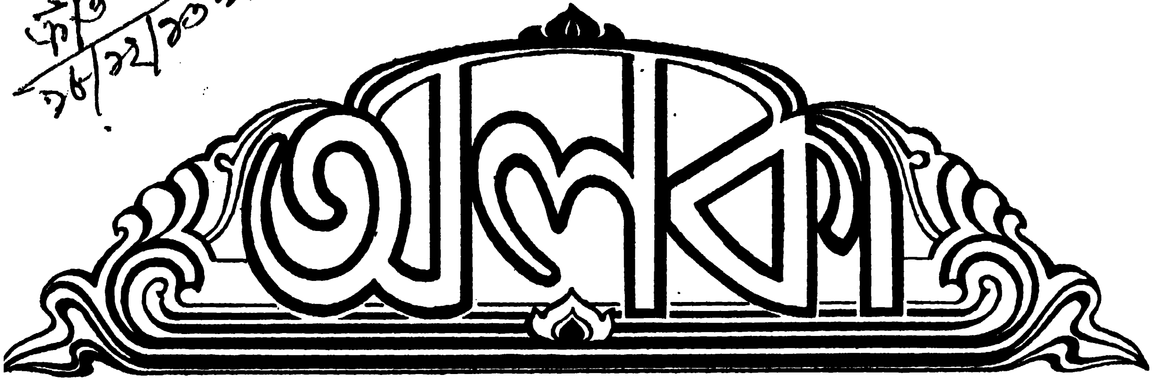


সচিত্র মাসিক পত্র

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড

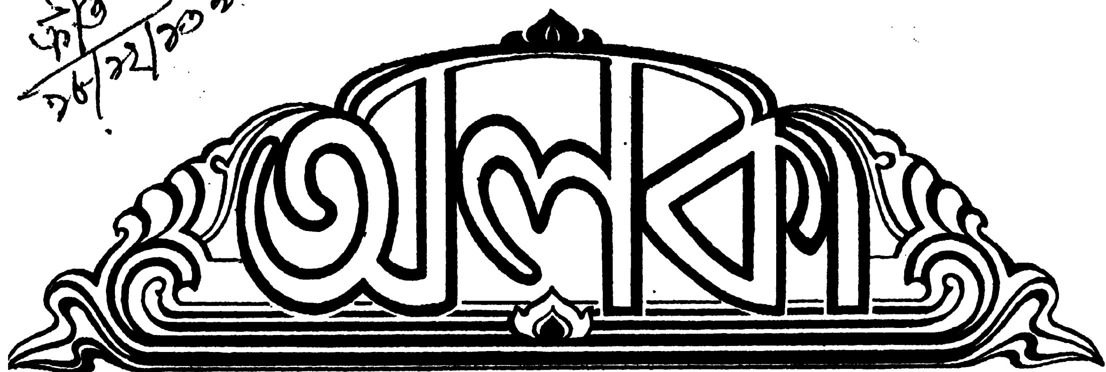
চৈত্র, ১৩৪৬ — ভাদ্র, ১৩৪৭

সম্পাদক

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সরকার

এভিনিউ হাউস্

১, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা



সচিত্র মাসিক পত্র

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৪৬ — ভাদ্র, ১৩৪৭

সম্পাদক
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সরকার

এভিনিউ হাউস্
১, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা

৪৫৫০

অলকা

(চৈত্র, ১৩৪৬ হইতে ভাদ্র, ১৩৪৭)

ষাণ্মাষিক সূচী

বিষয় সূচী

লেখক সূচী

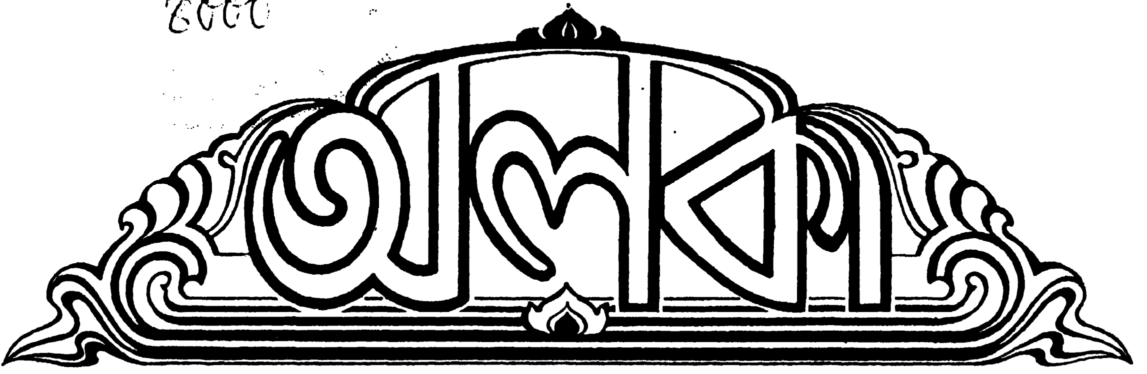
(বর্ণানুক্রমিক)

চিত্র-সূচী



প্রলোভন

শিল্পী—শ্রীরবীন ভট্টাচার্য্য



দ্বিতীয় বর্ষ } চৈত্র, ১৩৪৬ { ৭ম সংখ্যা

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, রায় বাহাদুর, এম. এ.

গত ২রা মার্চ তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে পরিষৎ হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহের একখানি সংক্ষিপ্ত জীবনীও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত সময়োপযোগী হইয়াছে বলিতেই হইবে। কারণ আমরা কালীপ্রসন্নের জীবন-কথা ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছি। যে সকল মনস্বী নিজ দেহ পাত করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের প্রবাল দ্বীপ রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কালীপ্রসন্ন অগ্রণী। বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যখন আমরা স্মরণ করি যে কালীপ্রসন্নের আয়ুষ্কাল মাত্র ত্রিংশ বর্ষ মাত্র, তখন আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ১৮৭০ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন, এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা বস্তুতঃ অভাবনীয়।

তাঁহার জীবনে দুইটি বিষয়ের অত্যুগ্র প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়—একটি তাঁহার স্বদেশানুরাগ, আর একটি তাঁহার বাংলা ভাষার প্রতি প্রীতি। এই দুইটিই তাঁহার সাধনার মূলমন্ত্র ছিল। জেমস্ লং সাহেব যখন জজ সার মর্ড্যাণ্ট ওয়েল্সের বিচারে অর্থদণ্ডে ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, তখন কালীপ্রসন্ন সিংহ অযাচিত ভাবে সহস্র মুদ্রা দিয়া তাঁহার দুঃখ লাঘব করিয়াছিলেন। এই লং সাহেব কিছুদিন পরে স্বদেশে যাত্রা করেন, তখন কালীপ্রসন্ন 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র মারফতে তাঁহাকে এক বিদায় অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিলেন। এই বিদ্যোৎসাহিনী সভা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ সংস্কারে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং ব্যবস্থাপক সভার নিকট যে আবেদন-পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে তিন সহস্র ভদ্রলোকের স্বাক্ষর যোগাড় করিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন যাহা ভাল বলিয়া মনে করিতেন, তাহা করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইতেন না। সমাজে অবশ্য চিরদিনই দুইটি দল আছে এবং হয়ত চিরদিন থাকিবে। তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। বিদ্যাসাগর যে

মানবিকতার প্রেরণায় হিন্দু সমাজের বৈধব্য দুঃখ মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন, কালীপ্রসন্নও সেইরূপ। কিন্তু শুধু মৌখিক সহানুভূতির হাওয়াবাজি না করিয়া তিনি নানা ভাবে এই আন্দোলনকে সফল করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই সময়ের বা তাহার কয়েক বৎসরের পরবর্ত্তী মনোবৃত্তির সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নবজীবনে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কৌতূহলপ্রদ। নবজীবন দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিলে বঙ্কিম আনন্দ প্রকাশ করিয়া লিখিতেছেন :

'এত আহ্লাদের কথায় একটু বিষাদের কথা আছে। জন কতক লোক সূতিকা হইতেই আমাদের উপর বিরূপ। ইহারা কথায় কথায় আমাদের উপর সাম্প্রদায়িক কলঙ্ক আরোপ করিতে যত্নবান। আমরা উত্তরে মুখ ফিরাইলে বলেন, এই চলিল তিব্বতে; ইহারা এবার থিয়সফিষ্ট্ হইবে। পূর্ব্বমুখ হইলে বলেন, ঐ দেখ বুড়া ঋষিগণের না বুঝিয়া অনুকরণ করিতেছে; পশ্চিমমুখে ফিরিলে বলেন, এইবার ইহারা মক্কায় গিয়া ফতোয়া পড়িবে, দক্ষিণ মুখ হইলে বলেন, যাক্ এইবার ইহারা যমালয়ে গেল।'

এই রূপ উক্তি হইতে তদানীন্তন সমাজে মতভেদের বহর সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যায়। কিন্তু কালীপ্রসন্নের চরিত্রে এই মহৎগুণটি ছিল যে তিনি এই সকল মতামতের প্রতি গারুড়ীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতেন না। তিনি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে নিজের গায়ের বহুমূল্য শাল দান করিতেও বিরত হন নাই, আবার ল্যাঙ্কাশায়ার দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে এক সহস্র মুদ্রা প্রদানেও কাতর হন নাই। জজ ওয়েলস্ বাঙ্গালী চরিত্রের নিন্দা করিতেন বলিয়া কালীপ্রসন্ন তাঁহাকে তিরস্কার করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই, আবার যখন ঐ জজ সাহেব স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া এতদ্দেশবাসীর অনুকূল হইলেন, তখন তাঁহার বিদায় সংবর্দ্ধনায় যোগদান করিতেও পরাঙ্মুখ হন নাই। সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে লর্ড ক্যানিং যখন দেশের লোককে অযথা অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন, তখন কালীপ্রসন্নের হৃদয় গলিয়াছিল; তিনি লর্ড ক্যানিংএর মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপনের প্রস্তাবে হাজার টাকা দিয়াছিলেন। বাংলার নীলকরপ্রপীড়িত প্রজাও তাঁহার যেমন সহানুভূতি লাভ করিয়াছিল, সিপাহী যুদ্ধের শেষে অত্যাচার-উৎপীড়িত ভারতবাসীর জন্যও তিনি তেমনই ব্যথা অনুভব করিয়াছিলেন। এই সকল কার্য হইতে শুধু যে তাঁহার স্বদেশহিতৈষণার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নহে, তাঁহার পরদুঃখকাতর হৃদয়েরও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার বদান্যতা সে সময়ে সর্বজনবিদিত ছিল। দান করিতে করিতে তিনি তাঁহার রাজভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ করিয়া দিয়াছিলেন, এইরূপ তাঁহার আত্মীয়স্বজনের নিকট শুনিয়াছি। সমাজের হিত, মানবের উপকার, স্বদেশের কল্যাণ—এই ছিল তাঁহার কর্মজীবনের মূলমন্ত্র। অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া তিনি যে অতুল বিভবের অধিকারী হইয়াছিলেন, তিনি তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে একটুও কৃপণতা করেন নাই। এই সদ্গুণের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, তাঁহার দত্তকপুত্র বিজয়চন্দ্র সিংহ। ইঁহার সহিত অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। কালীপ্রসন্নের পরে বিজয়চন্দ্র আজও কলিকাতা সমাজে শিষ্টাচার, সৌজন্য, পরোপকার এবং বদান্যতার জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন। ইঁহার ব্যবহার দেখিয়া যদি ইঁহার পিতার সদ্গুণের সম্বন্ধে অনুমান করা অন্যায় না হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে কালীপ্রসন্ন একজন অসাধারণ বাঙ্গালী ছিলেন।

তিনি যে দান করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন, তাহা মনে করিলে সঙ্গত হইবে না। আমি

শুনিয়াছি যে, অনেকে তাঁহাকে ঠকাইয়া লইত। তাঁহার বন্ধুগণ সাধুর মুখোষ পরিয়া আসিত, এবং পরিশেষে তাঁহার বিষয় সম্পত্তি ফাঁকি দিয়া লইত এইরূপ বহু গল্প শুনিয়াছি। কোনও সময়ে একটি খুনী মোকদ্দমার সুযোগ লইয়া জনৈক খ্যাতনামা লোক তাঁহাকে দিয়া একটি সাদা কাগজ স্বাক্ষর করাইয়া লন। ঐ সময়ে যুবক কালীপ্রসন্ন কোনও একটি বিশিষ্ট সমাজে খেলায় রত ছিলেন। বন্ধু তখন পুলিশ আসিয়াছে এই ভয় দেখাইয়া তাঁহার নিকট হইতে একখানি সাদা কাগজে লিখাইয়া লন। পরে জানা গেল যে কালীপ্রসন্ন তাঁহার একটি অতি মূল্যবান সম্পত্তি সেই ভদ্রলোককে বিক্রয় করিয়াছেন! এই সকল বন্ধুদ্রোহিতার ফলে তিনি অত্যধিক মদ্য পান করিতে আরম্ভ করিলেন। সারা দিন রাত্রি একটি রুদ্ধ কক্ষে তিনি এইরূপে বিস্মৃতির আরাধনা করিতেন। ফলে অল্প বয়সেই তাঁহার যকৃতের পীড়া হইল এবং তাহাতেই তাঁহার দেহপাত হইল। ইংরেজি শিক্ষার ফলে দেশে যে পানাসক্তি প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার প্রধান বিষময় ফল—অকালে এই অমূল্য জীবনের উপর যবনিকাপাত।

যাহার প্রাণ অমৃতের সন্ধানে ছুটিয়াছে, মৃত্যু তাহাকে জয় করিতে পারে না। কালীপ্রসন্ন মরিয়াও অমর হইয়াছেন, তাঁহার সাহিত্য সাধনার দ্বারা। এই সাধনায় তিনি ডুবিয়া ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। বাংলা ভাষার তখন উন্মেষ হইয়াছে মাত্র। ইহার ভবিষ্যৎ তখনও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কালীপ্রসন্ন কিন্তু বুঝিতে পরিলেন যে বাঙ্গালীজাতির মুক্তি এই সাহিত্যের পথে। সাহিত্যেই তাহার কল্যাণ, সাহিত্যেই তাহার উন্নতি। তিনি প্রথমেই হিন্দু সংস্কৃতির হীরকখনি মহাভারত গদ্যে অনুবাদ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহার পূর্বেও মহাভারতের অনুবাদ ছিল, পদ্যেও ইহার বহুল প্রচার চিল। কিন্তু কালীপ্রসন্ন বুঝিয়াছিলেন যে মহর্ষিপ্রণীত অমর কাব্য যথাযথভাবে বাঙ্গালীর পক্ষে সুপ্রাপ্য করিতে পারিলে জাতির কল্যাণ হইবে। যে ভাষায় আমরা সব সময়ে কথা বলি, সেই ভাষায়, সেই সরল গদ্যে মহাভারতের কাহিনী জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করিতে না পারিলে মহাভারতের আদর্শ সকলের জীবনে সুলভ হইবে না। এই ধারণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি মহাভারত ও ভগবদ্গীতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে অর্থব্যয় করিতে তিনি কৃপণতা করেন নাই। মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশ করিতে বর্ধমানের মহারাজের রাজকোষও যথেষ্ট কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। এই মহাভারত অনুবাদ করিতে কালীপ্রসন্নের সুদীর্ঘ আট বৎসর লাগিয়াছিল।

বাংলা ভাষার অগ্রগতি যাহাতে ক্ষিপ্র হয়, তাহার জন্যও কালীপ্রসন্ন যথাসাধ্য অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। বিদ্যোৎসাহিনী সভার তিনিই ছিলেন প্রাণস্বরূপ। তাঁহারই চেষ্টায় 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' প্রচারিত হয় ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র সম্পাদনভার কালীপ্রসন্ন গ্রহণ করিয়া ইহাকে কিছুকাল জীবিত রাখিয়াছিলেন। সচিত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন লিখিয়াছিলেন:

"বিবিধার্থ কি বিদ্যাবতী রমণীকুল কি তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত সমাজ, সর্বত্রই তুল্য সম্মানে পরিগৃহীত হইয়াছে; এমন কি বর্ণপরিচয়বিহীন বালকগণও শুদ্ধ চিত্র দর্শনাভিলাষে বিবিধার্থের প্রকাশকাল প্রতীক্ষা করিয়াছে।" (কালীপ্রসন্ন সিংহ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

'পরিদর্শক' নামে একখানি দৈনিক সংবাদ পত্রও কালীপ্রসন্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাকেও কালীপ্রসন্ন সাহায্য করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন 'সংবাদ প্রভাকরে'র বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলনে নানাবিধ পুরস্কার ঘোষণা করিয়া ইনি বঙ্গভাষার উন্নতিতে যথেষ্ট সহায়তা করিতেন। অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপনেও কালীপ্রসন্ন যে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা হয়ত আমরা অনেকেই জানি না। এড়ুকেশন গেজেট হইতে ব্রজেন্দ্রবাবু দেখাইতেছেন :

"এই নব যুব বিদ্যোৎসাহী সিংহ মহাশয় পরোপকারে সিংহস্বরূপ হইয়াছেন, ইনি দিগ্‌বিদিগে আর ছয়টা অবৈতনিক বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া দীনহীনগণকে তিমিরহারী জ্ঞান চক্ষু দিতেছেন…" ইহার একটি স্কুলে তিনি মাসিক একশত টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন।

কালীপ্রসন্নের সাহিত্য-সেবা যে অত্যন্ত ব্যাপক ভাবেই হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু তিনি সাময়িক সাহিত্যের প্রশ্রয় দিয়া এবং বিদ্যালয়ে সাহায্য দান করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না। সাহিত্য-সৃষ্টিরও নানা আয়োজন তিনি করিয়াছিলেন। তাঁহার 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে তিনি তাৎকালীন কলিকাতা সমাজের যে পরিহাসোজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা অনেক বিষয়ে অপূর্ব। চলিত ভাষায় বঙ্গ সাহিত্যে যে দুইখানি মূল্যবান গ্রন্থ সে সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে একখানি 'আলালের ঘরের দুলাল', অপর খানি 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'। আলাল এবং হুতোম দুই জনেই বঙ্গভাষার প্রকৃত প্রতিভা কোথায় তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সংস্কৃতবহুল শব্দসম্ভারে বাংলাভাষাকে যাঁহারা আড়ষ্ট ও খঞ্জ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের চৈতন্য-সম্পাদনের জন্যই প্রধানত এই দুইখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। এই পুস্তক প্রকাশিত হইবার পরে আর বঙ্গভাষা পথভ্রষ্ট হয় নাই। সাহিত্যের জয়যাত্রার ইতিহাসে হুতোমের পর্ব চিরস্থায়ী হইবার যোগ্য। এই গ্রন্থে লেখক যে স্বাধীনতার পরিচয় দিয়াছেন, ইহার ভূমিকায়ও সেইরূপ। সমস্ত গতানুগতিকতা দূরে নিক্ষেপ করিয়া তিনি অমিত্রাক্ষর পদ্যে ভূমিকা লিখিয়াছিলেন।

"হে সজ্জন! স্বভাবের সুনির্মল পটে,
রহস্য-রসে রঙ্গে চিত্রিনু চরিত্র—
দেবী সরস্বতীর বরে। কৃপা চক্ষে হের
একবার, শেষে বিবেচনা মতে যার
যা অধিক আছে, তিরস্কার কিম্বা
পুরস্কার, দিও তাহা মোরে, বহুমানে
লব শির পাতি।"

১৮৬১ সালে মাইকেলের মেঘনাদবধ রচিত হয়। সুতরাং কালীপ্রসন্ন যদি এই অমিত্রাক্ষর রচনায় মাইকেলের অনুসরণ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার সৎসাহস ও প্রতিভার সুখ্যাতি না করিয়া পারা যায় না। মাইকেলকে বিদ্যোৎসাহিনী সভা হইতে যে অভিনন্দন দেওয়া হয় তাহাতে কালীপ্রসন্ন অমিত্রাক্ষর ছন্দের বহু প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং মাইকেল যে এই মেঘনাদবধ রচনার দ্বারা বঙ্গ সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিবেন, তাহাও ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র 'আলালের ঘরের দুলালে'র যেরূপ প্রশংসা করিয়াছেন হুতোমের সেরূপ করেন নাই। তাহার জন্য কেহ কেহ মনে করেন যে বঙ্কিম বাবু কোনও কারণে কালীপ্রসন্নের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনও বিশেষ প্রমাণ আছে বলিয়া জানি না। তবে সাময়িক পত্র পরিচালন ব্যাপারে হয়ত উভয়ের মধ্যে কিছু প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটিয়া থাকিবে।

'নবজীবনে'র দ্বিতীয় বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্র হুতোমের কবিতা ছাপিয়াছেন। তখন কালীপ্রসন্ন স্বর্গত। কিন্তু কবিতাটি যেরূপ ব্যঙ্গরসে সমুজ্জ্বল তাহাতে মনে হয় যে কালীপ্রসন্নের দেহাবসানের পরে তাঁহারই কবিতা নিজের পত্রে স্থান দিয়া তিনি প্রতিভার মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। কবিতাটি অনেকেরই সুপরিচিত, তাহা হইলেও ইহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

হুতোম প্যাঁচার গান

সহর বন্দনা

কলির সহর কল্‌কাতাটির পায়ে নমস্কার
যার জাঁক্‌জমকে ভাগীরথীর দুধার গুলজার।
যার কোলের কাছে ঘাসের মাঠে হাওয়া খাবার স্থান।
যার মাঠের ধারে বাড়ীর বাহার দেখলে জুড়ায় প্রাণ।
যার পাথর ইটে পথ বাঁধানো 'ফুটপাথ' দোধারি
যার পথের গায়ে মাঠের মাঝে গাছের কত সারি,
যার তিনদিকে জল সহর ঘেরা— উত্তরে বাহালি
আহা বাগবাজারের খালের সীমা অগ্নিকোণে কালী।
আর অজ দখিণে আদি গঙ্গা টালির নালা হালি!
যার মাথার দিকে পাইকপাড়া খুরে খিদিরপুর
যার পূব্ব্ ঘেঁসে সুঁড়ো টালি ঘোঁজে আলিপুর
যার ইট দালানে খোলার চালে ঠেকাঠেকি গায়
যার গির্জে মসীদ ঠাকুর বাড়ীর চূড়োয় আকাশ ছায়,
যার বাজার গলি বিষ্ঠে নলি বাইরে জ্বলে ঝাড়,
যার বুকের উপর বেশ্যাপাড়া মেথর হাঁকায় ষাঁড়!
যার টাউন জোড়া পল্লী দুটি সাহেব নেটিভ পাড়া,
যার চৌরঙ্গী সোনার থালা সহর ধুলোর হাঁড়া!
যার গ্যাসের আলো রাত্রিকালে চক্ষে লাগায় ধাঁধা,
যার কোলে দোলে লোহার সাঁকো এদিক ওদিক বাঁধা।
যার রান্নাঘরে সহর ফুঁড়ে কলের পানি ছোটে,
যার দুধের কেঁড়েয় খাঁটি পানি তিন পো ছেড়ে ওঠে।

যার দেশের ছেলে মিথ্যেবাদী সাহেব রাজাই সাঁচা,
যার লম্বাটে গোচ চেহারাটা ফজলি আমের ঢাঁচা ;
আহা ভাগীরথীর দুকূল জোড়া রূপের ছটা যার
কলির সহর কল্‌কাতা তোর পায়ে নমস্কার !

আসংগ

শ্রীগৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়

সংগমে ছিলে তুমি একাকী
ত্রিভুবন তুমিময় বিরহে
কাছে যবে ছিলে জানা হ'লনা
দূরে গিয়ে ধরা দিলে গভীরে।

ধরণী ও আকাশের অবকাশ
বেদনার বারিধারা ভরিল
দিলে তাপ মানসের গহনে
আগুনের তারাফুল ফুটিল।

সর্পিল বেণী ছিল জড়ানো—
অলকার বাতায়নে একি এ
রাত্রির এলোচুল ছড়ানো—
কুণ্ডলকবরী কি বাঁধিবে ?

নিমীল সে-নয়নের কি মোহ
আকাশের নীলমায়াজড়ানো
অঞ্জন আজ সেথা শোভে কি
নবীন-বরষা-ঘনছায়াতে !

রাত্রির সুরভিত স্বপ্ন
বনতলে শেফালিকা ঝরিল
না-বলা বাণীর কত বেদনা
কাঁপে এই উষসীর শিশিরে।

ভাদ্রের ভরানদীদুকূলে
শত-তারা-চোখে কারে খুঁজিছ
কাছে যবে ছিলে ধরা দিলেনা
দূরে গিয়ে কেন চাও বাঁধিতে ?

কাজল

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বেশী মানসিক উত্তেজনার সময় সবচেয়ে দরকারী কথাটাই মানুষ ভুলিয়া যায়।

রাণী জানিত সন্ধ্যার একটু পরেই বিকাশ আসিবে। একজায়গায় নিমন্ত্রণ আছে, বিকাশ অনেক করিয়া বলিয়া রাখিয়াছে, তার সঙ্গে রাণীর সেখানে যাওয়া চাই। কথায় কিছু প্রকাশ না পাক, বলার ভঙ্গির মধ্যে কি যেন ছিল বিকাশের, আজ সারাদিন থাকিয়া থাকিয়া রাণীর বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যার আগেই চুল বাঁধিয়া কাপড় পরিয়া এবং আর সব সাধারণ প্রসাধন শেষ করিয়া সে ভাবিয়াছিল, বিকাশ আসিয়াছে খবর পাইলে চোখে কাজল দিয়া নীচে যাইবে। মিনিট দশেক মানুষটাকে একা বসাইয়া রাখাও হইবে, সদ্য সদ্য কাজল দেওয়ায় চোখ দুটিও তার জ্বল্ জ্বল্ করিবে অন্য দিনের চেয়ে বেশী।

মুগ্ধ বিকাশ আরও বেশী মুগ্ধ হইয়া যাইবে।

কে জানে মানুষের পছন্দের রীতিনীতি কি অদ্ভুত! রাণীর মধ্যে ভাল লাগিবার এত কিছু থাকিতে বিকাশ পছন্দ করিয়াছে তার চোখ দুটিকে। যেমন তেমন পছন্দ করা নয়, এরকম চোখ নাকি সে আজ পর্য্যন্ত আর কোন মানুষের দ্যাখে নাই, মানুষের যে এমন অপরূপ চোখ থাকিতে পারে সে নাকি তা কল্পনাও করিতে পারে না।

'এমন যার চোখ, তার মন কি বিচিত্র হবে আমি তাই ভাবি।'

বিকাশ একদিন এই কথা বলিয়াছিল।

অথচ কাজলের ছোঁয়াচ না পাইলে কেমন যেন ছোট আর গোল আর ফ্যাকাসে দেখায় রাণীর চোখ। অনেকদিনের চেষ্টায় রাণী চোখের প্রসাধনের কৌশল আয়ত্ত করিয়াছে। অনেক যত্নে সে কাজল তৈরী করে। অতি সাবধানে সে চোখের পাতায়, চোখের কোণে আর ভুরুতে কাজলের ছোঁয়াচ দেয়—একটু হাত কাঁপিয়া গেলে ভাল করিয়া সব ধুইয়া মুছিয়া আবার নতুন করিয়া দিতে হয়। কাজল দেওয়ার পর চোখ দুটিকে তার একটু বড়, একটু টানা, একটু বেশী কালো আর ভাসাভাসা মনে হয়। এ যে তার চোখের স্বাভাবিক রূপ নয়, সহজে তাহা ধরা যায় না। দৃষ্টি যার একটু বেশী রকম তীক্ষ্ণ তার পক্ষেও বুঝা কঠিন, চোখে রাণী কাজল দিয়াছে। দৃষ্টির তীক্ষ্ণতার সঙ্গে যার অভিজ্ঞতা থাকে প্রচুর, তার পক্ষেই কেবল মাঝে মাঝে টের পাইয়া গিয়া মনে মনে একটু হাসা সম্ভব।

মনে মনে হাসিবেই যে এমন কোন কথা নাই, রাণীর চোখের কাজল-বৈচিত্র্য আবিষ্কার করার মত চোখ যার আছে, হারানোর বদলে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যার স্বভাব, হাসির বদলে তার মনে মায়া জাগাই স্বাভাবিক। কাজল দেওয়ার কায়দার মধ্যে রাণীর যে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় আছে, মনে মনে তার প্রশংসা করাও আশ্চর্য্য নয়। তবে রাণীর কথা আলাদা। চোখের কাজল মনে তার যে কালিমার ছোঁয়াচ দিয়াছে, ফাঁকি ধরা পড়ার ভয়টাই তার সবচেয়ে জোরালো অভিব্যক্তি।

কত তুচ্ছ ব্যাপার চোখে একটু কাজলের ছোঁয়াচ দেওয়া! রূপ বাড়ানোর নামে মেয়েদের

কত হাস্যকর প্রসাধনের প্রক্রিয়া মানুষের চোখ-সহা হইয়া গিয়াছে; রূপের ফাঁকি আড়াল-করা কত প্রকাশ্য ও স্থূল রঙের পর্দা মানুষ চাহিয়া দেখিতেও ভুলিয়া গিয়াছে, কৃত্রিম রূপের মোহেই বেশী মুগ্ধ হইতে শিখিয়া রীতিমত দাবী করিতে শিখিয়াছে কৃত্রিম রূপ। কি আসিয়া যায় চোখে একটু কাজল দিলে? প্রথম প্রথম রাণীও তাই ভাবিত, এটা সে একটা খুব বড় অপরাধ এ ধারণা তার ছিল না। তারপর অল্পে অল্পে তার নিজের ফাঁক তার নিজের কাছেই বড় হইয়া উঠিয়াছে, নিজে নিজেই সে বিশ্বাস করিয়া ফেলিয়াছে, চোখে কাজল দিয়া সর্ব্বদা সে সকলকে ঠকায়। একবার যে টের পাইবে, সেই তাকে ছি ছি করিবে।

এ ভয় চরমে উঠিয়াছে, কাজল দেওয়া চোখ দেখিয়া বিকাশের মুগ্ধ হওয়ার পর। মাঝে মাঝে বিকাশ যেন সত্যই অবাক হইয়া তার চোখের দিকে চাহিয়া থাকে, কি যেন খুঁজিয়া পায় আর কি যেন খুঁজিয়া পাইতে চায়। রাণী হয়ত তখন কথা বলিতেছে, কি বলিতেছে ভুলিয়া যাওয়ার চেয়ে কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়ায় চোখ মুদিয়া ফেলিবার প্রায় অদম্য একটা প্রেরণা দমন করা।

বিকাশ কিন্তু হঠাৎ খুসী হইয়া ওঠে, যা খুঁজিতেছিল যেন খুঁজিয়া পাইয়াছে। বলে, 'সত্যি, মানুষ আর সব পারে, চোখের সঙ্গে মনের যোগটা কেবল ঘুচিয়ে দিতে পারে না।'

শুনিয়া পাংশু মুখে রাণী একটু হাসে। বিকাশ তার চোখের ফাঁকি ধরিয়া ফেলিয়াছে এই ভয়ে তার মুখ শুকাইয়া যায় না, ভয় তার হয় ভবিষ্যতের। এখন আর বিকাশ কিছু টের পাইবে না, পাইলে অনেক আগেই পাইত, অনেকবার সে তার চোখ দুটিকে একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়াছে। অনেকদিনের অভিজ্ঞতায় রাণী এটুকু জানিয়াছে, প্রথম দু' একবার তার চোখের দিকে চাহিয়া যদি বিকাশ না বুঝিতে পারে চোখে সে কাজল দিয়াছে, সেদিন আর তার ধরা পড়িবার ভয় নাই। ধরা সে পড়িবে সেইদিন, যেদিন ঠিকমত কাজল দেওয়া হইবে না, চোখের দিকে চাহিয়াই বিকাশ বুঝিবে চোখের পরিচিত রূপের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এবং আরও ভাল করিয়া টের পাইবে সেদিন, যেদিন তার কাজলহীন চোখ চোখে পড়িবে।

একবার যদি বিকাশ তার স্বাভাবিক চোখ দেখিতে পায়, গভীর বিতৃষ্ণায় তার মন ভরিয়া যাইবে। আর সে তার ধারে কাছেও কোনদিন আসিবে না।

নিজের ঘরে বসিয়া এই কথাটাই রাণী আজ ভাবিতেছিল। অন্য দিনের চেয়ে ভাবনাটা আজ চিন্তারাজ্যের একটু উঁচু স্তরে চড়িয়া গিয়াছিল, যেখানে মানুষের বুদ্ধি জীবনের কতকগুলি দুর্ব্বোধ্য রহস্যানুভূতির ব্যাখ্যা খুঁজিয়া মরে, জীবনের অনিয়মগুলির মধ্যে যুক্তি আবিষ্কারের চেষ্টা করে, আত্মচিন্তার প্রসঙ্গে সমালোচনা করে নিজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের।

এমন একটা অবস্থা বিকাশ কেন সৃষ্টি করিয়াছে, এই একটিমাত্র ছলনাকে যাতে প্রশ্রয় দিয়া চলা ছাড়া সে আর উপায় খুঁজিয়া পাইতেছে না? আর কোন বিষয়ে কোন কিছুই তো সে বিকাশের কাছে লুকাইবার চেষ্টা করে না। কি না জানে বিকাশ তার সম্বন্ধে? অ্যাশ-ট্রের বদলে ছাই ফেলার জন্য ভাঙ্গা কলাই করা বাটি বিকাশকে আগাইয়া দিতে রাণীর কোনদিন এতটুকু সঙ্কোচ হয় নাই। কাকার আশ্রয়ে দিনগুলি যে তার বিশেষ আরামে কাটিতেছে না, বিনয়বাবুর বাড়ীর

কয়েকটি ছেলেমেয়েকে রোজ চারঘণ্টা পড়াইয়া সে যে অতি কষ্টে কলেজের খরচটা সংগ্রহ করে, সংসারের কাজকর্ম্ম করিতে সে যে তেমন পটু নয়, সময়ও পায় না,—তাও বিকাশের অজানা নয়। কি সে বলিতে বাকী রাখিয়াছে বিকাশকে অথবা বিকাশ যাতে টের না পায় সেজন্য চেষ্টা করিয়াছে? কেবল তার চোখ দুটিকে একটু কৃত্রিমতার আড়ালে রাখা ছাড়া?

তার সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি বিকাশ হাসিমুখে মানিয়া নিয়াছে, তার গুণগুলিকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া রাখিয়াছে সহজ অবহেলায়। এমন সুন্দর দেহের গড়ন রাণীর, অনেক ভদ্রতা-অভ্যস্ত ভদ্রলোক পর্য্যন্ত চাহিয়া না থাকিয়া পারে না, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বিকাশের চোখে পড়িয়াছে কিনা সন্দেহ। চোখ নিয়া এত যদি বাড়াবাড়ি বিকাশ না করিত, কাজলহীন চোখ তাকে দেখাক বা না দেখাক, চোখে যে সে একটু কাজল দেয় একথাটা একদিন কি সাহস করিয়া স্বীকার করিয়া ফেলিতে পারিত না বিকাশের কাছে?

এইসব ভাবিতেছে রাণী, এ বাড়ীর কর্ত্তা তার কাকা মাধববাবুর সেজ মেয়ে নলিনী নীচে হইতেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকিয়া বলিল, 'ওগো মহারাণি! আপনার জন্যে এক ভদ্রলোক যে বাইরের ঘরে বসে আছেন একঘণ্টা।'

রাগে গা'টা যেন রাণীর জ্বলিয়া গেল। চোখে কাজল দেওয়ার উপর তাকে ভাল লাগা না-লাগা নির্ভর করিবে কেন ভাবিয়া বিকাশের উপর মনের মধ্যে একটা দুর্ব্বোধ্য বিতৃষ্ণা সঞ্চারিত হইতেছিল, নলিনীর অভদ্র হাঁক শুনিয়া সমস্ত রাগটা গিয়া পড়িল এবাড়ীর হিংসুটে মানুষগুলির উপর। গট গট করিয়া সে নীচে নামিয়া গেল।

চোখে আর কাজল দেওয়া হইল না।

সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছে। কে জানিত আত্মচিন্তার সময় এত তাড়াতাড়ি চলিয়া যায়! বাহিরের ঘরটি অন্ধকার, জানালা দিয়া রাস্তার একটু আলো আসায় কেবল টের পাওয়া যায় একটি আবছা মূর্ত্তি একটা চেয়ার দখল করিয়া বসিয়া আছে।

এতক্ষণে রাণীর মনে পড়িল, কাল রাত্রে এ ঘরের বাল্‌বটি ফিউজ হইয়া গিয়াছিল। আজ আপিস ফেরৎ মাধববাবু বাল্‌ব কিনিয়া আনিয়া লাগাইবেন।

'অন্ধকারে বসে আছেন?'

'আলো না জ্বাললে কি করব বল?'

আলো না জ্বলিবার কারণটি ব্যাখ্যা করিয়া রাণী বলিল, 'মোমবাতি আনিয়ে নেব একটা?'

'কি দরকার? তার চেয়ে চল ঘুরে আসি।'

দুজনে বাহির হইয়া গেল। বিকাশের মোটরটি খুব বড় নয়, আনকোরা নতুনও নয়। দামী গাড়ী কিনিবার পয়সা বিকাশের আছে, কিন্তু ওভাবে পয়সা নষ্ট করিবার সখ তার নাই। মানুষটা সে একটু হিসাবী, গাড়ীর চাকচিক্যে মানুষের মনে ঈর্ষামেশানো সম্ভ্রম জাগাইয়া সুখী হওয়ার মত বোকামিকে সে প্রশ্রয় দেয় না। এইজন্য রাণী তাকে বড় ভয় করে। কোন্ তুচ্ছ খুঁতটি কত বড় হইয়া বিকাশের চোখে ঠেকিবে, কে তা জানে? চল্লিশ বছর বয়সে মানুষ জীবন-সঙ্গিনীর মধ্যে কি চায়? অহঙ্কার চায় না, ধৈর্য্যহীনতা চায় না, চাপল্য চায় না, সঙ্কীর্ণতা চায় না—

এসব রাণী জানে। কিন্তু কি চায়? ঝাঁঝহীন স্নিগ্ধ খানিকটা রূপযৌবন আর শান্ত কোমল স্বভাব? ভক্তি? শ্রদ্ধা?

যাই হোক, চোখ দুটি ছাড়া তার মধ্যে আর কিছু যে বিকাশের ভাল লাগিয়াছে আজ পর্য্যন্ত কথায় বা ইঙ্গিতে কোনদিন সে প্রকাশ করে নাই। ধরা যাক, তাকেই যদি বিকাশ জীবনসঙ্গিনী করে, তবে কি বলিতে হইবে চল্লিশ বছর বয়সে বিকাশের মত মানুষ জীবনসঙ্গিনীর মধ্যে মনের মত দুটি চোখ ছাড়া আর কিছুই চায় না?

এইবার হঠাৎ রাণীর মনে পড়িয়া গেল, চোখে আজ কাজলের ছোঁয়াচ দেওয়া হয় নাই। গাড়ী তখন বড় রাস্তার কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে, সঙ্কীর্ণ পথে খুব সাবধানে গাড়ী চালাইতে হইতেছে বলিয়া বিকাশ চুপ করিয়া আছে, বড় রাস্তায় পড়িলে কথা আরম্ভ করিবে। রাণীর সমস্ত শরীর যেন অবশ হইয়া আসে, মাথাটা ঝিম ঝিম করিয়া ওঠে। আর কতক্ষণ? পনের মিনিট, কুড়ি মিনিট। তারপরেই নিমন্ত্রণ-বাড়ীর জোরালো আলোতে রাণীর এতদিনের সমস্ত আশার সমাধি। বিকাশ অবাক হইয়া খানিকক্ষণ তার গোল ফ্যাকাসে আর ছোট ছোট চোখ দুটির দিকে চাহিয়া থাকিবে। তারপর আত্মসম্বরণ করিয়া চিরদিন যেভাবে কথা বলিয়াছে, যেরকম ব্যবহার করিয়াছে, তেমনিভাবে কথা বলিবে, সেইরকম ব্যবহার করিবে। যেন কিছুই ঘটে নাই। যথা-সময়ে বাড়ীও পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে তাকে। তারপর ধীরে ধীরে যাতায়াত কমিতে কমিতে তাদের বাড়ীতে বিকাশের পদার্পণ ঘটিবে কদাচিৎ—তাদের দুজনের মধ্যে বজায় থাকিবে সাধারণ একটা বন্ধুত্ব। হয়তো তাও থাকিবে না।

'কি ভাবছ?'

'কিছু না।'

রাণীর গলার আওয়াজ শুনিয়া বিকাশ চকিতে একবার তার মুখের দিকে তাকায়। কিছু বলে না।

এরকম একটা সম্ভাবনার কথা কি রাণী কখনো ভাবে নাই? সে ভাবনার সঙ্গে আজ সত্য সত্যই ব্যাপারটা ঘটিয়া যাওয়ার মধ্যে কত তফাৎ! নিজেই সে ছোট বিছানাটিতে শুইয়া কতদিন কল্পনা করিয়াছে, চোখে কাজল না দিয়াই বিকাশের সামনে একদিন বাহির হইবে, ডাকিয়া বলিবে, দ্যাখো তো কাজল না দিলে কেমন দেখায় আমার চোখ? দেখিয়া বিকাশের যদি বিতৃষ্ণা জাগে, জাগিবে। চোখ দুটি একটু সুন্দর কম বলিয়াই যার ভালবাসা কর্পূরের মত উড়িয়া যায়, তাকে রাণী চায় না। কি দাম আছে ওরকম মানুষের? কাজলবিহীন বিশ্রী চোখ সমেত তাকে যে চাহিবে, না হোক সে বিকাশের মত বড়লোক, তার সঙ্গেই সে সুখী হইবে জীবনে। কিন্তু কল্পনার সেই উদ্ধত সাহসের চিহ্নটুকু আজ রাণী নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পায় না। কথাটা মনে পড়িবামাত্র সেই যে বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিয়াছিল, তারপর মনে হইয়াছিল একটা অদৃশ্য কি যেন তার বুকটা এত জোরে চাপিয়া ধরিয়াছে যে নিঃশ্বাস টানিতেও তার কষ্ট হইতেছে, এখনও বুকের মধ্যে সেই চাপ একটুও কমে নাই। তাড়াতাড়ি ছোট ছোট নিঃশ্বাস নিতে হইতেছে রাণীকে, গাড়ী চলিতে না থাকিলে বিকাশ নিশ্চয় টের পাইয়া যাইত।

কিন্তু বিকাশ কিছু একটা নিশ্চয় টের পাইয়াছিল। অন্যদিন সে কত কথা বলে, আজ নীরবে গাড়ী চালাইয়া যাইতে লাগিল।

রাণীর তখন মনে পড়িতেছে নিজের বর্ত্তমান জীবনের কথা। এ ভাবে তার কত দিন চলিবে? সমস্ত সকালটা বিনয়বাবুর ছেলেমেয়েদের পড়াইতে কাটিয়া যায়, নিজের তাড়াতাড়ি ক্লাশ থাকিলে বিকালে গিয়া পড়াইয়া চার ঘণ্টা পূর্ণ করিতে হয়। তাও আর বেশী দিন চলিবে না। বিনয়বাবু পুরুষ মাষ্টার রাখিবেন, পেটে যার বিদ্যা আছে। বাড়ীর কাজ করার সময় রাণী পায় না। মেয়েমানুষ খাওয়ার সময় পায় আর কাজ করার সময় পায় না, এত বড় অপরাধ ক্ষমা করার উদারতা এ বাড়ীর কারো নাই। সকলে খোঁচায়, সময় সময় সে খোঁচা গালাগালির পর্য্যায়ে গিয়া পড়ে। রাণী মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়া যায়। সে জানে প্রতিবাদ করিয়া লাভ নাই, প্রতিকার করিতে গেলেও ঠকিবে সে নিজেই। সন্ধ্যার পর বাড়ীর কাজ সে হয়তো কিছু কিছু করিয়া দিবার সময় পায়, ইচ্ছা করিয়াই এড়াইয়া চলে। কাজ করিলে রাত জাগিয়া পড়িতে হয়, রাত জাগিয়া পড়িলে চেহারা খারাপ হইয়া যায়। রাত্রে সাড়ে দশটা বাজিতে না বাজিতে রাণী বিছানায় যায়, ঘুম না আসিলেও চুপ করিয়া শুইয়া থাকে। মুখে ক্লিষ্টতার ছাপ পড়িবার ভয়ে দুশ্চিন্তার সঙ্গে প্রায়ই সে এমন লড়াই করে যে পরদিন আয়নায় মুখ দেখিয়া কান্না আসে।

বাড়ীর ভিতরটা বড় অপরিচ্ছন্ন। সেঁতসেঁতে ভিজা উঠানটার শ্যাওলা ঘষিয়াও তোলা যায় না। কমদামী পুরাণো আসবাব আর বাক্স-পেঁটরায় ঘরগুলি ভর্ত্তি, পা-পোষের কাজ চলে ছেঁড়া ভাঁজ করা বস্তায়, আলনার কাজ চলে দড়িতে, এখানে ছেঁড়া ময়লা কাপড় মেলা, ওখানে চট জড়ানো লেপের বস্তা ঝুলানো, সেখানে জমা করা ঘটি বাটি থালা। কয়েকটা নোংরা চীনামাটির কাপ ডিসের কাছে চটা ওঠা কলাই করা বাটিগুলি দেখিলেই বুঝা যায় ওই বাটিতেই এ বাড়ীর অর্দ্ধেক লোক চা পান করে। তার উপর আছে বাড়ীর সকলের চালচলন আর কথাবার্ত্তা। যতক্ষণ বাড়ীর মধ্যে থাকে রাণীর যেন দম আটকাইয়া আসে।

ওই বাড়ীতেই কি বাকী জীবনটা তার কাটাইতে হইবে? কলেজ বন্ধ হইলে বাহিরে বাহিরে দিনগুলি কাটাইয়া দিবার সুযোগটাও যে তার যাইবে নষ্ট হইয়া।

কাত হইতে হইতে রাণী প্রায় বিকাশের গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ চমকিয়া সোজা হইয়া বসিল। অল্প দূরেই একটা মোড় দেখা যাইতেছে, ওই মোড়টা ঘুরিলেই নিমন্ত্রণ-বাড়ী। বাস্, তারপর সব শেষ। আজ সারাদিন সে অনেক কিছু কল্পনা করিয়াছিল কিনা, আশা আজ চরমে উঠিয়াছিল কিনা, নিজের সামান্য একটু ভুলের জন্য আজই সব তার নষ্ট হইয়া গেল।

মোড়ে পৌঁছানোর আগেই বিকাশ গাড়ী থামাইয়া ফেলিল। ইচ্ছা করিয়া কিনা কে জানে, এমন জায়গায় সে গাড়ী থামাইল, পথের ধারের বড় একটা দোকানের জোরালো আলো যেখানে ঠিক রাণীর একেবারে মুখে আসিয়া পড়ে। কিছু ভাবিয়া দেখিবার আগেই দু'হাতে রাণী মুখ ঢাকিয়া ফেলিল।

'আজ তোমায় কি হয়েছে বল ত?'

কথা বলিতে গিয়া রাণীর গলায় স্বর ফোটে না। সহরের পথের গাড়ী ও মানুষের দৃষ্টি

মিশ্রিত শব্দের বিরামহীন স্রোত তাই দুই কাণে ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজিতে থাকে। একটা অদ্ভুত অনুভূতি জাগে রাণীর। ডুমকায় সহরের বাহিরে মাঠের মধ্যে বিকাশের একখানা বাড়ীর কথা সে কেবল কাণে শুনিয়াছে, তবু মাঠের মধ্যে মস্ত একটা বাড়ীর বড় বড় থামওয়ালা চওড়া গাড়ী-বারান্দায় ফ্রক্ পরা ছেলেমানুষ রাণী কেন মনের আনন্দে ডিগবাজী খায় এখন, চারিদিকে অবিশ্রাম বর্ষণের ঝম্ ঝম্ শব্দের মধ্যে ?

বিকাশ একটু ভাবিয়া বলে, 'তোমার শরীর ভাল নেই, আজ না হয় ওখানে না গেলে ? চলো ফিরে যাই। কেমন ?'

চোখের পলকে রাণী নিজের মুক্তির পথ দেখিতে পায়। এই সহজ উপায়টা তার এতক্ষণ খেয়াল হয় নাই। নিমন্ত্রণ-বাড়ীর আলোর মধ্যে গিয়া না দাঁড়াইলেই তো তার চোখ দেখিবার সুযোগ বিকাশ পাইবে না। মুখ হইতে হাত সরাইয়া, খোঁপা ঠিক করিবার ছলে মুখে বাহুর ছায়া ফেলিয়া, রাণী বলে, 'তাই চলুন। সত্যি আজ শরীরটা ভাল নেই।'

দোকানের জোরালো আলোর সীমানা হইতে গাড়ী যতক্ষণ সরিয়া না যায়, রাণী খোঁপাই ঠিক করিতে থাকে। তারপর জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিতে গিয়া সামলাইয়া নিয়া হাত নামাইয়া নেয়। মনটা হঠাৎ তার এমন বিষণ্ণ হইয়া গিয়াছে বলিবার নয়। এমন একটা গভীর অবসাদ আসিয়াছে যে মস্তিস্কের মধ্যে তার স্বাদের গুরুত্বটা যেন ভারি জিনিষ বুকে করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়া পাহাড়ের নীচে অসহায় অবস্থায় পড়িয়া থাকিবার স্বপ্ন দেখার মত স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

'সোজা বাড়ী যাবে ? গঙ্গার ধারে একটু ঘুরে গেলে বোধ হয় তোমার ভাল লাগত। যাবে ?'

রাণী অস্ফুট স্বরে বলে, 'চলুন।'

হঠাৎ আবার ধাক্কা খাওয়ার মত চমক দেওয়া উত্তেজনায় তার বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গঙ্গার ধারে ! বিকাশ তবে নিশ্চয় আজ কিছু তাকে বলিবে, একটা লেখাপড়া করিয়াও ফেলিবে তার সঙ্গে। কাজল না দেওয়া চোখ দেখার সুযোগ তো গঙ্গার ধারে নাই— এতদিন তার যে চোখ বিকাশ দেখিয়া আসিয়াছে সেই চোখের কথা কল্পনা করিয়াই বিকাশ আজ নিজেকে বাঁধিয়া ফেলিবে। কত উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনাই বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মত রাণীর মনে ভাসিয়া আসিতে থাকে। মাঠ ও গঙ্গার মধ্যে বিস্তীর্ণ রাস্তায় গাড়ীর গতি শিথিল করিয়া দেওয়া মাত্র তার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া ওঠে। কিন্তু বিকাশ যে কি ভাবিতে থাকে নিজের মনে সেই জানে, মুখে যেন আজ তার কথাই নাই। পাশে যে রাণী বসিয়া আছে সব সময় যেন এটা তার খেয়ালও থাকিতেছে না।

রাণীর উত্তেজনা ধীরে ধীরে কমিয়া আসে। গাড়ী দাঁড় করাইয়া কিছুক্ষণ পায়ে হাঁটিয়া বেড়ানোর পর বিকাশ হঠাৎ বলে, 'চল, এবার ফিরি।' ততক্ষণে রাণীর মন আবার বিষাদ ও বিরক্তিতে ভরিয়া গিয়াছে। গাড়ী যখন বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চলিল তার তখন মনে হইতেছে, সে বুঝি কয়েক রাত্রি ঘুমায় নাই। রোগশয্যাপার্শ্বে চার পাঁচ রাত্রি জাগিবার পর বাপের মৃত্যুর সময় নিজেকে তার এইরকম অবসন্ন, নিস্তেজ আর প্রাণহীন মনে হইতেছিল। সব চুকিয়া গিয়াছে। আজ যখন বিকাশ কিছু বলিল না, কোনদিন আর তার কাছে কিছু শুনিবার ভরসা রাণীর নাই।

রাস্তার আলোতে বিকাশ কি তার চোখ দেখিয়া আগেই কিছু টের পাইয়াছিল? তাই সে আজ এমন গম্ভীর, চিন্তামগ্ন? কি করিবে স্থির করিবার জন্য গঙ্গার ধারে আসিয়াছিল, এতক্ষণে মন ঠিক করিয়া বাড়ী ফিরিয়া চলিয়াছে?

বাড়ী পৌঁছিয়া রাণী ভদ্রতা করিয়া বলে 'বসবেন না?'

বিকাশ বলে 'বসব? না, আর বসব না।'

রাণী শ্রান্তকণ্ঠে বলে, 'আচ্ছা।'

বিকাশ কিন্তু যায় না, দাঁড়াইয়া থাকে। তার আপত্তি যেন শুধু বসিতে, দাঁড়াইয়া থাকিতে অনিচ্ছা নাই। খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে হঠাৎ বলে, 'আচ্ছা, একটু বসি, জল খেয়ে যাই এক গ্লাস।'

রাণী তার মনের ভাব অনুমান করিয়া একেবারে হতাশ হইয়া যায়। একটু মায়া হইতেছে বিকাশের। এতকাল যাকে জীবনসঙ্গিনী করার কথাটা মনে মনে নাড়াচাড়া করিয়া আসিয়াছে, আজ গোল গোল কুৎসিৎ চোখ দেখিয়া তাকে একেবারে ত্যাগ করিবার মতলব ঠিক করিয়া একটু খুঁত খুঁত করিতেছে মনটা, একটু অস্বস্তি বোধ হইতেছে। কিন্তু এরকম দয়া করা কেন? একটু বসিয়া এক গ্লাস জল খাইয়া পরে কষ্ট দেওয়ার বদলে এখন চলিয়া গেলেই পারে বিকাশ!

যন্ত্রের মত রাণী আগাইয়া যায়। বাহিরের ঘর অন্ধকার, সেইরকম জানালা দিয়া মৃদু একটু আলো আসিতেছে। 'অন্ধকারে বসতে হবে কিন্তু'—বলিতে বলিতে চিরদিনের অভ্যাসের বশে হাত বাড়াইয়া রাণী দেয়ালের গায়ে সুইচটা টিপিয়া দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘর আলো হইয়া যায়—ইতিমধ্যে নতুন বালব্ লাগানো হইয়া গিয়াছে।

বিকাশের কাছে আর তার আশা করার কিছু নাই, তার কাজলহীন চোখ এখন আর বিকাশকে দেখাইতে ভয় পাওয়ারও তার কোন কারণ নাই, তবু রাণী চমকাইয়া উঠিয়া বিস্ফারিত চোখে বিকাশের দিকে চাহিয়া থাকে। যদি বা কোন আশা ছিল, রাণীর অজ্ঞাত কোন কারণে আজ কিছু না বলিয়া বিকাশ যদি পরে বলিবার কথা ভাবিয়া রাখিয়া থাকে, এতক্ষণে সব আশা চুকিয়া গেল। সত্যই সে বড় বোকা।

রাণীর মনে হয়, বিকাশের সামনেই সে বুঝি কাঁদিয়া ফেলিবে।

তাড়াতাড়ি ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া জল আনিবার জন্য সে ভিতরে যাইতেছে, বিকাশ খপ করিয়া তার হাত ধরিয়া ফেলে।

'বোসো। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'জলটা আনি?' রাণীর মাথা ঘুরিতে থাকে। তাকেই কি কৈফিয়ৎ দিতে হইবে কেন আজ তার চোখ অন্যদিনের মত নয়, ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে চোখ কেন আজ তার এমন বিশ্রী দেখাইতেছে?

'জল পরে এলো। আগে আমার কথা শুনে নাও।'

কিছু বলিবার নাই, কিছু করিবারও নাই। কাঠের টেবিলটিতে দু'হাতের ভর দিয়া দাঁড়াইয়া

রাণী নীরবে বিকাশের কথার প্রতীক্ষা করে। কি নিষ্ঠুর বিকাশ! এই মানুষটাকে সে এতদিন এত কোমল, এত হৃদয়বান মনে করিয়াছিল!

বিকাশ বলে, 'ভেবেছিলাম আজ বলব না। তোমার শরীর ভাল নয়, আজ বলা উচিত হবে না। কিন্তু তোমার চোখ দেখে আর না বলে থাকতে পারছি না রাণী। তোমার চোখ দেখে' রোজ অবাক হয়ে যাই, কিন্তু আজ এমন আশ্চর্য্য রকম সুন্দর দেখাচ্ছে তোমার চোখ—'

রাণী কাতরভাবে বলিল, 'কেন ঠাট্টা করছেন?'

যাই হোক, রাণীর সমস্যা মিটিয়া গেল। পড়া ছাড়িয়া রাণী তার সংসারে গৃহিণী হইতে রাজী হইবে কিনা ভাবিয়া বিকাশের বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল। রাণী রাজী হওয়ায় সে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। তারপর এ রকম অবস্থায় নারী ও পুরুষ যে সব কথা বলাবলি করে অনেকক্ষণ সে সব কথা বলাবলির পর বিকাশ গেল বাড়ী।

আর রাণী ছুটিয়া গেল নিজের ঘরে। সিঁড়িতে পা দেওয়ামাত্র কাকীমা রান্নাঘর হইতে ডাক দিলেন তীব্র ধমকের সুরে, সে সাড়াও দিল না। ঘরে গিয়া আলো জ্বালিয়া মুখের সামনে ধরিল প্রসাধনের ছোট আয়নাটি। চোখের কোলে কালি পড়িয়াছে, চোখের পাতা ভারি হইয়া উঠিয়াছে। বেদনার্ত্ত স্নায়বিক প্রক্রিয়ায় চোখে যে কালি পড়ে, কাজলের চেয়ে তা তো কম সুন্দর করে না মানুষের চোখকে! কি রহস্যময় মনে হইতেছে তার চোখ দুটিকে!

নিজের চোখ দেখিয়া রাণী নিজেই যেন মোহিত হইয়া যায়!



সদা সত্য কথা কহিবে

প্র. না. বি.

স্থান :—কোনও রেডিও ষ্টেশনের ব্রডকাষ্টিং রুম।

সময় :—বেলা অনুমান আড়াইটা,—কিছু এদিক ওদিক হইতে পারে; রেডিও বন্ধ; মিষ্টার দাস, রেডিও অফিসার, ব্যস্ত ও বিরক্তভাবে পায়চারি করিতেছেন এবং বারংবার জানালা দিয়া বাহিরে উঁকি মারিয়া দেখিতেছেন; জানালা দিয়া বাড়ীর সদর দরজা—ও দরজার দুই দিকে পথের কিয়দংশ দেখা যায়; মিঃ দাস ব্যগ্রভাবে সদর দরজার দুইপাশে লক্ষ্য করিতেছেন; এক একবার দেয়ালের বড় ঘড়িটার দিকে তাকাইতেছেন—আবার ফিরিয়া জানালার কাছে যাইতেছেন।

তেওয়ারী নামে একজন হিন্দুস্থানী ভৃত্য ও রামচরণ নামে বাঙালী ভৃত্য ঘরের দরজার কাছে মিঃ দাসের হুকুমের অপেক্ষায় সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান; মিঃ দাসের ভাবগতিক দেখিয়া তাহারা কিঞ্চিৎ শঙ্কিত।

মিস্ বর্দ্ধন একজন রেডিও-শিল্পী; তিনি একপাশে একটি সোফার উপর বসিয়া আপন মনে তানপুরায় শব্দ করিতেছেন; তানপুরা বাজান বলা চলে না, অবসরবিনোদন ও যন্ত্রটা পরীক্ষার ভাব হইতে তানপুরার তারে আঘাত করিতেছেন মাত্র; এবং মাঝে মাঝে মিঃ দাসকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে কৌতুক অনুভব করিতেছেন। মিঃ দাস ভৃত্যদ্বয়ের সম্মুখে আসিয়া থামিলেন।

মিঃ দাস—তেওয়ারী, তোমারা বাঁশকো লাঠি হ্যায়?

তেওয়ারী—ক্যা হুজুর?

মিঃ দাস—সমঝা নেই। বাঁশকো লাঠি।

তেওয়ারী—বাঁশী? জিস্‌কো বংশী বোলতা? জরুর হ্যায় হুজুর।

"যমুনাকি তীরে নীরে বংশী বাজাওয়ে
মিঠি তান শুনাওএ"

সুর করিয়া এই দুই ছত্র গাহিল

মিঃ দাস—[রাগিয়া গিয়া] তোমারা শির্—

তেওয়ারী—শির তো নেহি হ্যায় হুজুর—

মিঃ দাস—[বিস্ময়ে] ওরে রামচরণ, ও বলে কি?

রামচরণ—ঠিকই বলেছে বাবু। আমাকেও একদিন ঐ কথা বলেছিল, শেষে অনেক জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে ওর বুদ্ধিশুদ্ধি নেই বলে দেশের লোক ওকে বাংলা দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে; বলেছে তোর যে রকম বুদ্ধি তাতে বাংলা দেশ ছাড়া আর কোথাও রুটী মিল্‌বে না।

তেওয়ারী—এ ঠিক বাত হ্যায় হুজুর—

মিঃ দাস—এ কি রকম হ'ল? আমি যখন হিন্দিতে বললাম—তুমি বুঝতে পারলে না,—আর বাংলা দিব্যি বুঝ্‌লে?

তেওয়ারী—হিন্দি! হিন্দি কোন্ বোলা থা?

মিঃ দাস—কেন আমি ?

তেওয়ারী—উস্‌কো কভি হিন্দি নেই কহা যাতা। হুজুর, কসুর মাপ কিজিয়ে—আপকো হিন্দিসে বাংলা বুলি হাম বহুৎ সমঝাতা।

মিঃ দাস—বাই জোভ! মিস্ বর্দ্ধন, কাগজ আছে ?

মিস্ বর্দ্ধন—কেন ?

মিঃ দাস—হিন্দুস্থানীরা হিন্দি বুঝতে পারে না—। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করবার পক্ষে এটা মস্ত আর্গুমেণ্ট।

মিস্ বর্দ্ধন—ও বলছিল, আপনার হিন্দি হিন্দিই নয়—

মিঃ দাস—[বিরক্ত হইয়া] নয় তো নয়। এই রামচরণ, তুই আর তেওয়ারী গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক, আমি যেই এই জানালার কাছে থেকে ইসারা করবো—অমনি বুঝলি ?

রামচরণ—আজ্ঞে বুঝেছি, কি করতে হবে ?

মিঃ দাস—যে আসবে তাকে জাপটে ধরবি—এই এমনি করে।

তেওয়ারী—এসা মাফিক্ ? লেকেন হুজুর, কই আওরৎ আয়েগা।

মিঃ দাস—যে আসুক। তারপরে তাকে টান্‌তে টান্‌তে এখানে নিয়ে আসবি। বুঝলি ?

রামচরণ—আজ্ঞে, হাঁ।

মিঃ দাস—যা তবে, এখন সদর-দরজার কাছে গিয়ে লুকিয়ে থাক। যাও তেওয়ারী—

তেওয়ারী—জো হুকুম।

উভয়ের প্রস্থান

মিস্ বর্দ্ধন—মিঃ দাস, কাকে ধরতে বললেন ? চোর-ছ্যাঁচড় নাকি ?

মিঃ দাস—চোর হ'লে তো ছিল ভাল—

মিস্ বর্দ্ধন—তবে কি ?

মিঃ দাস—রোজ রোজ—সদর-দরজার কাছে। আজ একবার দেখব—

মিস্ বর্দ্ধন—ব্যাপারটা কি ?

মিঃ দাস—আপনারা শিল্পী মানুষ, সব দেখেও দেখেন না। সদর দরজার কাছে প্রত্যেক দিন কে যেন আবর্জ্জনা ফেলে যায়—

মিস্ বর্দ্ধন—তাতে কি হ'য়েছে ?

মিঃ দাস—কি হ'য়েছে ? কি বলছেন মিস্ বর্দ্ধন! অন্যের বাড়ীর আবর্জ্জনা—আমাদের বাড়ীর সম্মুখে এনে ফেলে যাবে।

মিস্ বর্দ্ধন—অবাক করলেন মিঃ দাস! চিরদিন তো এই রীতিই চলছে। আমার বাড়ীর আবর্জ্জনা আপনার বাড়ীর সম্মুখে ফেলবো—; আপনার বাড়ীর আবর্জ্জনা পড়বে রামের বাড়ীর সম্মুখে; রামের বাড়ীর পড়বে—শ্যামের বাড়ীর সম্মুখে—এমনি করে আবর্জ্জনার ধারা সহরের অন্য প্রান্তে গিয়ে শেষে ধাপার মাঠে পেঁছিবে।

মিঃ দাস—কিন্তু কি অবিচার বলুন তো—

মিস্ বৰ্দ্ধন—অবিচার আপনি করছেন। বাঙালীর জীবনে আর কি সুখ আছে? পরের বাড়ীর সম্মুখে আবর্জ্জনা ফেলবার শেষ সুখটিও আপনি যদি হরণ করেন, তবে বাঙালী বাঁচবে কোন সুখে?

মিঃ দাস—বাঙালী! বাঙালী! [হঠাৎ ঘড়ির দিকে লক্ষ্য করিয়া] দাঁড়ান, সময় হ'য়েছে, আমি জানলার কাছে যাই।

মিস্ বৰ্দ্ধন—কি অসীম ধৈর্য্য আপনার, এই জন্যে সেই বেলা একটা থেকে এখানে বসে আছেন?

মিঃ দাস—চুপ করুন, সময় হয়েছে। ওই যে তেওয়ারী আর রামচরণ। বেশ—এইবার।

এমন সময়ে দেখা গেল—পাশের বাড়ীর ঝি অতি সন্তর্পণে সাবধানে এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে এক টিন আবর্জ্জনা—এঁটো পাতা প্রভৃতি লইয়া আসিয়া সদর দরজার পাশে ঢালিয়া দিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে; মিঃ দাস চীৎকার করিয়া উঠিলেন

মিঃ দাস—[উৎসাহে হিন্দি বাংলা ইংরাজি মিশাইয়া] তেওয়ারী, রামচরণ, পাকড়ো,—ভাগ যাতা। জোরসে পাকড়ো। বহুৎ কিয়া। বহুৎ আচ্ছা। একদম হিঁয়াপর লে আও! I shall see! The culprit.

তেওয়ারী—[বাহির হইতে] হুজুর, আওরৎ হ্যায়—

মিঃ দাস—হ্যায় তো হ্যায়—। আগাড়ি লে আও—

এমন সময়ে রামচরণ ও তেওয়ারী সেই ঝিকে টানিতে টানিতে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল

রামচরণ—এই যে বাবু ধ'রে নিয়ে এসেছি —

তেওয়ারী—হুজুর একঠো কুর্শি দেগা?

মিঃ দাস—কুর্শি। কিসকো দেগা?

তেওয়ারী—আওরৎ হ্যায়। উস্‌কো লিয়ে—

মিঃ দাস—চুপ থাকো—[ঝির প্রতি] বাপু, তোমাকে যদি থানায় দি!

ঝি—আমিও তাই চাই—

মিঃ দাস—তাই চাও? কেন?

ঝি—আপনিই বলুন, কেন থানায় দিতে চান?

মিঃ দাস—তোমার জেল হবে—

ঝি—আমি তো জেলে যেতেই চাই—

মিঃ দাস—জেলে যেতেই চাও? কেন?

ঝি—তা হলে আর চাকরি করতে হবে না—

মিঃ দাস—চাকরি না করলে রোজ রোজ বাড়ীর সম্মুখে আবর্জ্জনা ফেলবে কে?

ঝি—সে জন্য ঝিয়ের অভাব হবে না—

মিস্ বৰ্দ্ধন—দেখ বাছা, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে—তুমি লেখাপড়া শিখেছিলে?

ঝি—শিখেছিলাম বই কি!

মিস্ বর্দ্ধন—কতদূর ?

ঝি—কলেজে ঢুকে ছেড়ে দিয়েছিলাম।

মিস্ বর্দ্ধন—ছাড়লে কেন ?

ঝি—আজ্ঞে সহশিক্ষার দুঃসহ ধাক্কা সামলাতে পারবো না ভেবে।

মিঃ দাস—এতো পড়াশোনা আছে—আর এটুকু জানো না যে পরের বাড়ীর সম্মুখে আবর্জ্জনা ফেলতে নেই ?

ঝি—কেমন করে জানবো—ইস্কুলে এ সব কথা তো কেউ শেখায় নি।

মিঃ দাস—তবে কি শিখেছ ?

ঝি—যা চিরদিন দেখছি। পরের বাড়ীতে নিজের বাড়ীর উনুনের ধোঁয়া কৌশলে চালিয়ে দিতে হবে, পরের বাড়ীর সম্মুখে আবর্জ্জনা ফেলতে হবে—

মিঃ দাস—অসহ্য।

ঝি—আজ্ঞে—আপনারাও ফেলতে আরম্ভ করেন। বেশ সহ্য হবে।

মিঃ দাস—বাজে কথা। কোন্ বাড়ীর ঝি তুমি ?

ঝি—আজ্ঞে পাশের বাড়ীর—

মিঃ দাস—কার বাড়ী ?

ঝি—ডাক্তারবাবুর—

মিঃ দাস—ডাক্তারের বাড়ীর ঝি হ'য়ে তুমি এমন অস্বাস্থ্যকর কাজ কর ?

মিস্ বর্দ্ধন—ওকে মিছে ধমকাচ্ছেন—ওতো আর ডাক্তার নয়—

ঝি—কে বললে আমি ডাক্তার নই ? আমিই ডাক্তার।

ঘরশুদ্ধ সকলে অবাক

মিঃ দাস—কি বলছ ?

ঝি—বিশ্বাস না হয় এই দেখুন, এই শাড়ীর নীচে কোট পাণ্টলুন আছে।

সকলে (সমস্বরে)—কি আশ্চর্য্য !

ঝি—আশ্চর্য্যটা কি ? মা লক্ষ্মী, মিঃ দাস, এই দেখুন আমার শাড়ীখানা খুলে ফেলে দিলাম—এইবারে দেখুন আমি ডাক্তার কিনা ? এই দেখুন সুট, এই দেখুন স্টেথোস্কোপ, এতেও বিশ্বাস না হয় প্রেস্কৃপশান্ লিখে দিচ্ছি, ওষুধ খান, দু'দিনের মধ্যে কম্ম নিকেশ হয়ে যাবে।

তেওয়ারী—আওরৎ নেহি হ্যায়—। মুলুক তো মুলুক বাংলা মুলুক।

মিঃ দাস—এই রামচরণ, তোরা এবার যা। ওয়েল ডক্টর—

ডাক্তার—ডাক্তার সেন—

মিঃ দাস—ডাক্তার সেন—ব্যাপারটা কি হ'ল বুঝতে পারছি না, আপনি ডাক্তার, ঝি সেজে এই বাড়ীর সদর-দরজায় আবর্জ্জনা ফেলে যান কেন ?

ডাক্তার—ডিভিসন্ অব লেবার—

মিঃ দাস—কি রকম ?

ডাক্তার—আপনারা অসুখে ভুগবেন, আমি ওষুধ দেবো—

মিঃ দাস—তার জন্যে আবর্জ্জনা ফেলা কেন ?

ডাক্তার—নইলে অসুখ হবে কি করে ? ব্যাপারটা বুঝুন, যতদিন সুস্থ আছেন, আপনাদের ওষুধের দরকার নেই। আর ব্যাধি তো আমার সুবিধামত আপনাকে আক্রমণ করবে না, কাজেই আমাকে ব্যাধির ঘটকালি করতে হয়।

মিঃ দাস—সেইজন্য নিজে এসে আবর্জ্জনা ফেলে যাচ্ছেন ?

ডাক্তার—একেই তো ইংরেজিতে বলে নিজের field create করে নেওয়া। আমিই অসুখ বাধিয়ে দেবো, আবার আমিই সারাবো, মাঝ থেকে পয়সা আসবে আমার—

মিঃ দাস—আর যদি অসুখ না সারাতে পারেন।

ডাক্তার—তবে আপনি মরবেন, কিন্তু পয়সাটা দিয়েই মরবেন।

মিঃ দাস—কিন্তু ঝি সেজে এ কাজ কেন করেন ?

ডাক্তার—মা লক্ষ্মী যদি কিছু মনে না করেন তো বলি পরের বাড়ীর সম্মুখে আবর্জ্জনা ফেলার ব্যবসাটা মাতৃজাতির একচেটিয়া, সেইজন্য ঝিয়ের পোষাক নিতে হয়—

মিঃ দাস—তবু ভাল যে এই কাজ কেবল আপনি একাই করে থাকেন !

ডাক্তার—কে বললে আমি একা ?

মিঃ দাস—তবে ?

ডাক্তার—যে সব ঝি পরের বাড়ীর সম্মুখে বেলা তিনটার সময় আবর্জ্জনা ফেলে, তারা প্রত্যেকে আমার মত ছদ্মবেশী ডাক্তার—

মিঃ দাস—কি বলছেন ?

ডাক্তার—বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করে দেখবেন, কোন ডাক্তারকে বেলা তিনটার সময় ডিস্‌পেন্‌সারিতে পাবেন না। বাড়ীতে গেলে শুন্‌তে পাবেন ডাক্তারবাবু ঘুমোচ্ছেন। ঘুমোচ্ছেন না ছাই, তিনি তখন ঝিয়ের সাজ খুলছেন !

মিস্ বর্দ্ধন—তবে কি ডাক্তারদের কাজ ব্যাধি নিবারণ নয় ?

ডাক্তার—সেটা তো পরে ; আগে তাদের কাজ ব্যাধি প্রচার। প্রবৃত্তি থাক্‌লে তো তার নিবৃত্তি সম্ভব, কি বলেন ?

মিঃ দাস—নাঃ, দেশের আর কোন আশা নেই !

ডাক্তার—আর ডাক্তারদেরই বা কোন্ আশা আছে ? আমরা ছ'বছর ধরে টাকা পয়সা খরচ করে ডাক্তারি শিখেছি ; তারপর থেকে কোটপাণ্টলুন, ষ্টেথোস্কোপ, ছুরি, ওষুধ প্রভৃতির নখদন্ত ও বিষ নিয়ে ওৎ পেতে বসে আছি, রুগী নেই। এমন কিছু দিন চললে সব যে মরচে পড়ে নষ্ট হয়ে যাবে। সুপ্ত সিংহের মুখে তো শিকার প্রবেশ করে না, তাই একটু উদ্যম করে রোগ প্রচার করতে হয় ; রুগীর জন্য উন্মুখ হয়ে বসে আছি, দিনের পর দিন, রুগীর দেখা নাই ; এ বিরহ সহ্য করতে না পেরে এই দুঃসাহসিক অভিসার করতে বাধ্য হয়েছি।

মিঃ দাস—কি ভয়ানক কথা। কোন জাদুমন্ত্রে দেশ থেকে যদি রোগ নির্ম্মূল করে ফেলা যায়, তাতে আপনাদের আপত্তি হবে দেখছি—

ডাক্তার—নিশ্চয়ই হবে—একশবার হবে।

মিঃ দাস—নাঃ, দেশের আর আশা নেই দেখছি। বাঙালী, তোমার মৃত্যুবাণ তুমি নিজেই নির্ম্মাণ করছ। আসল কথা কি জানেন, বাঙালী এখনও সহরে বাস করবার যোগ্য হয় নি—মূলত সে একটা গ্রাম্য জাতি। তাই নিজের বাড়ীর আবর্জ্জনা পরের বাড়ীর দরজায়, উনুনের ধোঁয়া পরের বাড়ীর জানালায় সে অনায়াসে চালিয়ে দেয়; ট্রাম বাস যেন তার বৈঠকখানা, দশজনের অস্তিত্বকে উপেক্ষা করে উচ্চস্বরে পারিবারিক আলোচনা চালাতে সঙ্কোচ বোধ করে না। এ জাতের সহরে এসে বাস করা উচিত নয়, গ্রামে ফিরে যাওয়াই সঙ্গত।

[পুলিনবাবু ও গিরিজাবাবুর ছুটিতে ছুটিতে প্রবেশ, এরা দুইজনও রেডিও অফিসের লোক]

পুলিনবাবু ও গিরিজাবাবু—কি সর্ব্বনাশ!

মিঃ দাস—কি হ'য়েছে পুলিনবাবু, কি ব্যাপার গিরিজাবাবু, ছুটতে ছুটতে আসছেন যে, হাঁপাচ্ছেন কেন? কোন বিপদ ঘ'টেছে নাকি?

পুলিনবাবু—কি সর্ব্বনাশ!

মিঃ দাস—সর্ব্বনাশটা কি?

পুলিনবাবু—এ আরম্ভ করেছেন কি? আপনি এ সব কি ব্রডকাষ্ট করছেন?

মিঃ দাস—ব্রডকাষ্ট কি করলাম?

গিরিজাবাবু—পুলিনবাবু, যা ভেবেছি। মাইক্রোফোন 'অন' করা রয়েছে।

গিরিজাবাবু, পুলিনবাবু ও মিঃ দাস—কি সর্ব্বনাশ!

মিঃ দাস—বন্ধ করো, বন্ধ করো। পুলিনবাবু বন্ধ করুন।

সকলে দৌড়াইয়া গিয়া মাইক্রোফোন 'অফ' করিয়া দিল

পুলিনবাবু—এই যে বন্ধ করে দিলাম—

মিঃ দাস—যাক, বিপদ কেটে গেল।

পুলিনবাবু—বিপদ কাটে নি মিঃ দাস। বিপদ জনতার আকার ধ'রে ছুটে আসছে।

মিঃ দাস—সে আবার কি?

পুলিনবাবু—বলুন না গিরিজাবাবু, ব্যাপার কি? আমি আর পারছি না—

গিরিজাবাবু—শুনুন তবে মিঃ দাস—আমরা দুজনে ট্রামে করে শ্যামবাজার থেকে এখানে আসছিলাম। হঠাৎ রেডিওর শব্দ কানে গেল। ভাবলাম এ কি? এখন তো কোন প্রোগ্রাম নেই। রেডিও চলে কেন? কান পেতে রইলাম। কি সর্ব্বনাশ! বুঝলুম আপনার কণ্ঠস্বর। আর, নাঃ, আর পারছি না, এবার আপনি বলুন পুলিনবাবু—

পুলিনবাবু—আর কি বলবো? শুনলাম আপনি বাঙালীকে অনর্গল অপমান করে যাচ্ছেন।

মিঃ দাস—অপমান করলাম কোথায়?

পুলিনবাবু—অপমান ছাড়া আর কি? পরের বাড়ীর সম্মুখে আবর্জ্জনা ফেলার বিরুদ্ধে, পরের বাড়ীতে উনুনের ধোঁয়া চালিয়ে দেবার বিরুদ্ধে বলছেন—একে অপমান ছাড়া আর কি বলে?

মিঃ দাস—ভালই হ'য়েছে। যে কথা আমি শুধু একজনকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলাম, তা সমস্ত সহরের লোক শুনেছে।

পুলিনবাবু—মিঃ দাস, আপনার মাথা কি খারাপ হয়েছিল? এসব কথা বলা উচিত, কারণ এসব কথা ভাল, কিন্তু আপনি মাইক্রোফোন 'অন' করে দিয়ে এসব কথা বলতে গেলেন কেন?

মিঃ দাস—মাইক্রোফোন তো বন্ধই ছিল হঠাৎ তা 'অন' করে দিল কে?

ডাক্তার—মাইক্রোফোন 'অন' করে দিয়েছি আমি, আমি ডাক্তার—

মিঃ দাস—কেন 'অন' করতে গেলেন?

ডাক্তার—যে কথা আপনি আমাকে ঘরে ধরে এনে শোনাচ্ছিলেন, কৌশলে আমি তা সহরের লোকের কানে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছি। তারাই বিচার করবে, আমাদের মধ্যে কে অন্যায় করেছে? আমি আবর্জ্জনা ফেলে, না আপনি আবর্জ্জনার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে—

মিঃ দাস—এ বিষয়ে কি দ্বিমত হতে পারে?

পুলিনবাবু—না, দ্বিমত হবার কোন আশঙ্কা নেই। টালা থেকে টালিগঞ্জ অবধি সব লোক ছুটে এলো বলে।

মিঃ দাস—কেন?

ডাক্তার—কেন? আপনি তাদের অপমান করেছেন, তাদের জন্মগত অধিকারের বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য্য করছেন, আর তারা চুপ করে থাকবে? বাঙালীর আত্মসম্মানজ্ঞান সুবিধা বুঝে জেগে ওঠে।

পুলিনবাবু—মিঃ দাস, ওই শুনুন ক্রুদ্ধ জনতার গর্জ্জন।

মিঃ দাস—ও পুলিনবাবু, কি হবে?

ডাক্তার—হবে আবার কি? আপনাকে ক্রুদ্ধ জনতা এখনি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে।

মিঃ দাস—ডাক্তারবাবু, সে কাজের জন্য তো আপনি একাই যথেষ্ট। জনতার কি দরকার? আচ্ছা পুলিনবাবু, জনতাকে স্মরণ করিয়ে দিলে হয় না যে তারা অহিংসা-মন্ত্র গ্রহণ করেছে—

পুলিনবাবু—মিঃ দাস, বাঙালী বিদেশীর বেলাতে অহিংস, স্বদেশীর বেলাতে নয়।

মিঃ দাস—তবে?

পুলিনবাবু—আচ্ছা, আমি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি। আপনারা সকলে চুপ করুন।

মিঃ দাস—পুলিনবাবু, ওই শুনুন জনতার গর্জ্জন ক্রমে নিকটবর্ত্তী হচ্ছে।

পুলিনবাবু—আঃ চুপ করুন।

মিঃ দাস—ওকি পুলিনবাবু, আপনি আবার মাইক্রোফোন 'অন' করে দিচ্ছেন কেন?

পুলিনবাবু—[চাপা গলায়] আঃ চুপ করুন। আমি এখন কিছু ব্রডকাষ্ট করবো।

[তারপরে তিনি গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বক্তৃতার সুরে আরম্ভ করিলেন]

হে ভারতের বৃহত্তম নগরের মহত্তম অধিবাসীবৃন্দ! আপনাদের কাছে আমরা মার্জ্জনা

ভিক্ষা করিতেছি। আমাদের অনবধানতাবশতঃ একটা উন্মাদ লোক আফিসে আসিয়া যা খুসী তাই বলিয়া বাঙালীজাতিকে অপমান করিয়া গিয়াছে; তাহাকে আমরা ধরিয়া স্বস্থানে প্রেরণ করিলাম। সে যাহা বলিয়াছিল, আশা করি তাহা আপনারা সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই; আর কাণে প্রবেশ করিয়াছিল সত্য, এতক্ষণে নিশ্চয়ই তাহা অপর কাণ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে; দেখুন দুইটি কাণ থাকিবার কত সুবিধা। কিন্তু এত বড় একটা জাতির মধ্যে দুই চারি জন এক কাণ কাটা লোক থাকিলেও থাকিতে পারে; এসব কথা হয়তো তাহাদের মস্তিষ্ক হইতে প্রস্থানের পথ পায় নাই বলিয়া মাথার মধ্যে থাকিয়া গিয়াছে। তাহাদের সুবিধার জন্য আমরা প্রচার করিতেছি।

—হে মহান জাতি, তোমরা নিজের বাড়ীর আবর্জ্জনা সর্ব্বদাই পরের বাড়ীর দরজায় ফেলিবে; তোমরা নিজের উনুনের ধোঁয়া পরের বাড়ীতে চালনা করিয়া দিবে; ট্রাম ও বাসকে নিজের বৈঠকখানা মনে করিয়া তারস্বরে পারিবারিক আলোচনা চালাইবে; পাশের আসনে উপবিষ্ট নিরীহ যাত্রীর নাকে তোমার বিড়ির ধোঁয়া প্রবিষ্ট করাইয়া দিবে; রেলের টিকিট করিবার সময় দৈব-প্রেরণায় গুঁতাগুঁতি করিয়া হাত পা ভাঙিবে আর সিনেমার টিকিট করিবার সময় জনতার চাপে প্রাণদান করিয়া সিনেমা-শহিদ সাজিবে। নিতান্ত নিন্দুকেরাই বলে বাঙালী নাগরিক হইয়া উঠিয়া গ্রামকে ভুলিয়া গিয়াছে; বাঙালী এখনো মনে মনে গ্রাম্য, ইহাই বাঙালীর 'ব্যাক টু ভিলেজ'।

মিঃ দাস—একি পুলিনবাবু, মাইক্রোফোন 'অফ্' করে দিলেন যে?

পুলিনবাবু—আমার কাজ শেষ হয়ে গেল।

মিঃ দাস—এ যে ভয়ানক গালাগালি দিলেন।

পুলিনবাবু—কোথায় গালাগালি। ওই শুনুন, জনতা কেমন আনন্দধ্বনি করছে। খুসী না হলে তারা কি আনন্দধ্বনি প্রকাশ করতো।

মিঃ দাস—সব উলটপালট হয়ে গেল। ডাক্তারবাবু, আপনারই জিত হল, এবার থেকে নিয়মিত ভাবে আবর্জ্জনা ফেলবেন। প্রতিবাদ করবার সাহস আর নেই।

পুলিনবাবু—যাক মিঃ দাস, এবারের মত ফাঁড়া আপনার কেটে গেল।

মিঃ দাস—তা গেল বটে। আমি আজই এ চাকরিতে ইস্তাফা দেবো—

পুলিনবাবু—বেশ।

মিঃ দাস—শুধু তাই নয়, কলকাতা ছাড়বো—

পুলিনবাবু—বেশ।

মিঃ দাস—এবং ডাক্তার দিয়ে নিজেকে একবার পরীক্ষা করাবো—

পুলিনবাবু—সেই সঙ্গে মাথাটাও পরীক্ষা করাবেন।

ডাক্তার—আমার সার্টিফিকেট চলবে কিনা জানি না, কিন্তু নিশ্চিত বলতে পারি—

মিঃ দাস—আমি পাগল—

ডাক্তার—না আপনিই একমাত্র প্রকৃতিস্থ। আর আমরা সমস্ত জাতটা পাগল।

পুলিনবাবু—বেশ।

ডাক্তার—কিন্তু মিঃ দাস, লোকে আপনাকেই পাগল বলবে কারণ আপনি hopeless minorityতে—

পুলিনবাবু—মিঃ দাস, আপনি পাগল কিনা জানি না, কিন্তু এটা নিশ্চয় জানি আপনি নির্বোধ—

মিঃ দাস—বোধ হয় দুটোই—

মিঃ দাস ছাড়া সকলে—ওদুটো প্রায় লোকে প্রায় একসঙ্গেই হয়ে থাকে।

যবনিকা

রাত্রি

শ্রীপরেশনাথ সান্যাল

বহু রাত্রি একা একা ছাদে শুয়ে থাকি
আকাশের কোল ঘেঁসে—
উড়ে যায় রাত্রিচর পাখী।
তাদের পক্ষের ধ্বনি
ক্লান্তবুকে আনে চঞ্চলতা,
অধীর আগ্রহ নিয়ে কান পেতে শুনি
ধমনীর অন্তরালে শোণিতের কথা।

রাত্রি ধীরে গাঢ় হয়
ঘন হয় কাল অন্ধকার ;
তিমিরের বক্ষমূলে বর্শা হানে
দীর্ঘাকৃতি দীপ্তি তারকার।
রজনীর কান্না শুনে আমি পাই ভয়
অন্ধকার আরো গাঢ় হয়।

আকাশ উপরে নীল
ঘন নীল,—সীমানা প্রচুর
আমার মুখের 'পরে ঝুঁকে চেয়ে থাকে,
অন্ধকারে ব্যবধান হয়ে যায় দূর।

রাত্রি আর আমি জেগে থাকি
ভূমিতলে পৃথিবী ঘুমায়
দিবসের অনুভূতি—সহসা বিরাগী
বক্ষতলে ক্ষয় হ'য়ে যায়।
পৃথিবীর পাশে শুয়ে মানুষো ঘুমায়
রাত্রি আর আমি জেগে থাকি।

মানুষো ঘুমায় বুঝি ?
ঘুমের চাদরে ঢাকা মানুষেরে
শব মনে হয়।
রজনীর অন্ধকারে দিবসের পুঁজি
প্রাত্যহিক অবসাদে হ'য়ে যায় ক্ষয়।
আলোর শিশুরা রাতে পথ মরে খুঁজি—
আমি পাই ভয়
আমার মুখের 'পরে
অন্ধকার আরো গাঢ় হয়।
দিনের প্রার্থনা নিয়ে আমি জেগে থাকি
অন্ধকারে আমি পাই ভয়।

শরৎ-পরিচয়

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

রাজেন্দ্রনাথের আরও একটি বীরত্বের পরিচয় দি :

মাঘ মাসে ভাগলপুরে দারুণ শীত হয়। সেই দুর্বিষহ শীতের রাত্রে বাংলা ইস্কুলের পণ্ডিত মশাইয়ের স্ত্রীবিয়োগ ঘটল। তিনি নিজে অসুস্থ, এবং কোলের ছেলেটি নিতান্ত শিশু। সে ক্ষেত্রে মৃত-সৎকারে তাঁর যোগ দেওয়া সম্ভবপর নয়। তাতেও বড় কিছু আসে যায় না।

ব্রজেন্দ্রনাথ পীড়িতজনের ছিলেন অভিভাবক। খবর দিলে কি না দিলে, তিনি সে বাড়িতে হামেহাল হাজির। আবার রুগী না বাঁচলে নাকি কর্ত্তব্যের তিনিই ছিলেন একেবারে অধ্যক্ষ। তাঁর কর্তৃত্বে বাঙালীর মড়া বাসি হওয়ার চেয়ে বড় অপমান কি আছে? সূর্য্যদেব গাফিলি ক'রে হয়তো একদিন পশ্চিমে উঠতে পারেন ; কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বেঁচে থাকৃতে এ অসম্ভবেরও অসম্ভব। কিন্তু এ সংসারে এতোবড় নিষ্ঠাও সকলের থাকে না। ব্রজেন্দ্রনাথ অধিকন্তু হিসেবে একটি ইস্কুলের হেড মাস্টার—অতএব ছাত্র সম্প্রদায় তাঁর মুঠোর মধ্যে। এমন শীতের রাতে পত্নীদের সন্তানসম্ভাবনার কাহিনী অমূলক হ'লেও নেহাৎ অকেজো হয় না ; অন্তত স্বামী বেচারিদের শবদাহের আশু দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় হয়। পুন্নাম নরক থেকে মুক্তি? সে তো পরলোকের কথা। বর্ত্তমানে বাঁচলে, তবে তো সে দিনের কথা।

রাজুর দল কোমর বেঁধে অগ্রসর হল। তাদের মাঘেও ভয় নেই, মেঘেও ডর নেই ; একে অমানিশা, তায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। যেতে হবে মণ্টের ঘাটে—ক্রোশ দুই এর ধাক্কা—অতএব ব্রজেন্দ্রনাথ আর সবুর সইতে পারলেন না। চারজন হ'তেই নৈশ আকাশে প্রকম্পিত হ'য়ে উঠলো : বলো হরি,—হরি বোলের নিদারুণ ধ্বনি।

হাস্য-রসিক বিধাতা এতেও তৃপ্ত হ'লেন না। গোদের উপর বিষ-ফোড়া। টিপি টিপি বৃষ্টিও সুরু হ'লো।

সেকালে হারিক্যান্ লণ্ঠন প্রবর্ত্তিত হয়নি। যেহেতু, বালক হিঙ্কস্ তখন সবেমাত্র ইস্কুলে ভর্ত্তি হ'য়েছে, আর ডিজ বাবাজির জন্মই হয়নি। কিন্তু মানুষের—যাকে বলে, উদ্ভাবনী শক্তি তা' চিরকালই অপরাজেয়। একটি হাঁড়ির মধ্যে ভেরাণ্ডার তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে একটা চাকরের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে অভিযান সুরু হ'য়ে গেল। ব্রজেন্দ্রনাথ চলেছেন অশ্বগতিতে। পিছন থেকে বামাচরণমামা ডাকেন :

ওহে, শুনছো,—আস্তে আস্তে। ছেলেদের পা মচকে যাবে যে,—সব্বার তো তোমার মত ঠ্যাং লম্বা নয়, বোজেন্দর।

গেলে—আপনি তো আছেন। ছেলেদের মধ্যে থেকে কে একজন বললে।

বাপ সকল আমি আর বহনে পটু নই। তোমাদের সঙ্গদানই বর্ত্তমানে আগমনের উদ্দেশ্য।

ব্রজেন্দ্র বললেন : বৃষ্টি গুঁড়ি গুঁড়ি হচ্ছে, ঝমাঝম হ'তে আর দেরি কি?

অবিলম্বে আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হ'ল। পা অসাড় হ'য়ে গেছে। জলে ভিজে স-শয্যা মড়া ফুলে ঢোল! ছেলেদের কচি কাঁধ বাঁশের ঘসড়ানিতে নোম্‌চা প'ড়ে জ্বালা ক'রতে লেগেছে।

মাস্টার মশাই, একটু রাখলে হয় না!

তবে রাখ এই তেঁতুল-তলায়।

গাছটা যেন একটা বনস্পতি। বামাচরণমামা ব'সে বললেন, কিন্তু জায়গাটা আমার পছন্দসই নয়।

কেন, ঠাকুরদা?

এৎবারি বেটা এখেনেই থাকে কিনা?

কে এৎবারি? ডাকাত?

দূৎ, সে তো তিলকা মাঝি!

তবে?

বামাচরণ বললেন, সে একটা মস্ত ইতিহাস; বলি শোন্ঃ—আমাদের ঐ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের মেমকে দেখেছিস্?—নীল গাউন পরা?—

ধোপানী?

ধোপানী হলে কি হয়, মানুষটা ভালো। ও সায়েবের ছোঁয়া খায় না। বাবুর্চির রাঁধা ছুঁয়ে গঙ্গাস্নান করে আসে।

ব্রজেন্দ্র বললেন,—এতও তুমি জান মামা!

ঠেকলেই জানতে হয়, বাবাজীবন!

তারপর ঠাকুরদা?

ঐ যে দেখছো—ঐ ছোট্ট কুঁড়ে, সায়েবের ফটকের লাগাও; ঐতে থাকতো এৎবারি ধোপা। হঠাৎ এৎবারি মারা গেল। তারপর ধোপানীর উন্নতি হল; সে নীল গাউন পরলে। কিন্তু তার বেশী আর সে কিছুতেই এগোতে চায় না। সায়েব অনেক বোঝালে, কিন্তু ধোপানীর সেই এক কথাঃ সায়েব, তোমায় সব দিতে পারি, কিন্তু জাত দেব কেমন ক'রে?

কেন? সায়েব জিজ্ঞেস করে।

জাত তো আমার নয়, জাত যে বাপ-দাদার।

এই অকাট্য যুক্তির পর আর তর্ক চলে না। তবুও লোকে ছাড়ে না, বলেঃ তুই সায়েবকে সাদি করিস নি?

সাদি নয় তো, নিকা করেছি। নৈলে বেটাবেটি হল কি ক'রে? ধোপানি দৈহিক সংস্কারে নীল গাউন পর্য্যন্ত এগিয়েছিলঃ কিন্তু মানসিক সংস্কারে যে তিমিরে সেই তিমিরেই র'য়ে গেল। অতএব তার এৎবারি ম'রে ভূত ছাড়া আর কি হ'তে পারে?

ধোপানীর মন দিয়ে মেমসায়েব সেই ভূতকে মোটেই পরিত্যজ্য মনে করেনি। সে দিনে-রাতে এই তেঁতুল-তলায় এৎবারির সঙ্গে কথা ক'য়ে নিজেকে অপাপ-বিদ্ধ রেখেছিল। এৎবারিও এমন মেয়েকে ছেড়ে যায়নি; সে এই গাছেই বিরাজ করে—অবশ্য কুলীন ভূত নয় ব'লে কথা কইতে

পারে না ; কিন্তু গাছের ডাল নাড়িয়ে ধোপানীর সমস্যার সমাধান ক'রে দেয়। অতএব—তাই ব'লছিলাম বোজেন্দর,—এই গাছটার ওপর লোকে একটু ভয়চকিত কটাক্ষ ফেলে, একটু তফাৎ রেখেই আনা-গোনা ক'রে থাকে।

এই কথা কটি বলে মামা সেঁতান টিকে ধরাবার জন্যে গাল ফুলিয়ে ক'লকেয় ফুঁ পাড়তে লাগলেন।

তার পর ঠাকুরদা ?

হুঁ, তাই ব'লছিলাম,—আজ তিথিটাও সুবিধের নয়—আর এই জায়গাটা গিয়ে কি বলে, আমার মনঃপূত নয়।

ব্রজেন্দ্রনাথ ভূতে অবিশ্বাস ক'রতেন না ; কিন্তু ঠিক এই সময়ে তা' স্বীকার করা উচিত হবে না মনে ক'রেই বোধ হয় ব'ললেন, ও সব কিছু না ; আচ্ছা দেখাই যাক্ না—সত্যি মিথ্যে—আমরা তো আর একা নই !

কি দেখবে ? দেখা আমার ভালো ক'রেই আছে।

কি রকম সে ! কে একজন পেছন থেকে প্রশ্ন ক'রে ব'সলো। তাকে চাপা দিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ ব'ললেন,—থাক্ মামা ! থাক্ ও-সব এখন, ছেলেরা ভয় খেয়ে যাবে।

কিন্তু মানুষের স্বভাব ভালো নয়। ভয় পায়, তবুও সে আবার ভয়ঙ্করকেও চায় ; বিশেষ ক'রে ঐ অর্ব্বাচীনের দল ! তারা সমস্বরে ব'ললে ; না ঠাকুরদা, বলুন। আপনাকে ব'লতেই হবে।

দেখছো হে ব্রোজেন, এদের আবদারটা !

বলুন তবে ; সময়টা তো কাটবে।

থেলো হুঁকোটায় বার কতক কলকে-ফাটান টান মেরে, খুব কতকগুলো কেশে নিয়ে বামাচরণ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গল্প শুরু ক'রে দিলেন।—

তুমি বোধ হয় দেখে থাক্‌বে ব্রোজেন, আমার পিসে রঙ্গলাল মুখুয্যে মশাইকে ? তিনি এই ঠকুারদের এষ্টেটের ওভারসিয়ার ছিলেন।

দেখেছি মনে হয়। উদুরিতে মারা গেলেন তো ? তাঁকেও ঐ মণ্টের ঘাটের পূবে পুড়িয়েছি। ব'লে ব্রজেন্দ্রনাথ বেশ একটু শ্লাঘা অনুভব ক'রলেন।

এমন ভালো মানুষ কালে ভদ্রে দেখা যায়। পুকুরের পাঁক যেন ! আর আমার পিসিমাটি ! বাপ্ ! যেন পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ—

ধূমটা কি—মামা ?

বচন হে, ক্ষুরধার ! রাগে দুর্বাসা মুনিটি ! নিত্য উদ্দীপনাময়ী, রণচণ্ডিকা !

বামাচরণ আফিং সেবা ক'রতেন এবং তার সহকারী ছিল তাম্রকূট। নিত্য-উৎসারিত ধূম-কুণ্ডলীতে অতিপুষ্ট গোঁফ জোড়া, চোখের উপর ঝুলে পড়া ভ্রূযুগল আর চুলগুলি পেকে তাম্রবর্ণ ধারণ ক'রেছিল। কথার বাঁধুনি ছিল ; কিন্তু তা চিবিয়ে চিবিয়ে। যেন মন ব'সে রোমন্থন ক'রছে। কথার গতি মন্দাক্রান্তা।

বামাচরণ ব'ললেন, আমি থাকি কোথায় সেই বাঙালীটোলায় আর তিনি এই বারারিতে।

পিসিমার হুকুম হ'ল, বোশেখী পূর্ণিমার সত্য-নারাণের সিন্নি খেয়ে যেতে হবে তাঁর বাড়ীতে। "না" বললে রক্ষে আছে! এলুম সকাল সকাল। আশা যে, শীগ্‌গির শীগ্‌গির ফেরা যাবে। কিন্তু পিসিমার রোগটাও জানা ছিল। লক্ষ্মীপুজোর বরাতে শেষ পর্য্যন্ত ফেঁদে ব'সবেন মহামায়ার সাড়ম্বর পুজো!—আঁবই ক'রেছেন সাতাশ রকমের—মায় সেই জরদালু থেকে আরম্ভ ক'রে, বোম্বাই, ল্যাংড়া,—তো ভরত-ভোগ, কিষণ ভোগ, ফজ্‌লি, গঙ্গাসাগর—শেষ গিয়ে ঠেকেচে পাতুকায়—

পাতুকাটা কি দাদামশাই?

সেই যে কালো কালো ছোট ছোট আমগুলো,—

আর কাগ্ দেশান্তরি?

তার অম্বল হ'য়েছিল।

তার পর?

ক্ষীরের সঙ্গে,—যে-সে ক্ষীর নয় গো! ভঁয়সার ক্ষীর। তার সঙ্গে—বোম্বাই—বুঝেছ, বোজেন্দর—সে একেবারে, ব্লড্—ব্লড্।

মানে?

গায়ে রক্ত গজিয়ে উঠবে।···শেষ ক'রতে পক্কা আড়াই ঘণ্টা কাবার হ'য়ে গেল। ঠিক সাড়ে বারোটার সময় একটা কেঁদো লাঠি হাতে ক'রে—অগস্ত-যাত্রা শুরু হ'ল।

পুলিস সায়েবের বাংলো পেরিয়ে এই তেঁতুলগাছের মন্‌ডালটায় নজর প'ড়লো—নির্ম্মেঘ আকাশ, ফুট্‌ফুটে জোচ্ছনা। কোথাও কিচ্ছু নেই; কিন্তু হঠাৎ ছাঁৎ ক'রে মনটা কেমন খারাপ হ'য়ে গেল! দূরে সায়েবের কুকুরগুলো ঝাঁউ, ঝাঁউ ক'রে ডাকচে! পেঁচার ডাক্! আকাশে মারওয়াড়ির দোকানে কাপড়-ফাঁড়ার আওয়াজ! গায়ে কাঁটা দেবেই! কিন্তু বামাচরণ ভয় পাবার বান্দা নয়। বামাচরণ ভীতুও নয়, আবার হোঁৎকাও নয়! অবিশ্যি, লাঠিটা বাগিয়ে ধরলুম,—হাত থেকে না ফ'স্‌কে খ'সে যায়!

চ'লচি আর ব'লচি, হে বাবা রজকনন্দন! তুমি যে ঐ তেঁতুলগাছে আছ তা আজকালকার ইংরিজি পড়া আহাম্মকেরা অস্বীকার করতে পারে; কিন্তু আমার সব দোষ থাকতে পারে, নেশাটা আস্‌টা—তা অস্বীকার করলে যে আমার কালাচাঁদের উপর অসম্মান দেখানো হয়; কিন্তু মন্দ লোকে কি না বলে—জানে কি তারা যে বামাচরণ কি বিপদে প'ড়ে ওকে ভোজেছে?

কি রকম মামা?

যৌবনে ডিঙি কাৎ হয় আর কি গ্রিহিণী রোগে!

গ্রিহিণী নয় মামা, গ্রহণী!

তা হবে বাবা,—একটা ই কার বাদ দিলে—যে ভুগেছে সে জানে,—ও ব্যাধির কিছুমাত্র ইতর-বিশেষ হয় না!

তার পর?

তখন আমাদের নিত্যানন্দ কবরেজ তাঁর ছাগলাগু দাড়ি নেড়ে' হিঁকো হিঁকো ক'রে হেসে বললেন: ইসে বাবা, বামাচরণ কালাচাঁদ না ভোজলে এ যাত্রায় রক্ষা পাওয়ার আর তো কোন উপায়

দেখিনে! তারপর সেই প্রাণ-মাতান হিঁকো হিঁকো হাসি আর থামে না। গায়ে জোর থাকলে উঠে ব'সে যা থাকে কপালে ব'লে ঠাস ক'রে গালে একটা চড় বসিয়েই দিতুম হয় তো বা,—কিন্তু ভগবানের দয়া অসীম ঐ কবরেজের উপর,—উঠবো কি বিছানায় প'ড়ে চিঁ চিঁ ক'রছি!

সেই আমার কালাচাঁদ! ওকে নেশা বললে—বুজেছ কিনা ব্রোজেন্দর, শিবকেও গেঁজেল বলতে হয়!

কে একজন অন্ধকার থেকে বললে: শিব কি তা নন্?

বাপরে! তাঁর নিন্দে! গঞ্জিকা বলে ইতর লোকে—ও হ'ল ত্বরিতানন্দ! যত্তো পারে কুঁচকি কণ্ঠা ঠেসে খাও—আর মারো একটি দম! পেটের মধ্যে সব সর্‌পট্! ভুঁইকম্পেও অমন সমভূমি হয় না পাহাড় পব্বত!

তারপর, আপনার রজকনন্দন কি বললে?

কিচ্ছু না। সাধ্যি কি কথা কয় চক্কোত্তি বামুনের সামনে এসে? ন খেই সুতো কি বৃথায় ঝোলে বামুনের গলায়? চোলছি আর বোলছি, লোকে বলে এৎবারি তুই আছিস, ঐ তেঁতুল গাছের মগাটায়; কিন্তু প্রত্যয় হয় না, একটা কিছু তোর কারসাজি না দেখলে! বলি, পারিস দেখাতে?

একশো হাত দূর থেকে বুড়ো আঙ্গুলে পৈতে জড়িয়ে জপছি ব্রহ্ম-মন্তর গায়ত্রী। উঃ কি তেজ মন্তরের—গা চপ্ চপ ঘামে—যেন সুরধুনী বইছে গায়! আর বুকের মধ্যে—যেন বালাপোষের তুলো ধুনচে আমাদের গোমদা মিঞা! ব্রহ্মতেজ কি অসাধারণ মাইরি! থামিনি! চলেছি গুড়ি গুড়ি! জিভ জড়িয়ে আসে—ওঁ বলতে বেরোয় বোং!

অন্ধকারে হাসির খুক্ খুক্ শব্দ শুনে বামাচরণ বললেন: হাসছো এখন: পড়তে যদি সে পাল্লায় বাছাধনরা—সাতদিন দাঁত কপাটি লেগে থাকতো—এই গাছতলায়। রোজা ডেকে হলুদ পুড়িয়ে জ্ঞান করাতে হোতো, তা তোমায় আমি বলে দিচ্ছি, বোজেন্দর!

তারপর, তারপর দাদা?

গাছতলায় এসেছি কি না এসেছি। সমস্ত গাছটাই উঠলো হুড়মুড়িয়ে দুলে! আর মগডাল থেকে পড়লো একখানি ঝাড়া দশ ইঞ্চি চৌপল থান ইট—পড়ে শব্দ হল ঠং—আনকোরা মিন্টের টাকার মতো! ঠিক সামনে! বেঁচে গেল পৈত্রিক মাথাটি আমার। মাথাটা যে একটু ঘোরেনি, আর চোখে সরষে ফুল দেখিনি বললে সত্যের উপক্ষয় হবে। কিন্তু বামাচরণের ভুল হয়নি, অবস্থা দেখে ব্যবস্থা! গায়ত্রি ছেড়ে—সোজা ধরেছি রামনাম!

বললুম, কেয়াবাৎ এৎবারি হাতের তারিফ তোর! সামনে ইটখানা পড়ে আছে টাটকা… যাকে বলে গরমাগরম, একটা কোণার এতটুকু বালি পর্য্যন্ত খসেনি!…ভৌতিক, একদম ভৌতিক! আমরা তোমরা ফেললে, ইটখানা চৌ-চাক্‌লা হয়ে ভাঙতো, না বাবাজীবন?

নিশ্চয়!

তারপর দাদা?

ধোপানি তখনো ফেরেনি কুঠিতে। দৌড়ে এসে বললে: কেয়া হুয়া বাবুজি?

কুছ নেহি, মেম জি···এক লোটা পানি মাংগাও !

সবুর সয়না···ছুটলাম সোজা বাবলা বনের মধ্যে দিয়ে।

বাড়ী ফেরার পথে দেখি তখনও দফাদার ডাক্তার পড়ছে তার সেই মোটা মোটা বইগুলো !

বললুম···একটা পেট কামড়ানির ওষুধ দাও! সে দিলে কি না জেলস্···বল্লুম, ডাক্তার, একাজ্বরির ওষুধ দিচ্ছ কেন? সে আমার বিদ্যে দেখে হাসে! জানে কিনা বামাচরণ গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ।

তা হলে আপনি ভূত মানেন?

নিশ্চয়! আমি ভেবে দেখেছি যে ভূত অস্বীকার করলে ভগবান অস্বীকার করতে হয়। তবে এলো কোত্থেকে এই বামাচরণ চক্কোত্তী, শুনি!

বৃষ্টির সঙ্গে শিল পড়তে আরম্ভ হল।

ব্রজেন্দ্র বললেন, কাছাকাছি আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু মড়া ফেলে তো আর যাওয়া যায় না।

রাজেন্দ্র বললে, আপনারা যান···আমি তো আছি।

কে রে তুই? সাবাস্!

ও রাজু···

তা ছাড়া আর কে হবে? বলে বামাচরণ বললেন, চলো, চলো···আমাদের নিমোনিয়া হবে ব্রোজেন্দর···আমরা ছাঁ-পোষা মানুষ!···ওদের কি? টাঁস্‌লে ত একাই টাঁসবে। কিছু স-পুরী এক-গাড়ে যাবে না!

তাই তো! ভাবছি।

আরে! মাথা দিয়ে ভাববে তো! যদি শিলে মাথাই ভেঙে চুর হয় তো ভাববে কি দিয়ে? চলো,শুভস্য শীঘ্রম্।

বাবু হাম্‌ভি···

আবার চাকরটা যেতে চায় যে, মামা!

কাহে রে?

ডর।

ডর কোন্ বাৎ কা?

জোরে চেপে ঝড় আর শিলে বৃষ্টি আসাতে সবাই ছুটে চলে গেল আশ্রয়ের সন্ধানে।

রইল একা রাজু।

শেষ রাতে আকাশ পরিষ্কার হয়ে আলো দেখা দিতেই সবাই ফিরে এসে দেখলে। মড়া পড়ে আছে, আর কেউ নেই।

ও আমি আগেই জানতুম, বেজোন্দর।

কিন্তু কাজটা কি ভালো হল? ভারি অকল্যাণ,—মামা!

দাঁড়াও অকল্যাণ,—লাশটা যে উঠে চলে যায়নি, এই আমাদের ভাগ্যি !

রেজোর উপর আমার ধারণাটা কিন্তু ভালোই ছিল।

ভুলে গেলে ? এটা কোন্ কাল।

তা ঠিক।

সরে এসো,—সবাই সরে এসো ! সব্বাই শোন বামাচরণ চক্কোত্তির কথা,—নৈলে প্রাণ খোয়াবে, বলে দিলুম।

সকলে দূরে সরে গিয়ে দাঁড়াল। ব্রজেন্দ্র বললেন, ব্যাপার কি মামা ?

ব্যাপার গুরুচরণ !

সে কি ?

দেখছো না, মড়া নড়তে সুরু করেছে।

তাই তো।

পেটটা ফুলে ঢাক হয়ে গেছে।

এ সব এৎবারি বেটার খেলা ! বামনের মড়া বিশেষ করে এয়ো স্ত্রী,—আর রক্ষে আছে।—বোজেন্দর—যা বলি শোন।

কি মামা !

আমরা সবাই বামুনের ছেলে আছি—ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলে পৈতে জড়িয়ে—চীৎকার করে বলবে রাম, রাম রাম ;—দেখবে একতার জোর—ভয় আমার ঐ চাকরটাকে নিয়ে, ওকে না ভর করে বসে ব্যাটা।

এই কেয়া নাম তুমারা ?

গরভূ—

হট যাও গরভূ—তফাৎ যাও। বল সবাই এক সঙ্গে।

রাম, রাম, রাম।

ব্যস্,—নড়চে ফের বল।

রাম, রাম, রাম।

ওই দেখ উঠছে। আরো চেঁচিয়ে বল—

রাম, রাম, রাম !

ঐ আসচে, পেছু হটে,—সবাই পেছিয়ে—

হাসতে হাসতে মড়া-ঢাকা লেপের ভিতর থেকে রাজু এলো বেরিয়ে।

সাবাস বাচ্ছা ! জীতে রহো—এই তো মরদের সাহস।

ছোট ছেলেদের জন্য লেখা গোটা কয়েক গল্প শরৎ শেষ অসুখে পড়েও লিখছিলেন। তাতে নাম না দেওয়া থাকলেও, সেগুলি ইন্দ্রনাথের (রাজুর) কাহিনী ফলিয়ে সাহিত্য করে লেখা হয়েছে।

বইখানি এম-সি সরকারের সুধীর বাবু প্রকাশিত করেছেন। শেষ কদিন শরৎচন্দ্র সর্বদাই ভাগলপুরের কথা বলতেন। একদিন উমাপ্রসাদকে ডেকে বললেন, রাজু, চল ভাগলপুরে যাওয়া যাক। সেখেনে ভারি চমৎকার গঙ্গা। দুজনে পাথর ঘাটে স্নান করবো, যাবে ?

যাবো বই কি !

সে যাওয়া আর হয়নি।

স্বপ্নভঙ্গ

শ্রীকুমারেন্দ্র আচার্য্য

মিষ্টার দে ব্যারিষ্টার। নামজাদা ব্যারিষ্টার, বারের লিডিং প্র্যাক্‌টিশনার।

লোক হিসাবে সজ্জন। ব্যারিষ্টারী করিতেই যেন পৃথিবীতে তাঁহার আবির্ভাব—এমন-ই মনে হওয়াটা বিচিত্র নয়। পাকা সাহেব। হাজার বৎসর পরে মিঃ দে'কে যদি অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় পৃথিবীর এ-দেশে হাজির করানো যায়, তা হইলে ওই একটী লোকই ভারতে ইংরেজ রাজত্বের নিঃসংশয় প্রমাণ দিতে পারিতেন বলিয়াই বিশ্বাস। এ্যারিষ্টোক্রেশীর যতোগুলি সোজা এবং শক্ত ফিকিরফন্দী আছে তা তিনি কাল্‌চার করিয়াছেন। ইংলিশ আউট্‌লুকের রং ফিকে হইলেই তিনি বৎসর বৎসর বিলাতে রং করিয়া আনেন, এবং কলিকাতায় বসিয়াও ইংরেজ জাতির সহিত যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তবে এ-কথাও সত্য যে তাঁহার এ্যারিষ্টোক্রেশী অকৃত্রিম। যে এ্যারিষ্টোক্রেশী পশ্চিম হইতে জাহাজে চাপিয়া এ-দেশের বন্দরে বিকায় তিনি তার খরিদ্দার নহেন, তিনি তাহা লাভ করিয়াছেন সেখানকার বায়ু হইতে। প্রকৃতিও তাঁহাকে এ-বিষয়ে সাহায্য করিয়াছে। বর্ণ এ-দেশের পক্ষে উগ্র গৌর, স্পেনীয় ধরণের। ঠোঁট ছু'টো পাতলা। কণ্ঠস্বর ঈষৎ ভাঙ্গা এবং গম্ভীর। গায়ে সিগারেটের গন্ধ। তর্জ্জনীতে সিগারেটের দাগ।

এ্যারিষ্টোক্রেশীর নাকি আরো একটা রহস্যময় বৈশিষ্ট্য আছে। সেটা কন্যা-সন্তানের আবশ্যকতা এবং তাহার উপর আকর্ষণের আধিক্য। এটা যদি সত্য-ই হয় তা হইলে মিঃ দে এ-বিষয়েও কৃতী। তাঁর একটিমাত্র কন্যা—মিস্ হেনা দে। হেনাকে তিনি ভালবাসেন খুব—(অবশ্য এটা এ্যারিষ্টোক্রেশীর রীতি অনুযায়ী নয়)। আভিজাত্য শিক্ষা দিতে তিনি চেষ্টার কসুর করেন নাই। এমন কি একবার বিলাতে পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছেন।

হেনার দিক হইতে বলিতে গেলে এ অবশ্যস্বীকার্য্য যে সে আভিজাত্যের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারে নাই। যতটুকু স্বতঃ আসিয়াছে তাহা গ্রহণ করিয়াছে, যেটুকু আসে নাই সেটুকুর জন্য সে চেষ্টা করে নাই, সে ইচ্ছাও নাই।

মিস্ ডরোথি তাহাকে অঙ্ক কষাণ, ইংরাজী গদ্যও পড়ান। মিসেস্ মঞ্জুষা সেন বাংলা, সংস্কৃত এবং সময় সময় ইংরাজী পদ্যও পড়ান।

মিস্ হেনার পড়িবার ঘরে ঢুকিলেই চোখে পড়ে, বইকাগজ রাখিবার একটা মেহগিনি টেবিল ছাড়া, একটা বড়ো ড্রেসিং টেবিল। স্নো ক্রীম পমেড ইত্যাদির প্রাচুর্য্য যেমনি, তাদের অনাদরও তেমনি। থাকিতে হয় আছে শুধু দে সাহেবের বিল বাড়াইবার জন্য। অব্যবহারে অনেক জিনিষ শুকাইয়া গিয়াছে। বাপের সঙ্গে কোথাও যাওয়ার সময় ছাড়া তাহাদের বড়ো একটা খোঁজখবর থাকে না। তার ভিতর একটা কথা আছে। মিসেস্ মঞ্জুষা এ-সব কখনো ব্যবহার করেন না। কিন্তু তিনি কতো সুন্দর! তাঁর ললাটের ঘর্ম্মবিন্দু যখন আলোকে চিক্‌চিক্ করিয়া উঠে তখন হেনার মনে হয়, অমন সৌন্দর্য্য কি কোনো রাসায়নিক স্নো বা ক্রীম দিতে পারে? তাঁর ঠোঁট কবিতার উচ্ছ্বাসে

আরো লাল হইয়া উঠে, জগতে কোন্ লিপষ্টিক এমন রং ফুটাইবে? মিঃ দে মনে করেন এটা হেনার পাগলামী বা ছেলেমানুষী। কিন্তু হেনা জানে এটা তার পাগলামী নয়, দৃঢ় বিশ্বাস। মঞ্জুষা তার কাছে মর্ত্ত্যলোকবাসী এঞ্জেল্ বা এমনি কিছু। যাক।

ঘরের আর একদিকে একটা বড়ো পিয়ানো। তার সামনের জানালা দিয়া দেখা যায় উঠোনের ইউক্যালিপটস্ গাছ হাওয়ায় শোঁ শোঁ করিতেছে। এ জানালায় কতকগুলি বিলাতী লতা গুচ্ছ পাকাইয়া ঝুলিতেছে। ঘরের ঠিক সামনের দালানে একটা টিয়াজাতীয় পাখী—বোধ হয় দেশী ও বিলাতীর সংমিশ্রণ জাত—দাঁড়ে ঝুলিতেছে। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা, সে বলিতেছে রাধা, কৃষ্ণ। হেনাই শিখাইয়াছে।

সন্ধ্যাবেলা। মিসেস্ মঞ্জুষা আজ আর আসেন নাই। পশ্চিমের ক্ষীয়মান সূর্য্যরশ্মি জানালার ভিতর দিয়া বিপরীত দেয়ালে পড়িয়াছে। হেনার ভাল লাগিতেছিল না। পিয়ানোটা খুলিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল।

পাখীটা মাঝে মাঝে চেঁচাইতেছে, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ।

হেনার অঙ্গুলি পিয়ানোর উপর স্থির হইয়া আসে। বাপের সঙ্গে যাইয়া সে টেমস রাইন দেখিয়াছে, কিন্তু যমুনা দেখে নাই। অথচ মনে হইল, অনেক দূরে যমুনাতীরের কোন লোকান্তরালবর্ত্তী অন্তরলোক হইতে সেই শাশ্বত বেণুরব তার পিয়ানোকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতেছে।

দালানে জুতার শব্দ হইল।

পিয়ানোটা বন্ধ করিয়া হেনা বলিল, আসুন।

দুর্লভ ঘরে প্রবেশ করিল। দুর্লভ যুবক। সুন্দর সুশ্রী বলিষ্ঠ চেহারা। তাহার মুখের সঙ্গে যে-হাসি জড়ানো আছে, তা এমনি স্বাভাবিক এবং মুখাবয়বের সহিত এমনি সুসঙ্গত যে, বোধ হয় দুর্লভ তা নিজেই টের পায় না।

দুর্লভকে হেনার ভারী ভাল লাগে। তার কারণ এ নয় যে সে সুন্দর এবং ধনী। হেনার কোনদিনই তার দৈহিক সৌন্দর্য্যের দিকে বিশেষ একটা নজর পড়ে নাই। দুর্লভ কীট্স-এর পরম ভক্ত। সৌন্দর্য্যের অনুভূতি তার অত্যন্ত গভীর। হেনার জন্য তাহার আকর্ষণ থাকিলেও থাকিতে পারে কিন্তু নিয়শ্চই মোহ নাই, কারণ, সে বলে, জগতে সুন্দর এত বেশী আছে এবং ভালবাসিবার বস্তুও এতো আছে যে হেনাকে বাদ দিলেও তার জীবনে কোথাও ফাঁক থাকিবে না। এই কারণেই হেনা তাকে এত বেশী পছন্দ করে। এই কারণেই দুর্লভকে সে বেশী সুন্দর দেখে। সেই জন্য দুর্লভ গান করিতে বসিলে তার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে সুর শুন্বার আগে থেকেই। এই কারণেই তার বলিষ্ঠ পুরুষ প্রকৃতির প্রতি তরুণীর অজস্র অভিনন্দন স্বতঃই উৎসারিত হইয়া উঠে, যেমন হতো আগেকার তরুণীদের বীর নাইটের প্রতি।

হেনা জানে দুর্লভের উপর তাহার পিতার লোভ আছে। দুর্লভও অসম্মত নয়। তার আনন্দের সীমা থাকে না। তার দৃঢ় বিশ্বাস, সে দুর্লভকে লইয়া দু'জনে একটা নূতন অতীন্দ্রিয় জগৎ সৃষ্টি করিয়া বাস করিবে—যেমন মিসেস মঞ্জুষা করিয়াছেন। দুর্লভের সহস্রমুখী রূপ-পিপাসু মনকে সে একমাত্র তাহার দিকে ফিরাইয়া নারীত্বের শ্রেষ্ঠ জয়-গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিবে।

এদিকে দুর্লভ আর ওদিকে মঞ্জুষা। এরা হেনার কাছে যেন মনুষ্যধর্ম্মী জীব নয়। এদের যেন রক্ত মাংস নাই, রক্ত মাংসের বৃত্তিও নাই। এরা যেন হাওয়া আর সূর্য্যালোকে গড়া।

তার ভারী ইচ্ছা করে মিসেস মঞ্জুষাকে আরো ভাল করিয়া জানিবার জন্য। তিনি স্ত্রী হিসাবে কেমন করিয়া স্বামীর সঙ্গে ঘর করেন, তার জানা শুধু কৌতূহলের নয় একটা মস্ত আবশ্যকীয় শিক্ষারও বস্তু।

কারণ, সে জানিত তাহার নারীজন্মের উপর ঈশ্বরের অনিবার্য্য আদেশ আছে...আজ হোক কাল হোক ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, তাহাকে স্ত্রী হইতে হইবে। হ্যাঁ, সে স্ত্রী হইবে যেমন মঞ্জুষা হইয়াছেন।

মিসেস্ মঞ্জুষাকে মনে পড়ে। তিনি আদর্শ স্বামীর সঙ্গিনী। মনে পড়িল, সেদিনকার কথা, যেদিন মিসেস্ মঞ্জুষা কবি রসেটির একটা কবিতা পড়াইতেছিলেন। কবির সেই আত্মভোলা নিষ্কাম প্রেম-নিবেদন বুঝি মঞ্জুষাই শুধু বোঝেন—পড়াইতে পড়াইতে তাঁহার স্বভাবসুন্দর মুখখানা অপার্থিব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

হেনার মনে হয়, মিসেস মঞ্জুষা স্বামীকে এমনি ভালবাসেন। যে ভালবাসায় অনেক অকবিও ব্রাউনিং হইয়া উঠে, এ সেই ভালবাসা।

কন্যা যখন এ সব কল্পনায় আত্মহারা, মিঃ দে তখন ভিতরে ভিতরে স্থির করিলেন, দুর্লভকে তিনি ছাড়িবেন না। তিনি জানিতেন, হেনার এতে আপত্তি নাই। তবু মনে মনে স্থির করিলেন, হেনাকে একবার কথাটা বলিয়া তাহার মনের ভাব যাচাই করিয়া লইতে।

দুর্লভের যে চঞ্চল চিত্ত বিশ্বের সকল দিকে ছড়াইয়া ছিল, তা কেমন এক রহস্যময় কারণে হেনার দিকে একমুখী হইয়া পড়িল। হেনা যে তাহার জীবনে অপরিহার্য্য তা ত' সে আগে বোঝে নাই ? যেন কাব্যলক্ষ্মী আসিয়া তাঁহার চোখে নূতন অঞ্জন লেপিয়া দিল, যাহার জন্য সে হেনাকে আজ অত্যন্ত বিচিত্র দেখিল। যেন এই তাহার প্রথম পরিচয়—প্রথম পরিচয়ের প্রেম। হেনা তাহার কাছে একটা নূতন বিস্ময়। দুর্লভ হেনাকে কবিতা পড়িয়া শোনায়। হেনা শুনে, বলে, সুন্দর।

দুর্লভ বলে, এই কবিতা আমাদের জীবনের ওপর ছেপে নেবো। মুছবে না। আমাদের জীবন ধন্য হবে। হেনা অস্ফুট কণ্ঠে ওই কথারই পুনরাবৃত্তি করে, ধন্য হবো।

মিসেস্ মঞ্জুষাকে তার এখন সব-চেয়ে বেশী প্রয়োজন। তিনি কতদিন আসেন নাই—প্রায় চার মাস হইতে চলিল। এমন কখনো করেন না। অন্ততঃ খবরও একটা দেন। তার মন চঞ্চল হয়। হয়ত' বা অসুখ করিয়াছে—হয়ত' বা কোন কারণে রাগ হইয়াছে। ঘরে একেলা বসিয়া মিসেস্ মঞ্জুষার কথা ভাবে। এমন সন্ধ্যাবেলা হয়ত বা তাঁহার স্বামী তাঁহাকে বাহুডোরে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, আর মঞ্জুষা তাঁহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া কথা বলিতেছেন, অননুকরণীয় ছন্দে কবিতা শোনাইতেছেন। এইরূপ সম্ভব অসম্ভব কল্পনায় হেনা বিভোর হইয়া থাকে—সেই কল্পনা মিঃ দে এমন কি দুর্লভের উপস্থিতি-ও অগ্রাহ্য করিয়া চলে।

'বিলাতী পাখীটা বলে,—রাধাকৃষ্ণ।

হেনা চমকিয়া উঠে। কেন ? কৃষ্ণ নামে চমকিয়া উঠা, হেনার পক্ষে একটা অত্যন্ত হাস্যকর বিসদৃশ ব্যাপার। এ কৃষ্ণ নামমাত্র নয়, পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণ-ও নয়, এ প্রেমের শাশ্বত কৃষ্ণ। এ-কথাটা বোঝা তাহার পক্ষে কঠিন নয়। হায়, হায়, মিঃ দে এতো করিয়াও কিছু পরিবর্ত্তন করাইতে পারিলেন না, ব্যারিষ্টারকন্যা হেনা যে অন্তরে সেই গোপী-ই রহিয়া গেছে।

সোফারকে ডাকিয়া সে গাড়ী প্রস্তুত করিতে বলিল। আজ মঞ্জুষার খবর লইতেই হইবে। গাড়ীতে যাইতে যাইতে হঠাৎ মনে পড়িল, তাঁহার জন্য একটা কিছু লইয়া যাওয়া প্রয়োজন—তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির উপহার স্বরূপ। কি লইবে ? একটা ব্রোচ, লেসপিন্, নেকলেশ না আংটি ? না, ওই যে দোকানে সুন্দর ফুলের বোকে দেখা যাইতেছে ওই তাঁর সব-চেয়ে উপযুক্ত। সোণায় যে পৃথিবীর মাটীর দাগ আছে। ফুল পায় সুগন্ধি বাতাস আর সূর্য্যালোক।

গাড়ী থামাইয়া হেনা মিসেস্ মঞ্জুষার বাড়ীতে ঢুকিল। কেহ নাই। বৈঠকখানা খোলা, তাতে আসবাব পত্রের ভিতর একটা জীর্ণ সতরঞ্চি। দেয়ালে টাঙানো একখানা রাধাকৃষ্ণের ছবি, যা প্রায় রাধাকৃষ্ণের মতই পৌরাণিক।

ওই না মঞ্জুষাকে জানালার ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছে ? ঈস্, কি বিশ্রী চেহারা হইয়া গেছে। চোখ কোটরে ঢুকিয়া গেছে, গালের হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ঠোঁট দুইটী এমনি শুষ্ক এবং বিবর্ণ হইয়া গেছে তা দূর হইতেও যে-কোনো পরিচিতের দৃষ্টি এড়ায় না।

তাহাকে দেখিতে পাইয়া মিসেস্ মঞ্জুষা হাসিলেন। সেই হাসির ছায়া যেন মুখখানাকে মুহূর্ত্তের জন্য কালো করিয়া দিল। আগে হাসিলে গালে যে টোল পড়িত সেটুকু নিঃশেষে অন্তর্হিত হইয়া গেছে।

বিস্মিত দৃষ্টিতে হেনা বলিল, আপনার এ-রকম চেহারা হলো কেন ?

হাসিয়া মিসেস্ মঞ্জুষা বলিলেন, অসুখ করলেই শরীর খারাপ হয়, এই-ই ত শরীরের নিয়ম।

হেনা বলিল, কই একবারও ত' খবর দেন নি ? প্রায় পাঁচ মাস হ'লো যান নি।

মঞ্জুষা তাহার করুণ দৃষ্টি হেনার মুখের উপর হইতে নামাইয়া বলিল, উপায় নেই যে হেনা।

—কেন ?

—আমার স্বামী বারণ করেন। আমাকে বড্ড বেশী ভাল বাসেন কি না তাই। আমি মাতৃত্বের অপেক্ষা ক'রছি। তোমার ওখানে যেতে অন্ততঃ মাস দুই সময় লাগবে। মিঃ দেকে বলো তিনি যেন অসন্তুষ্ট না হন—কী আর খবর দেবো তাই খবর দিইনি। তুমি পড়াশুনো করো মন দিয়ে। ভালো কথা, তোমার নাকি দুর্লভের সঙ্গে বে'র কথা হচ্ছে ?

নত মুখে হেনা বলিল, ঠিক কিছু হয়নি।

—হ্যাঁ ঠিক হয়েছে। দুর্লভ আমাকে সব কথা বলেছে। আপত্তি এসেছিল প্রথমতঃ তার নিজের তরফ থেকে। ও বলেছিল বে করবে না। কিন্তু বাপের এক ছেলে—বাড়ীর বা বংশের ওই একটি মাত্র ছেলে। ওর মা তাই ওকে সম্মত করাতে বাধ্য হ'লেন। এখন সে রাজী। তোমাদের তরফ থেকে আপত্তির কারণ কিছু নেই, এটা অনুমান করতে পারি।

মুখ তুলিয়া হেনা বলিল, বাপের একমাত্র ছেলে হওয়াটা কি বিয়ে করার পক্ষে একটা যুক্তি ?

—নিশ্চয়ই। এটা শুধু আমাদের ঘরের যুক্তি নয়—এটা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সাহেব বাঙ্গালী সকলকা'রই যুক্তি। মানুষ মৃত্যুর চেয়ে ভয় করে নিঃশেষে বিলোপের কল্পনাকে। বংশের কাউকে পৃথিবীতে রেখে গিয়ে ভাবে তবু মৃত্যুর সঙ্গে একটা যোগসূত্র রইলো। এটা মস্তো সান্ত্বনা। কুসংস্কার বলো আর যাই-ই বলো, এটা মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি। যাই হোক, শুনে খুসী হলুম্ খুব।

হেনা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মিসেস্ মঞ্জুষার ক্লিষ্ট মুখখানার দিকে চাহিয়া সে নিজের মুখখানা নীচু করিতে বাধ্য হইল। ফুলের তোড়া যেন তাহার চক্ষের সম্মুখেই শুকাইয়া উঠিতে লাগিল।

মিসেস্ মঞ্জুষা যেন উপহারস্বরূপ লজ্জার একটা দুর্বহ বোঝা চাপাইয়া দিয়া বাড়ী হইতে ফিরাইয়া দিয়াছেন। পৃথিবীটার আসল ধাতু মাটী, সোণা নয়, এ নির্ম্মম সত্যটা মিসেস্ মঞ্জুষা না জানাইয়া দিলেও পারিতেন।

সে ঘরে চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। যে-পুলকের জগৎখানি এমনি রূঢ় আঘাতে তাসের ঘরের মত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল, তার-ই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তাহার ক্ষুব্ধ অন্তর মাথা গুঁজিয়া লুকাইতে চাহিল। মিসেস্ মঞ্জুষা আজ তাহার কাছে হৃতজ্যোতিঃ হৃতরূপ পতিত দেবদূত—আজ তিনি পৃথিবীর সামান্য মানুষের চেয়ে এতোটুকুও বড়ো নহেন। জগতে বোধ হয়, সবাই এমনি—কেউ কারো চেয়ে এতোটুকুও বড়ো নয়।

মাতৃত্ব। এই উজ্জ্বল সোণায় পৃথিবীর মাটী কেন এমনি চিরদিন লাগিয়া আছে? ঈশ্বরের নিকট এ প্রশ্নের জবাব আজ কে তাহাকে দিবে?

ইতিমধ্যে মিঃ দে'র বাড়ীতে প্রাথমিক আয়োজনটুকু সুরু হইয়া গেছে। বাড়ীখানাকে অনাবশ্যকরূপে দ্বিতীয়বার চুণকাম করা হইয়াছে, আইভিগুলো ছাঁটা হইয়াছে, বৈদ্যুতিক সাজসজ্জার উদ্যোগপর্ব্বও সুরু হইয়াছে। মিঃ দে কারণে এবং অকারণে ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন। হেনা চুপ করিয়া দেখে। শুইয়া শুইয়া পরিশ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। মনে হয়, দুর্লভ আসিয়া এক গাল হাসিয়া তাহার পাশে বসে। বলে, কি ভাবছো হেনা?

হেনা বলে, বে হবে না। আমি রাজী নই।

দুর্লভ বিস্মিত হইয়া বলে, কেন, কারণ জানতে পারি কি?

—পারো। আমার সঙ্গে তোমার বে' হ'তে পারে না। আমি সুখী হ'তে পারবো না।

—কেন?

—তোমায় ভালবাসি ব'লে। আশ্চর্য্য হ'য়ো না। হেঁয়ালী নয়। তোমায় খুব ভালবাসি। মিসেস্ মঞ্জুষা একদিন একটা কবিতা শুনিয়েছিলেন, ব্রাউনিংয়ের প্রতি তাঁর প্রণয়িণীর প্রেমনিবেদন। আমি সেই রকম ভালবাসি। সেই প্রেমকে অপমান ক'রো না, আমাকে অধিকার ক'রতে এসে। তুমি আমার নাগালের বাইরে থেকো। খুব তৃপ্তি পাবো। এই তোমার কাছে আমার মিনতি।

দুর্লভ যেন খোলা জানালার দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকে। তারপর নীরবে ঘরের বাহির হইয়া যায়।

হেনার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। কপালের ঘর্ম্মবিন্দুর উপর খোলা জানালার হাওয়া লাগায় সে অনেকটা আরাম বোধ করে।

পাখীটা কতোরকম বুলি আওড়ায়, শীষ দেয়। অভ্যাগতাগণ রাতদিনই অর্গ্যানের সুরে বাড়ীটা আচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

'জংশন ষ্টেশনে'

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

মাঘের প্রভাত
উষাস্নান সারি' ছাড়িছে কুহেলি-সাড়ি
পূর্ব্বানদীতটে। চম্পাপীত ক্ষণ-নগ্নবুকে
ঘুরায়ে জড়ায়ে নিল জরীর আঁচল,
স্মিতমুখে চলে গেল আলোকের
অন্তরাল-পথে।
ট্রেণ মোর থামিল ষ্টেশনে,—
জংশন ষ্টেশন ;—
ছাড়িয়া রাতের গদি স্প্রীংময় কোমল,
নামিনু উপলকীর্ণ সুদীর্ঘ অঙ্গনে!
বিনিদ্র রাতের সাথী
গদিকে কি বেসেছিনু ভাল ?
দুর্ঘট ঘর্ঘর-ঘৃষ্ট
রজনীর লৌহপথে যেবা
গতির উৎক্ষেপ মাঝে
স্থিতির আরাম দিল মোরে,
ব্যথা কি বাজিছে বুকে ছাড়িতে তাহারে ?
অথবা—
লাগিছে ভাল নিদ্রাহীন রাত্রিশেষে
যাত্রীময়
জংশন ষ্টেশনে
কঠিন কঙ্করকীর্ণ এ অপরিচয় ?
প্রাঙ্গণের কাঁটাতারে কুসুমাক্ত বিদেশিনী লতা।
অদূর প্রান্তর অজানায়
নৃত্যপর নটেশের
ডম্বরুর মত—
চ'লেছে সাঁওতালী মেয়ে নাচিয়া গাহিয়া
দোলায়ে কঠিন তনু মুঠিম কটিতে।

উষাস্নাত মাঘের প্রভাত,
গদিআঁটা ট্রেণের কামরা,
কাঁটাতারে কুসুমাক্ত লতা,
মাঠের সাঁওতালী মেয়ে,
কারে আমি ভালবাসি ?
ভাল কি বেসেছি কভু কারে ?
বিশ্বমাঝে কে আমার লভিল সে প্রেম ?
যে-প্রেমের
নাহি অন্ত, তল, সীমা, আদি ও ইত্যাদি ?
সে প্রেম কি কৃপণের মত
সঞ্চয়ি রাখিনু নিজ বুকে ?

দিক্‌হস্তী সম
গর্জিয়া আসিল ট্রেণ,
থামি' কিছুক্ষণ
শুণ্ডমুখে আকণ্ঠ করিল পান
পঙ্কিল সলিল।
ঘড়ির কাঁটায় কহে
এ ট্রেণ আমার নহে।
আমার ট্রেণের বার্ত্তা নিঃশব্দ সঙ্কেতে,
হয়ত বহিয়া আসে তড়িতের তার!
সে বার্ত্তা জানে না ওই নীলকণ্ঠ পাখী
তারে বসি খেতেছে যে দোলা
পরম আরামে।

জংশন ষ্টেশনে
ওয়েটিংরুমে দেওয়ালে মুকুর আঁটা ;
কত কত প্রতিচ্ছবি ধরেছে সে বুকে !
চাহি' তার পানে
ভাবিলাম—
যারা যারা এল গেল
প্রতিবিম্ব ফেলে গেল
আয়তলোচনা বিলাসিনী,
তারা যদি আজ

ভিড় করে দাঁড়ায় সম্মুখে
বিলাইয়ে দিব আমার সে-প্রেম ?

সহসা সম্মুখে দেখি
মুকুর হইতে মোর মুখপানে চেয়ে—
দাঁড়ায়ে সে রয়েছে একাকী,
যারে আমি আজনম ভালবাসিতেছি
না বুঝিয়া না জানিয়া !
ওই তনু মম,
কখন প্রথম পেনু তারে—
জননীর জঠর আঁধারে,
নাহি পড়ে মনে।
অনালোক বায়ুশূন্য, ক্লেদক্লিন্ন
জটিল অরণ্যমাঝে সুদীর্ঘ রজনী।
সেথা মোরা ফিরিতেছি খুঁজি পরস্পরে।
সহসা পরশে অনুভবি,
অন্ধ অনুরাগে
জড়ায়ে সে দিল কণ্ঠে মোর—
সহস্র স্নায়ুর জালে রচিত জীবনমাল্য।
সেই ক্ষণে
বুকে বুক মুখে মুখ
লভিলাম চিরপরিচয়।
সেই হ'তে উভয়ের যাত্রা সুরু হ'ল—
সুদীর্ঘ পথের।
শৈশবে খেলিনু এক সাথে,
যৌবনের প্রগাঢ় মিলনে
ভুলে গেনু—কেবা সে কে আমি।
আজ মোরা অভিন্ন এমন, এ হেন তন্ময়,
নিঃসাড় হইয়া গেছে প্রেম-অনুভূতি।
রূপহীন পিপাসিতে দিয়াছে সে রূপ,—
অজীবনে দিয়াছে জীবন ;—
তাই কি এমন ভালবাসি ?
জানি আমি—নহে সে সুন্দর,
তবু মানিনা ত,—তা' হ'তে সুন্দর কারে
শয়নে, স্বপনে, সুপ্তি-জাগরণে,
তিলেক ছাড়িলে নাহি বাঁচি।

মৃত্যুময় জানিয়াও
প্রেম মোর অমর করিতে তারে চাহে।
কালো অঙ্গে তার—
সযতনে বুলাইয়া ভালবাসা
চিরকাল করি প্রসাধন।
লুকায়ে লুকায়ে দেখি তারে
গুরুজন-গঞ্জনা ভাবিয়া।
তার রোগে রুগ্ন আমি,
তার শোকে আমি মুহ্যমান।
হেন অপ্রমিত প্রেমে কে কোথা প্রেমিক ?

ওই যুগ্ম আঁখি
দেখাইল মোরে—
রূপের স্বরূপ বারে বারে।
বয়সের ক্লান্তি ভারে সে যদি আজিকে
ধ্বসিয়া বসিয়া যায়
গ্রামান্ত-প্রান্তরে গরীবের গোরের মতন,
তবে কি তাহারে ছাড়ি' ঘুরিয়া মরিব
পদ্মপলাশিনীদের পিছে পিছে ?
সে প্রেম মোদের নহে।
এ প্রেম এমনই মূঢ়, নিজে অন্ধ হ'য়ে
অন্ধে করে দিব্য চক্ষুষ্মান ;
এমনই মহান্—
আপনার গোপন যৌবনে
জরারে ভূষিত করে,
চির সুন্দরের পাশে
কুৎসিতের রচি' দেয় স্থান।
অপ্রমেয় মোদের এ প্রেম।

তবু দু'য়ে হবে ছাড়াছাড়ি !
এই যে জীবনরাতি ক্ষীণ দীপ জ্বালি'
কাটাই দুজনে—
দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদি বিচ্ছেদ ভাবিয়া,
এ রজনী হবে ভোর।
মোদের মিলিত কণ্ঠে আকুল মিনতি,
কাতর ক্রন্দন,

অসহ্য যন্ত্রণাময় ছেদন-বেদন,
রুধিতে নারিবে হায় অরুণ মরণরথ।
সে রথের চক্রতলে
হতমান গতপ্রাণ প্রিয়া
যদি প'ড়ে রয় ধূলিধূসরিত,
চৌদিকে কাঁদিতে থাকে জীবনসঙ্গিনিগণ,
তবু রথে চড়ি'
একা মোরে যেতে হবে
ওপারের মধুপুরে ?
মোর প্রেম কখনো ত মানেনি মথুরা।
তার চেয়ে—
শঙ্করের মত সতীদেহ স্কন্ধে তুলি' লব,
ভ্রমিয়া বেড়াব ত্রিভুবন
মহাশোকে অসীম নির্বেদে ;
যতদিন দিকে দিকে সতীপীঠ নহে প্রতিষ্ঠিত,
যতদিন ক্রন্দনতপস্যা মম
সে সতীরে না পারে ফিরাতে।
দারুণ সে যজ্ঞপণ্ডদিনে
দেহহারা জীব হবে সতীহারা শিব।

ঘণ্টা বাজে জংশন ষ্টেশনে।
আমারি ঈপ্সিত ট্রেণ
আসিয়া দাঁড়াল প্রাঙ্গণের প্রান্ত ঘেঁসি',
চড়িনু নূতন ট্রেণে, নব কামরায় ;
কুশন-কবোষ্ণ গদি স্প্রীংময় কোমল।
উড়ে গেছে নীলকণ্ঠ পাখী,
কে জানে চলিছে কিনা শূন্য তার তলে
আমারি ট্রেণের বার্ত্তা অগ্রিম ষ্টেশনে।



বিপিনের সংসার

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিপিন নিজের চক্ষুকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না, কারণ যে মেয়েটী পিছন ফিরিয়া চাহিয়াছিল, সে—মানী।

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য বিপিনের চলিবার শক্তি যেন রহিত হইল। মানী এদিকে চাহিয়া আছে বটে কিন্তু তাহার দিকে নয়—তাহাকে সে দেখিতে পায় নাই। বিপিন অগ্রসর হইয়া মানীর সামনে গিয়া বলিল—এই যে মানী। তুমি এখানে ?

মানী চমকিয়া উঠিয়া অন্য দিক হইতে মুহূর্ত্তে দৃষ্টি ফিরাইয়া তাহার দিকে চাহিল। তাহার মুখে বিস্ময়—গভীর, অবিমিশ্র বিস্ময়।

বিপিন হাসিয়া বলিল—চিনতে পারচ না ? আমি—

মানীর মুখ হইতে বিস্ময়ের ভাব তখনও কাটে নাই। পরক্ষণেই সে ট্রাঙ্কের উপর হইতে উঠিয়া হাসিমুখে বিপিনের দিকে আগাইয়া আসিতে আসিতে বলিল—বিপিন দা। তুমি কোথা থেকে ?

বিপিন মানীকে 'তুই' বলিতে পারিল না, অনেক দিন পরে দেখা, কেমন সঙ্কোচ বোধ হইল। বলিল—আমি ? আমি রাণাঘাটে এসেচি কাজে। বলচি। কিন্তু তুমি এমন সময় এখানে ?

মানী চোখ নামাইয়া নীচু দিক চাহিয়া ধরা গলায় বলিল—তুমি কি করেই বা জানবে। বাবা মারা গিয়েচেন—কাল চতুর্থীর শ্রাদ্ধ। তাই পলাশপুর যাচ্চি আজ। এই ট্রেণে নামলাম।

বিপিন বিস্ময়ের স্বরে বলিল—অনাদি বাবু মারা গিয়েচেন ? কবে ? কি হয়েছিল ?

—কি হয়েছিল জানিনে। পরশু টেলিগ্রাম করেচে এখানকার নায়েব হরি বাবু। তাই আজ আমার দেওরকে সঙ্গে নিয়ে আসচি, উনি আসতে পারলেন না—কেস আছে হাতে। বোধ হয় কাজের দিন আসবেন। দেওর গাড়ী ডাকতে গিয়েচে—তাই বসে আছি।

বিপিন দুই চক্ষু ভরিয়া যেন মানীকে দেখিতেছিল। এখনও যেন তাহার বিশ্বাস হইতেছিল না যে, এই সেই মানী। সেই রকমই সুন্দর দেখিতে এখনও। এতটুকু বদলায় নাই।

—বিপিন দা, ভাল আছ ? কোথায় আছ, কি করচ এখন ?

—এখন যে আমি ডাক্তার, নাম-করা পাড়াগাঁয়ের ডাক্তার। রুগী নিয়ে রাণাঘাটের হাঁসপাতালে এসেচি, রুগীর বাসাতেই আছি। আমাদের দেশের ওই দিকে সোনাতনপুর বলে একটা গাঁ, সেখানেই থাকি। তুমি যে পথ দেখিয়ে দিয়েছিলে মনে আছে মানী। ডাক্তারি করার পরামর্শ তুমিই দিয়েছিলে প্রথম। তাই আজ দুটো ভাত করে খাচ্চি।

—সত্যি, বিপিন দা। সত্যি বলচো এসব কথা ?

—সাক্ষী হাজির করতে রাজি আছি, মানী। বিশ্বাস করো আমার কথা।

—ভারি আনন্দ হোল শুনে। কিন্তু বিপিন দা, তোমার সঙ্গে যে এক রাশ কথা রয়েচে আমার। একটী রাশ কথা।

বিপিন ঠিকমত কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেছিল না। আজ কি সুন্দর দিনটা, কার মুখ দেখিয়া যে উঠিয়াছিল আজ! এই রাণাঘাট ষ্টেশনে জীবনের এমন একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা তাহার ঘটিবে, উহা সে কি ভাবিয়াছিল এবার যেদিন গাড়ী হইতে এখানে নামে!

সে শুধু বলিল—আমারও এক রাশ কথা আছে, মানী।

মানী বলিল—আমার একটি কথা রাখবে বিপিন দা, পলাশপুরে এসো। বাবার কাজের দিন পড়েচে সামনের বুধবার, তুমি আর দু দিন আগে এসো। আমি তোমায় বলচি। তোমার আসা তো উচিতও, এসময় তোমায় দেখলে মাও যথেষ্ট ভরসা পাবেন।

—যাওয়া আমার খুব উচিত। বাবার আমলের মনিব, আমার একটা কর্ত্তব্য তো আছে; কিন্তু একটা কথা হচ্চে—

মানী আরও আগাইয়া আসিয়া ছেলেমানুষের মত মিনতি ও আবদারের সুরে বলিল—ও সব কিন্তু টিন্তু শুনবো না·· আসতেই হবে, তোমার পায়ে পড়ি এসো বিপিন দা—আসবে না?

এই সময় শান্তি আসিয়া সলজ্জ ভাবে অদূরে দাঁড়াইল।

মানী বলিল—ও কে বিপিন দা?

বিপিন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। মানী জানে সে কি রকম চরিত্রের লোক ছিল পূর্ব্বে, হয়তো ভাবিতে পারে পয়সা হাতে পাইয়া বিপিন দা আবার আগের মত—যাহাই হোক, শান্তি কেন এ সময় এখানে আসিল? আর কিছুক্ষণ বেঞ্চিতে বসিলে কি হইত তাহার!

বলিল—ও গিয়ে আমাদের গাঁয়েরই—মানে ঠিক আমাদের গাঁয়ের নয়, আমি যেখানে ডাক্তারি করি সে গাঁয়েরই—ওর বাবা আমার রুগী।

মানী বলিল—ডাকো না এখানে! বেশ মেয়েটী।

বিপিন শান্তিকে ডাকিয়া মানীর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। মানী তাহার হাত ধরিয়া ট্রাঙ্কের উপর বসাইয়া বলিল—বসো না ভাই এখানে, তোমার বাবার কি অসুখ?

—চোখের অসুখ, তাই ডাক্তার বাবুকে সঙ্গে করে আমরা রাণাঘাটের সায়েব ডাক্তারের কাছে দেখাতে এসেচি পরশু। আপনি বুঝি ডাক্তার বাবুর গাঁয়ের লোক?

—না ভাই, আমার বাপের বাড়ী পলাশপুর, এখান থেকে চার ক্রোশ—বিপিন দা'র সঙ্গে ছেলেবেলায় এক সঙ্গে খেলা করেচি।

এই সময় মানীর দেওর আসিয়া বলিল—বৌদি, গাড়ী এই রাত্তির বেলা যেতে চায় না—অনেক কষ্টে একখানা ঠিক করেচি। চলুন উঠুন।

মানী দেওরের সহিত বিপিনের পরিচয় করাইয়া দিল। মানীর দেওর বেশ ছেলেটী, কোন্ কলেজে বি, এ পড়ে—এইটুকুই মাত্র বিপিন শুনিল, তাহার মন তখন সে দিকে ছিল না।

মানী গাড়ীতে উঠিবার সময় বার বার বলিল—কবে আসচো পলাশপুরে বিপিন দা? কালই এসো।

এঁরা এখানে দুদিন থাকবেন তো? তুমি সেই ফাঁকে ঘুরে এসো আমাদের ওখান। আসাই চাই; মনে থাকে যেন।

বাড়ী ফিরিবার পথে শান্তি যেন কেমন একটু বিমনা। সে জিজ্ঞাসা করিল—উনি কে ডাক্তার-বাবু? আপনার সঙ্গে কি করে আলাপ?

বিপিন বলিল—আমি আগে যে জমিদার বাড়ী কাজ করতাম, সেই জমিদার বাবুর মেয়ে। আমার বাবাও ওখানে কাজ করতেন কিনা, ছেলেবেলায় ওদের বাড়ী যেতাম—ওর সঙ্গে একসঙ্গে খেলা করেছি—অনেক দিনের জানাশুনো।

শান্তি বলিল—বেশ লোক কিন্তু। অত বড় মানুষের মেয়ে, মনে কোনো ঠ্যাকার নেই। দেখতেও ভারি চমৎকার।

রাত্রে সেদিন বিপিনের ঘুম হইল না। মনের মধ্যে কি এক প্রকারের উত্তেজনা, কি যে আনন্দ, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা যায় না—যত ঘুমাইবার চেষ্টা করে—বিছানা যেন গরম আগুন, মানীর সহিত দেখা হইয়াছে—আজ মানীর সহিত দেখা হইয়াছে—মানী তাহাকে পলাশপুর যাইতে বার বার অনুরোধ করিয়াছে—অনেকবার করিয়া বলিয়াছে—সেই মানী। এসব জিনিসও জীবনে সম্ভব হয়?

শুধু মানীর অনুরোধই বা কেন—অনাদিবাবু তাহার বাবার আমলের মনিব। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তাহার সেখানে একবার যাওয়াটা লৌকিক এবং সামাজিক উভয় দিক দিয়াই একটা কর্ত্তব্য বই কি।

সকালে উঠিয়া চা খাওয়ার পরে সে শান্তির শ্বশুরকে লইয়া যথারীতি হাঁসপাতালে গেল। সেখান হইতে ফিরিয়া শান্তিকে বলিল—শান্তি, ভাত চড়িয়ে দাও তাড়াতাড়ি, আমি আজই পলাশপুর যাবো। শান্তি নিজে ভাত রাঁধিয়া বিপিনকে দিত না, তবে হাঁড়ি চড়াইয়া দিত, বিপিন নামাইয়া লইত মাত্র। তরকারী রাঁধিবার সময়ে নিজে রান্না করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া দেখাইয়া দিত কি ভাবে কি রাঁধিতে হইবে।

শান্তি মন-মরাভাবে বলিল—আজই?

—হ্যাঁ, আজই যাই। বলে গেল কি না কাল—যাওয়া উচিত আজ। বাবার অন্নদাতা মনিব, বুঝলে না?

—আমাকে নিয়ে চলুন না সেখানে?

বিপিন অবাক হইয়া গেল। শান্তি বলে কি! সে কোথায় যাইবে?

শান্তি আবার বলিল—যাবেন নিয়ে? চলুন না ওঁদের বাড়ীঘর দেখে আসি—কখনো তো কিছু দেখিনি—থাকি পাড়াগাঁয়ে পড়ে।

—তা হয় না শান্তি, কে কি মনে করবে, বুঝলে না? আর তুমি চলে গেলে তোমার শ্বশুর কি করবেন?

—একদিনের জন্যে ও চালিয়ে নিতে পারবে এখন। ও সব কাজে মজবুত, আপনার মত অকেজো নয় তো কেউ।

—তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু কে কি ভাবতে পারে—গেলে গোপালকেও নিয়ে যেতে হয়। তা তো সম্ভব হচ্চে না, বুঝলে না?

শান্তি নিরুত্তর রহিল—কিন্তু বোঝা গেল সে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

বেলা তিনটার সময় শান্তির স্বামী ও শ্বশুরকে বলিয়া কহিয়া দুদিনের ছুটি লইয়া সে পলাশপুর রওনা হইল। যাইবার সময় শান্তি পান সাজিয়া একখানা ভিজা নেকড়ায় জড়াইয়া হাতে দিয়া বলিল—বড্ড রোদ্দুর, জলতেষ্টা পেলে মাঠের মধ্যে পান খাবেন। পরশু ঠিক চলে আসবেন কিন্তু। বাবা কখন কেমন থাকেন, আপনি না এলে মহা ভাবনায় পড়ে যাবো আমরা।

ষ্টেশনের পাশের সেগুণ বাগান ছাড়াইয়া সোজা মেটে রাস্তা উত্তরমুখে মাঠের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। এখনও রৌদ্রের খুব তেজ, যদিও বেলা চারটা বাজিতে চলিল। এই পথ বাহিয়া আজ পাঁচ বছর পূর্ব্বে বিপিন ধোপাখালির কাছারী বা মানীদের বাড়ী হইতে কতবার কাগজপত্র লইয়া রাণাঘাটে উকীলের বাড়ী মোকর্দ্দমা করিতে আসিয়াছে, এই পথের প্রতিটী বৃক্ষলতা তাহার সুপরিচিত—শুধু সুপরিচিত নয়, সেই সময়কার কত স্মৃতি, মানীর কত হাসির ভঙ্গি, কত আদরের কথা ইহাদের সঙ্গে জড়ানো। কত কত! সে সব কথা আজ ভাবিয়া লাভ কি?

বেলা পাঁচটার সময় সুন্দরপুরের বিশ্বাসদের বাড়ীর সামনে আসিতেই পথে হঠাৎ বিশ্বাসের বড় ছেলে মোহিতের সঙ্গে দেখা। মোহিত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—একি, নায়েব মশায় যে! এতদিন কোথায় ছিলেন? চলেচেন কোথায়? পলাশপুরেই? ও, তা আবার কি ওদের ষ্টেটে—অনাদিবাবু তো মারা গিয়েচেন—

বিপিন সংক্ষেপে বলিল, ষ্টেটে চাকুরী করিবার জন্য নয়, অনাদিবাবুর শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়াই সে পলাশপুর যাইতেছে—বর্ত্তমানে সে ডাক্তারী করে। মোহিত ছাড়ে না, বেলা পড়িয়াছে, একটু চা খাইয়া তবে যাইতে হইবে, পূর্ব্বে রাণাঘাট হইতে যাতায়াতের পথে তাহাদের বাড়ীতে বিপিনের কত পায়ের ধুলা পড়িত—ইত্যাদি।

অগত্যা কিছুক্ষণ বসিতে হইল। চাও খাইতে হইল।

কতকাল পরে আবার পলাশপুরের বাড়ীতে মানীর সঙ্গে দেখা হইবে। সেই বাহিরের ঘর, সেই দালান, সেই দালানের জানালাটী, যেখানটীতে মানী তাহার সহিত কথা বলিবার জন্য দাঁড়াইয়া থাকিত।

সন্ধ্যার পর সে অনাদিবাবুদের বাড়ীতে পৌঁছিয়া গেল। প্রথমেই বীরু হাড়ির সঙ্গে দেখা—সেই বীরু হাড়ি পাইক, যে ইহাদের ষ্টেটে এক হইয়াও বহু এবং বহু হইয়াও এক। তাহাকে দেখিয়া বীরু ছুটিয়া আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিল—নায়েব বাবু যে! কনে থেকে আলেন এখন?

—ভাল আছিস্ রে বীরু?

—আপনার ছিচরণ আশীর্ব্বাদে—তা যান্, মা ঠাকরোণের সঙ্গে একবার দেখাডা করে আসুন। বিপিন বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া প্রথমে অনাদিবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিল। তিনি বিপিনকে দেখিয়া চোখের জল ফেলিয়া অনেক পুরানো কথা পাড়িলেন। তাহার বাবা বিনোদবাবুর সময় ষ্টেটের অবস্থা

কি ছিল, আর এখন কি দাঁড়াইয়াছে, আয় বড়ই কমিয়া গিয়াছে, বর্ত্তমান নায়েবটীও বিশেষ কাজের লোক নয়, তাহার উপর কর্ত্তা মারা গেলেন। এখন যে জমিদারী কে দেখাশুনা করিবে তাহা ভাবিয়াই তিনি নাকি কাঠ হইয়া যাইতেছেন। পরিশেষে বলিলেন—তা তুমি এখন কি করছ বাবা ?

বিপিন এ প্রশ্নের উত্তর দিল। সে চারিদিকে চাহিতেছিল, সেই অতি সুপরিচিত ঘরদোর, আগেকার দিনের কত কথা স্বপ্নের মত মনে হয়—আবার সেই বাড়ীতে আসিয়া সে দাঁড়াইয়াছে—ওই সে জানালাটী—এসব যেন স্বপ্ন—সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা এখনও যেন শক্ত।

অনাদিবাবুর স্ত্রী বলিলেন—তা বাবা, কর্ত্তা নেই, আমি মেয়েমানুষ, আমার হাত পা আসচে না। তুমি বাড়ীর ছেলে, দেখ শোনো, যাতে যা হয় ব্যবস্থা করো। তোমাকে আর কি বলবো ?

—মা, ওপরের চাবিটা একবার দাও তো—সিন্দুক খুলে রূপোর বাটিগুলো—

বলিতে বলিতে মানী বারান্দা হইতে বাহিরে আসিয়া রোয়াকে পা দিতেই বিপিনকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। বিস্মিত মুখে বলিল—ওমা, বিপিনদা, কখন এলে ? এখন ? কিছু তো জানিনে—তা একবার আমাকে খোঁজ করে খবর পাঠাতে হয়—এসো, এসো, এসে বসো দালানে।

মানীর মা বলিলেন—হ্যাঁ, বসো বাবা। মানী সেদিন বলছিল রাণাঘাট ইষ্টিশানে তোমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়েছিল, তোমাকে আসতে বলেচে—আমি বল্লুম, তা একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এলি নে কেন ? কতদিন দেখিনি—

মানী বলিল—বোসো বিপিনদা, আমি একটু চা করে আনি—হেঁটে এলে এতটা পথ। কিছুক্ষণ পরে চা ও খাবার লইয়া মানী ফিরিল। বলিল—বিপিনদা, তোমায় এ বাড়ীতে আবার দেখে মনে হচ্চে, তুমি কোথাও যাওনি, আমাদের এখানেই যেন কাজ কর। পুরোনো দিন যেন ফিরে এসেচে—না ?

—সত্যি। বোস্ না এখানে মানী ? তোর দেওর কোথায় ?

মানী হাসিয়া বলিল—তবুও ভালো, পুরোনো দিনের মত ডাকচো। রাণাঘাট ইষ্টিশানে যে 'আপনি' আজ্ঞে সুরু করেছিলে ! আমার দেওরকে কলকাতায় পাঠিয়েচি চতুর্থীর শ্রাদ্ধের জিনিসপত্র কিনতে। এখানে না এসে এষ্টিমেট ঠিক না করে তো আগে থেকে জিনিসপত্র কিনে আনতে পারিনে ?

—সে কবে ?

—কাল রাত পোয়ালেই। ভালোই হয়েচে তুমি এসেচ। আমার কাজের দিন তোমাকে পেয়ে আমার সাহস হচ্চে। দেখবার কেউ নেই—তুমি দেখে শুনে যাতে ভালভাবে সব মেটে, নিন্দে না হয় তার ব্যবস্থা করো।

—তুই এখানে এসেছিলি আরও আমি চলে গেলে ?

—হুঁ—কতবার এসেচি গিয়েচি—

—আমার কথা মনে হোত ?

—বাপরে ! প্রথম যখন আসি তখন টিঁকতে পারিনে বাড়ীতে। সেই যে আমি রাগ করে

ওপরে গেলাম, তার পরেই সকালে উঠে দেখি তুমি রাণাঘাটে চলে গিয়েচ—আর কোনদিন দেখা হয়নি তারপর—সেই কথাই কেবল মনে পড়তো।

—আচ্ছা, কলকাতায় থাকলে আমার কথা মনে পড়ে?

—পড়ে না যে তা নয়। কিন্তু সত্যি বলতে গেলে কলকাতায় ভুলে থাকি পাঁচ কাজ নিয়ে। সেখানে তুমি কোনোদিন যাওনি, সেখানকার বাড়ীঘরের সঙ্গে যাদের যোগ বেশী, তাদের কথাই মনে হয়। কিন্তু এখানে এলে—বাপরে! আচ্ছা, চা খেয়ে একটু বাইরে গিয়ে দেখাশুনো কর, আমি এরপর তোমার সঙ্গে কথা বলবো আবার। এখন বড় ব্যস্ত—

রাত্রে বিপিন পুরানো দিনের মত রান্নাঘরে বসিয়া খাইল, পরিবেশন করিল মানী নিজে। আহারান্তে বাহির হইয়া আসিবার সময় বিপিন দেখিল, মানী কখন আসিয়া সেই জানালাটীতে দাঁড়াইয়াছে। হাসিমুখে বলিল—ও বিপিনদা।

সাধে কি বিপিনের মনে হয়, মানীর সঙ্গে তাহার পরিচিতা আর কোনো মেয়ের তুলনা হয় না; আর কোন মেয়ে তাহার মন বুঝিয়া এ রকম করিত? মানীর সঙ্গে ইহা লইয়া কোনো কথাই তো হয় নাই এপর্য্যন্ত। অথচ সে কি করিয়া বুঝিল, বিপিনের মন কি চায়!

বিপিন হাসিয়া জবাব দিল—ও মানী!

—মনে পড়ে?

—সব পড়ে।

—ঠিক?

—নিশ্চয়। নইলে কি করে বুঝলুম। বাবা, তুমি অন্তর্য্যামী মেয়েমানুষ। মানী জিব বাহির করিয়া দুই চোখ বুজিয়া মুখ ভ্যাঁঙ্গাইল।

—সত্যি মানী, তোর তুলনা নেই।

—সত্যি?

—নির্ভুল সত্যি।

—কখনো ভেবেছিলে বিপিনদা, এমন হবে আবার?

—স্বপ্নেও না। কিন্তু মানী, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে, কখন হবে?

—বাইরের ঘরে গিয়ে বোসো। আমি পান নিয়ে যাচ্চি।

একটু পরেই মানী বৈঠকখানায় ঢুকিয়া চৌকির উপর পানের ডিবাটি রাখিয়া কবাট ধরিয়া দাঁড়াইল। বলিল—তুমি এখন কি করচো, কোথায় আছ ভাল করে বল। সেদিন কিছুই শুনিনি। সেদিন কি আমার ওসব শোনবার মন ছিল বিপিনদা? কতকাল পরে দেখা বল তো?

বিপিন তাহার ডাক্তারী জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিয়া গেল। সোনাতনপুরের দত্তবাড়ীর কথা, শান্তির কথা, মনোরমাকে সাপে কামড়ানোর কথা।

রাত হইয়াছে। ইতিমধ্যে দুবার মানী বাড়ীর মধ্যে গেল মায়ের ডাকে, আবার ফিরিল। সব কথা শুনিয়া বলিল—বিপিনদা, তুমি আমার চিঠি একখানা পেয়েছিলে একবার?

—নিশ্চয়।

—ওই সময়টা আমার মন বড্ড খারাপ হয়েছিল পুরোনো কথা ভেবে। তাই চিঠিখানা লিখেছিলুম। আমার কথা ভাবতে? সত্যি বল তো—

—সর্ব্বদাই। বেশী করে একদিন মনে পড়েছিল, সে দিনটির কথা বলি।

তারপর জেয়ালা বল্লভপুরের বিলের ধারের সেই রাত্রির ব্যাপার বিপিন বলিল। মতি বাগদিনীর সর্ব্বত্যাগী প্রেমের কথা, তাহার অতীব দুঃখজনক মৃত্যুর কথা।

সব শুনিয়া মানী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—অদ্ভুত!

—তোকে বলবো বলে সেইদিনই ভেবেছি। তোর কথাই মনে হয়েছিল সকলের আগে সেদিন।

—আচ্ছা, কেন এমন হয় বিপিনদা? দুঃখের সময় কেন এমন করে মনে পড়ে? সত্যি বলচি, তবে শোনো। আমার খোকা যখন মারা গেল, এক বছর বয়েস হয়েছিল, আজ বাঁচলে তিন বছরেরটি হোত, রাত তিনটের সময় মারা গেল ভবানীপুরের বাড়ীতে। একশো কান্নাকাটির মধ্যে তোমার কথা মনে পড়লো কেন আমার?

—এ রোগের ওষুধ নেই মানী। কেন, কি বলবো!

—অথচ ভেবে ছাখো, সে সময় কি তোমার কথা মনে পড়বার সময়? তবে কেন মনে পড়লো?

তারপর দুজনেই চুপচাপ। নীরবতার ভাষা আরও গভীর হয়, নীরবতার বাণী অনেক কথা বলে। কিছুক্ষণ পরে বিপিন বলিল—কাল সকালে আমি চলে যাবো মানী। ডাক্তার লোক, রুগী ফেলে এসেচি।

—বেশ। আমি বাধা দেবো না।

—তুই আমায় মানুষ করে দিয়েছিস মানী।

—শুনে সুখী হলুম।

—জানিস মানী, ওই যে তোর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি এখান থেকে চলে যাবার পরে, সেই দুঃখটা মনের মধ্যে বড্ড ছিল। আজ আর তা রইল না। সুতরাং চলে যাই।

—না, যেও না বিপিনদা। বাবার চতুর্থীর শ্রাদ্ধটা আমি করচি, থেকে যাও। একটু দেখাশুনো করতে হবে তোমাকে।

—তবে থাকি। তুই যা বলবি।

—তোমার সঙ্গে সেদিন যে বউটিকে দেখলুম, ও তোমার সঙ্গে বেড়ায় কেন?

—বেড়ায় না মানী। সিনেমা দেখতে এসেছিল সেদিন, শ্বশুর অন্ধ, তার কাছে কে থাকে, তাই ওর স্বামী ছিল।

—মেয়েমানুষের চোখ এড়ানো বড় কঠিন বিপিনদা, ও মেয়েটি তোমায় ভালবাসে।

—কে বললে?

—নইলে কক্ষনো তোমার সঙ্গে সিনেমা দেখতে আসতে চাইত না পাড়াগাঁয়ের বউ। তোমার বয়েসও বেশী নয় কিছু। আসতে পারতো না।

—ও।

--আমার কথা শোনো। তোমার স্বভাবচরিত্র ভাল না, ওর সঙ্গে আর মিশো না বেশী।

বিপিন হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল—বেহ্মধম্মের লেকচার দিচ্চিস যে! পাদ্রি সায়েব!

মানীও হাসিয়া ফেলিল। পুনরায় গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—না, সত্যি বলচি, শোনো। ওকে কষ্ট দেবে কেন মিছিমিছি? ওর সঙ্গে মেলামেশা কোরো না। মেয়েমানুষ বড্ড কষ্ট পায়। মতি বাগদিনীর কথা ভাবো।

বিপিন বলিল—ধোপাখালিতে এক বুড়ী ছিল, সেও তোর সম্বন্ধে আমায় একথা বলেছিল।

--আমার সম্বন্ধে? কে বুড়ী? ওমা, সে কি! শুনিনি তো কক্ষনো?

বিপিন সংক্ষেপে কামিনীর কাহিনী বলিয়া গেল।

মানী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ঠিক বলেছিল বিপিনদা। এ কষ্ট সাধ করে কেউ যেন বরণ করে না। তবে কামিনী বুড়ী যখন বলেছিল, তখন আর উপায় ছিল কি?

—নাঃ।

—শান্তির সঙ্গে দেখাশুনো করবে না। সোনাতনপুর ওদের বাড়ী যদি ছাড়তে হয়, তাও করবে এজন্যে। বউদিদিকে নিয়ে যাও না? যেখানে থাকো সেখানে?

—বেশ। তুমি শান্তির বরের একটা চাকরী করে দাও না কলকাতায়? বড় ভাল ছেলেটি। শান্তির একটা উপায় করো অন্তত।

—চেষ্টা করবো। ওঁকে বলে দেখি—হয়ে যেতে পারে।

—জানিস মানী, শান্তির তোকে বড্ড ভাল লেগেছে। ও এখানে আসতে চাচ্ছিল।

—সে আমার জন্যে নয় বিপিনদা। সে তোমার জন্যে—তোমার সঙ্গ পাবে এই জন্যে। ওসব আর আমায় শেখাতে হবে না। আমি মনকে বোঝাচ্চি, তোমার সঙ্গে কাল শ্রাদ্ধের কথাবার্ত্তা বলতে এসেছি। কিন্তু তাই কি এসেচি? এতক্ষণ বসে তোমার সঙ্গে বক্ বক্ করচি কি সেইজন্যে।

পরদিন সকাল হইতে কাজকর্ম্মের খুব ভিড়। জমিদারের বড় মেয়ে বড়মানুষের বউ, খুব জাঁক করিয়াই চতুর্থীর শ্রাদ্ধ হইবে। বিপিন খাটিতে লাগিয়া গেল সকাল হইতেই। আশেপাশের অনেকগুলি গ্রামের ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত। লোকজনের কোলাহলে বাড়ী সরগরম হইয়া উঠিল।

মানী একবার বলিল—আহা, শান্তিকে আনলে হোত বিপিনদা! নিজে মুখ ফুটে বলেছিলো, আনলে না কেন? সব তোমার দোষ।

—না এনেই অত মুখনাড়া শুনলাম, আনলে কি আর রক্ষে ছিল?

—কীর্ত্তনের দল আনতে রাণাঘাটে গাড়ী যাচ্চে, তুমি গিয়ে ওই গাড়ীতে তাকে নিয়ে আসবে?

--সে উচিত হয় না, মানী। অন্ধ শ্বশুর দু দিন পড়ে থাকবে কার কাছে? থাক গে ওসব।

ধোপাখালির অনেক প্রজা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া সকলেই খুব খুসি। নরহরি দাসও আসিয়াছিল। সে বিপিনকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—নায়েববাবু যে! অনেক দিনির পর আপনার সঙ্গে দ্যাখা। ভাল আছেন? আপনি চলে যাবার পর ধোপাখালি অনুপায় হয়ে গিয়েচে বাবু! সবাই আপনার কথা বলে।

বিপিন তাহার কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিল। বলিল—হ্যাঁরে, তোদের গাঁয়ে ডাক্তারি চলে? আমি আজকাল ডাক্তারি করি কিনা?

নরহরি দাস বলিল—আসুন, এখ্‌খুনি আসুন বাবু। ডাক্তারের যে কি কষ্ট, তা তো নিজের চোখে তুমি দেখেই এসেচ। আপনারে পেলি লোকে আর কোথাও যাবে না। ওষুধ খেয়েই মরবে।

সারাদিন বিপিন বাহিরে কাজকর্ম্মের ভিড়ে ব্যস্ত রহিল। মানীর সঙ্গে দেখাশুনা হইল না। অনেক রাত্রে যখন কীর্ত্তন বসিয়াছে, তখন মানী আসিয়া বলিল—বিপিনদা, খাবে এসো, রান্নাঘরে জায়গা করেচি।

রান্নাঘরের দাওয়ায় মানী নিজের হাতে তাহার পাতে লুচি তরকারি পরিবেশন করিতে করিতে বলিল—আমি জানি তুমি সারাদিন খাওনি, পেট ভরে খাও এখন।

বিপিন বিস্মিত হইয়া বলিল—তুই কি করে জানলি?

—আমি সব জানি।

—সাধে কি বলি, অন্তর্য্যামী মেয়ে?

—নাও, এখন ভাল করে খাও দিকি। বাজে কথা রাখো। দই আর ক্ষীর নিয়ে আসি—তুমি ক্ষীর ভালবাসতে খুব।

আরও ঘণ্টা দুই পরে নিমন্ত্রিতাদের আহারের পর্ব্ব মিটিল। বাড়ী অনেক নিস্তব্ধ হইল। বাহিরের উঠানে কীর্ত্তনসভা ভঙ্গ হইল।

বিপিন মানীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া বলিল—মানী, কীর্ত্তনের দল গাড়ী করে রাণাঘাট যাচ্চে, আমি ওই সঙ্গে চলে যাই।

—তাই যাবে। বেশ যাও। যা কিন্তু বলে দিয়েচি, মনে থাকবে?

—নিশ্চয়। তুই যা বলবি, তাই করবো।

—শান্তির সঙ্গে আর মিশবে না, ও ছেলেমানুষ—তার ওপর অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। কেন ওকে কষ্ট দেবে?

—মানী, সে কথা আমিও ভেবেছিলুম বহুদিন আগেই। তবে চালাবার লোক না পাওয়া গেলে আমাদের মত লোকে সব সময় ঠিক পথে চলে না। এবার থেকে সে ভুল আর হবে না। আমি ভাবছি, ধোপাখালিতে যদি ডাক্তারী করি তবে কেমন হয়?

—সত্যি ভেবেছ বিপিনদা? খুব ভাল হয়। তুমি ওখানে নায়েব ছিলে, সবাই চেনে বেশ চলবে। ওদিক ছেড়ে দিয়ে এদিকে এসো।

—তোর সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে মানী।

মানী হাসিয়া বলিল—আর জন্মে। এ জন্মে যাদের ওপর যা কর্ত্তব্য আছে, করে যাই—বিপিনদা।

বিপিন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—বেশ, ভুল হবে না?

মানী হাসিতে হাসিতে বলিল, আবার ভুল? আমি নির্ব্বোধ, এ অপবাদ অন্তত তুমি আমায় দিওনা বিপিন দা। দাঁড়াও, প্রণামটা করি।

তারপর মানী গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া বলিল—আমার আর একটা কথা রেখো। যেখানেই থাকো, বৌদিদিকে নিয়ে এসো সেখানে। অমন করে কষ্ট দিও না সতীলক্ষ্মী মেয়েকে। যদি সাপের কামড়ে মারাই যেতেন, সে কষ্ট জীবনে কখনো দূর হোত ভেবেছ?

বিপিন বিদায় লইয়া গরুর গাড়ীতে উঠিতে যাইবে, মানী পিছন হইতে ডাকিল—শোনো বিপিনদা?

—কি রে?

—মানী কথা বলে না। বিপিন দেখিল, তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে।

—মানী! ছিঃ, লক্ষ্মীটি—আসি।

মানী তখনও কথা বলিল না। বিপিনও আধ মিনিট চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল মানীর সামনে। তারপরে মানী চোখ মুছিয়া বলিল—আচ্ছা, এসো বিপিনদা।

গরুর গাড়ী ছাড়িল। অনেকখানি রাস্তা—মেঠো নির্জ্জন পথ, কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদের মেটে জ্যোৎস্নায় পথের ধারের গ্রাম্য বাঁশবন, কচিৎ কোনো আমবাগান কিংবা বেগুন-পটলের ক্ষেত, আখের ক্ষেত অস্পষ্ট ও অদ্ভুত দেখাইতেছে। বিপিনের মনে অন্য কোনো জগতের অস্তিত্ব নাই—কোথায় সে চলিয়াছে—এই আনন্দ ও বিষাদের আলোছায়া-ঘেরা পথে কত দূর দূরান্তরের উদ্দেশ্যে তার যাত্রা যেন সীমাহীন লক্ষ্যহীন—সে চলার বিজন পথে না আছে শান্তি, না আছে মনোরমা। কেহ নাই, সেখানে সে একেবারে সম্পূর্ণ নিঃস্ব, সম্পূর্ণ একা। কিংবা যদি কেহ থাকে, মনের গহন গভীর গোপন তলায় যদি কেহ থাকে, ঘুমাইয়া থাকুক সে, গভীর সুষুপ্তির মধ্যে নিজেকে লুকাইয়া রাখুক সে।

রাণাঘাটে যখন গাড়ী পৌঁছিল, তখন বেশ রোদ উঠিয়াছে।

শান্তি তাহাকে দেখিয়া বলিল—একি চেহারা হয়েচে আপনার ডাক্তারবাবু? রাতে ঘুম হয়নি বুঝি? আর হবেই বা কি করে গরুর গাড়ীতে। নেয়ে ফেলুন, আমি ঠাণ্ডা জল তুলে দিই।

দুপুরবেলা বিপিন চুপ করিয়া শুইয়া আছে, শান্তি ঘরে ঢুকিয়া বলিল—ওবেলা চলুন আর একবার টকি ছবি দেখে আসি—আর তো চলে যাচ্চি দু তিন দিনের মধ্যে। হয়তো আর দেখা হবে না।

—গোপাল ছবি দেখেছিল?

—উঃ দুদিন। আপনি যেদিন যান, আর যেদিন আসেন।

—চল যাই।

শান্তি খুসি হইয়া সকালে সকালে সাজিয়া-গুজিয়া তৈয়ারী হইল। বিপিন বেলা তিনটার সময় তাহাকে লইয়া বাহির হইল, কারণ বিপিনের ইচ্ছা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সে শান্তিকে বাসায় ফিরাইয়া আনিবে, নতুবা শান্তির শ্বশুরের খাওয়া-দাওয়ার বড় অসুবিধা হয়।

ছবি দেখিতে বসিয়া শান্তি অত্যন্ত খুসি। আজকার ছবিতে ভাল গান ছিল, সে ওধরণের গান কখনো শোনে নাই—মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল।

ইণ্টারভ্যালের সময়ে বলিল—চলুন বাইরে, চা খাবেন না?

তাহার ধারণা ছবিতে যাহারা আসে, তাহাদের চা খাইতেই হয় এবং চা খাওয়ার জন্য ছুটি দেওয়া হইয়াছে। শান্তি আবদারের সুরে বলিল—আমি কিন্তু পয়সা দেবো আজও।

বিপিন হাসিয়া বলিল—পয়সা ছড়াবার ইচ্ছে হয়েচে? বেশ, ছড়াও—

শান্তি লজ্জিত হইল দেখিয়া বিপিন বলিল—না না, কিছু মনে কোরো না শান্তি। এমনি বল্লুম। আমি তোমাকে কিন্তু কোনো একটা জিনিস খাওয়াবো—কি খাবে বল?

শান্তি বালিকার মত আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ওই যে কাঁচের বোয়েমে রয়েচে—ওকে কি বলে—কেক্?...বেশ ওই কেক্ নিন তবে—আপনার জন্যেও নিন্—

সিনেমার পরে শান্তি বলিল—চলুন, একটু ইষ্টিশানে বেড়িয়ে যাই—আর তো দেখতে পাবো না ওসব—চলে যাচ্চি পরশু।

ডাউন প্ল্যাটফর্মে একখানা বেঞ্চির উপরে নিজে বসিয়া বলিল—বসুন এখানে।

বিপিন বসিল।

—একটা সিগারেটের বাক্স কিনে আনুন, আমি পয়সা দিচ্চি।

—না, তুমি কেন দেবে?

—আপনার পায়ে পড়ি—কটা আর পয়সা, দিই না কিনে।

সে এমন মিনতির সুরে বলিল যে, বিপিন তাহার অনুরোধ ঠেলিতে পারিল না। সিগারেট টানিতে টানিতে বিপিন শান্তির নানা প্রশ্নের জবাব দিতে লাগিল—এ লাইন কোথায় গিয়াছে, ও লাইন কোথায় গিয়াছে, সিগ্ন্যালে লাল আলো সবুজ আলো কেন, কি করিয়া আলো বদলায় ইত্যাদি। আধঘণ্টা বসিবার পরে বিপিন বলিল—চল আমরা যাই—দেরি হয়ে গেল।

—বসুন না আর একটু—আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস্ করি—

—কি?

—আমার জন্যে আপনার মন কেমন করে একটুও?

বিপিন বড় মুস্কিলে পড়িল। এ কথার জবাব কি ধরণের দেওয়া যায়। শান্তি আরও কয়েকবার এভাবের প্রশ্ন করিয়াছে ইতিপূর্ব্বে।

সে ইতস্তত করিয়া বলিল—তা করে বই কি—বিদেশে থাকি, তোমার মত যত্ন—

—ওসব বাজে কথা। ঠিক কথার জবাব দিন তো দিন—নইলে থাক্।

—এ কথা কেন শান্তি?

—আছে দরকার।

—করে বই কি।

—ঠিক বলছেন?

—ঠিক।

শান্তি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—চলুন, যাই। রাত হয়ে যাচ্চে।

বাসায় ফিরিয়া আহারাদির পরে অনেক রাত্রে বিপিন শুইল।

মাঝরাতে একবার কিসের শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিল।—বাহিরের রোয়াকে কিসের শব্দ হইতেছে। বিপিন জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, শান্তি রোয়াকের পৈঠায় বাঁশের

আলনার খুঁটি হেলান দিয়া একা বসিয়া আছে; এবং শুধু বসিয়া আছে নয়, বিপিনের মনে হইল, সে হাপুস্‌নয়নে কাঁদিতেছে—কারণ রোয়াকের পৈঠা বিপিনের ঘরের জানালার ঠিক কোণাকুণি।

বিপিন নিঃশব্দে জানালা হইতে সরিয়া গেল। শান্তি কেন কাঁদে এত রাত্রে? তাহাকে কি দোর খুলিয়া ডাকিয়া শান্ত করিবে? তাহাতে শান্তি লজ্জা পাইবে হয়তো। যে লুকাইয়া কাঁদিতে চায়, তাহাকে প্রকাশের লজ্জা দেওয়া কেন?

বিপিনের আর ঘুম হইল না।

হয়তো ভোরের দিকে একটু তন্দ্রা আসিয়া থাকিবে, গোপালের ডাকে তাহার ঘুম ভাঙিল। শান্তি চা লইয়া আসিল, সে সদ্য স্নান করিয়াছে, পিঠের উপর ভিজা চুলটি এলানো, মুখে চোখে রাত্রি-জাগরণের কোনো চিহ্ন নাই। হাসিমুখে বলিল—উঃ, এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুম? কতক্ষণ থেকে থেকে শেষে ওকে বললুম ডেকে দিতে। চা খায় আর কত বেলায় মানুষ!

অদ্ভুত মেয়ে বটে শান্তি। বিপিনের মন দুঃখ, সহানুভূতি ও স্নেহে পূর্ণ হইয়া গেল। সে বুঝিয়া ফেলিয়াছে অনেক কথা।

শান্তিকে আর সে দেখা দিবে না। এইবারই শেষ।

মানী বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে ঠিকই বলিয়াছিল।

ডাক্তারী চলুক না চলুক, সোনাতনপুরের নিকট হইতে তাহাকে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। হয় ধোপাখালি, নয় যে কোন স্থানে—কিন্তু সোনাতনপুরে বা পিপলিপাড়ায় আর নয়। মানীর কথা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবে।

পরদিন দুপুরের পর সকলে দুইখানি গরুর গাড়ীতে করিয়া রাণাঘাট হইতে রওনা হইয়া গ্রামের দিকে ফিরিল। কাপাসপুকুরের মধ্য দিয়া পুর্ব্ব দিকে তাহাদের নিজেদের গ্রামের পথ বাহির হইয়া গিয়াছে—রাণাঘাট হইতে ক্রোশ চার পাঁচ দূরে। এই পর্য্যন্ত আসিয়া বিপিন বলিল—আপনারা যান তবে, আমি অনেকদিন বাড়ী যাই নি, একবার বাড়ী হয়ে যাবো। সামান্য পথ, হেঁটে যাবো।

শান্তি বলিল—কেন ডাক্তারবাবু? আমাদের ওখানে আসুন আজ। তারপর না হয় কাল বাড়ী আসবেন?

বিপিন রাজি হইল না। বাড়ীর সংবাদ না পাইয়া মন খারাপ আছে, বাড়ী যাইতে হইবেই। বিপিন বুঝিল, শান্তি দুঃখিত হইল।

কিন্তু উপায় নাই, শান্তিকে বড় দুঃখ হইতে বাঁচাইবার জন্য এ দুঃখ তাহাকে দিতে হইবেই যে।

শান্তি গাড়ী হইতে নামিয়া বিপিনকে প্রণাম করিল, গোপালও করিল—উহাদের বংশের নিয়ম, ব্রাহ্মণের উপর যথেষ্ট ভক্তি চিরদিন।

একটা বড় পুষ্পিত শিমুলগাছতলায় গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে, শান্তি গাছের গুঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছে, গোপাল বৃদ্ধ বাপের হাত ধরিয়া নামাইয়া বিপিনের পরিত্যক্ত গাড়ীখানায় উঠাইতেছে—ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষত শান্তির সম্বন্ধে এই ছবিই বিপিনের স্মৃতিপটের বড় উজ্জ্বল, বড় স্পষ্ট, বড় করুণ ছবি। সেইজন্য ছবিটা অনেকদিন তাহার মনে ছিল।

অভিনয়

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

অনেক খুঁজিয়া, "অভিনয়" ফিল্ম্‌টি সুটিং করিবার উপযুক্ত, আমাদের ডিরেক্টার ভাস্করেস্কির মনের মতন বৃহৎ বাগান-বাড়ী পাওয়া গেল।

তখন বাংলাদেশে সিনেমা-শিল্পের অরুণোদয়। সিনেমার ব্যবসাদারি লিমেটেড-কোম্পানীর জালে বঙ্গদেশ ছাইয়া যায় নাই। আমরা কয়েকজন বেকার যুবক "বঙ্গীয় সিনেমা সিন্‌ডিকেট" নাম দিয়া সুফলা বাংলার চিত্তভূমিতে পশ্চিমের এ নূতন আর্টের যে কলম পুঁতিয়াছিলাম, সে তরুণতরু কোন ফল প্রসব না করিয়া কি করিয়া মরিয়া গেল, সেই ইতিহাসটি আজ বলি।

আমাদের এ প্রচেষ্টা ব্যবসায় ছিল না। কাহারও অর্থলাভ ত হয় নাই। আমাদের পৃষ্ঠপোষক লক্ষপতি রামহরি দত্তের তরুণ উত্তরাধিকারী শোভেন্দ্রলাল শোভাবাজারে তাহার যে বাড়ীখানি মর্টগেজ দিয়াছিল, সে-টি শেষ পর্য্যন্ত বিক্রি করিতে হইয়াছিল। টাকা খরচের কোন হিসাব রাখা হয় নাই। সেজন্য টাকার কত অংশ ফিল্‌ম্‌ বিক্রেতাকে দিতে হইয়াছিল ও কত অংশ মদ্যবিক্রেতা, অলঙ্কারবিক্রেতা ও ট্যাক্সিওয়ালাদের বিল চুকাইতে গিয়াছিল, তাহা বলিতে পারিতেছি না।

যদি শুনিয়া থাকেন, যে, বঙ্গরঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী সুরসুন্দরীর উপযুক্ত আদর না হওয়ায় ও কোন নাটকে প্রধানার পার্ট না পাওয়ায়, নূতন সিনেমা-আর্টে সুরসুন্দরীর অভিনয়-প্রতিভার পরিস্ফুরণের জন্য শোভেন্দ্রলাল এই উদ্যোগ করিয়াছিল, তাহা হইলে ভুল শুনিয়াছেন। ইহা সখের বা আমোদের ব্যাপার ছিল না। দুইবার বি. এ-ফেল প্যারিস-প্রত্যাগত রূপকার ভাস্কর সেন, এই কথা আমাদের বার বার বলিত, এ সখ নয়, এ সহজ নয়, কঠিন সাধনার দরকার; শিল্প-প্রাণ বাঙ্গালী জাতির অভিনব সিনেমা-আর্ট সাধনার ক্ষেত্র হইবে বঙ্গীয় সিনেমা সিন্‌ডিকেট, বাঙ্গালীর বিশেষ প্রতিভার প্রকাশ হইবে এইখানে।

ভাস্কর সেন আমাদের ডিরেক্টর। আমরা তাহার নাম দিয়াছিলাম ভাস্করেস্কি। প্যারিসে থাকিবার সময় ভাস্করের সঙ্গে মস্কো আর্ট থিয়েটারের সুবিখ্যাত ডিরেক্টর ষ্টেনিস্‌লভেস্কির আলাপ হইয়াছিল। ষ্টেনিস্‌লভেস্কির সঙ্গে পরিচয়ে সে অভিনয়-কলার এক নূতন আলো দেখিতে পাইল। শেকভের "চেরি অর্চাড" নাটক অভিনয়ে ষ্টেনিসলভেস্কি যে নব অভিনয়-রীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন বঙ্গদেশে সিনেমাতে সেই নব বাস্তবতার প্রবর্ত্তক হইলেন ভাস্কর সেন। "চেরি অর্চাড" অভিনয়ের পূর্ব্বে ষ্টেনিস্‌লভেস্কি নাকি নাটক-বর্ণিত গ্রামের বাড়ীর মত এক বাড়ীতে সকল অভিনেতা অভিনেত্রীদের অনেক দিন রাখিয়া নাটকের রিহার্স্যল দিয়াছিলেন। নাটক-বর্ণিত স্থানে বাস করিলে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকের মধ্যে যে মানসিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হইবে, তাহাতে অভিনয় বাস্তব, স্বাভাবিক হইয়া উঠিবে। ভাস্করেস্কির কথায় "spirit of the play" বুঝিতে হইলে, বাস্তব অভিনয়ে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে হইলে, পারিপার্শ্বিকও বাস্তব হওয়া দরকার। নাটক বা গল্পের যে স্থান, সেই পরিবেষ্টনে বাস করিলে অভিনেতারা নিজেদের সত্তা ভুলিয়া গিয়া নাটক-বর্ণিত নানা চরিত্রের বিচিত্র অস্তিত্বধারায় নবজন্মলাভ করিবে।

এই নব অভিনয়-রীতি অনুসারে "অভিনয়" ফিল্মটি তুলিবার জন্য আমাদের যেরূপ বাগান-বাড়ীতে গিয়া বাস করা উচিত, সেরূপ বাড়ী কলিকাতার নিকট কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ভাগ্যক্রমে, আমাদের এক উকীল-বন্ধু এক বাড়ীর সন্ধান দিল। পাওনাদারদের পক্ষ হইতে সে সেই বাগান-বাড়ীর রিসিভার হইয়াছে। গড়িয়াহাট রোডের কাছে গড়ে খালের নিকট কোন সুবিখ্যাত সুপ্রাচীন জমিদার-বংশের সুবৃহৎ প্রমোদ-প্রাসাদ, অর্দ্ধভগ্ন, জঙ্গলসঙ্কুল, বহু উন্মত্তপ্রমোদস্মৃতিবিজড়িত। বাড়ীটির ইতিহাস শুনিয়া ভাস্করেস্কি উৎসাহিত হইয়া বলিল—ঠিক, এই জিনিষ আমি খুঁজছিলুম।

তোরণ দ্বারে ধ্বংসস্তূপের পার্শ্ব দিয়া আমাদের ট্যাক্সি যখন সশব্দে বাড়ীর বৃহৎ বাগানের পথে প্রবেশ করিল,

অপূর্ব্ব স্তব্ধতার ঘনজাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। মজা দীঘি, শেওলা-ভরা পুকুর, ঘন আগাছাভরা বাগান; বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে মুর্শিদাবাদের নবাব বাড়ীর অনুকরণে তৈরি সুবৃহৎ প্রমোদ-প্রাসাদের ভাঙা দেওয়াল, অর্দ্ধেক খসিয়া পড়া দরজা জানলা, আগাছা-ভরা থামের সারি। ভাস্করেস্কি মুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল,—বা চমৎকার! "অভিনয়" ফিল্মের জন্য এইরূপ পরিবেষ্টনী ত চাই।

সুরসুন্দরী ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, বাবা! এ কোন ভুতুড়ে বাড়ীতে আনলে, আমি ওর মধ্যে থাকতে পারব না বলে দিচ্ছি।

এক সময় আদিগঙ্গার পুণ্য নির্ম্মল ধারা এ বাড়ীর পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইত। এখন সে নদী মজিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে বদ্ধ পঙ্কিল জলায় তাহার লুপ্ত স্রোতের চিহ্নপথ দেখিতে পাওয়া যায়। তেমনি এ প্রাসাদে যে যৌবন-মদমত্ত সুখ-তরঙ্গিনী উচ্ছ্বসিত উল্লাসে প্রবাহিত হইত সে ফেনিল স্রোত কালধারার অতলতায় লুপ্ত।

দরওয়ান আসিয়া একতলার ঘরের বড় দরজা খুলিয়া দিতে অন্ধকার স্যেঁতস্যেঁতে ঘরগুলি হইতে একটা দম-আটকানো পচা গন্ধ বাহির হইল ও অন্ধকার-নিবাসী কতকগুলি কালো পাখী উড়িয়া চলিয়া গেল।

উকীল রিসিভারটি বলিল, নীচের কোন ঘরে ঢুকবেন না, বিপদ হতে পারে, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসুন।

চওড়া কাঠের পুরাতন সিঁড়ি আমাদের পদভরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। বুঝি ভাঙিয়া পড়ে।

দোতালায় উঠিয়া আমরা চমৎকৃত হইলাম। পূর্ব্বদিকের মহলে এক বৃহৎ হল ঘরে গিয়া রিসিভারটি হাসিয়া বলিল, কেমন দেখছেন? এই বাড়ীর মধ্যে এমন সুন্দর সুসজ্জিত চিত্রিত ঘর আছে স্বপ্নেও ভাবতে পারেন কি?

মেজেতে নানাবর্ণের মার্ব্বেলের ওপর মোটা পারস্য কার্পেট পাতা। আমরা একটু জোরে চলিতে খানিকটা ধূলা উড়িয়া গেল। সকলে চুপ করিয়া দাঁড়াইলাম। পঙ্কের-কাজ-করা দেওয়ালে নগ্না সুন্দরীদের তৈলচিত্র ও গিল্টিকরা চওড়া ফ্রেমে বাঁধান বড় আয়নার সারি মার্ব্বেলের ব্রাকেটে সাজান। মাঝে মাঝে ইতালীয়ান মার্ব্বেলে তৈরী অর্দ্ধবিবসনা নারীমূর্ত্তি, কাহারও হাতে প্রদীপ কাহারও হাতে ফুলের মালা। ছাদ হইতে বড় বড় ঝাড় ঝুলিতেছে কিন্তু, ঝাড়-লণ্ঠন ঘিরিয়া, তৈলচিত্রগুলির ওপর, প্রস্তর মূর্ত্তিগুলির ভগ্নহস্তে, কোথাও মাকড়সা জাল বুনিয়াছে, কোথাও আরসলা নির্ভয়ে বেড়াইতেছে, কোথাও ধূলিস্তরে পোকা।

উকীল রিসিভারটির নিকট জানা গেল, মনসা-পোতার জমিদার-বংশের শেষ বংশধর প্রবীর রায় চৌধুরী মাঝে মাঝে বাড়ির এই মহলে আসিয়া থাকিতেন, প্রাসাদের অন্য অংশ স্তব্ধ অন্ধকারময় আর রাতের পর রাত এই গৃহে প্রমোদের প্রদীপ জ্বলিত, মদের পেয়ালা উল্টাইয়া ভাঙিয়া যাইত; ঝাড় লণ্ঠেনের আলোক নর্ত্তকীদের স্বর্ণালঙ্কারে প্রবীর রায়ের ছয় আংটির হীরকে ঝক ঝক করিত। জমিদারী, কলিকাতার বাড়ী সব যখন বিক্রি হইয়া গেল পাওনাদারদের তাগাদায় বিরক্ত হইয়া তিনি এই নির্জ্জন প্রাসাদে আশ্রয় লইয়াছিলেন, কলিকাতার বাড়ী হইতে কিছু কার্পেট তৈলচিত্র, ইতালীয়ান ভাস্করগঠিত নরনারীমূর্ত্তি আস্‌বাব্‌পত্র ইত্যাদি সরাইয়া তিনি এই মহলটি সুসজ্জিত করিয়াছিলেন।

ভাস্কর সেন উৎসাহের সহিত বলিল, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ রিসিভার-মশাই; আমি ঠিক এইরকম জায়গা, এইরকম বাড়ী ঘর চাইছিলুম। এ বাগানে এ ঘরে সাত দিন থাকলেই এই পরিবেষ্টনের প্রভাবে আমাদের সত্তার নবরূপ হবে, আমাদের অভিনয় সত্য, বাস্তব হয়ে উঠবে।

রিসিভারটি সবিস্ময়ে বলিল, আপনারা কি এখানে থাকতে চান নাকি? থাকবার দরকার কি হচ্ছে?

আমি বল্লুম, আপনি ত বল্লেন দরকার কি হচ্ছে, ফিল্মের গল্পের বাড়ীর সঙ্গে ত বাড়ীর মিল হয়ে গেছে, এ বাড়ীতে না থাকলে—

তিনি বাধা দিয়ে বললেন, কেন স্টেশন তো কাছে, ট্রেণও অনেক আছে, আপনারা কল্‌কাতা হতেই রোজ যাতায়াত করতে পারেন। সেই-টাই যুক্তিযুক্ত।

—তাহলে spirit of the play কি করে ধরছি বলুন?

—spirit কি বলছেন, আপনারা কি ভূত নামাবেন নাকি? তা এ পুরানো বাড়ীতে দু একটা ভূত নিশ্চয় আছে।

লাল সালুর ঘেরাটোপ-পরান এক চতুর্দ্দশ লুই চেয়ারে

বসিয়া পড়িয়া শোভেন্দ্রলাল বলিল, এখন spiritএর বোতলটা আন দেখি, তা না হলে বাড়ীর ভূত তো ঘাড়ে চাপবে দেখছি।

ভাস্কর গম্ভীর ভাবে বলিল, দেখ, যেখানে প্রবীর রায় চৌধুরী থাকতে পারত, তোমরা সেখানে থাকতে পারবে না? আমিত গোড়ায় তোমাদের বলেছিলুম, অভিনয় আর্টের সাধনা বড় সহজ নয়।

আমি উৎসুকভাবে বলিলাম, আচ্ছা প্রবীর রায় এখন কোথায়?

রিসিভার উকীলটি বলিল, প্রবীর রায়! কোথায় তিনি জানলে তো মশাই এখন তিন হাজার টাকা লাভ করতুম। তিনি দেউলিয়ে নিরুদ্দেশ, খুনের আসামী!

—খুনের?

—হাঁ, এই ঘরে খুন হয়েছিল। বা! কম্‌লা বাইজীর খুনের কথা আপনি শোনেন নি? তাঁর প্রণয়িণী যখন তাঁকে প্রতারণা করলে—

শোভেন্দ্রলাল গেলাসে সোড়া ঢালিতে ঢালিতে বলিল, মশাই, বাড়ীটা দেখতেই যথেষ্ট ভয়ানক, আর খুনের গল্পটা নাই করলেন। আমি বলিলাম, কিন্তু আমার ফিল্মের গল্পের সঙ্গে যে বড্ড মিল হয়ে যাচ্ছে।

ফিল্মের গল্পটি আমার লেখা। তখন ইংলণ্ডে রুস গল্প-লেখক শেকভের খুব নাম হইয়াছে। যাহারা আমার পেছনে বলিত, আমি শেকভের গল্পের প্লট চুরি করিয়া গল্প লিখি, তাহারা সম্মুখে আমাকে প্রশংসা করিত, তোমার গল্প লেখার আর্ট রুস গল্পলেখকদের ন্যায়। নূতন ধরণের গল্প লিখি বলিয়া সাহিত্য-সমাজে আমার খুব নাম হইয়াছে। সেজন্য গল্প লেখার ভার আমার ওপর পড়িয়াছিল।

কিন্তু আমার গল্পের কাঠামো ভাস্করেস্কির সিনেরিয়োর মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত।

ভাস্কর বলিল, বুঝলে কি না পুরঞ্জয়, আরও রং দিতে হবে, প্রতিদিনের বৈচিত্র্যহীন জীবনের চিত্র নয়, আরব্যোপন্যাসের রাজ্যে নিয়ে যেতে হবে। এ ত তোমার সোফায় বসে বা বিছানায় শুয়ে গল্প পড়া নয়। ভাবো অন্ধকার শুব্ধ ঘরে তোমার চোখের সামনে কাঁপছে আলো ভরা সাদা পর্দ্দা, সেই রূপালি পর্দ্দায় নানা সাজের নানা মূর্ত্তির ব্যঞ্জনাময় অঙ্গভঙ্গী—নানা অঙ্গভঙ্গীর সাদাকালোয় স্রোত অবিরাম বয়ে চলেছে—এখানে কিছু অসম্ভব বলে মনে হয় না—অসম্ভবকেই চাই। প্রতিদিনের সহজ সরল বাস্তব জীবন দেখবার জন্যে ত কেউ রৌদ্রালোকিত জনকল্লোলপূর্ণ প্রশস্ত রাজপথ হতে এই শুব্ধ অন্ধকার ঘরে পয়সা দিয়ে প্রবেশ করবে না। দর্শক চায় অবাস্তবকে অসম্ভবকে রূপকথাকে, আপনার অন্তরের স্বপ্ন, গোপন কামনাকে সজীব সরূপ দেখতে—তোমার গল্পটির সেজন্য একটু অদল বদল করেছি।

আমি লিখেছিলুম, এক বড়লোকের ছেলে মানুষ হয়েছিল কৃপণতার মধ্যে; প্রচুর ধনৈশ্বর্য্যের মধ্যে তাকে থাকতে হত দরিদ্রের মত। তারপর যখন সে ধনের অধিকারী হল, সে মেতে উঠল ভোগবিলাসে, দু' তিন বছরের মধ্যে পাচ ছ' লাখ টাকা উড়িয়ে দিল, আমোদ-প্রমোদে, নানা নিরুদ্ধ কামনার চরিতার্থতায়। তারপর সে দেউলিয়ে হয়ে আবার ফিরে এল তার দরিদ্রজীবন-প্রণালীতে। যেমন সে পূর্ব্বে ছিল।

ভাস্কর বলিল, দেখ পুরঞ্জয়, শুধু বড় লোকের ছেলে বললে হবে না, ও হবে অভিজাত কোন জমিদার বংশের—আকবরের আমল হতে তাদের বৃহৎ জমিদারী। আর চার পাঁচ লাখ টাকা ওড়ান খুব বেশী কথা নয়। বুঝেছি, তুমি বলবে, এই নির্জ্জীব, প্রাণ-হীন যৌবনধর্ম্মশূন্য বাংলায় যৌবনমদিরায় মত্ত হয়ে চার পাঁচ লাখ ওড়ানই যথেষ্ট। না, ও সংখ্যা আরও বড় করতে হবে, তিন দশে ত্রিশ লাখ তিন ত্রিশে নব্বই লাখ, বুঝলে। ভাবতে পারো, যৌবনে ভোগ সুখের জন্য গোলকুণ্ডার নবাব বা কৌশম্বীর মহারাজা তাদের রাজ্য মর্টগেজ দিল। তাদের বহুবংশ সঞ্চিত ধনাগার উড়িয়ে দিল। কল্পনা চাই, কল্পনা!

আমি বলিলাম, দেখ ভাস্কর, অতই যদি করলে ত শেষের থ্রিলটা বাদ যায় কেন—হত্যা একটা দিয়ে দাও—তবে আত্মহত্যা চলবে না—

ভাস্কর হাসিয়া বলিল—স্বীয় প্রণয়িণীকে হত্যা করে নিরুদ্দেশ—কি বল—

আমি বলিলাম, চমৎকার, প্রেমের প্রবঞ্চনার জন্য প্রতিহিংসা প্রণোদিত হয়ে প্রেয়সীকে হত্যা করা—

সেক্সপিয়ারের নজীর রয়েছে—তারপর নিরুদ্দেশ—শেষের মধ্যে অশেষ—ভাল হবে।

ভাস্করেস্কির সিনারিয়োতে উন্মত্ত কল্পনার জালে বদ্ধ আমার মূল গল্পটির প্রাণ ছটফট করিলেও, "অভিনয়" ফিল্মের গল্প-লেখক রূপে আমি সুপরিচিত হইয়া উঠিলাম।

লোকটি প্রথম দিন আমাদের ছবি তোলা দেখিল বিস্ময়মুগ্ধ নেত্রে, ছোট ছেলে যেমন করিয়া সার্কেসে বাঘের খেলা দেখে।

দ্বিতীয় দিন সে একেবারে ক্যামেরার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

ব্যাপারটি এইরূপ :

আমাদের প্রধান অভিনেতা হারাণ মিত্তির প্রথম দিন অভিনয় করিয়াই জ্বরে পড়িল। আবেষ্টনীর প্রভাব তাহার মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বর রূপে পরিস্ফুট হওয়াতে সকলে দমিয়া গেল। তাহার শ্যালক আসিয়া তাহাকে কলিকাতায় লইয়া গেল। খবর পাওয়া গেল, তাহার পত্নী পিত্রালয় হইতে তাহার সেবার জন্য আসিতেছেন। সুতরাং সারিয়াও তাহার ফিরিয়া আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই।

সে ছিল ভাস্করের প্রিয় অভিনেতা। স্থানীয় আবহাওয়ার প্রভাব তাহার মনে সঞ্চারিত না হইয়া দেহের ওপর হওয়াতে মুস্কিল হইল। শোভেন্দ্রলাল বলিল, পার্টটা আমিই তাহলে করি।

গল্পের প্রধান নায়কের পার্টটা অভিনয় করিতে, প্রথম হইতেই তাহার ইচ্ছা। এখন সুযোগ পাইয়া সে পার্টটি দাবী করিল। ইহার মধ্যে সে দশ হাজার টাকা খরচ করিয়াছে। সুতরাং দাবী তাহার আছে।

কিন্তু প্রধানা অভিনেত্রী সুরসুন্দরী আপত্তি জানাইল। শোভন্দ্রলালের প্রণয়ের অভিনয় সে সহ্য করিতে পারিবে না। বোধ হয়, জীবনে যাহাকে প্রণয়ীরূপে পাইয়াছে তাহার সহিত প্রণয়ের অভিনয় করিবার মত অভিনয়-নৈপুণ্য তাহার ছিল না।

সুরসুন্দরী গাল ফোলাইয়া বলিল,—তোমার সঙ্গে এ্যক্ট—না বাপু—তা হলে আমাকে বাদ দিন ডিরেক্টর মশাই—

—কেন আমি অভিনয় করতে পারি না?

—আর আমি যদি হঠাৎ হেসে ফেলি—আমি জানি না।

—না, না, তাহলে চলবে না, ফিল্‌মের দাম অনেক, বাজে নষ্ট করতে পারব না—

—সেইজন্যেই তো বলছি। উনি যখন তা—তা—তা—তা তাহলে বলে আরম্ভ করবেন—আর ওর দিকে চেয়ে ওই সব অভিনয় আমি করতে পারব না, আমার মনে পড়ে যাবে—

—কি মনে পড়বে, আমাদের জানাবার দরকার নেই। মোট কথা, আপনি ওর সঙ্গে অভিনয় করতে নারাজ।

এমন সময় লোকটি ক্যামেরার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

দীর্ঘদেহ,—কোঁকড়ানো লম্বা চুল শুকনো, উন্নত নাসিকার দুই পার্শ্বে চক্ষু দুইটি অস্বাভাবিক জ্বলজ্বল করিতেছে! এক সময় লোকটি যে অত্যন্ত সুপুরুষ ছিল, তাহার দেহের গঠন, ম্লান শোভায়, বোঝা যায়। কাচা সোনার রং তামাটে হইয়া গিয়াছে, মুখ শুষ্ক, শীর্ণ কিন্তু তেজঃপূর্ণ ছাই-রঙের এক শালে দেহ আবৃত। কোন পরিচিত ধনীর দেহে এই কাজ করা শাল দেখিলে অত্যন্ত মহার্ঘ্য মনে হইত কিন্তু এই অপরিচিত পথচারীর মলিন পাঞ্জাবীর ওপর ধূলিভরা শাল দেখিলে বহুমূল্য কাশ্মিরী শালের শস্তা অনুকরণ বলিয়া বোধ হয়।

লোকটি ক্যামেরার অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুরসুন্দরীর বিদ্রূপে শোভেন্দ্রলাল ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। লোকটিকে ক্যামেরার সমুখে দেখিয়া চিৎকার করিয়া বলিল, কি চান মশাই?

লোকটি গম্ভীরভাবে বলিল, আপনাদের এ্যক্টর নাই শুনছি, আমি এ্যক্টিং করে দিতে পারি।

—বা, এ্যক্টিং করতে পারেন! তা-তা-তা-

সুরসুন্দরী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—দেখলেত, উনি করবেন যেন্ পার্ট!

শোভেন্দ্রলাল খিঁচাইয়া উঠিল—না উনি করবেন!

ভাস্কর ডিরেক্টরের কণ্ঠে বলিল—সাইলেন্স!

স্থির দৃষ্টিতে সে অজানা লোকটির দিকে চাহিয়া রহিল। কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করিল না।

ধীরে সে বলল, শুনুন মশাই, আপনি কি এ্যক্ট করবেন?

—আমি অনেক এ্যক্‌টিং করেছি।

—সে বোধ হয় থিয়েটারে, এ থিয়েটার নয়, এ হচ্ছে সিনেমা, নতুন আর্ট।

—শুধু থিয়েটারে নয়, জীবনেও অনেক এ্যাক্টিং করেছি; তা এ নতুন ধরণের এ্যাক্টিং দেখে আবার করতে ইচ্ছে করছে।

—বা, বেশ। কিন্তু এ ত কথা নয়। এ ছবি। আপনার কণ্ঠস্বর, বলার ভঙ্গী সুন্দর, কিন্তু এ ছবি, অঙ্গভঙ্গী দিয়ে প্রকাশ করতে হবে মনের ভাব।

—বা, কথা না বলে এ্যাক্টিং হয় কি করে? আমি কথা বলব, অঙ্গভঙ্গীও করব, আপনি আমার অঙ্গভঙ্গীর ছবি তুলে নিন।

—আচ্ছা, মোসন্ এ্যাক্টিং করুন দেখি, আপনার প্রণয়িণীকে বলছেন—'চলে যাও'—হাতের ভঙ্গীতে দেখান—

লোকটি তর্জ্জনী দ্বারা পথ নির্দ্দেশ করিয়া এমন গম্ভীর-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "চলে যা-ও," যে আমরা সকলে চমকিয়া উঠিলাম। যেন সে আমাদের আদেশ করিতেছে, এই বাগান ত্যাগ করিয়া এখনি চলিয়া যাও।

আমরা ভীতভাবে লোকটির দিকে চাহিলাম।

ভাস্কর স্থিরকণ্ঠে বলিল, এ যেন আপনি কোন ভৃত্যকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ভাবুন আপনি আপনার প্রিয়জনকে বলছেন, আপনার মুখ বলছে বটে চলে যাও, কিন্তু আপনার মন যে বলছে, ফিরে এসো।

লোকটি কোন কথা কহিল না। দীর্ঘ হস্তের আঙ্গুল-গুলি মেলিয়া একবার সুদূর পথের দিকে দেখাইল, তারপর শিরাবহুল হস্তের সকল অঙ্গুলি গুটাইয়া হাতটি বুকের দিকে টানিয়া আনিল, যেন কোন অদৃশ্যা প্রেয়সীকে সে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিতে চায়।

ভাস্কর উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, বা চমৎকার। আপনি পারবেন, তবে আমার ডিরেক্‌সনে চলতে হবে, বুঝলেন। শোভেন্দ্রলাল বিরক্তির সহিত বলিল, কেন ভাস্কর তুমি মিছিমিছি সময় নষ্ট করছ, চাল নেই চুলো নেই, একটা লোক এসে দাঁড়াল সে করবে অভিনয়—আর কি রকম পার্ট—এক লক্ষপতি টাকা উড়িয়ে দেবার নেশায় মেতেছে—পারবেন—পারো ভা-ভা-ভা-ভাব্‌তে—

লোকটি অস্বাভাবিকভাবে হাসিয়া উঠিল। তাহার চক্ষু কাঁপিল না, গম্ভীর মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিল না, শুধু গানের করুণ সুরের মত একটানা শব্দ—হা-হা-হা-হা-যেন অন্তস্থলে নিমজ্জিত কোন শব্দস্রোত উৎসের মত কণ্ঠদিয়া বাহির হইয়া আসিয়া স্তব্ধ বায়ুস্রোতে মিশিয়া গেল, সুরের রেশের মত সে শব্দতরঙ্গ ভাঙা বাড়ী ঘুরিয়া মজা দীঘি পার হইয়া দূরে বনে মিশিয়া গেল—হা-হাঃ হাঃ-হা!

আমরা চমকিয়া উঠিলাম, লোকটা পাগল নাকি।

শোভেন্দ্রলাল বোধ হয় ভয় পাইয়াছিল। সে চাপা গলায় বলিল, আমি চল্লুম!

ক্যামেরা-ম্যান বলিয়া উঠিল, ওহে তোমাদের ক্যাপিটালিষ্ট যে চলে গেল, এখনও ফিল্‌মের সব দাম দেওয়া হয়নি।

লোকটি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কত খরচ মশাই?

—কি?

—এই আপনাদের ফিল্‌ম্ না কি বলছেন?

—এই ছবিটি তুলতে ত্রিশ হাজার টাকা খরচ, বুঝেছেন। শুধু ফিল্‌মের দাম পাঁচ ছ' হাজার হবে।

—ত্রিশ? হে!

লোকটি অনামিকা হইতে তিনখণ্ড হীরক খচিত এক স্বর্ণ-অঙ্গুরীয় খুলিয়া দিল।

—দেখুন ত? আংটিটার ক' হাজার দাম হবে? আমার কাছে ত পাঁচ হাজার নিয়েছিল।

ভাস্কর বলিল, আপনার আংটি আপনি রাখুন। আপনাকে বিনাপয়সাতেই এ্যাক্টিং করতে দেব। পার্টটা বড় শক্ত। তবে আপনি পারবেন মনে হচ্ছে।

আমরা ভাস্করকে চিনি। তাহার মাথায় যখন যে রোখ চাপে, কেহ নিরস্ত করিতে পারে না। আজ সকালে সে ওই অপরিচিত পথিককে লইয়া অভিনয়ের চর্চ্চা করিবে।

আমি মৃদুস্বরে বলিলাম, আর মিছে সময় নষ্ট করে কি হবে, এ দিকে যা হয় একটা ব্যাবস্থা কর।

—না হে পুরঞ্জয়, লোকটা অদ্ভুত এ্যাক্টিং করতে পারে, প্রতিভা আছে, আমি দেখেই বুঝেছি। আর এমনি

করেই বড় বড় অভিনেতা, গায়কদের আবিষ্কার হয়েছে, ডিরেক্টারদের কাজই হচ্ছে সন্ধান করা, খুঁজে বা'র করা আমি লোকটাকে ছাড়ছি না।

আর আপত্তি করা বৃথা।

ভাস্কর বলিল, শুনুন মশাই, আগে গল্পটি শুনুন। এক লক্ষপতি জমিদার—গল্পটা আজ ভাবুন—ডুবে যান গল্পের ঘটনার মধ্যে—ভুলে যান আপনি কে—ভাবুন আপনি লক্ষপতি জমিদার, এই বাড়ী এই বাগান আপনার, আপনার—যে লোকের পার্ট অভিনয় করবেন, এক হয়ে যেতে হবে তার সঙ্গে—কল্পনা করুন আপনিই লক্ষপতি জমিদার—

লোকটি গম্ভীরভাবে শুনিতেছিল, সহসা হা—হাঃ হাঃ—হা—হাসিয়া উঠিল। গানের করুণ সুরের মত সেই একটানা হাস্যধ্বনি।

ভাস্করও চমকিয়া উঠিল। বোধ হয় লোকটা পাগল। কিন্তু একেবারে পাগল নয়। হয়ত পাগলামির অভিনয় করিতেছে। লোকটাকে সহজে ছাড়া হইবে না।

ক্যামেরা-ম্যান বলিল, আপনি তা হলে গল্প বোঝান, আজ আর তো কোন কাজ হচ্ছে না, আমি একটু গলা ভিজিয়ে আসি।

সুরসুন্দরীও তাহার সহিত চলিয়া গেল।

ভাস্কর লোকটিকে প্লটটি বোঝাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে কোন কোন দৃশ্যের মূক অভিনয়ও চলিল। গল্পটির শেষের দিক শুনিয়া লোকটির হাত পা কাঁপিতে লাগিল, যেন শীত করিয়া তাহার জ্বর আসিতেছে।

ভাস্কর বলিল, আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন ?

—অসুস্থ! হা—হাঃ হাঃ হা—

সেই অদ্ভুত করুণ ভীতিপ্রদ হাস্য!

হঠাৎ চুপ করিয়া সে ব্যঙ্গের সুরে বলিল, লক্ষপতির পার্ট করতে হবে, লক্ষপতি তার বিষয় সম্পত্তি উড়িয়ে দিচ্ছে—লোকটা বললে কি না আমি পারব না—

তাহার চোখ জলিয়া উঠিল।

ভাস্কর বলিল, পারবেন, আপনি পারবেন, উত্তেজিত হবেন না।

—আচ্ছা, কাল হবেত, শুধু ভাবতে হবে, পার্ট মুখস্থ করা নেই—শুধু হাত পা নাড়া—এত মজার অভিনয়—কি দরওয়ান, আমি পারব না ?

দরওয়ানটি দূরে দাড়াইয়াছিল, সে থতমত ভাবে চাহিল, কোন উত্তর দিল না।

লোকটি নীরবে চলিয়া গেল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, দরওয়ান লোকটি কে ?

দরওয়ান চুপ করিয়া রহিল।

—এই গ্রামের ?

—হাঁ, গ্রামেরই, বড়বংশের লোক, এখন এ অবস্থা। ওকে নেবেন না আপনাদের দলে।

—কেন ?

—বারণ করলেই বা কে শুন্‌ছে!

—শক্তি আছে, আমার ডিরেক্‌সন যদি ঠিক মত মেনে চলে, চমৎকার হবে।

পরদিন প্রভাতে দোতলার বড়ঘরে কার্পেটের ওপর চা পানের সভা বসিয়াছে।

হীরের বালার সহিত মুক্তার দুল উপহার দেওয়া হইবে এই সর্ত্তে সুরসুন্দরী শোভেন্দ্রলালের সহিত অভিনয় করিতে নিমরাজী হইয়াছে। শোভেন্দ্র সেজন্য গতরাত্রে-খোলা আধ-বোতল হুইস্কি খুঁজিয়া লইয়া আসিল। ভাস্করেস্কি সিনারিয়োতে লাল নীল পেন্সিলে দাগ দিতেছে, এমন সময় দরওয়ান আসিয়া জানাইল, সেই লোকটি আসিতেছে।

শোভেন্দ্র বলিল, আসছে বললেই আসবে, ভাগিয়ে দে, দরওয়ান কিজন্য আছ তুমি ?

লোকটি কাহারও অনুমতি না লইয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দুই চোখ জলজল করিতে লাগিল।

—ভাগাও! না? আমার বাড়ী থেকে আমায় ভাগাবে? হা-হা

—তোমার বাড়ী ?

—হাঁ, আমার বাড়ী, আলবাৎ আমার বাড়ী—আমার বাড়ী, আমার বাগান, আমার ছবি, আমার কার্পেট—আমি লক্ষপতি—

হাতের ভঙ্গীতে সে প্রতি জিনিষ দেখাইতে লাগিল।

—হাঁ তুমি "অভিনয়" গল্পের লক্ষপতি।

—গল্পের—হা—হা

—আচ্ছা পাগলের পাল্লায় গড়া গেছে।

সুরসুন্দরী ভয়ে পাশের ঘরের দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

—কি হে ভাস্করেস্কি তোমার অভিনেতার ওপর যে আবেষ্টনের প্রভাব একটু বেশী হয়ে গেছে।

—আইডিয়াল এ্যক্টর হয়ে উঠেছে, নিজের ব্যক্তিগত সত্তা ভুলে গেছে, নিজেকে গল্পের লক্ষপতি নায়ক ভাবতে ভাবতে স্বীয় জীবনের অস্তিত্বধারার স্মৃতি লুপ্ত—

—না, না, এ সমস্ত ওর অভিনয়, ও এ্যক্টিং করতে পারবে না, তুমি বলেছিলে, তাই দেখাচ্ছে—

উত্তেজনায় লোকটির মুখ রক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল, ক্রমে পাণ্ডুর হইয়া গেল। উদাস চোখে বারবার ঘরের চারিদিকে চাহিয়া, ধীরে সে শোভেন্দ্রলালের দিকে অগ্রসর হইল।

—কি চাই?

—দেবেন মশাই একটু?

—কি?

—ওই যে বোতলে।

—ওহে আর একটা গেলাস দাওত, সোডার বোতলটা এগিয়ে দাও।

—সোডা আবার কেন, এত আধ বোতলটুকু আছে।

—এ হুইস্কি—বাজে মাল নয়—হোয়াইট হর্স—হুইস্কি দেখেছ?

—হুইস্কি দেখিনি? হা-হাঃ-হা-হা—

মুক্ত প্রান্তরে যে হাস্য করুণ সঙ্গীতের সুরের মত বোধ হইয়াছিল, এ সুসজ্জিত কক্ষে সে হাস্য ক্ষিপ্ত আর্ত্তনাদের মত মনে হইল। লোকটির দিকে চাহিয়া মন করুণায় ভরিয়া গেল। যেন সে অনেক দুঃখ পাইয়াছে।

আধ বোতল হুইস্কি সে এক চুমুকে খাইয়া ফেলিল। চোখে জলজলে ভাব ফিরিয়া আসিল।

—আজ কি সিন্ করছেন? এই ঘরটায় হোক না।

—দেখ বাপু এবার সরে পড়। এই নাও, এই মনিব্যাগটা নিয়ে যাও, কিছু টাকা আছে ওর মধ্যে—এবার ভাগো—ও মেন পার্ট আমি করব ঠিক হয়েছে।

—টাকা! টাকা দেখাতে এসেছ আমাকে—আমার বাড়ীতে বসে আমাকে টাকা দেখান!

ব্যাগটা সে এক ঝাড়লণ্ঠন লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া দিল। ঝন্ঝন্ শব্দে কয়েকটি ঝাড় ভাঙিয়া পড়িল।

—দেখলে ত ভাস্করেস্কি, তখনই বলেছিলুম ভাগাও—এখন পাগলকে সামলাও!

—পাগল, আমি পাগল, হা-হাঃ-হা-হ্যাঁ পাগল বৈকি—

—চমৎকার, চমৎকার অভিনয়।

—হাততালি দিতে ইচ্ছে করছে।

সুরসুন্দরী হাততালি দিতে লাগিল। সোনার চুড়িগুলি বাজিয়া উঠিল।

ভাস্কর বলিল,—দেখুন মশাই, এবার স্থির হয়ে বসুন: আপনি চমৎকার অভিনয় করতে পারেন—আপনাকেই মেন পার্ট দেব—শক্তি আপনার আছে, তবে আমার ডিরেক্‌সন, বুঝলেন আমার ডিরেক্‌সনে চলতে হবে।

লোকটি চেঁচাইয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া গিয়াছে। ক্ষীণ প্রাণশক্তি মাঝে মাঝে অগ্নিশিখার মত নাচিয়া ওঠে। বসিয়া সে হাঁপাইতে লাগিল। মিনতির স্বরে বলিল, দেবেন, দেবেন ত আমায় এ্যক্ট করতে—ক্ষমা করবেন, একটু চেঁচামেচি করেছি—কি জানেন অনেক দিন পরে খেলুম, চট্ করে মাথায় উঠে গেছে—এ্যক্টিং করা আমার সবচেয়ে বড় নেশা, এ মদখাওয়ার চেয়ে বেশী। থিয়েটারে এক এক রাতে ত্রিশ হাজার চল্লিশ হাজার টাকা খরচ করেছি—

—কি ভাস্করেস্কি এ সব কথা ত আমার গল্পেতে নেই, তোমার সিনারিওতেও নেই।

—বুঝলেন, ভাড়া করে ফেললুম ষ্টার থিয়েটার, সে রাতে যারা থিয়েটার দেখতে আসবে কাউকে টিকিট কিনতে হবে না, নর্ত্তকীদের সাজে ঝুটো গয়না নেই, প্রত্যেকের গলায় হাজার টাকার জড়োয়া হার—এ হাতে এম্নি করে কেটেছি হ্যাণ্ডনোট আর এ হাতে এম্নি করে ছুঁড়ে দিয়েছি নোটের তাড়া ষ্টেজের ওপর—

—চমৎকার হাতের ভঙ্গী!

—আচ্ছা নোট ছুঁড়ে দেবার হস্তভঙ্গীটা আর একবার দেখান তো।

—শুধু নোট নয় মশাই, এই ছুঁড়ে দিলুম মুক্তার বালা,

এই ছুঁড়ে দিলুম হীরের হার, এই ছুঁড়ে দিলুম আর্ম্‌লেট্, সোনার নূপুর—

শূন্য গেলাস, চায়ের কাপ, বোতল সে চারিদিকে ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল।

—দেখুন, সোনার নূপুর ছোঁড়াটার ভঙ্গী ঠিক হল না। ওটা পায়ে গিয়ে পড়বে।

হাতের আর্দ্ধদগ্ধ সিগারেট ছুঁড়িয়া দিয়া ভাস্করেস্কি দেখাইল কি ভাবে নর্ত্তকীকে সোনার নূপুরের উপহার দিতে হয়।

—কি! আমি জানিনা, আমি জানিনা সোনার নূপুর ছুঁড়তে, আমাকে শেখাতে এসেছ।

লোকটি চিৎকার করিয়া কার্পেট হইতে সিগারেট কেস লইয়া এক মার্ব্বেলের পরীমূর্ত্তির দিকে ছুঁড়িয়া মারিল। সিগারেট কেস্‌টি পরীমূর্ত্তির হাতে আঘাত করিয়া পায়ের ওপর খুলিয়া পড়িয়া গেল, সিগারেটগুলি পা দিয়া গড়াইয়া আঙ্গুলের ফাঁকে আটকাইয়া গেল।

আমরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেলাম। লোকটা সত্যি কে?

লোকটি আবার হাঁপাইতে লাগিল। মুখ রক্তহীন হইয়া গিয়াছে। এক শূন্য বোতল হাতে করিয়া ধীরে বলিল, আর নেই মশাই?

—আর খাওয়া নয়, আবার মাথায় চড়বে।

—দিন একটু।

—ওহে জিন্‌টা না হয় বের কর।

—জিন্! ভাল ভাল! ও ভারমুত আর কেন, ও বেদানার রস বললেই হয়।

এক চুমুকে গেলাস নিঃশেষিত করিয়া সে বলিল, বড় তেষ্টা পেয়েছিল। দেখুন, সকালবেলা কি এ্যাক্টিং হয়, এ্যাক্টিং রাতের বেলা, কথায় বলে ফুট-লাইট। তা আমার বাড়ীতে যখন আপনারা কষ্ট করে এসেছেন, একদিন রাতে হররা হোক্ কি বলেন?

ভাস্করকে আমি মৃদুস্বরে বলিলাম, আবার 'আমার বাড়ী, বলছে যে ভাস্করেস্কি, তোমায় ঠাট্টা করছে নাকি?

শোভেন্দ্রলাল উৎসাহিত হইয়া বলিল, এ বিষয়ে আমার খুব মত, রাতে একটা হৈ রৈ হোক, এমন সুন্দর হল-ঘর রয়েছে—তা নয় রোদে দাঁড়িয়ে হাত পা ছোঁড়—

—আমার বাড়ীতে আপনারা অতিথি—

—আপনার বাড়ী?

—আলবাৎ আমার বাড়ী, আমার বাড়ী, আমার বাড়ী, আমার বাড়ী, আমার বাগান, ওই আমার ছবি—

—দেখলেন চট্ করে কেমন মাথায় উঠে যায়।

—দেখছ ভাস্কর, কি রকম ইন্‌টারেস্‌টিং, প্রফেসার সেন থাকলে বোঝাতে পারতেন, অত্যধিক মদ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পারসোন্যালিটির কি রকম পরিবর্ত্তন হয়, এক লোকের মধ্যে পাশাপাশি দুইটি ব্যক্তি চলেছে, কখনও এক হয়ে যাচ্ছে, কখনও আলাদা—

—আমি লক্ষপতি, আমি পথের ভিখারী—হাসছেন হাসছেন—হাসুন—হা—হাঃ হাঃ—

—বা চমৎকার, পথের ভিখারী লক্ষপতির অভিনয় করতে গিয়ে সত্যিই লক্ষপতি হয়ে গেছে—এই আইডিয়াল এ্যক্টর-

লোকটি তখন মার্ব্বেল পাথরের নানা নারীমূর্ত্তির দিকে দেশলাইয়ের বাক্স, গেলাস, ছাই-দানি ছুঁড়ে বলছে, নে নে মোতির মালা, হীরের ফুল, পোখরাজের আংটি।

পরদিন সন্ধ্যায় নৃত্যগীতে অভিনয় জমিয়া উঠিল। ঠিক হইয়াছিল, ফিলমের শেষ দৃশ্যটির রিহার্সেল হইবে। পাঁচটা ট্যাক্সি ভরিয়া কলিকাতা হইতে আসিল তরুণী নর্ত্তকীর দল, প্রচুর আহার্য্য, পানীয় ও ফুলের মালা।

ঝাড়-লণ্ঠনের আলোর সারি আগুনের শিখার মত কাঁপিতেছে; পরীমূর্ত্তিদিগের কণ্ঠে কটিতে ভগ্নহস্তে ফুলের মালা জড়ান। প্রবীর রায়ের সময় প্রমোদ-নিশীথে এই চিত্রিত কক্ষ কিরূপ সুসজ্জিত হইত আলোকে ঝলমল করিত, তাহারি আভাস পাওয়া যাইতেছে।

লোকটি প্রথম কিছুক্ষণ ভাস্করের ডিরেক্‌সন মত অভিনয় করিল, তারপর সে আপন খেয়াল মত আপন খুসিতে অভিনয় করিয়া যাইতে লাগিল। সকলে এমন মাতিয়া উঠিয়াছে যে কেহ বাধা দিয়া রসভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিল না।

নাচ সুরু হইতে হররা আরম্ভ হইল। লোকটি কিছুক্ষণ তবলা বাজাইয়া নাচের সঙ্গে তাল দিতেছিল। এক নর্ত্তকীর নূপুর খুলিয়া লইয়া নিজে পরিয়া নৃত্য সুরু করিল।

ভাবে বিভোর হইয়া হাত তুলিয়া সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল, যেন সে কোন অতল আনন্দরসে ডুবিয়া গেছে। তাহার মুখের ভাব বদলাইয়া গেল। রুক্ষ শীর্ণ মুখ তরুণ সুন্দর, চক্ষের জ্বালাময় দৃষ্টিতে নবমেঘের সুখকর স্নিগ্ধতা।

আমি মুগ্ধ বিস্মিত হইয়া দেখিতেছিলাম।

এমন সময় সিঁড়ির কাছে গোলমাল শুনিয়া বাহির হইয়া গেলাম।

দেখি, এক পুলিস ইনসপেক্টার বেগে সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছে, দরওয়ান তাহার পথরোধ করিবার চেষ্টা করিয়া কথা কাটাকাটি করিতেছে।

পুলিস ইনসপেক্টারটি চেঁচাইতেছে, কোথায়? কোথায় তোর বাবুকে লুকিয়ে রেখেছিস?

দরওয়ান বলিতেছে, হাম্ নেহি জানতা, নেহি জানতা, এ সব বাবুলোক কলকাতাসে থেটার করনে আয়া—

—থেটার! তুই জানিস না! হাতে হাতকড়া পড়বে জানিস—আমি শুনেছি, ও বাড়ীতে লুকিয়ে আছে।

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, কে কে দরওয়ান?

ইনসপেক্টারটি আমার দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া বলিল, আপনি কে? হল্লা কিসের এত? সব ধরে চালান করবো।

—আমরা মশাই সিনেমা কোম্পানী কলকাতা থেকে এসেছি।

আমাকে ঠেলিয়া দিয়া ইনসপেক্টারটি আলোকিত কক্ষের দ্বারে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। সকলের উল্লাস নৃত্যভঙ্গী দেখিয়া সে বিস্মিত হইয়া গেল। হাসিয়া বলিয়া উঠিল, বা, এ যে বেড়ে চলেছে?

—বললুম তো মশাই আমরা সিনেমা কোম্পানী, কলকাতা থেকে এসেছি।

—তা ও লোকটি কে, ওই যে হাত তুলে ঘুরে ঘুরে নাচছে?

—উনি আমাদের দলের এক অভিনেতা।

—একেবারে ভাবে গদগদ হয়ে গেছে। দেখুন তো, লোকাল পুলিসের রিপোর্টে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলুম কি এই থিয়েটার দেখতে?

—এলেন যখন, একটু দেখেই যান, বসুন।

—হাঁ, বসব বই কি, ঘরগুলো সার্চ করতে, একটা রিপোর্ট লিখতে হবে ত।

ইন্সপেক্টরটি কোণে এক চেয়ার টানিয়া বসিল। নৃত্যের মত্ততায় কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিল না।

—চলেত?

—তা চলে, তেষ্টাও পেয়েছে।

শেষ দৃশ্যে পুলিশ কর্ম্মচারির পার্ট প্রমথর ছিল। কিন্তু আজ রাতে তার হুঁস নাও থাকিতে পারে বলিয়া পার্টটি আমিই করিব বলিয়াছিলাম। নৃত্য শেষ হইলেই, প্রণয়িণীকে হত্যা, তারপর পুলিস আফিসারের আগমন ও হত্যাকারীর পেছনে অনেকক্ষণ ছুটাছুটি। সিনেমাতে এই ছোটাছুটির সিনগুলি বেশ জমে বলিয়া পুলিস অফিসারের অবতারণা।

ইন্সপেক্টারটিকে পানীয় দিয়া আমি বেশ পরিবর্ত্তন করিতে গেলাম। পুলিস অফিসার সাজিয়া প্রবেশ করিতেই ইন্সপেক্টারটি আমার দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া বলিল, কি হে বিশ্বাস, খুব রিপোর্ট দিয়েছ।

আমি হাসিয়া বলিলাম, চিন্‌তে পাচ্ছেন না? আমি যে এতক্ষণ আপনার সঙ্গে কথা কইছিলুম

—ও! এ বেশ কেন?

—পুলিস অফিসারের পার্ট আছে।

—কি করবে?

—হত্যার পর খবর পেয়ে এরেষ্ট করতে আসব, ধরতে অবশ্য পারব না, শুধু ছোটাছুটি।

—হত্যা হবে নাকি? সে কি?

—আজ্ঞে, অভিনয়ের হত্যা, সত্য নয়।

—সত্যি নয়? এই থামাও নাচ গান। ও লোকটা কি বললে?

—আজ্ঞে আমাদের প্রধান অভিনেতা মেন পার্ট করছে—

—ওই হত্যা করবে।

—হাঁ

—না, না, হত্যা হবে না, তুমি এরেষ্ট করছ না কেন?

—আজ্ঞে, হত্যা না হলে আমার এরেষ্ট করবার অধিকার কোথায়? নির্দ্দোষী লোককে আমি কি করে ধরব?

—কিন্তু তুমি ত জান হত্যা করতে যাচ্ছে—

—সে ত অভিনয়।

—হুঁ, আচ্ছা, গেলাসটা ভরো দেখি।

এমন সময় আর একটি পুলিস অফিসার হন্ হন্ করিয়া আসিয়া ইন্‌সপেক্টারকে প্রথামত সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সে বলিল, আর আরেষ্ট করতে দেরী করছেন কেন? আমি নীচে এতক্ষণ দরজা আগলে দাঁড়িয়েছিলুম।

—কি পাগলের মত বকছ? কাকে আরেষ্ট করব?

—প্রবীর রায়, প্রবীর রায়কে খুঁজে পাচ্ছেন না—এই থামাও নাচ গান—ওই ত—

—আরে উনি এদের অভিনেতা, মেন পার্ট করছেন।

সাব্‌ইন্‌সপেক্টার বিশ্বাস বিস্মিতভাবে বলিল, কে বল্লে?

আমার দিকে চাহিয়া ইন্‌স্‌পেক্টারটি বলিল, এই ইনি বলেছেন।

—ইনি কে? কোন থানার?

—ইনি কোন থানার নয়, থেটারের, সত্যিকার পুলিস নয়, অভিনয়ের পুলিস।

—এ কোনটা সত্যি, কোনটা অভিনয়? আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না—এরা আপনাকে—

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, আপনি কি সব সময় বুঝতে পারেন কোনটা সত্যি, কোনটা অভিনয়?

—না, না, ওই প্রবীর রায়, হনুমান সিং বল্লে, আর আমি কাল সন্ধ্যায় নিজের কানে শুনেছি—

আমি চমকিয়া উঠিলাম, হয়ত ওই লোকটি সত্যি প্রবীর রায়।

উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি শুনেছেন?

—দেখলুম, ওই লোকটি বাড়ীর চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর গাছের গুঁড়িতে ভাঙা পাঁচিলের গায়ে ঘুষি মারছে আর বলছে, এ বাড়ী আমার এ বাগান আমার, আমি প্রবীর রায়, আমি লক্ষপতি—

—তখন এ্যারেষ্ট করলে না কেন?

—কোথায় মশাই অন্ধকারে চলে গেল, চারদিকে সাপঘোপ—

—অথবা ভূতপ্রেত—

—আর দেরী করছেন কেন?

—চুপ, বা, একসেলেণ্ট এ্যাক্টিং করছে—ভাল এ্যাক্টিং হলে বুঝতে পারি—বুঝলে—

—দেরী করবেন না—

—গোলমাল কোরো না—চুপ—মোসন্‌গুলো দেখ—আমাদের হাত থেকে কোথায় পালাবে!

লোকটি তখন সুরসুন্দরীর দিকে চাহিয়া বক্তৃতা দিতেছে, ডান হাতে ফুলের মালা, বাম হাতে রিভলভার।

লোকটি বলিতেছে, আমার বাড়ী আমার বাগান,—টাকা, টাকার জন্য প্রতারণা করলি,—বিশ্বাসঘাতিনী—তার পায়ে ঢেলে দিয়েছি, রাজার ঐশ্বর্য্য সম্রাটের ধন সম্পদ—হুঁ হুঁ হুঁ—তোর শাস্তি তোর উপযুক্ত শাস্তি—এই—

ফুলের মালা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া লোকটি রিভলভার হাতে সুরসুন্দরীর দিকে অগ্রসর হইল।

তাহার কণ্ঠ স্বরে, ভঙ্গীতে সুরসুন্দরী সত্যই ভয় পাইয়াছিল, সম্মুখে রিভলভার দেখিয়া সে চেঁচাইয়া উঠিল, ওরে বাবাগো, খুন করলে গো—

স্থানীয় পুলিস কর্ম্মচারীটি চিৎকার করিয়া উঠিল, খুন! চোখের সামনে খুন দেখছেন? ধরো—

ইন্সপেক্টারটি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া টানিয়া রাখিল, চুপ কি এক্সলেণ্ট এ্যাক্টিং, মার্ডার কোরো না।

স্বপ্নে সত্যে বাস্তবে অভিনয়ে বিস্ময়ে আতঙ্কে মিলিয়ে চোখের সম্মুখের দৃশ্য দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিল। যেন কোন মায়াময় দুঃস্বপ্নের স্রোতে সকলে ভাসিয়া চলিয়াছি।

হঠাৎ লোকটি স্তব্ধ হইয়া চাহিল, যেন কোন দুঃস্বপ্নের ঘোর হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে, মুখ মলিন, জল জলে চোখ যেন জলে-ভরা।

ভাঙা গলায় সে বলিল—এ কে? এ নয়—পালা—পালা—তুই রিভলভারের সামনে থেকে—ছুটে পালা—

সুরসুন্দরী চেঁচাইতে চেঁচাইতে বেগে পাশের ঘরে ছুটিয়া পালাইয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

লোকটির মুখ চোখ আরক্ত হইয়া উঠিল, আবার সে চীৎকার করিয়া বলিল—পালালি?—প্রবীর রায়ের হাত থেকে পালাবি কোথায়?

—সে ছুটিতে চেষ্টা করিল, তাহার হাত পা

কাঁপিতেছে, সমস্ত দেহ যেন ভয়ানক শীতে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

এক পরীমূর্ত্তির দিকে সেগুলি ছুঁড়িয়া মারিতে চেষ্টা করিল। এ সিনেমা-কোম্পানীর মেকী রিভলভার আসল রিভলভার নয়, কোন শব্দ বা অগ্নি বাহির হইল না। উন্মত্ত ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে লোকটি বর্ণমলিন পারস্য কার্পেটের ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। গেলাস, নূপুর, ছিন্ন ফুলগুলির মধ্যে তাহার দীর্ঘ দেহ স্থির।

স্থানীয় পুলিস কর্ম্মচারী শায়িত দেহের দিকে ছুটিয়া আসিল।

সে চিৎকার করিয়া বলিল, কেউ এ ঘর থেকে নড়বেন না, কেউ বাইরে যাবার চেষ্টা করবেন না।

আমি লুণ্ঠিত দেহের নিকট গিয়া বক্ষের স্পন্দন অনুভব করিতে চেষ্টা করিলাম।

ইন্সপেক্টারটির এতক্ষণে চমক ভাঙ্গিল। তিনি হাতের গেলাসটা কার্পেটে ফেলিয়া দিয়া অগ্রসর হইয়া বলিলেন, বা, এক্সলেণ্ট! এবার উঠে পড়ুন মশাই, প্রবীর রায়, থেটার ফিনিস, এবার আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

আমি ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলাম, কাকে বলছেন?—প্রবীর রায় এখানে নেই।

—নেই? ইনি আপনাদের কোম্পানীর অভিনেতা! হা! হা! উঠুন মশাই, থেটার শেষ হয়ে গেছে—বুঝলেন।

আমি ধীর স্বরে বলিলাম, সত্যি বলছি প্রবীর রায় এখানে নেই, তাঁকে আপনারা এ্যারেষ্ট করতে পারবেন না, এ তাঁহার মৃত দেহ।

সাব-ইন্‌সপেক্টার বিশ্বাস ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, আপনাকে তখনই এ্যারেষ্ট করতে বলেছিলুম!

—বড্ড পালাল দেখছি।

এমন সময় দরওয়ান মলিন মুখে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

—এই ব্যাটাকে এ্যারেষ্ট করো।

—হুজুর, আপনারা ভুল করছেন, ইনি আমার মনিব প্রবীর রায় নেহি, ইনি চন্দনপুরের প্রতীপ রায় আছে—

—প্রতীপ রায়, সে আবার কে?

সাব্-ইন্‌সপেক্টার বিশ্বাস বলিল, ঠিক! প্রতীপ রায়, চন্দনপুরের, তাই চেনা চেনা মনে হচ্ছে, চন্দনপুরের জমিদার, রেস খেলে আর থিয়েটার করে দেউলিয়ে হয়েছে, পথে পথে পাগলের মত ঘুরে বেড়ায় শুনেছিলুম, ওর নামেও একটা ওয়ারেণ্ট আছে—তবে আমাদের থানার জুরিস্‌ডিকসনের বাইরে বলে—

—এখন সব থানার জুরিসডিকসনের বাইরে—

—কিন্তু ও যে বলছিল, আমি প্রবীর রায়।

ভাস্করের মুখের দিকে চাহিয়া আমি বলিলাম, সেটা বোধ হয় পরিবেষ্টনের প্রভাব।



আলালের ঘরের দুলাল

(প্রথম সংস্করণের পাঠ লইয়া আলোচনা)

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

প্যারীচাঁদ মিত্রের কৃতিত্ব স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; যাঁহারা শিক্ষাবিধানে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহারাও এ পর্য্যন্ত প্যারীচাঁদের কৃতিত্ব প্রচার করিয়াই আসিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় "আলালের ঘরের দুলাল"-এর নাম বহুদিন ধরিয়া আছে; কারণ ইহার রচনারীতি ও উপন্যাসের আকার সাহিত্যের ইতিহাসে ইহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ইহার প্রথম সংস্করণের পাঠ ও পরবর্ত্তীকালের ধৃত পাঠ লইয়া কোনও আলোচনা এ পর্য্যন্ত দেখি নাই। আজকাল আমরা একদিকে পুরাতন লেখকদিগকে আধুনিক বেশে সজ্জিত করিতে ত্রুটি করি না, আবার অন্যদিকে পুরাতন পাঠ সম্বন্ধে পণ্ডিত সমাজ একটু সজাগও হইয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়, 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর যে সংস্করণ বাহির করিয়াছেন, তাহা নানা দিক দিয়া ছাত্রদের ও সাধারণ পাঠকদের সহায়তা করিবে। ঐ গ্রন্থের একটি ভূমিকা আমিও লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার সময় প্রথম সংস্করণ আমার চক্ষে পড়ে নাই; পরে তাহা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। কতকগুলি বিষয়ে এই প্রথম সংস্করণটির পাঠের প্রতি বঙ্গসাহিত্যসেবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। প্রথমে 'টাইটেল পেজ' হইতে আরম্ভ করা যাক। এইভাবে তাহা দেওয়া হইয়াছে :—

'আলালের ঘরের দুলাল' / শ্রীযুত টেকচাঁদ ঠাকুর কর্তৃক বিরচিত / কলিকাতা রোজারিও কোম্পানীর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত। / সন ১২৬৪ / Calcutta : Printed by D'Rozario and Co, 8 Tank Square.

প্রথম সংস্করণে প্রতি অধ্যায়ের উপর অধ্যায়ের সংখ্যা-চিহ্ন না দিয়া পাশে দেওয়া আছে। যেমন, পরবর্ত্তী সংস্করণে আছে—

(১)

বাবুরামবাবুর পরিচয়, মতিলালের বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পারসি শিক্ষা।

প্রথম সংস্করণে

১ **বাবুরামবাবুর** পরিচয়, মতিলালের বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পারসি শিক্ষা

প্রথম সংস্করণে অধ্যায়ের নাম শেষ হইলে সর্বত্র দাঁড়ি বা অন্য কোন চিহ্ন নাই, ইহা লক্ষণীয়; তৃতীয়তঃ স্থান বা লোকের নাম অর্থাৎ সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য বা Proper Noun—একটু বড় হরপে মুদ্রিত; বৈদ্যবাটী, বাবুরামবাবু, দেওয়ানগাজী প্রভৃতি শব্দ। চতুর্থতঃ 'দিকে' কোথাও প্রথম সংস্করণে নাই—সর্বত্র 'দিগে'।

'চতুর্দিকে' নয়, 'চতুর্দিগে'। এইরূপ 'চক্ষে' নয়, 'চখে', এমন কি 'চকে'। পঞ্চমতঃ, এখনকার সংস্করণে উদ্ধৃত চিহ্নের যেমন বাহুল্য, প্রথম সংস্করণে তেমন নয়, এ বিষয়ে অনেক সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তবিক বলিতে গেলে অনেক যতিচিহ্নই তখনকার সংস্করণে ছিল না, এখন দেখা যাইতেছে।

ষষ্ঠতঃ কথার দ্বিত্ব অনেক সময় অঙ্ক দিয়া বোঝান হইত। যেমন 'ক্লাসে ক্লাসে' না বলিয়া 'ক্লাসে২', 'করিতে করিতে' না বলিয়া 'করিতে২', 'শৃগালদিগের হোয়া হোয়া ও ঝিঁঝিঁ পোকার ঝিঁ ঝিঁ শব্দে'র স্থানে 'শৃগালদিগের হোয়া২ ও ঝিঁঝিঁ পোকার ঝিঁ২ শব্দ', 'ঘন ঘন' না বলিয়া 'ঘন২'।

সপ্তমতঃ 'বালী' প্রথম সংস্করণে 'বালি' লেখা হইয়াছে। 'শ্রেণি' এখনকার মত 'শ্রেণী' নয়।

অষ্টমতঃ, তখন অনেক সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করা হইত, তাহাতে সঙ্গতি রক্ষা পাইত, এখন তাহাতে হানি ঘটিতেছে; যেমন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে হরি বলিতেছে, "মহাশয়ের যেমন কাণ্ড! ভাত খেতে বসতেছিনু" ইত্যাদি —তাহার স্থানে ছিল, "মোশায়ের যেমন কাণ্ড!" ইত্যাদি।

তখন কিন্তু বেনিগারদ ছিল আসল কথা; এখন আমরা তাহাকে 'বেলিগারদ' করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছি।

চতুর্থ অধ্যায়ের নামকরণে কিন্তু একটি ব্যতিক্রম

আছে ; 'কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষার বিবরণ, শিশুশিক্ষার প্রকরণ, মতিলালের কুসঙ্গ ও ধৃত হইয়া, পুলিশে আগমন'—প্রথম সংস্করণে এস্থানে আছে,—'**কলিকাতায়** ইংরাজি শিক্ষার……পুলিসে আনয়ন'।

প্রথম অধ্যায়ে একস্থানে আছে, "কপাল মন্দ, পড়াশুনার দরুণ কিছুই লাভটাব হয় না।" প্রথম সংস্করণে আছে, "……কিছুই লাভ ভাব হয় না।"

'আপন বাটী' নয় 'আপান বাটী'। কলেজ নয় কালেজ। 'ভাট বন্দী' নয় 'ভাট বন্দি'। দশটা 'ঢং ঢং' করিয়া বাজে না, 'ডং ডং' করিয়া বাজে।

একাদশ অধ্যায়ে আছে, "আহা, কাল যে লাঠি ধরিয়া স্নান করিতে যাইতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া আমার দুঃখ হইল"—তাহার স্থানে প্রথম সংস্করণে, "আহা, কাল যে করে লাঠি ধরিয়া স্নান করিতে……"

পরবর্তী সংস্করণে—বেণীবাবু খান খাবু নাই গতি গঙ্গা।
হুপ হাপ গুপ গাপ বেড়ে উঠে ডাঙ্গা॥

প্রথম সংস্করণে 'ডাঙ্গার' স্থানে ছিল "দাঙ্গা"।

বেচারামের সেই অপূর্ব, 'দুঁর দুঁর'-এর অনুনাসিকত্ব পরবর্তী সংস্করণে লোপ পাইল কেন? সপ্তদশ অধ্যায়ের শেষ দিকে প্রথম সংস্করণে বাঞ্ছারামের মুখে যে কথা বসান হইয়াছে—"আরে আবাগের বেটা ভূত," তাহা পরবর্তী সংস্করণে বেচারামের মুখে দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাতে ভালই হইয়াছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথমেই ছিল সূর্য অস্ত হইতেছে—তাহা শুদ্ধ করিয়া পরে লেখা হইল 'অস্ত যাইতেছে'। শেষের দিকে ভারতচন্দ্রের ঢংয়ে যে কবিতা আছে তাহার মধ্যে দুইস্থানে ব্যতিক্রম দেখিতে পাই।

'ছিছিছি, ঢোস্কা কি ঐ মেয়েটির বর লো।'

এখানে প্রথম সংস্করণে ছিল, 'ঢোস্কার' পূর্বে 'এই' কথাটি তাহাতে ছন্দও বজায় থাকিত। 'ছি ছি ছি এই ঢোস্কা কি ঐ মেয়েটির বর লো'—তাহার ছয় লাইন পরেই আবার আছে—

'চক্ষু কট মট সট সট করিছে'—

এখানেও ছন্দের গতি টেঁকে নাই। প্রথম সংস্করণে টিঁকিয়াছিল, তখন ছিল—

'চক্ষু কট মটমট সট সট করিছে'

২৬শ অধ্যায় আরম্ভ করিতে করিতে প্রথম দুই পৃষ্ঠায় পূর্বোক্ত রূপ ভিন্ন তিনটি ব্যতিক্রম পাইলাম। 'ইহাতে যে টাকাকড়ি রোজগার হইয়াছিল, তাহা কোথায়?'—

প্রথম সংস্করণে ছিল 'তাহা করিয়া যে টাকাকড়ি রোজগার হইয়াছিল'…কয়েক লাইন পরে আছে, 'সিদে পথে থাকিতে মার নাই—তাহাতে মন ও শরীর দুই ভাল থাকে'; প্রথম সংস্করণে ছিল 'সিদে পথে…শরীর ও মন দুই ভাল থাকে'। এখন আছে, 'তোর ধরম আওরভী জাহের হোগা'—আগে ছিল 'জাহের হোগি'।

২৭শ অধ্যায়ের প্রথম দিকে বাহুল্য বলিতেছেন, "ওরে ঐ কদুর ডাগাটা মাচার উপর তুলে দে, ঐ খেড়ের আঁটিটা বিছেয়ে ধুপে দেও" এক একবার ছম ছমে ভাবে চারিদিকে দেখিতেছেন—এখানে ছিল…'ধুপে দে' ও এক একবার…। এই প্রসঙ্গে 'দেও' অপেক্ষা 'দে' অধিক সঙ্গত, এবং দুইটি বাক্যের মধ্যে সংযোজক 'ও'-এর প্রয়োগ সুষ্ঠু হইয়াছে। কিছু পরে আছে…'জমিদার ও নীলকরকে জব্দ করিবার জন্য দুইটি উপায় আছে', আগে ছিল,—'দুই উপায় আছে'। বরদাবাবুর অজানা লোকের উপর দয়ার পরিচয় পাইয়া 'সারজন আপনি রাস্তার নিকট যাইয়া' এখন দেখি, তখন ছিল 'সারজন আপনি আড়াব নিকট যাইয়া।'

২৯শ অধ্যায়ে গোটা ছয়েক পাঠান্তর উল্লেখযোগ্য মনে হইতেছে। প্রথমেই আছে, বাঞ্ছারামবাবুর ক্ষুধা কিছুতেই 'নিবৃত্ত' হয় না—প্রথম সংস্করণে 'নিবৃত্ত' পরিবর্তে 'নিবারিত' ছিল। তাহার পর 'বাটীর ভিতরে মতিলালের বিমাতা ও স্ত্রী—দুইটি অবলামাত্র বাস করেন'—ইহার স্থানে ছিল 'বিমাতা ও স্ত্রী এই দুইটি অবলা মাত্র…'। বাঞ্ছারাম হুকুম দিতেছেন, 'ভাং তালা'—কিন্তু তালা কোথায়? প্রথমে ছিল, 'ভাং ডাল'। তাই পরেই আছে,—'এখনি তালা ভেঙ্গে দখল লব', তাহার স্থানে প্রথমে ছিল 'এখনি বাড়ী ভেঙ্গে' ইত্যাদি। 'তোমাদের নিকট আমার এই ভিক্ষা যে'—আগে, ছিল 'তোমাদের নিকট আমার ভিক্ষা এই যে'। পরিবারেরা 'এখন বেরিয়ে যাউক'—পূর্বে ছিল 'পরিবারেরা এখনি বেরিয়ে যাউক'। আচ্ছা, 'গলি-ঘুঁজি' না 'গলি-ঘুজি'?

উপরে যে সকল পরিবর্তন বা পাঠান্তর দেখান হইল তাহা হইতে বুঝিতে পারা কঠিন নয় যে পরবর্তী পাঠ সর্বত্র ভাল নহে 'পুরাণমিত্যেব না সাধু সর্বম নবৈ নূতন-মিত্যানবদ্যম্'—টেকচাঁদ ঠাকুরের এই অমর কীর্তির প্রথম পাঠগুলি দেখিয়া টেকচাঁদী আদর্শের একটা অপেক্ষাকৃত যথার্থ ছবি পাইতে পারি।

'যাচ্ছি-যাবো'র দেশ আফ্রিকা*

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সোহালি ভাষায় 'বার্ডো কিডোগো' বলে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়। আফ্রিকা মহাদেশের যে কোনো দেশের যে কোনো জাতই হোক সে জুলু, বাসুতো, মাটাবেল বা কাফির—ওদের মুখের বুলিই 'বার্ডো কিডোগো'। আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূল থেকে নিয়ে পশ্চিম উপকূল পর্য্যন্ত, কায়রো থেকে কেপ টাউন পর্য্যন্ত, এই কথাটাই সবাই বোঝে এবং এই কথার অলস ছন্দে নিজেদের জীবনের গতির লয় ওরা বেঁধেচে। কথাটার মানে "একটুখানি অপেক্ষা করো।" আফ্রিকার প্রত্যেক কাজে, কথায়, তার বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্যে, তার বড় বড় নদীতে, জলাভূমিতে, কর্দ্দমাক্ত পথে—এই কথার প্রভাব বর্ত্তমান।

যখন আমি কলোরাডো আফ্রিকান্ অভিযানের নেতৃত্ব নিয়ে আফ্রিকা যাই তখন যথেষ্ট উৎসাহ নিয়েই গিয়েছিলাম। আমাদের অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল বন্য জন্তুর চলচ্চিত্র সংগ্রহ করা। আদিম অধিবাসীদেরও বটে। কিন্তু পূর্ব্ব উপকূলের কিলিণ্ডিলি বন্দরে যে দিনটিতে পদার্পণ করলাম, সেদিন থেকে আর পশ্চিম উপকূলের লাপোস বন্দরে যে দিন আবার দেশে ফিরবার জন্যে জাহাজে চড়ি সে দিনটি পর্য্যন্ত প্রত্যেক কাজে পদে পদে অনুভব করেছি, আফ্রিকা ইউরোপ নয়, এখানকার জীবনের তাল দীর্ঘবিলম্বিত, তাড়াতাড়ি এখানে কিছু করা যায় না। সবতাতেই দেরি, 'একটুখানি অপেক্ষা করো', 'বার্ডো কিডোগো'—এখানকার জলে হাওয়ায় এর প্রভাব।

কলোরাডো আফ্রিকান্ অভিযানে যোগদান করবার দুবছর আগে আমি একবার একা দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকার কাওকো ভেগু ও কালাজারি মরুভূমির মধ্যে ভ্রমণ করি। সিংহের দেশের মধ্যে দিয়ে হাজার মাইল পথ ভ্রমণ করেও একবার একটি মাত্র ছাড়া আর কোনো সিংহই দেখিনি। তাই এবার যখন আবার আফ্রিকায় এসে পড়লাম তখন ভাবছিলাম, এ দেশের সেই 'যাচ্ছি-যাবো' বাণীর প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছি কি না।

কুলীদের মাথায় জিনিষপত্র চাপিয়ে মোটর ট্রাক্ নিয়ে আমরা টাঙ্গানিয়াকা প্রদেশের সেরেণপেটি প্রান্তরে তাঁবু ফেললাম। সেরেণপেটি সমতলভূমি, বন্যজন্তু বিশেষ করে সিংহের প্রধান আড্ডা। সুতরাং আমরা আমাদের জায়গার নাম দিলাম ক্যাম্প সিম্বা—মাসাই ভাষায় সিম্বা কথার মানে সিংহ। আমাদের তাঁবু থেকে কয়েক মাইলের মধ্যে একটা গভীর সংকীর্ণ উপত্যকার সন্ধান পাওয়া গেল, যেখানে সিংহ বাস করে।

একমাস ধরে আমরা ক্যামেরা নিয়ে সিংহদের চলচ্চিত্র তুললাম। একটি দুটি নয়, এক একটি দলে পেয়েছিলাম চারটি সিংহ—এদের সংখ্যা কখনও বেড়ে ছয় এবং আটও দাঁড়াতো। সিংহ ও সিংহিনী দুই-ই ছিল এদের দলে। সিংহ শিকার আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না—তার তোড়-জোড়ও ছিল না। শুধু এদের ছবি সংগ্রহ করাই ছিল আমাদের কাজ। অনেক সময় মাত্র ছ' ফুট দূর থেকে এদের ছবি নিতে হয়েচে, অনেক সময়ে আমাদের ও সিংহের দলের মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র একটা পাতলা বেড়া, জঙ্গলের ডালপালা দিয়ে তৈরি। এরকম বেড়াকে আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলের ভাষায় বলে 'বোমা'।

আমরা একটি মৃত জেব্রাকে এক জায়গায় ফেলে রাখতাম। জেব্রার মাংস সিংহের অতি প্রিয় খাদ্য—মাংসের গন্ধ পেয়ে দুটি একটি করে সিংহ সিংহিনী জড়ো হোত মৃত জেব্রার চারধারে, আমরা সেই সময় ফটো নিতাম। আমাদের সঙ্গে ওদের যেন মিতালি গড়ে উঠেছিল, জেব্রার মাংস বিনামূল্যে খেতে পেয়ে হয় তো বা ওরা আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখিয়েই আমাদের কিছু বলতো না, আমরাও ওদের কিছু বলতাম না।

সিংহের দল যে কত ধরণের খেলা, লাফালাফি, দৌড় ঝাঁপ করতো জেব্রার মাংস খেতে খেতে, তা আমরাও

---

* পল্ হফ্‌লারের বিবরণের অনুবাদ।

চোখে দেখবার আগে বিশ্বাস করতাম না যে সিংহ এসব করতে পারে। তবে মৃত্যু নিয়ে খেলা করচি এ কথা সব সময়েই আমাদের মনে সজাগ থাকতো। নাইট্রোগ্লিসিরিণ নিয়ে নাড়াচাড়া করা আর সিংহ নিয়ে কারবার করা দুই-ই সমান—কখন কি বিপদ ঘটবে, এ কথা কিছু বলবার জো নেই। মৃত্যু যখন আসবে, তখন আসবে সম্পূর্ণ অতর্কিতে।

আফ্রিকায় একটা কথা প্রচলিত আছে, 'অনিশ্চয়তাই সিংহের চরিত্রের একমাত্র নিশ্চয়তা'—আমরা সব সময় এ কথাটি মনে রেখে চলতাম বটে, কিন্তু আমাদের কাজের প্রকৃতি ছিল যে রকম, তাতে দৈবের ওপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ও ছিল না আমাদের।

দশ ফুট বা বড় জোর পনেরো ফুট দূর থেকে আমরা ছবি তুলতাম। সিংহ এক লাফে যায় প্রায় আঠারো ফুট, সুতরাং ক্রুদ্ধ সিংহের প্রথম ঝম্পের সীমানার মধ্যেই আমরা আর আমাদের চলচ্চিত্রের ক্যামেরা—এস্থলে দৈবের ওপর নির্ভর না করে উপায়ই বা কি ?

একবার একটা সিংহিনী সম্পূর্ণ অকারণে আমার দিকে ছুটে এল এবং ততোধিক অকারণে আমার ছ'ফুট মাত্র দূরে থমকে গেল দাঁড়িয়ে। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র পরে সে পনেরো ফুট দূরে বেশ শান্ত নিরীহ পোষ-মানা জন্তুটির মত বিচরণ করছিল। কেন বা কি মনে করে সে হঠাৎ আমার দিকে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এল, কেনই বা সে আবার ফিরে গেল—এর খবর কেউ দিতে পারে না,—সিংহ ভয়ানক খামখেয়ালী প্রকৃতির জানোয়ার

এত তাড়াতাড়ি সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল যে প্রথমে আমার মনে হওয়ার অবকাশই হয় নি—তারপর বিপদ যখন উত্তীর্ণ হয়ে গেল তখন আমি বাতাহত বৃক্ষপত্রের মত কাঁপতে লাগলাম এবং অনেক কষ্টে বন্দুকটা বাগিয়ে ওর দিকে ধরলাম। সিংহটা আর ছ' ফুট আমার দিকে এগিয়ে এলে আমার কাঁপুনি বা রাইফেলে কোনো উপকারই দর্শাত না।



'একটি দুটি নয়—'

ক্যামেরাতে ছবি তোলবার কাজ যতদিন চলছিল, ততদিন সিংহ শিকার করবার কোনো চেষ্টা করিনি বা কোনো কারণেই ওদের বিরুদ্ধে কোনো মারাত্মক অস্ত্রের ব্যবহার করিনি। তাঁবুর সকলের ওপরও আমি এই মর্মেই আদেশ জারি করেছিলাম। এর আগেও আমি কখনো সিংহ শিকার করিনি—এবং দু দুবার আফ্রিকায় সিংহবহুল অঞ্চলে ভ্রমণ করেও একটা মৃত সিংহের চামড়া ও মুণ্ড যে আমি গর্ব্বের সঙ্গে সকলকে দেখাতে পারতুম না, এতে আমার নিজেরই লজ্জা বোধ হোত।

আমরা তাঁবু খাটাবার দু সপ্তাহ পরে একদিন আমাদের

উপত্যকা থেকে কিছু দূরে একটা হলদে-কেশরওয়ালা বড় সিংহ দেখা গেল। এ সিংহটা আমাদের পরিচিত সিংহদলের সভ্য নয়, যারা আমাদের ক্যামেরার সামনে খেলাধূলো করে, জেব্রার মাংস খেয়ে ছবি তুলতে দেয়। একটা সিংহিনীর সঙ্গে সে গাছের ছায়ায় শুয়ে মাধ্যাহ্নিক নিদ্রাসুখ উপভোগ করছিল, দূর থেকে শুভ্র সূর্য্যালোকের প্রখরতার মধ্যে ওদের দুটিকে দুটি কালো দাগের মত দেখাচ্ছিল যেন।

আমি এগিয়ে গেলাম ওদের দিকে। ছোট ছোট ঘাসের বনের ওপর দিয়ে দু জোড়া কান খাড়া হয়ে উঠতেই আমি বন্দুক বাগিয়ে ধরলাম। অল্পক্ষণ অপেক্ষা করবার পরে একটা প্রকাণ্ড সিংহ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল ঘন ঘাসের বনের মধ্যে থেকে। তার লেজটা একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে চাবুকের মত আন্দোলিত হচ্চে—এইবার আক্রমণ করতে ছুটে আসবে আমার দিকে, এটা তারই চিহ্ন।

সিংহটা আক্রমণ করতো হয়তো কিন্তু সিংহিনীটা সেই সময় হঠাৎ লাফিয়ে বাঁদিকে পাহাড়ের ধারের বনের দিকে পালিয়ে গেল—আমার কাছ থেকে জায়গাটার দূরত্ব প্রায় একশো কুড়ি গজ। সিংহটা সঙ্গিনীর ব্যবহারে সম্ভবতঃ ক্ষুব্ধ হয়ে আক্রমণ স্থগিত রাখলে এবং ধীরে ধীরে তার অনুসরণ করলে, কিন্তু তার দুর্ভাগ্য বনের মধ্যে ঢোকবার আগে সে কৌতূহল চাপতে না পেরে আমার দিকে একবার পেছন ফিরে চেয়ে দেখতে গেল—আমি সেই সময়েই গুলি করলাম। সিংহটা তখনই বজ্রাহতের মতই সেখানে পড়ে গেল, গুলি লেগেচে এটা বুঝতে দেরি হোল না আমার। আমি আর কিছু এগিয়ে গেলাম।

ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে কয়েক ফুটের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে দুএকটা পাথর ছুঁড়ে মেরে দেখলাম সিংহটা নড়ে চড়ে না। বন্দুকটা এক জায়গায় রেখে দিয়ে আমি মৃত সিংহের ফটো তুলবার ব্যবস্থা করছি, সেই সময়ে বন্দুকের শব্দে আকৃষ্ট হয়ে আমাদের দলের সব লোক এসে সেখানে পৌঁছল। আমাদের কুলীর সর্দ্দার মাইক ওর কেশররাশি সরিয়ে দেখতে চাইলে গুলি কোথায় বিঁধেছে। দেখা গেল একটা চোখের মধ্যে দিয়ে গুলি গিয়েচে, এমন সোজা চলে গিয়েচে যে চোখের অদ্ধ পর্য্যন্ত অক্ষত আছে।

ফটো তোলবার সুবিধের জন্যে কুলীরা লম্বা লম্বা ঘাস কেটে সামনে খানিকটা জায়গা ফাঁকা করতে ব্যস্ত হোল—ওদের মধ্যে একজন কুলী মৃত সিংহের লেজটা ধরে এক পাশে দেহটা সরাতে যাবে—এমন সময়ে সিংহটা ভীষণ গর্জ্জন করে উঠলো। সবাই সঙ্গে সঙ্গে একেবারে লঙ্-জাম্পের প্রতিযোগিতার মত লাফ দিয়ে পিছু হটে গেল। সিংহ ক্রমশঃ লম্বা নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলো—তার বুক উঠতে নামতে লাগলো—ক্রমশঃ সে জেগে উঠচে। তাহোলে সিংহটা মরে নি, মূর্চ্ছা গিয়েছিল মাত্র। কাল-বিলম্ব না করে আমি বন্দুকের নল প্রায় ওর গায়ে ঠেকিয়ে পুনরায় গুলি ছুঁড়লাম। তাতেই সেটা সাবাড় হোল। নিগ্রো কুলীদের মধ্যে যারা ইতিমধ্যে বেগতিক বুঝে গাছে চড়ে বসেছিল, ভরসা পেয়ে তারা আবার নেমে এল।

আমার মনে হয় সিংহ যেন আফ্রিকার বিরাট বন্য প্রকৃতির প্রতীক। ও কাউকে ভয় করে না, যেখানে সেখানে সগর্ব্বে বিচরণ করে, নিজের তৈরী আইন ছাড়া কারো আইন মানে না। হত্যাই ওর জীবনের মূলমন্ত্র—আফ্রিকার বিশাল বন্য প্রান্তরে বনচারী জীবের সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত না হয়ে পড়ে—এই তদারক করে বেড়াবার এবং বেড়ে উঠলে তার প্রতিকার করবার দায়িত্ব দিয়েই প্রকৃতি যেন ওকে পাঠিয়েছে। সিংহ নিষ্ঠুর সন্দেহ নেই, তবে প্রয়োজন না বুঝলে সে কখনো পশুহত্যা করে না। হায়েনার মত নীচ প্রকৃতির হত্যাকারী এবং ভীষণ পেটুক নয় সিংহ। হায়েনার মত ভীরু কাপুরুষ নয় সিংহ।

আমার পরিচিত এক নরওয়েবাসী ভ্রমণকারীর সিংহের ব্যাপারে একটা মজার অভিজ্ঞতা হয়েছিল অল্পদিন পরেই। ওরা আফ্রিকায় এসেছে এই প্রথম, সঙ্গে একজন পাকা শিকারী নিয়ে কুলীদের মাথায় তাঁবু ও মোট চাপিয়ে ওরা ঘুরতে ঘুরতে এসে আমাদের অঞ্চলেই হাজির হোল। ক্যাম্প সিম্বা থেকে আট মাইল দূরে একটা উপত্যকার মধ্যে আমরা ওয়াটারবাক্ হরিণ শিকার করতে গিয়েছি—পাহাড়ী পথের মোড় ঘুরেই দেখলাম ওরা এক জায়গায় তাঁবু ফেলেচে। কথায় কথায় আলাপ হোল। জানা গেল ওরা নাইরোবি সহরে আমাদের কথা শুনেচে এবং আমাদের সঙ্গে অসংখ্য সিংহের প্রতিদিন দেখাশুনো হচ্চে খবর পেয়ে এই দিকেই এসেচে সুলভ

সিংহ শিকারের আশায়। ওদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করলে—যে জায়গাটা আমরা তাঁবু ফেলছি, এর কাছাকাছি সিংহ আছে তো?

বুঝলাম লোকগুলি নিতান্তই অনভিজ্ঞ। টাঙ্গানিয়াকায় সেরেংগেটি প্রান্তরে ঘন ঘাসের বনের মধ্যে তাঁবু ফেলে জিগ্যেস করতে এসেছে সিংহ এখানে আছে কি না। ক'দিন আগেও ঠিক এই জায়গায় ছ'টা সিংহকে আমরা একত্র দেখেছি। শুধু দেখা নয়, হরিণের মাংস পেট ভরে খাইয়ে তাদের তৃপ্তি সাধন করেছিলামও বটে। ঘটনাটা এইরূপ।

সেদিন আমরা একটা হরিণ শিকার করেছিলাম এবং যখন আমাদের কুলী হরিণের ছালটা ছাড়াচ্ছিল, তখন অনুমতি প্রার্থনা করলে ওকে মারবার। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমতি দিতে হল এবং সিংহিনীর জীবলীলা সাঙ্গ হতে দশ মিনিটের বেশী সময় নিলে না এবং সে ঘটনাটি ঘটেছিল যে বড় কাঁটাগাছের তলায়, সেখানেই নরওয়েবাসী ভ্রমণকারীর নিগ্রো পাচক রান্নার বাসনপত্র সাজাচ্ছিল।

এই জায়গার চারিপাশে উঁচু পাহাড় ও পাষাণময় মালভূমি, জলের ধোয়াট সব উঁচু জায়গায়টা থেকে নেমে জমা হয় এই সংকীর্ণ উপত্যকার খোড়লে—সে জল থাকেও অনেক দিন। সুতরাং রাজ্যের বন্য জন্তু জলপানের জন্যে এখানে সন্ধ্যার পর দলে দলে আসে। সিংহ এখানে দেখা যদি না যায় তবে টাঙ্গানিয়াকার আর কোন জায়গায় দেখা যাবে না।



'জেব্রার মাংস সিংহের অতি প্রিয়খাদ্য—'

ছ'টা সিংহ মৃত হরিণের কিছু দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এবং মাঝে মাঝে গর্জ্জন করছিল। ছালটা ছাড়ানো হয়ে গেলে মৃতদেহটা আমরা ওদের জন্যে ফেলে রেখে চলে এসেছিলাম।

এই স্থানে আর একদিন আমাদের আর এক কুলী একটি বড় সিংহিনীর দর্শন পায়—একটা জেব্রা মেরে সে মৃতদেহের দুদিকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল আর তাকে চক্রাকারে ঘিরে কতকগুলো শকুনি আর হায়েনা কলরব করছিল। আমি একদিন এই সিংহিনীর ফটো নিয়েছিলাম আমাদের তাঁবুর নিকটবর্ত্তী একটা ঝর্ণার কাছে।

আমার কুলীরা জানতো আমি যে সিংহের ফটো নিই—তাকে হত্যা করি না—সে জন্যে ওরা আমার কাছে

আমাদের নরওয়েবাসী শিকারী বন্ধুটির সে রাত্রে ভাল নিদ্রা হোল না। তিনি ইতিপূর্ব্বে কখনো আফ্রিকায় আসেননি, আফ্রিকার বন্য প্রান্তরের বিচিত্র নৈশ-শব্দ তাঁর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল কি না জানি না, মোটের ওপর নিদ্রার আশা পরিত্যাগ করে তিনি অবশেষে তাঁবুর বাইরে মুক্ত প্রান্তরে নক্ষত্রালোকিত আকাশতলে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ পায়চারী করবার মতলবে তাঁবু থেকে বের হোলেন।

এ পর্য্যন্ত মোটামুটি ব্যাপারটা মন্দ ছিল না।

কিন্তু বহুদূরবর্ত্তী স্বদেশ নরওয়ে ত্যাগ করবার পূর্ব্বে নিরীহ ভদ্রলোক একটি কাজ করেছিলেন, যার জন্যে সে রাত্রে তাঁকে ঘোর বিপদের সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। তিনি একটি সাদা এবং কালো ডোরাদার পায়জামা

কিনেছিলেন। নৈশভ্রমণের সময় এই পায়জামাটা ছিল তাঁর পরণে।

হঠাৎ বেড়াতে বেড়াতে তাঁর কানে গেল কোন দিকে যেন দ্রুতগামী ঘোড়ার খুরের শব্দ হচ্চে এবং শব্দটা ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হচ্চে। মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে এক বৃহৎকায় জন্তুকে তিনি তাঁর দিকে ছুটে আসতে দেখলেন। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন কতকটা ভয়ে এবং কতকটা কৌতুহলে। যখন তিনি দেখলেন সেটা একটি বৃহদাকার সিংহ এবং সিংহটি এক্সপ্রেস ট্রেনের বেগে তাঁকে লক্ষ্য করেই ছুটে আসচে, তখন তাঁর চলৎশক্তি রহিত হবার উপক্রম হয়েচে।

সিংহটা তাঁর খুব কাছে এসে ধূলোর ঘূর্ণির মধ্যে হঠাৎ থেমে দাঁড়ালো এবং তাঁর দিকে বিস্ময় ও বিরক্তির সঙ্গে অল্পক্ষণ চেয়ে দেখে মুখ ফিরিয়ে যেদিকে থেকে এসেছিল সেদিকেই প্রস্থান করলে। তার ধরণ দেখে মনে হবার কথা যে সে রীতিমত বিরক্ত হয়েচে। এই ব্যাপারটি আমরা পরদিন শুনলাম। সিংহের এরকম অদ্ভুত ব্যবহারের একটিমাত্র যুক্তিসঙ্গত কারণ নির্দ্দেশ করতে পারা যায়, তা হচ্চে এই যে, আধ-অন্ধকার প্রান্তরের মধ্যে সিংহটা দূর থেকে আমাদের সাদা-কালো ডোরা কাটা পায়জামা পরিহিত বন্ধুকে জেব্রা বলে ভুল করেছিল এবং কাছে এসে যখন দেখলে যে এই অদ্ভুত জীবটি জেব্রা নয় তখন তার সন্দেহ হোল এ হয়তো কোনোরকম ফাঁদ হবে। সুতরাং সে কালবিলম্ব না করে ফিরে চলে গেল। এ হোল আমার অনুমান, অন্য কোনো কারণ যে এর নির্দ্দেশ করা যেতে পারে না এমন কথা আমি বলবো না। আফ্রিকায় ভ্রমণের ফলে অনেক সিংহের সংস্পর্শে এসে ওদেশের প্রচলিত জনপ্রবাদটির সত্যতা আমি খুব ভালই উপলব্ধি করেছি যে, অনিশ্চয়তাই সিংহের চরিত্রের একমাত্র নিশ্চয়তা। অমন খামখেয়ালী প্রকৃতির জীব আফ্রিকাতেও আর দুটি পাওয়া যাবে না।

মোটের ওপর পরদিন সকালেই ওঁরা জয়াগাটা থেকে তাঁবু উঠিয়ে আমাদের তাঁবুর কাছাকছি একস্থানে এসে আড্ডা করলেন। অত যেখানে সিংহের চলাচল, সকলের পক্ষে সে স্থানটা বাসযোগ্য বলে বিবেচিত নাও হতে পারে।

ক্যাম্প সিম্বাতে যখন ছিলাম, মাসাই জাতির বাড়ীঘর, গরুবাছুর ও তাদের জীবনযাত্রাপ্রণালীর ফিল্ম তোলবার প্রস্তাব করি ওদের জাতির সর্দ্দারের কাছে। ওরা বড় দেরি করতে আরম্ভ করে—আফ্রিকার সে চিরন্তন বুলি 'বার্ডো কিডোগো'—'হচ্ছে হবে'। দুমাস লেগেছিল ওদের সম্বন্ধে ফিল্ম তুলতে।

মাসাইদের ব্যাপার যদি বাদ দিই, তবে আমাদের দিন ওখানে বেশ কেটেছিল। তারপর একটা দুর্দ্দৈব উপস্থিত হোল, ক্যামেরাটা একদিন বিগড়ে গেল। সেই জঙ্গলে ক্যামেরা সারানোর লোক কোথায় পাই—সন্ধান নিয়ে জানা গেল গিলগিল বলে একটা গ্রামে একজন ইংরেজ মিস্ত্রী থাকে, সে এ কাজ জানে।

মোটর ট্রাক নিয়ে গিলগিল যাবার পথে মোটর এঞ্জিনের কি এক গোলমাল হোল, সেটা সারাবার জন্যে যেতে হোল নাইরোবি সহরে। এই সব ব্যাপারে কেটে গেল তিন সপ্তাহ। হিসেব করে দেখলাম এই তিন সপ্তাহে আমি বিষুবরেখা পারাপার হয়েছি ছ'বার এবং সবশুদ্ধ হাজার মাইল মোটর চালিয়েছি।

আফ্রিকার বন্যপ্রকৃতি এ থেকে ভালই বোঝা যাবে।

এই হাজার মাইল মোটর চালানো ও ছুটোছুটির সময় আমার একটা কথা মনে পড়লো। মাসাই ও নন্দি জাতীয় লোকেরা কি করে সিংহ শিকার করে, তার একটা ছবি তোলা। জন পনেরো মাসাই বর্শাধারী যোদ্ধাকে যুদ্ধসাজে সাজিয়ে ক্যাম্প সিম্বায় রওনা করতে হবে মোটর ট্রাকে। তারপর সেখানে ওরা ওদের সিংহ শিকারের অভিনয় করবে—আমরা তাদের ছবি নেবো। তদনুসারে আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরে লোক যোগাড় করলাম, তারা রাজি হোল, মোটর ট্রাক যোগে তাদের সকলকে সুশৃঙ্খলায় ক্যাম্প সিম্বাতে পাঠিয়ে দেওয়াও গেল।

কিন্তু তারপর বাধলো গোল।

ওরা তাঁবুতে এলো বটে, কিন্তু কিছুতেই শিকারের অভিনয় করতে রাজি হয় না। তারা অভিনয় করতে রাজি নয়, সত্যকার সিংহ শিকার করবে। আমরা বললাম—ভালই তো, তাই কর। সিংহের অভাব কি?

দুতিন দিন পরে সিংহ শিকারের সুযোগ উপস্থিত হোল ওদের। মাসাই জাতির শিকারীরা সিংহ শিকারের সময়

যে রকম সাহস ও কৌশল প্রদর্শন করে, তাতে তাদের বদমেজাজকে সহজেই ক্ষমা করা যায়। এদের সিংহ শিকার একটা দেখবার জিনিস। আমরা এর নিঁখুত ছবি তুলেছিলাম এবং সভ্যজগতের প্রায় সকলেই আমাদের ছবিতে এই বিখ্যাত সিংহ শিকার দেখেছেন।

ক্যাম্প সিম্বা পরিত্যাগ করবার পূর্ব্বে আমার মনে হোল যাদের সাহায্যে আমাদের ছবি তোলার কাজ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে তাদের প্রতি কিছু সম্মান দেখানো দরকার। আমরা আশপাশের শিকারীদের তাঁবুর সকলকে এক বিদায়ভোজে নিমন্ত্রণ করলাম। সবশুদ্ধ লোক হোল সতেরো জন—মুক্ত আকাশের তলায় আমাদের লম্বা ডিনার-টেবিল পাতা হোল।

এই সতেরো জন লোকই অবশ্য ইউরোপীয়, এরা আফ্রিকা ভ্রমণে অভিজ্ঞ, নানা বিষয়ে এরা আমাদের সাহায্য করেছে। সন্ধ্যার পর আমাদের ভোজ আরম্ভ হোল, আমাদের ঘরে সেই বিস্তৃত বন্যপ্রান্তরে হায়েনা ও শৃগাল-কুলের নৈশচীৎকার যেন ইউরোপে আমেরিকায় বড় হোটেলের ভোজের সময় ঐক্যতান বাদনের কাজ করছিল। সে অদ্ভুত রাত্রি এবং সেই বিদায়ভোজের বিচিত্র পটভূমি আমার বহুদিন মনে থাকবে। শুধু হায়েনা ও শৃগাল নয়, সিংহের গর্জ্জনও শ্রুত হয়েছিল আমাদের ভোজের সময়।

এর কয়েকদিন পরে আমরা ক্যাম্প সিম্বা থেকে তাঁবু ওঠালাম। এখান থেকে চলে যাবার সময় আমরা চারিপাশে শুকনো ঘাসে আগুন ধরিয়ে দিলাম। এখানকার সব ছিল ভাল, কিন্তু এত উইয়ের উপদ্রব আর কোথাও দেখিনি। আমাদের সব জিনিসে তাদের ভাগ বসানো চাইই। তাঁবুর ওপরের কাঠ খেয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলেছিল উইয়ের দল—টেবিল পেতে খাবার সময় খাদ্যবস্তুর সঙ্গে কাঠের গুঁড়ো খেতে হোত রোজ। আগুন দিয়ে এই উইয়ের বংশ ধ্বংস করে যাবোই।

সেরেণপেটি প্রান্তরে নানারকম বন্যজন্তু আছে। এরা অনেক সময় এক এক দলে অনেকগুলো করে থাকে। ইল্যাড, রিড্‌বাক্, হার্টিবিষ্ট প্রভৃতি বড় বড় জানোয়ারের দল মানুষ দেখলে যে খুব ভয় পায় তা নয়, তাদের কাছেও যাওয়া যায়—কিন্তু যেই ক্যামেরায় ছবি তোলবার জন্যে তে-পায়া ইত্যাদি খাটানো হচ্চে—অমনি তারা ছুটে পালাবে। কিন্তু ছুটে বেশীদূর যাবে না। ফটো নেবার পাল্লার বাইরে কোথাও গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে যাবে এবং সকৌতূহলে আমাদের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করবে। আবার যদি আমরা এগিয়ে যাই, ওরাও আবার কিছু দূর সরে গিয়ে দাঁড়াবে।

অবশেষে আমরা এ সমস্যার মীমাংসা করেছিলাম। ওদের দিকে কখনো দ্রুত অগ্রসর হতে নেই বা চারিপাশের প্রান্তরের রংয়ের সঙ্গে মিশ খায় এমন কোনো



'মাসাই জাতির সিংহ শিকারী'—

আবরণের আড়ালে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হয়। ঘাসের তৈরি বেড়া সমান রেখে একজন বা দুজন ক্যামেরা নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়, তাড়াতাড়ি করতে নেই। এভাবে আমরা বড় বড় দলের ছবি তুলতে পেরেছিলাম তারপর, জিনিসটা যখন বুঝতে পারলাম।

তবে যদি ওদের ক্লোজ-আপ ফটো নিতে হয় তবে কোনো জলের ধারে লতাপাতার আড়াল তৈরী করে ধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা করাই বিধি। এ ব্যাপারেও আমাদের বিফল হতে হয়েচে অনেকবার কিন্তু। দিনের পর দিন কোনো জলের ধারে অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করবার পরে অবশেষে দেখা গেল ইল্যাড্ বা হার্টিবিষ্টের দল এ জলাটা ছেড়ে দিয়ে আজকাল অন্য কোনো জায়গায় জল খেতে যাচ্চে।

জেব্রা সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে জেব্রার গাত্রচর্ম্মের বর্ণসংস্থান প্রকৃতির কি খেয়ালে হয়েছিল সে বিষয়ে যাঁরা বাড়ী বসে প্রাণীবিদ্যা আলোচনা করেন তাঁদের মন্তের সঙ্গে আফ্রিকা-ভ্রমণকারী বা শিকারীদের মত মেলে না।

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ বলেন ও ধরণের সাদা-কালো ডোরা-কাটা গাত্রচর্ম্ম মরুপ্রান্তরের মধ্যে দৃষ্টিবিভ্রম জাগিয়ে নিরীহ জেব্রাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে। যাঁরা এ কথা বলে থাকেন, তাঁরা কখনও জেব্রা দেখেননি কিংবা জেব্রাকে দেখলেও দেখেচেন সার্কাসে। তারা জানেন না যে জেব্রার এই গায়ের রংটি তাকে সমতল প্রান্তরে বহুদূর থেকে শত্রুর কাছে ধরিয়ে দেয়, যদি সে আলোর বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে না থাকে এবং শত্রুর দিকে মাথা দিয়ে লম্বালম্বি ভাবে দাঁড়িয়ে না থাকে। এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে শুধু জেব্রা কেন যে কোনো জন্তু আফ্রিকার মরু প্রান্তরের রংয়ের সঙ্গে মিলিয়ে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা কথা ভেবে দেখতে হবে, আফ্রিকার বনপ্রান্তরে জেব্রার স্বাভাবিক শত্রু মানুষ নয়—সিংহ। সিংহ ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে শিকার খুঁজে বার করে, দৃষ্টিশক্তির দ্বারা তত নয়। সেরেণপেটি প্রান্তরে কঙ্গোনি বলে এক প্রকারের হরিণ বা ষাঁড়ের মত জানোয়ার আছে, ফটোগ্রাফারের জীবন তারা অতিষ্ঠ করে তোলে। এরা অত্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্ত জানোয়ার, যখনই কোনো বড় জানোয়ারের দলের ছবি তোলবার চেষ্টা করেছি, সব তোড়জোর করে এবার কল ঘোরাতে যাবো, অমনি কঙ্গোনি দলের সর্দারটি এক ভীষণ হুঙ্কার ছাড়লো, সঙ্গে সঙ্গে যত জানোয়ার যেখানে ছিল, সব নক্ষত্রবেগে এদিক ওদিক ছুটতে আরম্ভ করলে। দিনটাই মাটি হয়ে যেত একেবারে। সেরেণপেটি প্রান্তর ছাড়তে হোল কারণ আমায় যেতে হবে সাদা গণ্ডারের ছবি নিতে বেলজিয়ান কঙ্গোতে। সাদা গণ্ডার আফ্রিকা থেকে প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছে, এখনও সামান্য যা অবশিষ্ট আছে, এইবেলা ওদের ছবি তুলে না রাখলে এর পর আফ্রিকার শ্বেত গণ্ডার রূপকথার জীব হয়ে দাঁড়াবে।

ক্যাম্প শিবা ছেড়ে আমরা গেলাম ইতুরীর আরণ্য প্রদেশে বন্য বামনজাতির ফটো নিতে। ইতুরীর গভীর অরণ্যে এই অদ্ভুতদর্শন বামনেরা বাস করে এবং সাধারণতঃ এরা অত্যন্ত ভীরু ও লাজুক প্রকৃতির। বিদেশী লোক দেখলেই গহন বনে পালায়। তীর ধনু এদের প্রধান অস্ত্র। ধনুকের ব্যবহারে এরা এমন দক্ষ যে বড় বড় বন্য হস্তী অবলীলাক্রমে এদের নিক্ষিপ্ত তীরের মুখে প্রাণ দেয়।

ফরাসী অধিকৃত কঙ্গোতে উরাঙ্গি জাতির স্ত্রীলোকে তাদের অধর ও ওষ্ঠ চিরে তার মধ্যে আট ন' ইঞ্চি ব্যাস-যুক্ত ধাতুর গোল চাকতি পরিয়ে রাখে। এতে ওদের অতি কুশ্রী দেখায়। পূর্ব্বে যখন আরব দস্যুরা ক্রীতদাস সংগ্রহের জন্তে উরাঙ্গি জাতির গ্রামসমূহে লুঠ করতো, তখন গ্রামের স্ত্রীলোকদের এই বর্ব্বর দস্যুদের কবল থেকে রক্ষা করবার জন্তেই নাকি এই প্রথা উরাঙ্গি জাতির মধ্যে প্রচলিত হয়েছিল।

প্রসঙ্গক্রমে এ কথা বলতে পারি যে আমার মতে মাসাই ও নান্দি জাতির মেয়েরা পূর্ব্ব আফ্রিকার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুশ্রী ও লাবণ্যবতী।

আমার ইচ্ছা ছিল বেলজিয়ান ও ফরাসী কঙ্গোর মধ্যে দিয়ে ক্রমশঃ মধ্য-আফ্রিকার দিকে অগ্রসর হবো। পথে নাইজিরিয়া প্রদেশ ও ক্যামেরুণ পর্ব্বতমালা পার হয়ে যাবো। এই পথে যাবার সময় দীর্ঘসূত্রী আফ্রিকা আর 'বাচ্ছি-বাবো' মন্ত্র নিয়ে আমার পিছু লাগলো বড় বেশী করে। প্রত্যেক কাজে পদে পদে বাধা পাওয়া দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সামিল হয়ে দাঁড়ালো। লাগোস্ পৌছুবার

পূর্ব্বে ভ্রমণকারীর অদৃষ্টে যত প্রকার দুর্দ্দৈব ঘটা সম্ভব, তা সবগুলিই আমাদের ঘটে গেল।

নেমে গেল ভীষণ বর্ষা, দিনের পর দিন যায়, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, বৃষ্টির বিরাম নেই। রাস্তাঘাট কাদায় দুর্গম কুলীরা একটুও নাড়াতে পারলে না গাড়ীখানা। সারা রাত্রি ধরে এই ব্যাপার চললো। অবশেষে সকাল হোল। আমি আমাদের দলের কুলীর সর্দ্দারকে নিকটবর্ত্তী গ্রামে পাঠিয়ে দিলাম লোক সংগ্রহ করে আনবার জন্যে।



'একদল সিংহ'—

হয়ে উঠলো, মোটর ট্রাক কাদায় ডুবে যায় তো আর উঠতে চায় না। কুলীরা দিন দিন অলস হয়ে উঠলো, বোঝা বইতে কাজ করতে অত্যন্ত দেরি করতে থাকে। পথের মাঝখানে বড় বড় নদী পড়তে লাগলো, পার হবার সেতু নেই সে নদীর ওপর। এর ওপর দলের লোকের মধ্যে দেখা দিলে রোগ, ম্যালেরিয়া জর পেটের পীড়া। আমাদের সকলের মন ও শরীর ভেঙে গেল, উৎসাহ কমে গেল।

এখনও সেসব দিনের কথা দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়।

আফ্রিকার ভ্রমণপর্ব্ব যখন আমাদের প্রায় শেষ হয়ে এসেচে, সে সময় লামি সহর থেকে সত্তর মাইল দূরে আমাদের মোটর ট্রাক এক জলার মধ্যে কাদায় আটকে গেল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কত চেষ্টা করা হোল, আমাদের

কিছুক্ষণ পরে আমার কাণে প্রবেশ করলো রণবাদ্যের আওয়াজ এবং বাজনার তালে তালে সম্মিলিত বহু কণ্ঠের যুদ্ধ-সংগীত। ক্রমে বাজনা ও গানের শব্দ নিকটবর্ত্তী হোল, ঘোড়ার পায়ের খুরের ধ্বনিও শুনতে পেলাম, সঙ্গে সঙ্গে ঢাক ঢোলের শব্দ। বনজঙ্গলের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল একদল অশ্বারোহী আমাদের দিকে আসচে।

ব্যাপার কি, ক্রমে বোঝা গেল।

নিকটবর্ত্তী গ্রামের আমীর আমাদের বিপদের কথা শুনে তাঁর সৈন্য নিয়ে সাহায্য করতে আসচেন। এই সৈন্যদলের পুরোভাগে স্বয়ং আমীর। তাঁর সুদর্শন কৃষ্ণকায় অশ্বটি সোনালী ও রূপালী সাজে সজ্জিত, আমীরের বহুমূল্য লাল ও নীল রেশমের রাজপরিচ্ছদ, সর্ব্বাঙ্গে মণিমুক্তা ঝলমল করচে।

আমীরকে কোনো প্রাচীনকালের রাজপুত্রের মতই দেখাচ্ছিল। কিন্তু আমীর যে স্বপ্নরাজ্যেই বাস করেন না, পরক্ষণে আমরা বুঝলাম। তাঁর আদেশে অশ্বারোহী সৈন্যদল দাঁড়িয়ে গেল, ঘোড়া থেকে নেমে সবাই গিয়ে কাদার মধ্যে আটকানো মোটর ট্রাকে কাঁধ দিয়ে ঠেলতে লাগলো, ওদিকে ওদের রণবাদ্য সমান তালেই বাজচে তখনও।

সৈন্যদলের সমবেত চেষ্টার ফলে চক্ষের নিমিষে আমাদের মোটর ট্রাক্ শুকনো ডাঙায় উঠলো জলাভূমি ছেড়ে। তারপর আমীর আমার নিকটে এসে ঘোড়া থামালেন এবং ঘোড়ার ওপর বসেই গম্ভীরভাবেই আমার করমর্দ্দন করলেন। পরক্ষণে তাঁর মুখ থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ নির্গত হোল, সৈন্যদল যেমন এসেছিল, আবার ঠিক সে ভাবেই গ্রামের অভিমুখে চললো।

এই অজ্ঞাতনামা ক্ষুদ্র রাজাকে আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে চিরকাল মনে রাখবো, আফ্রিকার আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতাকে ইনি জয় করেচেন অতি অদ্ভুতভাবে।

১৪০০ সাল

শ্রীসমীর ঘোষ

আবার আসিব আমি ফিরে এই বাতায়নতলে ;
সেদিন মুকুলে ফুলে ডালি তার ভরি' বাসন্তিকা
এসেছে ধরায় নামি'। শ্যামাঙ্গিনী কুঞ্জবীথিকা
রক্তিম কামনাভারে শিহরি' উঠিছে পলে পলে।
সমুদ্রফেনার মত শান্তস্মিত গন্ধরাজ দলে
একে একে মিলাইয়া বিনিসুতা রচিলে মালিকা ;
প্রসাধন সমাপনে তুমি যেন হোলে মালবিকা
গোধূলির আলো আসি' ঝলসিল মেঘের কুন্তলে।

প্রতীচ্যের নীল-অন্তে বিছাইয়া অঞ্চল ধূসর
সন্ধ্যারাণী জ্বালি' দিল চন্দ্রিকার স্বর্ণদীপাধার ;
সেই স্বর্ণ আলো পড়ি' শুভ্রবক্ষে স্মিত যূথিকার
মনোরম শেষ অর্ঘ্যে সুরভিত করিল বাসর।
দক্ষিণ-দিগন্ত-বাহী সমীরণ গাহিল আবার :
বীণা তুলে গাহ কবি—ফিরে এনু শত বর্ষান্তর।

রাবণ

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

অবরুদ্ধ রাজধানীর রাজপ্রাসাদের বিশাল খোলা ছাদের উপর রাজা রাবণ একাকী পায়চারী করিতেছিলেন। রাত্রি খুব বেশী গভীর না হইলেও একেবারে অগভীরও নহে। রাবণ সুগভীর চিন্তায় নিমগ্ন। বিশটি চোখে কখনো দপ্ করিয়া যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে, কখনো বা বিরাজ করিতেছে বিষাদের ম্লান ছায়া। উপরে বহু উপরে নীল সায়রে সোনার থালা ভাসিতেছে যেন; এবং নীচের সায়রে তাহারি প্রতিবিম্ব বহুধা বিচ্ছিন্ন হইয়া ভাসিতেছে। রাবণ কখনো বা নীরবে দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতেছিলেন, কখনো বা নীচু দিকে চাহিয়া চক্ষু মুছিতেছিলেন। রাবণের চোখে অশ্রুর বাষ্পজাল! আশ্চর্য্য! কিন্তু আশ্চর্য্য হইলেও সত্য। বহু চোখে যিনি অশ্রু ঝরান তাঁহার চোখেও অশ্রু ঝরা একেবারে অসম্ভব নহে।

কুম্ভকর্ণ তাঁহার ঘুমের ঘরে ঘুমাইতেছিলেন। তাঁহার বিরাট নাসিকাধ্বনি রাজধানীর হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, কিন্তু এই ধ্বনির সহিত রাজধানীর সবাই অভ্যস্ত থাকার দরুণ ইহার জন্য কাহারো তেমন কিছু অসুবিধা হইতেছিল না। কিন্তু অসুবিধা হইতেছিল রাবণের। ধ্বনি শুনিয়া তাঁহার মনে হইল এই ধ্বনি যাহা হইতে বাহির হইতেছে সেই নাসিকার কথা, এবং নাসিকার সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়িল নাসিকার মালিক ভ্রাতা কুম্ভকর্ণের কথা। ভাবিলেন "হায় কুম্ভকর্ণ! তুমিই সুখী। সোনার লঙ্কা নর ও বানরে মিলিয়া ঘিরিয়া রহিয়াছে, আর তুমি দিব্বি নাক ডাকাইতেছ। আর আমরা কাঁদিয়া মরিতেছি। তোমার ঘুমের মেয়াদ এখনো ফুরায় নাই। ঘুমাও, তুমি ঘুমাও। যতক্ষণ লঙ্কার দফা সারা না হইতেছে ততক্ষণ জাগিও না। যখন সোনার লঙ্কা পিতলের লঙ্কায় পরিণত হইবে তখন, হে নিদ্রাবিশারদ, তখন তুমি জাগিও।" ভাবিতে ভাবিতেই তাঁহার কণ্ঠ কান্নায় ভারী হইয়া আসিল। রুমাল বাহির করিয়া রাবণ চট্ করিয়া চোখের জল রুমালে মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিলেন।

পরক্ষণেই মনে হইল "ছি ছি! এ কি করিতেছি! ঘুমন্ত কুম্ভকর্ণের উপর অভিমান করিতেছি! হায় হায়, আমি কি বেয়াক্কেল! কি বেকুব! সে যদি জাগিয়া জাগিয়া ঘুমাইত তাহা হইলে না হয় তাহার উপর অভিমান করা চলিতে পারিত। কিন্তু সে যে বাস্তবিক ঘুমাইয়া ঘুমাইয়াই ঘুমাইতেছে। জাগিয়া আমিই বা এমন কি করিতেছি? সে ঘুমাইতেছে, আর আমি পায়চারী করিতেছি। ঘুমানো এবং পায়চারীর মধ্যে এমন কি তফাৎ যাহার জন্য আমি ঘুমন্ত কুম্ভকর্ণের উপর অভিমান করিতে পারি?" ভাবিতে ভাবিতে রাবণ পায়চারী করিতে লাগিলেন।

রাবণ সত্য কথা সোজা করিয়া বলিতে গেলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গিয়াছিলেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নহে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। রামকে যত সহজ লোক মনে করিয়াছিলেন রাম যে মোটেই সহজ লোক নয় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ

তিনি পাইয়াছেন। এবং কচি ছোকরা রাম কোথা হইতে আসিয়া এমন নিদারুণ রামলাথি মারিবে তাহাও ছিল রাবণের কল্পনার অতীত। কল্পনার অতীত যখন বাস্তব হইয়া চোখের সামনে দেখা দেয় তখন চোখের মালিকের অবস্থা কিরূপ হয় তাহা আন্দাজ করা কঠিন নহে। রাবণের অবস্থা সেরূপই হইয়াছিল।

সমুদ্রের তরঙ্গের উপর শিলা ভাসাইয়া যে রাস্তা তৈয়ারী করিয়াছে সে তো সোজা ইঞ্জিনিয়ার নয়! সে যে আরো কত অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিবে তাহা কে বলিতে পারে? পাছে আরো অসম্ভব সম্ভব হইয়া উঠে এই ভয় রাবণের মাথায় মাথায় ভূতের মত ভর করিয়া বসিল। রাবণ একটা একটা করিয়া দশটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলেন।

সহসা পিছন হইতে যেন বামাকণ্ঠে কে ডাকিল "মহারাজ!" রাবণের মনে হইল মন্দোদরীর গলা। ঘুমন্ত মন্দোদরীকে একা ফেলিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া তিনি ছাতে চলিয়া আসিয়াছিলেন; মনে করিলেন মন্দোদরীর বুঝি ঘুম ভাঙিয়াছে। পিছন দিকে না চাহিয়াই কহিলে "মন্দোদরী!"

উত্তর আসিল "আজ্ঞে, আমি মন্দোদরী নই, সারণ।"

রাবণ ফিরিয়া দেখেন সত্য সত্যই সারণ, প্রধান মন্ত্রী সারণ। চন্দ্রালোক পড়িয়াও মুখের মালিন্য যায় নাই, দুই চক্ষু যেন কাঁদিয়া লাল।

রাবণ কহিলেন "ওঃ, মন্ত্রী!"

সারণ রাবণের একটু আগের ভুলের কথা ভাবিয়া ব্যথিত হইলেন। ভাবিলেন "হায়! এ কি করুণ পরিবর্ত্তন! আমাকে কিনা ভুল করিলেন মন্দোদরী বলিয়া! হে বিধাতা! ইহাও আমাকে দেখিতে হইল!"

কহিলেন "আর তো নিশ্চিন্ত থাকলে চলে না মহারাজ!"

অন্য সময় হইলে রাবণ অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিতেন, কিন্তু এক্ষণে তাহা হইলেন না। যথাসাধ্য মেজাজ ঠাণ্ডা রাখিয়াই কহিলেন "নিশ্চিন্ত থাকতে আর পারছি কোথায় মন্ত্রী? নিদ্রা ভুলে সচিন্ত ভাবে পায়চারী করছি। একটি মুহূর্ত্ত চিন্তা থেকে রেহাই পাচ্ছি না।...শোনো। আজ, এই তো মোটে খানিকক্ষণ আগে, ঘুমের ঘোরে মন্দোদরী কেঁদে কেঁদে উঠছিল। যে মন্দোদরী জেগেও কদাচিৎ কাঁদে সেই মন্দোদরী যখন ঘুমিয়ে কাঁদতে সুরু করেছে তখনি নিঃসংশয় হয়েছি সারণ, যে গতিক বড় সুবিধার নয়। এখন মনে হচ্ছে হাজার মন্ত্রণাতেও আর কুলোবে না এখন মন্ত্রণাতীত কিছু না হলে আর চলবে না।"

এমন সময় দূরে বহু বানর সমস্বরে শ্রীরামচন্দ্রের জয়গান গাহিতে লাগিল। রাবণ কহিলেন "ঐ শোনো সারণ। ঐ শোনো! রামের জয়গানে বাতাসের দম আটকে আস্‌ছে। কিন্তু আমার রাজধানীতে শুন্‌তে পাচ্ছ কি আমার জয়গান?"

যে গান গাওয়া হইতেছে না সে গান শুনিবার মত ক্ষমতা সারণের ছিল না। কিন্তু সেই অনুযায়ী উত্তর দেওয়া সমীচীন মনে না করিয়া সারণ কহিলেন "মহারাজ! জয়গান গাহিলেই জয় হয় এ কথা আর যেই মানুক, আমি মানতে চাই না। ওরা যতই জয়গান গেয়ে চলুক, আপনার কীর্ত্তিকে কখনো ম্লান করতে পারবে না। এই আমার স্থির বিশ্বাস।"

"হায় রে বিশ্বাস!" নিশ্বাস ছাড়িয়া রাবণ কহিলেন। "বিশ্বাসের খাঁচায় সব কিছুকে ধরে রাখা যায় না সারণ। তা যদি যেতো, তা হলে—"

দূরে আবার রামের জয়ধ্বনি শোনা গেল। অসমাপ্ত বাক্যটি সমাপ্ত না করিয়াই রাবণ পায়চারী করিতে লাগিলেন; সারণও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাহাই করিতে লাগিলেন।

এদিকে অশোকবনে সীতার চারিদিকে চেড়ীর দল আবোল তাবোল বকিতেছে। সীতাদেবীর মনের ভিতরে আশা ও নিরাশার দ্বন্দ চলিয়াছে। কিন্তু বাহির হইতে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। বনের ভিতরের জমাট অন্ধকারকে কয়েকটা মিট্‌মিটে প্রদীপ কিছুটা কম জমাট করিয়াছে। সীতাকে আক্কেল দিবার জন্য রাবণ ইচ্ছা করিয়াই অশোকবনে আলোর ব্যবস্থা করেন নাই। উপর হইতে চাঁদের আলোরও এমন সাধ্য নাই যে বনের সবুজ ছাদ ভেদ করিয়া বনের ভিতরে ঢুকিবে।

সীতার কথা মনে করিয়াই সারণ কহিলেন "এক কাজ করলে হয় না, মহারাজ?"

মহারাজ কহিলেন, "কি কাজ, সারণ?"

সারণ উত্তর দিলেন "সীতাকে ফেরত দেওয়া। ঐ একটি কাজ করলেই তো সব হাঙ্গামা চুকে যায়। আমার তো মনে হয়—"

রাবণ একটু রাগ করিয়াই কহিলেন "বাজে কথা বোলো না সারণ। শূর্পী ছুঁড়ীর নাক কাটা গেছে। এখন আবার সীতাকে কাপুরুষের মত ফেরত দিলে আমার নাক কানও কি কাটা যাবে না?"

পকেট হইতে দূরবীণ লইয়া রাবণ দূরের দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন, এবং দুই কানে দূর-শোন যন্ত্র লাগাইয়া দূরের শ্রাব্য শুনিতে লাগিলেন। দেখিলেন এবং শুনিলেন বিভীষণ রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে দিব্বি সরস আলোচনায় নিমগ্ন। আশ্চর্য্য! মুখে চোখে এতটুকু ব্যথার আভাস নাই। জননী নিকষার উপর রাবণের রাগ হইল, কিন্তু এত বছর পরে আর রাগ করিয়া লাভ নাই। রাগের তীর যত জোরে ছোঁরা যায় তত জোরেই নিজের গায়েই আসিয়া বেঁধে।

তবু, রাগের একটা বিশেষ ধর্ম্মই এই যে রাগ তখনই বেশী হয় যখন রাগিয়া কোন লাভ নাই। আর সহ্য করিতে না পারিয়া রাবণ চক্ষু ও কর্ণের সাহায্যকারী যন্ত্রগুলি সারণকে দিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ দেখিয়া শুনিয়া সারণও অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন এবং দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া যান্ত্রিক দূরদর্শন ও দূরশ্রবণ বন্ধ করিয়া দিলেন।

রাবণ কহিলেন "দেখলে ব্যাপার?"

সারণ কহিলেন "দেখলুম মহারাজ। কিন্তু আপনি এতে দুঃখিত হবেন না। যা হয়ে গেছে তার জন্যে দুঃখ করে লাভ নেই। বরং কি করলে এখন লঙ্কার মান রাখতে পারা যায় সেই পরামর্শ করবেন চলুন। মন্ত্রণাগারে অন্যান্য মন্ত্রীরা সবাই বসে অপেক্ষা করছে।"

"তোমরা পরামর্শ করো গে যাও। আমি ছাদে একটু একা থাকতে চাই, যাও।" রাবণের কঠোর কণ্ঠস্বরে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া সারণ নীচে চলিয়া গেলেন। রাবণ আবার চিন্তিত মনে পায়চারী করিতে লাগিলেন।

ভাবিতে লাগিলেন "সারণ কিনা বলিতেছিল সীতাকে ফেরত দিতে। হায়! এই কাপুরুষোচিত মনোভাব তাহার কেন হইল? কেমন করিয়া হইল? বিভীষণ কি বাহির হইয়া

যাইবার পূর্ব্বে সারণের মনে তাহার নিজ মনের ছাপ রাখিয়া গিয়াছে ? উঃ! বিভীষণ! বিভীষণ!" কাছে পাইলে তখন বিভীষণকে তিনি বহু খণ্ডে বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিতেন। বিভীষণের ভাগ্য ভাল তিনি দূরে ছিলেন।

একটু পরেই পিছনে শোনা গেল "মহারাজ!"

বিরক্ত হইয়া রাবণ কহিলেন "জ্বালাতন করো না সারণ।" কিন্তু ফিরিয়া দেখিলেন সারণ নাই, আছেন রাণী মন্দোদরী।

মন্দোদরী কহিলেন "নাথ! আপনার আজ এ রকম ভুল হচ্ছে কেন? শরীর নিশ্চয়ই ভাল নেই। চলুন, আর হিম লাগাবেন না।"

রাবণ কহিলেন "ওঃ, মন্দা ? আমি ভেবেছিলুম সারণ।"

মন্দোদরী কহিলেন "পরামর্শ করতে করতে মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, আপনি আমায় ঘুমন্ত রেখেই দিব্বি চুপি চুপি এসে পড়েছেন।"

রাবণ কহিলে "এমনিতেই যে প্রলয় চলছে, তার উপর আর স্ত্রীবুদ্ধি নেওয়া নিরাপদ মনে হলো না, তাই তোমায় জাগাইনি মন্দা। হিম পড়ছে ঘুমোও গিয়ে যাও।"

"কিন্তু প্রভু" মন্দোদরী কহিলেন "আপনাকে এই হিমের রাতে খোলা ছাতে রেখে কোন প্রাণে আমি ঘুমুতে যাবো ? আপনিও চলুন। অনেক রাত জেগে জেগে শরীর খারাপ করেছেন। আজকের রাতটা একটু ঘুমুবেন চলুন। ভাবতে হয় কাল ভাববেন। আজ ভুলে যান লঙ্কার অবরোধ, ভুলে যান সীতার কথা। আজ ভুলে যান অতীত, ভুলে থাকুন ভবিষ্যৎ, মনে রাখুন শুধু বর্ত্তমান—আর মনে করুন ঘুমের চাইতে বড় বর্ত্তমানে আর কিছু নেই। অতীত নেই, নেই ভবিষ্যৎ, আছে বর্ত্তমান আর ঘুম, ঘুম আর বর্ত্তমান।"

রাবণ ব্যথিত চিত্তে বুঝিলেন (অথবা বুঝিয়া ব্যথিতচিত্ত হইলেন) যে মন্দোদরীর মনে কুম্ভকর্ণ কম্‌প্লেকস্ কাজ করিতেছে, যদিও মন্দোদরী নিজে হয়তো তাহা খেয়াল করেন নাই। তাঁহার উদাসী মন নীরবে হায় হায় করিয়া উঠিল।

তিনি কহিলেন "তোমার এই নীতি তোমার এক ঠাকুরপো খুব ভালো করেই মানছে মন্দা।"

"কুম্ভ ঠাকুরপোর কথা বলছেন, প্রভু?"

"হ্যাঁ মন্দা। ঐ শোন তার নাকের ধ্বনি। হায়! কি অসময়েই সে ঘুমুতে সুরু করেছিল! আরো মাসখানেক আগে সুরু করলে এখন তার ঘুমের মেয়াদ শেষ হয়ে যেতো।"

"কি হত তা হলে?"

"তা হলে এখন আর আমায় এত ভাবতে হত না। একে একে লঙ্কার অনেক প্রদীপই তো নিভলো। আরো যেন না নেভে তার ব্যবস্থা করার জন্যই জাগ্রত কুম্ভকর্ণকে একান্ত দরকার। কিন্তু মেয়াদ ফুরোবার আগে তার ঘুম ভাঙা তো চলবে না মন্দা। সেই হয়েছে বিপদ। আমি সহজে যেতে চাই না, কারণ ঐ পুঁচকে ছোঁড়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কলঙ্ক দেববিজয়ী লঙ্কাধিপতির মাথায় আমি চাপাতে চাই না। যদিও শেষপর্য্যন্ত হয় তো—হয় তো—"

"হয় তো কি প্রভু?"

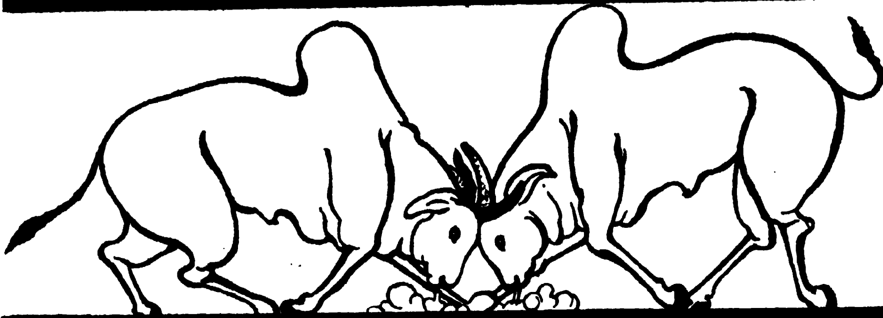
"হয় তো আমাকেই যেতে হবে। যেতেই হবে। কে যেন আমার কাণে কাণে বলে দিচ্ছে লঙ্কা হারবে। হয় তো শেষটা লঙ্কা হারবেই। কিন্তু সেজন্য আমার তত দুঃখ নয় যত দুঃখ ভবিষ্যতের কথা ভেবে। তবে শোনো বলি। বিভীষণ অমর হবে, রামচন্দ্র দিয়েছে তাকে বর। আমাদের লঙ্কার মত আরো কত দেশের দফা যে সে সারবে তা কে বলতে পারে ?"

সহসা রাবণের দুই চোখের সম্মুখ হইতে ভবিষ্যতের যবনিকা সরিয়া গেল ; তাঁহার দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া গেল। তিনি দেখিলেন অমর কেবলমাত্র বিভীষণই হয় নাই, কুম্ভকর্ণও হইয়াছে। দেখিলেন এক বিভীষণই বহু হইয়াছে, কুম্ভকর্ণও বহুরূপে নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যাইতেছে। বিভীষণ এবং কুম্ভকর্ণের বাহ্যিক চেহারা বদলাইলেও ভিতরের চেহারা তেমন কিছু বদলায় নাই। বরং বিভীষণের বৈভিষণ্য কিছু পক্কতর হইয়াছে, এবং কুম্ভকর্ণও আরো পরিপক্কভাবে ঘুমাইতে শিখিয়াছে। দেখিলেন বিভীষণ ঘরের মায়া ছাড়িয়া পরের প্রেমে হাবুডুবু খাইতেছে, কিন্তু অনেকেই তাহাকে বিভীষণ বলিয়া চিনিতে পারিতেছে না। অনেকে চিনিতে পারিয়াই বাহবা দিতেছে। কুম্ভকর্ণকে জাগাইবার জোর চেষ্টা চলিয়াছে, কিন্তু চেষ্টার জোর যত বাড়িতেছে ঘুমের জোরও যেন ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। রাবণ উত্তেজিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন "ওরে কুম্ভকর্ণ। এবার জাগ তুই, জাগ। শীগগীর জাগ।" সে চীৎকার কুম্ভকর্ণের বিপুল নাসিকা-গর্জ্জনকেও ছাপাইয়া উঠিয়া লঙ্কার আকাশ বাতাস ভরিয়া তুলিল। একদল রাক্ষস তাড়াতাড়ি চলিল কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাইতে। এদিকে রাবণ তখন রাজপ্রাসাদের ছাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন ; রাণী মন্দোদরীর চীৎকারে পরিচারিকাগণ আসিয়া অজ্ঞান রাবণকে সজ্ঞান করিবার জন্য যত কিছু করা দরকার করিতেছে।

ঘণ্টাখানেক পরে রাবণের জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে রাবণ কহিলেন "একি ? অ্যাঁ ? ব্যাপার কি ?"

মন্দোদরী কহিলেন "কিছু নয় মহারাজ। মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। এবার নীচে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়বেন চলুন।"

ছলছল চোখে সুবোধ বালকের মত রাণী মন্দোদরীর দিকে তাকাইয়া রাজা রাবণ কহিলেন "চলো।"





চলন্তিকা

সম্বুদ্ধ

আর চিন্তা নাই, জারমলীন আসিয়াছে। অন্যূন দুইজন রসগ্রাহী পাঠকের অভিনন্দন পাইয়াছি, ‘চলন্তিকা’ নাকি ভাল লেখা হইতেছে। মন্তব্যকারী একজন নহেন, অনেক ; এবং তাঁহারা প্রিয় কথা বলিয়াছেন, অতএব রসজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁহাদের কথা অবিশ্বাস করা কাজেই চলে না।

বিশেষত যখন এই উক্তির মধ্যে তাঁহাদের কোন পার্থিব প্রত্যাশা নিহিত নাই। একদম নিষ্কাম নিষ্কর উক্তি। চলন্তিকা পড়িয়া তাঁহাদের ভাল লাগিয়াছে ; সেই কথাই তাঁহারা বলিয়াছেন —আমি লোকটা ‘বলি ভাল’।

অর্থ তলাইয়া তাঁহারা দেখেন নাই। দেখিলে হৃষ্ট হইতেন না, চটিতেন। চটেন নাই, আমি আর তাঁহাদের উপরে চটিয়া কি করিব, অগত্যা আমিও হৃষ্ট হইলাম।

আমাদের তিনকড়িদার একটি বাতিক আছে। তাঁহার ধারণা আমরা, এবং বিশেষ করিয়া আমিই, তাঁহার শনি, নহিলে তাঁহার কেন্দ্রস্থিত অনিবার্য্য বৃহস্পতির রোখ্ কেহ ঠেকাইতে পারিত না। মানুষ বড় হয় অরিজিন্যালিটির জোরে। সেদিক দিয়া তিনকড়িদা একেবারে বড়িষ্ঠ লোক। গড়ে প্রতি উনিশ ঘণ্টা বাইশ মিনিটে একবার করিয়া একটা না একটা অরিজিন্যাল আইডিয়া তাঁহার মাথায় গজাইয়া উঠে। কেবল আমরা দুরাত্মারাই নাকি ঠাট্টা করিয়া তাঁহার মেজাজ খারাপ করিয়া দিই, ফলে সে আইডিয়া আর ডালপালা মেলিয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে না। নহিলে এতদিন তিনি অনেক কিছু মহৎ ব্যাপারই করিয়া ফেলিতে পারিতেন।

খবরের কাগজ বানাইবার প্রস্তাবে আমি উৎসাহ দিই নাই ; সেই হইতেই তিনকড়িদা চটিয়াছিলেন। এই ক’মাসের মধ্যে আমার তত্ত্ব পর্য্যন্ত লইতে আসেন নাই।

কিন্তু আবার আসিলেনও। নূতন আইডিয়া মাথার মধ্যে ঠেলা মারিল ; সে সময়ে আমাকে না শুনাইয়া তাঁহার স্বস্তি নাই। রাগই করুন আর যাই করুন, মনে মনে আমাকে ভালই বাসেন তিনকড়িদা।

*

বিকালে বাড়ি ফিরিয়া একটু চিৎ হইয়া বিশ্রাম করিতেছি, তিনি আসিলেন। আসিয়াই কহিলেন, ওহে, তোমাকে ভারি দরকার।

কহিলাম, বসুন।

তিনকড়িদা বসিলেন। কহিলেন, কথাটা বলিতেও হয়, আবার ভরসাও পাই না। তুমি তো শুনিলেই এক পালা ঠাট্টা বিদ্রূপ জুড়িয়া দিবে।

সদ্য সদ্য প্রশস্তি পাইয়াছি, মনটা ভাল ছিল। কহিলাম, আপনি আমাকে এই কথা বলিলেন, দাদা? আমি আপনাকে ঠাট্টা করি!

তিনকড়িদা কহিলেন, না, তা, মানে ঠাট্টা ঠিক নয়, তবে কি জান…

আমি কহিলাম, জানি। কিন্তু এত বড় কথা যখন আপনি বলিলেন, আমারও প্রতিজ্ঞা, আজ আপনার কথা শুনিবই। বলুন কি কথা—বাহির করুন কাগজপত্র, যা থাকে কপালে।

তিনকড়িদা কহিলেন, কিসের কাগজপত্র?

আমি কহিলাম, খসড়ার। প্ল্যানের। ঠিক ধরিয়াছি কিনা তাই বলুন।

তিনকড়িদা কহিলেন, খসড়া তো এখনও কিছু ঠিক করি নাই। তোমার মতটা শুধু জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম।

আমি কহিলাম, আমার মত আছে। সম্পূর্ণ মত আছে। এই নিন হাত। এবার বলুন প্ল্যানটা কি।

তিনকড়িদা বার দুই ঢোক গিলিলেন। তিন বার মাথা চুলকাইলেন। চারবার উস্‌খুস করিলেন। তারপর কহিলেন, বলিতেছিলাম কি, যুদ্ধ তো বাধিয়াছে, এই ফাঁকে একটা ব্যবসা ফাঁদিয়া ফেলিলে হইত না?

কহিলাম, নিশ্চয়। লাগিয়া যান আপনি, আমি একশ টাকার শেয়ার কিনিব। কিসের ব্যবসা করিবেন?

তিনকড়িদা কহিলেন, চামড়ার। ভাবিয়া দেখিলাম, ওটার মত লাভ কিছুতে নাই।

তারপর প্রায় পনেরো মিনিট ব্যাপী একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া তিনকড়িদা আমাকে ব্যবসার ভবিষ্যৎটা বুঝাইয়া দিলেন। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশি কাঁচা চামড়া রপ্তানি হয় ভারতবর্ষ হইতে। যুদ্ধের ফলে ইউরোপের কারখানা বন্ধ হইবে, এই ফাঁকে কারখানা বসাইয়া বাজার হাত করিয়া ফেলিতে পারিলে ইত্যাদি।

শুনিয়া কহিলাম, কিন্তু একটি কথা, কারখানা যে করিবেন, বাটার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন তো?

তিনকড়িদা কহিলেন, আঁটিতে মোটে হইবেই না। বাটা খালি জুতা বানায়। আমরা জুতা বানাইব না।

আমি কহিলাম, কি বানাইবেন তবে? লাগাম? কিন্তু এখনকার যুদ্ধ হয় ট্যাঙ্কে চড়িয়া। তাহার মুখে লাগাম থাকে না।

তিনকড়িদা কহিলেন, ওসব কিছু না। ঠিক করিয়াছি, বানাইব ফুটবল।

আমি কহিলাম, ফুটবল কত আর চলিবে ?

তিনকড়িদা কহিলেন, কেন চলিবে না ? এটা চৈত্র মাস। সামনেই সীজন। বিলাতি ফুটবল এবার বাজারে আসিবে না। আসিলেও অত্যন্ত চড়া দামে। আমরা সস্তায় বেচিব। সেজন্য ভাবি না, এখন একটি মাত্র প্রশ্ন হইল, দেশি চামড়ার তৈরি বল বিলাতির সমান মজবুত হইবে কিনা। কি প্রসেসে ট্যান্ করা যায়, সেইটা কোন স্পেশালিষ্টকে জিজ্ঞাসা করা দরকার। তোমার চেনা তেমন কেহ আছেন কিনা, তাহাই জানিতে আসিলাম।

আমি কহিলাম, এই কথা ? তা, এর জন্য আর স্পেশালিষ্ট কনসাল্ট্ করিতে হইবে না। আমিই আপনাকে অভয় দিতেছি, আপনি নির্ভয়ে কারখানা খুলিয়া ফেলুন। দেশি চামড়া কোন অংশই বিলাতির চেয়ে খারাপ হইবে না।

তিনকড়িদা দ্বিধার সুরে কহিলেন, সেইখানেই তো কথা। এ বিলাতি ম্যাক্‌গ্রেগর বল একটা চব্বিশ টাকা দাম, টেকেও এক মাস। আমার দেশি জিনিষ যদি সেই রকম টেকে তবেই না দাম চাহিতে পারিব।

এবার আমি চটিয়া উঠিলাম, কহিলাম, পাগল হয়েছেন আপনি ? হাজার বছর লাথি খাইয়াও যে চামড়া এতটুকু কুঁচ্‌কাইল না, দাগ পড়িল না, এক মাসে লাথি মারিয়া সেই চামড়া ফাটাইবে এমন সাধ্য কাহার ? তাহাদের পায়ে কি ডিনামাইট বাঁধা আছে ?

তিনকড়িদা কহিলেন, আহা হা, চট কেন। ঐ তোমার বড় দোষ।

আমি কহিলাম, কেন চটিব না, আলবৎ চটিব। আপনি আমাদের জাতীয় চামড়ার অবমাননা করিয়াছেন। আপনি দেশদ্রোহী।

তিনকড়িদা কাতর হইয়া কহিলেন, না রে ভাই, সে হইতে পারিলে তো সরকারি চাকুরিই পাইতাম, চামড়া ঘাঁটিতে আসিব কেন।

আমি কহিলাম, বেশ, না যদি হন, এখনই যান, গিয়া কারখানা খুলুন। আপনার বিশ্বাস ও নিষ্ঠার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিন।

তিনকড়িদা বিনাবাক্যব্যয়ে চলিয়া গেলেন।

*

আমিও উঠিলাম। বাড়িতে অতিথি আছে—আমার দু'টি আত্মীয়। রামগড়ের পথে একদিনের জন্য আমার বাড়িতেই আসিয়া উঠিয়াছেন। আসিয়াছেন যখন, একবার বাজারেও যাইতে হয়।

সন্ধ্যার পর ; পাড়ার বাজারে ভাল মাছ মিলিল না। বাধ্য হইয়া তিন পয়সার টিকিট কিনিয়া বাসে চাপিলাম। এ সময়টা ভাল মাছ সস্তায় পাইবার একমাত্র স্থান, ওয়াটগঞ্জ বাজার।

খিদিরপুরে মাছ সস্তা। আরও একটি জিনিস সস্তা—পুরানো জুতা। রকম-বেরকমের সেকেণ্ড-ফুট জুতার এমন স্টক আর কোথাও নাই। মাছ কিনিয়া বাজার হইতে বাহির হইতেছি,

দেখি এক বুড়া আপনমনে বকিতে বকিতে চলিয়াছে—চার আনা চটি ছিল তাকে দু' টাকা হাঁকলি বাপু, মড়ার যুদ্ধে কি জুতোও লাগছে আজকাল ?

কৌতূহল হইল। ঘুরিয়া গিয়া পুরানো জুতার দোকানের পাশে দাঁড়াইলাম। বুড়া মিথ্যা বলে নাই। দোকানে অসম্ভব ভিড়। সাধারণত ও দোকানে ভিড় থাকে না; পুরানো জুতা যাহারা কেনে তাহারা লোকের চক্ষু এড়াইয়াই কিনিতে চায়। এদিন দেখিলাম লজ্জাসঙ্কোচের কাহারও বালাই নাই—দিব্য ঠেলাঠেলি করিয়া লোকেরা জুতা কিনিতেছে। দামের দিকেও কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই, দোকানি দুগুণ চারগুণ যা দাম হাঁকিতেছে তাহাই ফেলিয়া দিয়া সকলে জুতা লইয়া যাইতেছে।

ব্যাপার কি বুঝিলাম না। ছেলেপিলেদের হাতে বিজ্ঞাপনের পাতা পড়িবে এই ভয়ে পঞ্জিকা কিনি না। কাছাকাছি কি কোন সিদ্ধিযোগ আছে—জুতাদানে শত-অশ্বমেধতুল্য ফল হইবে? যদি জানা যায়, ভাবিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিলাম। দোকানির নজর পড়িয়াছিল, দুই হাতে জুতা আর পয়সা সামলাইবার ফাঁকে সে একসময় আমার দিকে চাহিল। কহিল, আসুন বাবু, দিই দু' পাটি ভাল দেখে?

আমি কহিলাম, উহুঁ, কিনব না। অমনি দাঁড়িয়েছি।

সে বিস্মিত হইয়া কহিল, লেবেন না? তারপরই কি বুঝিয়া কহিল, ও, যাবেন না বুঝি?

তখন আমার বিস্মিত হইবার পালা। কহিলাম, কোথায়? সে কহিল, কেন, সবাই যেথা যাচ্ছে। কংগ্রেস।

হরিবোল হরি। এই কথাটা এতক্ষণ বুঝি নাই, ভাবিয়া নিজের উপরে ধিক্কার আসিল।

মহাজাতীয় মহাসমরের মহাস্ত্র হিসাবে চরখাই এতদিন চলিয়াছিল। সম্প্রতি দেখা যাইতেছে, চরখা আর চলিবে না। এতদিন কথাটা কাহারও লক্ষ্য হয় নাই—চরখা মানুষে ডান হাতে ঘুরায়, অতএব ওটা দক্ষিণপন্থীদের অস্ত্র। বামপন্থায় চরখা চলিবে না।

অস্ত্র হিসাবে চরখার স্থান দখল কে করিবে তাহা লইয়া গবেষণা চলিতেছে। ছেঁড়া-জুতা চলিতে পারে কিনা, তাহার এক্সপেরিমেণ্ট সুরু হইয়াছে। শ্রীরামপুরে সেই এক্সপেরিমেণ্টের আরম্ভ। শ্রীরামগড়ে শ্রীরামদাসেরা ঠিক কোন পথে গড়াইবেন জানা যায় না—সময়কালে প্রস্তুত যাহাতে থাকিতে পারেন মনে করিয়া সকলে ছেঁড়াজুতা দুই-এক পাটি করিয়া লইয়া যাইতেছেন। সেইজন্যই দোকানে ভিড়—ইউরোপের যুদ্ধের জন্য নয়।

কিন্তু, সত্যই যদি তাই হয়—দি আইডিয়া! বাড়ি ফিরিয়াই তিনকড়িদার সন্ধানে ছুটিলাম। তিনি বাড়িতে ছিলেন না, হয়তো কোন ভাবী ডিরেক্টরের তল্লাসে গিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ বসিয়া, শেষে বউদিকে বলিয়া আসিলাম, কাল সকালেই যেন দাদাকে অতি অবশ্য আমার সঙ্গে দেখা করিতে বলেন।

রাত্রে শুইয়া শুইয়া স্থির করিলাম, এইটাই সুযুক্তি। ফুটবল নয়, তিনকড়িদাকে ছেঁড়া-জুতার কারখানাই বানাইতে পরামর্শ দিব। দুইদিনে লাল হইয়া যাইবেন। মান্য ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া জুতা ছোঁড়াটা খাঁটি বিলাতি কায়দা, অতএব এখন কিছুদিন ওটা চলিবে।

ছেঁড়া-জুতার মূল্য অনেক। মূল্য মানে দাম নয়, ব্যবহারিক মূল্য। ছেঁড়াজুতা শুঁকিলে মৃগীর মূর্চ্ছা ছাড়িয়া যায়। ভারত-মহামহীরুহের শাখায় শাখায় যে শাখামৃগেরা বিচরণ করেন, তাঁহাদের মৃগীরোগ যদি জুতায় ছাড়াইতে পারে, তবে আমি সানন্দে ছেঁড়াজুতাকে জাতীয় পুনরুজ্জীবনের প্রতীক বলিয়া স্বীকার করিব—স্বীকার করিব আধুনিক ভারতের জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি, ডি গুপ্ত, টসের চা, এমন কি মেট্রোর টিকিট এবং সেন্সলের চেয়েও ছেঁড়াজুতার দাম অনেক অনেক অনেক বেশি।

*

চক্ষু বুজিয়া শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছিলাম, একটি মোহন কণ্ঠ কানে আসিল: আলোটা জ্বালিয়া রাখিয়াই ঘুমাইতেছ, ইলেকট্রিকের পয়সা লাগে না?

হাত বাড়াইয়া সুইচটা টিপিয়া দিলাম। নিবিড় নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঘর ভরিয়া গেল।

*

আলোর পরে অন্ধকার, ইহাই পৃথিবীর রীতি। অন্ধকারের পরে আবার আলো।

হরিপুরার পরে রামগড়। ঢাকুরিয়ার পরে বেলেঘাটা। ঢাকুরিয়া লেকে বহুদিন কেহ ডুবিয়া মরে নাই। লেকটা পুরানো হইয়া গিয়াছে—আউট অব্ ফ্যাশন। এখন সেখানে ডুবিতে গেলে অন্যেরা 'বাঙাল' বলিয়া অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিবে। তখন নিজেরই মনে হইবে যেন ভাগ্যদোষে গেলবছরের ডিজাইন জর্জেট পরিয়া চিত্রায় 'পরাজয়' দেখিতে গিয়াছি। তাহার চেয়ে দুদিন অপেক্ষা করাই সমীচীন। বেলেঘাটার লেক সমাপ্ত হইল বলিয়া। সেটায় জলও বেশি থাকিবে।

*

আমাদের ডেথ-রেট কি সত্যই কমিয়া গেল? গত ক'দিনের মধ্যে সেনসেশনাল মৃত্যু ঘটিয়াছে মাত্র দুইজনের—স্যর মাইকেল ও'ডায়ার এবং অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের। দু'জনেরই মৃত্যু আকস্মিক, এবং অনিচ্ছাকৃত। ফিনল্যাণ্ড মরিয়া জুড়াইয়াছে—সেটাও স্বেচ্ছায় নয়।

ইচ্ছা করিয়া মৃত্যুবরণের চল উঠিয়া যাইতেছে—শুধু লেকে নয়, সর্বত্রই। দেশের জন্য প্রাণ দিবার সংকল্পও কিছুদিন যাবৎ শুনিতে পাইতেছি না—চমৎকার কমিউটিং-এর ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত ও স্মার্তরা যুক্তি করিয়া বিধান দিয়াছেন, বিকল্প দিলেই চলিবে—কলৌ নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। নেতারা প্রাণের পরিবর্তে বক্তৃতা দিবেন এবং নীতরা প্রাণের বদলে হাততালি ও টাকার তোড়া দিবেন, তাহাতেই কাজ বেশি হইবে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, দু'টা চারটা মূর্খ গোঁয়ারের প্রাণের তুলনায় হাততালির ও মোটাসোটা একটা টাকার তোড়ার কমার্শিয়াল ভ্যালু অনেক বেশি। টাকায় মহাজাতির ভিত্তির রচনা হইতে পারে। ভিত্তি রচনা সুরুও হইয়া গিয়াছে, সেদিন দেখিয়া আসিলাম।

ভারতকে এক মহাজাতিতে পরিণত করিবার স্বপ্ন দেখিয়া কতগুলা মূর্খ প্রাণবিসর্জন করিয়াছিল তাহাদের চিতাভস্মে মহাজাতিসদনের এতটুকু কোণও গাঁথিয়া উঠিতে পারে নাই। বীর সাভারকর আজও 'হিন্দু'; মহম্মদ আলি লিয়াকৎ হোসেন আসফাক্ উল্লা 'মুসলমান'; এই পরিচয়ই আবার নূতন করিয়া শুনিতেছি।

*

মানুষ যে কম মরিতেছে তাহার প্রকৃত কারণ এই। পরলোকে—স্বর্গই হউক আর নরকই হউক—সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা চলিতেছে। হিন্দু নরক আর মুসলমান নরক, ইম্পিরিয়ালিস্ট নরক আর কমিউনিস্ট নরক—পাঁচিল গাঁথিয়া আলাদা করা হইতেছে। অতএব সেখানকার রাস্তাও বন্ধ। ব্যবস্থা সারা হইবার আগে আর দরজা খোলা হইবে না।

এবং তাহারও মূলে ক্রিয়া করিতেছে যমরাজের বিবমিষা। জঞ্জাল আনিয়া কোথায় রাখিব ভাবিয়া তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন—যতদিন আমরা ইহলোকে থাকি ততদিনই তাঁহার বাঁচোয়া। সাধ করিয়া কচু কেহ গেলে না, তাই এই রাবিশস্তূপকে দূরে ঠেলিয়া রাখিবার তিনি ফিকির খুঁজিতেছেন। বাটোয়ারার দোহাই যেটা দেওয়া হইতেছে সেটা একটা অছিলা মাত্র। দোটানায় পড়িয়া কাহিল অবস্থা হইয়াছে আমাদের। বাঁচিয়া সুখ নাই, মরিবার রাস্তাও বন্ধ। শ্রীরামপুরে কেহ মরে নাই। রামগড়েও কেহ মরিবে না। এক যদি অবস্থাদৃষ্টে ভারতমাতা লজ্জায় মরেন, সে আলাদা কথা।

*

একটা কথা কিন্তু অনেকে লক্ষ্য করেন নাই। কংগ্রেস-প্যাণ্ডালের নাম আগে থাকিত 'মতিলাল নগর' 'দেশবন্ধু নগর'। এখন নগরের স্থান অধিকার করিয়াছে 'পুরী'। রাষ্ট্রভাষা হিসাবে তো হিন্দুস্থানী চলিয়াই গিয়াছে—রাজধানী কলিকাতায় বাংলা না জানিলে চলে, হিন্দুস্থানী না জানিলে পথ চলাই যায় না। এখন আবার অলক্ষিতে কংগ্রেসের কেন্দ্রস্থলে 'পুরী' ঢুকিয়া বসিল। ভাত-খোর বাঙালীর দশা শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়াইবে বলা কঠিন নয়।

*

একমাত্র ভরসার কথা, আমরা বাঙালীই আছি। বাহুবল আমাদের না থাকিতে পারে, বুদ্ধির গৌরব আমরা ছাড়ি নাই; এবং কালগুণে সে বুদ্ধিটা ফিচেলি-বুদ্ধি হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সন্দেশ রসগোল্লা চুলায় যাউক, জিলাপিই বঙ্গদেশের আদি ও অকৃত্রিম অবলম্বন। জিলাপির জয় হউক।

*

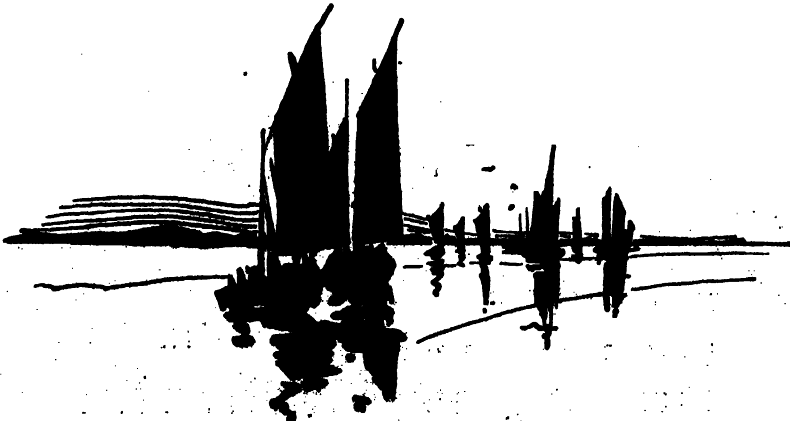
কিন্তু পৃথিবী কুৎসিত জায়গা। ইহার বাহির নিটোল, কিন্তু মধ্যে ফাঁপা, ফুটায় ভর্তি। জিলাপিরও মধ্যে ফুটা আছে, সেই ফুটা দিয়া রস পড়িয়া যায়। বেশিদিনের কথা নয়, 'স্বদেশী'

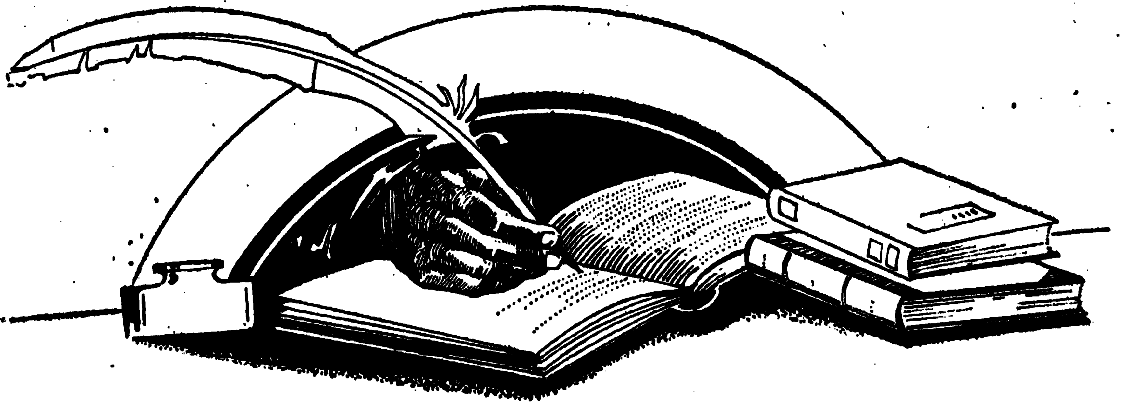
লোকেরা বিলাতি কাপড় বর্জন করিয়াছিল, এবং অ-দেশী লোকেরা পাল্টা খদ্দর বর্জন করিয়াছিল, দু'য়ের মধ্যকার ফাঁকটুকু দিয়া জাপানি ছিট আসিয়া আমাদের ঘর ভরিয়া ফেলিয়াছে। বাংলাদেশে তাহারই পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে। যুগান্তর আনন্দবাজারকে জব্দ করিতেছে, আনন্দবাজার যুগান্তরকে শায়েস্তা করিতেছে, মাঝখান হইতে কাটতি বাড়িতেছে স্টেট্‌স্‌ম্যানের। পাঠকের অপরাধ নাই, পয়সা খরচ করিয়া ভোরবেলা বাসিমুখে গালিগালাজ অধ্যয়ন করিতে কেহ চায় না। আর যদিবা চায় সেজন্য কাগজ কেনা অনাবশ্যক। কলিকাতা শহরে রাস্তার মোড়ের 'কলতলা' এখনও আছে, খোলার বস্তিও সমস্ত উচ্ছিন্ন হয় নাই।

*

একটা কথা শুধু ভাবিতেছি। ফরোয়ার্ড ব্লক ও ব্যাকোয়ার্ড ব্লকের মারামারি তো চলিতেছে এই ফাঁকে তৃতীয় কোন পক্ষ আসর দখল করিয়া বসিবে না তো? মানুষের মনকে লইয়া যখন আড়কাটির দরাদরি সুরু হয়, তাহার শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা আদায় করিবার উন্মত্ত আক্রোশে যখন বিভিন্ন 'গুরু'-পক্ষ শকুনির মত নির্লজ্জ কাড়াকাড়িতে মাতিয়া উঠেন, তখন সেই কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছিঁড়ির টাগ্‌-অব্‌-ওয়ারে আর কিছু বিধ্বস্ত হউক না হউক, মানুষের সেই মন ও শ্রদ্ধা কিছুতেই অক্ষত থাকে না, থাকিতে পারে না। গুরুঠাকুর যতক্ষণ কাষায়বসন ও নামাবলীতে মণ্ডিত থাকেন ততক্ষণই তিনি গুরুদেব; বিদায়ের ভাগ লইয়া টানাটানি করিতে বসন যখন খসিয়া পড়ে তখন তিনি উলঙ্গ মানুষ মাত্র—শ্রদ্ধার মায়াঞ্জনে রচিত তাঁহার দেবত্ব নিমিষে ডুবিয়া যায়। এবং তারপর সেই শিষ্য তাঁহাদের কোন পক্ষকেই আর ভক্তি করিতে পারে না।

ভারতের রাজনীতিক নিষ্ঠা লইয়া সেই ছেঁড়াছিঁড়ি চলিতেছে। যাহাদের নিষ্ঠা ও ভক্তি বাগাইবার জন্য এই আয়োজন, তাহারা যদি দেখিয়া শুনিয়া হতাশ্বাস হইয়া পড়ে, এবং তারপর 'ধুত্তোর' বলিয়া উভয় পক্ষকেই ঝাঁটাইয়া নরকস্থ করিবার সাধু সংকল্প করিয়া বসে, আশ্চর্য্য হইবার কিছু থাকিবে না।





সম্পাদকীয়

আমি 'অলকা'র সম্পাদনের ভার নিয়ে অবধি ইউরোপের আগামী যুদ্ধ সম্বন্ধে নানা কথা বলেছি। এর কারণ বোধহয় এ যুদ্ধ সম্বন্ধে নীরব থাকা সম্ভব নয়। কেননা যুদ্ধ জিনিষটে এমন ভীষণ যে, তা যখন হচ্ছে কিংবা হব-হব করছে, তখন সে বিষয়ে উদাসীন থাকা রক্তমাংসের দেহধারী মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। সবুজপত্র প্রকাশের পিঠপিঠ ইউরোপের মহাসমর সুরু হ'ল। সে পত্রে আমি সে যুদ্ধের বিষয় বড় বড় প্রবন্ধ লিখতে বাধ্য হই।

আমি কলম ধরলেই অমনি তার পিঠ পিঠ যুদ্ধ এসে পড়ে, তার জন্য আমি দায়ী নই। দায়ী ইউরোপ। আমরা এ যুগে যুদ্ধব্যবসায়ী নই; যুদ্ধ আমরা বাধাইও না, থামাইও না। ও কারবার এ যুগে ইউরোপীয়দের একচেটে কারবার। কিন্তু এ কারবারের লাভলোকসানের আমরাও ভাগী। গত যুদ্ধের ফলে দেখা গিয়েছে যে, লোকসানটা বেশী করে পড়ে আমাদের ঘাড়ে। আগামী যুদ্ধের ফলে আমাদের কিছু লাভ হ'তে পারে—এ আশা আমি করি। কেন?—সে কথা আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলেছি; আজ আর তা'র পুনরুক্তি করব না।

মানুষের স্মৃতির পিছনেও অনেকটা সত্য আছে, আশার অন্তরেও কতকটা সত্য আছে।

আর আশা যদি স্বপ্নমাত্রও হয়, তাহলে বলি যে স্বপ্নও স্মৃতি দিয়ে গড়া। আজকালকার মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের মতে স্বপ্নের অন্তরে আছে কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট Sensation আর মানুষের স্মৃতিই তাকে স্পষ্ট আকার দেয়।

ভারতবর্ষের মুক্তির আশা আমার বর্ত্তমানের জ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

গত মহাসমরের পর মানুষের অবস্থার যে ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটেছে, তা' সকলেই জানেন। আর সেই সঙ্গে তার মনেরও পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

আমরাও আর পরভাগ্যোপজীবী হয়ে থাকতে চাই নে; আর আমাদের শাসনকর্ত্তারাও আমাদের অধীন রাখতে তাদৃশ উদ্‌গ্রীব নন।

Kipling যা'কে বলেন White man's burden, তা গোরালোকদেরও পক্ষে এ যুগে ফূর্ত্তি ক'রে বহন করা আর সম্ভব নয়। পরের দেশ আত্মসাৎ করলেই যে স্বদেশের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে,

তারা এখন আগেকার মত এ ধারণার বশীভূত নয়। সমগ্র ভারতবর্ষের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে চিরস্থায়ী হ'বে, সে বিষয়েও গোরা জাতের মনে এখন সংশয় জন্মেছে। সুতরাং আমরা যে চিরকাল পরাধীন থাকব না, সে কথা তাঁরা বুঝেছেন।

এ কারণ আমাদের মুক্তির আশা অমূলক নয়।

সমগ্র ভারতবর্ষের মুক্তি একটা বিরাট ব্যাপার। এ ঘটনা শুধু আমাদের প্রার্থনার জোরে ঘটবে না।

যাঁরা ভারত উদ্ধারের ভার নিজের হাতে নিয়েছেন, তাঁরাই এ ভবিষ্যৎ ঘটনার তারিখ ফেলতে পারেন—আমি পারি নে।

Bergson বলেছেন যে Saintদের সুমুখে কোনও বাধা নেই। তাঁরা একলম্ফে সব বাধা অতিক্রম করেন। আমি Saintদের সম্প্রদায়ভুক্ত নই। আমার চোখের সুমুখে মুক্তিপথে অসংখ্য বাধা আছে। সুতরাং আমি সেই বাধাগুলিই স্পষ্ট দেখতে পাই। অতএব মুক্তি কোন পথে তা আমি জানি নে।

এখন এসব বড় কথা থাক। Malaria-র দেশে জন্মাবধি বাস করলে অনেকে যেমন immune হয়ে যান, অর্থাৎ Malaria-র বিষ আত্মসাৎ করে বেঁচে থাকেন, আমরা অনেকে তেমনি অধীনতায় অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছি। এতদিন অধীনতার ভিতর লালিত পালিত হয়ে যে আমরা কতকটা অধীনতার সঙ্গে মনের খাপ খাইয়ে নিই নি, এমন কথা বলা যায় না। Environment-এর সঙ্গে বনিবনাও ক'রে নেওয়ার ক্ষমতা মানুষের আছে।

অবস্থা প্রতিকূলই হোক আর অনুকূলই হোক, তা'র মধ্যে বেঁচে থাকবার প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে অদম্য। আর সেই জন্য অবস্থার সঙ্গে নিজেকে adjust ক'রে নেবার চেষ্টাও মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক।

ইংরেজী ভাষায় দু'টি শব্দ আছে, হঠাৎ শুনলে যাদের মানে একই মনে হয়; কিন্তু আসলে তা নয়। শব্দ দু'টি হচ্ছে resignation ও acceptance। Resignation-এর অর্থ নিরুপায় হ'য়ে যা' প্রতিকূল তা'র কাছে আত্মসমর্পণ করা; আর acceptance মানে এই একই অবস্থার অস্তিত্ব মেনে নিয়ে তা'র ভিতরে আত্মোন্নতি সাধন করা।

এ দেশের বহুলোক তাদের পরাধীনতা শেষোক্ত অর্থে গ্রাহ্য করেছে। কারণ আর কোনও বিষয়ে না হোক, Economic ক্ষেত্রে আত্মোন্নতি সাধন করবার এ অবস্থাতেও আমাদের সুযোগ আছে;—জাতিগত হিসেবে না হোক, ব্যক্তিগত হিসেবে।

পরাধীন হওয়ায় আমাদের ঢের ক্ষতি হ'য়েছে; অপরপক্ষে লাভও কম হয় নি। সে লাভ লোকসানের খতিয়ান করতে আমি অপারগ। তবে আমরা বাঙ্গালীরা যে ইউরোপীয় সভ্যতার কাছে অনেক পরিমাণে ঋণী, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অথচ আমরাই সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীনতাকামী। এই মনোভাবের জন্যও আমরা বিলেতের কাছে ঋণী। কারণ ইউরোপীয় সভ্যতা দাসমনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

আমাদের পরাধীনতা আমাদের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য, এ বিষয়ে উভয়পক্ষেই ওকালতি করা যায়। ইংরাজরা এ পরাধীনতার পক্ষে নিত্য ওকালতি করেছেন, অপরপক্ষে আমরা আমাদের পরাধীনতার জন্য অনেক অশ্রুবিসর্জ্জন করেছি।

ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, স্বাধীনতা অর্জ্জনের কামনা আমাদের আছে, কিন্তু সঙ্কল্প আমাদের নেই। আমরা আমাদের ছোটবড় সভাসমিতিতে নিত্য যে resolution pass করি, তা'তে আমাদের কামনাই প্রকাশ করি,—সংকল্প নয়।

কামনা আর সংকল্প এক মনোভাব নয়; তা যে নয়, তা সংকল্প কথাটার মানে বুঝলেই জানা যায়। এ শব্দটির অর্থ যে কি, তা' মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩ শ্লোকের ব্যাখ্যায় যথেষ্ট স্পষ্ট করে লেখা আছে। যাঁরা উক্ত শ্লোকের ভাষ্য পড়বার কষ্ট স্বীকার করতে অনিচ্ছুক, তাঁরা ইংরাজী শব্দ desire ও will শব্দ দু'টির প্রভেদ থেকেই তা বুঝতে পারবেন।

আমাদের স্বরাজলাভের desire আছে, কিন্তু will নেই। এর কারণ আমরা অবস্থার গুণে এ উভয়ের ভিতর ইতস্ততঃ করছি।

আমাদের Politicianরা যে মনঃস্থির করতে পারেন নি, তার প্রমাণ আগামী কংগ্রেসের সভাপতি আবুল কলম আজাদ বলছেন যে বর্ত্তমান অবস্থা অসহ্য, এ অবস্থায় আর ধৈর্য্য ধরে থাকা অসম্ভব। অপরপক্ষে মহাত্মা গান্ধী বলছেন যে, আমাদের ধৈর্য্য ধরেই থাকতে হবে।

ফলে মহাত্মা গান্ধীর মতই কংগ্রেস গ্রাহ্য করবে। নিরুপায় লোকের আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় ধৈর্য্য অবলম্বন করা। আমরা নিজে কোন উপায় বার করতে না পারি, কাল তা বার করবেন। ভবভূতি বলেছেন কাল নিরবধি। সুতরাং আমাদের স্বরাজলাভ Postponed sine die, কারণ ভারতের ভাগ্যবিধাতারা এ বিষয়ে কোনও তারিখ ফেলতে রাজি নন।

আমরা কি চাই, সে বিষয়েও আমাদের মতভেদ আছে। "গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল" যাঁরা দিচ্ছেন, তাঁরাও সে কাঁঠালটি কি—Dominion status না independence—সে বিষয়েও একমত নন। আমি নিজে অবশ্য Dominion status পেলেই সুখী হব। কেন, তা বলবার জন্যে বসেছি। এ বিষয়ে আমার একটি কৈফিয়ৎ আছে।

Independence-এর এ যুগে যদি কোনও অর্থ থাকে ত সে অর্থ এই যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল বন্ধন ছিন্ন করা। অর্থাৎ Political বন্ধন ছিন্ন করা। অপরপক্ষে Dominion status-এর অর্থ এই যে স্বাধীন হয়েও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে যোগ রক্ষা করা।

বলা বাহুল্য যে, এ ক্ষেত্রে যোগ মানে শাসন নয়। তা যে নয়, পৃথিবীর অপর যে-সব দেশ Dominion status লাভ করেছে, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যায়। Independence লাভ করা আমাদের পক্ষে বর্ত্তমানে impossible; এবং Dominion status লাভ করাও improbable। এ কথা যে সত্য, তা দু'দিন পরেই রামগড় কংগ্রেসে দেখা যাবে।

উভয়পক্ষে একমত না হ'লে আমরা Dominion status অর্জ্জন করতে পারব না। উভয়পক্ষ যে আজও একমত হয় নি, তা ত সুস্পষ্ট; আর শীঘ্র হ'বার কোনো সম্ভাবনাও নেই। মহাত্মা গান্ধী আসছে কংগ্রেসে প্রস্তাবার তাড়া পর্য্যন্ত দেবেন না।

আমরা পূর্ণ স্বরাজ লাভ করি অথবা অপূর্ণ স্বরাজ লাভ করি, আমরা বিলেতি সভ্যতার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করতে পারব না। কারণ ইতিমধ্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ বেড়ে গেছে। Political ও Economic ক্ষেত্রে বিলাতের সঙ্গে আমাদের বন্ধন প্রত্যক্ষ।

আমরা যদিও Politics-এর লৌহময় শৃঙ্খল হ'তে মুক্ত হই তবু Economics-এর স্বর্ণময় শৃঙ্খল হ'তে মুক্ত হ'তে পারব না। এ যুগে আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে একঘরে হতে পারব না। দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে আদানপ্রদান ভবিষ্যতেও চলবে।

এর চাইতে বড় কথা হচ্ছে বিলেতি সভ্যতার মনের সভ্যতার সঙ্গে আমাদের অদৃশ্য বন্ধন। বিলেত কথাটি এ ক্ষেত্রে আমি ইউরোপীয় অর্থে ব্যবহার করছি। বিলেতি দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকলা যে আমাদের মন বদলে দিয়েছে, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। আর এই অদৃশ্য বন্ধন হতে মুক্ত হওয়া অসম্ভব।

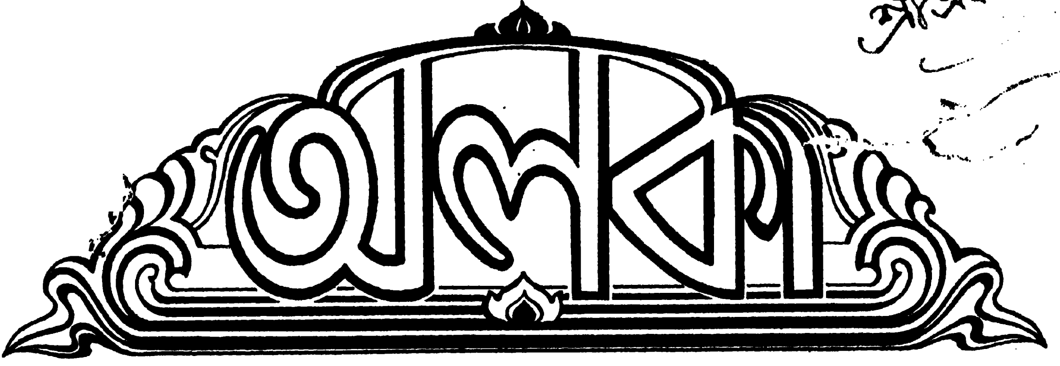
আমি বারান্তরে এই অদৃশ্য বন্ধনগুলির কথাই বলব। কারণ বর্ত্তমানে আমাদের পলিটিক্যাল মনোভাব ঘুলিয়ে গিয়েছে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত
শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও
৬৬।১ এল্‌গিন রোড হইতে প্রকাশিত



শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা

শিল্পী—মিঃ ভিক্টর নাগ



দ্বিতীয় বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৪৭ | ৮ম সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ

"আজ এই নববর্ষের পুণ্য প্রভাতকে অন্তরের ভিতর জীবনের ভিতর উপলব্ধি করতে নিত্য সঞ্চিত সম্বলভাবে গ্রহণ করতে মন্দিরে এসেছি। এই অনুষ্ঠানে প্রায়ই আমি অনুপস্থিত থাকিনি, বৎসরের প্রথম প্রভাতের মধ্যে যে উপদেশ রয়েছে তাকে আমি আমার জীবনে কখনও উপেক্ষা করিনি।

"প্রভাতে ঘুম থেকে জেগে চোখ মেলে দেখি বিধাতার এ এক আশ্চর্য্য বিধি! প্রতিদিন প্রভাত আসে নতুন করে, প্রতিদিন নবজীবনের রাজ্যে প্রভাতের অবগুণ্ঠন-মোচন এ এক বিস্ময়ের বস্তু! এই নিরন্তর জাগ্রত ধারা যদি না থাকত তবে প্রতিদিনের পুঞ্জীভূত জড়তার আবর্জ্জনায় পৃথিবীর এই ক্ষেত্রকে আচ্ছন্ন করে ফেলত, প্রতিদিনের ক্লান্তি আমাদের অভিভূত করে তুলতো; কিন্তু প্রতিদিনই বৎসরারম্ভের দিন তাই প্রতি প্রভাতের আলোকে আমাদের ক্লান্তি নৈরাশ্য অবসাদ দূরীভূত হয়। প্রতিদিনের সূর্য্যোদয় এই নবীনতার প্রকাশকে বহন করে আনে। তবুও মানবের চিত্ত একটি বিশিষ্ট দিনের আগমনের অপেক্ষা করে—সে দিনটি কালের মধ্যে চিহ্নিত করতে চায়, বিশ্ব সংসারে সেই চির নবীনের আনন্দরূপ জীবনে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে, ধ্বনিত করতে আজ আমাদের এই নববর্ষের উৎসব, তার এই বার্ত্তা—নবীনের আনন্দরূপের মাঝখানে তোমার প্রাণকে পূর্ণ করে নাও, যা জীর্ণ দীর্ণ প্রাচীন তাকে সরিয়ে ফেলো।

আজকার দিনে পৃথিবীতে বড় কঠিন সময় বড় দুঃখের দিন এসেছে। বৃদ্ধ জরা, প্রাচীন লোভ, ভয়ঙ্কর রিপু বিনাশের দূত, দানবের মূর্ত্তি নিয়ে আজ দেখা দিয়েছে, ক্ষুধার অন্ত নেই। তাকেই আজ পৃথিবীর উচ্চ আসনে বসিয়ে মানুষ ঘোষণা করছে দৈত্যের শাসনকে মানতে হবে। আজ এই মিথ্যাকে প্রচণ্ড গর্জ্জনে ঘোষণা করা হচ্ছে, আজ ইতিহাসে যুদ্ধ সজ্ঘর্ষের মধ্যে সেই আত্মার বিনাশের আয়োজনকেই দেখি। কিন্তু এই জরার লক্ষণ মানুষের জীবনে মরীচিকার মতো আসে সত্যকে নূতন করে উপলব্ধি করার জন্য। ভরসা রাখতে হবে যে, এই দুঃস্বপ্ন থেকে মানুষ আবার জাগবে। এই মিথ্যার আবির্ভাব তার উৎপীড়ন অত্যাচার আপাততঃ নিদারুণ হলেও তার ধ্বংসলীলার অবসান হবে। এই বিনাশের রূপ সত্য নয়।

"আজ নববর্ষে আমার জীবনের ক্ষেত্র এই আশ্রমে যে সকল কর্ম্মী সমবেত হয়েছেন, তাঁদের আজ নমস্কার করি; এই কথাই আমি তাঁদের বলে যেতে চাই যে, এই প্রাচীনতার জড়তার রূপ সত্য নয়। নববর্ষে সেই নব জীবনের বাণী সকলকে উদ্বুদ্ধ করুক—

"তুমি আপনি জাগাও মোরে,
তব সুধা-পরশে হৃদয়নাথ, তিমির রজনী
অবসানে হেরি তোমারে।
ধীরে ধীরে বিকাশো হৃদয়-গগনে
বিমল তব মুখভাতি।"*

বর্ষ-বরণ

মহবুবর রহমান খাঁ

এস, উষার আলোক-পথে হিরণ কিরণ-রথে
সুন্দর অভিনব শান্ত!
জরার মরণশেষে তরুণ কিশোর-বেশে
নবারুণরাগে নব পান্থ!

এস, দৃপ্ত বিজয়ীসম ভৈরব মনোরম
ঝটিকা-চপল চল-ছন্দে
ধ্বনিয়া কোকিল-কুহু কাঁপায়ে কানন মুহু
শীর্ণ মুকুল-দল-গন্ধে!

এস, নবীনের অভিযানে ক্লান্তি ঘুচায়ে প্রাণে
ব্যর্থ অতীত করি' চূর্ণ,
বর্ষ-শ্মশান'পরে কঙ্কাল তুলি' করে
নবীন চেতনে করি' পূর্ণ!

এস, মুছায়ে নয়নবারি সঙ্কোচ অপসারি'
হর্ষ বিথারি' সারা বিশ্বে,
বুলায়ে পরশ প্রাণে দুলায়ে আশার গানে
ভুলায়ে নিখিলহারা নিঃস্বে!

* শান্তিনিকেতনে নববর্ষ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ

ডাক্তারকে ডাক্তারি

বুদ্ধদেব বসু

ডাক্তার হিরণ্ময় চৌধুরী, স্বনামধন্য। বয়েস ৫২

ডাক্তার মনোহর ঘোষ, চৌধুরীর প্রধান সহকারী। বয়েস ৪০

ডাক্তার সোমেশ পাল, চৌধুরীর দ্বিতীয় সহকারী। বয়েস ৩২

বরুণ সেন—২২

মালতী মিত্র—২০ (সমস্ত চরিত্র কাল্পনিক)

প্রথম অঙ্ক

হিরণ্ময় ও মনোহর

[ঢং ক'রে ঘড়িতে একটা শব্দ হ'লো।]

হিরণ্ময়। সাড়ে তিনটে। পাঁচটাতে অ্যালবার্ট হলে মিটিং। সাড়ে চারটেতে নিউ এশিয়াটিক ইনশিওরেন্সের ডিরেক্টরদের সভা। চারটেতে স্যার গৌরীশঙ্করের বাড়িতে চা-পার্টি। মনোহর, আমার একটুও সময় নেই। এক্ষুনি বেরুতে হবে।

মনোহর। এক্ষুনি?

হিরণ্ময়। হ্যাঁ, এক্ষুনি, এক্ষুনি। মনোহর, রোগীদের সব চ'লে যেতে ব'লে দাও। কাল দুটো থেকে পাঁচটের মধ্যে আসে যেন।

মনোহর। কিন্তু আপনিই তো ওদের অ্যাপয়ন্টমেণ্ট দিয়েছিলেন।

হিরণ্ময়। তাই নাকি? উঃ, পারিনে আর রোগীদের জ্বালায়! সভায়, পার্টিতে, রেস্তোরঁায়, সিনেমায়, আলমোড়ায়, উটকামণ্ডে, যেখানেই আমি যাই—একবার টের পেলেই হয় যে ঐ লোকটি হিরণ্ময় চৌধুরী, আর রোগীরা পিলপিল ক'রে বেরিয়ে আসে। বিশ্রাম নেই, শান্তি নেই, বন্ধুতা নেই, হৃদ্যতা নেই। আর আমারও কী-রকম হয়েছে জানো, যতই চেষ্টা করি, কিছুতেই ভুলতে পারিনে যে আমি ডাক্তার। একটা লোকের মুখের দিকে তাকালেই তার অসুখটা যেন আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল্ করতে থাকে। It's a dog's life.

মনোহর। আপনার শেষের কথাটায় একমত হবে না, এমন লোকই হয়তো বেশি।

হিরণ্ময়। তা আমি জানি। কিন্তু তুমিই বলো, মনোহর, আমি কি টাকা চাই? যাতে আমার কাছে বেশি রোগী না আসে, সেজন্য ষোলো থেকে বত্রিশ, বত্রিশ থেকে চৌষট্টি ভিজিট করলুম…তবু কি রেহাই আছে! আমার মতো একটা ওল্ড ব্যাচ্লার, যে খদ্দর ছাড়া পরে না, চা ছাড়া নেশা করে না, স্বদেশি ছাড়া অন্য-কোনো হুজুগে মাতে না, তার টাকার কী দরকার? তবু তো দেখছো কাণ্ড!

মনোহর। টাকা জিনিসটা বড্ড খামখেয়ালি; যার দরকার নেই, তার কাছেই যায়।

হিরণ্ময়। ভাবছি, সামনের পয়লা জানুয়ারি থেকে একশো আটাশ টাকা ভিজিট করবো। তখন যদি ...।

মনোহর। সেই ভালো হবে, স্যার। অত্যন্ত ধনী যারা নয়, তারা যেন ভুলেও না ভাবে যে তাদের বাঁচবার অধিকার আছে।

(সোমেশের প্রবেশ)

সোমেশ (ঘরে ঢুকে)। যমুনাদাস মেটা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন।

হিরণ্ময়। কাল ঠিক তিনটেতে তাঁকে আসতে বলো।

সোমেশ (একটু থতমত খেয়ে)। আরো অনেকেই…

হিরণ্ময়। হ্যাঁ, জানি। ফর্মগুলো ফিল্-আপ ক'রে রাখো, কাল দেখবো সকলকেই। আমাকে এক্ষুনি বেরুতে হচ্ছে। বুঝেছো?

সোমেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

হিরণ্ময়। তবে আর দাঁড়িয়ে আছো কেন?…এই সোমেশ, শোনো। তোমার পেটে গল্-স্টোন আছে, না?

সোমেশ। আজ্ঞে…।

হিরণ্ময়। চোখ দেখেই বোঝা যায়। Typical। তা ওটা পুষে রাখছো কেন? তুমি তো নিজেও ডাক্তার। না হয় আমাকেই একবার বলতে। Fool!

সোমেশ। আজ্ঞে এত কাজের চাপ…

হিরণ্ময়। বেশ, বেশ, যাও, কাজ করো গে। আমাকে মনে করিয়ে দিয়ো একবার…দু'মাসেই সেরে যাবে। (সোমেশ চ'লে গেলো)

(টেলিফোন বাজলো)

মনোহর (টেলিফোনে)। হ্যালো…ও, হ্যাঁ…দিচ্ছি…স্যর গৌরীশঙ্কর টেলিফোনে।

হিরণ্ময় (টেলিফোনে)। শঙ্কর?…না, ভুলিনি, যাচ্ছি…এই এক্ষুনি। ও, সেই গ্যাঞ্জেস কেমিক্যালের ব্যাপার তো? সোমবার দেখা হবে কর্পোরেশনে, বলে দেবো।...আচ্ছা। (টেলিফোন রেখে) চললুম। গাড়িটা পিছনের দরজায় আছে তো? ওরা কেউ দেখলে রক্ষে নেই।

(সোমেশের প্রবেশ)

সোমেশ (ঘরে ঢুকে)। বেরুচ্ছেন, স্যর?

হিরণ্ময়। দেখতেই পাচ্ছ।

সোমেশ। সকলেই চ'লে গেছে……

হিরণ্ময়। ব্রাভো, ব্র্যাভো। তুমি সত্যি এফিশিয়েন্ট হ'য়ে উঠছো, সোমেশ।

সোমেশ।…শুধু একজন…

হিরণ্ময়। নাঃ, এই যমুনাদাসকে নিয়ে আর পারলুম না। আসলে ওর কোনো অসুখই নেই… খামকা টাকাগুলো ঢালছে।

সোমেশ। আজ্ঞে যমুনাদাস নয়।

হিরণ্ময়। কে তবে ?

সোমেশ। নতুন পেশেণ্ট। ইয়ং ম্যান। বলে কিছুতেই যাবে না। রাত-বারোটা অবধি ব'সে থাকতে হ'লেও থাকবে। যেমন ক'রে পারে, আজকের মধ্যেই সে···

হিরণ্ময়। অসুখটা কি ?

সোমেশ। আমার কোনো কথারই জবাব দেয়নি। আপনার কাছেই সব বলবে।

হিরণ্ময়। দেখি ফর্মটা...

সোমেশ। ফর্মও ফিল্ অপ করেনি। এই স্লিপ পাঠিয়েছে।

হিরণ্ময়। (স্লিপটি নিয়ে)। বাঃ, এ যে পাগল দেখছি। কী লিখেছে জানো, মনোহর ? To The Greatest Doctor of India : Save me. A dying man.

মনোহর। পাগল না-ও হ'তে পারে। আপনি না-হয় একটা মিনিট...এ কী !

(বরুণ ঘরের মধ্যে এসে ঢুকেছে)

সোমেশ। (ব্যস্তভাবে)। এ কী কাণ্ড ! আপনি তো আচ্ছা লোক, মশাই, বলা নেই, কওয়া নেই, সোজা এসে ঢুকেছেন ! শুকলাল !

বরুণ। (হাঁপাতে হাঁপাতে) ও-বেচারাকে কিছু বলবেন না। ওর কিছু দোষ নেই। ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছি আমিই। আরো চার-পাঁচটা চাকর ছুটে এসেছিলো, কিন্তু...

হিরণ্ময়। তুমি বড্ড হাঁপাচ্ছো ছোকরা। বোসো।

সোমেশ। (উত্তেজিত স্বরে)। জোর ক'রে ডাক্তার হিরণ্ময় চৌধুরীর ঘরে ঢোকা—এমন কাণ্ড কে কবে শুনেছে ! জানেন, মশাই, আপনি কত বড়ো অন্যায় করেছেন ? জানেন, ডাক্তার চৌধুরী কত ব্যস্ত, কত বড়ো বড়ো পেশেণ্ট তিনি আজ ফিরিয়ে দিয়েছেন !

বরুণ। আমি সব চেয়ে বড়ো পেশেণ্ট। আমি মুমূর্ষু।

হিরণ্ময়। That's right. ও-অবস্থার কাছাকাছি আসবার আগে আমার খোঁজ কেউ বড়ো একটা করে না।

বরুণ। কেননা আপনিই শুধু পারেন মৃত্যুর দরজা থেকে মানুষকে ফিরিয়ে আনতে।

হিরণ্ময়। (অল্প হেসে)। ভুল, ভুল ধারণা তোমার। যাকগে, কাল ঠিক দুটোতে এসো। সবার আগে তোমাকে দেখবো।

বরুণ। কাল ! কাল হয়তো বড্ড দেরি হ'য়ে যাবে। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু এগিয়ে আসছে।

সোমেশ। বাজে বকছেন কেন ? যান, কাল ঠিক সময়ে আসবেন।

বরুণ। ডাক্তারের দু' মিনিট সময়, আর আমার জীবন ! কোনটা বেশি ?

হিরণ্ময়। অল্ রাইট। তোমাকে এক্ষুনি দেখছি। বলো তো ব্যাপার কী ?

বরুণ। ব্যাপার কী, তা জানবার জন্যেই তো আপনার কাছে আসা।

হিরণ্ময়। তোমার যক্ষ্মা হয়েছে।

বরুণ। (অসহিষ্ণু ভাবে)। তা আমি জানি। এখন বলে দিন কী করলে বাঁচবো। আমাকে বাঁচা—

হিরণ্ময়। এই ফর্মটা—

বরুণ। এই ফর্মটা আমাকে বাঁচাবে, ডাক্তারবাবু? আপনার সময়ের এত মূল্য, অথচ কত সময় নষ্ট করেন! শুনুন, আমি সব বলছি। আমার নাম বরুণ মিত্র, বয়েস বাইশ। অবিবাহিত। এক বছর আগে এ রোগের প্রথম সূত্রপাত। প্রথমে বিশ্বাস হয় নি। বিশ্বাস না করবার চেষ্টায় কাটল ছ' মাস। পর পর ডাক্তার দেখালুম—

সোমেশ। কোন ডাক্তার?

বরুণ। ও, আপনি সব লিখে নিচ্ছেন, দেখছি!

সোমেশ। কোন্ ডাক্তার বললেন না তো?

বরুণ। ধরুন না আপনাকেই দেখিয়েছিলুম।

সোমেশ। মনে রাখবেন এটা ফাজলেম করবার জায়গা নয়।

বরুণ। ডাক্তারের নাম মনে নেই। X-Y-Z যে-কোনো ডাক্তার। তারপর কিছুদিন পুরী, আরো কিছুদিন সোনার বাংলার অকথ্য পল্লীতে কাটিয়ে ফিরেছি কলকাতায়। রোজই একটু একটু করে খারাপ হচ্ছি। আর কিছু জানবার আছে?

সোমেশ। আপনার প্রোফেশন?

বরুণ। তার সঙ্গে এই রোগের কিছু সম্পর্ক আছে?

সোমেশ। যা জিজ্ঞেস করছি জবাব দিন।

বরুণ। আমি কিছুই করি না।

সোমেশ। জমিদার?

বরুণ (হো-হো ক'রে হেসে)। না, না, না, জমিদার নই, জমিদার নই। ওঃ, ডাক্তারবাবু, আপনার এই অ্যাসিষ্ট্যাণ্টটি এতও হাসাতে পারেন।

সোমেশ। আপনার রসিকতার ধারণা আমার সঙ্গে ঠিক মিলছে না।

বরুণ। আমি কী করি শুনবেন, তাহ'লে? আমি আর্টিস্ট।

সোমেশ। আর্ট—ইস্ট!

বরুণ। ছবি আঁকি। খুব ভালোই আঁকি। এত ভালো আঁকি যে এ-পর্য্যন্ত একখানা ছবিও আমার বিক্রি হয়নি।

সোমেশ। আচ্ছা। আপনার মা বাবা জীবিত?

বরুণ। এর কোনো দরকার আছে?

সোমেশ। আছে বইকি—

হিরণ্ময়। আচ্ছা, যাক্ ও-সব! আমার হ'য়ে গেছে। দেখি জিভটা। বেশ!...

বরুণ। বুক, পিঠ, পেট এ সব দেখবেন না?

হিরণ্ময়। দেখা হয়ে গেছে।

বরুণ। ব্লাড, ইউরিণ, স্পুটাম, এক্সরে প্লেট এসব লাগবে না?

হিরন্ময়। লাগলে তো বলবোই।

বরুণ। Oh, doctor, You are Great, GREAT! আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলুম আপনাকে দেখাবার জন্যে; সার্থক হয়েছে আমার পরিশ্রম। আমি শুনেছিলুম আপনি একবার তাকিয়েই সব বুঝতে পারেন, সে কথা তাহ'লে সত্যি! আপনি চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রতিভাবান, আমি যেমন প্রতিভাবান শিল্পে। হবে, হবে, আমার শিল্পেরও আদর হবে একদিন। সেজান্, পিকাসো, মাতিস্—ওদেরই মতো আমার নাম একদিন হবে প্রণম্য। আমাকে বাঁচান, আমাকে শুধু বাঁচিয়ে তুলুন একবার।

হিরণ্ময়। সঙ্গে তোমার আত্মীয় কেউ এসেছেন নাকি?

বরুণ। কেন, এ কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? আপনার যা বলবার আমাকেই বলুন। আমি ভীরু নই।

হিরণ্ময়। তাহ'লে তোমাকেই বলি। আর এক বছরের বেশি তোমার বাঁচবার আশা নেই।

বরুণ। কিছুতেই না?

হিরণ্ময়। তা কেমন ক'রে বলি? কখনো কখনো মির‍্যাক্‌ল্‌ও ঘটে।

বরুণ। তাহ'লে আমার বেলায় মির‍্যাক্‌ল্‌ই ঘটবে। আপনি যা বলবেন সব আমি করবো, এতটুকু অবহেলা করবো না কিছুতে।

হিরণ্ময়। হ্যাঁ, খুব যত্নে, খুব নিপুণ শুশ্রূষায় থাকলে······

বরুণ। সব হবে, সব। আমি বাঁচবোই।

হিরণ্ময়। (একটু পরে)। এই নাও তোমার প্রেস্‌ক্রপশন। আর এই তোমার diet-chart। জ্বর যদি হয়—বোধ হয় হবে—টেম্পারেচারের নির্ভুল রেকর্ড চাই। আজ বুধবার, সামনের বুধবার আবার খবর পাঠাবে। ডায়েট-এর একটুও অনিয়ম যেন না হয়। ······আচ্ছা।

মনোহর। চারটে বাজতে আর দেরি নেই। আপনার এনগেজমেণ্ট······।

হিরণ্ময়। হ্যাঁ, আর আর এক সেকেণ্ডও দেরি নয়। (ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।)

মনোহর। (নিচু গলায়)। বত্রিশ টাকা।

বরুণ। কী বললেন?

হিরণ্ময়। (নিচু, কিন্তু আগের চাইতে একটু উঁচু গলায়)। এঁর ভিজিট। বাড়ি এসে দেখালে বত্রিশ।

বরুণ। টাকা তো আমি নিয়ে আসিনি।

মনোহর। }
সোমেশ। } (একসঙ্গে)। টাকা আনেননি!

বরুণ। টাকা কি আমার আছে যে আনবো। আমি তো বলেছিলুম যে আমি ছবি আঁকি, এত ভালো আঁকি যে এ পর্য্যন্ত একখানাও বিক্রি হয়নি। আপনাদের আগেই বোঝা উচিত ছিলো।

সোমেশ। চীট! ইম্পস্টার! এ রকম লোককে গলা ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দেওয়া উচিত। পকেটে কানাকড়ি নেই এসেছেন হিরণ্ময় চৌধুরীকে দিয়ে চিকিৎসা করাতে। জোচ্চোর!

বরুণ। আর একটি কথা বলছো কি তোমার ঐ ছুঁচলো নাকটা আর আস্ত থাকবে না।

সোমেশ (চীৎকার ক'রে)। কী! আমাকে অপমান!

বরুণ। একজন বরুণ দত্ত তোমার মতো তিরিশ হাজার ডাক্তারের সমান। হার্ভে, পাস্তুর, লিস্টার—এঁরা যে জাতের লোক আমি সেই জাতের। আমার মর্য্যাদা বুঝবে হিরণ্ময় চৌধুরী, তুমি বুঝবে না।

সোমেশ। Sir, Sir, I appeal to you. This is insufferable, scandalous!

মনোহর। স্যর স্যর ব'লে চ্যাঁচালে আর কী হবে। তিনি এতক্ষণে হাওয়াগাড়ী চেপে উধাও।

সোমেশ। তবে কী হবে? এই লোকটা কি ফাঁকি দিয়ে পালাবে?

মনোহর। আটকে রাখো। পাহারায় ব'সে থাকো। আমি চললুম।

সোমেশ (ব্যস্তভাবে)। না, না, মনোহর-দা, তুমি যেয়ো না। ইস—কী মুস্কিলেই পড়া গেলো! কোথা থেকে এই ভ্যাগাবণ্ডটা এসে জুটলো—

বরুণ। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার কথা রাখতে হচ্ছে। এই নাও।

(বরুণ এক ঘুষি বসিয়ে দিলে সোমেশের নাকে। গুম্ ক'রে শব্দ হ'লো। সোমেশের চীৎকার —উঃ! তারপর:)

সোমেশ। রাস্কেল, বেরোও, বেরোও, এখান থেকে এক্ষুনি! (বরুণের ঘাড় ধ'রে)

বরুণ। ঘাড় ছাড়ো, বলছি!

সোমেশ। বেরো—ও! (দিলে বরুণকে ধাক্কা। ধুপ ক'রে শব্দ হ'লো। বরুণ মেঝেতে প'ড়ে গেলো। সঙ্গে-সঙ্গে উঠলো তার কাশি। প্রচণ্ড কাশি। কিছুতেই থামে না। কাশির ফাঁকে-ফাঁকে—অনেক কষ্টে সে ব'লে উঠলো)

বরুণ। মেরে ফেললে, মেরে ফেললে আমাকে। মালতী, মালতী!

[একদিক থেকে মালতী, অন্যদিক থেকে হিরণ্ময়ের প্রবেশ]

হিরণ্ময়। এ কী কাণ্ড! এত গোলমাল কিসের? পেশেণ্ট মেঝেয় গড়াচ্ছে কেন? আর এই মেয়েটি কে? সোমেশ! মনোহর!

[সকলে চুপ; শুধু বরুণের কাশি শোনা যাচ্ছে।]

হিরণ্ময়। আরে লোকটা কাশতে কাশতে এক্ষুণি মরে যাবে যে! কী ব্যাপার বলো না!

মনোহর। আপনি বেরোননি, স্যর?

হিরণ্ময়। একটু উপরে গিয়েছিলুম, সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে গোলমাল শুনে ফিরে আসতে হ'লো। আমার মনে হয় ব্যাপারটার অর্থ জানবার অধিকার আমার আছে।

সোমেশ (ভয়ে-ভয়ে)। স্যর, আপনার ভিজিটের টাকা না দিয়েই ও চ'লে যাচ্ছিলো।

মালতী। বেশ সব ডাক্তার আপনারা! রোগীকে প্রায় মেরেই ফেলেছিলেন। জিজ্ঞেস করি, উনি কি ও-ভাবেই থাকবেন, না ওঁকে তুলতে-টুলতে হবে?

হিরণ্ময়। আপনি কে জানতে পারি?

মালতী। আমার নাম মালতী মিত্র।

হিরণ্ময়। পেশেণ্টের আত্মীয় ?

মালতী। না আত্মীয় নই। তা উনি কি ও-ভাবেই পড়ে থাকবেন !

হিরণ্ময়। সোমেশ, ওকে ধ'রে তুলে ঐ কাউচটায় শুইয়ে দাও তো।

বরুণ। (তার কাশি এতক্ষণে থেমেছে)। আমাকে কেউ যেন না ছোঁয়। নিজেই উঠছি।

হিরণ্ময়। শুয়ে পড়ো ওখানে চুপ ক'রে। কথা বোলো না।

মালতী। ডাক্তার চৌধুরী, রোগীকে মার-ধর করাও কি আপনার অ্যাসিস্ট্যাণ্টদের কর্ত্তব্যের মধ্যে ?

হিরণ্ময়। তার মানে ?

মালতী। মানে ঐ ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করুন।

সোমেশ। (তাড়াতাড়ি)। স্যর, স্যর, আমার কোন দোষ নেই, স্যর। He refused to pay your fees. শুধু তা-ই নয়, he insulted me. Not only that, he hit me, sir, he struck me on the nose...sir, I am quite innocent···

হিরণ্ময়। বাংলাতেই বলো, সোমেশ, গুছিয়ে বলতে পারবে।

বরুণ। (ক্ষীণস্বরে)। হ্যাঁ আমিই ওকে আগে মেরেছিলুম। আমাকে চীট, ইম্পস্টর, জোচ্চোর এবং তার পরেও ভ্যাগাবণ্ড বলেছিলো, এত সাহস আপনার এই অ্যাসিস্ট্যাণ্টের। কিন্তু আপনি তো জানেন আমি কত উঁচু দরের লোক। আপনার নিজের জীবনও তো একটা সাধনা।

হিরণ্ময়। কিন্তু তুমিই বা টাকাটা দিয়ে দাওনি কেন ?

বরুণ। টাকা কোথায় ডাক্তারবাবু, টাকা কি আমার আছে ? টাকা নেই ব'লেই তো আপনার কাছে আসা। আপনি তো শুধুই একজন বড়ো ডাক্তার নন, আপনি যে মহৎ। আপনি দেশপ্রেমিক, দেশের কাজে আপনার অজস্র দানের কথা কে না জানে ! আমি জানি স্বদেশের মুখের দিকে চেয়েও আপনি আমাকে বাঁচাবেন।

হিরণ্ময়। ও, তুমি তা-ই ভেবে এসেছো !

বরুণ। ভুল ভাবিনি। আমি জানি, আমি ভুল ভাবিনি।

হিরণ্ময়। বেশ, টাকা না-হয় না-ই দিয়েছিলে। মারতে গেলে কেন সোমেশকে ?

বরুণ। তা উনি তো আমাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিলেন ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে। ভাগ্যিস মালতী ছিলো।

হিরণ্ময়। আমার সঙ্গে কেউ এসেছেন আগে তো বলোনি। কোথায় ছিলেন ইনি এতক্ষণ ?

বরুণ। মেয়েদের বসবার ঘরে। ওর পিড়াপীড়িতেই আপনার কাছে আমার আসা।

হিরণ্ময়। কী বিশ্রী কাণ্ড ! কত দিকে কত কাজ আমার প'ড়ে আছে, বুড়ো ধাড়িদের ছেলেমান্‌ষিতে বেরোতেই পারলুম না বাড়ি থেকে। না-হয় ছেড়েই দিতে টাকাটা, সোমেশ ! কত সময় নষ্ট হ'লো ! তোমার মেজাজটা দিন-দিন খারাপ হচ্ছে, সোমেশ।

সোমেশ। আজ্ঞে আর-কোনোদিন—

হিরণ্ময়। না, না, তোমার দোষ কী। গল্‌-স্টোন না সারালে মেজাজও সারবে না। আজ থেকে

তোমার একমাসের ছুটি। কালই ভর্তি হবে মেডিক্যাল কলেজে। ছোট্ট একটা অপারেশন ক'রে ফেললেই আপদ চুকবে। কিচ্ছু ভয় নেই, আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দেবো।

সোমেশ। কালই···

হিরণ্ময়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কালই। ভয় নেই তোমার, তোমার চাকরি ঠিক থাকবে। এখন যাও।

সোমেশ। আমার আজকের ব্যবহারের জন্য আমি সত্যি দুঃখিত।

হিরণ্ময়। বুঝেছি। আর দেরি কোরো না। যাও।

[সোমেশ চলে গেলো]

বরুণ। গেছে লোকটা ? উঃ, বাঁচলুম হাঁপ ছেড়ে। আস্ত একটা ক্যাড্‌!

[টেলিফোন বাজলো]

মনোহর। স্যর গৌরীশঙ্কর টেলিফোনে।

হিরণ্ময়। উঃ, জ্বালালে! ব'লে দাও আমি বাড়ি নেই।

মনোহর। বলছেন, সি-পির ফিনান্স মিনিস্টার আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

হিরণ্ময়। Blast it!

মনোহর। কী বলবো ?

হিরণ্ময়। বললুম যে, আমি বাড়ি নেই। শুনতে পাও না ?

মনোহর (টেলিফোনে)। Sorry, Sir Gourishankar, Dr Chaudhuri has just left. হ্যাঁ, এইমাত্র। বোধ হয় আপনাদের দিকেই গেছেন···হ্যাঁ, পার্টিতে যাবেন বলেছিলেন—হ্যাঁ···নমস্কার। (টেলিফোন রেখে) আমি তাহ'লে এখন যেতে পারি ?

হিরণ্ময়। আচ্ছা, যাও।

[মনোহর চলে গেলো]

হিরণ্ময় (একটু পরে) And now, my impertinent young man, what else can I do for you ?

বরুণ। আপনি কি আমার উপর রাগ করলেন ?

হিরণ্ময়। না, রাগ করবো কেন ? তোমাকে দেখে বরং ভালোই লাগলো। নয়তো তুমি কি ভেবেছো তোমার জন্য এত সময় নষ্ট করতুম ?

বরুণ। এমন আর বেশি সময় কী ? এখন তো আপনি ইচ্ছে করলে বেরোতে পারেন।

হিরণ্ময়। তোমার অনুমতির জন্য ধন্যবাদ। তা তুমি—তোমরা কি ততক্ষণ আমার এখানেই বিশ্রাম করবে ?

বরুণ। আমার তো সেইরকমই ইচ্ছা।

হিরণ্ময়। আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার বোধ হয় কোনো কথা ওঠে না ?

বরুণ। ডাক্তারবাবু, আপনি কি আমাকে মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা দেবেন ?

হিরণ্ময়। আমি তো এ-কথা বলিনি যে তুমি কিছুতেই বাঁচবে না।

বরুণ। না না, আপনি তো বললেনই আমি বাঁচবো। আপনার ওষুধ খেলে, আপনার কথা-মতো চললে রোগ আমার সেরে যাবেই। কিন্তু ওষুধ দামি, পথ্য আরো দামি—ও সব আমি কোথায় পাবো?

মালতী। আমি বুঝিয়ে বলছি। বরুণের এক পয়সাও আয় নেই। আমি মাষ্টারি ক'রে যে-পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনে পাই, তাই-ভরসা। নিজের খরচের জন্য পনেরো টাকা রেখে আর তিরিশ-টাকাও যদি ওর চিকিৎসায় খরচ করি, তাতেই বা কী! এ-রোগের চিকিৎসাই তো টাকা।

হিরণ্ময়। তুমি—আপনি ওর কে?

মালতী। আমাকে তুমিই বলবেন।

বরুণ। হ্যাঁ, ওকে আবার আপনি বলছেন কেন? ও যে নেহাৎ ছেলে মানুষ। ডাক্তারবাবু, ও আমার কে তা বলা যায় না। ও আমার সব, সব। ও ছাড়া জগতে আমার কেউ নেই।

হিরণ্ময়। বুঝেছি। তা তোমার মা বাবা···

বরুণ। মা নেই, বাবা আছেন, কিন্তু না থাকার মধ্যে। তিনি তাঁর নিজের সংসারের চাপেই অর্ধমৃত, আমার দিকে তাকাবার ফুরসুৎ তাঁর নেই।

হিরণ্ময়। ও, বুঝেছি। আর-কোনো আত্মীয়?

বরুণ। ডাক্তারবাবু, আপনি কি আমাকে যাচাই করছেন? আপনার মনেও কি এমন সন্দেহ উঁকি দিতে পারে যে আমি প্রতারণা করছি? আমার যদি টাকা থাকতো, আপনাকে আমি অঢেল টাকা দিতুম, ডাক্তারবাবু, আপনি নিশ্চিন্ত মনে দিন-রাত লেবরেটরীতে ব'সে কাজ করতেন, যুদ্ধ ঘোষণা করতেন রোগের, দুঃখের অপমৃত্যুর বিরুদ্ধে। তাহ'লে জমিদারের পচা লিভার আর ব্যবসাদারের ব্লাড-প্রেসারের চিকিৎসায় আপনার প্রতিভার শোচনীয় অপব্যয় হ'তে দিতুম নাকি কখনো? একা লুই পাস্তুর কী ক'রে গেলেন ভাবুন একবার! কিন্তু এখনো অনেক বাকি আছে, অনেক! আপনি হ'লেন না কেন তাদেরই একজন মৃত্যুকে যারা মারে, জীবনকে যারা বাঁচায়? আপনিও কেন আর সকলের মতো আয়ের অঙ্ক দিয়ে বাঁচবার যোগ্যতার হিসেব করতে বসলেন? হাজার হাজার টাকা যে খরচ করতে পারবে সেই বাঁচবে, আর তা যে না পারবে তাকেই মৃত্যুর হাতে আপনি তুলে দেন কোন বিবেকে? কী, চুপ ক'রে আছেন যে? আমাকে পাগল ভাবছেন?

মালতী। বেশি কথা বোলো না, বরুণ, এক্ষুনি আবার তোমার কাশি উঠবে। আপনি কিছু মনে করবেন না, ডাক্তারবাবু—এ-সব কথা বলা ওর রোগেরই একটা সিমটম। সত্যি কথাই ওর আত্মীয়দের মধ্যে সিবিলিয়ান কি বড়ো ব্যারিষ্টার, লিমিটেড কোম্পানির কর্তা কি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর একজনও নেই। তাছাড়া আত্মীয়রা ওকে পছন্দ করে না, তার উপর এ-রোগের নাম শুনলে তো দূর-দূর ক'রে তাড়াবে। ও ম'রে গেলে দুঃখিত হবার বিশেষ কেউ নেই। আমি ছাড়া আর-কেউ তো ওকে ভালোবাসে না।

হিরণ্ময়। অতএব আমাকেই এর সমস্ত দায়িত্ব নিতে হবে বোধ করি?

বরুণ। আগেই বলেছিলুম তোমাকে, মালতী! হিরণ্ময় চৌধুরী আমাকে ফেরাবেন না—তিনি আমাকে বাঁচাবেন!

হিরণ্ময়। কিন্তু আমি কী করতে পারি? এ দুর্ভাগা দেশে তোমার মতো হাজার লোক আছে,

লক্ষ লোক আছে। তারা যদি সবাই আজ আমার দিকে হাত বাড়ায় তার ফল এ-ই শুধু হবে যে আমিও ফতুর হ'য়ে যাবো। তুমি এখনো ছেলেমানুষ। তুমি বোঝো না যে পৃথিবীর দুঃখ অন্তহীন, একজন মানুষ তার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারে না।

বরুণ। সেই অন্তহীন দুঃখের বিরুদ্ধেই তো আমাদের যুদ্ধ—আপনার, আমার, মালতীর—শিল্পের, বিজ্ঞানের, ভালোবাসার। মরতে আমি ভয় পাইনে, ডাক্তারবাবু; কোটি কোটি লোক যে-অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো, সে-অন্ধকার আমাকেও ছিনিয়ে নিতে এলে আমি কি ভয় পাবো? না, না—তবু যে আমি বাঁচতে চাই তার দুটি কারণ। আমার মনের মধ্যে অদ্ভুত সব ছবি দিন-রাত হানা দেয়, সেগুলো আমাকে আঁকতেই হবে। আর ঐ মালতী। ওর ছোট্ট শরীরে অসীম স্নেহ, অন্তহীন শক্তি। ও না থাকলে কবেই আমি ম'রে যেতুম। কিন্তু সেরে না উঠলে তো ওকে বিয়ে করতে পারবো না।

হিরণ্ময়। সেরে উঠলেও অনেক দিন অপেক্ষা করতে হবে।

বরুণ। তা করবো। পাঁচ বছর, দশ বছর, কুড়ি বছর—যতদিন আপনি বলবেন। এখনো আমার বয়েস অল্প। ···কিন্তু এই জন্যেই তো অনেক দিন বাঁচতে হবে, যাতে যথেষ্ট দিন অপেক্ষা করতে পারি। কুড়ি বছর তো তুচ্ছ! হাজার বছর অপেক্ষা করতে পারি সানন্দে···কিন্তু সময় নেই! হঠাৎ একদিন মৃত্যু এসে কানে কানে ব'লে গেলো, সময় নেই! আর কী বিকট তার চেহারা কাকাবাবু, কুকুরের মতো ধুঁকতে ধুঁকতে, হাঁপাতে হাঁপাতে, রক্ত বমি করতে করতে মরা!

মালতী। ওকে চুপ করতে বলুন তো, কাকাবাবু, আমি ব'লে ব'লে তো হয়রাণ।

বরুণ। বলুন, কাকাবাবু, আপনি আদেশ করলে আমি আর একটি কথাও বলবো না। কিন্তু তার আগে আমার একটি কথার আপনি জবাব দিন: আপনি কি আমাকে বাঁচাবেন, না কি পাঠিয়ে দেবেন মৃত্যুর মুখে?

হিরণ্ময়। আমি তোমাকে বাঁচাবার কে? জীবন-মরণ কি মানুষের হাত?

বরুণ। বেশ তাহলে। আপনার মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা নিয়ে আমি চললুম।

[মুহূর্তের স্তব্ধতা]

হিরণ্ময়। শোনো—আমার চিকিৎসা থেকে তুমি বঞ্চিত হবে না। আর তাছাড়া···

বরুণ। আমাকে ভুল বুঝছেন। আমি সাহায্যের জন্য আসিনি। চলো, মালতী।

মালতী। আপনি ওকে কোথায় পাঠাচ্ছেন, ডাক্তারবাবু? ও এখন যেখানে থাকে সেই ঘর দেখলে আপনি আঁৎকে উঠবেন। মাসে দু' টাকা তার ভাড়া। সেখানে সুস্থ লোকেরই যক্ষ্মা হয়। আপনার সমস্ত চিকিৎসা ব্যর্থ হবে, সেই ঘরই ওকে মারবে। ওকে আপনি টাকা দিতে চাচ্ছেন, টাকা ফুরিয়ে যাবে। তার চেয়ে বেশি কিছু দিন, যা ফুরোয় না, আপনার করুণা, আপনার মহত্ত্ব, আপনার দেবত্ব। দেবতার শক্তি আপনার হাতে—আপনার কাছে ভিক্ষা চাইতে লজ্জা নেই—ডাক্তারবাবু, আমি আপনার কাছে ওর জীবন ভিক্ষা চাইছি।

বরুণ। না, না, ভিক্ষা নয়, আমার অধিকার, আমার অধিকার। আমি দীর্ঘজীবন চাই, পরিপূর্ণ জীবন চাই, শিল্পীর বিচিত্র, উজ্জ্বল জীবন চাই—তা তো কারো দয়ার দান হ'তে পারে না। অনেক জীবনের বলিতে পৃথিবী লাল, আমিও হবো বলি। চলো, মালতী।···ডাক্তার, অনেক, অনেক কাজ বাকি আছে

এখনো। দারুণ রোগের অব্যর্থ চিকিৎসা আবিষ্কারই যথেষ্ট নয়, সে-চিকিৎসা সকলেই যাতে পেতে পারে, তার ব্যবস্থা না হ'লে কিছুই হ'লো না।...আপনার অনেক সময় নষ্ট করলুম, এত শিগগিরই যদি মরতে না হ'তো তাহ'লে নিশ্চয়ই একদিন ক্ষতিপূরণ করতুম।

[একটু চুপচাপ]

হিরণ্ময়। একটু দাঁড়াও।

বরুণ। আপনাকে কী ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাবো জানিনে। মরবার সময় আপনার কথা আমার মনে থাকবে।

হিরণ্ময়। শোনো—একটা কথা।

বরুণ। বলুন, আপনার শেষ কথা বলুন। জীবন ? না, মৃত্যু ? জীবন, না মৃত্যু ?

হিরণ্ময়। যেয়ো না। আমার যদি শক্তিতে কুলোয় তোমাকে বাঁচাবো।

বরুণ। মালতী, আমি তবে বাঁচলুম ! মালতী !

(ক্রমশঃ)



নির্বাণ

গৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়

হাতে হাত রাখো
কথা কোয়ো নাকো,
হে শাশ্বতী,
চির-পরিচয়ে হে চির-অজানা চিরন্তনী !
দেখ নাকি হায়
বেলা চলে যায়
গোধূলি মিলাল দিগন্তরে,
ঘনায় সন্ধ্যা—
তোমার অশ্রু-চোখের ছায়ায়
বিদায় ঘনাল,
হে শাশ্বতী !
দিনের মরণে স্মৃতির মরণ
কেমনে মানিব, চিরন্তনী !

তন্বুতটরেখা এখনো ঢাকেনি
তিমির-চেলাঞ্চলে,
তারাদীপাবলি জলেনিক অম্বরে—
মন্থর ঐ কুহেলি জড়ায়ে প্রান্তরে
শর্বরী দূরে থমকি' প্রতীক্ষিছে।

সময় ফুরায়—
ফুরাল সময়, হে শাশ্বতী !
হানো নয়নের অন্তিম বিদ্যুৎ—
ঝলকি' উঠুক্ পলাতক পাখা
বিস্মৃতি-বলাকার
নামহারা কোন্ তুষারমরুর পারে।

নামুক্ এখন বিনিদ্র বিভাবরী—
কালসাগরের অবিরাম কলরোল
আছাড়ি পড়ুক্ অস্ত-অচল-মূলে।
আমিহীন তুমি, তুমিহারা আমি
তুমি নাই আমি নাই,
কেহ নাই কিছু নাই—
জ্বালাময়ী এই নেতির ধূয়ায়
কাঁপিছে তারকা কাঁপে অম্বর—
নব সৃজনের কি এ শিহরণ,
হে শাশ্বতী !*

[* 'পরিচয়' হইতে]

বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত বেকারসমস্যা

শ্রীনবগোপাল দাস, আই-সি-এস্

বাংলাদেশের মধ্যবিত্তদের মধ্যে বেকারসমস্যা গত কুড়ি পঁচিশ বৎসরের মধ্যে অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এবং বাংলাদেশেও অনেক তদন্ত কমিটি বসিয়াছে, কিন্তু সুষ্ঠু কোন সমাধান কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। ইহার প্রধান কারণ, আমাদের দেশের বেকার সমস্যা শুধু চাকুরী সমস্যা নহে, ইহা শিক্ষা, সমাজ এবং আদর্শ সমস্যা।

প্রথমেই আমাদের মনে রাখা উচিত শুধু তথাকথিত চাকুরী দিয়া বেকারদের দুঃখমোচন করা কখনই প্র্যাক্‌টিক্যাল পলিটিক্স হইতে পারে না। বাংলা দেশে বৎসরে অন্ততঃ কুড়ি হাজার ছেলেমেয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়, এগারো বারো হাজার ছেলেমেয়ে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেয় এবং অন্ততঃ তিন চার হাজার ছেলেমেয়ে গ্র্যাজুয়েট ছাপ নিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে বাহির হয়। ইহারা প্রায় প্রত্যেকেই চাকুরীপ্রার্থী, কিন্তু কেরাণীগিরি, শিক্ষকতা এবং সাধারণ কর্ম্মচারীর কাজ ছাড়া অন্য কোন প্রকার কাজের জন্য ইহারা উপযুক্ত নয়।

কাজের সংস্থান শুধু কেরাণীগিরি বা শিক্ষকতা দ্বারা হইতে পারে না। বেশীর ভাগ কাজ পড়িয়া আছে বাংলার মাটিতে এবং বাংলার কলকারখানায়। বাংলার মাটিতে সোণা ফলে ইহা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও আংশিক ভাবে সত্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কৃষি পরিচালনা রহিয়াছে অত্যন্ত অজ্ঞ ও নিরক্ষর এক শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ। বাংলা দেশের শিক্ষিত যুবকবৃন্দ যদি তাঁহাদের মিথ্যা আত্মাভিমান বর্জ্জন করিয়া সাধারণ কৃষকের মত ঐকান্তিক ভাবে উন্নত প্রণালীর কৃষিকার্য্যে ব্রতী হন্ তবে এখনও তাঁহারা মোটা ভাত কাপড়ের সুন্দর এবং সহজ ব্যবস্থা করিয়া নিতে পারেন।

তাহার পর কলকারখানায় কাজের সুযোগের কথা। বাংলা দেশে যে সমস্ত কলকারখানা বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার অধিকাংশই ইউরোপীয় বা অবাঙালী ভারতীয়দের হাতে বলিয়া বাঙালীরা হয়ত যথোপযুক্ত সুযোগ পায় না, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় এই সুযোগ না পাওয়ার জন্য বাঙালীরা নিজেরাই অনেকখানি দায়ী। কলকারখানার কাজ বাংলার তথাকথিত শিক্ষিত যুবকগণ পছন্দ করে না। হাতে তেল লাগা, কলকারখানার ঘর্ঘর শব্দ, কুলিমজুরদের সাথে মিশিয়া কাজ করা, এই সব জিনিষে তাহাদের আত্মসম্মানের হানি হয়। ফলে বাংলা দেশে অবস্থা হইয়াছে এই যে অধিকাংশ মালিক বা ম্যানেজারই যাহাদের মিথ্যা আত্মসম্মানবোধ নাই এমন লোকদের নিযুক্ত করিতে বাধ্য হন্ এবং মিথ্যা আত্মসম্মানবোধশূন্য কর্ম্মঠ লোক অবাঙালীদের মধ্যেই বেশী পাওয়া যায়।

আসল কথা হইতেছে এই যে সহজে উপার্জ্জন করার মোহ বাঙালী যুবকেরা কিছুতেই কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। আজকাল যাহারা বেকার সম্প্রদায়ভুক্ত তাহাদের পিতা পিতামহ তাঁহাদের যুগে অনায়াসে একটা কেরাণীগিরি বা সেই জাতীয় কাজ পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু দিন দিন শিক্ষিত যুবকের সংখ্যা বাড়িতেছে, অথচ সেই অনুপাতে কেরাণীগিরিজাতীয় চাকুরীর সংখ্যা বাড়ে নাই। এমতাবস্থায়

বেকার সমস্যা যে তীব্র হইয়া উঠিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? আমাদের বেকার যুবকেরা প্রায়ই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত, কোন বিশেষ টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা তাহাদের নাই বলিলেও চলে, অথচ সুলভ একটা মর্য্যাদাবোধে স্ফীত হইয়া তাহারা জীবন সংগ্রামে তাহাদের অক্ষমতার কথা স্বীকার করিবে না বা সাধারণ শ্রমিকের মত নিম্নতম সোপান হইতে কাজে ব্রতী হইবে না। ফল হয় এই যে অশিক্ষিত অথচ অহঙ্কারহীন, অবাঙালীরাই চোখের সম্মুখে তাহাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লয়, বাংলাদেশের যুবকদের অলসতার অবসরে তাহারা সব শিল্প ব্যবসায়ে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করে। আর বাঙালী যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া যায়।

আমাদের দেশের শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের জাতীয় চরিত্রের এই দোষগুলি আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। স্কুল, কলেজ বা য়ুনিভার্সিটিতে আমাদের দেশের যুবকেরা যে শিক্ষা পায় তাহা ব্যবহারিক জীবন হইতে এতখানি ভ্রষ্ট যে জীবন সংগ্রামে সেই শিক্ষা প্রায় কোন কাজেই লাগে না। তাহা ছাড়া কয়েকটি নোট্‌স্‌ গাইড মুখস্থ করিয়া যে সুলভ ডিগ্রীর ছাপ পাওয়া যায় সে ডিগ্রীর মূল্য কি ? অর্থনীতিতে আজকাল যুবকদের ঝোঁক খুব বেশী দেখিতে পাই। কিন্তু অর্থনীতি শাস্ত্রের কয়জন বি,এ বা এম্‌,এ দেশের অর্থ-নৈতিক সমস্যাগুলি বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করে ? রসায়ন বা পদার্থ বিদ্যার দিকেও অনেকের ঝোঁক আছে শুনিতে পাই। কিন্তু দেশের শিল্প-বিজ্ঞান-সমস্যা সম্বন্ধে কয়জন যুবক তাহাদের রসায়ন বা পদার্থ বিদ্যার জ্ঞান নিয়োজিত করে ?

ফল হয় বরং বিপরীত। যাহারা কলেজ বা য়ুনিভার্সিটির প্রাচীর অতিক্রম করিয়া বাহির হইয়া আসে তাহারা নিজেদের সাধারণ মানুষ সম্প্রদায় বহির্ভূত ভাবে, তাহারা মনে করে যে শ্রমসাধ্য কাজ তাহাদের জন্য নয়, তাহাদের কাজ, হয় কেরাণীগিরি নতুবা মাষ্টারি নতুবা ওকালতি বা মোক্তারি করা। তাহারা ভুলিয়া যায় প্রতি বৎসর যে ভাবে বাংলার বি,এ, এম্‌,এর সংখ্যা বাড়িতেছে সেই অনুপাতে কেরাণী-গিরি বা মাষ্টারী চাকুরীর সংখ্যা বাড়িতেছে না, বাড়া সম্ভবপরও নয়। অন্ন-সংস্থানের পথ তাহাদিগকে খুঁজিয়া নিতে হইবে কলকারখানায় ও ব্যবসায়ে, কৃষি ও কুটিরশিল্পে।



ভাল লোক

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

লোকটি ভাল। বয়স বেশি হইলেও—স্বাস্থ্যসম্পদ্‌যুক্ত। রঙটি না কালো, না গৌর; হাত পায়ের হাড়গুলি বেশ মোটা এবং চওড়া; মুখখানি প্রকাণ্ড; এত প্রকাণ্ড যে নাপিত দাড়ি কামাইবার পূর্ব্বে একটি পয়সা বেশি লইবার চুক্তি করিয়া লয়; সেই প্রকাণ্ড মুখের সঙ্গে গোঁফ এবং চক্ষু দুইটিও সমতা রক্ষা করিতেছে। মাথায় সবে মাত্র টাকের অঙ্কুর দেখা দিয়াছে। প্রথম দর্শনেই মনে শঙ্কার সঞ্চার হয়। কারণ, তিনি কথা বলেন কম; লাল চোখের প্রখর দৃষ্টি দ্বারা নবপরিচিতের আপাদমস্তক উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া জানালার দিকে সন্ধানী আলোর মত সেই দৃষ্টি ফেলিয়া একটি সিগারেট ধরাইয়া লন। পূব দিকের জানালার নীচেই খোলার ঘর। সেই সব ঘরের অধিবাসীদের চরিত্র সম্বন্ধে তিনি খুঁটিনাটি অনেক তথ্য জানেন। সেই সকল তথ্য ভদ্রসমাজে পরিবেশনযোগ্য নহে বলিয়াই সে বর্ণনা এখানে দিব না। কিন্তু ভদ্রলোকটিকে আমার ভালই লাগিল। তাঁহার লাল চোখে একটি প্রসন্ন জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। তিনি সারা মুখে কুঞ্চনরেখা সম্প্রসারিত করিয়া বলিলেন, 'জলতেষ্টা পেলে ওই কুঁজো আছে, ঢেলে খাবেন, কর্পূর দিয়ে রেখেছি।'

তাঁহাকে দেখিয়া আমার মুখ কি শুকাইয়া গিয়াছিল, নতুবা তিনি জলতৃষ্ণার কথা বলিলেন কেন? তক্তাপোষের উপরে বসিতেই বলিলেন, 'ওই চাকর—নাম রাখাল, যা দরকার হবে হুকুম করবেন।'

চাকর রাখাল ততক্ষণ তক্তাপোষের উপর প্রকাণ্ড এক থালা নামাইয়া দিয়াছে; থালার একটি কোণে খান দুই লুচি, কিছু ডাল, সিকি মুঠা বোঁদে পড়িয়া আছে। লোকটি একখানি লুচি গালে পুরিবার সময় লক্ষ্য করিলাম, গালের অনুপাতে হাঁয়ের প্রসার যথেষ্ট, একখানি লুচির পরিবর্ত্তে এক গণ্ডা ঠাসিয়া দিলেও তাহার মধ্যে স্থান সঙ্কুলান অনায়াসেই হইতে পারিত। অতঃপর জলযোগসমাপনান্তে তিনি পান সুরু করিলেন, একটি সিগারেটও ধরাইলেন।

সিগারেটের ধূম পান করিতে করিতে খোসমেজাজে গল্প আরম্ভ করিলেন, 'মশায়ের বাড়ী? বটে— আমারও ওই জেলা। আর মশায় বলবেন না, এবার বন্যায় আউশ ফসল ত নষ্ট হয়েছেই—ঘরবাড়ী কিছুর চিহ্ন আর নেই। আহা!' বলিয়া পরম দুঃখভরে সিগারেটে ঘন ঘন টান দিতে লাগিলেন।

দুঃখ-প্রকাশের ভঙ্গি ত সকলের সমান নহে। কেহ পোলাওয়ের ঢেকুর তুলিতে তুলিতে নিরন্নদের জন্য জ্বালাময়ী ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন, কেহ বা চাষ আবাদ না বুঝিয়াও—চাষ আবাদ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য মুখে মুখে ব্যাখ্যা করিতে পারেন। মোট কথা, ভরা পেটে দুঃখীর কথা দয়া করিয়া আমাদের মনের কোণে এক একবার চকিতের মত উদয় হইয়া থাকে। কারণ আর কিছুই নহে— অবচেতন মনের অন্ধকার গুহায় বিবেকের ক্ষণকালীন বিদ্যুদ্বিকাশ আর কি!

কিন্তু লোকটি সত্যই ভাল। তিনি তাঁহার গভীর দুঃখের মধ্যেও মুখখানিকে গম্ভীর করিয়া বিধাতাদত্ত সৌন্দর্য্যকে হত্যা করেন নাই। গল্পে তিনি প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। আর দুটি পান চিবাইয়া ফেলিলেন এবং আর দুটি সিগারেট ভস্মসাৎ করিলেন। চতুর্থ সিগারেট লইতে গিয়া খালি বাক্সটায় হাত ঠেকিতেই

হঠাৎ যেন সচেতন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'নাঃ, বসে বসে গল্প করলেই খালি পান আর সিগারেট খেতে ইচ্ছা করে। ওই জন্যই বেশী করে আনাই নে। যাই একটু বেড়িয়ে আসি।'

বাহির হইবার মুখেই বাধা।

—'বাবু, কিছু সাহায্য করতে হবে।'

লাল চক্ষু প্রখর হইয়া উঠিল, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, 'কিসের সাহায্য ?'

—'আজ্ঞে, বন্যেয় সব ডুবে গেছে। স্ত্রীপুত্র নিয়ে অনেকে মাঠের মাঝে রাত কাটাচ্ছেন। তাঁদের লজ্জা নিবারণের একখানি বস্ত্র—এক মুঠো অন্ন—'

শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়াই ভদ্রলোক একরূপ ধমক দিয়াই বলিলেন, 'এটা মেস জান না ? ভিক্ষে করতে হয়ত গেরস্ত বাড়ী যাও—এখানে নয়।'

মেসে থাকিবার এই একটা মস্ত সুবিধা বলিয়া মনে হইল। গরীবদের দুঃখ লইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে ঘুম না আসা পর্য্যন্ত যতক্ষণ খুসি গল্প করিতে পারিব, অথচ একটি পয়সা খরচা হইবে না। দয়াবৃত্তি অনুশীলনের জন্য গৃহস্থ বাড়ী ত খোলা আছে। ভিক্ষুকরা না চিনিলেও আমরা দয়া করিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে সেই বাড়ীর দরজা অনায়াসে দেখাইয়া দিতে পারিব। সুতরাং, লোকটি ভাল বৈকি !

এমন লোকের পরিচয় জানিতে কাহার না কৌতূহল হয়। নাম তাঁহার শ্রীযুক্ত অবনীভুষণ চট্টোপাধ্যায়। নিবাস, না, গ্রামের নাম আর বলিব না, বলিলেই আপনারা হয়ত তাঁহার সঙ্গে পরিচিত হইবার জন্য ব্যাকুল লইয়া উঠিবেন। তিনি নির্ব্বিরোধ লোক, বহু লোকের ঝঞ্ঝাট জোগাইতে ভালবাসেন না। জেলা অবশ্য বলিব। মুর্শিদাবাদ। কাজ করেন বড় সওদাগরী অফিসে। বেতন মধ্যম, কিন্তু ঘাড়ে সংসার চাপাইয়া বিপদগ্রস্ত হন নাই। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, সংসার নাই'ত অতটাকা তিনি উপায় করছেন কি জন্য ? কিন্তু প্রশ্নটা অবান্তর। সংসার পাতিবার জন্যই কি উপায় করা ? উপার্জ্জন করার একটি সুন্দর মোহ কি নাই ?

তিনি বলেন, টাকার পাখা আছে , জমে না। সে কথা সত্য। যাহারা বৃহৎ সংসার কাঁধে বহিয়া দুঃখকে দিনরাত সঙ্গী করিয়াছেন, তাঁহারা টাকায় কি করিয়া পক্ষ সংযোগ করিতে হয় সে কৌশল হয়ত জানেন না, অবনীবাবু জানেন। দানধ্যান অবনীবাবু ভাল বাসেন কি ? সে পরিচয় ত এই মাত্র কিছু গাইলাম। আর একটি বিষয় এই অল্প সময়ের মধ্যে লক্ষ্য করিলাম। এখানকার অধিকাংশ লোকের সঙ্গেই তাঁহার হৃদ্যতা নাই। অবনীবাবু বলেন, 'যত সব চ্যাংড়ার দল, কি কথা কইব ওদের সঙ্গে ! তার চেয়ে বড় বড় রাস্তা দিয়ে ঘুরে বেড়ান ভাল।'

কলিকাতার প্রশস্ত রাস্তা দিয়া অবনীবাবু প্রত্যহ টহল দিয়া বেড়ান। সন্ধ্যা সাতটা হইতে নটা সাড়ে নটা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া বাসায় ফেরেন, এবং লাঠি ও জামা যথাস্থানে রাখিয়া একটি পকেট এডিসনের মাদুর বগল দাবায় পুরিয়া ছাদে গিয়া উঠেন। খোলা ছাদে প্রচুর হাওয়া; সেই হাওয়ার সমুদ্রে চিৎ হইয়া শুইয়া তিনি শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করেন। পান সম্বন্ধে এই সময়ে তাঁহার মিতব্যয়িতা প্রকাশ পাইলেও, সিগারেট সম্বন্ধে তিনি উদাসীন নন। সিগারেট টানিয়া প্রথমে যে কাহাকেও দেখিলেই প্রশ্ন করেন কেমন আছেন ?

ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে যে লোকটিকে সুস্থ দেহে হাস্যমুখে গল্প করিতে দেখিয়াছিলেন, তিনি যে সহসা

অসুস্থ হইয়া পড়িবেন না—সেটুকু তিনি জানেন বলিয়াই নির্ভয়ে ঐ প্রশ্নটি করেন।

গল্প চলিতে থাকে—'তারপর, আজ কি রান্না হচ্ছে! ছ্যাঃ! এদের খাওয়া দাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। আজ শুনেছেন ক্যাবিনেটের খবর?'

জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি সে-সময় উত্তর দিতে গেলেই সহসা অবনীবাবু বলেন, 'এবার আর ফুলকপি খেতে হবে না, মশায়। পাটনার জমি সব জলের তলায়।'

জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি যদি বন্যা বা ফুলকপি সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করিতে সচেষ্ট হন—অবনীবাবু অধীর কণ্ঠে বলিয়া উঠেন, 'চলুন একদিন 'জীবন-প্রভাত' দেখে আসি। দেবিকারাণী পার্ট যা করেছে—.'

ভদ্রলোকের ধারাই এই। এক বিষয়ের পুনরুক্তি তাঁহারা শুনিতে চাহেন না, শুনাইতে ভালবাসেন। তাঁহাদের সঞ্চয় বেশি থাকিলেও, সে গুলি মেলিয়া ধরিবার পটুতা কম। যাহারা ইঁহাদের বোঝে না—তাঁহাদের সঙ্গে অবনীবাবুর কথা বন্ধ. যাঁহারা বোঝেন—তাঁহাদের সঙ্গে হৃদ্যতা বেশি।

আমি আসিবার পূর্ব্বে যাঁহার সঙ্গে ইঁহার হৃদ্যতা অর্থাৎ মাখামাখি ছিল, এই অবসরে তাঁহার কথা কিছু বলিয়া রাখি। লোকটির নাম জ্ঞান বাবু। বয়স গোটা চল্লিশ। সারাদিন অফিসে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি ও গোটা দুই টিউশনি করিয়া ক্লান্ত দেহে যখন বাসায় ফেরেন, তখন অবনীবাবুর গল্প-রোমন্থন তাঁহার নেহাৎ মন্দ লাগে না হয়ত। যতই অসার ও অখাদ্য হউক সে গল্প তাঁহার এক ঘেয়ে কর্ম্মক্লান্তির মধ্যে বিরতি বলিয়াই গ্রহণ করেন। অধুনা আর একটি টিউশন লওয়াতে তাঁহার বাসায় ফিরিতে বিলম্ব হইতে লাগিল, নবাগত আমাকে ধরিয়া অবনীবাবু সেই ক্ষতি পূরণ করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন।

সেদিন ছাদে শুইয়াই তিনি বলিলেন, 'জ্ঞানবাবুটা হা-টাকা যো-টাকা করেই মরবে। শরীর খারাপ অথচ দেখছেন ত ব্যাপারটা।'

একটু থামিয়া বলিলেন, 'হবে-নাই বা কেন? অবস্থা ছিল ওদের অচ্যভক্ষ্যধনুর্গুণ, জানি ত সব! এখন টাকার নেশা লেগেছে! সব পারি, মশাই, ওইটি পারলাম না।'

সে কথা সত্য, টিউশনি করিবার সামর্থ্য যাঁহার নাই তাঁহার পক্ষে রাজধানীর পথে পথে জন সমুদ্রের ঢেউ গণিয়া বেড়ানোই ত নিরাপদ।

বলিলাম, 'ভদ্রলোকের সংসারে পোষ্য বেশি—'

অবনীবাবু বলিলেন, 'পোষ্য কার না বেশি? রাজা মহারাজা কেউ ত এখানে নেই। ওসব স্বভাব, মশাই, স্বভাব। হাঁ, ভাল মশলার দোকান আপনার জানা আছে? পরিষ্কার জিনিষ অথচ দামে শস্তা।'

—'কেন কলেজ ষ্ট্রীট—'

—'দূর, পাইকারী দর পাবেন বড় বাজারে। একখানা ত্রিপল ও গোটা দুই বালতি কিনতে হবে, কাল যাবেন আমার সঙ্গে, দোকান দেখিয়ে দেব।'

এমন সময় আহারের তাগাদা আসিল। আমি উঠিতে উঠিতে বলিলাম, 'দাদা, চলুন।'

—'না, সাত তাড়াতাড়ি খাওয়া আমি পছন্দ করি না। যত সব পেট হাতে করা—'

সকালে না খাওয়ার হেতুটা ভূষণবাবু পরিষ্কার করিয়া দিলেন, 'আছে মশাই মজা আছে, নতুন লোক ও-সব বুঝবেন না, মজা আছে বলব? এক নম্বর—না থাক।' নূতন লোক বলিয়া তিনি

অধিক বাক্যব্যয় করিলেন না। অন্যান্য সকলে মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

খাওয়া শেষে একখানা বই পড়িতেছিলাম; বোধ হয় সাড়ে এগারোটা হইবে, অবনীবাবু সেই মাত্র আহার শেষ করিয়া আঁচাইতেছেন। সেই অবস্থাতেই চাকরকে বলিতেছেন, 'নাঃ, যত সব লাট বেলাটের কাণ্ড! রাত বারটা অবধি গলির আলো জ্বলছে! রাখাল, আলো নেবাও। কল বন্ধ আছে কিনা দেখে এস, আর প্রস্রাবের জায়গায় ফিনাইল জল ঢেলে দাও।'

ঘরে আসিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, 'আর নয়, মশায়, বই কাল পড়বেন। আলো না নিবুলে আমার আবার ঘুম হয় না, সারারাত ছট্‌ফট্ করে মরি।'

তাঁহার দেরিতে আহারের ইহাই কি এক নম্বর হেতু!

আর একদিন ছাদের প্রান্তে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'শুনেছেন জ্ঞানবাবুর কাণ্ড? ভুজুং ভাজং দিয়ে যতসব বড়লোকের ছেলের মাথাটি খাচ্ছেন! কিছু জানে না, মশায় খালি বচন। বচন না হ'লে অমনি আফিসের পর ছেলে ঠেঙান পোষায়! উঃ, এরাই আবার লোকশিক্ষা দেয়!'

অতঃপর তিনি জ্ঞানবাবু সম্বন্ধে যে-সব গুপ্ত কথা প্রকাশ করিলেন, তাহা শুনিয়া যে কোন নূতন লোক জ্ঞানবাবুকে একটি পুরা শয়তান ছাড়া অন্য কিছু কল্পনা করিতে পারে না।

বুঝিলাম, অবনীবাবু আমাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অন্তরঙ্গ বন্ধুর গুপ্তকথা কে আর তৃতীয় জনের কাছে প্রাণ খুলিয়া প্রকাশ করিতে পারে?

খানিক পরে ঠাকুর আহারের ডাক দিলে বলিলেন, 'আরে বসুন, সকাল থেকে খালি খাই, খাই। এক সঙ্গে বসবো' খন।

বলা বাহুল্য, ক্ষুধা স্নেহের তাড়নায় পরাজয় মানিল। খাইতে বসিয়া ঠাকুর যখন একখানি মাছ দেওয়ার পর আর একখানি মাছ দিতে উদ্যত হইল, তখন হাত নাড়িয়া বলিলাম, ' না, না, পরে যারা খাবেন তাঁদের অকুলান হতে পারে।

অবনীবাবু চোখের মধ্য দিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'ছেলে মানুষ আপনি—কিছু বোঝেন না। আমি সব শেষে খাই, তারপর খায় ঠাকুর আর চাকর, ও ইচ্ছে করলে একখানা কেন, দুখানা মাছও দিতে পারে। ঠাকুর, আমার জন্য যে স্পেশ্যাল পেঁয়াজের তরকারি করেছ, তাই থেকে বাবুকে একটু দাও। আর দেখ, সেদিন ফিষ্টের সময় যে পাঁপড় এসেছিল, তাই থেকে খান দুই রেখেছ ত? আচ্ছা, ভাজ দুখানা। আরে মশাই, খান, খান—এটা মেস।'

তাঁহার বিলম্বে খাওয়ার দ্বিতীয় কারণটিও যেন বুঝিতে পারিতেছি।

তথাপি বলিব—লোকটি ভাল! আমার খাওয়া শোওয়া চাল চলন ইত্যাদির মধ্যে কল্যাণজনক নির্দ্দেশ দিয়া আমাকে তাঁহার দিকে টানিতে লাগিলেন। মাসকাবারে একদিন হঠাৎ কিছু টাকার দরকার হওয়ায় অফিস হইতে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছি। কাহার কাছে চাহিব টাকা? সকলেরই সংসার আছে।

অবনীবাবু জামা ছাড়িয়াই প্রশ্ন করিলেন, 'মুখ শুকনো কেন?' কারণ জানিয়া অভয় হাস্যে বলিলেন, 'এই! আরে মুখ হাত ধুয়ে জলটল খান, আমি সে-ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

জলযোগান্তে তিনি সিগারেট ধরাইয়া বলিলেন, 'ওই জ্ঞানবাবু, উনি দিতে পারবেন টাকা।'

বলিলাম, 'নতুন আলাপ, ওঁর কাছে কি হঠাৎ টাকা চাওয়া যায় ?'

বলিলেন, 'আরে আপনি কি আর চাইবেন, চাইব আমি। প্রত্যেক মাসেই দশ পনেরো নিয়ে থাকি।'

—'কিন্তু আপনি ধার করেন কেন ?'

—'কেন ?' তিনি হাসিলেন। পরে বলিলেন, 'এ কেনর উত্তর দেওয়া মুস্কিল। ধার সকলকেই করতে হয়—রাজা মহারাজাকেও।'

—'কিন্তু জ্ঞানবাবুর সঙ্গে আপনার যে রকম মাখামাখি—'

তিনি হো হো করিয়া হাসিলেন, 'আজকাল নেই। কে বলেছে ? তা না থাক, চাইলেই টাকা পাওয়া যায়। ওর টাকা ছড়ানো থাকে, বাক্সে, বিছানার তলায়, আলমারির মধ্যে। আমাদের ত সেই পোষ্টাফিসের খাতা না খুললে—' হঠাৎ থামিয়া গিয়া বলিলেন, 'ঠাকুরকে একবার ডাকুন ত, কাল ওলের ডালনা খেতে হবে। ভাদ্র মাস, অথচ একদিনও ওল আসেনি মেসে।'

ওলের ডালনার ফরমায়েস হইল, অধিক রাত্রিতে টাকাও পাইলাম।

মেসের অনেকে অপ্রকাশ্যে আমাদের বন্ধুত্ব লইয়া ঠাট্টা তামাসা সুরু করিয়াছেন, মাঝে মাঝে তাহাদের গুঞ্জনের ধ্বনি শুনিয়া বুঝিতে পারি। অসমবয়সের বন্ধুত্ব বলিয়াই বুঝি এই ঠাট্টা। তাঁহার সঙ্গে দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিয়া থাকি, সিনেমায় যাই, তাস খেলি, বাজারের সওদাও একসঙ্গে চলে। সংসারীর পক্ষে তিনি যে অত্যন্ত সুবিধাজনক এ-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ কোথায় কোন জিনিষটি একটি আধলা মূল্যে সুলভ পাওয়া যায়, এ-তথ্য তাঁহার জানা। সিকি পয়সার হিসাব তাঁহার খাতার দৈনিক লিখন হইতে নিষ্কৃতি পায় না, অথচ সংসার তিনি পাতেন নাই। মাঝে মাঝে তাঁহাকে হেঁয়ালির মতই দুর্ব্বোধ্য মনে হয়, মাঝে মাঝে অত্যন্ত সরল বলিয়া অবহেলাও করিয়া ফেলি।

একটি জিনিষে তাঁহার নিষ্ঠা অত্যন্ত বেশি—

নিয়ম নিষ্ঠা। প্রত্যহ আটটায় শয্যাত্যাগ করিয়া সংবাদপত্র লইয়া বসেন। সংবাদপত্র না পাইলে বহু কটূ ও অশোভন মন্তব্য প্রকাশ করত সাড়ে আটটায় কলতলায় গিয়া নামেন। নয়টার মধ্যে ভাত তাঁহার চাই। আহারের পর মিনিট পনেরো খালি তক্তাপোষটায় চিৎ হইয়া পড়িয়া পান চিবাইতে থাকেন। পান চিবানো হইলে ধূমপান এবং তাহা শেষ হইলে ও-দিকে খোলার বস্তির প্রবেশ পথটির পানে, কখনও বা ও পারের দ্বিতলের খোলা জানালার পানে সতৃষ্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলিয়া নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া থাকেন। সাড়ে নয়টা বাজিতেই জামা জুতা পরিয়া অফিস-বেশে সজ্জিত হন। মেসের কাহারও ভাল মন্দর, অরুচিকর মন্তব্য প্রকাশ করিলেও, জড়াইয়া থাকিতে ভালবাসেন না। সকলে এই জন্য বলে 'মহাপ্রভু,' অন্তরালে অবশ্য 'প্রভু' শব্দ পক্ষী-বিশেষের নামে রূপান্তরিত হইয়া উচ্চারিত হয়।

তাঁহার অফিস ও আমার অফিস পাশাপাশি। ভুল করিয়া তাঁহাদের অফিসের কোন লোকের নামে একখানা চেক্ ইস্যু করিয়াছিলাম। সেই ভুলের খেসারৎ দিতে হইলে আমাকে পঞ্চাশ খানি মুদ্রা দণ্ড দিতে হইত। ভুলটা ধরিয়া দিলেন আমাদের হিসাব পরীক্ষক মিত্র সাহেব।

বলিলেন, 'যদি চেক ক্যাশ করার আগে রদ করতে পারেন, ভাল, নইলে এ-টাকা আপনাকেই দিতে হবে।

শুষ্ক মুখে অবনীবাবুর কাছে গিয়া পড়িলাম।

অবনীবাবু বলিলেন, 'আরে এস, বস। এত ব্যস্ত কেন? দেখি কোন ডিপার্টমেণ্টের বাবু? ও, অনাদি, আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক করে দিচ্ছি। পান খাও। আরে বিনয়, এদিকে এসো ত, তোমার কবিতাটা একবার এঁকে শুনিয়ে দাও ত।'

প্রাণে অস্বস্তি লইয়া বিনয়ের কবিতা শুনিলাম, শুনিয়া হাসিলামও। দেখিলাম, এখানেও রঙ্গ মন্দ চলে না। সব অফিসেই এমন একটি লোক খুঁজিলে পাওয়া যায়, যাহাকে ক্ষেপাইয়া আলস্যহীন কার্য্যের মধ্যে একটি স্বাস্থ্যকর (!) অবসর সৃষ্টি করা চলে।

অবনীবাবু আমাকে ক্ষতির দায় হইতে বাঁচাইয়া দিলেন, আমিও বেশি করিয়া তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ হইয়া পড়িলাম।

বাহিরের লোক এ-কৃতজ্ঞতার মূল্য বুঝিতে পারিল না। তাহারা আমাদের অন্তরঙ্গতা লইয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া অপ্রকাশ্যে ও অর্দ্ধপ্রকাশ্যে বলিতে লাগিল। তা বলুক, আমার অবনী-প্রীতিতে, এত কটাক্ষ নির্দ্দেশেও ভাঁটা পড়িল না। এমনই করিয়া একটি বছর সুখের মধ্য দিয়া কাটিয়া গেল।

একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে এক শুভ সংবাদ অবনীবাবুকে শুনাইয়া দিলাম, 'শুনেছেন, আসছে মাস থেকে একটা গ্রেড পেলাম, একশো থেকে—দেড়শো।

অবনীবাবু শুধু বলিবেন, 'বেশ' এবং তাড়াতড়ি জামা গায়ে দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

যখন ফিরিলেন, তখন আমরা মশারি টাঙাইয়া নিদ্রার আয়োজন করিতেছি।

সেই দিন হইতে লক্ষ্য করিলাম, অবনীবাবুর কর্ম্ম-ব্যস্ততা বাড়িয়াছে, আমাদের সঙ্গে আলাপের অবসর তাঁহার কম, অস্বাভাবিক ভাবে তিনি গম্ভীর।

দিন দশেক পরে, এক প্রাতঃকালে দেখিলাম আবার তাঁহার মুখের হাসি ফিরিয়া আসিয়াছে। সকাল বেলাই পানের ফরমাস দিলেন, সিগারেট ধরাইলেন এবং আমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, 'এবার চেকোশ্লোভাকিয়ার অবস্থা কেমন বুঝছেন? পারবে সামলাতে জার্ম্মেণীর ঠেলা?'

প্রফুল্লবাবু বলিলেন, 'ওদিকে রাশিয়া এদিকে ফ্রান্স—হঠাৎ কিছু করতে পারবে বলে বোধ হয় না।'

'না! ওদের হুমকীই সার। জার্ম্মেণী ওর টুঁটী চেপে ধরলে—কি করবে ফ্রান্স, রাশিয়া? ডাইরেক্ট সাহায্য করবার পথ আছে?'

'কেন, আকাশ-পথ?,

অবনীবাবু হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, 'দুত্তোরি আকাশ পথ। ঠাকুর, ঠাকুর?'

'বাবু'! বলিয়া জোড়হস্ত ঠাকুর দুয়ারের ও পিঠে আসিয়া দাঁড়াইল।

—'দেখ, আজ পেটটায় বড় কামড় মারছে, একটু সিঙ্গি মাছের ঝোল ক'রো।'

এইরূপে সিঙ্গিমাছের ঝোলের মধ্যে চেক-প্রসঙ্গ ডুবিয়া গেল।

একদিন বৈকালে অফিস বইতে আসিয়া দুই খানি পত্র পাইলাম। বছর তিনেক পূর্ব্বে গৃহসংস্কার উপলক্ষে কোন মহাজনের নিকট হইতে শ'দুয়েক টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলাম। সুদ এ যাবৎ এক পয়সা বাকি রাখি নাই, আসলটা এই মাসে অফিস হইতে কিছু ধার করিয়া শোধ দিব ভাবিতেছিলাম। মাহিনা বাড়িয়াছে, সংসারে অসচ্ছলতা না আসিবারই কথা। এদিকে হ্যাণ্ডনোটের মেয়াদ উত্তীর্ণপ্রায়।

সে-কথা মহাজন জানিত, আমিও জানিতাম। আর জানিতেন অবনীবাবু; তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্টতা বৃদ্ধির মুখে অনেক গোপন কথাই বলিয়াছিলাম।

যাহা হউক, টাকা শোধ লইয়া এ-যাবৎ মহাজন পীড়াপীড়ি করে নাই—সেই জন্য কতকটা নিশ্চিন্ত ছিলাম।

কোন কারণবশত মহাজন যে পীড়ন করিবে না তাহা জানিতাম, কিন্তু ধার শোধ না দেওয়া পর্য্যন্ত একটা অস্বস্তি নিরন্তর আমাকে খোঁচা মারিত।

হাত মুখ ধুইবার আগেই লেফাফা দুখানি খুলিলাম। চারখানি পত্র-টুকরা তাহা হইতে টানিয়া বাহির করিলাম। একখানি স্ত্রীর চিঠি, একখানি বড় কন্যার (সম্প্রতি সে প্রথম ভাগ শেষ করিয়াছে; কাজেই তাহার মায়ের পত্রের সঙ্গে নিজের কুশল-সংবাদ ও পুতুল-ক্রয়ের অনুরোধ জানাইয়া প্রায়ই লিপি-কুশলতার পরিচয় দিয়া থাকে), একখানি স্বয়ং মহাজনের। চতুর্থ খানির লেখক কে তাহাই সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলাম।

সেইখানির খানিকটা এইরূপ;

........আপনার নিশ্চয় স্মরণ নাই যে, আর এক সপ্তাহ পরে আপনার হাতচিঠির তারিখ না বদলাইলে উহা তামাদি হইয়া যাইবে। এ-বিষয়ে অবহিত হওয়া আপনার উচিত। ....বাবুর মাহিনা বাড়ার সংবাদ মিথ্যা। আমরা একই আফিসের লোক। একদিন কথা-প্রসঙ্গে আমার কাছে বলিলেন, 'আর কটা দিন গেলে নিশ্চিন্ত। একটা ভাবনা ঘোচে।' জিজ্ঞাসায় সমস্ত জানিতে পারিলাম।

এরূপ অসৎ লোককে কেন যে টাকা ধার দিয়াছিলেন, তাই ভাবি! অথবা সৎ লোকেরা চির দিনই অসতের দ্বারা প্রতারিত হইয়া থাকেন। যাহা হউক, ধর্ম্মের কল যে বাতাসে নড়ে—এ-কথা মিথ্যা নয়। যদিও আপনি অপরিচিত, তথাপি ধর্ম্ম-রক্ষা-কল্পে এক আনার ষ্ট্যাম্প খরচ করিয়া আপনাকে সাবধান করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্যবিধায় এ-কার্য্য করিলাম। আশা করি যথা-বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। ঈশ্বরের কাছে আপনার কুশল কামনা করি। ইতি—

জনৈক হিতাকাঙ্ক্ষী

এই পত্র খানির শেষে মহাজনের মন্তব্যটি এইরূপ;

তুমি যে এইরূপ নরাধম তাহা জানিতাম না। আমার ধারণা ছিল, কলিকালে ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপ পাইতে বসিয়াছে, এ-কালে কেহ কাহারও উপকার করিতে ভালবাসে না। কিন্তু দেখিতেছি, আমার সে ধারণা অমূলক। তোমাদের অফিসে এখনও ধর্ম্মের কল নিত্য চলিতেছে, এবং সে-কল বাতাসে নড়িয়া অনেক রহস্য প্রকাশ করিয়া দেয়। সত্বর টাকা শোধের ব্যবস্থা না করিলে......কিন্তু পত্রে আর সে-কথা প্রকাশ করিব না, সাক্ষাতেই বলিব। এখন জিজ্ঞাসা করি, এইরূপ অন্তরঙ্গ ধার্ম্মিক বন্ধু কয়জন এ যাবৎ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছ? যাহাদের সাক্ষাতে পারিবারিক তথ্য উদঘাটন করিতে তোমার দ্বিধা বোধ হয় না?......

অবনীবাবু খালি তক্তাপোষে চিৎ হইয়া পড়িয়া প্রসন্ন মুখে পান চিবাইতেছিলেন ও গলিপথে নিত্য নিয়মিত সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন।

বলিলাম, 'আপনার টাইম টেবল খানা একবার দেবেন?'

—'ঐ বাক্সর উপর আছে, নিন।' তিনি প্রসন্ন মুখে সিগারেট ধরাইবার উদ্যোগ করিলেন।

টাইম টেবল খুলিতেই তাহার মধ্যে অবনীবাবু গতকল্য যে মশলার ফর্দ্দখানি তৈয়ারী করিয়াছিলেন—তাহা টুপ করিয়া বিছানার উপর পড়িয়া গেল। সন্দেহ ভঞ্জন হইল।

টাইম টেবল রাখিবার শব্দে অবনীবাবু ঘাড় ফিরাইয়া আমার পানে চাহিয়া সহাস্যে বলিলেন, 'ওকি, মুখ গম্ভীর কেন? চলুন, চলুন, আজ 'বেকার নাশন' দেখে আসা যাক 'উত্তরা'য়। যাবেন?'

প্রত্যুত্তরে কোন কথা না বলিয়া হিতাকাঙ্ক্ষী-লিখিত পত্রখানি তাঁহারা কোলের কাছে ছুঁড়িয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলাম।

হাত মুখ ধুইয়া ফিরিয়া আসিতেই অবনীবাবু প্রসন্ন-সহানুভূতি-সূচক কণ্ঠে বলিলেন, 'দেখুন শত্রুতা! একেই বলে ঘরের ঢেঁকি কুমীর। আফিসের লোককে কখন ত বিশ্বাস করতে নেই। মহাজন নালিশ করেছে ত?'

অতি কষ্টে মনোভাব দমন করিয়া বলিলাম, 'না, ঘরের ঢেঁকি এক জায়গায় ঢেঁকিত্বেরই পরিচয় দিয়াছেন। মহাজন যদি আমার নিকট আত্মীয় না হ'য়ে আর কেউ হতেন—'

অবনীবাবু সোৎসাহে অর্দ্ধনগ্ন কোমরের কাপড় টানিয়া তুলিয়া সোজা হইয়া বসিলেন এবং এক সঙ্গে গোটা দুই ডবল খিলি পান গালে পুরিয়া অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটায় প্রচণ্ড একটা টান দিয়া প্রচুর ধোঁয়া বাহিরকরত আনন্দ প্রকাশ করিলেন, 'যাক বাঁচা গেল। চলুন, চলুন, আজ 'বেকার নাশন' দেখতেই হবে।'

আশ্চর্য্য, সেই আনন্দ প্রকাশের মধ্যে এতটুকু কৃত্রিমতা ছিল না।

সুতরাং, লোকটি ভাল বৈকি!



শরৎ-পরিচয়

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীকান্তে শরৎচন্দ্র ইন্দ্রনাথের যে সব বীরত্বের কাহিনী লিখেছেন সে গুলিকে একেবারে নির্জলা সত্য ব'লে ধ'রে নিলে আমাদের ভুল হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। কেননা, শ্রীকান্ত বইখানি নিশ্চয় শরৎ-চন্দ্রের আত্ম-জীবন-চরিত নয়। সে-রকম ভুল যাঁরা করেন তাঁরা ভুলে যান যে, শ্রীকান্ত বইখানি জীবনী নয়, সেটিও একখানি উপন্যাস।

তবে, একখানি সাধারণ উপন্যাসের সঙ্গে এর তুলনা ক'রলে একটি বিশেষত্ব পরিস্ফুট হ'য়ে উঠে। এই উপন্যাসখানির উপকরণ বাস্তব-ঘটনাকে কল্পনার রং-এ রসে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

একটু বিশদ ভাবে দু-একটি ঘটনার বিশ্লেষণ করলেই আমরা বুঝতে পারব যে, শরৎচন্দ্রের কল্পনা কি রকম মায়া সৃষ্টি ক'রেছে।

শ্রীকান্তের প্রথম পর্ব্বের আরম্ভেই আমরা দেখি যে, একটি 'ফুট-বল ম্যাচে'র পরি-সমাপ্তির পর মারা-মারি, এবং বিপন্ন শ্রীকান্তকে ইন্দ্রনাথ আততায়ীর হাত থেকে উদ্ধার করছে।

এই মারামারির সময় সেখানে বর্ত্তমান লেখকের উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য ঘটেছিল। ভাগলপুর "টয়েন বি স্পোর্টের" একটি খেলার শেষে এ ব্যাপারটি ঘটে। এবং ইন্দ্রনাথের (রাজু) দল লাঠির জোরে বিপক্ষ পক্ষকে তাড়িয়ে দেয়।

শ্রীকান্তের (শরতের) সঙ্গে ইন্দ্রনাথের (রাজুর) এটি প্রথম দেখা নয়। কারণ এই ঘটনা ১৮৯৩-৯৪ সালে ঘটে। এই সময়ে শরতের বয়স সতের বৎসর, রাজুর আঠার উনিশ হবে।

এখানে রাজুর বর্ণনাটি একটুও কাল্পনিক কি অতিরঞ্জিত নয়।

কিন্তু শ্রীকান্তকে একেবারে অন্য ছাঁচে ঢেলে দেওয়া হ'য়েছে। ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তকে বল্‌ছে :—না তবে কি ? দাঁড়িয়ে মার খাবি নাকি ? ঐ, ওই দিক দিয়ে ওরা আস্‌চে—আচ্ছা, তবে খুব ক'সে দৌড়ো—

এ কাজটা বরাবরই খুব পারি।

শেষেরটি শ্রীকান্তের উক্তি। কিন্তু জানি যে শ্রীকান্তের সহকারিতা নৈলে সেদিনের জয় ইন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

শ্রীকান্তে শ্রীকান্তের চরিত্রটি কল্পনার রং-এ রসে এমন রূপ দেওয়া হয়েছে—যা ইন্দ্রনাথকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তোলার সহায়তা দান ক'রেছে!

তারপর ইন্দ্রনাথের সিদ্ধি এবং সিগারেটের প্রসঙ্গ। ইতিপূর্ব্বে নীলার কাহিনীতে বলা হ'য়েছে যে, শ্রীকান্ত দেবানন্দপুর থেকে নেশায় দক্ষ হ'য়ে ফিরেছে। অতএব এটি সম্পূর্ণ অলীক ছদ্ম সাধুতা!

ইন্দ্রনাথের রাতে বাঁশী বাজিয়ে বেড়ান'র গল্প সত্য। বড়দাদার মন্তব্যটি নির্জলা সত্য ; সে হতভাগা ছাড়া এমন বাঁশীই বা বাজাবে কে, আর ঐ বনের মধ্যেই বা ঢুক্‌বে কে ?

গোঁসাই বাগান সেকালে ছিল "রামবাবুর বাগান" এখন শিবচন্দ্র খাঁর দৌহিত্র ধরণীবাবু এই বাগানের মালিক।

এইবার মেজ'দাদার কঠোর তত্ত্বাবধানে তিন ভাইএ-র নিঃশব্দে বিদ্যাভ্যাসের কাহিনী।

ক্যাম্বিসের খাটের উপর শুয়ে আছেন পিশে মশাই নয়—দাদা মশাই এবং বৃদ্ধ রামকমল ভট্টাচার্য্য—রামচন্দ্র ভট্‌চায্।—ছোড়দা এবং যতীন দা—দুজনেই মামা—গল্পের খাতিরে দাদা হ'য়েছেন। এই সময় দেউড়িতে গৌরী সিং তুলসীদাসের রামায়ণ প'ড়তো সুর ক'রে।

টিকিট-বিলির গল্প সত্য। ছিনাথ বউরূপীর অভিযানও সত্য। তবে সবটাতেই কল্পনার রসান আছে।

বউরূপীর ল্যাজ কাটাটি শরৎচন্দ্রের "অধিকন্তু না দোষায়।" সেদিন ইন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিল না। শরৎচন্দ্রও না। এই গল্প কুসুমকামিনীর সান্ধ্য বৈঠকে শোনা—শরৎচন্দ্র তাকে এমন অদ্ভুতভাবে রূপায়িত করেছেন। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। কল্পনার ইন্ধনে বাস্তবের খেয়ালি পোলাও!

শ্রীকান্তের বিস্তৃত আলোচনা করলে দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে এমনি করেই শরৎচন্দ্র বাস্তবকে কল্পনার সহযোগে সাহিত্যের পংক্তিভুক্ত ক'রেছেন। কিন্তু শ্রীকান্তকে তাঁর আত্ম-জীবন-চরিত ব'লে ধ'রে নিলে সমূহ ভ্রান্তির মধ্যে প'ড়তে হয়। এমন কি শ্রীকান্ত-চরিত্র শরৎচন্দ্রের চরিত্র নয় এ কথা জোর ক'রেই বলা যায়—এবং বললে সত্যের কিছুমাত্র অপলাপ করা হয় না।

তবে আর একটি কথা প্রণিধান-যোগ্য। শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্রের জীবনের অভিজ্ঞতার উপকরণেই গঠিত। এমন কি শ্রীকান্তের সহিত শরৎ-জীবনের একটি অদ্ভুত সমান্তরলতা আছে। কিন্তু আবার এ কথাও সব সময়ে মনে রাখতে হবে যে শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তে সবচেয়ে বেশী আত্ম-গোপন ক'রেছেন।

শ্রীকান্ত চরিত্রে একটি পরিস্ফুট সংসার-নৈর্যুজ্য আছে; সেইরূপটি শরৎচন্দ্রের চরিত্রে মাত্র ছিটেফোঁটায় ছিল; কিন্তু তাঁর পিতা মতিলালের চরিত্রের সেইটিই মেরুদণ্ড ব'ললে একটুও অত্যুক্তি করা হয় না।

অনেকে ব'লে থাকেন যে, শরৎচন্দ্র সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যে আত্ম-প্রকাশ করে গেছেন, জীবনী হিসাবে তাই যথেষ্ট। তাঁর স্বতন্ত্র জীবন-চরিতের কোন প্রয়োজন নেই। শরৎচন্দ্র কিন্তু তাঁর নিজের সাহিত্যের মধ্যে অদ্ভুত আত্ম-গোপনই ক'রেছেন। এ কথা যাঁরা জানেন না, তাঁদের ভুল হওয়া কি একান্ত স্বাভাবিক নয়?

শ্রীকান্তের আরম্ভে ইন্দ্রনাথকে লোক-চক্ষুর গোচর করার ভূমিকায় শরৎচন্দ্র বলেছেন; কিন্তু কি করিয়া "ভবঘুরে" হইয়া পড়িলাম, সে কথা বলিতে গেলে, প্রভাত-জীবনে এ নেশায় কে মাতাইয়া দিয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তাহার নাম ইন্দ্রনাথ।

ইন্দ্রনাথ, অর্থাৎ বাস্তব রাজেন্দ্রনাথের সহিত আলাপ হ'বার বহু পূর্ব্বে শরৎচন্দ্র—সেকালে যখন পুরী যেতে রেল হয়নি—তখনই পায়ে হেঁটে পুরী বেড়িয়ে এসেছিলেন। ইন্দ্রনাথের থিয়েটারের দলে যোগ দেবার আগেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গীত এবং অভিনয় বিদ্যায় হাতে খড়ি হ'য়েছিল—এক যাত্রার দলে।

অতএব শরৎচন্দ্রের "ভবঘুরে" বৃত্তির গুরু রাজেন্দ্রনাথ নন্।

সৃষ্টির মহত্ত্ব উপলব্ধি ক'রে সৃষ্টি কর্ত্তাকে জানার ইচ্ছে একান্ত স্বাভাবিক। ইংরাজিতে যাকে "ব্যাক্‌ডোর কিউরিওসিটী" বলে, এ নিশ্চয়ই তা নয়। ইংরাজি সাহিত্যে তেমন একটা ইচ্ছা এবং

চেষ্টা সেক্সপীয়র সম্বন্ধে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রকে ব্যক্তিগত ভাবে জান্‌তে পারলে সাহিত্যের দিক দিয়ে কোন ক্ষতি হবে ব'লে তো মনে হয় না। অবশ্য, এখেনে শরৎচন্দ্রকে অন্যায় ভাবে উঁচু করার জন্যে সেক্সপীয়রের সঙ্গে তুলনা করার দুরভিসন্ধি নেই। বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের স্থান যে কোন্ ধাপে হবে তা নির্ণয় করার সময় হয়ত' আসেনি এখনও; কিন্তু একটা স্থান হ'লেও হতে পারে মনে করার মধ্যে খুব বড় বেশী অপরাধ হয় না, হয়তো।

বর্ত্তমান লেখকের শরৎচন্দ্রকে বাল্যকাল থেকে জানার সুযোগ ঘটেছিল। শরৎচন্দ্র তাঁকে ১৩৩৯ সালের ৩০শে আশ্বিনে সাম্‌তাবেড় থেকে একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন—কত কাল পরে যে তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে ব'সেছি তার ঠিকানা নেই। বোধ করি বছরখানেকের মধ্যে একখানা চিঠিও লিখিনি। তুমি আমার বিজয়ার ভালবাসা জেনো। এ স্নেহ কোন দিনই কম নেই,—কম হয়নি। সে যাক্।

এই চিঠিতে দেখা যায় যে দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও ছিল। বর্ত্তমান লেখকের শ্রীকান্ত বারম্বার পড়ার পরও দৃঢ় প্রতীতি হয় যে, শরৎচন্দ্রের জীবন-চরিত—শ্রীকান্তে নিঃশেষে লেখা হ'য়ে যায়নি।

শরৎচন্দ্রকে বুঝতে হ'লে শরৎ যে সময়ে ভাগলপুরে অতিবাহিত করেন সেই সময়ের বাঙ্গালী সমাজের কথা কিছু কিছু জানা দরকার। কেন না, তাঁর লেখার বহু উপকরণ ভাগলপুরের সেই সময়কার ঘটনার প্রতিচ্ছায়ায় পরিপূর্ণ!

তা ছাড়া মানুষটি-ই বা কোথা দিয়ে, কেমন ক'রে এমনটি হ'য়ে গ'ড়ে উঠ্‌লেন, তা জানার আগ্রহ মানুষের থাকা অন্যায় ত নয়ই পরন্তু একান্ত স্বাভাবিক।

ভাগলপুর এখন বিহারে গিয়ে পড়েছে; কিন্তু আটাশ বছর আগে বাংলার অন্তর্ভুক্তই ছিল। সেখানে উদ্যমশীল অভাবগ্রস্ত চাকুরে-বাঙালী গিয়ে তাঁদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করেন। প্রতিযোগিতাও ছিল কম।

এখানে বাঙালী ব'লতে বাংলা ভাষা-ভাষী লোকদের কথাই ধ'রতে হবে। এমন যাওয়া মুসলমান আমোলেও ছিল; কিন্তু সে যুগের বাঙালীরা তাদের আচার-ব্যবহার, এমন কি, মাতৃ-ভাষা ভুলে গিয়ে না-মুর্গি, না-বটের অবস্থা প্রাপ্ত হ'য়েছেন! শুন্‌তে পাই এই অবস্থা-প্রাপ্ত বাঙালী অন্য জায়গাতেও আছেন।

কিন্তু ইংরেজ আমোলে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরা কিম্ভুত কিমাকার ভাব ধারণ করেন নি। তার অন্যতম দৃষ্টান্ত শরৎচন্দ্র নিজেই!

মুঙ্গের আর ভাগলপুর আজকের বিহার প্রদেশের বাঙালী-অধ্যুষিত দুটি কাছাকাছি সহর। এদের মধ্যে জামালপুর এক সময়ে ই-আই-আর রেলের কর্ম্ম-কেন্দ্র ছিল। সেই সময়ে বহু বাঙালী কর্ম্ম-উপলক্ষে এখেনে বাস করতেন। মুঙ্গের থেকে জামালপুর বেশী দূর নয়, অতএব মুঙ্গেরে বাঙালীদের একটি সুন্দর উপনিবেশ গ'ড়ে ওঠার সুযোগও ঘটে ছিল। মুঙ্গের সীতাকুণ্ডের জন্যে বিখ্যাত। এখানে গঙ্গা উত্তর-বাহিনী এবং প্রসিদ্ধি আছে যে, মুঙ্গেরের কষ্টহারিণীর ঘাটে শ্রীরামচন্দ্র তাঁর পথ-ক্লান্তি অপনোদন ক'রেছিলেন। এই হিসেবে মুঙ্গের ভাগলপুরের চেয়ে লোভনীয় স্থান। তার উপর মুসলমান আমোলে মুঙ্গের প্রসিদ্ধিও লাভ ক'রেছিল।

সেকালে ফ্যাসানের দিক দিয়েও মুঙ্গের ভাগলপুরের অগ্রণী ছিল। এখনও দেখ্‌তে পাওয়া যায়

যে পাটনা এবং ক'লকাতার ফ্যাসান প্রথম আসে মুঙ্গেরে এবং তারপর রক্ষণশীল ভাগলপুর ধীরে ধীরে তার অনুকরণ করে। মুঙ্গেরে সে কালে কাঁচা পয়সার গরম ছিল। যাত্রা থিয়েটারের রব-রবা ছিল। মুঙ্গেরের ব্রাহ্ম-মন্দির ভাগলপুরের ব্রাহ্ম-মন্দিরেব চেয়ে পুরোনো। মোট কথা, ভাগলপুর অগ্রগতিতে মুঙ্গেরের আজও পিছনেই চ'লে থাকে।

একটি নূতন উপনিবেশে আদিতে—যখন নবাগতের সংখ্যা থাকে মুষ্টিমেয়, তখন তারা যেন এক পরিবারভুক্তের মত ঘনিষ্ঠতায় সম্বদ্ধ হ'য়ে বাস ক'রতে থাকে। একজন দাঁড়ান কর্ত্তার মতো, তাঁর আদেশ, নির্দ্দেশ, অনুজ্ঞা এবং বিধি-নিয়মে বাকি সকলে চলে। ভাগলপুরে বাঙালীকে জঙ্গল কেটে বাস ক'রতে হ'য়েছিল। যারা আদিতে এসে বাঙালীটোলার সৃষ্টি করেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন ব্রাহ্মণ। বাঙালীটোলার প্রথম বাড়ী গঙ্গার উপর মাণিক সরকার তৈরি ক'রেছিলেন। মাণিক সরকার—আদামপুরের নীল কুঠির সরকার অর্থাৎ ম্যানেজার ছিলেন। সরকারের এখন একটা ছোট মানে হ'য়েছে; কিন্তু মাণিকচন্দ্র সেই শ্রেণীর গোমস্তা সরকার ছিলেন না। নীলকুঠি থেকে পাকা পুলের উপর দিয়ে তাঁর বাড়ী আস্‌তে হ'তো। এই কাজে সরকার মশাই জমিদারী ক'রে গেছেন। এবং মাণিক সরকারের বংশধরেরা—মাণিক সরকারের পুরোনো বাড়ীকে নূতন ক'রে আবার এসে বাস ক'রছেন। এঁরা মধ্য কলিকাতায় বাড়ী ক'রে বাস ক'রতেন। বাঙালী টোলার এই বাড়ীর পর ব্রাহ্মণের বাস সুরু হয়—এবং দু-চার ঘর কায়স্থ বাদে প্রকৃত এটি ব্রাহ্মণ পাড়া।

কায়স্থেরা ব্রাহ্মণদের আগে এসে প্রায় সকলেই জমিদারী ক'রেছেন।

এক-শো দেড়-শো বছর আগে ব্রাহ্মণদের প্রতিষ্ঠা ছিল, তাই ভাগলপুরের বাঙালী সমাজও ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যেই পরিচালিত হ'তো। কায়স্থরা সংখ্যায় অল্প হ'লেও—সঙ্গতি-পন্ন ছিলেন; কিন্তু তাঁরা ব্রাহ্মণের প্রাধান্য মেনেই চ'লতেন। হিঁদুয়ানির দিক দিয়ে ভাগলপুরের বাঙালী-সমাজ মুঙ্গেরের বাঙালী-সমাজের চেয়ে বেশী রক্ষণ-শীল ছিল।

এর উপর আর একটি বড় কথা ছিল। যে সব বাঙালী মুসলমান আমোলে এসেছিলেন, তাঁদের অবস্থা কতকটা শোচনীয় দাঁড়িয়েছিল। তাঁরা বাংলা ছেড়ে ছিকা-ছিকি ধ'রেছিলেন। চেহারায়, আচার-ব্যবহারে, তাঁদের মধ্যে বাঙালিত্বের স্বরূপ খুঁজে বার করা শক্ত।

নতুন দল এটাকে দুর্গতি মনে ক'রে—তা' থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার বিধিমত চেষ্টা ক'রেছিলেন। নিজেদের শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কার এবং আচার ব্যবহারে স্বদেশের ধারা প্রবাহিত রাখার চেষ্টার সুফল আজও দেখ্‌তে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র সেটিকে বড় একটা সু-নজরে না দেখ্‌লেও, ভাগলপুরের বাঙালী সমাজ আজও গর্ব করার অনেক-কিছু দেখাতে পারে। এখেনে বাঙালীর সাহিত্য-পরিষৎ শাখা আছে, সঙ্গীত-সমাজ, ভাগলপুর ইন্‌স্টিট্যুট্, হরিসভা, দুর্গাস্থান, কালীস্থান, ব্রাহ্ম-সমাজ ও আছে। এই সহরে রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার জন্মেছিলেন—তাঁর সঙ্গীত এবং সাহিত্যের কৃতিত্বের কথা ভাগলপুর বাঙালীর শ্লাঘার বস্তু। শরৎচন্দ্রের শিক্ষা-দীক্ষা সাধনার কেন্দ্র হিসেবে ভাগলপুর বাংলা দেশের স্মরণীয় স্থান। ভাগলপুর তেজনারায়ণ কলেজও একজন বাঙালীর পরি-কল্পনা-প্রসূত। তাঁর নাম ডাঃ লাড্‌লিমোহন ঘোষ। তেজনারায়ণ সিং তাঁরই অনুপ্রেরণায় এই কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন।

য়াক্, কথা এই যে, বঙ্কিমের বন্দে-মাতরম্ রচনার আগেই ভাগলপুরের প্রবাসী নয়, প্রান্তবাসী বাঙালী নিজেদের বাঙালীত্ব রক্ষা করার জন্যে প্রাণ-পণ চেষ্টা ক'রে কায়েমি বন্দোবস্ত ক'রে গিয়েছিলেন। সেখানকার বেশীর ভাগ প্রতিষ্ঠান গুলি সিপাই বিদ্রোহের আগেকার।

একদিন যা সকলের সমবেত চেষ্টায় হ'য়েছিল পরে তা' আবার জ্ঞাতিত্ববোধ জাগাতে তুটো তিনটেও হ'য়ে ভাগ হ'য়ে গেল। এই দলা-দলি, ভাঙ্গা-গড়ার বিষম-কালেই শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে ছিলেন। ভাগলপুরে শরৎচন্দ্র শৈশব থেকে ছাব্বিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত ছিলেন। পাঁচ থেকে কুড়ি পঁচিশ পর্য্যন্ত মানুষের শিক্ষা-দীক্ষায়, চরিত্র,—সংস্কারে বেড়ে ওঠার কাল। আমাদের বক্তব্যও মূলত শরৎচন্দ্রকে অবলম্বন ক'রেই চ'লবে।

ভাগলপুরের সেকেলে বাঙালী যে কি রকম অতিমাত্রায় রক্ষণশীল ছিলেন তার একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথা আরও পরিষ্কার হবে ভরসা করি।

তারাপদ ঘোষাল মশাই তখন জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার ছিলেন। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। বহু-ভাষা-বিদ্,—গ্রীক্, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, সংস্কৃত, পালি ইত্যাদি বহু ভাষায় তাঁর দখল ছিল প্রগাঢ়। অবশ্য, তিনি ইংরিজিতে এম-এ তো ছিলেনই।

উদার প্রকৃতির মানুষ। সকল বিষয়ে দৃষ্টি তাঁর গভীর এবং প্রশস্ত।

ইস্কুলের হাতায় নারকুলে কুলের অসংখ্য গাছ ছিল, ফলও ফ'লতো অসম্ভব। কিন্তু তার শান্ত-শাসনে, তার অজ্ঞাতে একটি ফলও কোন ছাত্র ছিঁড়ে খেতো না। কুল পাক্‌লে একদিন ঝুড়ি ঝুড়ি পাড়া হচ্চে, আর ছেলেদের মধ্যে বাঁটা হচ্চে। বিচার-বুদ্ধিকে ছেলেদের মনে এমন দৃঢ় ক'রে দেবার ব্যবস্থা সচরাচর ইস্কুল পাঠশালায় দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। আবার আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থাও ছিল অতিশয় বিচিত্র। সে যুগে ইস্কুলে ম্যাজিক দেখান, কুস্তি শেখান এবং ছেলেদের দিয়ে অভিনয় করান—একটা অবাক্ কাণ্ড।

অভিভাবকেরা তখন খেলার মর্ম্মই বুঝতেন না। অভিনয় নিয়ে চাপা আলোচনাও চ'লতো বাড়ি বাড়ি, কিন্তু এমন সংযতবাক্ রাশ-ভারি মানুষ ছিলেন তিনি যে, প্রতিবাদও কেউ ক'রতো না তার পাণ্ডিত্যের উপর সকলের বিশ্বাসও ছিল অপরিমেয়।

সে বছর গ্রীষ্মের ছুটির দিন সন্ধ্যার সময় ছেলেদের আমোদ-প্রমোদের "জলসায়" অভিভাবকেরাও আহূত হ'য়েছিলেন। জলযোগের পর রঙ্গমঞ্চে সীতার পাতাল প্রবেশের অভিনয়ের ভূমিকায় ছেলেদের প্রবর্ত্তিত কনসার্ট বেজে উঠ্‌লো। তারপর অতি সংক্ষেপে ঘোষাল মশাই বুঝিয়ে দিলেন কি সুফল পাওয়া যায়—এই অভিনয় করাতে।

মাঙ্গলিক গানের পর—লাল শালুর পর্দ্দা উঠে গেলে দেখা গেল শ্বেত পদ্মের উপর ব'সে আছেন দেবী সরস্বতী—বীণা-রঞ্জিত পুস্তক-হস্তে! তাঁর পায়ের কাছে রাজ-হংস। ঋষিবালকেরা গান ধরলে যা কুন্দেন্দুতুষারহার-ধবলা···ধূপ-ধুনোর গন্ধে চারিদিক আমোদিত!

চারিদিকে চটাপট হাত-তালি!

বাঃ! বাঃ! ক্যাপিট্যাল্! একসেলেণ্ট!

এমন সময় খাঁ মশাই উঠ্‌লেন ব্যাঘ্র হুঙ্কার দিয়ে এক লাফে ষ্টেজের ওপর। সরস্বতীর পরচুলো

উঠে এলো তাঁর বজ্র-মুষ্টির মধ্যে।

ফুট্‌লাইটের মোমবাতি কার্পেটের উপর প'ড়ে লঙ্কাকাণ্ড, সেদিনের প্রমোদের আনন্দ বিপদের ঘনান্ধকারে লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল সত্যি বটে; কিন্তু চিরদিনের জন্যে তা' নিঃশেষ হ'য়ে যায়নি।

কিন্তু প্রমোদ-প্রবণ মানুষের মন যথানিয়ম ছিদ্র-অন্বেষণ ক'রে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা বেঁধে ছিল। বাঙালী-টোলাতেই এক যাত্রার দল! কিন্তু যাত্রায় নবীনদের মন উঠে না। অচিরে আর্য্য-সমাজ নাম নিয়ে যাত্রা দলের বাছা এক্‌টররা এক থিয়েটারের দল খুলে ফেললে। কিন্তু তাতেও আকাঙ্ক্ষা মেটে না! অবশেষে অতি-আধুনিকরা খুল্‌লে "আদামপুর ক্লাব।" রাজা শিবচন্দ্রের একমাত্র ছেলে কুমার সতীশ হ'লেন তার পৃষ্ঠপোষক গৌরী সেন। রাজুর ছোড়দার নেতৃত্বে তার বাড়-বাড়ন্ত। ষ্টেজ ম্যানেজার হ'লেন ম্যানেজার-ললিত—আর রাজু, শরৎ, নরু, ক্ষীরু, মহেন, উপীন্দা ইত্যাদি ইত্যাদি ক্লাবের "নরক গুলজার" করতে লাগ্‌লেন।

কিন্তু "আদামপুর ক্লাব" শত্রুপক্ষেরা যার নাম দিয়েছিল, "এ ড্যাম পূয়োর ক্লাব"—শুধু থিয়েটার করার উদ্দেশ্য নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়নি। ক্রীকেট, শিকার, দাবা, তাস, পাশা, বিলিয়ার্ডস্‌ এবং পরে "ফুট বল" এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

সেদিন সাহিত্যের কদর ছিল না। তবে নভেল পড়া বাদ যেতো না এবং শেষের দিকে ছোড়দা লিখ্‌লেন এবং অচিরে ছাপালেন "ক্রীতা।"

এমনি ক'রে দিনে দিনে প্রতিযোগিতার উত্তাপে সমাজ দ্বিধা ভিন্ন হ'য়ে প'ড়লো! রক্ষণশীলেরা—অর্থাৎ দক্ষিণ-পন্থীদের—আর্য্য-ধর্ম্ম প্রচারিণীর পতাকার নীচে—হরি-সভার এক মণ্ডলী জমাট বাঁধলে।

অন্যদিকে উদার-পন্থীরা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অতীন্দ্রিয় প্রভাবে দানা বাঁধার উপক্রম ক'রে—ভাগলপুর ইন্সটিট্যুটে সমবেত হ'লেন।

ঠিক এই সময় ভাগলপুরের বাঙালী-সমাজের ইতিহাসে একটা প্রকাণ্ড সমস্যা-মূলক ঘটনা ঘ'টে গেল।

শিবচন্দ্র তাঁর তীক্ষ্ণ প্রতিভায় অল্পকালের মধ্যে ধন-কুবের হয়ে উঠ্‌লেন এবং সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন ক'রে সমুদ্র যাত্রা ক'রলেন।

এই অমার্জ্জনীয় অপরাধে শিবচন্দ্র এক-ঘরে হ'লেন। বাংলা দেশের সনাতন দলাদলির পুনরাবৃত্তি সুরু হয়ে গেল।

শরৎচন্দ্রের তখন বয়স অল্প হ'লেও ব্যাপারটিকে হৃদয়ঙ্গম করার মতো তিনি একেবারে অবোধ নন। এইখেনেই তাঁর মনে পল্লী-সমাজের বীজ উপ্ত হ'য়েছিল ব'লে মনে হয়।

দুঃখ হ'তে, ক্ষতি হ'তে

কমলরাণী মিত্র

দুঃখ হ'তে ক্ষতি হ'তে যে অমৃত ক'রেছি সঞ্চয়
নিত্য পলে পলে,
মৃত্তিকার ধরণীতে কণ্ঠ ভরি' তা'রি চিরজয়
গাহি কুতূহলে!
রজনীর অন্ধকারে অগণিত তারকার ভাতি
গগন-অঙ্গনে
কী বিস্ময়ে হেরিয়াছি পুলকিত একা সারারাতি
মুগ্ধ শিহরণে!
জন্মে জন্মে মনে হ'বে জন্ম হ'তে নব জন্মান্তরে,
মৃত্যুলোক পারে—
সেই কথা রেখে' যাবো অরণ্যের পল্লব মর্ম্মরে
ধরার দুয়ারে!
অনন্ত বেদনা-মাঝে আছে যাহা সৃষ্টির সম্ভবে
আনন্দ স্বরূপে
আমি যে দেখেছি তা'র মধুর স্বভাব
অপরূপ রূপে—
তাই মোর কাব্যকথা হ'লো আজি ছন্দিত মুখর
অশ্রু-পূর্ণ দেশে,
কুসুম-সজ্জায় আজো ধরণীর রোরুদ্য অন্তর
সাজে বধূ-বেশে!

''রঙ্গপুরের পল্লীগীতিকায় রঙ্গরস''*

শ্রী তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

সাধারণ যাত্রাভিনয়ে একঘেয়ে অভিনয় যখন লোকের মনকে বিশেষ আকৃষ্ট করে না, তখন মাঝে মাঝে আসর জমাইবার জন্য হাস্যরসের প্রয়োজন হয়। কখনো ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর দ্বন্দ, ঝাড়ুদার ঝাড়ুদারণীর প্রেম কলহ-ই লোক-জনকে ঠেকাইয়া রাখে। যে কোন নাটকই হউক না কেন, তাহার মধ্যে শত করুণভাব থাকিলেও, গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিবার মনোমত ইঙ্গিত থাকিলেও অন্ততঃ একটি স্থানে হাস্যরসকে ফুটাইয়া তুলিতে হয়, নতুবা নাটকের অঙ্গহানি হইবে, সন্দেহ নাই। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, লোক স্বভাবতই কৌতুকপ্রিয়। স্থান, কাল পাত্রানুসারে একই বস্তু বিভিন্নাকার ধারণ করে। কোন খোঁড়াকে দেখিয়া মনে হয়ত দুঃখ হইতে পারে, কিন্তু কোন একটি নিখুঁত লোক যদি খোঁড়াইতে থাকে, তাহা হইলে না হাসিয়া উপায় নাই। অনেকের এমন ক্ষমতা আছে যে একাই আসর জমাইয়া রাখিতে পারেন—লোকে তাঁহার মুখ হইতে যে কোন রকম একটু কিছু শুনিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, হাস্যরস উপভোগ করিবার লোক হয়ত অনেক মিলিতে পারে, কিন্তু হাসাইতে পারে কয়জন?

যাক সে কথা। সাধারণ পল্লীগীতিকার মধ্যে যে সমস্ত রঙ্গরস আছে, তাহাও কম উপভোগ্য নয়।—তাহা না হইলে এত লোক ধৈর্য্য-সহকারে বসিয়া শুনিতে পারিত না। যাঁহারা পল্লীগীতিকার রঙ্গরসে আনন্দ উপভোগ করেন না, তাঁহারা হয় গেঁয়ো লোকের আমোদ প্রমোদ বলিয়া উপেক্ষা করেন, না হয় তাহাদের ভাষা বোঝেন না কিংবা বুঝিবার চেষ্টা করেন না।

রঙ্গপুরের পল্লীগীতিকার রঙ্গরসবিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য আলোচ্য প্রবন্ধের অবতারণা। রঙ্গপুরের পল্লীগীতিকার মধ্যে ময়নামতীর গান-ই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। নাথ সম্প্রদায় এই গান পাঁচরাত্রি ধরিয়া গাহিয়া থাকে। ময়নামতীর গান, যুগী বেশ, হাড়িসিদ্ধার গান "থাড়া ঝুকি" প্রভৃতি নামে উক্ত গানটি প্রচলিত। স্থান, কাল, ভাব, ভাষা ও সংস্কার লইয়া আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে উক্ত গান রঙ্গপুর জেলার নিজস্ব; বিশেষতঃ নীলফামারী মহকুমার অধীন ধর্ম্মপাল নামক স্থান হইতে উদ্ভূত। যাক্ সে কথা [1]ময়নামতীর গানের মধ্যে ধর্ম্মরাজ যখন তাঁহার জননী ময়নার নিকট হইতে তাঁহার পিতার মৃত্যু বিবরণ অবগত হইলেন এবং কালিকা বন্দরের বন্দরিয়া ও হাড়িসিদ্ধা তাঁহার পিতার মৃত্যুর ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত বলিয়া সন্দেহ করিলেন, তখন কালিকাবন্দরের বন্দরিয়ার বাড়ীতে খেতুয়াকে পাঠাইলেন। খেতুয়া পাইকালি লাঠি হাতে করিয়া, ভাঙ্গা ছাতি ঘাড়ে করিয়া কালিকাবন্দর অভিমুখে রওয়ানা হইল। খেতুয়ার কালিকাবন্দরে গমন উপভোগ্য রঙ্গরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

সাত পোয়া বহরের ধুতি নিলে খেড়ুয়া পরিধান করিয়া,
বাপ্ কালাডি পাইকালি লাঠি নিলে হস্তেত করিয়া,
ভাঙ্গা একটা ছাতি নিলে খেতুয়া ঘাড়েত করিয়া।
টিকিরাও চাপরেয়া যায়ছে খেতুয়া কালিকাবন্দরক লাগিয়া
ইত্যাদি।

জননী ময়নার উপর কলঙ্কক্ষেপ করিবার জন্য ধর্ম্মিরাজকে [3]হীরানটীর বাড়ীতে বার বৎসর যাবৎ তের ঘড়া জল প্রতিদিন বহন করিতে হইয়াছিল। হীরানটীর বাড়ীতে ধর্ম্মিরাজের দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না—হীরানটী রাজার বুকের

---

* রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত। (১৩৪৬ সাল)

১। নীলফামারী মহকুমার অধীন ডোমার ষ্টেশন হইতে ৫ মাইল পূর্ব্বে ধর্ম্মপাল নামে একটি গ্রাম আছে। সেইস্থানে ধর্ম্মপাল রাজার বাড়ী ছিল বলিয়া লোকের বিশ্বাস। আধ মাইল দূরে একটি গড় আছে তাহার নাম ময়নামতীর গড়। এখানে যুদ্ধের জন্য অনেক অস্ত্র ঢালাই করা হইত, তাহার চিহ্ন পাওয়া যায়।

২। কালিকাবন্দর = কালীগঞ্জ, কালিকাপুর প্রভৃতি নামে অনেক স্থানে রংপুর জেলায় আছে। কালীগঞ্জ ডোমার হইতে প্রায় ৭ মাইল উত্তর পূর্ব্বদিকে। এখনো এখানে একটি ছোটখাটো হাট বসে। কালিকাপুর নীলফামারী সহর হইতে ৭ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে। করোতোয়া নদী তাহার নিম্ন দিয়া প্রবাহিত। এখানে পূর্ব্বে একটি বন্দর ছিল। নীলফামারী সহর হইতে ৫ মাইল দক্ষিণে বাবড়িঝাড় নামক স্থানে হাড়িসিদ্দার বাড়ী ছিল বলিয়া লোকের বিশ্বাস। শেষোক্ত কালিকাপুর ও বাবড়িঝাড় নামক স্থানের সহিত বন্দরিয়া ও হাড়িসিদ্ধার বাড়ীর সংস্পর্শ স্বাভাবিক।

৩। হীরানটীর বাড়ী:—পার্ব্বতীপুর ষ্টেশনের পরে খোলাহাটি ষ্টেশন, উক্ত খোলাহাটি ষ্টেশন হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে করতোয়া নদীর তীরে একটি

উপর চড়িয়া স্নান করিত। জননী ময়না পুত্রের ক্লেশ ভোগের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া হাড়িসিদ্ধার উপর অনুযোগ করিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার পুত্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য হাড়িসিদ্ধাকে আদেশ প্রদান করিলেন। হীরানটীর বাড়ীতে গমন করিবার পথে ধর্ম্মিরাজের সহিত হাড়িসিদ্ধার সাক্ষাৎলাভ হইল। হাড়িসিদ্ধা তাঁহাকে ঝোলার মধ্যে পুরিয়া হীরানটীর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং ধর্ম্মিরাজকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য হীরানটীকে বলিতে লাগিলেন। হীরানটী নানা রকম অজুহাতে আসল প্রসঙ্গ ঢাকিয়া রাখিতে প্রয়াস পাইতে লাগিল। এদিকে ঝোলার মধ্যে থাকিয়া ধর্ম্মিরাজ নড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। আর, হাড়িসিদ্ধা তাঁহাকে চাপিয়া রাখিতে লাগিলেন। ছোট-খাটো ব্যঙ্গকে অবহেলা না করিলে, সাধারণের দৃষ্টি বোধ করি এরূপ রঙ্গ এড়াইতে পারিবে না।

১ বগলত থাকি ধর্ম্মিরাজ নড়ে আর চড়ে।
বাম বগল দিয়া সিদ্ধা চিপি চিপি ধরে॥

উত্তর বঙ্গে জগজ্জীবন কবির "মনসা পুরাণ" বিশেষ-ভাবে প্রচলিত। দীর্ঘ এগার রাত্রি ধরিয়া এই গান হইয়া থাকে। বিশেষতঃ রঙ্গপুর অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট এই গান অতি প্রিয়। চামর ধরিয়া মূল গায়েন গান গাহিতে থাকে, সঙ্গে ৪।৫ জন দোয়াড় ধুয়া টানিয়া যাইতে থাকে—অধিকাংশ স্থানেই এই রীতি দৃষ্ট হয়। যাত্রার প্রণালীতে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া গান গাহিতে ও এখন দেখা যাইতেছে। লক্ষীন্দরের বিবাহের জন্য কন্যার সন্ধান করিতে চন্দ্রধর সদাগর বাহির হইলেন। লেঙ্গাপাত্র তাহার নিকট বিভিন্ন দেশের কন্যার কথা আনিয়া জোগাইতে লাগিল। বিভিন্ন দেশের কন্যার কথা অতি সুন্দর ভাবে রঙ্গরূপে বিবৃত হইয়াছে, এস্থলে কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি।

প্রথমেতে গেল সাধু পূর্ব্ব সহর।
উতরিল গিয়া চান্দ উধা বানিয়ার ঘর॥
উধা বানিয়ার কইনা দেখিতে সুন্দর।
কাঠালের প্রমাণ ঘেঘ তার গলার উপর॥

*　　*　　*

ওখান থাকি যাত্রী হইল বিদায়।
মধু বানিয়ার ঘরে যাআ উপনীত হয়॥
মধু বানিয়ার কইনার কথা কহনে না যায়।
কাঠাল প্রমাণ গোদ আছে তার বাম পায়॥
ধুপ্ ধাপ্ করি গোদী হাসের মত চলে।
আস্তি দেওয়া হাস্ত যেমন ধীরে ধীরে চলে॥
ইত্যাদি।

এইরূপে কন্যা না পাইয়া সাধু বাড়ী ফিরিতে বদ্ধপরিকর হইলে মনসা দেবী মায়ারূপে বুড়ি সাজিয়া সদাগরকে বাচক সদাগরের বাড়ী যাইতে উপদেশ প্রদান করিলেন। বাচক সদাগরের কন্যা বেহুলাকে দেখিয়া চন্দ্রধর সদাগর প্রীত হইলেন এবং বিবাহের একরকম পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিয়া বাড়ী ফিরিলেন, শুভ দিনে লক্ষীন্দরকে সঙ্গে লইয়া বরযাত্রিগণ বাচক সদাগরের বাড়ী পৌছিলেন। লক্ষীন্দরকে দেখিয়া যুবতীগণ নিজেদের ভাগ্য নিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কাহার স্বামী অপেক্ষা কাহার স্বামী মন্দ, তাহা লইয়া রঙ্গরস চলিতে লাগিল॥

ওকি ও সই মন মোর হরিয়া লইল রে,
নয়নে নয়ন দিয়া॥ (ধুয়া)
এক যুবতী বলে দিদি মোর কপাল পোড়া।
২মুই হেন সুন্দরী ৩মাইয়া মোর সোয়ামি খোঁড়া॥
নাঠি ধরিয়া উঠে খোঁড়া, ৪নাঠি ধরিয়া বইসে।
খোঁড়ার ভাবনায় চোখে মোর ৫নিন্দ নাই আসে॥

*　　*　　*　　*

আর যুবতী বলে দিদি তোর খোঁড়া আপন ভাল।
মুই হেন সুন্দরী মাইয়া মোর সোয়ামি কাল।
লোকে বলে ৬কালুয়া স্বামী—মোর সে হয় দুঃখ।
প্রভাতে উঠিয়া ৭দেখো হাড়ি ৮পাতিলার মুখ॥
আর এক যুবতী বলে দিদি তোর কালুয়া আপন ভাল।

বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মরাজ যে হীরা নটীর বাড়ীতে ১২ বৎসর তের ঘড়া জল বহিয়াছিলেন, তাহার বাড়ী এই স্থানে-ই ছিল বলিয়া লোকের বিশ্বাস।

১। বগলত—বগলে—সপ্তমীস্থানে "ত" প্রযুক্ত হইয়াছে। ২। মুই—আমি; ৩। মাইয়া—মেয়ে, স্ত্রী; ৪। নাঠি—লাঠি; ৫। নিন্দ—নিদ্রা; ৬। কালুয়া—কালবর্ণ; ৭। দেখো—দেখি; ৮। পাতিলা—গামলা কলস।

মোর ঘরে দাঁতুয়া স্বামী সে বড় জঞ্জাল ॥
দাঁতুয়ার দাঁত যেমন দিদি চৈত মাসের মুলা।
তুক্কের স্থখের কথা কইতে দাঁতে নাগে ইরা ॥
ইত্যাদি।

তারপর লক্ষ্মীন্দরকে দেখিয়া বুড়ীরা কেমন পাগল হইয়াছে, তাহা রঙ্গরূপে উক্ত হইয়াছে।

ওকি আমার বুড়ী পাগল হইল রে (ধুয়া)
এক বুড়ী বলে দিদি মোর বলিত যৈবন।
লোকে বলে বুড়ী [1]মোক্ বুড়ী নয় মোর মন ॥

* * * * *

এক বুড়ী বলে দিদি মুই বালার [2]নাগ্য পাওঁ।
গুয়া হেন খোসা থুইয়া বালাক মুই খাওঁ ॥
এক বুড়ী বলে দিদি মুই বালার নাগ্য পাওঁ।
সন্দাতে [3]হুরুকা দিয়া কপাট প্রভাতে [4]না ঘুচাওঁ।

কন্যাদান করিবার সময় কন্যাপক্ষের কে কি রকম দান করিতেছে তাহা উপভোগ্য রূপে বর্ণিত হইয়াছে—এ স্থলের রঙ্গরস ও উপেক্ষার নয়।

তারপরে দান করে কইনার মাসি।
দান নাই দক্ষিণা নাই মুচ্কিমারা হাসি ॥
তারপরে দান করে কইনার [5]আবো।
কি দান দেব রে নাতি—তোরে সঙ্গে যাব ॥

লক্ষ্মীন্দরকে "বিবাহের কামান" কামাইবার সময় বেহুলার সখীবৃন্দ নরসুন্দরকে লইয়া রঙ্গ করিতেছে। বিবাহে মাথা কামাইবার প্রথা রঙ্গপুরের ক্ষত্রিয়দের মধ্যে অনেক স্থলে প্রচলিত আছে। রঙ্গপুরের ক্ষত্রিয় সমাজের উদ্যোগে ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের কাহার-ও বিবাহের সময় উপবীত ধারণ করিবার রীতি কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। বিবাহে মস্তক মুণ্ডন প্রথা এখনো অনেক স্থলে প্রচলিত। যাহা হউক, এদিকে বেহুলার সখীবৃন্দ নরসুন্দরকে লইয়া এক একটি রঙ্গের কথা বলিতেছে, আর সে বেচারী দৌড়াইয়া পলাইতে বাধ্য হইতেছে। বেহুলার সখীবৃন্দ রঙ্গ করিয়া বলিতেছে—

এত মানুষ মরে, [6]নাউয়া কেনে না মরে—
নাউয়ার পোন্দে জোক্ [7]সোন্দাইছে—কেকর
কেকর করে ॥

নরসুন্দর তখন দৌড়াইতে প্রবৃত্ত হইল এবং তাহার কাপড়-চোপড় ঝাড়িতে আরম্ভ করিল। সখীবৃন্দ তখন তাহাকে টানিয়া আনিয়া মস্তক মুণ্ডন করাইতে বসাইল।

সখীবৃন্দ আবার রঙ্গ করিয়া গান করিতে লাগিল।

ওরে [8]মাথা কেলের [9]বার [10]গেলু রে নাউয়া।
তোর [11]নাউয়ানীকে ধরি পলাইছে ছয়জন [12]চেঙ্গেরা—

বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের বিবাহ হইবার পর ছয় বধূ অন্নপাক করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ধুলা বালিতে শাক পাতা মাখিয়া সিদ্ধ করিয়া রাখা হইতেছে।

আনিয়া চাম ঘাসের ডারি, তাহারে করিল রস মাধুরী
তাহাক্ রাখিল কোটরায় ভরিয়া।
[13]কাইঞ্চা বাড়ীর নারিঞ্চা শাক্
কাজলে মাখিল [14]তাক্
বালি দিলে নবন বলিয়া ॥

যথা সময়ে ছয় বধূ লক্ষ্মীন্দরকে অন্ন ব্যঞ্জন পরিবেশন করিয়া গেল। অন্ন ব্যঞ্জনের অবস্থা দেখিয়া লক্ষ্মীন্দর তাহা মুখে তুলিতে পারিল না। তখন লক্ষ্মীন্দর বধূগণকে উপলক্ষ্য করিয়া নানারকম রঙ্গ করিতে লাগিল। বধূদিগের স্বামীর নূতন যৌবন বয়স—সেজন্য তাহারা যাহাই কেন রান্ধিয়া দেয়, তাহাই তাহারা নির্ব্বিবাদে মুখে পুরিয়া দেয়।

নৌতন যৈবন বস্—সোহামিক্ করিছ বশ।
[15]যেদি আন্দ সেদি বসি খায়।
যেমনি ডাইল আন্দ বৌ, তেম্নি দাদা খায়।
পাতিল ভরা আঁন্দিস ডাইল—[16]বিলাই সাঁতার দেয়।

তারপর, যেদিন হইতে ছয় বধূর স্বামী ভিন্ন দেশে বাণিজ্যের জন্য গিয়াছে, সেদিন হইতে বধূদিগের মন অন্য পুরুষের দিকে ছুটিয়াছে।

যেদিন হইতে তোমার স্বামী হইছে লঙ্কার বেপারী।
পরপুরুষক্ দেখিয়া বৌ করিস্ তেরাতেরি ॥

১। মোক্—আমাকে; ২। নাগ্য—নাগাল; ৩। হুরুকা—খিল; ৪। না ঘুচাওঁ—খুলি না; ৫। আবো—দিদিমা; ৬। নাউয়া—নাপিত; ৭। সোন্দাইছে—প্রবেশ করিয়াছে, কোন কোন লোকে "সেমাইছে"ও বলে; ৮। মাথা কেলের—মাথা কামাইবার; ৯। বার—বাহির; ১০। গেলু—গমন করিলে; ১১। নাউয়ানীক্—নাপিতের স্ত্রীকে; ১২। চেঙ্গেড়া—অল্পবয়স্ক লোক; ১৩। কাইঞ্চা বাড়ীর—বাড়ীর পিছনের; ১৪। তাক্—তাহাকে; ১৫। যেদি আন্দ—যে রকমে রন্ধন কর; ১৬। বিলাই—বিড়াল;

আগিনা ঘর [1]সাল্টিয়া বৌ, [2]পাতারে নৈয়া যাও।
পরপুরুষক দেখিয়া ঐঠে মন ভুলাও॥
আমার নাগিয়া বৌ—তোমার থাকে মন,
বেহুলার সতীন তোমার বধূ ছয়জন।

লক্ষ্মীন্দরের মুখে এরূপ রঙ্গকথা শুনিয়া বধূগণ লজ্জা পাইয়া পলায়ন করিল—আর বেহুলা সতী মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিলেন।

একথা শুনিয়া বৌ পলায় আশে পাশে।
আর মুখতে কাপড় দিয়া বেহুলা বালী হাসে॥

"চলমল সাধুর গান" নামে একটি গীতিকাব্য রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রচলিত। লক্ষ্মীমাতার পুত্র চলমল সাধুর সহিত "ছুবুলা কন্যার" বিবাহ, সাধুর বাণিজ্যে গমন, রাজ্যের কোটালের দ্বারা ছুবুলার কুপথে গমন, বাণিজ্য হইতে ফিরিবার পর স্বীয় স্বামীকে স্বহস্তে নিধন, কোটাল কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যান, পরিশেষে, মহাদেবের কৃপাবলে চলমলের প্রাণ-দান, ছুবুলার সহিত পুনর্মিলন—ইত্যাদি চলমল সাধুর গানের বিষয়বস্তু। উক্ত গানের মধ্যে রঙ্গরসের কথা তেমন নাই, তবে যেটুকু আছে তাহা কবিত্বপূর্ণ। সাধু বাণিজ্য হইতে দেশে ফিরিবার পথে, ফুল বাড়ীর ঘাটে স্বীয় পত্নী ছুবুলাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন না, ছুবুলা ও স্বীয় স্বামীকে চিনিতে পারে নাই। ছুবুলাকে ঘাটের পথে দেখিয়া চলমল সাধু রঙ্গ করিয়া গান করিতে লাগিলেন।

জল ভর সুন্দর কইনা
জলে দিয়া ঢেউ।
একেলা ঘাটে এইসাছ কইনা
সঙ্গে নাই তোর কেউ॥

ছুবুলা কন্যা ও সাধুর এ রকম বেহায়াপনার জন্য তাহাকে খোঁচা মারিতে কার্পণ্য করিল না॥

সাধু, ধন আছে কোঠা ভরা বিভা করতে পার,
[3]পরার [4]রমণীক্ দেখি কেন জ্বইলা মর।

সাধু উত্তর দিলেন যে, তাহার অনেক রত্ন আছে তাহা তিনি স্বীকার করেন; কিন্তু তাহার মত সুন্দর কন্যা মিলাইতে পারেন নাই বলিয়া বিবাহ করেন নাই।

ও নাথ কন্যা ও—
ধন আছে কোঠাভরা [5]বিভা করতে পারি।
তোমার মত [6]উপের কইনা মিলাইতে না পারি॥

কন্যা প্রত্যুত্তরে বলিল যে, তাহার মত কন্যা মিলাইতে হইলে সাধুকে গলায় কলসী বেন্দে জল-ডুব দিতে হইবে।

আমার মত উপের কইনা যদি মিলাইতে চাও,
গলায় কলসী বেন্দে জলে [7]ঝম্প দেও।

সাধু সে কথার যে উত্তর করিলেন, তাহা একটু আপত্তিকর।

কোথায় পাব কলস কইনা কোথায় পাব দড়ি।
তোমরা হইলেন জোর যবুনা আমরা ডুইবে মরি॥

এইরূপে রঙ্গরূপে কথাকাটাকাটির পর উভয়ে উভয়কে চিনিতে পারিল। তখন ছুবুলা কন্যা ছুটিয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করিল।

তখন নাই বান্দে কইনা ধুতি নাই বান্দে [8]চুলি।
দৌড় দিয়া যায়ছে যেন কুমুতি পাগলি॥

সাধারণ যাত্রা পাঁচালী গানের মধ্যে উপরি-উক্ত প্রকার রঙ্গরস অনেক আছে। শুধু রঙ্গ লইয়া ও গান চলিয়া থাকে "আলকাচের গান" নামে রঙ্গকৌতুকপূর্ণ একটি গান অনেক দিন হইতে রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রচলিত। এই গানের মধ্যে হিন্দি-ভাষাও কতকাংশে দৃষ্ট হয়। ভিন্ন দেশের লোকের ভাষার সঙ্গে পরিচিত হইবার জন্য-ই এরূপ প্রভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। "আলকেচ" শব্দের মূলগত অর্থ "রঙ্গ"। "স্ত্রী-পুরুষের" প্রেম কলহ লইয়া-ই উক্ত গানটি রচিত। বাপের বাড়ী যাইবার জন্য স্ত্রী তাহার শাশুড়ীর নিকট মিনতি জানাইতেছে। পুরুষ তাহাতে বাদ সাধিতেছে—

আমি দিব না যাইতে, শরীর শুকাবে
রাখাল পহরা দিলাম হো॥

তখন স্ত্রীলোকটি তাহার স্বামীর দরদ লইয়া ঠাট্টা করিতেছে—তাহার অবস্থা অপেক্ষা, তাহার বাপের অবস্থা স্বচ্ছল।

কিসের এত টান রে মুন্সা, কিসের এত টান।
আমার বাবার বাড়ী দেখিয়া আলি—
কেতেনা গোলা ধান॥

১। সাল্টিয়া—কুড়াইয়া; ২। পাতারে—মাঠে, ক্ষেতে; ৩। পরার—পরের, অন্যের; ৪। রমণীক্—রমণীকে; ৫। বিভা—বিবাহ; ৬। উপের—রূপের—অনেক সময় "অ" কে "র" "উ" কে "রু" বলা হইয়া থাকে; ৭। ঝম্প দেও—ঝাঁপ দেও; ৮। চুলি—চুল।

* * * *

বাবার খাটে দুইজনা চাকরা হো ॥

পুরুষটি প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছে যে, তাহার বাপের বাড়ীর অবস্থা ভাল নয়—তাহার বাপ পরের চাকুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

তোর বাপ নাই খায় ভাত।
তোর বাপ্‌টা হইয়াছে হাবাৎ ॥
আমি জানি কিনা জানি করিস না ফুটানি
তোর বাপ্‌টা পরার চাকরা হো ॥

স্ত্রীলোকটি তাহার স্বামীর বাক্যের অসত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে, সে তাহার বাপের বাড়ী যাইয়া পিঠা খাইয়া আসিয়াছে।

বাদ্‌ বলিস্‌ ঝুটারে মুন্সা বাদ বলিস ঝুটা।
আমার বাবার বাড়ী ত খাইয়া আইলি গরাগরি পিঠা ॥

পিঠাতে কেতেনা আছে মিঠা।
মিঠাতে খেতে পার নাই পিঠা ॥

পুরুষটি তখন আবার রঙ্গ করিয়া বলিতেছে যে তাহার শ্বশুর বাড়ীতে একদিন যাইয়া পিঁড়িতে বসিয়া তাহার কাপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। মুড়ী খাইতে দেওয়া হইয়াছিল—কিন্তু মুড়ীর আকর লাগিয়া তাহার দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল ॥

আমার মন টলে না শ্বশুর বাড়ী যাইতে—
শ্বশুর বাড়ী গেইলাম ভাইরে বস্‌তে দিলে পিড়া।
পিড়ার কাটা নাগি আমার কাপড় গেল চিড়া।
শ্বশুর বাড়ী গেইলাম ভাইরে খেতে দিল মুড়ি।
মুড়ির আখর লাগি আমার দন্ত গেল নড়ি ॥

এইরূপে বহুপ্রকার রঙ্গরসের কথা গানের মধ্যে উক্ত হইয়াছে। রঙ্গরসের মধ্যে অশ্লীলতা যে নাই, এমন নহে, তবে শ্লীলতা রক্ষা করিয়া রঙ্গ করিবার ক্ষমতা ও পল্লী-গায়েনদের আছে।

"বল ভাই" নামক একটি রঙ্গের গান সৌখিন লোকের কন্যা, দূতী, পথিক ও রসিক লইয়া রচিত ॥ সৌখিন কন্যা নিজের সম্বন্ধে গান করিয়া বলিতেছে।

আমি [1]সকিনের মেয়ে—
দাদা সকিন, বাবা সকিন,
দেখনা সকিন চেয়ে ॥
শিশুকালে হইয়াছি [2]আরি
পর পুরুষের মুখ হেরি।

* * * *

আমার মতন পাইলে সকিন
তার কাছে রই চিরদিন ॥

তখন পথিক তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলিতেছে, যে, সাধ করিয়া সে যেন বিষফল ভক্ষণ না করে। তাহাতে পরিণামে তাহাকে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু পথিকের সতর্কবাণী শ্রবণ না করিয়া মেয়েটি একটি রসিকজনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। পুরুষটি তাহার পত্নী বিয়োগ হইবার পর সৌখিন মেয়েটিকে নিজের আয়ত্তে আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। নানারকম প্রলোভন দ্বারা তাহাকে বশীভূত করিতে প্রয়াস পাইল।

কইনা, তুই আমার সঙ্গে চল্‌
আমার সঙ্গে চল্‌ ॥
সময় অন্তে ঘরে বসিয়ে পাবি অন্নজল।
তুমি হাকিম, আমি হুকুম,
তুমি জোর আমি জুলুম
তোর কথাতে ফিরিব সদা—
বাহির ঘরে চল ॥

ক্রমে তাহারা উভয়ে পাপ পথে পা বাড়াইল। পরিণামে তীব্র অনুশোচনায় জর্জ্জরিত হইয়া তাহাদিগকে অশান্তিতে কাল যাপন করিতে হইয়াছিল।

"বলাই গান" নামে একটি রঙ্গরসের গান কবিরাজ ও স্বামী-স্ত্রীর বিষয়বস্তু লইয়া রচিত, এ গানটি বহুদিনের প্রাচীন। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাইবে আশঙ্কায় এস্থলে আর তাহার উল্লেখ করিলাম না ॥

কেবল রঙ্গরসপূর্ণ গান ভিন্ন ছোট খাটো অনেক গানে রঙ্গ কৌতুকের কথা অনেক আছে। রঙ্গপুরের পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা বিবাহের সময় অনেক রঙ্গের গান করিয়া থাকে কোন বাড়ীতে বিবাহ আরম্ভ হইলে দুই-তিন দিন ধরিয়া সমানভাবে গান চলিতে থাকে। পাড়ার স্ত্রীলোকেরা

১। সকিন—সৌখিন; ২। আরি—রাঁড়ী—বিধবা।

বিয়ে বাড়ীতে ছেলের মা-বাপ্, মেয়ের মা বাপ্, মামা ইত্যাদিকে লইয়া ঠাট্টা করিয়া সুর তুলিয়া গান গাহিতে থাকে। আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েরা হয়ত সে স্থলে দু'এক খানি গজল কিংবা ঠুংরি ঠুকিতে পারিলেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবেন, তাহাদের সমঝদার লোকেরা তাহাতে মুগ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহাদের অনেক সময় গেঁয়ো বলিয়া ঠাট্টা করা হয়, তাহারাও তাহাদের গানের সমঝ্দার কম পায় না—তাহারাও যে সকল নির্দ্দোষ রঙ্গ কৌতুকের গান করিয়া থাকে সে সমস্ত ও উপেক্ষার নয়। বিয়ের বাড়ীতে পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা যে রকম গান এখনো করিয়া থাকে, তাহার দুই একটি এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ কন্যার মা'কে লইয়া যে রঙ্গ করা হইয়া থাকে, তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে—

ওরে কইনার মাও—
　লম্বা মাথার ক্যাশ্,
হাটিয়া গেইলে ঢলিয়া পড়িস্
　পাগল করিলি [1]কাক্ ॥
ওরে কইনার মাও—
　তোর [2]আস্তার বগলে ঘর
যত লোক পাক পাড়ে
　বিছানার যোগাড় কর ॥
যত লোক [3]পাক পাড়ে,
　খিলির যোগাড় কর ॥

একসঙ্গে কন্যার বাড়ীর সকলকে লইয়া রঙ্গ করিয়া গান করা হইয়া থাকে। তাহার কিছু কিছু এস্থলে উল্লেখ করিতে প্রয়াস পাইতেছি। কলা গাছ গাড়িয়া তাহার চারিপাশে ঘুরিয়া এই গান করা হয়।

[4]মাড়োয়ার গোরে গোরে ছিটাইনু রে খই
　কন্যার মাওটার [6]হেটা ঠোঁট কই,
　কি দিয়া খাইবে আমার [5]জলুয়া দই ॥
মাড়োয়ার গোরে গোরে ছিটাইনু রে খই
　কইনার বাপ্টার হেটা ঠোঁট কই।
　কি দিয়া খাইবে আমার জলুয়া দই ॥
মাড়োয়ার গোরে গোরে ছিটাইনু রে খই
　কইনার পিসাটার হেটা ঠোঁট কই।
　কি দিয়া খাইবে আমার জলুয়া দই ॥

অনুরূপ বরের বাড়ীর লোকজনকে উপলক্ষ করিয়াও গান করা হইয়া থাকে। এস্থলে আর উল্লেখ করিলাম না। নিম্নলিখিত গান-টি গাহিয়া সকলে বিয়ের সময় একযোগে উলুধ্বনি করিয়া থাকে।

উলু উলু [7]মাণ্ডালের ফুল।
কইনার বাড়ী কত দুর ॥
[8]হেটে [9]ডাঙ্গা মধুপুর—
তাক্ ছাড়ি অনেক দুর ॥
কইনা [10]আলু ঘামিয়া।
ছাতি ধরো টানিয়া ॥
ছাতির উপর গামছা,
তিন [11]বইনের তামসা—উলু উলু—
　(উলু ধ্বনি)

"বিয়ের গান" ছাড়া পল্লী অঞ্চলে অনেক ব্রত করিবার সময় গান করা হইয়া থাকে। "ষাইটোর পুজা" নামে একটি ব্রত রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রচলিত। বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থলে ইহা ষষ্টি পুজা নামে-ই খ্যাত। কিন্তু রঙ্গপুরের ষাইটোর পুজার একটু বিশেষত্ব আছে। কলা এবং ষোলার ফুল এই গানের প্রধান উপকরণ। ষোলার গাছ রোপণ করিয়া তাহার চারি পাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মেয়েরা কুলা হাতে করিয়া গান করিতে থাকে।

এস্থলে উক্ত "ষাইটোরের" গানের কিছু উল্লেখ করা যাইতেছে।

[12]আগা হাটের বামনা রে
পাছা হাটের বামনা।
[13]কলাতি [14]পুছেছে—ও বামনা ঠাকুর রে—
　কি করিমেন আগ্ বল হাটের কলা রে ॥
　তোর মাথা হইয়াছে পাকিয়া সন্।
　কমর হইয়াছে ধনুক বান্
　এখন কি [15]তোমাক্ সাঝে ছাওয়ালে বাপ্রে ॥

১। কাক্—কাহাকে। ২। আস্তার—রাস্তার। ৩। পাক পাড়ে—ঘুরে—চারিদিকে যাতায়াত করে। ৪। মাড়োয়া—কলার গাছ ৫। জলুয়া—জল মিশ্রিত। ৬। হেটা ঠোঁট—নিচের ঠোঁট। ৭। মাণ্ডালের—মাদারের ৮। হেটে—এদিকে ৯। ডাঙ্গা—মাঠ। ১০। আলু—আসিলে। ১১। বইন—বোন (ভগিনী), বহিন (হিন্দী)। ১২। আগা হাটের বামনা—প্রথম হাটে-ই জিনিষ কিনিয়া রাখিতে হয়। সে সব জিনিষ-ই পুজায় লাগে। ১৩। কলাতি—যে কলা বিক্রী করে। ১৪। পুছেছে—জিজ্ঞাসা করিতেছে। পৃচ্ছ ধাতু হইতে উদ্ভূত। ১৫। তোমাক—তোমাকে।

উক্ত গানটি ছেলের বাপ্‌কে উদ্দেশ করিয়া ও বিবাহের সময় গীত হইয়া থাকে ॥

রঙ্গপুর অঞ্চলে অনেক "নাথ সম্প্রদায়ের বাস আছে। ইহাদের অনেকে চুণের ব্যবসা করে, কেহ আবার গান গাহিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। যাহারা গান করে, তাহাদের সঙ্গে "দোতরা" নামে একটি অপূর্ব্ব স্বরযন্ত্র থাকে। তাহার সাহায্যে বাড়ী বাড়ী গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ান-ই অনেকের পেশা। ইহাদের মধ্যে অনেকেই নিত্য-নূতন গান রচনা করিতে ওস্তাদ। রঙ্গরসের গান ও ইহারা অনেক করিয়া থাকে। মাছের বিয়ের গান চোর-চুরণীর গান, মশার গান, ইত্যাদি বহু ছোটখাটো গান নাথেরা গাহিয়া থাকে। প্রথমতঃ চোর-চুরণী গানের কিছু এস্থলে বিবৃত করিতেছি। চোর গৃহস্থের বাড়ীতে চুরি করিতে যাইয়া কি রকমে ঠকিয়াছিল, তাহাই তাহার স্ত্রীর গোচর করিতেছে—

চুরি করিবার [১]গেনু চুরণী গে
ভাওলা গঞ্জের [২]ভিতি।
যুগী পাড়াত চুরি করনু
[৩]তামান মুছি মাটি ॥
হে গে চুরণী—
কি চুরি করিমো আর
সারা আতে [৪]চেতোন আছে
মরা কুত্তা তার ॥

"মশার গানে"র বিষয়বস্তু কোন এক স্ত্রীলোকের রূপমত্ত রসিক জনকে কেন্দ্র করিয়া। স্ত্রীলোকটি যেখানেই যাইতেছে তাহার পিছন পিছন মশার মত ভন্ ভন্ করিতে নিলাজী লোকটি যাইতেছে। অশ্লীল অংশকে বাদ দিয়া কিছু কিছু উল্লেখ করা যাইতেছে—

মশারে জ্বালায় [৫]আই মুই, গেনু বাপের বাড়ী,
তবু ত নিলাজী মোশা বেড়ায় টারিটারি ॥
মশারে জ্বালায় আই মুই গায়ে দিনু ক্যাথা।
তবু ত নিলাজী মশা কানে কয় মোর কথা ॥
আই মুই যাওছোঁ মরিয়া।
কাইম্ করিবার [৬]ফুসলাছে মোক ভৈরব দাড়িয়া ॥

কোন এক ভগিনী তাহার দাদার নিকট তাহার বিবাহ করিতে কাহাকে পছন্দ হয় তাহা বিবৃত করিতেছে। "হালুয়া", "তেলি", "বানিয়া", "পাইক" প্রভৃতি অপছন্দ করিবার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া রসিক গায়েনের ঘরে তাহার বিবাহ দিতে অনুরোধ করিতেছে।

দাদা রে দাদা—
হালুয়ার ঘরত [৭]বেচেয়া না খাইস রে দাদা
হালুয়া হাল বয়া আসিবে
নাঙ্গল জোঙ্গাল থুইবে
হুকা কোনা চাহিবে
অতে দেরী হইবে
হালুয়ার আগ্‌টা ভাসিবে
হালুয়া পেন্ঠি দেখাইবে
তাতে মন মোর আকাশে উঠিবে রে দাদা।

দাদা রে দাদা—
তেলির ঘরে বেচেয়া না খাইস রে দাদা,
তেলি বিয়ানে উঠিবে
সর্ষার ডালি চাইবে
সর্ষা ঝারির কইবে
অতে দেরী হইবে * * *
ছাইটের ডাঙ্গে পাঞ্জর ভাঙ্গিবে রে দাদা।

দাদা রে দাদা—
আসিয়ার ঘরত বেচেয়া খাইস রে দাদা,
অসিয়া গান করি আসিবে
দোতরা সারিঞ্জা থুইবে
আয়না কাকই দেখিবে
[৮]সিতা কোনা [৯]পাড়িবে
অতে মন মোর খুসী হইবে রে দাদা ॥

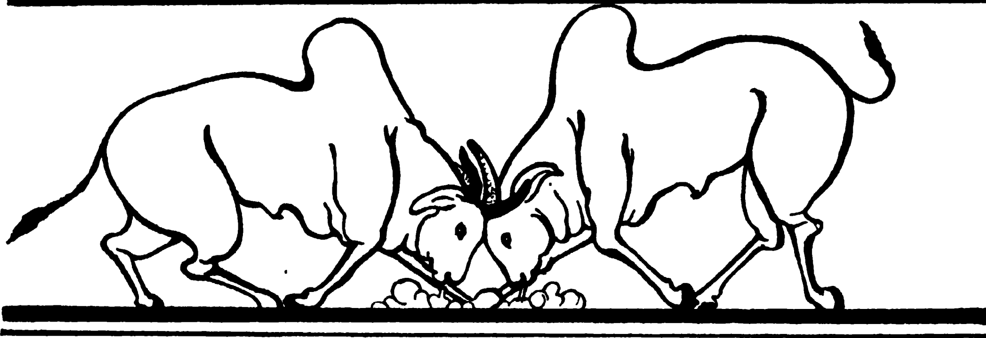
পরিশেষে, রসগোল্লা জিলাপীর রসতত্ত্বের উল্লেখ করিয়া রস-প্রবন্ধ আলোচনায় বিরতি করিব। রস পরিবেশন করিবার আমার বিশেষ কোন ক্ষমতাই নাই। তবে রস-পিপাসু সুধীবৃন্দ পল্লীগীতিকার মধুভাণ্ডের রস আস্বাদন

১। গেনু—গমন করিলাম। ২। ভিতি—দিকে। ৩। তামান—সকল। ৪। চৈতন্য। ৫। আই—এয়োতি। ৬। ফুসলাছে—প্রলুব্ধ করিতেছে। ৭। তাহাতে বেচেয়া—বিক্রী করিয়া। ৮। সীতা কোনা—সীথি-টা। ৯। পাড়িবে—বানাইবে। টারি—পাড়া। আগটা—রাগ। ভাসিবে—চড়িবে।

করিতে সচেষ্ট হইলে বোধ করি নিরাশ হইবেন না, একথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। রস আস্বাদন করিতে গেলে হয়ত দুই একটা মৌমাছির কামড় সহ্য করিতে হইতে পারে কিন্তু "সাতসমুদ্র তের নদী" পার হইয়া বিদেশীয় মধুভাণ্ডে হাত দিতে গেলে কামড় খাইয়াই ফিরিয়া আসিতে হইবে। আমাদের দেশের মৌমাছিরা বোধকরি অতটা নির্দ্দয় হইবে না। এবিষয়ে আর বিশেষ কিছু উল্লেখ না করিয়া রসগোল্লা জেলাপী ইত্যাদির রসতত্ত্ব উদ্ধৃত করিয়া এস্থলে ইতি করিব ভাবিতেছি।

বাবু, নালমোন্ কি অস্‌মাধুরী
নাল্ ডুবা ডুব ডুব ॥
ও জেলাপীর কেরপি পাক্,
অসগোল্লার গোল গোল রস
বাবু নাল ডুবাডুব ॥

পল্লীগীতিকার মধ্যে নির্দ্দোষ আনন্দ লাভ করিবার উপকরণ অনেক আছে। শিক্ষিত জনসাধারণ চাকচিক্যের মোহে অন্ধ না হইয়া যদি পল্লীগীতিকার লুপ্ত সম্পদ্ পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন, তাহা হইলে ভাষা-জননীর সম্পদ্ বর্দ্ধিত হইবে, সন্দেহ নাই। তবে, বঙ্গভারতীর ভাণ্ডারে যাহাতে আবর্জ্জনা স্থান না পায়, সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আশা করি দেশ-প্রীতিকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষিত সুধীবৃন্দ এদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিবেন ॥



প্রেতের মমতা

শ্রী বিনোদবিহারী বন্দোপাধ্যায়

সত্যঘটনা। আমার এক চিকিৎসকবন্ধুর জীবনের অভিজ্ঞতা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

১৯৩৭ সালের মার্চ্চ মাস, কলিকাতায় তখন বেশ গরম পড়িয়াছে। আমি নূতন ডাক্তার, এম্, বি, পাস করিয়া মেডিক্যাল কলেজে কিছুদিন হইল হাউস ফিজিসিয়ান নিযুক্ত হইয়াছি। একটি ৫।৬ বৎসরের ছেলে ডিপ্‌থিরিয়া রোগগ্রস্ত হইয়া হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছে। শুনিলাম ছেলেটির বাপ অবস্থাপন্ন লোক, কলেজের নিকটেই তাঁহাদের বাড়ি। রোগীর মাতার আপত্তিসত্ত্বেও সুচিকিৎসার জন্য পৃথক্ কেবিন ভাড়া করিয়া হাঁসপাতালেই তাহাকে রাখা হইয়াছে। একজন অভিজ্ঞ নার্স দিবারাত্র বালকের সেবায় নিযুক্ত। আত্মীয়স্বজন অনেকেই আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যাইতেছেন, বিশেষতঃ ছেলেটির মা অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া সময়ে অসময়ে আসিতেছেন। প্রথম প্রথম ২।১ দিন হাঁসপাতালের নিয়মভঙ্গ হইলেও সকলে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছে। অবশেষে একদিন নার্স দ্বারা তাহাকে অসময়ে আসিতে বারণ করা হইল, কিন্তু তরুণী মাতার উৎকণ্ঠিত নীরব মুখের কাছে কঠোর নিয়ম শিথিল হইয়া গেল। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রোগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম সে তাহার মাতার একমাত্র সন্তান। ভাবিলাম, নিয়মভঙ্গ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। Tracheotomy অর্থাৎ গলায় অস্ত্রোপচারকৃত ছিদ্রের সাহায্যে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া চলিতেছে। ছেলেটি যেমন উজ্জ্বলকান্তি, বয়সের তুলনায় তেমনই বলিষ্ঠদেহ। বাঙ্গালীর বাড়িতে এরূপ স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের সমন্বয় সচরাচর দেখা যায় না। সে যেদিন প্রথম হাঁসপাতালে আসে সেদিনের কথা আমার বেশ মনে পড়ে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভীতিবিহ্বল দৃষ্টি, অপরিচিত লোকমণ্ডলীর মধ্যে নিতান্ত অসহায়ের মত পড়িয়া আছে, বেশী কথা বলেনা, নিতান্ত প্রয়োজনের কথাও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয়। সময় সময় তাহার মাকে খোঁজে, বাবার নাম একবারও করেনা। বাহিরের জগতে মা অপেক্ষা বাবাকেই বেশী প্রয়োজন ইহা বুঝিবার মত বয়স বোধ হয় তখনও হয় নাই। প্রায় সমবয়স্ক একটা ছেলে রোগীকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে আসে, মৃদু শুষ্ক হাসির দ্বারাই দুই বন্ধুর মধ্যে পরিচয় হয়, কথার বাহুল্য থাকে না। বয়সের তুলনায় অসুস্থ বালকটি অস্বাভাবিক গম্ভীর ;

আমার এক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বন্ধু বলেন যে শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যে আদর্শ মহাপুরুষের কথা বলিয়াছেন তাহা বর্ত্তমানযুগে একমাত্র বহুদর্শী চিকিৎসককে দেখিলেই উপলব্ধি করা যায়। অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সুখ-দুঃখের গণ্ডী ক্রমশঃ ছোট হইয়া আসে, চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত নিজের বাড়িটির বাহিরে মন দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা এবং সুখে বিগতস্পৃহ হয়, ইতরভদ্রনির্ব্বিশেষে সকলের নিকট অর্থশোষণ করিতে করিতে শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমভাব আসিয়া পড়ে, সাধারণের নিন্দা ও স্তুতির প্রতি মন ধীরে ধীরে উদাসীন হইয়া যায়। ইহাই নাকি গীতার " স মে প্রিয়ঃ " অবস্থা। কিন্তু আমি তখন নূতন ডাক্তার। রোগীর আধি-ভৌতিক ও আধি-দৈবিক যন্ত্রণা ক্রমশঃ উপেক্ষা করিতে করিতে, মৃত্যুকে বহুরূপে চক্ষের সম্মুখে দেখিয়া, দীর্ঘকাল ব্যাধি-কবলিত রোগীকে প্রিয় জীবনের প্রতি আসক্তিবিহীন হইতে দেখিয়া, ব্যাধি ও

মৃত্যুর সংঘর্ষে ক্ষণভঙ্গুর সংসারকে মুহূর্ত্তের মধ্যে শ্মশানে পরিণত হইতে দেখিতে দেখিতে এখন এক প্রাণহীন নির্লিপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু যখন নূতন চিকিৎসক হইয়া হাঁসপাতালের কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াছিলাম তখন মনে হইত সকল ব্যাধিই কঠিন, সকল রোগীই আমার আত্মীয়। ব্যাধির প্রভাবে রোগীর জীবন ও মৃত্যুর সীমারেখা যখন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিত, তখন তাহার আত্মীয় স্বজনের ন্যায় নিজেও উৎকণ্ঠিত হইতাম। বাড়িতে গিয়া ক্ষণে ক্ষণে সকল কার্য্যের মধ্যে সেই কথাই মনে পড়িত। কোনও রোগী মরিয়া গেলে আত্মীয়বিয়োগের দুঃখ পাইতাম, কেহ আরোগ্যলাভ করিলে আনন্দের সীমা থাকিত না। মনের নিভৃত কোণে চিকিৎসকের প্রচ্ছন্ন গর্ব্ব ছিল, রোগীর মৃত্যুতে সেই গর্ব্বে আঘাত লাগিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিতাম।

প্রিয়দর্শন বালকটি হাঁসপাতালে আসিবার ২।১ দিন পর হইতেই তাহার দিকে একটা আকর্ষণ অনুভব করিলাম। নীরব শিশু রোগের যন্ত্রণা প্রকাশ করিত না, কিন্তু তাহার চক্ষের ভাষা আমি বুঝিতে পারিতাম। বড় বড় চক্ষু দুইটি লইয়া যখন প্রথম প্রথম সে সন্দিগ্ধভাবে আমার দিকে তাকাইয়া থাকিত, তখন তাহার অপলক জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সম্মুখে আমি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতাম। ক্রমে ক্রমে সে আমাকে বিশ্বাস করিতে লাগিল, সন্দিগ্ধদৃষ্টি আর দেখা যাইত না, আমাকে একলা পাইলে কথা কহিত, আমি কাছে বসিলে হাতখানির অপেক্ষাকৃত মোটা মোটা আঙ্গুলগুলি আমার গায়ের উপর অনায়াসে রাখিয়া দিত। কোনও প্রয়োজনের সৃষ্টি করিয়া আমি নার্সকে কক্ষান্তরে পাঠাইতাম এবং হাঁসপাতালের অন্যান্য রোগীর কথা ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হইয়া একাকী সেই আতুর শিশুর নির্জ্জনসঙ্গ উপভোগ করিতাম। নীরব বালককে তাহার মার কথা জিজ্ঞাসা করিলেই সে হঠাৎ মুখর হইয়া উঠিত। ছেলেটি ক্রমশঃ আরোগ্য হইয়া উঠিতে লাগিল।

সেদিন ১৩ই মার্চ্চ। গভীর রাত্রি। হাঁসপাতালের ঘড়িতে সেইমাত্র একটা বাজিয়াছে। একটি ছোট টেবিলের কাছে জাগিয়া বসিয়া আছি। দূরে একজন নার্স খানিকক্ষণ কি কাগজ পত্র নাড়ানাড়ি করিয়া এখন দুই গালে হাত দিয়া কি ভাবিতেছে। আমি একজন সঙ্কটাপন্ন রোগীর জ্বরের তালিকা দেখিতেছি, হঠাৎ এক একবার অন্যমনস্ক হইয়া বাড়ির কথা ভাবিতেছি, আবার পরমুহূর্ত্তেই দূর কক্ষপ্রান্তে কোনও রোগীর অস্পষ্ট যন্ত্রণাসূচক শব্দে সচেতন হইয়া উঠিতেছি। আমার বসিবার স্থান হইতে বালক রোগীর কক্ষ প্রায় সমস্তটাই দেখা যাইতেছে। মশারির ভিতরে সে নিদ্রিত, বাহিরে তাহার পিতার নিযুক্ত নার্সটি আমার দিকে পিছু ফিরিয়া টুলের উপর বসিয়া আছে। রাত্রির অস্পষ্ট ছায়ায় শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা দুইটি নার্সকেই যেন একই আকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে। এক একবার তাহাদের কথা ভাবিতেছি—টাকা দিয়া ইহাদের নিকট হইতে স্নেহময়ী জননীর শুশ্রূষা ক্রয় করা হইয়াছে; তখনও হাঁসপাতালের কঠোর বাস্তবতা ছাত্রজীবনের মনের স্বপ্ন সম্পূর্ণ দূর করিতে পারে নাই। তরুণী নার্স দুইটিকে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইনগুলি ভাঙ্গাভাঙ্গা মনে পড়িতে লাগিল—

এ কিশোরী মেয়ে
পল্লীকোণে যে ঘরের তরে
করিয়াছে প্রস্ফুটিত দেহে ও অন্তরে
নারীর সহজ শক্তি আত্মনিবেদনপরা

শুশ্রূষার স্নিগ্ধসুধাভরা,
আমি তারে লাগিয়েছি কেনা কাজে করিতে মজুরী,
মূল্যে যার অসম্মান সেই শক্তি করি চুরি
পয়সার দিয়ে সিঁধকাঠি।

আবার পরক্ষণেই চিন্তাধারা কোনও রোগীর চাপা আর্ত্তনাদে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে।

গভীর রাত্রি। দিনের হাঁসপাতাল অনেকে দেখিয়াছেন, কিন্তু দিনের ও গভীর রাত্রির হাঁসপাতালের মধ্যে অনেক পার্থক্য, যেন দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্থান। একটিমাত্র রোগীর নিকট বসিয়া অনেকে হয়ত রাত্রি কাটাইয়াছেন, কিন্তু রোগীসমুদ্র-পরিবেষ্টিত দ্বীপের ন্যায় আপনাকে না দেখিলে হাঁসপাতালে রাত্রি-জাগরণের অর্থ সম্পূর্ণ অনুভব করা যায় না। আলোর মধ্যে সাহস আছে, নিবিড় কালো অন্ধকারের মধ্যে স্নিগ্ধতা আছে। কিন্তু আলোও নয়, অন্ধকারও নয় এমন একটা অস্পষ্টতার বিভীষিকা যিনি না দেখিয়াছেন তিনি অপরের কথায় তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। মৃদু ইলেকট্রিক আলোর ম্লান জ্যোতিতে নানাবিধ ছায়া দেয়ালের উপর পড়িয়াছে, কোন কোনটি ঈষৎ কম্পিত হইতেছে। বিস্তৃত প্রকোষ্ঠের দূরপ্রান্ত হইতে একটি রোগীর চাপা শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠধ্বনি শুনা যাইতেছে। আজ সকালে এক বৃদ্ধের পেটের ভিতর অস্ত্রোপচার হইয়াছে। রোগী সমস্ত দিন কলেপড়া মূর্চ্ছিত ইঁদুরের মত কঠিন ও নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছিল। এখন হঠাৎ তাহার দিকে তাকাইয়া দেখি সে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শুইয়া আছে, ঘোলাটে অর্থহীন দৃষ্টিতে প্রাণ আছে কিনা সহজে স্থির করা যায় না, অনেকক্ষণ লক্ষ্য করিলে গভীর নিশ্বাসের সহিত বক্ষসংলগ্ন বস্ত্রের মৃদুকম্পন বুঝিতে পারা যায়। একজন নবীন লেখক মোটরবাসের দুর্ঘটনায় মাথায় আঘাত লাগিয়া বিকালে হাঁসপাতালে আসিয়াছিল, এখনও পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অচৈতন্য! আজ মনে পড়িতেছে প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধির উৎকর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত একটি প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম। তাঁহার দিকে তাকাইয়া ভাবিতেছি হয়ত আজ মরিয়া তিনি নিজের লেখাকেই নিজে অপ্রমাণ করিয়া যাইবেন। তাঁহার সমস্ত মস্তিষ্কের গৌরব একখণ্ড জড়পদার্থের সংঘর্ষে চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইতে চলিল। চন্দ্রশেখর শ্মশানকে সাম্যসংস্থাপক বলিয়াছেন, তিনি বোধ হয় হাঁসপাতালের ভিতরে কখনও প্রবেশ করেন নাই। এখানে শ্মশান অপেক্ষাও অধিকতর সাম্য সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেছে। একই প্রকোষ্ঠ, সকলের যেন একই শয্যা, একই বস্ত্রাবলী। শরীরের সৌন্দর্য্য কখনও কাহারও ছিল কিনা জানিনা, কিন্তু আজ নাই, গৌরবর্ণ ও শ্যামবর্ণ উভয়ই অস্পষ্ট আলোয় প্রতিফলিত হইয়া রোগমসীমাখা কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইয়াছে। সমস্ত চক্ষুই কোটরপ্রবিষ্ট, সকল মুখই কঠিন ও শুষ্ক, সব দৃষ্টিতেই সংশয় ও ভীতি, সকলেরই বুদ্ধিবৃত্তি জড়তাপূর্ণ, সব কণ্ঠেই নীরবতা, অথবা নীরবতা অপেক্ষাও ভীষণ অস্পষ্ট আর্ত্তনাদ। নার্সটি তন্দ্রানিমীলিত চক্ষে নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে, রোগীদের মধ্যে যেন সেও আর একটি রোগী। ব্যাধির দুষ্টগন্ধে কলুষিত, অর্দ্ধমৃত প্রকোষ্ঠের মধ্যে আপনার সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ হইতেছে। আমার চক্ষে ঘুম নাই, চঞ্চলমন সুখদুঃখ, জীবনমৃত্যু নানাবিধ চিন্তার ভিতর দিয়া হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

হঠাৎ কি কারণে জানিনা সচকিত হইয়া ডিপ্‌থিরিয়া রোগগ্রস্ত বালকটির কেবিনের ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম নার্সটি দরজার পাশে টুলে বসিয়া আছে, কিন্তু চিবুকটা প্রায় বক্ষসংলগ্ন। ঘুমাইতেছে

বলিয়া মনে হইল। দৃষ্টি আপনাআপনিই আরও দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেই দেখিলাম যে বালকটির মশারি পরিবেষ্টিত শয্যার নিকটে একজন স্ত্রীলোক। মনোযোগসহকারে লক্ষ্য করিতেই বুঝিতে পারিলাম সেই নারীমূর্ত্তি মশারির একপ্রান্ত উঠাইয়া নিজ শরীরের প্রায় অর্দ্ধেকটা ভিতরে প্রবিষ্ট করাইয়া কিঞ্চিৎ নতভাবে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এতরাত্রে নিদ্রিত রোগীকে তাহার কোনও আত্মীয়স্বজন দেখিতে আসিয়াছে সন্দেহ হইল এবং এই স্নেহের উপদ্রবে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িলাম। আমার সম্মুখ দিয়া এই নারী নিশ্চয়ই কেবিনের ভিতর গিয়াছে অথচ আমি তাহাকে যাইবার সময় লক্ষ্য করি নাই, এতই অন্যমনস্ক ছিলাম, ইহা ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম। অৰ্দ্ধনিদ্রিতা নার্স কে ডাকিতে ডাকিতে কেবিনের দিকে অগ্রসর হইতেছি এমন সময় নার্স ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তৎক্ষণাৎ মশারির ভিতর হইতে সেই নারীমূর্ত্তি বিদ্যুদ্বেগে বাহিরে আসিয়া আমার সম্মুখ দিয়া দ্রুতপদবিক্ষেপে নীচে নামিবার সিঁড়ির দিকে চলিয়া গেল। আমি দেখিলাম মহিলাটি বালকের মাতা, চক্ষে দূরবিক্ষিপ্ত করুণদৃষ্টি, মুখ বিষাদক্লিষ্ট ও অস্বাভাবিক পাংশুবর্ণ। মুহূর্ত্তের মধ্যেই এই সমস্ত হইয়া গেল।

আমি নার্স কে তিরস্কার করিলাম এবং কর্ত্তব্যক্রটির জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করিব বলিয়া তাহাকে ভয় দেখাইলাম। সে দোষস্খালনের জন্য বারংবার বলিতে লাগিল যে, সে নিদ্রিত হয় নাই, সম্পূর্ণ জাগ্রৎ ছিল, কিন্তু বালকের মাতা দেখিতে আসায় সহানুভূতিপ্রযুক্ত সে কোনও বাধা দেয় নাই। বস্তুতঃ আমার বিরক্তির সীমা ছিল না। আমি সেখান হইতে তৎক্ষণাৎ দারোয়ানের নিকট যাইয়া এত গভীর রাত্রে রোগীর মাতাকে উপরে যাইতে দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে ক্রুটি অস্বীকার করিল—কেহই তাহার সম্মুখ দিয়া উপরে যায় নাই, অথবা নামিয়া আসে নাই। আমি মনে মনে ভাবিলাম এই ঘটনা হাঁসপাতালের শিথিল নিয়মাবলীর একটি নিদর্শন মাত্র। কিছু পয়সা দিয়া দারোয়ানকে বশীভূত করিয়া উৎকন্ঠিতা মাতা পুত্রকে দেখিবার জন্য উপরে গিয়াছিল, স্বভাবতঃই দারোয়ান ভীত হইয়া এখন ঘটনাটিকে অস্বীকার করিতেছে।

উপরে আসিয়া চেয়ারে বসিলাম, মনের উত্তেজনা তখনও চলিতেছে। ভাবিলাম এরূপ নিয়মভঙ্গ এবং কর্ত্তব্যক্রটি দেখিয়া কখনই চুপ করিয়া থাকা উচিত নয়। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট অভিযোগ করিবার জন্য আপিসে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি দারোয়ানকে ডাকাইলেন, এবং সে কোনও কৈফিয়ৎ দিবার পূর্ব্বেই তাহাকে যথেষ্ট ভৎ সনা করিলেন এবং পুনরায় এরূপ ঘটনা হইলে তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করা হইবে বলিয়া সাবধান করিয়া দিলেন। ভীত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে সে বারংবার নিজকর্ত্তব্যক্রটি অস্বীকার করিল। আমি তাহার নির্ল্লজ্জ মিথ্যাকথায় ও ব্যবহারে ঘোরতর অসন্তুষ্ট হইয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলিলাম যে বালকের মাতাকে শুধু যে আমিই বাহিরে যাইতে দেখিয়াছি তাহা নয়, বিশেষ নিযুক্ত নার্স টিও তাঁহাকে দেখিয়াছে। এই কথায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিলেন এবং ইংরাজিভাষায় আমার ভুল হইয়াছে বলিয়া দারোয়ানকে সেই স্থান ত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। আমি পুনরায় কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন যে তাঁহার মনে হইতেছে আমার ভ্রম হইয়াছে এবং নির্দ্দোষ দারোয়ানকে হয়ত অকারণে আমরা এত লাঞ্ছিত করিয়াছি। আমি তীব্রভাবে তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিবামাত্রই তিনি হাসিয়া বলিলেন যে ঘুমের ঘোরে আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি, কারণ বালকটির মাতা বহুক্ষণ পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সশরীরে হাঁসপাতালে প্রবেশ করা এখন অসম্ভব। সেই

রাত্রিতেই প্রায় ১১টায় নিজ বাড়ির ছাত হইতে নামিবার সময় হঠাৎ পদস্খলিত হইয়া মহিলাটি একেবারে নীচেয় পড়িয়া যান এবং মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগিয়া সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় হাঁসপাতালে আনীত হন। রাত্রি প্রায় ১২টার সময় তাঁহার মৃত্যু হওয়ার পর মৃতদেহ মর্গে (শবদেহ রাখিবার কক্ষে) লইয়া যাওয়া হইয়াছে। আমি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলাম যে ভুল তাঁহারই হইয়াছে, অন্য কোনও নারীকে তিনি বালকের মাতা বলিয়া ভ্রম করিতেছেন। বালকের মাতার মুখ আমার সম্পূর্ণ পরিচিত এবং কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেই আমি বারেণ্ডার অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল আলোকে তাঁহাকে আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়াছি। নার্স ও তাঁহাকে দেখিয়াছে। আমাদের উভয়ের একসঙ্গে ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমার কথায় একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসিলেন এবং আমার হাত ধরিয়া মর্গের দিকে অগ্রসর হইলেন। আমি আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে করিতে মর্গে উপস্থিত হইলাম অনতিদূরে লম্বমান এক মৃতদেহ শয়ান রহিয়াছে, তীব্র ইলেকট্রিক আলোকের জ্যোতিতে দূর হইতেই তাহার গোলাপি রং-এর জামা এবং নীলবর্ণ সাড়ি দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিলাম। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে পশ্চাতে ফেলিয়া চঞ্চলগতিতে মৃতা নারীকে পরিবেষ্টন করিয়া তাহার মুখের সম্মুখে দাঁড়াইলাম। শবের বিস্ফারিত চক্ষে সেই করুণদৃষ্টি, সেই বিষাদক্লিষ্ট ও অস্বাভাবিক পাংশুবর্ণ মুখ। এই মুখ অনেকবার দেখিয়াছি, আধঘণ্টা পূর্ব্বেও এই গোলাপি জামা ও নীলবর্ণসাড়িপরিবেষ্টিত দেহ আমার সম্মুখ দিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গিয়াছে, অথচ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিতেছেন অন্ততঃ দেড়ঘণ্টা পূর্ব্বে ইহার মৃতদেহ এই কক্ষে আনিয়া রাখা হইয়াছে। আমার সমস্ত শরীর যেন অবশ হইয়া আসিল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া প্রায় টানিতে টানিতে আমাকে মর্গের বাহিরে লইয়া আসিলেন।

কাহারও মুখে কথা নাই, নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে উভয়েই হাঁসপাতালের উপরে আসিয়া উঠিলাম। আমার চেয়ারের নিকট মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইয়া আমরা বালক রোগীকে দেখিবার জন্য তাহার কেবিনের দিকে অগ্রসর হইলাম। আমি উগ্রকণ্ঠে নার্সকে তিরস্কার করিয়াছিলাম, হয়ত বালকের নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়াছে। বিস্ময় ও অনুতাপ যুগপৎ তখন আমার মনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। দুই ডাক্তারে মিলিয়া একসঙ্গে কেবিনের ভিতর প্রবেশ করিলাম। কৌতূহলাবিষ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নার্সকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ভীত নার্স নিজের দোষস্খালন করিতেই ব্যস্ত—বালকের মাতা অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই হঠাৎ কেবিনের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, ইহাই সে বারংবার বলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ছেলেটিকে দেখিবার জন্য আমি মশারির একপ্রান্ত ধীরে ধীরে উত্তোলন করিয়াই বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তৎক্ষণাৎ আমার পার্শ্বে আসিয়া মশারির ভিতর জিজ্ঞাসুদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। স্তব্ধ হইয়া উভয়েই দেখিলাম বহুক্ষণ পূর্ব্বেই রোগীর মৃত্যু হইয়াছে।

অনেক চিন্তা করিয়াছি কিন্তু ঘটনাটি এখনও ঠিক্ বুঝিতে পারি নাই। বালকটির আকস্মিক মৃত্যুর পর কি তাহার মাতার প্রেতাত্মা মায়ার আকর্ষণে পুত্রকে দেখিতে আসিয়াছিল? কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় রোগীকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, মৃত্যুর কোনও আশঙ্কাচিহ্নই তখন তাহার শরীরে ছিলনা। তাহা হইলে কি আসন্ন বিচ্ছেদবিধুরা অশরীরী মাতা চিরবিদায় লইবার সময় বলপূর্ব্বক নিজপুত্রকে ইহলোক হইতে লইয়া গেল?

প্রতীক্ষা

শ্রী সুনীলরঞ্জন ঘোষ

তোমার লাগিয়া যে মালা গেঁথেছি
সারাটি দিবস ধরি,'
যে সুর সেধেছি আমার এ বীণা-তারে,
আজি সন্ধ্যায় সে ফুল ছিঁড়েছি
একটি একটি করি,'
খুলিয়া ফেলেছি সেতার অন্ধকারে।

এখন আমার চোখে নাহি আর
কালো কাজলের মায়া,
ছিঁড়িয়া ফেলেছি রক্ত-মেখলা মোর,
খুলিয়া রেখেছি কনক-কাঁচলি,
বসন সে-ধূপছায়া,
মুকুতা, কেয়ূর, কাঁকণ, নূপুর-ডোর।

ওষ্ঠে আমার এখনো যে তার
চিহ্ন রয়েছে জানি,
চুম্বনজ্বালা যুগল বক্ষে জ্বলে
ক্লান্ত শ্রবণে আজো বাজে তার
সুধাকণ্ঠের বাণী,
সে-মিলন-ছায়া পড়ে নয়নের জলে।

আমার বাসরে দীপ নিভে যায়
নিশার সমীর-শ্বাসে,
চম্পা-বরণ শয়নে শুকায় হেনা।
অগুরু, গুলাল গন্ধ মিলায়
দগ্ধ ধূপের বাসে,
কুঞ্জে আমার সে কি আর ফিরিবে না?

বিক্রমপুরের বর্ম্মবংশ

শ্রী বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী

পালরাজত্বকাল বাংলার সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ, গৌড়েশ্বরের সাম্রাজ্য এ সময় আবিন্ধ্যহিমাচল বিস্তৃতিলাভ করে। তাঁহার অঙ্গুলি-হেলনে আর্য্যাবর্ত্তের নরপতিগণ নত মস্তকে কান্যকুব্জের মহোদয়শ্রীমণ্ডিত সিংহাসনে অভিষেকবারি সিঞ্চন করিতেন। তাঁহার বিজয়ী অশ্ব স্বচ্ছন্দে কম্বোজ দেশে পরিভ্রমণ করিত। কিন্তু অনুত্তর বঙ্গপ্রদেশ চিরদিনই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে, এই নদী-মেখলা বনময় ভূখণ্ড কোনওদিনই দীর্ঘকাল গৌড়পতির অধীনতা স্বীকার করে নাই। পদ্মার বিশাল প্রবাহের তীরবর্ত্তী বিক্রমপুর ভাগ্যান্বেষী বীরগণের আশ্রয়স্থল। গৌড়েশ্বরের দৃষ্টির অন্তরালে শক্তিবৃদ্ধি করিয়া তাঁহারা অনায়াসে ভাগীরথীতীর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিতেন। পাল রাজগণ গঙ্গা অতিক্রম করিয়া দুই একবার তাঁহাদের রাজ্য আক্রমণ করিতেন বটে কিন্তু পদ্মার তরঙ্গসঙ্কুল বিপুল বিস্তার উপেক্ষা করিয়া নৌবলরক্ষিত বিক্রমপুর বিপর্য্যস্ত করিবার দুরাশা কাহারও হয় নাই।

একাদশ শতাব্দীতে নয়পাল ও বিগ্রহপাল দেবের রাজ্যকালে বার বার বহিঃশত্রুর আক্রমণে গৌড়সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে। সেই সুযোগে সুদূর দাক্ষিণাত্য হইতে বর্ম্মগণ আসিয়া বিক্রমপুর অধিকার করেন। পরবর্ত্তীকালে দিব্য বিদ্রোহের সুযোগে তাঁহাদের শক্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিজয়সেন বোধ হয় ইহাদিগকে বিতাড়িত করেন। সুতরাং দেখা যায় যে প্রায় একশত বৎসর বর্ম্মরাজগণ বিক্রমপুর সমবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে অনুত্তর বঙ্গপ্রদেশ শাসন করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের সম্পূর্ণ ইতিহাস আজও জানা যায় নাই। বাংলার ইতিহাসের অনেক কাহিনীই এইরূপ অজ্ঞাত রহিয়াছে। এই বর্ম্মবংশের ইতিহাস উদ্ধারের কাহিনীও কম বৈচিত্র্যময় নহে। আজ তাহারই অবতারণা করিতেছি।

প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় পুরাতত্ত্বের প্রথম পথপ্রদর্শক প্রিন্সেপ সাহেব উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর মন্দির গাত্রে প্রোথিত একখানি প্রস্তরলিপির পাঠোদ্ধার করেন ইহা ভট্টভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তি নামে বিখ্যাত। তাহাতে একটি লাইন ছিল—"যন্মন্ত্রশক্তি সচিবঃ সুচিরং চকার রাজ্যং স ধর্ম্মবিজয়ী হরিবর্ম্মদেবঃ"। কিন্তু কে এই হরিবর্ম্মা এবং কোথায় বা তাঁহার রাজ্য ছিল—কিছুই জানা গেল না তাহার পঞ্চাশ বৎসর পর ডাঃ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র মহাশয় ১৯১২ সনে "ঢাকা রিভিয়ু" পত্রিকায় একখানি তাম্রশাসনের প্রতিলিপি ও পাঠ প্রকাশিত করেন। ইহা ভোজবর্ম্মদেবের বেলাবশাসন নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে এক বর্ম্মবংশের পরিচয় পাওয়া গেল। তাঁহাদের রাজধানী ছিল বিক্রমপুর, কিন্তু ভুবনেশ্বর প্রশস্তির হরিবর্ম্মা এই বংশের ছিল কিনা জানা গেল না, বেলাব লিপিতে একটি শ্লোক আছে "বীরশ্রীশ্চ হরিশ্চ যত্র বহুশঃ প্রত্যক্ষমেবৈক্ষতঃ।" কিন্তু অনেকেই স্থির করিলেন যে ইহাতে হরিবর্ম্মদেবের ন্যায় বিশাল রাজ্যাধিকারী নরপতির উল্লেখ করা হইতেছে না, ইহা বর্ম্মগণের সৌভাগ্য-বিজ্ঞাপক সাধারণ উক্তি মাত্র। এমন সময় বাংলা ১৩১১ সনে পরলোকগত প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কৃত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" দ্বিতীয় ভাগে হরিবর্ম্মদেবের একখানি তাম্রশাসনের ক্ষুদ্র অস্পষ্ট ছবি ও গদ্যাংশের পাঠ প্রকাশিত হয়। বসুমহাশয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে ইহা বেজনীসার লিপি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে এবং তাঁহারই পাঠ অনুযায়ী হরিবর্ম্মার পিতার নাম "জ্যোতির্বর্ম্মা" স্থির হয়। আবার কেশব ও বিশ্বরূপ সেনের শাসনের অনুকরণে ইহারই এক কল্পিত পাঠ বৈদিক কুল পঞ্জিকায় সামল বর্ম্মার শাসন বলিয়া প্রচারিত হয়। এই সামলবর্ম্মা ১০০১ শকে বঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন বলিয়া প্রবল প্রসিদ্ধি আছে। ইতিমধ্যে হরিবর্ম্মদেবের রাজ্যকালে লিখিত দুইখানি পুঁথির সন্ধান মিলিল। তাহাদের একখানি তাঁহার ৩৯শ রাজ্যাঙ্কে লিখিত। বসু মহাশয় স্থির করিয়াছিলেন জ্যোতি এবং হরি বেলাব লিপিতে উল্লিখিত বজ্রবর্ম্মার

পূর্ব্ববর্ত্তী আবার ডাঃ বসাক ও ভট্টশালীপ্রমুখ ঐতিহাসিকগণ মত প্রকাশ করেন যে তাঁহারা ভোজবর্ম্মার ও পরবর্ত্তী। গৃহদাহে অগ্নিতাপে হরিবর্ম্মদেবের শাসনখানি নিতান্ত অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। কিছুদিন পর বিদ্বজ্জনসমাজ তাহার আর সংবাদও রাখিল না। হরিবর্ম্মার সমস্তার সমাধান আর সম্ভব হইল না। ইহার প্রায় ২৮ বৎসর পর অপ্রত্যাশিতরূপে শামলবর্ম্মার একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গেল।

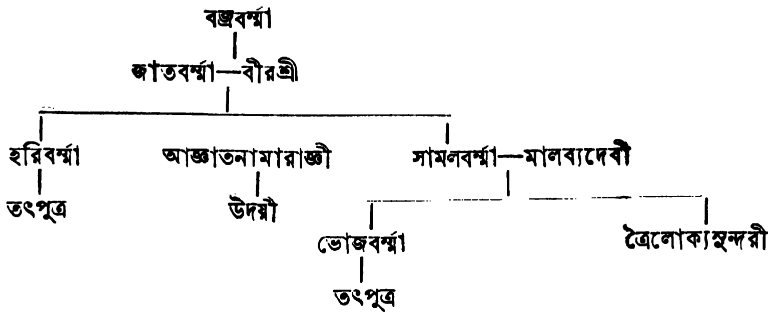
বিক্রমপুরস্থ বজ্রযোগিনী গ্রামনিবাসী জনৈক ভদ্রলোক লিপিচিহ্নিত কয়েকখানি তাম্রখণ্ড ঢাকা প্রত্নশালায় ডাঃ ভট্টশালী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত করেন। শাসনখানির অনেকাংশ লুপ্ত হইলেও দেখা গেল যে, ইহা দ্বারা পরম বৈষ্ণব রাজা সামলবর্ম্মদেব বৌদ্ধদেবী 'প্রজ্ঞাপারমিতা'র উদ্দেশে ভূমি দান করিয়াছিলেন। তাহার পঞ্চম ছত্রে স্পষ্ট লিখিত আছে "হরিবর্ম্ম দেবঃ"। প্রথম শ্লোকে জাতবর্ম্মারও উল্লেখ আছে বলিয়া স্থির হয়। ডাঃ ভট্টশালী মহাশয় "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় ইহার প্রতিলিপি ও পাঠপ্রকাশকালে মত প্রকাশ করেন যে হরিবর্ম্মা সামল বর্ম্মার কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনের চতুর্থ-শ্লোকে তাঁহার পুত্রেরও নামোল্লেখ ছিল বলিয়া মনে হয় কিন্তু অক্ষর কয়টি লুপ্ত হওয়ায় তাহা জানা যায় না, ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তিতেও তাঁহার পুত্রের উল্লেখ আছে "তন্নন্দনে বলতি যস্য চ দণ্ডনীতিবর্ত্মানুগা বহল কল্পলতেব লক্ষ্মীঃ"—এই অজ্ঞাতনামা পুত্রের পরই বোধ হয় সামল বর্ম্মা রাজা হন। কিন্তু পরলোকগত বসু মহাশয়কৃত অনুযায়ী হরির পিতার নাম ছিল জ্যোতিঃ। জাতবর্ম্মা ও সামল বর্ম্মার মধ্যে এই তিন জন রাজার রাজ্যকাল থাকিতে পারে না। সুতরাং ডাঃ ভট্টশালী মহাশয়ের প্রস্তাব নিঃসন্দেহে স্বীকৃত হইল না। সম্প্রতি তিনি 'ভারতবর্ষে' (মাঘ, ১৩৪৪) বসু মহাশয়কৃত প্রকাশিত হরিবর্ম্মদেবের তাম্রশাসনখানির পূর্ণাঙ্গ ছবি মুদ্রিত করিয়াছেন। তাহাতে স্পষ্ট দেখা যায় যে হরির পিতা "জ্যোতির্বর্ম্ম" নহেন তিনি বিশ্রুতকীর্ত্তি "জাতবর্ম্মদেব"। এবিষয়ে অপর কয়েকটি ভ্রমও তিনি তাঁহার প্রবন্ধে সংশোধন করিয়াছেন। এই শাসনখানির পুনরায় সন্ধান পাওয়ায় হরিবর্ম্মা-সমস্তার সমাধান হইল। দেখা গেল তিনি সামল বর্ম্মার অগ্রগামী এবং বজ্রযোগিনী শাসন হইতে মনে হয় তাঁহার সহোদর।

ভোজবর্ম্মার বেলাবলিপিতে একটি শ্লোকে আছে "তস্মোদয়ী সুমুরভূৎ প্রভূত, দুর্ব্বার বীরেষ্বপি সঙ্গরেষু।" এই "উদয়ী" বিষয়ে আজও পণ্ডিতগণ একমত হইতে পারেন নাই। স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় স্থির করেন ইনি পরমার রাজ উদয়াদিত্য হইতে অভিন্ন। পক্ষান্তরে ৺ননীগোপাল মজুমদার বিশেষ যুক্তি-সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে ভোজবর্ম্মার এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন "উদয়ী", কিন্তু এ সমস্যা ইতিহাসের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ উদয়ী সামল বর্ম্মার পুত্র যদিও হইয়া থাকেন তিনি কখনও বিক্রমপুরের সিংহাসনে উপবেশন করেন নাই ইহা নিশ্চিত।

একটি বিশেষ সমস্তা এই যে বেলাব লিপিতে হরিবর্ম্মা বা তাঁহার পুত্রের উল্লেখ নাই কেন। সম্প্রতি 'ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউটে'র পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অদ্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার একটি সমাধান উপস্থিত করিয়াছেন। সামল ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে কোনওরূপ মনোমালিন্য হওয়াই বোধ হয় ইহার কারণ। এবিষয়ে তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক স্কন্দগুপ্তের নাম উল্লেখ না করার অনুরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। সামল বর্ম্মের বজ্রযোগিনী তাম্রশাসনে হরি ও তাঁহার পুত্রের গৌরবসূচক শ্লোক আছে। সম্ভবতঃ সামলের মৃত্যুর পর হরির কোনও পৌত্র বা সেই সূত্রে সিংহাসনের কোনও দূরতর অধিকারী এই অন্তর্বিপ্লবের পরিচালক ছিলেন। ভোজবর্ম্মা দৃঢ় হস্তে বিদ্রোহ দমন করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। প্রশস্তিকার তাই বিদ্রোহীর সম্পর্কান্বিত হরি ও তাঁহার পুত্রের বিষয় নীরব রহিয়াছেন। অবশ্য একান্ত নির্ভরযোগ্য প্রমাণের অভাবে কোনও কিছু নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

ভোজবর্ম্মার পরবর্ত্তী অপর কোনও বর্ম্ম নরপতির নাম জানা যায় নাই, এতাবৎ বিক্রমপুর হইতে (প্রদত্ত যে সব তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে পরবর্ত্তী শাসন বিজয় সেন কর্ত্তৃক ভূমিদান উপলক্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল। তাঁহার বিজয়গাথায় কোথাও কোন বর্ম্মরাজ বা পূর্ব্ববঙ্গ বিজয়ের কাহিনী নাই। তাঁহার প্রদ্যুম্নেশ্বর প্রশস্তিতে গৌড় কামরূপ কলিঙ্গজয়ের উল্লেখ আছে কিন্তু বিক্রমপুর বা বঙ্গজয়ের কথা নাই। বোধ হয় বর্ম্মরাজ্য তখন এত

খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিল যে শাসনরচয়িতা তাহা উল্লেখযোগ্য মনে করেন নাই। বেলাবলিপি ভোজবর্ম্মদেবের পঞ্চম রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত। লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুরশাসনআলোচনা কালে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় ডাঃ ভট্টশালী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে এসময় ভাগীরথী গঙ্গা এবং মেঘনা বর্ম্মগণের রাজ্যের সীমানা ছিল। দহলাধিপতি কর্ণের ন্যায় এই বিশাল রাজ্যাধিপতি ভোজবর্ম্মদেবের বৃদ্ধকালে ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটা অসম্ভব নহে কিন্তু সেই রাজ্যবিজেতার পক্ষে সে ঘটনা উল্লেখ না করা আশ্চর্য্যজনক। বোধহয় ভোজ বর্ম্মার পর তাঁহার কোনও অযোগ্য বংশধরের রাজ্যকালে এই বিশাল রাজ্য সম্পূর্ণ খর্ব্ব হইয়া পড়ে। বিজয় সেন অবলীলা ক্রমে তাঁহাকে অপসারিত করিয়া শ্রীবিক্রমপুরের জয়স্কন্ধাবার স্থাপন করেন। গৌড় কামরূপ জয়ের তুলনায় একান্ত অকিঞ্চিৎকর এই ঘটনা আর কীর্ত্তিত হইল না। ভবিষ্যতে কোনও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইলে এবিষয়ে, নিশ্চিত সংবাদ জানা যাইবে কিন্তু বর্ত্তমানে নিম্নোক্ত বংশলতা নির্ভরযোগ্য ধরা যায়।*



দুঃখ ও সুখ

শ্রী কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

গলিত কনক দগ্ধ দুঃখ-দহনে
আঘাতে গঠিত মুকুট ভূষণ হার
দলিত কুসুম নিপীড়িত নির্য্যাতনে
বিলায় তাহার তরল সুরভি সার।
সুখের তুলনা ফণীর মাথার মণি
দুঃখ সে যেন সেই বিষধর সাপ
মণিরে ধরিতে কখনো মিলিবে ফণী
খরতর বিষ জরজর সন্তাপ।
দুর্ল্লভ করি সুখেরে বিধাতা
বিপদে ঘিরিয়া রাখে
দৈত্যপুরীর গুপ্ত কোঠায়
ভ্রমরা ভ্রমরী থাকে।

* তৃতীয় ভারতীয় ঐতিহাসিক কংগ্রেসে পঠিত প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ

ইতিবৃত্ত

'সম্বুদ্ধ'

মহর্ষি কশ্যপের তিন পুত্র ছিল, হনু, দনু ও মনু। মনুর সন্তানেরা 'মানব' নামে পরিচিত। দনুর সন্তান ছিল 'দানব'। বর্ত্তমানে ইহারা পৃথিবী হইতে প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। হনুর বংশ সম্বন্ধে পুরাণে কোন উল্লেখ নাই। তাহার কারণ, কশ্যপ তাহাকে ত্যজ্যপুত্র করিয়াছিলেন।

পুত্র হিন্দুদিগের ত্রাণের উপায়; এরূপ ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠপুত্রকে কেন তিনি ত্যজ্যপুত্র করিলেন, তাহার ইতিহাসও পুরাণে লিপিবদ্ধ হয় নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের চেষ্টায় সম্প্রতি সে ইতিহাস আবিষ্কৃত হইয়াছে। হনুর গৃহত্যাগের যে কাহিনী সেই আবিষ্কারের ফলে আমাদের গোচর হইয়াছে তাহা এইরূপ ঃ

মহর্ষি কশ্যপ যজ্ঞশালা হইতে যখন আশ্রমে ফিরিলেন তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়াছে। সমস্ত রাত্রি ও তারপর প্রায় মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন হোম চলিয়াছে; মহর্ষি তখন যেমন পরিশ্রান্ত তেমনই ক্ষুৎপিপাসায় কাতর। আশ্রমে পদার্পণ করিয়া তিনি দেখিলেন, প্রাঙ্গণের একধারে মনু ধূলিধূসরিত হইয়া মাটিতে বসিয়া আছে, তাহার মুখ বিষণ্ণ, চক্ষে জল। মহর্ষিকে দেখিবামাত্র সে করতলে মুখ আবৃত করিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বৃদ্ধবয়সের সন্তান, মনুর উপরে কশ্যপের স্নেহটা স্বভাবতই একটু বেশি ছিল। ব্যস্ত হইয়া তিনি তাহাকে মাটি হইতে কোলে তুলিয়া লইলেন; উত্তরীয়ে চক্ষু মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, কি হইয়াছে, মনু? মনু অধিকতর বেগে ফোঁপাইয়া কহিল, দাদা মারিয়াছে।

কশ্যপ ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। মনুর প্রতি হনু প্রসন্ন নয়, কারণে অকারণে সে তাহাকে উৎপীড়ন করে এই অভিযোগ ক্রমাগতই তাঁহার কানে আসিতেছিল। তাহার উপর সেদিন আবার তাঁহার মনও ছিল খারাপ। যজ্ঞে পদে পদে বিঘ্ন ঘটিয়াছে। হনু ও দনুর উপরে ভার ছিল সমিধ আহরণের; তাহারা একরাশ কাঁচা ভিজা কাঠ আনিয়া রাখিয়া দায় সারিয়াছে। ভিজা কাঠে আগুন জ্বলে না হোমে বসিয়া বারংবার আগুনে ফুঁ দিতে দিতে আর ধোঁয়া খাইতে খাইতে কশ্যপের প্রাণ সারা হইয়াছে, এখন পর্য্যন্ত তাঁহার দুই চক্ষু সমানে জ্বালা করিতেছে। সেখানে সেই দুর্ভোগ, আর গৃহে এই কলহ-ক্রন্দনের কোলাহল —কশ্যপের আর সহিতেছিল না।

মনুর ফোঁপানি শুনিয়া অদিতি কুটিরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, ইহারই মধ্যে আরম্ভ করিলি, একটু সবুর সহিল না তোর?

কশ্যপ কহিলেন, কি, ইহাদের হইয়াছে কি?

অদিতি ক্লান্ত কণ্ঠে কহিলেন, তুমিই জিজ্ঞাসা কর। আমি আর পারি না।

কশ্যপ কহিলেন, দেখ, সমস্ত দিনরাত্রি আমি যজ্ঞশালায় আগুনের তাতে পুড়িয়া মরি। দিনান্তে দুইদণ্ড ঘরে আসিয়া একটু জুড়াইব, তখনও যদি কেবল নালিশ আর নালিশই শুনিতে হয় তবে আমিও তো আর বাঁচি না। আজ হইয়াছে কি?

অদিতি কহিলেন, জানি না। হওয়ার দরকার বা কি, কাঁদিতে চাহিলে কি ছুতার অভাব?

মনু দ্বিগুণ বেগে কাঁদিয়া উঠিল।

কশ্যপ কহিলেন, কেবলই শুনি দাদা মারিয়াছে। ছোট ভাই কোথায় ভালবাসিবে যত্ন করিবে না ওর ছায়া দেখিলেই তাহার গায়ে বিষ লাগে। এমন করিয়া মানুষে বাঁচে? ভাল বুদ্ধি হইয়াছিল, বিবাহ করিয়া সংসার পাতাইয়াছিলাম। অধর্মের ভোগ।

খোঁচাটা অদিতিকে বিঁধিল। পলকের জন্য তাঁহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল; আত্মসংবরণ করিয়া তিনি মনুকে উদ্দেশ করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, হইয়াছে কি, বলিতে পারিস না?

মনু কহিল, দাদা মারিয়াছে।

অদিতি কহিলেন, কি করিয়াছিলি তুই, যে সে মারিল?

মনু কহিল, কিছু করি নাই।

অদিতি কহিলেন, আহা, কিছু কর নাই আর সে শুধু শুধু আসিয়া তোমাকে মার লাগাইল, না?

কশ্যপ কহিলেন, করিবে আবার কি? ওকে দেখিলেই তাহার গা জ্বলে। প্রায়ই তো শুনি সে কোন না কোন ছুতা ধরিয়া ওকে মারিয়াছে!

অদিতি কহিলেন, একতরফা শুনিলেই তো হয় না। হনু একটু গোঁয়ার মানি, কিন্তু বিনা দোষে সে কাহারও গায়ে হাত তোলে না।

কশ্যপ কহিলেন, না, তোলে না। এইটুকু ছেলে কি মিথ্যা বানাইয়া বলিতেছে?

অদিতি ম্লান হাসিয়া কহিলেন, তবেই তুমি সব জান; এই ছেলেটির পেটে পেটে যে কতখানি বজ্জাতি বুদ্ধি আছে, তাহার কূল পাইতেই আমি সারা হইয়া গেলাম। আর এটুকুও তো বোঝ, হনুর যদি ওর উপর আক্রোশই থাকিবে, সে তো ইচ্ছা করিলেই ওকে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে। সে শক্তি তাহার গায়ে আছে। সে ওকে কিছুই বলে না; যদি বা দৈবাৎ কখনও গায়ে হাত তোলে তবে সে অনেক উপদ্রব, অনেক নষ্টামি সহিয়া, তারপর।

কশ্যপ কহিলেন, তুমি তাহার পক্ষ টানিয়া বলিবে, সে তো জানা কথা। এমন করিয়া কথা বল যেন ওই তোমার সতীনপুত্র, সেই তোমার পেটের সন্তান।

অদিতির মুখে করুণ হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। মৃদুস্বরে কহিলেন, পেটের সন্তান যে আমার মনুই, তাহা কি আমার ভুলিবার উপায় রাখিয়াছে! আমার পেটের সন্তান বলিয়াই তো আমার লজ্জা।

কশ্যপ ইহার উত্তর দিলেন না। রোদনরত মনুর মস্তকে সস্নেহে হাত বুলাইয়া কহিলেন, ছি, কাঁদে না, চুপ কর। কেমন করিয়া মারিয়াছে?

মনু কহিল, দাদা গাছে উঠিয়া জাম খাইতেছিল। আমি চাহিলাম, দিল না। তারপর আমি যেই জাম খাইতে গাছে উঠিলাম, অমনি গাছে এমন ঝাঁকানি দিল আমি একেবারে মাটিতে পড়িয়া গেলাম। বলিয়া সে আবার কাঁদিয়া উঠিল।

প্রকৃত যাহা ঘটিয়াছিল তাহা ইহার ঠিক বিপরীত। হনু জাম খাইতেছিল, মনুর খেয়াল হইল, তাহাকে আছাড় খাওয়াইবে। সে গাছে উঠিয়া প্রাণপণে ডাল দোলাইতে আরম্ভ করিল। হনু গাছে চড়িতে পটু, সে হাতে পায়ে ডাল জড়াইয়া ধরিয়া রহিল, মাঝখান হইতে টাল রাখিতে না পারিয়া মনু

নিজেই গাছ হইতে পড়িয়া গেল। কশ্যপের কাছে চক্ষের জল দেখাইয়া নালিশ করা সমস্তটাই তাহার নষ্টামি, হনুকে মিছামিছি মার খাওয়াইবার ফন্দি।

কশ্যপ অতটা বুঝিলেন না, তাঁহার রাগ চড়িয়া গিয়াছিল। অদিতির দিকে চাহিয়া কহিলেন, সেটা কোথায় ?

মনু প্রস্তুত হইয়াই ছিল, সোৎসাহে হাত বাড়াইয়া দেখাইয়া দিল, ঐ-যে, গাছের মাথায় উঠিয়া বসিয়া আছে।

হউক তাহার নিজের দোষে, মনুকে আছাড় খাইতে দেখিয়া হনুর মন খারাপ হইয়া গিয়াছিল। বিরাট দেহটা ভরিয়া তাহার শক্তি ছিল যেমন প্রচুর, মনটাও ছিল ঠিক ততটাই নরম। তাহার উপর বুদ্ধিবৃত্তিও তাহার তেমন তীক্ষ্ণ ছিল না, ভাইদের সে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত।

কশ্যপ মুখ তুলিয়া চাহিলেন, ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন, এই বাঁদর, নামিয়া আয়।

হনু নিঃশব্দে গাছ বাহিয়া নামিতে আরম্ভ করিল। বর্ষাকাল, গাছ পিছল, তাড়াতাড়ি নামিবার উপায় নাই। এক পা এক পা করিয়া সন্তর্পণে নামিয়া যখন সে মাটিতে আসিয়া দাঁড়াইল, ততক্ষণে বিলম্ব দেখিয়া কশ্যপের ক্রোধ বাড়িয়া গিয়াছে। হনু মাটিতে নামিতেই তিনি দ্রুতপদে আগাইয়া গেলেন, তাহার গালে ঠাস করিয়া এক চড় কসাইয়া দিয়া কহিলেন, গাছ হইতে নামিতে এতক্ষণ লাগে ? আজ আবার মনুকে মারিয়াছিস কেন ?

কশ্যপ সাধারণত ছেলেদের গায়ে হাত তুলিতেন না। আচমকা চড় খাইয়া হনু স্তব্ধ হইয়া গেল ; উত্তরও দিল না, কাঁদিলও না, মাথা নিচু করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। উত্তর সে দিলে দিতে পারিত, সত্য যাহা ঘটিয়াছিল তাহাই পিতাকে বলিতে পারিত। কিন্তু তাহা হইলে মনু মার খায়।

উত্তর না পাইয়া কশ্যপের ক্রোধ আরও বাড়িল। হনুর চুলের মুঠী ধরিয়া ঝাঁকুনি দিয়া কহিলেন, অতবড় ধাড়ি ছেলে, ছোট ভাইএর গায়ে হাত তুলিস—দিনে দিনে বিদ্যা বাড়িতেছে না ? আমারও কাল বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল তোমাকে সমিধ আনিতে বলিয়াছিলাম। একবোঝা ভিজা কাঠ কোথা হইতে আনিয়া রাখিয়া দিয়াছ, আমি সারাদিন ধরিয়া ধোঁয়া খাইয়া মরিয়াছি। আনিতে ইচ্ছা যদি না ছিল তখন বলিলেই পারিতিস।

হনু বস্তুত শুকনা কাঠই আনিয়াছিল। কাঠে জল ঢালিয়া রাখিয়াছে মনু, তাহাকে দোষী করিবার জন্য। সেকথা কেহই জানিত না। হনু চিন্তিত হইল, কহিল, আমি তো শুকনা কাঠই আনিয়াছি।

—আবার মুখে মুখে তর্ক করে। আমি কি মিথ্যা বলিলাম ? কশ্যপের আর জ্ঞান রহিল না। প্রাঙ্গণের একধারে অদিতি লাউচারা লাগাইয়াছিলেন, তাহার বেড়া হইতে একখানা অর্দ্ধশুষ্ক কঞ্চি তিনি টানিয়া বাহির করিলেন। তারপর সেই কঞ্চি শপাশপ শব্দে হনুর সর্ব্বাঙ্গে পড়িতে লাগিল।

হনু নড়িল না চড়িল না প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের চেষ্টামাত্র করিল না ; দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া প্রাণপণে অশ্রুর বেগ রুদ্ধ করিয়া নিঃশব্দে মার খাইতে লাগিল।

অপরের অঙ্গে আঘাত করিবার মধ্যে একটা উগ্র উন্মাদনা আছে একবার মারিতে আরম্ভ করিলে আর হঠাৎ থামা যায় না। কশ্যপের তখন হিতাহিত চেতনা নাই, অন্ধের মত তিনি হনুর হাতে পায়ে পৃষ্ঠে মস্তকে ছড়ি চালাইতে লাগিলেন ; মারিতে মারিতে শেষে ছড়ি ভাঙিয়া গেল।

অদিতি এতক্ষণ হতবাক্ হইয়া চাহিয়া ছিলেন। নূতন কঞ্চির সন্ধানে কশ্যপ ফিরিয়া চাহিতেই তাঁহার চমক ভাঙিল ; ছুটিয়া গিয়া তিনি হনুকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইলেন। চিৎকার করিয়া কহিলেন, করিতেছ কি তুমি, পাগল হইয়াছ ?

কশ্যপ ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, সরিয়া যাও।

অদিতি কহিলেন, না। কি চাও তুমি, ওকে মারিয়া ফেলিবে ?

কশ্যপ শ্রান্তস্বরে কহিলেন, মরুক, তাই মরুক, আপদ যাক। অমন পুত্র থাকার চেয়ে না থাকা শতগুণে ভাল।

অদিতি তাঁহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া কহিলেন, থাক, কাছে আসিও না। দুধের বাছাকে এমন করিয়া মারিতে প্রাণে একটু লাগিল না, তুমি কি বাপ না রাক্ষস ?

কশ্যপ হাতের কঞ্চি ফেলিয়া দিলেন, কহিলেন, বেশ, আজ ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু আবার যদি কোনদিন শুনি মনুর গায়ে হাত তুলিয়াছে, সেইদিন ওর শেষ।

অদিতি কহিলেন, আচ্ছা, সে আমি বুঝিব। জান, তোমার সঙ্গে একসঙ্গে বসিয়া খাইবে বলিয়া বাছা আমার এতখানি বেলা উপবাসী রহিয়াছে ?

কশ্যপ কহিলেন, বাকি বেলাও থাকিবে। আজ যদি ওকে তুমি ডাকিয়া ভাত দাও তবে তোমার অতিবড় কঠিন দিব্য রহিল।

হনু তখনও সেইভাবেই ঠায় দাঁড়াইয়া আছে। অদিতি তাহার গায়ে পিঠে হাত বুলাইয়া দিয়া কহিলেন, বাছা রে। থাক কাঁদিস না, স্নান করিয়া আয়, যা। হনু নড়িল না। অদিতি একটুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে গিয়া কুটিরে প্রবেশ করিলেন। দাঁড়াইবার সময় তাঁহার নাই। কশ্যপ স্নানাহার করিয়া এখনই আবার যজ্ঞশালায় যাইবেন, তাঁহার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে।

মনু পিতার হাত ধরিয়া আগেই কুটিরে চলিয়া গিয়াছিল। অদিতিও যাইবার পর হনুর সম্বিৎ ফিরিল! এতক্ষণ তাহার যেন নিঃশ্বাসও বহিতেছিল না; এখন তাহার বক্ষ মথিত করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। শুষ্কচক্ষে কিছুক্ষণ সে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিল ; তারপর ধীরে ধীরে গিয়া আবার গাছের মাথায় উঠিল।

কশ্যপ স্নান ও আহার সারিয়া যজ্ঞশালায় চলিয়া গেলেন। মনু ও দনু যাইয়া খেলিতে বাহির হইল। আশ্রম নির্জ্জন হইয়া গেলে পর অদিতি দুইখানি থালায় করিয়া ভাত বাড়িতে বসিলেন। ভাত বাড়িতে বাড়িতে তাঁহার মনে পড়িল, হনুকে ভাত দিতে কশ্যপ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, বৈধব্যের শপথ দিয়া গিয়াছেন। সে অভিশম্পাতকে তুচ্ছ করিবার তাঁহার সাহস নাই। ভাতের থালা সম্মুখে লইয়া অদিতি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন ; দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিয়া তাঁহার বসন ভিজিয়া গেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, ভগবান, ইহার চেয়ে আমাকে বন্ধ্যা করিলে না কেন!

অনেকক্ষণ অদিতি কাঁদিলেন। তারপর দুই থালায় ভাত একত্র করিয়া একখানি থালায় লইলেন। থালার পাশেপাশে ব্যঞ্জন প্রভৃতি সাজাইয়া দিয়া, থালা লইয়া তিনি কুটিরের বাহিরে আসিলেন। হনুকে ডাকিয়া খাওয়াইবার তাঁহার সাধ্য নাই ; যে গাছটির মাথায় সে বসিয়াছিল তাহার গোড়ায় গিয়া তিনি দাঁড়াইলেন।

বহু উচ্চে গাছের ডালে পা ঝুলাইয়া, আরেকখানি ডাল্‌কে জড়াইয়া ধরিয়া হনু নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে, তাহার অশ্রুহীন দৃষ্টি দূরে নিবদ্ধ ; আশ্রমের সীমানা ছাড়াইয়া, তপোবনের মাথার উপর দিয়া দিগন্তের রেখা পার হইয়া সে দৃষ্টি সীমাহীন শূন্যে গিয়া বিলীন হইয়াছে।

অদিতি চাহিয়া রহিলেন ; হঠাৎ যদি তাহার হাত ফস্‌কাইয়া যায়, বা গাছের ডাল ভাঙিয়া যায় তবে কি সর্ব্বনাশ হইবে কল্পনা করিতেও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের জন্য অদিতি চক্ষু মুদিলেন ; মন দৃঢ় করিয়া আবার চাহিলেন। হনু এত উঁচুতে বসিয়া রহিয়াছে, মাটি হইতে তাহাকে স্পষ্ট দেখাও যায় না—একনিমিষে যেন সে স্বার্থহিংসাখলতায় বিষাক্ত আশ্রমের বায়ুমণ্ডপ ছাড়াইয়া কোন মহাশূন্যে, মহা ঊর্দ্ধলোকে উঠিয়া গিয়াছে।

চাহিয়া চাহিয়া একসময়ে অদিতির চমক ভাঙিল ; বেলা আর নাই। হনুকে নাম ধরিয়া তিনি ডাকিতে পারিলেন না ; হাতের শাঁখা দিয়া থালার কানায় আঘাত করিলেন। কিন্তু সে সঙ্কেতধ্বনি হনু শুনিতে পাইল কিনা কে জানে। সে মুখ ফিরাইয়া চাহিল না, যেমন ছিল তেমনই বসিয়া রহিল। অদিতি উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিলেন। আবার সঙ্কেত করিলেন, আবার অপেক্ষা করিলেন। শেষে কপালে করাঘাত করিয়া ভাতের থালা সেইখানে মাটিতে নামাইয়া রাখিলেন। রাখিয়া, অশ্রুর বর্ষণে মাটি ভিজাইয়া কুটিরে ফিরিয়া আসিলেন।

সে দিন, সে রাত্রে আর তাঁহার মুখে অন্ন উঠিল না। রাত্রে খাইতে বসিয়া মনু কহিল, দাদা খাইয়াছে ?

অদিতি উত্তর দিলেন, না।

মনু আবার কহিল, গাছের তলায় একথালা ভাত দেখিলাম, কিসের ?

অদিতির ইচ্ছা হইতেছিল, দুইহাতে তাহার গলাটা চাপিয়া ধরিয়া জন্মের মত তাহার সেই বিষক্ষরা কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দেন। তাহা পারিলেন না, নিঃশব্দে কেবল ব্যঞ্জনের পাত্রটাই তাহার থালার উপর উপুড় করিয়া দিলেন।

দনু বিস্মিত হইয়া কহিল, তোমার জন্য রাখিলে না ?

অদিতি মৃদুস্বরে কহিলেন, খা, আমার আছে।

রাত্রি যখন শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন হনু ধীরে ধীরে গাছ হইতে নামিয়া আসিল। গাছের তলায়, যেখানে মায়ের অশ্রুতে সিক্ত ভাতের থালা বাতাসে শুকাইয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, তাহার পাশে সে আসিয়া থামিয়া দাঁড়াইল। একবার নিচু হইয়া সে থালাটা দেখিল ; একবার থালাটা ধরিতে গিয়া আবার হাত গুটাইয়া লইল। তারপর থালা হইতে দুটি ভাতের দানা তুলিয়া মাথায় রাখিয়া সে গিয়া কুটিরের পাশে দাঁড়াইল। দনু ও মনু ঘুমাইতেছে, তাহাদের নিঃশ্বাসের শব্দ কানে আসিল। অদিতির নিঃশ্বাস সমান তালে পড়িতেছে না, কখনও অস্পষ্ট, কখনও বা দ্রুত ও গভীর। শুনিয়া সে বুঝিল, অদিতি ঘুমায় নাই, শুইয়া শুইয়া কাঁদিতেছেন। হনুর একবার ইচ্ছা হইল তাঁহাকে ডাক দেয়, তারপর সে ইচ্ছা সংবরণ করিয়া সে সেইখানেই ভূতলে মাথা ঠেকাইয়া তাঁহাকে প্রণাম জানাইল ; তারপর উঠিয়া দ্রুতপদে হাঁটিতে লাগিল। অনেকদূর চলিয়া আসিয়া হনু মুখ তুলিয়া আকাশের দিকে চাহিল। আকাশে কৃষ্ণাপক্ষমীর চন্দ্র তখন লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, নক্ষত্রের আলো নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছে। সেই

স্তিমিত আলোতে দাঁড়াইয়া একবার এই চিরপরিচিত বনভূমির জন্য তাহার মন কেমন করিয়া উঠিল, একটি দীর্ঘশ্বাস বুকের তলা হইতে জাগিয়া উঠিয়া আবার বুকের মধ্যেই বিলীন হইয়া গেল। মুখ নামাইয়া হনু আবার চলিতে আরম্ভ করিল; ছায়ায় ঢাকা বনপথে তাহার মূর্ত্তি ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

বহুদিন পরে ইহাদের আরেকবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল—হনু ও মনুতে নয়, তাহাদের উভয়ের বংশধরে।

মনুর সন্তানেরা তখন শিল্প ও রণকৌশলে পটু হইয়া উঠিয়াছে। দানব বংশকে পরাভূত করিয়া তাহারা জম্বুদ্বীপে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করিল। তারপর তাহারও বাহিরে দিগ্বিজয়ে বাহির হইল।

বন্দুকে কিরীচে সজ্জিত হইয়া মানুষ প্লক্ষদ্বীপে যাইয়া উপস্থিত হইল। তাহার প্রকাশ্য উদ্দেশ্য মৃগয়া, গোপন উদ্দেশ্য রাজ্যজয়! বনের পথে চলিতে চলিতে অতর্কিতে একদিন তাহার সহিত হনুবংশীয়দের সাক্ষাৎ হইয়া গেল।

জম্বুদ্বাপ ছাড়িয়া হনু প্লক্ষদ্বীপের গভীর অরণ্যে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছিল; লোকালয়ে ফিরিয়া যাইবার আর তাহার প্রবৃত্তি ছিল না। বহুদিন সুখেদুঃখে কাটাইয়া হনু মরিয়া গেল; সন্তানদের শিখাইয়া রাখিয়া গেল, মনু বা তাহার বংশের কেহ যদি কোনদিন এদেশে আসে, বিমুখ হইয়া যেন না ফিরিয়া যায়, জ্ঞাতি বলিয়া, ভাই বলিয়া যেন সাদর অভ্যর্থনা পায়। বংশপরম্পরাক্রমে সেই আজ্ঞা বানরেরা মুখস্থ করিয়া আসিতেছিল।

মানুষকে দেখিবামাত্র তাহারা চিনিল; উল্লাসে চিৎকার করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইল। তাহাদের ভাষা হয়তো সে বুঝিবে না, এই ভয়ে দুই হাত প্রসারিত করিয়া, নিজের প্রশস্ত বক্ষে করাঘাত করিয়া বলিতে চাহিল, আইস, আমাকে আলিঙ্গন কর, এই বক্ষে তোমার জন্য স্থান করিয়া রাখিয়াছি।

মানুষ চাহিয়া দেখিল। তারপর বন্দুক তুলিয়া সেই বুক লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িল।

অতর্কিত আঘাতে বানর স্তম্ভিত হইয়া গেল, তারপর বিদীর্ণ পঞ্জর দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

মানুষ তাহার ডায়ারিতে লিখিল; গরিলার মত হিংস্র ও ক্রূরপ্রকৃতি জীব আর নাই। জাত্যংশে মানুষের নিকট জ্ঞাতি হইলেও ইহাদের প্রকৃতি মানুষের ঠিক বিপরীত। মানুষকে দেখিবামাত্র ইহারা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া তাহাকে আক্রমণ করে।



চয়ন

যাত্রা

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভোরের বেলা বাঁশীর স্বর শুনিয়া কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছি। অস্ফুট সূর্য্যকিরণে সেই বাঁশীর স্বরের উপর একটি মাধুরী ফুটিয়া উঠিয়াছে। এতদিন শুধু লোকের মনে একটি অস্থির আশামাত্র ছিল, এখন সেই আশা সপ্তমীর উষালোকে প্রথম বিভাসিত হইল। এ নিরাশার দেশে লেকের প্রাণ খুলিয়া আশা করিবার যো নাই—মুহূর্ত্তে প্রাণের আশা শুকাইয়া যাইতে পারে। আশা করিবারও আমাদের ক্ষেত্র সংকীর্ণ। আমাদের আশাপূর্ণ ভাবের মধ্যে একটা নৈরাশ্য—একটা মরীচিকা। বাঙালী হৃদয়ের উদারতায় ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হইয়া ক্ষুদ্রত্বের দুয়ারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আপনার গর্ব্ব করিতেছে—চতুর্দ্দিকে শুধু এই দৃশ্য।

আমরা চলিয়াছি—পশ্চাতে একটা কোলাহলময় আশা নিরাশাময় ভাব ফেলিয়া রাখিয়া, প্রকৃতির শ্যামল শোভার মধ্য দিয়া আমরা—ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছি। আমাদের চারিদিকে মেঘ কাঁদিয়া ফিরে, বায়ু বহিয়া যায়, স্বপ্ন ঝরিয়া পরে। অতীতের ক্ষীণালোকে আমরা ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া রহিয়াছি। একটা দূর শুভ মুহূর্ত্তের ছায়ায় অপেক্ষা করিতেছি। সহসা ভোরের বাঁশী থামিয়া গেল—দেখিলাম যে এই বাঁশীর স্বরে চড়িয়া বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখানে একটা অপরিচিতের মধ্যে পরিচিতের ভাব—পুরাতনের মধ্যে নূতনত্ব—বিস্মৃতির মধ্যে স্মৃতি।

এখানে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় মনটা কি রকম উদাস উদাস হইয়া পড়িত। মনের উপরে একটা দূরব্যাপী ঘুমন্ত স্বপ্নের ছায়া পড়িয়া তাহাকে উদাসী করিয়া তুলিত। দূর বৃক্ষাবলীর মধ্য দিয়া কল্পনার মত আমার প্রাণে কি যেন আসিয়া আঘাত করিত—আমার চক্ষের সম্মুখে কলিকাতার একটি প্রাচীন কুটিরের ছবি ফুটিয়া উঠিত। সেখানে যেন একটা অস্থির স্থিরতা—শত বৎসরের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে বর্ত্তমানের নূতনত্বের একটা আব্‌ছায়া রকম সংযোগ—স্মৃতিবিস্মৃতির নীরব কোলাহলের মধ্যে একটা অসম্পূর্ণ মন। কলিকাতার এই সংযোগবিয়োগময় ভাবের মধ্যে গঙ্গাতরঙ্গের একরকম প্রাণময়, প্রেমময়, ছায়াময় স্বপন মিশাইয়া প্রাণের মধ্যে একটা গভীর প্রাণ—আত্মার মধ্যে একটা গভীর আত্মা—মরণের মধ্যে একটা জীবনের ছায়া ফুটাইয়া দিত। এখানকার রামধনুর পূর্ণভাবময় ছায়া—ধরণী তাহার জ্যা। কলিকাতার অসম্পূর্ণ রামধনুর সহিত এখানকার রামধনুর কেমন একটা বিভিন্নতা। কিন্তু এই বিভিন্নতার মধ্যেও ঐক্য। এই রামধনুর মধ্যে সেখানকার রামধনুগুলি স্মৃতির আকারে বর্ত্তমান।

কলিকাতার ন্যায় এখানেও জীবনের অনেক ঘটনা সাজাইয়া নিয়াছি। সেই জন্য এখান দিয়া যাইতে হইলে খানিকটা করিয়া পুরাতনের স্মৃতি জাগিয়া উঠে। বিস্মৃতির ঘুমন্ত ভাবের মধ্যে একটা অস্ফুট সজীবতা দেখা দেয়। এখানকার গঙ্গায় অনেক দিন অনেক মালিন্য প্রক্ষালন করিয়াছি, তাহারা হয়তো জগতের মহান স্রোতে ভাসিয়া গিয়া কত কত দূর হইতে দূরতর দেশের বালুকাময় বেলাভূমি চুম্বন করিয়া আবার একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে এইখানে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর আসিয়া আটকাইয়া যাইবে। এখানকার রাস্তাঘাটে আমার সহস্র জীবন্ত পদচিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। তাহারা অস্ফুটভাবে আমার চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অস্ফুটাকারেই মিলাইয়া যায়।

* * এখানকার মুক্ত বায়ুতে একটা মুক্ত ভাব। কলিকাতার দলাদলিময় দ্বেষহিংসাপূর্ণ সমালোচনার পরিবর্ত্তে এখানে কেমন শান্তি। এখানে কেমন নিস্তব্ধতা। সেখানকার বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর—সেখানকার মহামহা

সংবাদপত্রের মিথ্যাকথার স্তূপ এখানে যেন আসিয়াও আসিতে পারে না। এখানে একটা প্রকৃতির শান্ত শিষ্ট কোমল ভাব। সেখানে শুধু ছ্যাকড়া গাড়ীর আড়ম্বরপূর্ণ কোলাহল।

কিন্তু এই মহা আড়ম্বরময় নূতনত্বের মধ্যেও একটা প্রাচীনত্ব আছে—সেখানকার অশান্তিময় ভাবের মধ্যেও খানিকটা শান্তির ভাব আছে। দূর স্মৃতির মধ্যে তাহার একটা মাধুর্য্য—আরও দূর বিস্মৃতির মধ্যে তাহার আরও মাধুর্য্য। সেখানকার অনেক জিনিষেই খানিকটা করিয়া স্মৃতি জাগিয়া আছে। খানিকটা বিস্মৃতি ঘুমাইয়া আছে।

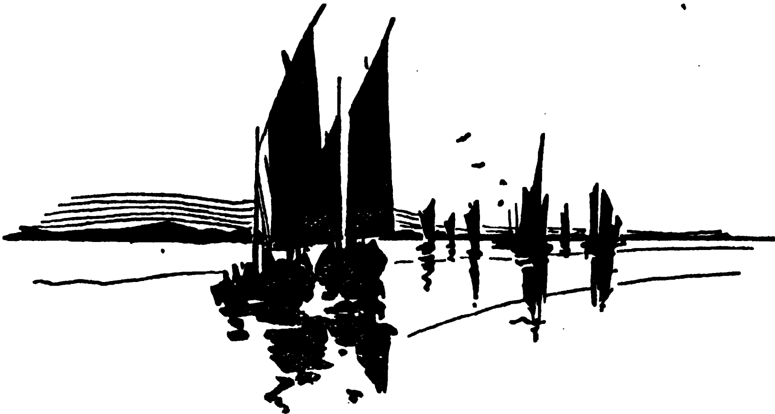
এখানকার গাছপালায় কেমন একরকম ঔদাস্যের ভাব। বৈরাগ্যের ছায়া। সহরে শুধু শুধু বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা। সেখানে শুধু বিলাস—সেখানে শুধু অহঙ্কার—সেখানে ক্ষুদ্র সংকীর্ণ ভাব। আর এখানকার কি অসীম উদার ভাব। এখানে জগতের মহান্ প্রেমের ছায়া পড়িয়াছে।

এই প্রেমের শান্তিময় ভাবের মধ্যে ডুবিতে পারিলে আমাদের ক্ষুধিত হৃদয়ের ক্ষুধানিবৃত্তি হয়—আমাদের পাষাণ অন্তঃকরণের পাষাণত্ব চলিয়া যায়—অনন্ত আনন্দের বিমল ছায়ায় আমাদের প্রাণমন ভরিয়া যায়।

মেঘের উপর মেঘের রেখা পড়িয়া ধীরে ধীরে বিজয়া কাটিয়া গেল। বিজয়ার পর আরও কতদিন কাটিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার শুভ্র মেঘগুলির কোমল বক্ষে প্রতিফলিত হইয়া কতদিনকার শেষ সূর্য্যকিরণগুলি ঢেউএর মত মিশাইয়া গিয়াছে—কত স্বার্থের কীট এতদিন ধরিয়া ক্রমাগত ভ্যান্ ভ্যান্ করিয়া জলন্ত হুতাশনে প্রাণ হারাইয়াছে।

সেই যে স্মৃতিময় ভোরের বাঁশী শুনিয়া সেদিন উষা-লোকে যাত্রা করিয়াছিলাম এতদিন প্রাণের মধ্যে সেই বাঁশীর স্বরের কি যেন অস্ফুট ছায়া পড়িয়াছিল, আজ সহসা তাহা নাড়াচাড়া পাইয়া জাগিয়া উঠিল। সেই ছায়ার মধ্যে সেদিনকার শুক্ষ তারার ম্লানমূর্ত্তি শরতের ঘুমন্ত হাসির মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সেদিনকার সূর্য্যালোক—সেদিনকার স্মৃতি—সেদিনকার সেই শ্যামলবসনা উষার প্রাণের কাহিনীগুলি মরমের চারিদিক ছাইয়া ফেলিল।

[ভারতী, পৌষ, ১২৯৩]



সেকালের কলিকাতা

শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগল

মহীশূরের দেওয়ান বাহাদুর সর্ মির্জা ইস্‌মাইল ষোল বৎসর পরে সেদিন কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি জনৈক সংবাদপত্র-প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, এবারে কলিকাতায় বিস্তর নূতন রাস্তা ও ঘরবাড়ী লক্ষ্য করিয়াছেন। অর্থাৎ কলিকাতার রূপ মাত্র ষোল বৎসরের মধ্যেই অনেকখানি বদলাইয়া গিয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে এত পরিবর্ত্তন! কেহ যদি শতবর্ষ পরে আজ রিপ ভ্যান্ উইন্‌কেলের (অবশ্য নিদ্রাকাল বাড়াইয়া) মত জাগ্রৎ হইতে পারেন তাহা হইলে বর্ত্তমান কলিকাতা তাঁহার নিকট একটি সম্পূর্ণ নূতন শহর বলিয়াই প্রতীত হইবে। বস্তুতঃ শতবর্ষ পূর্ব্বেকার কলিকাতা আর আজিকার কলিকাতা—এ দুইয়ে কোন তুলনাই হয় না। সেকালের বাঙ্গালীদের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, আগেকার চেয়ে বিভিন্ন ধরণের ছিল। কলিকাতার পথ ঘাট, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা-ব্যবস্থা, পৌর বিধি, আজ সবই তখনকার অবস্থা থেকে এক স্বতন্ত্র পর্য্যায়ে উপনীত। সে যুগের কলিকাতা এখন তাই কাহিনী বা গল্পের বস্তু। আর এই কলিকাতা সম্পর্কে সাহিত্যও গড়িয়া উঠিয়াছে প্রচুর। ইংরেজী বাঙ্গলা উভয় ভাষারই নানা জনে নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তথাপি এই কাহিনীর যেন শেষ নাই। আজিকার কলিকাতা এক দিনে গড়িয়া উঠে নাই। বহু কর্ম্মী ও মনীষীর বিপুল কর্ম্ম ও মনীষা ইহার পশ্চাতে কার্য্য করিয়াছে একথাটি আমরা যেন সর্ব্বদা স্মরণে রাখি।



পুরাতন ফোর্ট [হজেস্

তিনটি নগণ্য গ্রাম লইয়া আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে

জব চার্ণক এই নগরীর পত্তন করেন, অল্প বয়সের বালকেরাও অবশ্য একথা জানে। কলিকাতা নামের উৎপত্তি লইয়া অনেকে অনেকরূপ গবেষণা করিয়াছেন। সর্ব্বশেষ মত এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে যে, গঙ্গার উপরে কলি চূণের আড়ত ছিল, এই কলি চূণের আড়ত হইতেই কলিকাতা নামের উৎপত্তি! এই মত গ্রহণ বা বর্জ্জন আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে ইহার যুক্তিযুক্ততা অস্বীকার করিবারও কোন কারণ দেখি না। কলিকাতা, সুতানুটি, গোবিন্দপুর—বহু গ্রাম জনপদ ক্রমে এ তিনটির সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। তথাপি কতকগুলি নাম এখনও আজও কলিকাতার অস্তিত্ব স্মরণ করাইয়া দিতেছে! বাহির মির্জাপুর, বাহির শিমুলিয়া প্রভৃতি হইতে মূল কলিকাতা স্বতন্ত্র ছিল। বাগবাজার হইতে চৌরঙ্গী



বেলেঘাটার খাল

পর্য্যন্ত যে চিৎপুর সড়ক চলিয়া গিয়াছে তাহার পশ্চিম পাশে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর এই কলিকাতা শহর অবস্থিত। ফোর্ট উইলিয়ম, আইন আদালত, সরকারী ও সওদাগরী আফিস সবই ছিল এই সীমানার মধ্যে। সে যুগের যত বড়লোক এই চিৎপুর সড়কের এপার-ওপার বসবাস করিতেন। নেটিভ হাসপাতাল, হিন্দু কলেজ এই রাস্তারই উপর প্রথমে অবস্থিত ছিল। ১৮২৯ সনে প্রতিষ্ঠিত ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি নামে বিখ্যাত স্কুলটি এখনও এই রাস্তার উপরই প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু কলিকাতা সমগ্র বাঙ্গলা ও ব্রিটিশ অধিকৃত সমগ্র ভারতবর্ষের কর্ম্মস্থল হওয়ায় অতি দ্রুত ইহার আয়তন বাড়িয়া যায়। আমরা যে সময়কার কলিকাতার কথা বলিতে যাইতেছি তাহার আয়তনও এখন ঢের বাড়িয়া গিয়াছে।

গত শতাব্দীর প্রথম দিকে কলিকাতার আয়তন ও জনসংখ্যা আগেকার যুগের চেয়ে অতিমাত্রায় বাড়িয়াছিল, নানা অভাব-অভিযোগও দেখা দিয়াছিল, কিন্তু তাহা নিরাকরণের কোনরূপ সুবন্দোবস্ত হয় নাই। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি আইন বিধিবদ্ধ হইলে কয়েক জন জাষ্টিস্ নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাদের প্রধান কার্য্য হইল রাস্তাঘাট সংস্কার করা, রাস্তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও রাস্তায় জল দেওয়া। কিন্তু আসল সমস্যার কোন সমাধান হইল না। লর্ড ওয়েলেসলী ত্রিশ জন সভ্য লইয়া একটি টাউন ইম্প্রুভমেণ্ট কমিটি গঠন করিলেন। কিন্তু ইহা দ্বারাও শহরের বিশেষ কোন সংস্কার সাধিত হইল না। অবশেষে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে লটারি কমিটি শহর সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করিলেন। এ কমিটি পৌর উন্নতি বিধানে অতঃপর আত্মনিয়োগ করিলেন।

'লটারি' কথাটির সঙ্গে আমরা এখন সকলেই পরিচিত। ভারতবর্ষে কলিকাতাই প্রথম ১৭৮৪ সালে লটারি আরম্ভ হয়। প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুর, পার্শী সওদাগর রুস্তমজী কাওয়াসজী, লাহা পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা প্রাণকৃষ্ণ লাহা প্রমুখ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি

সেযুগে লটারি খেলিয়া বিস্তর টাকা পাইয়াছিলেন। লটারি প্রথমে খোলা হয় সেণ্ট জন গীর্জ্জার গৃহনির্ম্মাণের জন্য। কিন্তু পরে ইহার অর্থের এক বৃহৎ অংশ শহর-বাসীর উপকারার্থে ব্যয়িত হইতে থাকে। বহু পুষ্করিণী খনন করা হয়। আজ শহরের পূর্ব্ব দিকে যে খাল দেখিতেছি সেই বেলিয়াঘাটা খালও কাটা হয় এই লটারির টাকায়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। বাগবাজার হইতে উল্টাডিঙ্গি হইয়া বেলিয়াঘাটা পর্য্যন্ত যে খাল গিয়াছে তাহাকে অনেকে ভ্রম করিয়া মারাঠা ডিচ্ বলেন। কিন্তু মারাঠা আক্রমণের বহু পরে কর্ত্তিত ঐ খাল। মারাঠা ডিচ্ ছিল বর্ত্তমান আপার সারকুলার রোডে। পরে উহা বুজাইয়া এই নামের রাস্তা করা হইয়াছে। লর্ড ওয়েলেসলী কলিকাতার টাউন হল নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিয়া যান। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহা সমাপ্ত হয়। লটারির টাকা দ্বারাই টাউন হলের নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিয়াছে।

লটারি কমিটি দ্বারা যখন কলিকাতার এত উপকার সাধিত হইতেছিল তখন কর্ত্তৃপক্ষ যে ক্রমে ইহার উপরই সহরের সংস্কার ও সংরক্ষণ কার্য্যের বেশীর ভাগ অর্পণ করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? ১৮১৪ হইতে ১৮৩৬ সন পর্য্যন্ত এই বাইশ তেইশ বৎসর কলিকাতায় পৌর কার্য্য এই লটারি কমিটি নির্ব্বাহ করেন। লটারি দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া পৌর কার্য্য নির্ব্বাহ করা বিলিতী কর্ত্তাদের মোটেই মনঃপূত হইল না। বিলাতে ইহা লইয়া খুবই আন্দোলন সুরু হইলে শেষোক্ত বৎসরে ইহা তুলিয়া দেওয়া হইল। এই সময় ফিভার হস্‌পিটাল কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি কিন্তু একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। ইহা প্রথমে ছিল একটি সম্পূর্ণ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান।

লটারি কমিটি উঠিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার কার্য্য কলাপ শতাধিকবর্ষ পরেও জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। তখন 'কনজারভেন্সি' কার্য্য মাত্র বোর্ড অফ্ জাষ্টিসের উপর অর্পিত ছিল। সহরের রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খনন কার্য্য কমিটি পুরাদস্তর করিয়াছিলেন। কলিকাতার বিখ্যাত রাস্তাগুলির অধিকাংশই লটারি কমিটির কীর্ত্তি। ষ্ট্রাণ্ড রোড ১৮২৮ সনে নির্ম্মিত হয়। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, উড ষ্ট্রীট, লাউডন ষ্ট্রীট, ময়রা ষ্ট্রীট, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট লটারি কমিটি নির্ম্মাণ করেন। গোলদীঘি ও হেদুয়া পুষ্করিণী ১৮২৬ সনে খনন করেন। এই দুই অঞ্চলে চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল খুব। রাস্তা নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খনন করা হইলে এ উপদ্রব অনেকটা কমিয়া যায়।

লটারি কমিটির এবম্বিধ পৌর সংস্কার কার্য্যেও কিন্তু আসল সমস্যার সমাধান হইল না। বড় বড় রাস্তা নির্ম্মাণ ও দীর্ঘিকা খনন করা হইলেও স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে বিশেষ কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। এজন্য প্রয়োজন অন্য রকম প্রতিষ্ঠানের। লটারি কমিটি দ্বারা বা বোর্ড অফ্ জাষ্টিসের দ্বারা তাহা করান সম্ভবপর নহে কেননা ইহার কর্ম্মক্ষেত্র খুবই সংকীর্ণ। সহরে তখন জ্বর ও কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। শত শত লোক বর্ষা ও শরৎকালে জ্বরে মরিতে থাকে। কলেরার আবির্ভাব হইত বসন্ত কালে। সুবিখ্যাত ডেভিড হেয়ার ও ডি'রোজিও সাহেব কলেরা রোগে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। 'প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তের দুই পঙ্‌ক্তি কবিতা* তখনকার কলিকাতার অবস্থা আমাদিগকে এখনও স্মরণ করাইয়া দেয়। কলিকাতার দেশী ও বিদেশী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই দুরবস্থা নিবারণের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। ফিভার হস্‌পিটাল কমিটিই এই চিন্তার ফল।

তখন জ্বর রোগের খুব প্রাদুর্ভাব হয়, আগে বলিয়াছি। ধর্ম্মতলার নেটিভ হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য একটি বিশেষ সভা আহ্বান করেন। এই সভায় নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যগুলি লইয়া একটি সাব্ কমিটি গঠিত হয়—প্রথমতঃ শহরের মধ্যভাগে সর্ব্বপ্রকার, বিশেষ করিয়া জ্বরাক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য একটি ফিভার হাসপাতাল স্থাপন, দ্বিতীয়তঃ শহর ও শহরতলীর স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য উপায়াদি নির্দ্ধারণ ও সরকারে রিপোর্ট দান। তাঁহাদের এই উদ্দেশ্য সাধারণের

* "রাতে মশা দিনে মাছি।
দুই নিয়ে কল্‌কাতায় আছি॥"

গোচরীভূত করিবার জন্য ১৮৩৫ সনের ১৮ই জুন কলিকাতার টাউন হলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সাব্ কমিটির সভ্য সংখ্যা বাড়াইয়া দশজন করা হইল। কমিটির দশজন সভ্যের মধ্যে ছয় জন ইংরেজ ও চারজন ভারতবাসী। ইংরেজ সভ্যের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সর্ এড্ওয়ার্ড রায়াল, সর্ জন পিটর গ্রাণ্ট প্রমুখ পদস্থ ব্যক্তিরা ছিলেন। ভারতীয়রা যথাক্রমে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামকমল সেন, রসময় দত্ত ও রুস্তমজী কাওয়াসজী।

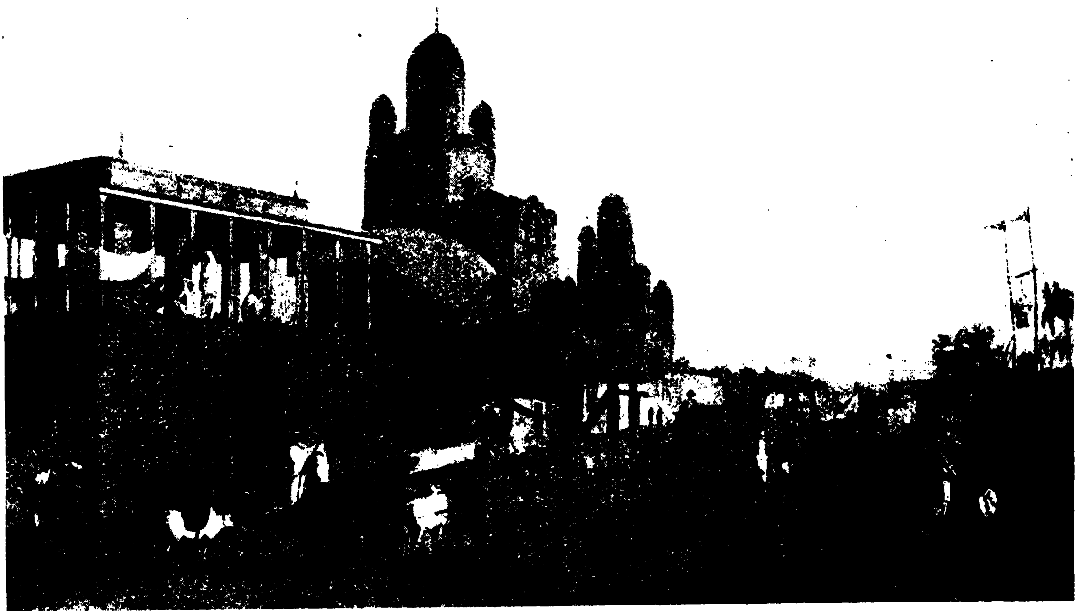


সেকালের বড়বাজার

এক বৎসরের মধ্যেই, অর্থাৎ ১৮৩৬, ৩রা জুন তারিখে বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ড কমিটির উদ্দেশ্য অনুমোদন করিলেন ও ইহার সঙ্গে কলিকাতার কর-নির্দ্ধারণ ও কর আদায়ের উপায় অনুসন্ধানের ভারও কমিটিকে দিলেন। তবে কমিটিকে সরকার পক্ষের দুইজন বিশেষজ্ঞকে ইহার সভ্য নিযুক্ত করিতে হইল। ফিভার হস্পিটাল কমিটির নামেরও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইল। ইহার নাম দেওয়া হইল অতঃপর 'ফিভার হস্পিটাল এণ্ড মিউনিসিপ্যাল এন্কোয়ারী কমিটি।' সর্ হেনরি ইভান্ এ, কটন তাঁহার 'ক্যালকাটা ওল্ড্ এণ্ড নিউ' নামক পুস্তকে এই কমিটি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "It makes the beginning of the modern Municipal Government" অর্থাৎ বর্ত্তমান পৌর শাসনের সূত্রপাত হয় এই কমিটির স্থাপনার সময় হইতে।

কমিটি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আমাদের বর্ত্তমান

প্রসঙ্গে আবশ্যক করে না। তবে, সেকালের কলিকাতার অবস্থার কথা এই কমিটিতে যে-সব সাক্ষ্য প্রদান করা হইয়াছে তাহাতে এবং ইহার রিপোর্টে কম বেশী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তবে এ প্রসঙ্গে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কলিকাতার পৌর শাসনের যাবতীয় ব্যাপারই ইহার অনুসন্ধানের বিষয়ীভূত ছিল। গৃহ নির্ম্মাণ পদ্ধতি, স্বাস্থ্য, নর্দ্দমা, রাস্তাঘাট, জল সরবরাহ, গঙ্গায় খেয়ানৌকা চলাচলের ব্যবস্থা, কর নিরূপণ ও কর-



গোবিন্দ মিত্রের মন্দির   [ডেনিয়েল

সংগ্রহ, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠান, প্রভৃতি সকল বিষয়ই কমিটি আলোচনা করেন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বনের নির্দ্দেশ দেন। তিনটি সাব্ কমিটিতে বিভক্ত হইয়া ইহা কার্য্য করিয়াছিল। কমিটি তিনটি রিপোর্টে তাঁহাদের মন্তব্য সরকারে পেশ করেন। প্রথম রিপোর্ট দেওয়া হয় ১৮৪০ সনের জানুয়ারী মাসে, দ্বিতীয়টী ১৮৪৬ সনের আগষ্ট মাসে ও তৃতীয়টি ১৮৪৭ সনের অক্টোবর মাসে। কমিটির সভাপতিত্ব করিয়াছেন বরাবর সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি সর্ জন পিটার গ্রাণ্ট। সর্ জন পিটার ১৮৪৮ সনের মার্চ্চ মাসে অবসর গ্রহণ করেন। কলিকাতা ত্যাগের প্রাক্কালে কৃতজ্ঞ কলিকাতা-বাসীরা তাঁহাকে একখানা অভিনন্দনপত্র দিয়াছিলেন। এই কমিটির, বিশেষতঃ তাঁহার কৃতিত্ব সম্বন্ধে অভিনন্দন-দাতারা বলেন,—

"We hope to realise permanent results in a sensible improvement of the health and comfort of the inhabitants of Calcutta from the establishment of sanitary regulations and a Fever Hospital in the accomplishment of which important objects the city will ever associate your name, with a grateful recollection of the lively interest evinced by you, and the valuable aid afforded in devising a comprehensive scheme of Municipal Administration of our Metropolis. Nor can we omit to mention the active interest you have taken in

the Hospital for 10 years of which Institution you have been for 13 years a distinguished Governor." *

কলিকাতার সর্ব্ববিধ উন্নতিকল্পে ফিভার হসপিটাল কমিটির প্রচেষ্টার কথা এখানে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। এ সম্বন্ধে সভাপতি গ্রাণ্ট সাহেবের কৃতিত্ব ভুলিবার নয়। তবে এ বিষয়ে দেশীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকে, বিশেষ দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রুস্তমজী কাওয়াসজীও খুবই উদ্যোগী ছিলেন। রুস্তমজী গ্রাণ্ট সাহেবের সঙ্গে সহরের নানা স্থানে গিয়া তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি দীর্ঘকাল কলিকাতায় বসবাস করিয়া একেবারে বাঙ্গালী বনিয়া গিয়াছিলেন। বাঙ্গালী-দের দুঃখ দৈন্য দুর্দ্দশা তাঁহার চিত্ত ব্যথিত করিয়া তুলিত। তিনি কমিটির সভ্য হিসাবে সর্ব্বত্র গমন করিয়া নানা তথ্য সংগ্রহ করেন এবং কমিটিতে পেশ করেন। তৎকালীন কলিকাতার একটি পূর্ণ চিত্র তৎপ্রদত্ত বিবয়টি হইতে পাওয়া যায়।

১৮৩৬ সনের জুন মাসে সরকার ফিভার হসপিটাল কমিটিকে একটি সরকারী কমিটি বলিয়া স্বীকার করিয়া লন এবং ইহা পূর্ণোদ্যমে কার্য্য আরম্ভ করে। তখন হইতেই নানা বিষয়ে অনুসন্ধান কার্য্যও চলিতে থাকে। প্রথমেই কলিকাতার ঘরবাড়ীর কথা। আগে বলিয়াছি চিৎপুর রোডের পশ্চিম দিকেই মূল কলিকাতা সহর অবস্থিত ছিল। এজন্য সে যুগের বড় লোকের বাড়ী ও সওদাগরি আফিস গুলি এই জায়গায়ই অবস্থিত ছিল। ক্রমে শহর বাড়িয়া গেলে পূর্ব্বদিকে জনবসতি স্থাপিত হইতে আরম্ভ হয়। দরিদ্র, অর্থান্বেষীরা ক্রমে আসিয়া কলিকাতা শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে থাকে। ঘর বাড়ী নির্ম্মাণের তখনও কোন বাঁধা ধরা নিয়ম হয় নাই। দরিদ্র লোকেরা প্রায়ই চালাঘর করিয়া বসবাস করিত। এই চালাঘরের বিপদ অনেক। খড় বা শনের ছাউনি হওয়ায় চৈত্র-বৈশাখ মাসে অগ্নিদেব ইহার উপরে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিতেন। একবার পুরাতন বালিগঞ্জে চালাঘরে আগুন লাগিলে লালবাজার পর্য্যন্ত যত চালাঘর ছিল সবই এই আগুনে ভস্মীভূত হইয়া যায়। শিয়ালদহ হইতে মাণিকতলা পর্য্যন্ত একবার একইদিনে সব চালাঘর পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল। রুস্তমজী কাওয়াসজী এই সম্পর্কে কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার সময় বলিয়াছেন যে, তিনি বহুবার এইরূপ অগ্নিদেবের তাণ্ডবলীলা স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছেন। ১৮৩৭ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ১লা মে পর্য্যন্ত একটি হিসাবে দেখা যায় – আগুন লাগিয়া কলিকাতার শতকরা পনর খানা চালা ঘর পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়াছে। এইরূপ ব্যাপকভাবে আগুন লাগিয়া গৃহহারা হওয়ায় দরিদ্র অধিবাসীদের কিরূপ দুর্দ্দশা হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। কমিটি, বিশেষতঃ রুস্তমজী কাওয়াসজীর চেষ্টায়, চালা ঘরের বদলে খোলার ঘর নির্ম্মাণের প্রস্তাব সরকার কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হয়। পুলিশ হইতে এই মর্ম্মে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয় যে, নগর মধ্যে কেহ তৃণাচ্ছাদিত গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন না। এ সম্পর্কে 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৫৩, ৪ঠা মার্চ্চ) লেখেন, "... নগরবাসি সম্ভ্রান্ত ইংরাজ, বাঙ্গালী, পার্সি প্রভৃতি সাধারণে এক প্রকাশ্য সভা করিয়া চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ আরম্ভ করিয়াছিল, অর্থাৎ খোলার ঘর করিতে যাহারদিগের নিতান্ত সঙ্গতি না হইবেক তাহারদিগের সেই টাকা হইতে সাহায্য করিবেন, একারণ ঐ সভা হইতে ফায়ার কমিটি নামক এক কমিটিও হইয়াছিল, বিখ্যাত পার্সি বণিক রুস্তমজী কাওয়াসজী তাহাতে বিস্তর টাকা দিয়াছিলেন।" 'সংবাদ প্রভাকর" কিন্তু বলেন যে, এই ১৮৫৩ সালেও এই ব্যবস্থা অনুযায়ী পুরাপুরি কার্য্য হইতেছে না। যাহা হউক, ইহার পরেই যে কর্ত্তৃপক্ষ চালাঘর উঠাইয়া দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সত্তর বর্ষ পরে এখন কিন্তু কলিকাতায় আবার খোলার ঘরও অচল হইয়া পড়িতেছে। কলিকাতার ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট খোলার বস্তি সব একে একে উঠাইয়া দিয়া অনেককে পাকা বাড়ী নির্ম্মাণের সুযোগ করিয়া দিতেছেন।

এই প্রসঙ্গে কলিকাতার জল সরবরাহের কথা আসিয়া পড়ে। যখন আগুনে কলিকাতার বস্তির পর বস্তি একেবারে উজাড় হইয়া যাইত তখন জলাভাবে দমকলগুলি কোন কিছুই করিয়া উঠিতে পারিত না।

* (*The Friend of India*, March 16, 1848.)

রুস্তমজী কাওয়াসজী কমিটিতে বলেন যে, তিনি স্বচক্ষে ইহা দেখিয়াছেন, এবং পরে ঐ অঞ্চলে নিজের জমিদারীতে বহু পুষ্করিণীও কাটিয়া দিয়াছেন। সরকার কিন্তু এদিকে তখনও মনঃ সংযোগ করেন নাই। কলিকাতায় জলের অভাব তখনকার দিনের একটা প্রধান সমস্যা। লালদীঘিই তখন কলিকাতাবাসীর পানীয় জল জোগাইত। পূর্ব্ব অঞ্চলের লোকদের পক্ষে অত দূর হইতে জল আনয়ন করা খুবই কষ্টকর ছিল। তাহারা পচা খানা ডোবার জল ব্যবহার করিত। ফলে অসুখ বিসুখের অন্ত অবধি ছিল না। এই সময় বৈঠকখানা অঞ্চলের বাঙ্গালী ও ফিরিঙ্গীরা একযোগে পানীয় জলের অভাব মোচনের জন্য রুস্তমজী কাওয়াসজী মারফত সরকারে দরখাস্তও করিয়াছিল। জানবাজার হইতে শ্যামবাজারের মোড় পর্য্যন্ত সার্কুলার রোডের দুই পার্শ্বে অতঃপর বহু পুষ্করিণী খনন করাইয়া লোকের জলকষ্ট নিবারণের চেষ্টা করা হয়। পনর বৎসর পূর্ব্বেও মাণিকতলা হইতে শ্যামবাজার পর্য্যন্ত সারকুলার রোডের দুই দিকে এইরূপ বহু পুষ্করিণী দৃষ্টিগোচর হইত। এখন প্রায় সবগুলিই বুজাইয়া ফেলা হইয়াছে। তখনকার জলাভাব মিটাইতে এগুলির প্রয়োজন হইয়াছিল। প্রয়োজন মিটাইয়া তাহারা এখন নিজেরাই কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ঐ সময়কার 'সম্বাদ ভাস্করে' (২রা জ্যৈষ্ঠ, ১২৫১) পাওয়া যায় যে, রুস্তমজী কাওয়াসজী সার্কুলার রোডের পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া জলপ্রণালী আনিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এখন আর ইহার চিহ্নও দৃষ্টিগোচর হইবে না। ইহাও হয়ত অনাবশ্যক বোধে কিছুকাল পূর্ব্বে বুজাইয়া ফেলা হইয়াছে। ফিভার কমিটি জলের অভাব দূর করিবার জন্য নানা উপায় দর্শাইয়াছিলেন। জলের কল প্রতিষ্ঠাও ইহার মধ্যে একটি।

উন্মুক্ত নর্দ্দমা, স্বল্প পরিসর রাস্তা, জল নিষ্কাশন প্রণালীর অভাব, প্রভৃতি মিলিয়া তখনকার কলিকাতা বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল। লটারি কমিটি রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণে কিরূপ যত্নবান্ হইয়াছিলেন আগেই বলিয়াছি। কিন্তু তাহা সংরক্ষণের সুব্যবস্থা না থাকায় এবং ক্রমশঃ জনবহুল শহরে অলিগলি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় নানারূপ অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। ফিভার হস্পিটাল কমিটির অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য হইয়াছিল শহরের স্বাস্থ্যকর আবহাওয়াই সৃষ্টির উপায় নির্দ্দেশ করা। কমিটির সভাপতি সর্ জন পিটার গ্রাণ্ট ও অন্যতম সভ্য রুস্তমজী কাওয়াসজী শহরের যে অংশে ঘন বসতি তাহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দেন।

"কলেজ ষ্ট্রীটের কাছাকাছি কতকটা জায়গা ছাড়া এই অঞ্চলের সর্ব্বত্রই ঘনবসতি। বাড়ী ও দোকান ঘরগুলি পাশাপাশি অবস্থিত। বাড়িগুলি একেবারে গা ঘেঁসিয়া থাকায় আলো-হাওয়ার প্রবেশ পথ একরূপ রুদ্ধ। রাস্তাগুলি সরু, আঁকাবাঁকা ও ঘোরালো। একারণ বায়ুর গতি পদে পদে প্রতিহত। রাস্তার দৈর্ঘ্য পোয়া মাইলেরও কম, এবং ইহা কদাচিৎ বার ফুটের অধিক প্রশস্ত। এই বার ফুটের প্রায় তিন ফুট জুড়িয়া পচা জল ও আবর্জ্জনাপূর্ণ দু'তিন ফুট গভীর নর্দ্দমা। এই নর্দ্দমার উপরিভাগ তক্তা দ্বারা ঢাকা—মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ ফাঁক দৃষ্ট হয়। ইহার উপর দিয়া গৃহে প্রবেশের পথ, আবার অনেক স্থলে ইহার অব্যবহিত পার্শ্বেই এক হইতে তিন ফুট উঁচুতে দোকান ঘর তৈরী হইয়াছে, উপরিস্থ সেতুই প্রকৃত প্রস্তাবে দোকান-ঘরের নির্ভর হওয়ায় নর্দ্দমা কখনও পরিষ্কার করা সম্ভবপর হয় না। মাঝে মাঝে যে ফাঁক আছে তাহা হইতে অনবরত দুর্গন্ধ বাহির হয়। এজন্য কি রাস্তায় কি বাড়ীতে কোথাও তিষ্ঠিতে পারা যায় না।"

বর্ষাকালের দুরবস্থা সম্বন্ধে রুস্তমজী এইরূপ লেখেন যে, তিনি বর্ষাকালে বহুবার এই অঞ্চলে গমন করিয়াছেন। অল্প বারিপাতেই এই অঞ্চলের নর্দ্দমাগুলি পূর্ণ হইয়া যায়, জল নিষ্কাশনের পথ একরূপ না থাকায় রাস্তায় দুই এক ফুট জল জমিয়া যায়। জল নিঃসরণ হইতে প্রায় আট ঘণ্টা সময় লাগে। এই সময়ে জলের ভিতর দিয়াই যাতায়াত করিতে হয়। এ অঞ্চলের বাড়িগুলি রাস্তার ইঞ্চি কয়েক নিম্নে অবস্থিত। কাজেই জলে বাড়ীর নিম্নভাগ অনেকক্ষণ ডুবিয়া থাকে, ফলে ইহা খুবই অস্বাস্থ্যকর হয়।

পাঠক শত বর্ষ পূর্ব্বেকার অবস্থার সঙ্গে আজিকার ঠনঠনিয়া কালীতলার অবস্থার তুলনা করিতে পারেন। আজও অধিক বারিপাত হইলে, জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা সত্ত্বেও কেন জল ঘণ্টার পর ঘণ্টায় জমিয়া থাকে ভাবিবার বিষয়।

মূলতঃ দরিদ্র জ্বর রোগীদের সুচিকিৎসার জন্য ফিভার হস্‌পিটাল কমিটি গঠিত হয়। সাত জন গণ্যমান্য বাঙ্গালী এই উদ্দেশ্যে ষোল হাজার টাকা দান করেন।* ১৮৪৭ সনে চাঁদার পরিমাণ আটষট্টি হাজারে দাঁড়ায়। ফিভার হস্‌পিটাল কমিটির উদ্দেশ্য ব্যাপক হইয়া পড়ায় হাসপাতাল স্থাপনের ভার শিক্ষা-পরিষদের (Council of Education) উপর অর্পণ করে। মতিলাল শীল প্রদত্ত বার হাজার টাকা মূল্যের একখণ্ড জমির উপর বড়লাট লর্ড ডালহৌসী ১৮৪৮ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর এই হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ইহাই এখনকার প্রসিদ্ধ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

ফিভার হস্‌পিটাল কমিটির শেষ রিপোর্ট সরকারে পেশ করা হয় ইংরেজী ১৮৪৮ সনে। কিন্তু ইহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী কার্য আরম্ভ হইতে বার বৎসর কাটিয়া যায়। ইতিমধ্যে ১৮৪৭ ও ১৮৫৬ সনে পৌর শাসন সংক্রান্ত দুইটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। ইহার ফলে পৌর সংস্কার কার্য্য কতকটা নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে। ইহার পর দ্রুত আরম্ভ—দুইটি আইন পাশ হইল। কলিকাতা শহর সংক্রান্ত সমস্ত টাকা কড়ির ভার দেওয়া হইল একটি কর্পোরেশনের উপর। কর্পোরেশন কথাটি এই সময় হইতেই চলন হয়। ১৮৫৯ সনে মৃত্তিকাভ্যন্তরে নর্দ্দমা খননের ও রাস্তায় আলো দানের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা সুরু হয়। ষোল বৎসর পরে এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হয়। বড় রাস্তাগুলির তলায় আটত্রিশ মাইল পরিমিত ইষ্টকের জল নিষ্কাশন প্রণালী এবং ছোট অলিগলিতে এই জন্য সাঁইত্রিশ মাইল পরিমিত নল স্থাপিত হইল! এক শত পাঁচ মাইল পরিমিত রাস্তায় আলো দিবারও ব্যবস্থা হইল এই সময়ে! ফিভার হস্‌পিটাল কমিটির প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ১৮৭৬ সনে নূতন কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা অবধি এই চল্লিশ বৎসরের মধ্যে কলিকাতার রূপ একেবারে বদলাইয়া গেল। ইদানীং ইহার রূপ এত দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইতেছে যে, অল্প সময়ের ব্যবধানেও তাহা চক্ষে ধরা পড়িয়া যায়।

কলিকাতার যেমন রূপ বদলাইয়াছে, কলিকাতাবাসীরও আচার ব্যবহারে অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যাইতেছে। আগেকার অন্তর্জ্জলী প্রথা এখনকার



রাইটার্স বিল্ডিংস্ [ডেনিয়েল

* ইহারা যথাক্রমে—রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় (২,০০০৲), রাজচন্দ্র দাস (২,০০০৲), দ্বারকানাথ ঠাকুর (৫,০০০৲), মথুরানাথ মল্লিক (২,০০০৲), রুস্তমজী কাওয়াসজী (৩০০০৲), প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১,০০০), মাধব দত্ত (১,০০০৲)।

লোকে প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছে। কলিকাতায় পাল্কীর চলন হইল খুব। সম্পন্ন ঘরের মহিলারা পাল্কীতে করিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেন, আত্মীয়ের বাড়ী যাইতে হইলেও পাল্কী ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। আজ কলিকাতাবাসীর নিকট পাল্কী একটি অদ্ভুত জিনিষ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শোভাবাজার রাজবাটীতে একটি ভগ্ন পাল্কী দেখিয়াছিলাম। যান-বাহনের আজ কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনই না হইয়াছে। আমোদ-প্রমোদেরও রূপান্তর ঘটিয়াছে। বাইনাচ-সম্পন্ন গৃহস্থের একটি প্রকৃষ্ট আমোদের বিষয় ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের মাণিকতলা বাড়ীতে বাইনাচ হইয়াছিল। দেশী বিদেশী গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকিয়া তাহাতে বিশেষ আমোদ উপভোগ করিতেন। যাত্রা-গান কলিকাতাবাসীদের একটি প্রধান আমোদ প্রমোদের বস্তু ছিল। পোষাক পরিচ্ছদও শতবর্ষ পূর্ব্বে অন্য ধরণের ছিল। কলিকাতার রূপ ও কলিকাতাবাসীর আচার-ব্যবহার ক্রমেই বদলাইয়া যাইতেছে।



সুপ্রভাত

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

নূতন বছরের নূতন দিন ভালো ভাবেই দেখা দিল। সুপ্রভাতই বটে।

চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছি, ঘুম আসিতেছে না। রাত্রি এখন মধ্যপ্রহরে আসিয়াছে। পুরাণো বছরের যাত্রা সমাপ্ত হইতে চলিল, ক্ষণপরেই নূতন বছরের হাতে কালের চাকাটা তুলিয়া দিয়াই তার ছুটি। ভাবিতেছিলাম,—আকাশের কোন সীমানায় এ হাত বদল হইবে, কোনখানে একের যাত্রা সমাপ্তি ও অপরের যাত্রা সুরু হইবে? কোন কালপুরুষের সজাগ দৃষ্টির তল দিয়া সময়ের এই আহ্নিক আবর্ত্তন? সময় তাঁর সম্মুখ দিয়া নিরন্তর আগাইয়াই যাইতেছে, অথচ তাঁকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না! আরও ভাবিতেছিলাম,—কোথা হইতে এত সময় আসে, আর কোথায় গিয়াই বা এত সময় সঞ্চিত হয়?

উপরে দোতালায় আলো জ্বলিতেছে, আমার জানালার উপর তার উজ্জ্বল ছায়া পড়িয়াছে। সদর দরজা খোলার শব্দ হইল। কাণ খাড়া করিলাম, এত রাত্রে কে আসে! তিন চার জন লোকের পায়ের শব্দ পাইলাম, তাহারা সন্তর্পণে সিঁড়ী দিয়া উপরে উঠিয়া গেল। একটা কথা কাণে আসিল—"ইন্‌জেক্‌সনের বাক্সটা আছে তো!"—ডাক্তার আসিয়াছেন।

উপরের ছোট মেয়েটি দিন পনর হয় জ্বরে ভুগিতেছে। মা নাই, মাম্মাদের কাছে থাকে। মাসীকে ছোট মা বলিয়া ডাকে, মাসীই মানুষ করিতেছেন। মাসী কলেজে পড়েন, আর মেয়ে মানুষ করেন, এখনও বিবাহ হয় নাই। নিজের গর্ভে সন্তান ধরিবার আগেই সন্তান পাইয়াছেন। পনর দিন পনর রাত্রি পক্ষিণীর মত মেয়েকে আগলাইয়া রাখিয়াছেন। ইতি মধ্যেই দীর্ঘ জাগরণে ও পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, মেয়েকে বুকে করিয়া সময়ের সঙ্গে তবু সমান চলিতেছেন—নূতন বছরের সীমানায় পৌঁছিতেই হইবে যে।

মেয়েটির অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃত্যু বোধ হয় ডাক দিয়াছে—'প্রভাত হবে তোমার রাতি'।

সেদিনও মেয়েটি সারা বাড়ীটা একাই চঞ্চল করিয়া রাখিত। হৈ-চৈ ছুটাছুটি, মাতামাতিতে বাড়ীটাকে শান্ত হইবার আর সুযোগই দিত না। যেমন স্বাস্থ্য, তেমন রং। বাঙ্গালী মেয়ের এরকম গায়ের রং আমি দেখি নাই, রং যেন ফাটিয়া পড়ে। এক মাথা কোঁকড়া চুল লইয়া আট বছরের মেয়েটি একাই একই সময়ে বাড়ীর সর্ব্বত্র বিরাজ করিত।

মাসী ধমক দিতেন—"অঞ্জু?"

—"কি ছোট মা?"

—"কি হচ্ছে? দুষ্টুমি করছ?"

—"না, ছোট মা, দুষ্টুমি করছি নে। উপর থেকে নীচে নামছি।"

—"ও ভাবে নামে? মাথা ফেটে যাবে যে।"

—"না, ফাটছে না তো।"

সিঁড়ীর রেলিং-এ ঘোড়া চাপিয়া দোতালা হইতে এক তলায় সংক্ষেপে নামিবার সোজা রাস্তা সে আবিষ্কার করিয়াছে, সেই রাস্তাতেই আপাততঃ তার বারম্বার অবতরণ হইতেছে।

ছোটমার গলা শোনা যায়—"দাঁড়াও, তোমার দিদিমণিকে বলে দেব।"

—"দিদিমণি আমাকে কিছু বলে না, ভালোবাসে।"

—"আদর দিয়ে মেম বেটী তোর মাথা খেয়েছে। দাঁড়াও, আমি আসছি।"

স্কুলের দিদিমণির নামে যখন কোন ফল দেখা যায় না, তখন বাধ্য হইয়া মাসীকেই নামিয়া আসিতে হয়।

মাসী কাছাকাছি আসিতেই রেলিংএর ঘোড়া হইতে নামিয়া ছোটমার কোলে সে ঝাঁপাইয়া পড়ে। আটবছরের মেয়ের বেগ ক্ষীণাঙ্গী ছোটমা সামলাইতে পারেন না, কোন মতে দেয়াল ধরিয়া পতন হইতে রক্ষা পান, বলেন—"ছাড়, ছাড়, ফেলবি নাকি! বাবা, কি দস্যি মেয়ে"—ছোটমা শ্বাসের গতি স্বাভাবিক করিতে ব্যস্ত হন, মেয়ে তখন অন্য ভাবে ছোটমাকে আক্রমণ করে। ছোটমার কোমর দুই হাতে বেষ্টন করিয়া বলে—"দাঁড়াও, ছোটমা, তোমাকে কোলে তুলছি!"

—"থাক্ বাপু, আমার অত কোলে উঠবার সখ নেই।"

কিন্তু মেয়ের সখ আছে, তাহাই যথেষ্ট, অপরের সম্মতির আবশ্যক করে না।

ছোটমা রেলিং ধরিয়া চীৎকার করেন—"আরে, ছাড় ছাড়্ প'ড়ে যাব। ও দাদা, অঞ্জুকে বারণ কর। লক্ষ্মী ছাড়া, ছেড়ে দে।" উপরের বারান্দা হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দাদা জিজ্ঞাসা করেন—"কি রে কি হোল? না বাপু, ওর মধ্যে আমি নেই।"

অঞ্জলি চীৎকার করিয়া উর্দ্ধমুখে ঘোষণা করে—"বড় মামা! দেখ, ছোটমাকে কোলে নিয়েছি।" বড়মাকে বলার প্রয়োজন ছিল না, তিনি নির্ব্বিকার বটে, কিন্তু দ্রষ্টা হিসাবে বেশ মজা উপভোগে কোন আপত্তি তাঁর নাই দেখা যাইত। মেয়ের হাত হইতে কোন মতে ছাড়া পাইয়া ছোটমা বলিতেন—"পাজী মেয়ে কোথাকার!" বলিয়া কাণ দুটি মলিয়া দিতেন, ঈষৎ মর্দ্দনেই সুন্দর কাণ দুটি রক্তবর্ণ হইয়া যাইত। যাইবার সময় মেয়েকে কোলে করিয়া উপরে উঠিতে হইত, তিনি নালিশ জানাইতেন—"এত বড় হয়েছিস, কোলে লজ্জা হয় না। নাব, পারিনে—" কিন্তু নামাইয়া দিতেন না, এ ভার বহনে যত কষ্ট ততই যেন আনন্দ।

আমার ঘরেও অঞ্জলি ঝড় লইয়া আসিত। সমস্ত ঘরটা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিত, জিনিষপত্র ছত্রখান করিয়া রাখিয়া তবে বিদায় লইত। কখনও কোলের উপর চাপিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিত—"তোমার মা নেই?"

—"না, আমার মা নেই।"

—"ছোটমাও নেই?"

—"না, ছোটমাও নেই।"

আমার মা নাই, ছোটমাও নাই—আমার দুর্ভাগ্যে মেয়েটির ছোট্ট বুকে ব্যথা লাগিত, বড় বড় চোখ দুটি ছল ছল করিয়া উঠিত। কিন্তু এ শোক ও সহানুভূতি শরৎ মেঘের মতই ক্ষণস্থায়ী। ক্ষণপরেই হয়তো বলিত, কিম্বা আমার দুঃখ ভুলাইবার ছলনা ওর,—"আমাকে হাতের উপর দাঁড় করাও তো, দেখি তোমার গায়ে কত জোর।"

আদেশ অমান্য করিবার শক্তি থাকিতনা, পায়ের জোরের পরীক্ষা দিতেই হইত। ছুই হাত পাতিয়া রাখিতাম, ছুই পা ছুই হাতে রাখিয়া মেয়েটি দাঁড়াইয়া আমার মাথা ধরিয়া সোজা হইয়া থাকিত, পরে বলিত—"হুঁ, এখন তোল দেখি।" ছুইটি ছোট্ট পা আমার মুঠার চাপে লাল হইয়া যাইত, হাতে তাহার দেহভার লইয়া দাঁড়াইতাম। রক্তমাংসের একটি জীবন্ত পদ্মের মতই আমার হাতের উপর সে দাঁড়াইয়া আছে, দেখিয়া বার বার মনে হইত। তারপর হয়তো হুকুম হইত—"কাঁধে তোল।" এ আদেশ ত অমান্য হইত না। এত প্রাণ, এত স্বাস্থ্য ও এত সৌন্দর্য্য সামান্য মাংসপিণ্ডে কি কৌশলে বন্দী আছে—চলিয়া গেলে ভাবিতে বাধ্য হইতাম।

সেই প্রাণ ও সেই স্বাস্থ্য রোগের মুঠার মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমার ছুই হাতে যে অঞ্জলি দাঁড়াইত, রোগের কঠিন হাতে সে অঞ্জলিকে দেখা যাইবে না,—পনর দিন পনর রাত্রি ছুই হাতে প্রাণ-পেষণ করিয়া জীবিত অঞ্জলিকে মৃতের কঙ্কালের প্রায় কাছাকাছি করিয়া আনিয়া ফেলিয়াছে। রোগে এমনভাবেই মেয়েটিকে নিংড়াইয়াছে। ছোটমা বুকে করিয়াই রাখিয়াছেন;—বুকের স্নেহ-ভালবাসা অফুরন্ত হইতে পারে, কিন্তু রক্তমাংসের খাঁচার ভারবহন-ক্ষমতা অসীম নয়। তা ছাড়া, কোন মানুষই আজ পর্য্যন্ত মৃত্যুর মুঠা হইতে আপন জনকে ছিনাইয়া লইতে পারে নাই। অবুঝ মন জানিয়াও এ সত্য স্বীকার পায় না, যতবারই না কেন সে পরাস্ত হউক।...ছোট মা উপরে দোতালায় জাগিয়া মেয়ে পাহারা দিতেছেন, ঘুমাইলে তাঁর চলে না, হয়তো চোর আসিতে পারে। রাত্রি মধ্য প্রহর পার হইয়াছে, বিছানায় জাগিয়াই আছি, চোখে কি আজ আর ঘুম আসিবেনা?

এক সময়ে কি একটা শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। রাত্রি আর বাকী নাই, নূতন বছরের ভোর প্রায় আসন্ন। দোতালায় কে যেন ডুকরাইয়া একবার কাঁদিয়া উঠিল। বিছানায় উঠিয়া বসিলাম;—মৃত্যু তবে এতক্ষণে অঞ্জলিকে তার ঠাণ্ডা হাতে ছুঁইতে পারিয়াছে। বড় মামার কান্না-ভারাক্রান্ত গলা শুনিলাম—"ওঃ"—যেন তাঁর পিঠে হঠাৎ ঘাতকের ধারালো ছুরির আধখানা ঢুকিয়া গিয়াছে!

বাহিরের দিকে একটা ঘর লইয়া থাকি, ভিতরে বড় বিশেষ যাই না, দরকারও হয় না। মৃত্যু যেখানে দুয়ার ভাঙিয়াছে, সেখানে সবারই অবারিত প্রবেশ। মৃত্যুর চাইতে মানুষ অবাঞ্ছিত অতিথি নয়, সে মানুষ যদি পশুর চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়, তবু সে মানুষই।

সিঁড়ী দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। আমার আগে আগে একতলার ভাড়াটে ভদ্রলোক ও তাঁর বৃদ্ধা মা উপরে উঠিতেছিলেন। দুজনে গিয়া ঘরে ঢুকিলেন, দরজায় গিয়া দাঁড়াইলাম, ভিতরে ঢুকিতে ইচ্ছা হইল না। ডাক্তার রোগীর বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, হাতে ইন্‌জেক্‌সনের যন্ত্র, শেষ চেষ্টা করিয়া তিনি সরিয়া আসিলেন।

অঞ্জলিকে চেনা যায় না, মাথায় সে কালো এক রাশ চুল নাই, সে রং নাই, বিবর্ণ চামড়ায় ঢাকা রোগা একটা শরীর পড়িয়া আছে। ছোটমা পাশে বসিয়া, মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়াই আছেন। মেয়ের তখন নাভিশ্বাস চলিতেছে। নাভি হইতে শ্বাস সরিয়া আসিয়া কণ্ঠাগত হইল। প্রাণপণে সমস্ত শক্তি দিয়া অঞ্জলি বাতাস নিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই পারিতেছে না। পৃথিবীতে এত বাতাস, তবু এক

কৌটা বাতাস পাইতেছে না, তার জন্য কী পরিশ্রম! পরিশ্রমে নাকের ডগাটা ভাঙিয়া গিয়াছে, চোখের তারা ঊর্দ্ধ দৃষ্টি লইয়াছে। বাতাসের জন্য অঞ্জলি শেষ চেষ্টা করিল, কিন্তু কোথায় কি কঠিন নিষেধ রহিয়াছে, এত বড় পৃথিবীর এত বাতাসের সামান্য একটু বাতাস তাকে দেওয়া গেল না। সামান্য শিশু, কতই বা আর বিদ্রোহ-শক্তি, অঞ্জলি চিরদিনের জন্য শান্ত হইয়া গেল। সামান্য একটু শব্দ, মানুষের কোন গভীর ও গোপন স্থান হইতে এ রকম শব্দ জন্ম নেয় জানি না,—কি করিয়া ছোটমাও পাশেই শুইয়া পড়িলেন। তাঁর খেয়াল ছিল না যে তাঁর হাতটা মেয়ের মুখটা চাপা দিয়াছে।

ঘরে মৃত্যু আসিয়াছে। নানারকম কান্নায় ঘরটা ভরিয়া গেল, স্ত্রী পুরুষ সকলেরই কান্নার সুর মৃত্যুকে বেষ্টন করিতে চলিয়াছে। বড় মামার গলা শোনা গেল—ওঃ, গুপ্ত ছুরির সবটাই এবার বিদ্ধ হইয়াছে। এত কান্নার মধ্যেও শোনা গেল নীচে একটা গোঙানি উঠিতেছে। লোকটি নিজে উপরে উঠিয়া আসিতে পারে নাই,—তাই ক্রন্দনটাকে পাঠাইয়া দিয়াছে। নীচের তলার ভাড়াটে ভদ্রলোক দ্রুত পায়ে আমার পাশ কাটাইয়া নীচে নামিয়া গেলেন। দেয়ালের বড় আয়নায় চোখ পড়িল, মা ও মেয়ের ছবি সেখানে গিয়া পড়িয়াছে, একজনের ঘুম হয়তো ভাঙিবে, কিন্তু অঞ্জলিকে আর জাগানো চলিবে না।

—"ডাক্তার বাবু, ডাক্তার বাবু, একবার নীচে আসুন।" নীচের তলার ভাড়াটে ভদ্রলোকের গলা। সারা ঘরটা তার লোকজন লইয়া আঁতকাইয়া উঠিল। বুক ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল—এখানেও কি মৃত্যু প্রবেশ করিয়াছে? বৃদ্ধা মা নীচে চলিলেন, ইচ্ছা যত গতি তত দ্রুত করিয়া লইতে পারিলেন না। ডাক্তারবাবুও নীচে নামিলেন, পিছনে পিছনে নামিয়া আসিলাম।

ডাক্তার ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন—"কোন ভয় নেই, তাড়াতাড়ি গরম জল করে আনুন। সরুন দেখি।" খোলা দরজা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, ভাড়াটে ভদ্রলোকের স্ত্রী মেঝের উপর পড়িয়া আছেন, রক্তে সমস্ত স্থানটা ভাসিয়া গিয়াছে। পাশেই সদ্যোজাত এক শিশু, রক্তে রাঙা হইয়া আছে। শিশুটি কাঁদিয়া উঠিল—ওঁয়া-ওঁয়া-ওঁয়া। উপরের কান্নার সঙ্গে এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা মিল কোনটা রহিয়াছে—প্রশ্নটা মাথায় লইয়া সরিয়া আসিলাম।

সদর দরজা খোলাই ছিল, বাহির হইয়া পড়িলাম। রাস্তায় লোক চলাচল সুরু হইয়াছে। বড় রাস্তায় আসিলাম। পূব দিকের আকাশে দেখিলাম নূতন বৎসরের প্রথম সূর্য্য উঠিতেছে। চারিদিকে রক্ত রং ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তার মধ্যে লাল সূর্য্য, একতলার ঘরে রক্তের মধ্যে সদ্যোজাত শিশুরই আর এক ছবি।……উপরে দোতালায় অঞ্জলির মৃত শরীর জড়াইয়া ছোটমা পড়িয়া আছেন। কোনটা সত্য—সদ্যোজাত শিশু না অঞ্জলি? কে বড়—জীবন না মৃত্যু?—সূর্য্য এখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে, দুই হাত কপালে তুলিয়া বৎসরের প্রথম সূর্য্যকে প্রণাম করিলাম—"সুপ্রভাত।"



চলন্তিকা

'সম্বুদ্ধ'

ঈশ্বর আছেন।

উপর্য্যুপরি অচেতনতা ও কাণ্ডজ্ঞানহীনতার প্রমাণ দিয়া দিয়া তিনি মানুষকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিলেন; অস্তিত্ব তাঁহার যদি-বা অক্ষুণ্ণ থাকে, মস্তিষ্ক সুস্থ আছে কিনা ভাবিয়া সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু অন্তর্যামী তিনি, সেকথা তাঁহার কাছে গোপন রহে নাই। ঠিক মোক্ষম সময়টি বুঝিয়া তিনি আমাদের শিরে তাঁহার করুণস্নিগ্ধ ধারা বর্ষণ করিয়াছেন, এবং অকাল শ্রাবণের দিক্‌প্লাবী জলধারায় আমাদের মনের সমস্তটুকু দ্বিধা ও সংশয় নিঃশেষে ধোয়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহার জয় হউক।

সংকল্প অবশ্য তাঁহার আরও বৃহৎ, আরও মহৎ ছিল; কেবল আমাদের সংশয়াকুল মনকে নহে, আমাদের কালিমাচ্ছন্ন চরিত্রটাকেই তিনি ধোয়াইয়া পরিচ্ছন্ন করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। সে উদ্দেশ্য হয়তো সফল হয় নাই, কিন্তু তবুও সে অপরাধ তাঁহার নয়।

এবং মানুষের মনকে সাফ করিবার মহান্ লক্ষ্য লইয়া ভিস্তিগিরি করাও তাঁহার এই প্রথম নয়। রামগড়ের বৃষ্টি পৃথিবীতে প্রথম ও অভিনব ঘটনা নয়, ইতিহাসের অলঙ্ঘ্য পুনরাবৃত্তি মাত্র।

······বাইবেলের বৃত্তান্ত স্মরণ করুন। মানুষের কুরুচি ও কুবুদ্ধিতে ঈশ্বর পীড়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন; একেবারে যখন অসহ্য লাগিল তখন তিনি ক্ষেপিয়া গেলেন, কহিলেন সুখের চেয়ে আমার স্বস্তি ভাল, এই নচ্ছার সৃষ্টিকে আমি ধ্বংস করিব। বলিয়া তিনি সমুদ্রের জল ফাঁপাইয়া তুলিলেন, আকাশ ফুটা করিয়া বাল্‌তি বাল্‌তি জল ঢালিয়া দিলেন, মহাপ্লাবনে পৃথিবী ভাসিয়া গেল।

অথচ গোড়ার ভুল তাঁহার নিজেরই। সমস্ত জীবজন্তু সৃষ্টির শেষে তিনি মানুষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং ঠিক তাহার পূর্বেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন বানরের। বস্তুত বানরের লেজটা কমাইয়া এবং নাকটা বাড়াইয়া মানুষ বানানো হইয়াছিল। তারপর ক্ষণিক মোহের বশে সেই মানুষের মধ্যে ঈশ্বর বুদ্ধির সঞ্চার করিলেন, সেটা আসিল তাঁর নিজের ভাণ্ডার হইতে। তাঁহার আশা ছিল, বুদ্ধির বলে মানুষ তাঁহার সমবর্তী হইয়া উঠিবে, দেহস্থ পশুপ্রবৃত্তিকে জয় করিয়া অবলুপ্ত করিয়া দিবে। সেই ভরসায় তিনি মানুষের হাতে পৃথিবী শাসনের ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতেও সঙ্কুচিত হন নাই।

কিন্তু তাঁহার সৃষ্টি খারাপ, তিনি কেমিষ্ট্রী জানিতেন না। তাই একথাটাও জানিতেন না যে বুদ্ধি বস্তুটা কঠিন পদার্থ নহে, সেটা জলীয় এবং তরলপদার্থের স্বভাব অনুসারে স্বতই আধারের রূপ ধারণ করে। বানর হইতে মানুষের দেহ উদ্ভূত হইয়াছিল, ঐশ্বরী বুদ্ধি সেই দেহের প্রভাব ও প্রকৃতিকে এড়াইতে পারিল না, অনায়াসে এবং অক্লেশে বাঁদুরে বুদ্ধিতে দাঁড়াইয়া গেল। সেই বুদ্ধির বশেই মানুষেরা পরস্পর দন্ত কিচ্‌কিচি করিয়া মরিতেছিল।

ঈশ্বর এতটা তলাইয়া দেখিলেন না। উচিত ছিল তাহার মানুষের বুদ্ধিকেই হরণ করা, তাহা না করিয়া তিনি তাহাকে প্রাণে মারিতে গেলেন, মহাপ্লাবনের সৃষ্টি করিলেন। তখনও তাহার বুদ্ধিটাকে আচ্ছন্ন করিয়া লওয়া প্রয়োজন, এ কথাটা তাঁহার মাথায় আসিল না। মানুষ অগত্যা তাঁহার শিলনোড়া দিয়াই তাঁহার দাঁত ভাঙিল—তাঁহার প্রদত্ত বুদ্ধি খাটাইয়াই সে জাহাজ বানাইয়া আত্মরক্ষা করিল। কেবল তাই নয়, যে কুরুচি, হীনতা ও কদর্যতা দেখিয়া ঈশ্বর বিরূপ হইয়াছিলেন, তাহার প্রতিটি প্রকারের বীজ ও বীজাণু সে সেই জাহাজে তুলিয়া অতি যত্নে আগ্‌লাইয়া বাঁচাইয়া রাখিল। মহাপ্লাবনে ম্যামথ মরিয়াছে, ডাইনোসর মরিয়া লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু মশা মাছি এবং ছিনে জোঁক মরে নাই। নেয়ার জাহাজে মহামহীরুহ কর্ডাইটিসের স্থান হয় নাই, কিন্তু বিছুটি গাছ এবং কচুরীপানা আজও সগৌরবে বাঁচিয়া আছে। মানুষের অপরাধ নাই, তাহার বুদ্ধি ও বিবেচনা দিয়া সে যেগুলাকে তাহার আত্মীয় মনে করিয়াছিল তাহাদেরই সে বাঁচাইতে চাহিয়াছে। বুদ্ধি ও প্রবৃত্তিই যদি তাহার হীন হয়, সে ক্রটি তাহার একার নয়, যিনি সেই বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি যোগাইয়াছেন তাঁহারও।

* * * *

তারপর যুগে যুগে বহুবার বহুস্থলে এই মহাপ্লাবনের পুনরভিনয় ঘটিয়াছে। সংকল্পে বিফল হইয়া ঈশ্বরের আক্কেল হয় নাই। যে অস্ত্র একবার শক্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইল বা অন্ধ আক্রোশে তিনি বারবার তাহারই বৃথা প্রয়োগ করিয়া চলিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রে, লঙ্কায়, ক্রিমিয়ায়, ইউরোপে বারংবার তিনি মহাযুদ্ধ ঘটাইয়াছেন, প্লাবনে দুর্ভিক্ষে মহামারীতে দেশে দেশে হাহাকারের স্রোত বহাইয়াছেন, কিন্তু মানুষের চরিত্রকে সংশোধিত করিতে পারেন নাই। আঘাতে উৎপীড়নে তাহাদের সংখ্যাই সুধু কমিয়াছে, হীনতা কমে নাই, কারণ সে আঘাতকে এড়াইয়া যাইবার পথ তাহার খোলা ছিল।

* * * *

রামগড়েও তাহাই ঘটিয়াছে। ভারতের জাতীয়তাবোধ এবং জাতীয়তাবাদ হিংসা দ্বন্দ্ব কলহের কলঙ্কে কুৎসিত পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে—বৃষ্টির জলে চুবাইয়া সেই হিংসাদ্বন্দ্বের উত্তাপকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিতে সেই হীনতার পঙ্কাবরণকে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দিতে তিনি বৃষ্টি নামাইয়াছিলেন। কিন্তু ফল কিছুই হইল না, নির্যাতন যেটুকু যাইবার গেল নিরীহ ও নিষ্পাপ সেবকদের উপর দিয়া। যে নেতারা এই পঙ্কিলতার জন্মদাতা তাঁহাদের ছাতা আছে, বর্ষাতি আছে, মঞ্চের উপরে ভূমি হইতে বহু উচ্চে স্থির আসন আছে, এবং মোটর-গাড়ি আছে। বর্ষার জলে তাঁহাদের জুতার তলাও ভিজিল না, তাঁহারা পরম নিরুদ্বেগে উচ্চ মঞ্চে বসিয়া রহিলেন এবং তারপর মোটর গাড়ি করিয়া দূরে গৃহাশ্রয়ে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। মধ্যখান হইতে ভিজিয়া মরিল নিষ্পাপ নির্বিরোধ সেবক ও দর্শকের দল—দেশসেবার ও করতালির মহাভোজে এই হরিজনদের স্থান চিরকালই ভূমিতলে নির্দিষ্ট হইয়া আছে, জল এক কোমর হইলেও গ্যালারি বহিয়া উঠিয়া

আত্মরক্ষা করিবার অধিকার ও অবসর ইহাদের নাই। দেশসেবার ক্যাপিটালিজ্‌মে ইহারাই প্রকৃত প্রোলেটারিয়াট্।

কেবল ইহারা মরে বলিয়াই দুঃখ নয়। ইহারা মরিতে জন্মিয়াছে, ম্যালেরিয়ায় মরিবার বদলে যদি নিউমোনিয়ায় মরেই, তাহাতে জগতের ক্ষতিবৃদ্ধি কোনদিকেই কিছু নাই। বরং কংগ্রেসী বৃষ্টির ঝাপ্‌টায় মরিলেই ইহাদের উপবাস-শীর্ণ মন কিছুটা তৃপ্ত হইবে; ক্ষণিকের জন্যও সেই হতভাগ্য নিজে এবং তাহার আত্মীয়স্বজনরা মনে করিবে, প্রাণটা তাহার দেশসেবাকে উপলক্ষ্য করিয়াই গেল। সেই কাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর মহান গৌরবে মন তাহাদের পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে; হয়তো খড়ো ঘরের ভাঙা বেড়ায় মা কালী এবং লক্ষ্মীদেবীর পটের পাশে সেই বঞ্চিত তৃষাশীর্ণ হতভাগ্যের একখানি জীর্ণ মলিন ফোটোগ্রাফ তাহারা টাঙাইয়া রাখিবে, হয়তো-বা দৈবাৎ বৎসরে একদিন সেই ফোটোটাকে তাহারা দু'টি গাঁদাফুল ও এক ছিটা চন্দন দিয়া সাজাইয়া সম্বর্ধনা করিবে।

জীবন আমাদের দৈন্যে জর্জর, তাই কল্পনাও আমাদের দীন ও অনাহারক্লিষ্ট। অহেতুক মৃত্যুর কুহেলিকায় পরিবৃত হইয়া যে মানুষ অকস্মাৎ মহিমা-মণ্ডিত হইয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দেয় তাহার গৌরবে আমরাও স্ফীত হইয়া উঠি। কিন্তু এই মৃত্যুর মধ্যে সান্ত্বনা থাকিতে পারে, ইহার সার্থকতা কোথায়? প্রাণ যাহারা দিয়া তৃপ্ত হইল তাহাদেরই জয়; কিন্তু সেই মৃতদেহের সোপান যাহাদের জন্য রচিত হইল, তাহারা সে সোপান বাহিয়া চলিয়াছে কোন্ দিকে? ঊর্দ্ধে উন্মুক্ত আকাশের পথে আলোকের অভিমুখে, না নিম্নে অতলগহ্বর অন্ধকারের পথে, সর্বনাশের অভিযানে? সুকুমার ও জ্যোতির্ময়ের মৃত্যু নির্দেশ দিতেছে কোন্ পথের?

* * *

এইটারই দিশা পাইতেছি না, থাকিয়া থাকিয়া মনে দ্বন্দ্ব লাগিতেছে। অগণিত নগণ্য দীনহীন কর্মী ও সেবকের স্কন্ধে ভর করিয়া রাজনীতিক অভিযানের জগদ্দল রথ অগ্রসর হয়; রথের উপরে দাঁড়াইয়া যাঁহারা পথের নির্দেশ দেন তাঁহারা রাজা নন, সারথি মাত্র। তবুও শ্রদ্ধায় মুগ্ধ চক্ষে মূক ভারবাহীর দল তাঁহাদের দিকেই বারবার ফিরিয়া তাকাইতে থাকে, তাঁহাদের কাছে পথের নির্দেশ চাহে বলিয়া তাহাদের মোহাবিষ্ট দৃষ্টিতে সেই সারথি ও দেবতা এক হইয়া দেখা দেন। নেতা যে মহাবাণীর দূত হইয়া আসিয়াছেন, নেতাকে ডিঙাইয়া সে বাণী পর্য্যন্ত তাহাদের ক্ষীণদৃষ্টি পৌঁছায় না—সেই নেতাকেই চরম ও পরম গুরুর আসনে বসাইয়া তাহারা তৃপ্ত হয়; কায়মনোবাক্যে তাঁহার অনুগত হইয়া ভাবে, দেশেরই সেবা করিলাম।

বিশ্বাস ও নিষ্ঠার প্রয়োজন আছে; কিন্তু এই নিষ্ঠাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার ভার নেতার নিজের। ভক্ত যদি গুরুর মধ্যে দেবতার সন্ধান করিয়া থাকে সেটা হয়তো তাহার ভ্রম; তবুও তখন বাধ্য হইয়াই গুরুকে অন্তত বাহ্যিক আচারেও দেবত্বের ভাণ করিতে হয়। সেখানে তিনি কেবল গুরু নহেন, তাঁহার মধ্যে যে দেবত্বের বিকাশ শিষ্য দেখিতে চাহিতেছে তাহার প্রতীকও তিনিই। আর সেই শ্রদ্ধার সম্মান যদি তিনি না রাখিতে পারেন, প্রতি বাক্যে প্রতি পদক্ষেপে কেবলই নিজেকে দীন ও হীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে থাকেন, তবে তিনি শুধু নিজেরই সর্বনাশ ডাকিয়া আনেন না, দেবতার মাহাত্ম্যেরও অবসান ঘটাইয়া বসেন। তাঁহার ক্রিয়াকলাপে শিষ্য বিরক্ত হয়, তাঁহার উপরে নিষ্ঠা হারায়; এবং ক্রমে তাঁহার

মধ্য দিয়া যে দেবতাকে সে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিতেছিল তাঁহার অস্তিত্ব ও শুভত্ব সম্বন্ধেই আস্থা হারাইয়া ফেলে। দেবতা তখন হইয়া উঠেন অপদেবতা।

* * *

রামগড়ে বৃষ্টি নামাইয়া ঈশ্বর নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন, কিন্তু শক্তির প্রমাণ দিতে পারেন নাই। সে বৃষ্টির ধারা আমাদের ক্লেদ ধুইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই; কেবল বাতাসে ও ভূমিতে যে ধূলার রাশি সঞ্চিত হইয়া ছিল তাহাকে ভিজাইয়া কর্দমে পরিণত করিয়াছে, সেই কাদা আরও ভাল করিয়া আমাদের সর্বাঙ্গে মাখামাখি করিয়া দিয়াছে। ভারত রাজনীতির ক্ষেত্রে যে ভূতের নৃত্য চলিতেছিল তাহার তাণ্ডব বেগ কিছুমাত্র কমে নাই; উদ্‌ভ্রান্ত পদক্ষেপে তরল কাদাই কেবল ছিট্‌কাইয়া উঠিয়া আমাদের নাকে মুখে সর্বাঙ্গে লাগিয়া আমাদেরও ভূত বানাইয়া দিতেছে। আমরা দৈনিক সাপ্তাহিকে ট্রামে বাসে ও পার্কে সেই কাদা ছিটাছিটি করিয়া বেড়াইতেছি, ভাবিতেছি ইহাই সিদ্ধি, ইহাই মোক্ষ।

* * *

রামগড়ের বৃষ্টিতে কাদার সৃষ্টিই হইয়াছে, মাটি শীতল হয় নাই।

শ্রদ্ধানন্দ পার্কের জমি উত্তরোত্তর উত্তপ্তই হইয়া উঠিতেছে। মুহুর্মুহু জ্বালাময়ী বক্তৃতার জ্বালায় তাহার সমস্ত ঘাস নিঃশেষে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। আবার কখনও সেখানে ঘাস গজাইবে কিনা স্বয়ং বিধাতাও বলিতে পারেন না। চারিদিক হইতে গরম বক্তৃতার যে 'লু' বহিতেছে তাহার দহনে মাঠের ঘাস পুড়িয়া যাইতে বাধ্য। বাংলাদেশের রাজনীতির উর্বরা ক্ষেত্র কন্টিকারী ও গোক্ষুরে ভরিয়া উঠিয়াছে; সেই কাঁটাবন উচ্ছিন্ন হইবার পূর্বে আর পার্কে ঘাস গজাইবে না।

* * *

কাঁটাগাছের গুণ অনেক। তাহার ব্যবহার অসামাজিক, তাহার স্পর্শ অবিস্মরণীয়, তাহার আলিঙ্গন অবিচ্ছেদ্য। বঙ্গদেশের কন্টকবৃক্ষেরা পরস্পর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া দুর্ভেদ্য জটিলতার জালসৃষ্টি করিতেছে—ইহাই নববর্ষের আধুনিকতম সংবাদ। বঙ্গীয় রাজনীতি-ক্ষেত্রে যে কৃষ্ণলীলার আবির্ভাব হইয়াছে তাহার মূলের কথা অ-পছন্দসই অতএব অবৈধ প্রেম। এই প্রেম লইয়া কাগজে কাগজে নূতন করিয়া মহাজন-পদাবলী প্রকাশিত হইতেছে, হিংসাদিগ্ধ জটিলা কুটিলারা পারস্পরিক দুশ্চরিত্রতা লইয়া গগনভেদী তারস্বরে এডিটোরিয়াল লিখিতেছেন; রাজনৈতিক ও কাগজনৈতিক প্রয়োজনে অকস্মাৎ বাংলাভাষা নবলব্ধ পরিভাষাসম্পদে গরীয়ান্ হইয়া উঠিতেছে।

এই পরিভাষা অনুসারে দেখা যায়, কানু নামের বর্তমান অর্থ 'মুস্‌লিম লীগ্'। শ্রীরাধা চন্দ্রাবলী কুবুজার দল পালা করিয়া পরস্পরকে কানুপ্রেমবিলাসিনী বলিয়া গাল দিয়া 'বিবৃতি' প্রচার করিতেছেন—এ বলে, সর্বনাশ, উহারা 'মুসলিম লীগের' সহিত ভাব করিল, হিন্দুয়ানির সর্বনাশ করিল; ও বলে, হায় হায়, ইহারা 'মুসলীম লীগে'র সঙ্গে প্রেম করিল, কংগ্রেসের চরিত্র নষ্ট করিল। কানু মুসলিমলীগ-লাউমাচায় পা ঝুলাইয়া বসিয়া মৃদু মন্দ হাস্য করিতেছেন। ভাবগতিকে কিন্তু মনে হইতেছে, আকৃতিটা একান্তই মৌখিক। আর্তনাদ উভয় পক্ষই করিতেছেন, কিন্তু আসল কথাটা 'প্রেম করিল' নয়,—'উহারা প্রেম করিল' আমরা ফাঁকে পড়িলাম, এই হিংসাটাই ইহাদের গোড়ার কথা। বৃদ্ধ গান্ধীজি এত যে অহিংসা করিতে বলিতেছেন, সে কথা কাহারও কাণেই যাইতেছে না।

* * *

প্রেম যাহার ইচ্ছা যাহার সঙ্গে ইচ্ছা করুক, আপত্তি করি না। আমার খালি দুঃখ, মাঝখান হইতে আমার চরিত্রটা খারাপ হইয়া গেল। নব-বৃন্দাবনের লীলা-খেলা যত দেখিতেছি ততই মন হিংস্র হইয়া উঠিতেছে। গ্লানি ও গুঙ্কারের বিষে জর্জরিত হইয়া কলমের কালি ততই ক্ষোভে ঘৃণায় কালো হইয়া যাইতেছে, কলমের পেটের মধ্যে যেন গালাগালির ইন্‌কিউবেটর বসিয়া গিয়াছে। গুরু বিষয় লইয়া লঘু রসিকতা করিব এই প্রকার একটা সাধু সংকল্প লইয়া 'চলন্তিকা' লিখিবার ভার লইয়াছিলাম ; এখন দেখি অন্তরের জ্বলুনিতে সে চলন্তিকা উত্তরোত্তর 'জ্বলন্তিকা' হইয়া উঠিতেছে—কলমের মুখ দিয়া শ্লীল মোলায়েম বাক্য আর বাহির হইতে চাহিতেছে না।

* * *

এখন একমাত্র ভরসা—ঈশ্বর আছেন, বৃষ্টি যখন একবার হইল, আরও বৃষ্টি হইবে, শিলাবৃষ্টি বজ্রপাত হওয়াও বিচিত্র নয়। এবং হইলে সেই বিদ্যুৎতরঙ্গের আঘাতে জাতীয় জীবনযাত্রার বিপথগত কম্পাশের কাঁটাটা ঘুরিয়া আবার সিধা হইয়াও যাইতে পারে।

* * *

সেই কল্যাণস্রাবী দুর্যোগের প্রতীক্ষায় দিন গণিতেছি। যে বিদ্যুতের 'শকে' স্নায়ুকেন্দ্র আলোড়িত হইয়া বানর আবার মনুষ্যে পরিণত হইবে, হে ঈশ্বর, তাহার সেই বহু কলঙ্কিত আবির্ভাব ঘটিবে কবে ?



রেভারেণ্ড সি, এফ্ এণ্ড্রুজ্

পরলোকগত Andrewsএর সাক্ষাৎ পরিচয় আমি বহুপূর্ব্বে লাভ করি; বোধহয় ১৯১১ অক্টোবর মাসে। আমি তখন সিম্‌লাপাহাড়ে ছিলুম; একদিন সন্ধ্যের সময় সিম্‌লার একটি নির্জ্জন রাস্তাতে একাকী পদচারণ কর্‌ছিলুম। পথিমধ্যে একটি ইংরাজ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তাঁর সঙ্গী দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি ছিল না। তিনি আমার সঙ্গে কথোপকথন সুরু করেন ও আমার কাছে নিজের পরিচয় দেন। তিনিই Andrews সাহেব।

তাঁর নামের সঙ্গে আমি পূর্ব্ব হ'তেই পরিচিত ছিলুম—লোকের মুখে শুনে নয়, তাঁর লেখা প'ড়ে। আমি যখন ১৯০৮ সালের জানুয়ারী মাসে সুরাট যাই, তখন বিলাতের প্রসিদ্ধ লেখক H. W. Nevinson আমার সহযাত্রী ছিলেন। Nevinson সাহেবের সঙ্গে আমার কল্‌কাতায় সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁর প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। সুরাট কংগ্রেস ভাঙ্গবার পর আমি Nevinson সাহেবের সঙ্গে এক ট্রেণে এক কামরায় ফিরে আসি। তিনি বেনারসে নেমে যান। আমরা কল্‌কাতায় ফিরে আসি। আমি তাঁকে দিল্লীতে Andrews সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে বলি এবং তিনি তা' করেন। Andrews সাহেবের সঙ্গে সিমলায় আমার প্রথম আলাপ হয় Nevinson সাহেব সম্বন্ধে।

Andrews সাহেবের লেখার প্রতি আমি কি কারণে আকৃষ্ট হই, তা আমি কল্‌কাতার লর্ড বিশপ Westcott সাহেবের ভাষাতেই বল্‌ছি:

To our shame, we own the strength of racial prejudice with which many Europeans have regarded the peoples of the East.·········

In Charlie Andrews no vestige of this feeling ever found any place in his relation with the people of this country to which he came out some 34 years ago.

Andrews সাহেব যে উপরোক্ত মনোভাব থেকে মুক্ত, তা' তাঁর লেখা থেকে আমি সেকালেই বুঝেছিলুম। তিনি শুধু লেখায় নয় ব্যবহারেও তাঁর এই উদার মনের পরিচয় চিরজীবন দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, তিনি ছিলেন একটি যথার্থ ইংরেজ এবং যথার্থ খৃষ্টান। এই দু'টি কথাতেই Andrews সাহেবের চরিত্র এবং জীবন প্রকাশ করা হয়েছে। ইংরেজের প্রধান গুণ তাদের অক্লান্ত কর্ম্মশক্তি। তিনি দরিদ্র ও পীড়িত ভারতবাসীদের দুঃখমোচনের জন্য দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করেছেন। এই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। আর খৃষ্টধর্ম্মের সব চাইতে বড় কথা হচ্ছে Charity,—অর্থাৎ সর্ব্বমানবে দয়া ও পরহিতৈষণা। এ গুণ যার আছে সেই যথার্থ খৃষ্টান,—যেমন ছিলেন Andrews সাহেব।

'ব্যবধান'

(গল্প)

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

১

আজ কমলাকে দেখিতে আসিবার কথা। সকালে উঠিয়া বাড়ীর বাগানের সংলগ্ন পুকুরটায় আহ্নিকের বাসনগুলি মাজিতে মাজিতে কথাটা মনে পড়িতেই কমলার মুখে একটুখানি লাজুক হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাহার বাবা পল্লীগ্রামের মস্ত জমিদার। বড় বাড়ী সেকালের আমলের। পূজার মণ্ডপ, বহির্বাটি অন্দর মহল সমস্ত আলাদা আলাদা দালান। একান্নবর্ত্তী বৃহৎ পরিবার এবং সে পরিবারে কমলার সমবয়সী রহস্য সম্পর্কের সঙ্গিনীর অভাব নাই। মাথার উপরের আমগাছটায় কি একটা পাখী কতক্ষণ হইতে ডাকিতেছে। শেষ জ্যৈষ্ঠের সকাল বেলাটা ভারি চমৎকার লাগিতেছে, ঠাণ্ডা কাকচক্ষুর মত পুকুরের ধারটায় বসিয়া। গাছের আড়াল হইতে কে যেন হাসি হাসি ভরা কণ্ঠে ডাকিল,—জেঠাইমার পুজোর বাসনগুলো নিয়ে নির্জ্জনে একা পুকুরের ধারে কতক্ষণ আর বসে থাকবি ভাই? এই ছুতো করে একা বসে কি যেন ধ্যান করচিস তুই, নয়? সত্যি বল না।

কমলা লজ্জিতমুখে বাসন লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। যে তাহাকে ডাকিয়াছিল সে অন্তরাল হইতে সম্মুখে আসিল। কমলার চেয়ে বছর দুয়েকের বড় তাহার খুড়তুতো বোন চপলা। ছায়া ভরা রাস্তাটা দিয়া যাইতে যাইতে চপলা কহিল, আচ্ছা তোর ভয় করচে না কমলা? যেখানে তোর বিয়ের কথা হচ্চে তাদের তো খুব সায়েবি চাল চলন। ছেলেটি নাকি বিলেত অবধি ঘুরে এসেছে। তা ভাই তোকে নিশ্চয়ই পছন্দ হবে। তোর দিকে চাইলে কেউ নাকি আবার ফিরে চাইতে পারে। আর কাকার বাসায় কলকাতায় থেকে কত গান শিখেচিস। এক একদিন অনেক রাত্রে যখন এস্রাজ বাজাস, কী যে মনে হয়!

এতক্ষণ পর কমলা হাসিয়া কহিল, কি মনে হয়?

তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চপলা কহিল, মনে হয় সেই দু'বছর আগে বিয়ের রাত্রে যে শানাই বেজেছিল তারই সুর যেন আবার শুনতে পাচ্ছি। এমনই করিয়া হাস্য পরিহাসে কাজ কর্ম্মের আয়োজনে বেলা গড়াইয়া আসিল। বেলা আন্দাজ পাঁচটার সময় বহির্বাটিতে একটা মোটর আসিবার আওয়াজ পাওয়া গেল। যাঁহাদের আজ আসিবার কথা তাঁহারা আসিয়া নামিলেন। গৃহে অভ্যর্থনা ও আদর আপ্যায়নের আর সীমা রহিল না। বসিবার ঘরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তাকিয়া মখমলের চাদরের উপর সাজানো আছে, রূপার গুড়গুড়িতে সুগন্ধি তামাক। রূপার ট্রের উপর আতরদান, গোলাপ পাশ। অনভ্যস্ত দৃশ্য ও অনভ্যস্ত সরঞ্জাম তথাপি সহরের ধূম ও ধূলি হইতে আসিয়া বিজয়নাথের চোখ যেন জুড়াইয়া গেল। স্বয়ং পাত্র আসিয়াছে তাহার দুই একজন বিশিষ্ট বন্ধুকে লইয়া মেয়ে দেখিতে। তাই শুধু অমনি মেয়ে দেখা হইল না, কমলাকে এস্রাজ বাজাইয়া গান গাহিতে হইল। ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করিতে হইল। জিজ্ঞাসাবাদ হইয়া গেলে সে উঠিয়া গেল তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। গ্রামে

ঘরে ঘরে সন্ধ্যার শাঁখ বাজিতেছে, ভিজা খড়ের ধোঁয়ায় একরকম গন্ধ আসিতেছে। কে যেন ঘরে একটা ডে-লাইট জ্বালিয়া দিয়া গেল। পাশের রেকাবিতে জুঁইফুলের সুমিষ্ট গন্ধ গ্রীষ্ম সন্ধ্যার রমণীয় রূপকে আরও উতলা করিয়া তুলিয়াছে। বাইরের দিকে চাহিয়া বিজয় নাথ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল, ঠিক এই রকমটি সে আর কোথাও দেখে নাই। কলিকাতায় অন্তরঙ্গ আত্মীয় বন্ধু মহলে যে সব মেয়েদের দেখিবার সুযোগ পাইয়াছে তাহাদের সহিত ইহার অনেক অমিল। এই মেয়েটির চারিদিকে এখানকার প্রকৃতির মত একটি স্নিগ্ধ সুদূর আবেষ্টনী আছে। সকলের কাছে সহজ ভাবে আসিয়াও সে স্বতন্ত্র। এই মাত্র তাহাকে কত ভাবে দেখা হইল, কত প্রশ্নই না করা হইল কিন্তু সমস্ত কথার উত্তর দিয়া সব দাবী পূর্ণ করিয়াও আপন মৌন সংযম এবং শালীনতার আভায় সে দীপ্যমান। বন্ধু বান্ধবদের ঠাট্টা উপহাস ও টিট্‌কারি সহ্য করিয়া এই পল্লী অঞ্চলে কমে দেখিতে আসা সার্থক মনে হইল তাহার। বিজয় নাথ সম্প্রতি বিলাতী বড় একটা ডিগ্রী পাইয়া মোটা মাহিনার সরকারী চাকুরিতে ঢুকিয়াছে কিন্তু এখনও তাহার ভিতরকার কবি ও ভাবুক মানুষটি একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। এতদূরে এই ছোট গ্রামটিতে কনে দেখিতে আসাই তাহার প্রমাণ।

গাঁয়ের লোকের ঈর্ষাজড়িত দৃষ্টির সম্মুখেই কমলার এমন এক বড় সরকারী চাকুরের সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেল। সখীরা কেহ কেহ অকৃত্রিম আনন্দে কহিল, সত্যি তোর ভাগ্য ভালো। কেহ বা ছোট একটু নিঃশ্বাস চাপিয়া সায় দিল। কিছুদিন পর কমলা পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল। বিজয়নাথের বদলীর হুকুম হইয়াছে, সে স্থির করিয়াছে নূতন জায়গায় কিছুদিন গুছাইয়া লইয়া কমলাকে আনিবে।

কমলা বাপের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে তাহার ন-বৌদি, রাঙাদি তাহার বকুলফুল, মনের কথা সকলেই অবাক হইয়া আবিষ্কার করিল, এখনও সে আগেকার দিনের মত ভোরে উঠিয়া আহ্নিকের জন্য সাজি হাতে ফুল তুলিতে যায়। কাপড় পরিবার ভঙ্গিটুকু এখনও তেমনই আলজ্জ এবং আনম্র। মুখের হাসিটি তেমনই ভীরু কুলায়প্রত্যাশী। এত বড় একটা সম্মানিত চাকুরের স্ত্রী হইয়াও পদ-মর্য্যাদার উপযোগী রং ধরে নাই তাহার বাক্যে এবং ব্যবহারে। বকুলফুল মুচকি হাসিয়া নেপথ্যে মন্তব্য করিল, এ আবার এক নতুন ধরণের ঠাট্, বুঝচিসনে? গায়ে পড়ে জানানো হচ্চে, 'আমি বড় সাদাসিধে। আমার দেমাক নেই।' বুঝি সবই।

গঙ্গাজল সন্দিগ্ধ হইয়া কহিল, তা হবে।

বিজয়নাথ কলিকাতায় বদলী হইয়াছিল। মনের মত বাড়ী সাজাইয়া সমস্ত বন্দোবস্ত শেষ করিয়া তিন দিনের ছুটি লইয়া সে স্ত্রীকে লইয়া যাইতে আসিল। তখন শ্রাবণের শেষ। সেদিনটায় কি ভাগ্যে সকালের দিকেই অনেক দিনের পর বাদল ছাড়াইয়া রোদের একটুখানি আভা দেখা দিয়াছে। বিজয় নাথের পাল্কী আসিতেছে, পথের মোড় হইতেই বেহারাদের মিলিত ধ্বনি শোনা যায়। বর্ষায় এ সময়টা পল্লীর দুরধিগম্য পথে মোটর চলে না, ঘোড়ার গাড়ী চলে না তাই পাল্কীর ব্যবস্থা হইয়াছে। সদরে অভ্যর্থনার একটা বিরাট ঢেউ উঠিল। কেউ চেঁচাইল, ওরে জামাইবাবু এয়েচেন শীগ্‌গীর চা আনতে বল। ......সাবান কই? ......হাত মুখ ধুয়ে ফেল বাবাজী। এতটা পথ এলে, যা আমাদের দেশের রাস্তা! ......ভালো তোয়ালে আন দিকি একটা......খুব ভালো সিগারেট এক বাক্স আনিয়ে রাখুন সরকার মশাই আর ঐ সঙ্গে এক ডজন সোডা। ......আজ্ঞে জল খাবার এই এখুনই এসে পড়লো

বলে। মাঠান নিজে বসে সাজাচ্চেন। সবই হয়ে গেছে শুধু ক্ষীরের আর চন্দ্রপুলির ছাঁচটি হ'য়ে গেলেই হয়।

এই মিলিত সোরগোল ও কলরবের মধ্যে বিজয়নাথের কেমন যেন একটু বিরক্তি একটু অনভ্যস্ত আড়ষ্টতা বোধ হইতেছিল। নিজগৃহের কেতাদুরস্ত ভাবটা মজ্জায় মজ্জায় মিশিতে সুরু হইয়াছে। চায়ের টেবিলে খানসামা ও বয় কলের পুতুলের মত সমস্ত সাজাইয়া দেয়, নিঃশব্দে পিয়ন আসিয়া সকালবেলাকার ডাক রাখিয়া যায়। নেহাৎ কিছু দরকার হইলে হাতের কাছের কলিং বেলটা টিপিলেই হইল। সে প্রয়োজন বড় একটা হয় না। চাকরবাকর এমন কেতাদুরস্ত যে ঘড়ির কাঁটার মত বিনা শব্দে সমস্ত করিয়া যায়। নিক্তির ওজনে বাঁধা, এতটুকু এদিক ওদিক কিংবা অযথা গোলমাল কখনো হয় না।

কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই এভাবটা কাটিয়া গেল। বিজয়নাথের ভিতরকার যে কবি ও ভাবুক চিত্তটি সরকারি কাজের নিষ্পেষণে ক্রমেই চাপা পড়িতেছিল, শ্রাবণ-প্রভাতের বর্ষাবারি-ধৌত প্রকৃতির আহ্বানে চারিদিককার আনন্দ-কোলাহলের আমন্ত্রণে আবার তাহা জাগিয়া উঠিল।

চায়ের সঙ্গে একরাশ চন্দ্রপুলি ক্ষীরছাঁচ ও কতরকমের যে সন্দেশ আসিল লেখা জোখা নাই। সকালে উঠিয়া এধরণের একরাশ মিষ্টান্ন খাওয়া বিজয়নাথের কোনকালে অভ্যাস নাই। কিন্তু তবু ইহার একটাকেও সে উপেক্ষা করিতে পারিল না। সামনে পাখা হাতে কমলার মা বসিয়া আছেন। স্মিত গাম্ভীর্য্যের সহিত স্নেহের মিশ্রণ তাঁহার মুখে কী চমৎকার একটি ছায়া ফেলিয়াছে। আশে পাশে নেপথ্যে এবং সম্মুখে যে সব অন্তঃপুরিকাদের অলঙ্কারের শিঞ্জন শোনা যাইতেছে তাহাদের শাঁখাপরা স্নিগ্ধ সেবাকোমল হাতের সহিত এই মিষ্টান্নগুলির যে একটা নিগূঢ় যোগাযোগ রহিয়াছে তাহা প্রশ্ন না করিয়াও বিজয়নাথের বুঝিতে বাকী রহিল না। তাই কঙ্কণের রিনি ঝিনি ও চাপা কলহাস্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহার কাছে এই সব সন্দেশের স্বাদ ফারপোর কেক বিস্কুটের চেয়ে নেহাৎ খারাপ লাগিল না।

জলযোগ শেষ হইয়া গেলে ক্যারম আসিল তাস আসিল দাবা আসিল এমন কি একটা বক্স হার্ম্মোনিয়াম অবধি আসিয়া জুটিল। পাড়ার ছেলেরা এবং আত্মীয় সমবয়সীরা যেন বদ্ধপরিকর হইয়া বসিয়াছে সহরে বিজয়নাথকে এই অজ পাড়াগাঁয়ে যেমন করিয়া হোক আনন্দ দিতেই হইবে। কিন্তু বিজয়নাথ ঠিক এতখানি আনন্দের জন্য উন্মুখ ছিল না। তাহার ঘন ঘন খেলায় ভুল হইয়া যাইতে লাগিল তাহার তৃষিত চোখ দুইটি সন্ধানীর মত ঘুরিয়া ফিরিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে আশা হইতেছে অপরূপ আবির্ভাবের মত এখনই বুঝি কবাটের আড়ালে লাল শাড়ির একটা প্রান্ত ঝলসিয়া উঠিবে। বহুদূর অন্দরের সীমান্তে কি একটা কৌতুক-হাস্যের টুক্‌রা, কোন একটা চপল কণ্ঠস্বর এখান অবধি ভাসিয়া আসিতেছে। সেইদিকে সমস্ত মন ধাবিত হইতেছে এবং অকস্মাৎ দাবাখেলার চালে এমন একটা মর্ম্মান্তিক ভুল হইয়া যাইতেছে যে নিতান্ত আনাড়ি বলিয়া প্রতিপক্ষের ছেলেটি করুণামিশ্রিত চক্ষে চাহিয়া আছে। অথচ কেমন করিয়া বিজয়নাথ তাহার কাছে প্রমাণ করিবে যে, দাবাখেলায় সে প্রায় অদ্বিতীয় বলিলেই হয় এবং তাহাদের ক্লাবে বিলিয়ার্ড টেনিসের সহিত এই সুন্দর দেশী খেলাটি প্রচলিত করিতে এককালে সে কতই না পরিশ্রম করিয়াছে। সকালবেলাকার ব্যাপারের পর মধ্যাহ্নের গুরুভোজন সমাধা হইতে বেলা প্রায় গড়াইয়া গেল। নির্জ্জন ঘরে দুগ্ধফেনশুভ্র শয্যায় বিশ্রাম করিতে করিতে বিজয়নাথ স্থিরনিশ্চয় হইল এইবার এতক্ষণ পরে কমলা নিশ্চয় আসিবে। কিন্তু কমলা আসিল না, শুধু পাশের ঘরে খয়ের করিবার

জন্য জড়ো-করা কেয়াফুলের তীব্র মদির গন্ধ সজল বাতাসের সহিত ভাসিয়া আসিতে লাগিল এবং শ্রাবণের আকাশের দিগন্ত জুড়িয়া আবার কালো মেঘ ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল। বর্ষার সমস্ত দিন সারা সন্ধ্যাটা পাগল করিয়া দিয়া অবশেষে যখন জলে ভেজা খোড়ো চাল ও সামনের রাস্তাটার উপর মেঘের অন্তরাল-ছিন্ন চাঁদের একটুক্‌রো আলো আসিয়া পড়িয়াছে, রাত্রি তখন অনেক ; সেই সময় চুড়ির একটু টুং টাং শব্দ, শাড়ির একটুখানি খস্ খস্ আওয়াজ দুয়ারের কাছে আসিয়া থামিল। অতি সন্তর্পণে ত্রস্ত চকিত পদে কমলা ঘরে ঢুকিল। বিজয়নাথের অভিমান তখন রাগে রূপান্তরিত হইয়াছে। ক্ষুব্ধকণ্ঠে সে কহিল, দেখা না করলেই পারতে আমার সঙ্গে !

কেনই বা করবে, কে আমি ?

কমলা মৃদুকণ্ঠে বলিল, কি করবো বলো, আমাদের এখানে এ বাড়ীতে এই রাত্রি ছাড়া দেখা হবার উপায় নেই। দিনের বেলায় তোমার সঙ্গে দেখা করলে কথা কইলে লোকের কাছে ঠাট্টাতামাসায় মুখ দেখাতে পারব না। সন্ধ্যে থেকেই তো ভাবচি, এইবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু ছোটকাকার ঘর আমাদের ঘরের সামনেই, তিনি ঘরে গেলেন, ঘুমিয়ে পড়লেন, কতক্ষণ পরে ঠাহর করে তবে এই আসছি।

তবু এত লজ্জা করচে, যদি······

বিজয়নাথ কমলার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, যদি কি ?···লোকের কাছে মুখ দেখাতে না পারতে যদি নাই বা দেখাতে। কিন্তু যে শুধু তোমার মুখ দেখবার জন্যেই এতদূর থেকে এত কষ্ট সয়ে এসেছে······

যাও, ওসব বোলোনা ভারি লজ্জা করে...কমলা সামনের চেয়ারটায় বসিল, তারপর কেমন ছিলে বল দিকি ? রাস্তায় কষ্ট হয়নি তো ?

বাবা, কষ্ট আবার হয়নি ! যা তোমাদের বাপের বাড়ীর দেশের রাস্তা। পালকির ভিতর অত্যন্ত সভয়ে এসেচি।

কমলা হাসিয়া কহিল, কেন গো, পথের বাধা আর পথের দুঃখ তো আর নতুন কিছু নয় যে বলচো। কতদিন থেকে কবিরা এর দুঃখ আর এর মাধুর্য্য বলে শেষ করতে পারেন নি। অভিসারের সেই পদ শোননি, 'একে পদপঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত কণ্টকে জর জর ভেল।' কোথায় বা শুনবে ? খোট্টার দেশে মানুষ হয়েচ চিরকাল। এখন আবার কলকাতায় বদলী হলে। বাংলাদেশের বৈষ্ণব বাড়ীর মত ভালো কীর্ত্তন তো শোননি কখনও।

বিজয়নাথ বলিল, আজই শুনিয়ে দাওনা। হাতে খড়ি হয়ে যাক। সত্যি ঠাট্টা নয় গাও একটা কীর্ত্তন। না হয় খুব আস্তে আস্তে গাও, শুধু আমি শুনতে পাই। ঐ যে প্রথম লাইনটা বল্লে, অভিসারের সেই পদটা গাও। জান নিশ্চয়। মনে মনে মিলিয়ে দেখি নিজের সঙ্গে।

বাহিরে তখন জোরে জল আসিয়াছে, ক্ষীণ জ্যোৎস্নার ধারা দুরন্ত কালো মেঘের প্রবাহে কোথায় ঢাকিয়া গেছে।

সলজ্জ মুখে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কমলা মৃদু মধুর কণ্ঠে গাহিল।

মন্দির ত্যজি' যবে পদচারি আইনু, নিশি দেখি কম্পিত অঙ্গ
তিমির দুরন্ত, পথ হেরই না পারই, পদযুগ বেড়ল ভুজঙ্গ।

একে কুল কামিনী, তাহে কুহু যামিনী, ঘোর গহন অতিদূর ;
আর তাহে জলধর বরখিয়ে ঝরঝর, হাম যাওব কোন পুর !
একে পদযুগ্ম পঙ্কে বিভূষিত, কণ্টকে জর জর ভেল
তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানিনু চির দুখ অব দূরে গেল।
তোহারি মুরলী যব শ্রবণে পশিল ছোড়ল গৃহ সুখ আশ।
পথহু দুখ তৃণ করি' মানিনু, কহতহি গোবিন্দদাস।

একটু থামিয়া কহিল, সেবার ঝুলনের সময়ে আমাদের মন্দিরের উৎসবে রসিকদাস এসেছিলেন তাঁর কাছ থেকেই শিখেচি এটি। বিজয়নাথ মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিল, কহিল, এত সুন্দর জিনিষ আছে জগতে আগে কখনো জানতে অবকাশ পাইনি এখন সেজন্যে আফ্‌শোষ হচ্চে। এবার থেকে মাঝে মাঝে শোনাবে তো! ······না চুপ করে থাকলে চলবে না প্রতিশ্রুতি দিতে হবে, নইলে ছাড়চিনে।

কমলা হাসিয়া কহিল, কিন্তু কলকাতায় গেলে তুমি নিজেই আর শুনতে চাইবে না। আমার মনে হয় কীর্ত্তন যেখানে সেখানে গাওয়া যায় না। কলকাতায় কাকার বাড়ীতে থাকতে দেখতুম মাঝে মাঝে রেডিওর প্রোগ্রামে কীর্ত্তন রয়েছে। আমার এমনই হাসি পেত।

বিজয়নাথ কিঞ্চিৎ আবেগভরে বলিয়া উঠিল, চুলোয় যাক কলকাতা। কিন্তু তুমি আর আমি দু'জনে যেখানে থাকব, সে দেশ কি পৃথিবীর মানচিত্রের বাইরে নয়?

ভোর তখন পাঁচটা, ভালো করিয়া দিনের আলো ফুটে নাই। কমলা অতি ধীর সন্তর্পণে দ্বার খুলিয়া বাহিরে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। পাছে স্বামীর ঘুম ভাঙিয়া যায় তাই সে নিঃশব্দে মৃদু পদ-সঞ্চারে যাইতেছিল, কিন্তু বিজয়নাথ ঘুমায় নাই। চোখ মেলিয়া কহিল, এত শীগ্‌গীর পালিও না। জানি আবার তো দেখা পাব সেই রাত্রি বারোটার পরে।

কমলা অনুনয়ের স্বরে কহিল, না সত্যি জেদ কোরোনা। এখনই মা উঠে পড়বেন। ছোট কাকীমার দোর খোলার আওয়াজ পেয়েচি। আর দেরী হলে ভারি লজ্জায় পড়বো কিন্তু।

বিজয়নাথ কহিল, আচ্ছা যাও। কিন্তু মাঝে আর মোটে একটা দিন, সে আমি ধৈর্য্য ধরে কোন রকমে কাটিয়ে দেব। তার পরেই যেতে হবে আমার সঙ্গে। যেখানে যাবে সেখানে কোন বাধা নেই, নেই কোন ব্যবধান। সেখানে এ সব চলবেনা এখন থেকে বলে দিচ্চি।

কমলা যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া কহিল, বাধা যেখানে থাকেনা সেখানে মানুষ নিজেই ব্যবধান গড়ে নেয়। তা বুঝি জানোনা?

বিজয়নাথ কহিল, বৈষ্ণব বাড়ীর কীর্ত্তন-জানা মেয়েটি এদিকে আবার দার্শনিকও কম নয় দেখচি।

(২)

প্রায় বছর খানেক হইল কমলা স্বামীর সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়াছে। ইতিমধ্যে আর কলিকাতা ছাড়িয়া কোথাও যাইবার অবকাশ ঘটিয়া উঠে নাই। কি একটা চ্যারিটিতে টাকা তুলিয়া দিতে হইবে বলিয়া মিসেস কেতকী মিত্র কতকগুলো উলের সেলাই বাড়ী বাড়ী গছাইয়া দিয়া গেছেন। ধূসর রঙের

উলের সেই বোনাটা লইয়া কমলা সোফায় বসিয়া বুনিতেছিল, বিজয়নাথ অফিস ফেরত ঘরে ঢুকিল। বাইরে মেঘলা দিন। ক্ষণে ক্ষণে জল ঝরিতেছে। গায়ের বর্ষাতি কোটটা খুলিয়া রাখিয়া বিজয়নাথ কহিল, বেয়ারাকে বলো চা দেবে।

চায়ের আদেশ দিবার জন্য কমলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিজয়নাথ হাঁকিয়া বলিল, ওকে বলেই চলে এস। তুমি কিসের জন্যে ড্রাজারি করতে যাও? এতটাকা খরচ করে এতগুলো লোক রেখেচি কিসের জন্যে বলতে পারো?

বেয়ারাকে হুকুম দিয়া কমলা আবার ঘরে ঢুকিল। চেয়ারটা রেডিওর কাছে টানিয়া লইয়া গিয়া বিজয়নাথ সুইচ্ টিপিল, ঠিক সাতটা ছত্রিশে একটা ছোট প্লে আছে। শুনবে?

বেয়ারা চা লইয়া ঘরে ঢুকিল, রেডিও চলিতে লাগিল। সামনের খোলা জানালাটা দিয়া বর্ষাবিধুর আকাশের একাংশ দেখা যাইতেছিল এবং বৃষ্টির ছাঁটের সহিত জোলো হাওয়া আসিতেছিল। বিজয়নাথ উঠিয়া সমস্ত জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া আলোটা জ্বালাইয়া দিল। মাথার উপর বিজলী পাখাটাও খুলিয়া দিল। চায়ে চিনি মিশাইতে মিশাইতে কহিল, আফিস থেকে ঠিক বেরিয়েচি আর খুব জোরে জল এ'লো। সঙ্গে ওয়াটারপ্রুফ্ ছিলো মোটরের পর্দ্দাগুলো ফেলে দিয়েছিলাম।

কমলার মুখে একটুখানি সুদূর হাসির আভাস। সে নীরবে এক পেয়ালা চা তুলিয়া লইল। কেক একটু কাটিয়া লইয়া বিজয়নাথ রেডিওটা ঘুরাইয়া কহিল, নাঃ কলকাতার প্রোগ্রাম ভালো লাগচেনা। ঢাকা দিলাম। বার্লিন শুনবে! আজ হের হিটলারের ঘোষণা আছে। না লণ্ডন ধরবো? বৃষ্টির জলের সঙ্গে বিলাতী ডান্সের বাজনাগুলো বেশ লাগে। আচ্ছা দেখ জলটা যে রকম লেগে রইলো, কালকের পার্টির কি হবে ভাবচি। বাবুর্চ্চিটা অবশ্য পাকা লোক কিন্তু ঘোষকে নিমন্ত্রণ করেচি। তার ষ্টাইল জানোতো, খাটো না হ'তে হয়।

ঘোষ আবার বলে রেখেচে, কাল খাওয়া দাওয়ার পর তোমাকে আমাকে নিয়ে নিউ এম্পায়ারে যাবে। কলকাতায় বদলী হয়ে ভালোই হয়েছে, লাইফ্ আছে এখানে। নিউ এম্পায়ারে কাল কি 'শো' আছে দেখেচ কি কাগজে? যদি তেমন পছন্দ হয় তবেই যেও নইলে সাজেষ্ট্ করো তো মেট্রোতেও যেতে পারি।

কমলা কিন্তু নিউ এম্পায়ার বা মেট্রোর কথা ভাবিতেছিল না, সে হাসি হাসি মুখে নিবিষ্ট হইয়া বৃষ্টির শব্দ শুনিতেছিল, খানিকটা অন্যমনস্ক হইয়া কহিল, এটা শ্রাবণ মাস, নয় গো?

আঙ্গুল গণিয়া বিজয়নাথ কহিল ফোর্থ আগষ্ট আজ, হ্যাঁ, তা শ্রাবণের মাঝামাঝি হোল বইকি।

কমলা উল্লসিত সুরে কহিল, ঠিকতো, শ্রাবণ মাস নইলে কি এমন অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ে? আর বছর এই শ্রাবণ মাসেই তো প্রথম রূপপুরে আমাকে আনতে গেছিলে, মনে পড়ে সেখানে কত কষ্ট সয়ে, পালকি করে কাদার রাস্তা ভেঙ্গে গেছিলে। আর যেয়েও কত কষ্ট ভোগ! পাড়াগাঁয়ের সব কাণ্ড, রাত বারোটার আগে দু'জনের চোখাচোখি হয় না। মনে পড়ে সে সব কথা? একটা গান শুনতে চেয়েছিলে। তাও কতইনা ভয়ে ভয়ে কত আস্তে গেয়েছিলাম, পাছে আর কেউ শুনতে পায়।

বিজয়নাথ চায়ের পেয়ালাটা পান শেষে নামাইয়া রাখিয়া একটা চুরুট ধরাইয়া আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, মনে আবার পড়ে না—খুব পড়ে। কিন্তু থ্যাঙ্ক গড্ যে সে সব ঝঞ্ঝাট আর কোন দিনেই

পোয়াতে হবে না। নিজের ঘর বাড়ী ছেড়ে আর বাপের বাড়ী যাচ্ছ না নিশ্চয়। আর ঐরকম দেশ! যেমন দুর্গম জায়গা তেমনি সুদুর্গম বিধি নিষেধ। উঃ বাঁচা গেছে। এখানে তোমার আমার মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। পুরো স্বাধীনতা, সম্পূর্ণ ফ্রি। কিছুই মানবার প্রয়োজন নেই। কমলা কহিল, মনে করচ ব্যবধান নেই বুঝি? খুব আছে। কে বল্লে ফ্রি···? দিনের আলোয় চোখোচোখি হলে লজ্জায় চোখ বন্ধ করবার কারণ নেই। না আছে মা খুড়িমার সঙ্কোচ। নাইবা থাকলো সইদের ঠাট্টা তামাসার ভয় কিন্তু তবু তো রেডিও আছে, এম্পায়ার আছে, ঘোষ আছে আর ঘোষদের পার্টি আছে। ওদের জয়জয়কার হোক। ব্যবধানের কমতিটা কোথায় বলতে পার? আজ তুমি ঘরে ঢুকেই বললে, অফিস থেকে যেই বেরিয়েচ অমনি জোরে জল এ'লো। তখন আমার কীর্ত্তনের সুরে তোমাকে শোনাতে হচ্ছিল:

'এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা, কেমনে আইলা বাটে।'

কিন্তু তুমি সেই অশ্রুত গানের গুঞ্জনের দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে রেডিওর সুইচটা টিপে দিয়ে জ্যাজ্ সঙ্গীত শুনতে বসলে। রূপপুরে যে সব বাধা ছিলো সে যে এ বাধার চেয়ে ঢের ভালো ছিল। সে বাধায় প্রতিহত হয়ে মনের আবেগ দ্বিগুণিত হোত। আর এই সব আধুনিকতার অপ্রতিবিধেয় বাধায় মনের জ্যোতি নিভে যায়। শেষ অবধি মন বলে কোন একটা জিনিষের বালাই বোধ হয় থাকে না। চলোনা সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে দিন কয়েকের জন্যে না হয় সেই রূপপুরে কাটিয়ে আসি! ওখানে এই শ্রাবণ মাসে খয়ের তৈরী ক'রবার জন্যে যত কেয়া ফুল জড়ো হোত, তার গন্ধ বুঝি তোমার মনে নেই? ঐ রেডিওতে যে বিলিতী গৎ বাজচে, তার চেয়ে সে গন্ধ বুঝি কম হ'লো! বিজয়নাথ আর একটা চুরুট ধরাইয়া কহিল, পাগল হয়েচ না কি? ঘোষ যে সেদিন পার্টিটা দিলে, সমাজে একটা চমক লাগিয়ে দিলে যেন। তার রিটার্ণ দিতে এত আয়োজন কর্ল্ুম সে সব পণ্ড হোক। তা ছাড়া ছুটিই বা কই আমার যে, তোমাকে নিয়ে সেই দুস্তর রাস্তা পার হয়ে রূপপুর যাব। বেশ তো লণ্ডনের প্রোগ্রাম তোমার যদি ভালো না লাগচে প্যারিসেরটা না হয় ধরচি।



কাকের কাণ্ড

'বনফুল'

কা—কা—কা—কা—

জগত্তারিণী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ঘরের ভিতর হইতে অতি কষ্টে বাহির হইয়া বলিলেন—হু-স্—

কাকটা উড়িয়া গিয়া রান্নাঘরের ছাতে বসিল। জগত্তারিণী খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পুনরায় ঘরের ভিতর ঢুকিলেন। কয়দিন হইতে কোমরে এমন একটা ব্যথা হইয়াছে! কোমরের অপরাধ নাই, বয়সও তো পঁয়ষট্টি পার হইতে চলিল। ঘরে ঢুকিয়া মুখ বিকৃতি-সহকারে তিনি উপবেশন করিলেন এবং কাঁথা সেলায়ে মন দিলেন। লতিকার ছেলে হইয়াছে তাহাকে পাঠাইতে হইবে।

কা—কা—কা—কা—

অমঙ্গল আশঙ্কায় জগত্তারিণীর অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। হাবু, গবু, দেবু, নিপু চার ছেলেই বিদেশে, কোলের ছেলে টিপু যদিও বাড়িতে আছে কিন্তু তাহারও শরীরটা ভাল নাই, এম. এ. পরীক্ষার খাটুনিতে ছেলের শরীরটা রোগা হইয়া গিয়াছে। সে ওপরে তেতালার ঘরে শুইয়া ঘুমাইতেছে। ছোট নাতিটুকু পাটনা গিয়াছে ফুটবল ম্যাচ খেলিতে—যা গোঁয়ার গোবিন্দ ছেলে—কখন যে কি করিয়া বসে ঠিক নাই। ইভা, নিভা—মেয়ে দুজন শ্বশুর বাড়িতে। তাহাদেরও অনেকদিন চিঠিপত্র আসে নাই। ছোট বউ মুকুজ্যেদের বাড়ি নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছে। নীচে কেহ নাই। নির্জ্জন দ্বিপ্রহর।

কা—কা—কা—কা—

জগত্তারিণীর মনে পড়িল কর্ত্তা যে অসুখে মারা যান সেই অসুখটি হইবার পূর্ব্বে ঠিক এমনি ভাবে কাক ডাকিয়াছিল। কি অলুক্ষুণে ডাক!

কা—কা—কা—কা—

জগত্তারিণী আবার কষ্ট করিয়া উঠিলেন।

হু—উ—স্—

কাক উড়িয়া কদম গাছের ডালটায় বসিল।

কা—কা—কা—কা—

হুস্—হুস্—

কাক উড়িল না, কিন্তু নীরব হইল এবং ঘাড় বাঁকাইয়া জগত্তারিণীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

জগত্তারিণী স্বগতোক্তি করিলেন—নবান্নের দিন যখন পেসাদ খেতে দেওয়া হয় সেদিন পাত্তা থাকে না কারো—এখন এসেছেন জ্বালাতে।

জগত্তারিণী ঘরের মধ্যে গেলেন, মুখবিকৃতি সহকারে পুনরায় বসিলেন এবং চশমাটি ঠিক করিয়া লইয়া সেলায়ে মন দিলেন।

কা—কা—কা—

জ্বালিয়ে খেলে তো মুখপোড়া!

কা—কা—কা—কাঁ—

আবার উঠিতে হইল।

হুস্—হুস্—যা—যা—

কাক বলিতে লাগিল—কক্—কক্—কক্—

ভারি ত্যাঁদড় তো মুখপোড়া।

কক্—

দেখবি তবে—

হস্ত উত্তোলন করিয়া জগত্তারিণী একটা কিছু ছুঁড়িয়া মারিবার ভাণ করিলেন। কাক ভাণ বোঝে। সে এক ডাল হইতে আর এক ডালে লাফাইয়া বসিল এবং জগত্তারিণীকে রাগাইয়া দিবার জন্যই যেন তাঁহার দিকে গলা বাড়াইয়া বাড়াইয়া র-ফলা যুক্ত করিয়া ডাকিল—ক্র—ক্র—ক্র!

হুস্—

কাক চুপ করিল এবং মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া সামনের ডালটার উপর ঠোঁট শানাইতে লাগিল।

জগত্তারিণী অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন, পাজি কোথাকার। ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। পুনরায় অতি কষ্টে বসিয়া প্রসারিত কাঁথাটায় মনোনিবেশ করিলেন। মিনিট খানেক বেশ নিবিষ্ট মনেই শেলাই করিতে পারিলেন। কিন্তু আবার—

কাঙাক্—কাঙাক্—কাঙাক্—

অনুনাসিক কণ্ঠে ডাকিতেছে!

জগত্তারিণী ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, কিন্তু উঠিলেন না। ডাকুক। বার বার আর কোমরের ব্যথা লইয়া উঠিতে পারেন না তিনি। ছোট বউ সেই যে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছে এখনও পর্য্যন্ত ফিরিবার নাম নাই। এমন আড্ডাবাজ হইয়াছে আজকালকার মেয়েরা!

কা—কা—কা—কা—

জগত্তারিণী আরও দুইটা ফোঁড় দিলেন।

কা—কা—কা—

আরও দুইটা ফোঁড় দিলেন।

কা—কা—কা—কা—

জগত্তারিণীর মনে হইল যেন বলিতেছে—খা-খা-খা—! অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল।

খাটের রেলিঙে ভর দিয়া আবার উঠিতে হইল তাঁহাকে।

জ্বালাতন!

কা—কা—কোয়্যাক্—

দূর হ—

কা—কা—কা—কা—

দূর দূর দূর হ—

কা আ—কা আ—কা আ—

তবে রে মুখ পোড়া—

জগত্তারিণী কষ্টে সিঁড়ি ভাঙিয়া উঠানে নামিলেন, আরও কষ্ট করিয়া একটি ছোট ঢিল কুড়াইয়া সক্রোধে সেটি কাকের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিতে গিয়া নিজেই পড়িয়া গেলেন। সকালে এক পশলা বৃষ্টি হওয়াতে উঠোনটা পিছল হইয়াছিল।

একজন সাবডিভিসন্যাল অফিসারকে মহকুমার নানাবিধ জরুরি কাজ ফেলিয়া, একজন মুন্সেফকে অনেকগুলি দরকারি মকোর্দ্দমার শুনানী মুলতুবি রাখিয়া, একজন হাই স্কুলের হেডমাষ্টারকে বহুবিধ কর্ত্তব্য স্থগিত করিয়া এবং একজন ডাক্তারকে অনেকগুলি শক্ত রোগী ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিতে হইল। সকলকেই সপরিবারে। নিভা দানাপুর হইতে এবং ইভা কলিকাতা হইতে সংসার ফেলিয়া সপুত্রকন্যা আসিয়া হাজির হইলেন। পৌত্রী লতিকাও তাহার কচি ছেলেটিকে লইয়া আসিয়া পড়িল। টুকুদের ফুটবল ম্যাচে 'ড্র' হইয়াছিল, টুকুই দলের মেরুদণ্ডস্বরূপ, কিন্তু টেলিগ্রাম পাইয়া সমস্ত দলটিকে মেরুদণ্ডহীন করিয়া দিয়া সে-ও চলিয়া আসিল।

টিপু চতুর্দ্দিকে টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছে—Mother seriously ill; come immediately.

এখন দেখা যাইতেছে তত সিরিয়াস নয়, হাড় টাড় ভাঙে নাই, কোমরেই একটু চোট লাগিয়াছে মাত্র। পড়িয়াই অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ডাক্তাররা বলিতেছেন তাহা দুর্ব্বলতার জন্য। ঠিক আগের দিনই নির্জ্জলা একাদশী ছিল। বহুকাল পরে পুত্র-কন্যা-পৌত্র-পৌত্রীদের একত্রিত দেখিয়া জগত্তারিণীর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—তাঁহার কোমরের ব্যথা যেন অর্দ্ধেক সারিয়া গেল। তিনি বালিশে ভর দিয়া সকলের বারণ সত্ত্বেও ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন এবং স্নেহ-সজল কণ্ঠে বলিলেন—তোদের সব্বাইকে রেখে এখন ভালয় ভালয় যেতে পারলেই বাঁচি আমি। টিপু বলিল—ভাগ্যে আমি ঠিক সেই সময়ে ওপর থেকে নেবে এসেছিলুম, তা নাহলে কি কাণ্ডই যে হত!

বড় ছেলে—যিনি এস. ডি. ও.—তিনি বলিলেন—তখনই আমি বলেছিলাম উঠোনটাও পাকা হয়ে যাক—কিন্তু তোমরা সবাই আপত্তি করলে—

মেজছেলে গবু—যিনি মুন্সেফ—তিনি বলিলেন আজই হরেন ওভারশিয়ারকে ডাকিয়ে উঠোনটা বাঁধাবার ব্যবস্থা করো—

সেজ ছেলে দেবু—হেডমাষ্টার—বলিলেন—এক্ষুণি।

ন ছেলে নিপু—ডাক্তার—তিনি ব্লাড প্রেশার মাপিবার যন্ত্রটা লইয়া প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন—ব্লাড প্রেশারটা আর একবার মাপা দরকার। বাহিরের বারান্দায় ছেলেমেয়েরা কলরব করিতেছিল। সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল লতিকার ছেলের গলা।

জগত্তারিণী হাসিয়া বলিলেন—ওলো লতি, খুব উঁচুদরের গলা হয়েছে যে তোর ব্যাটার। নিয়ে আয় ওকে আমার কাছে—

সমস্ত ঘটনার মূল সেই কাকটা পাশের বাড়ির চিলে কোঠার ছাতে বসিয়া নানা ভঙ্গীতে ডাকিতেছিল—ক—কক্—করর—,কিন্তু গোলমালে তাহা আর জগত্তারিণীর কানে গেল না।



সম্পাদকীয়

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান

বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক প্রকাশিত আমার "প্রাচীন হিন্দুস্থান" নামক পুস্তিকার মুখপত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "গল্প ও কবিতা বাঙ্‌লা ভাষাকে অবলম্বন ক'রে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তা'তে অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত মনে মননশক্তির দুর্ব্বলতা ও চরিত্রের শৈথিল্য ঘটবার আশঙ্কা প্রবল হ'য়ে উঠেছে।"

এ ভয় আমিও পাই। আমার বিশ্বাস কাব্যই হচ্ছে সাহিত্যের উত্তমাঙ্গ আর অলঙ্কারশাস্ত্রের মতে কাব্য মানে গল্প ও কবিতা। কিন্তু দুঃখের অথবা সুখের বিষয় যথার্থ কবিতা ও গল্প সকলে রচনা কর্‌তে পারেন না। ফলে অনেক গল্পে ও কবিতায় অক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। আর তা ছাড়া সাহিত্যকে আমি তা'র সঙ্কীর্ণ অর্থে কখনই গ্রাহ্য কর্‌তে পারি নি।

সাহিত্যের উন্নতির মানে তা'র সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি। ইতিহাস, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এমন কি দর্শনবিজ্ঞানও সাহিত্যের অন্তর্ভূত। এ সব বিষয়ে বাঙলা সাহিত্য যে দরিদ্র, তা শিক্ষিত লোক মাত্রই জানেন। আমি বহুকাল পূর্ব্বে দিল্লীতে গিয়ে এ কথা ব'লে আসি। আর বছর তিনেক আগে চন্দননগরে এ কথার পুনরুক্তি করি।

সাধারণ গল্প উপন্যাসের যে কোনও মূল্য নেই, তা'র প্রমাণ আমি বছর পঁচিশ আগে একদিন অকস্মাৎ পাই। আমি একদিন রামগড় ডাকবাংলায় আশ্রয় নিই এবং গোটা দিনটা সেখানেই কাটাই। এ সেই রামগড়, যেখানে সেদিন কংগ্রেসের অধিবেশন হ'য়েছিল। উক্ত ডাকবাংলায় অনেক বই ছিল। সবই ইংরাজী গল্প এবং উপন্যাস। এ সব বইএর নামও শুনি নি এবং লেখকদের নামও আমার কাছে ছিল সম্পূর্ণ অবিদিত। আমি কৌতূহলবশতঃ এদের পাতা উল্টে দেখলুম। বোধহয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যে ইংরাজের দল দেশী রাজারাজড়াদের উচ্ছেদ ক'রে ছোটনাগপুর আত্মসাৎ করেন, তাঁদেরই অবসর-বিনোদনের জন্য এ আবর্জ্জনা সংগৃহীত হ'য়েছিল। এমন খেলো আর জলো লেখা লোকে যে লিখ্‌তে পারে ও পড়্‌তে পারে, এ কথা ভেবে আমার মন দমে গেল। মনে হ'ল

এক শ' বৎসর পরে আমাদের লেখারও এই দুর্দ্দশা ঘটবে। আজ পর্য্যন্ত সে ভয় থেকে মুক্ত হই নি। পৃথিবীর অপর সব প্রচেষ্টার মত সাহিত্য রচনাও ব্যর্থ,—এই সত্যটি সেদিন আমার মনে ব'সে যায়। তবে এ জাতীয় সাহিত্যচর্চ্চায় ইংরাজ বীরপুরুষদের চরিত্রের কিছু শৈথিল্য ঘটেছিল কি না জানি নে। মনন-শক্তি যে প্রবল হয় নি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং ছোট গল্প ও ছোট কবিতার বন্যা যে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে মুক্তি দেবে না ও আমাদের মনকেও সরস করবে না, রবীন্দ্রনাথের এ আশঙ্কা অমূলক নয়।

রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন যে, 'বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক কর্‌বার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞান চর্চ্চার।' বিজ্ঞান বস্তুটি কি? বহুকাল পূর্ব্বে ৺অক্ষয় দত্ত একখানি বই লেখেন, তা'র নাম "বাহ্য বস্তুর সঙ্গে মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার"। বাহ্যবস্তুর সঙ্গে বাহ্যবস্তুর সম্বন্ধ নির্ণয় করবার শাস্ত্রের নাম বিজ্ঞান। বাহ্য বস্তুও সব পরস্পরের সঙ্গে নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। বাহ্য বস্তু মাত্রই কতকগুলি rules দ্বারা শাসিত। Julian Huxley বলেছেন যে: In science we learn about these rules. বহির্জগৎ অর্থাৎ "যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে শৃঙ্খলিত। এই শৃঙ্খলার জ্ঞানই বিজ্ঞান।

Science এর দুটি মার্গ আছে—জ্ঞানমার্গ ও কর্ম্মমার্গ। কর্ম্মমার্গে এই জ্ঞানের প্রসাদে মানুষ অপূর্ব্ব শক্তি লাভ করেছে। মানুষ আগে ছিল প্রকৃতির দাস, এখন প্রকৃতি হ'য়েছে মানুষের দাসী। এ কথা সকলেই জানেন।

তবে বিজ্ঞানের জ্ঞানমার্গের চূড়ান্ত কথা আমরা চূড়ান্ত ব'লে কখনও গ্রাহ্য কর্‌তে পারি নে। আমরা যারা এখনও উপনিষদের "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" এই মহাবাক্য গ্রাহ্য করি। আজ বিজ্ঞানও সেই কথা বল্‌ছে। তা যে বল্‌ছে, তা'র সংক্ষিপ্ত আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আশার কথা এই যে, বাঙালীর মন নূতন নূতন বিষয়ের প্রতি অনুকূল হ'য়েছে; যে সব বিষয়ের আলোচনা কর্‌তে হ'লে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চ্চা কর্‌বার প্রয়োজন হয়। আমার সুমুখেই দু'খানা বাঙলা বই রয়েছে, যার একখানিও কাব্য নয়। অর্থাৎ কবিতা বা গল্প নয়।

এর মধ্যে একখানি বইএর বিষয়ে দু'কথা বল্‌ব,—শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র রায়ের "ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান"। এ দুটিই ঘোর serious বিষয়। ধর্ম জিনিষটে হচ্ছে সনাতন। এই সনাতন ধর্মকে উচ্ছেদ ক'রে বিজ্ঞান মানুষের মনকে কি ক'রে অধিকার করছিল, এ পুস্তকে তার পরিচয় পাবেন। এর জন্যে লেখককে অনেক বই পড়তে হ'য়েছে এবং যা পড়েছেন তা জীর্ণ করতে হয়েছে। এবং তা করা অলস মনের কাজ নয়। শুধু তাঁ'র একটি কথা আমি মেনে নিতে পারি নে। তিনি বলেছেন যে science ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। আমি যতদূর জানি এ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন Marx. তিনি পলিটিক্সের মহাপুরুষ হ'তে পারেন, কিন্তু বিজ্ঞানের মহাপুরুষ ন'ন। তিনি বলেছেন যে ধর্ম মানুষের মনের আফিম, সুতরাং তা' বর্জ্জন করতে হ'বে। তথাস্তু। ধর্ম যদি আফিম হয়, পলিটিক্স হচ্ছে মদ। আজকের দিনে ইউরোপে যা' ঘট্‌ছে, তা' পলিটিকাল মদমত্ত মানবের বীভৎস মাতলামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

ধর্ম্ম হচ্ছে মনের ধর্ম। মন যে reality নয়, তাই প্রমাণ করেছিল Physics নামক বিজ্ঞান; তারি উপরে গড়ে তোলা হয়েছিল Scientific Philosophy. এই বৈজ্ঞানিক দর্শনই ছিল ধর্মবিশ্বাসের একমাত্র শত্রু।

এই Scientific Philosophy এ দেশের চার্ব্বাক দর্শনের পুনরুক্তি মাত্র। এ দর্শনের গোড়ার কথা হচ্ছে Matter ও Motion. আমরা যাকে মন বলি, তা' হচ্ছে Matter-এর একরকম বিকার মাত্র। ইংরাজি ভাষায় যা'র নাম epi-phenomenon.

নব Physics এই Scientific Philosophyর মূল উচ্ছেদ করেছে; তা'র মোটা কথাটারই উল্লেখ করব।

নব Physicsএর মতে atom ব'লে কোন বস্তু নেই, যা' আছে তা'র নাম Electron; আর Electron বস্তুকণা নয়, বিদ্যুৎকণা। অর্থাৎ যা আছে, তা হচ্ছে মনগ্রাহ্য, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। অতএব বাহ্য জগতের মূল উপাদান হচ্ছে idea,—যা'কে মনঃকণা বলা যায়।

নব Physicsএর নব আবিষ্কার Jeansএর মতে এই যে—reality হচ্ছে Universal mind, আর বহির্জগৎ তাঁ'র একটি thought মাত্র। আমাদের ভাষায় যা'কে বলে "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।"

বস্তুজগৎ নেই, আছে Universal mind ও আমাদের সংকীর্ণ mind.—এ সত্য নাকি বিলাতের বড় বড় সাহিত্যিকদের মনেও স্থান পেয়েছে।

Joad নামক বিলাতের জনৈক খ্যাতনামা দার্শনিক সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে লিখেছেন যে, খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি বিলাতের বহুলোক এখন উদাসীন হ'য়ে পড়েছে; উক্ত ধর্ম্মের dogmaতেও তা'রা অসন্তুষ্ট এবং তার ক্রিয়াকর্ম্মও উপেক্ষিত। তবে মানুষের মন ধর্ম্মমনোভাবকে মন থেকে তাড়াতে পারে না। ফলে বিলাতের মনীষীরা নূতন ধর্ম্মমনোভাবের সন্ধান পেয়েছেন। সে মনোভাব যে কি, তা'র পরিচয়স্বরূপ তিনি Aldous Huxleyর ক'টি কথা তুলে দিয়েছেন। সে কথা ক'টি এই:—

If individuality is not absolute, if personalities are illusory figments of a self-will disastrously blind to the reality of a more-than-personal consciousness, of which it is the limitation and denial, then all of every human being's efforts must be directed……to the actualisation of that more-than-personal consciousness.

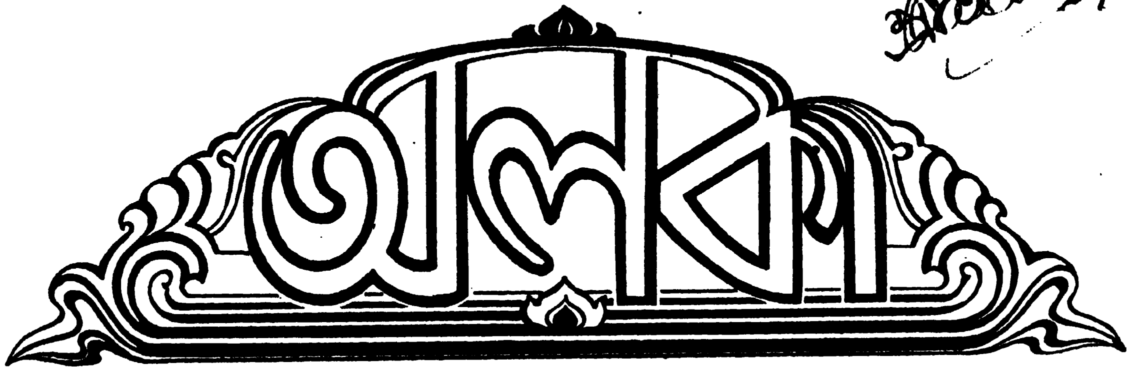
উপরোক্ত ইংরেজী কথা ক'টির নির্গলিতার্থ এই যে, আমাদের ক্ষুদ্র অহংএর গণ্ডী হ'তে মুক্তি না পেলে আমরা আত্মার সাক্ষাৎ পা'ব না। এ মুক্তিলাভের উপায় কি?—Joad বলেন সাধনা,—যে সাধনার পদ্ধতি এসিয়াবাসীরা জানে, ইউরোপীয়েরা জানে না। এই যুদ্ধের পরে বোধহয় ইউরোপীয়গণ ধ্যান ধারণা নিদিধ্যাসনে ব্রতী হবেন।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত
শ্রীপ্রমথনাথ মান্না কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, ২৫৯নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও ৩৬।১ এলগিন রোড হইতে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



আশ্রম বালিকা

শিল্পী—শ্রীরবীন ভট্টাচার্য্য



দ্বিতীয় বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭ { ৯ম সংখ্যা

সংস্কৃত-সাহিত্যের তিব্বত-বিজয়

মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী

(তেরশত বৎসর পূর্ব্বে তিব্বত দেশে শিক্ষার আলোক প্রবেশ করে নাই, ধর্ম্ম, সাহিত্য ও সভ্যতার লেশ মাত্র ছিল না। দেশবাসীর অবস্থা বর্ত্তমান আসামের বন্য নাগা, কুকিদের মতই ছিল। সপ্তম শতাব্দী হইতে হাজার বৎসর ধরিয়া তিব্বতে সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের ফলে কিরূপে ঐ দেশের লামা ও ভিক্ষুগণ সমগ্র বৌদ্ধজগতে ধর্ম্মগুরুর মর্য্যাদা লাভ করেন তাহাই এই প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।)

তেরশত বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে প্রবল-প্রতাপ স্রঙ্-সান-গ্যাম্পো (নরদেব) তিব্বতের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। তাঁহার দুই রাণীর মধ্যে একজন চীনসম্রাটের কন্যা, অপরা নেপালরাজ-দুহিতা। তাঁহারা দুইজনই ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। তাঁহাদের উৎসাহেই নরদেব তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে উদ্যোগী হইলেন, এবং ষোলজন সঙ্গীর সহিত সচিব-শ্রেষ্ঠ থোন্মি সম্ভোটকে মগধদেশে প্রেরণ করিলেন। এই সময়েই প্রসিদ্ধ চীন-পরিব্রাজক হুয়েন-সাং নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষা করিতেছিলেন। নরদেবের শ্বশুর চীন-সম্রাট্ তাই-সুঙের আনুকূল্যে তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে ভারতে আসিয়াছিলেন।

মগধের ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ আচার্য্যগণের নিকট বহুবৎসর নানা শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া থোন্মি সম্ভোট স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিব্বতে সে সময়ে লিপিবিদ্যার প্রচলন ছিল না। নাগরী বর্ণমালার আদর্শে তিব্বতী-লিপি উদ্ভাবন করিয়া তিনি ব্যাকরণ ও রচনা বিষয়ে আটখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। তিব্বতরাজ নিজে চারি বৎসরে এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিলেন। এই সময়েই রত্নমেঘ-সূত্র, কারণ্ডব্যূহ প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থ সংস্কৃত হইতে তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়। এই সকল গ্রন্থের সাহায্যে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইলে প্রজাবৃন্দ ন্যায়পরায়ণ নৃপতির অনুরক্ত হইয়া পড়িল। এই জন্যই নরদেবের নাম হইল 'স্রঙ্-সান্-গ্যাম্পো' অর্থাৎ অকপট, ন্যায়বান, অগাধসত্ত্ব। ভক্তিনত প্রজাপুঞ্জ মনে করিত, নরদেব অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধেরই অবতার। তাঁহার রাজত্বকালে সম্ভোট, ধর্ম্মকোশ, ব্রাহ্মণপণ্ডিত শঙ্কর, [illegible]া হুব-সন, নেপালগুরু শীলমঞ্জু প্রভৃতি বহু পিটক-গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে

সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত এইরূপ অনুবাদকার্য্য অবিচ্ছেদে ও পূর্ণোদ্যমেই চলিয়াছিল। শত সহস্র সংস্কৃত গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ভাষান্তরিত হইয়াছিল, এবং সকলেই তাহা পড়িয়া বুঝিতে পারিত। অনুবাদ এতই স্পষ্ট, অবিকল ও মূলানুগত যে, বহু সংস্কৃত পুঁথির সাহায্যেও যথার্থ পাঠনির্ণয়ে সন্দেহ হইলে তিব্বতীয় অনুবাদ দেখিলেই সংশয় দূর হয়। বিশ্বের অনুবাদ-সাহিত্যে এইরূপ মূলানুগত্য আর কোথাও দেখা যায় নাই। অনুবাদক পণ্ডিতগণ প্রত্যেক সংস্কৃত শব্দের অবিকল তিব্বতীয় প্রতিশব্দ প্রয়োগ করিতে উৎসুক থাকিতেন। কিন্তু অনেক ভুল থাকিলেও তাঁহাদের অনুবাদের ভাষা বিশুদ্ধ তিব্বতী। সেকালে উহা সুপাঠ্য ছিল, কিন্তু একালে অনেক স্থলে দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে, কারণ কালক্রমে উচ্চারণ বিকৃতি ও ব্যাকরণগত পরিবর্ত্তনের ফলে অন্যান্য ভাষার ন্যায় তিব্বতী ভাষারও রূপান্তর হইয়াছে। সাধারণ ইংরাজ যেমন প্রাচীন ইংরাজী বুঝে না, তিব্বতীরাও সেরূপ প্রাচীন তিব্বতী বুঝিতে পারে না।

বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ ভিন্ন আরও অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছিল, যথা কলিদাসের মেঘদূত প্রভৃতি কাব্য, দণ্ডীর কাব্যাদর্শ, রত্নাকরের ছন্দোরত্নাকর, জ্ঞানশ্রীমিত্রের বৃত্তমালা-স্তুতি ; পাণিনিসূত্র ও রামচন্দ্রের প্রক্রিয়াকৌমুদী, চন্দ্রগোমীর চান্দ্রব্যাকরণ, শর্ব্ববর্ম্মার কলাপ, অনুভূতিস্বরূপাচার্য্যের সারস্বত ; রবিগুপ্তের আর্য্যাকোষ, আর্য্য শূরের সুভাষিত-রত্নকরণ্ড ; অমরকোষ ও সুভূতিচন্দ্রকৃত কামধেনুটীকা, শ্রীধরসেনের মুক্তাবলী বা বিশ্বলোচন অভিধান , বাগ্‌ভটের অষ্টাঙ্গহৃদয় ও সর্ব্বহিত মিত্রদত্ত-কৃত ব্রহ্মবেদ-শার্ঙ্গধরচরক-টীকা, শালিহোত্রের অষ্টায়ুর্ব্বেদসংহিতা ; নগ্নজিতের চিত্রলক্ষণ, আত্রেয়-কৃত প্রতিমা-মান লক্ষণ ; ঈশ্বর রচিত সর্ব্বেশ্বর-রসায়ন ; সামুদ্রিক-ব্যঞ্জন-বর্ণন ; স্বরোদয়ার্থসংগ্রহ—ইত্যাদি ইত্যাদি। সর্ব্বসমেত অনুবাদগ্রন্থের সংখ্যা ৪,৫৬৬—তন্মধ্যে কতগুলি অপভ্রংশ ও চীনভাষা হইতে অনূদিত। এই সকল গ্রন্থ কাষ্ঠখোদিত ব্লক হইতে মুদ্রিত হইত। এখন ভারতের মধ্যে মাত্র ছয়টি গ্রন্থগারে এই তিব্বতীয় গ্রন্থমালা সংগৃহীত হইয়াছে—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে, রয়েল এসিয়াটিক অব্ বেঙ্গলে, শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীতে, পাটনার বিহার-উড়িষ্যা রিসার্চ্চ সোসাইটিতে, এবং মাদ্রাজ আদেয়ারের থিয়সফিক্যাল সোসাইটিতে।

অনুবাদ-গ্রন্থ ভিন্ন তিব্বতীভাষায় নানা বিষয়ে শত শত মূল গ্রন্থও রচিত হইয়াছে, যথা—(১) ইতিহাস, (২) জনশ্রুতি, কথা ও কাহিনী, (৩) বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস, (৪) অবদান অর্থাৎ মহাপুরুষ-চরিত, (৫) মোক্ষকথা, (৬) লেখমালা (৭) প্রাচীন লেখমালা, (৮) পুরাবৃত্ত, (৯) রাজবংশ, (১০) রাজবংশ-কল্পদ্রুম। স্থানীয় কথাকাহিনী, কাব্য ও গীতিকবিতা ভিন্ন প্রায় সমগ্র তিব্বতীয় সাহিত্যই সংস্কৃতসাহিত্য হইতে ভাষান্তরিত। প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের অনুবাদও কিছু আছে। তিব্বতীয় অনুবাদ হইতে আবার বহু গ্রন্থ মোঙ্গল, মাঞ্চু ও চীনভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ইউরোপে লাতিনের ন্যায় মোঙ্গলিয়া, মাঞ্চুরিয়া, ও মধ্য এসিয়ায় তিব্বতী ভাষা এইরূপে ধর্ম্ম, সংস্কৃতির ও শিক্ষার বাহন হইয়াছিল।

মনীষী শরচ্চন্দ্র দাস তিব্বতীয় সাহিত্যের তিন যুগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সপ্তম হইতে চতুর্দ্দশ শতক পর্য্যন্ত (৬৫০—১৪০০) আদি যুগ, অর্থাৎ সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদের যুগ, অর্থাৎ সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদের যুগ। মোঙ্গল দিগ্বিজয়ী চেঙ্গিস খাঁ ১২০৫ সালে তিব্বত জয় করেন। কাশ্মীরী পণ্ডিত শাক্যশ্রী সেই সময়ে তিব্বতে আগমন করেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি মগধদেশে ছিলেন, এবং তুরুস্ক সৈ

বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক নালন্দা, ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীলা বিহার-বিধ্বংস ও লুণ্ঠন স্বচক্ষে দর্শন করেন।

পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতক পর্য্যন্ত (১৪০০—১৭০০) মধ্য যুগ। এই তিনশত বৎসরকাল তিব্বতী পণ্ডিতগণ চীনসাহিত্যের সবিশেষ চর্চ্চা করেন এবং দেশপ্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন, কথা ও কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। এইরূপে তিব্বত-সাহিত্যে নবযুগের আবির্ভাব হইল, এবং বৌদ্ধধর্ম্মও নব প্রেরণা লাভ করিল।

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে বর্ত্তমান যুগের আরম্ভ। এই যুগেই তিব্বতী ভাষা এসিয়ার পূর্ব্বাঞ্চলের দেবভাষারূপে গণ্য হইয়াছে।

শতবর্ষ পূর্ব্বে হাঙ্গেরীদেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সোমা ডি কোরোস ইংরাজ সরকারের সহায়তায় বহুকাল বাস করিয়া তিব্বতী শিক্ষা করেন। তিনি তিব্বতী ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন করেন, এবং এসিয়াটিক রিসার্চ্চ ও এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তিব্বত-সংক্রান্ত বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ঐ সকল প্রবন্ধ এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইরাছে।

প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে চট্টগ্রামের শরচ্চন্দ্র দাস দার্জ্জিলিং তিব্বতী বোর্ডিং স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন। তিব্বতী শিক্ষা করিয়া ভারতসরকারের অনুরোধে তিনি চারিবার তিব্বতে গিয়াছিলেন। তিব্বত-সংক্রান্ত দৌত্যকার্য্যে সহায়তার জন্য ভারত-সরকার তাঁহাকে চীন-রাজধানী পিকিঙে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র-রচিত অবদান-কল্পলতার লুপ্তপ্রায় মূলগ্রন্থ ও তাহার তিব্বতীয় অনুবাদ, কাব্যাদর্শের অনুবাদ ভদ্রকল্পদ্রুম নামক ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস প্রভৃতি বহু প্রাচীন গ্রন্থ শরচ্চন্দ্র প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তিব্বতীয় বিষয়ে তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধমালা প্রকাশিত হইয়াছিল। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি 'তিব্বতী হইতে ইংরাজী অভিধান' মুদ্রিত হয়।

প্রাচীন কালের শত শত সংস্কৃত গ্রন্থরত্ন চিরতরে লুপ্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তিব্বতীয় অনুবাদের সাহায্যে তাহার মধ্যে অনেকগুলি পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারে। এইরূপে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও ধর্ম্মমতের বিস্মৃত তত্ত্ব ও তথ্যের সন্ধান লাভের জন্যই তিব্বতী ভাষা আয়ত্ত করা প্রয়োজন।*

কাম ও প্রেম

শ্রী মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

হৃদয় মাঝে
আগুন জ্বলে
কামের মহা মত্ততায়;
প্রেমের ধারা
ছুটলে পরে
অশান্ত প্রাণ শান্তি পায়!

বন্ধুভাবে
শত্রু যে কাম
মরণ তাহার চরম দান;
দীনতা ও
অনুরাগে
প্রেমই মিলায় ভগবান!

* ইংরাজী হইতে শ্রীপ্রমথ নাথ সরকার কর্ত্তৃক অনূদিত

আগমনী

গিরিজাকুমার বসু

যুগে যুগে বুক-ভাঙা দুখে
সোহাগের হিয়া-ভরা অসহ তৃষায়
চাহিয়াছি জগতের মুখে,
বিরহের মসীঘন তিমির নিশায়
নিদারুণ বেদনা-বিবশ,
দরদীর খুঁজেছি পরশ,
কোনোদিন স্নেহ কারো পাইনিকো লেশ,
ভাবিয়াছি এ ব্যথার নাহি বুঝি শেষ,
বিরস অধর চুমি'
হেনকালে এলে তুমি
অনুপমা আশা-সঞ্জীবনী
হরষের হেম-আগমনী।

*   *   *   *

কিছু ভালো লাগেনিকো চোখে ;
দিকে দিকে সুন্দরের ক'রেছি সন্ধান
কতকাল এই মর্ত্ত্যলোকে,
আঁখিজলে পাঠায়েছি কাতর আহ্বান
"কোথা তুমি আছ মনোহর ?"
আসে নাই কাহারো উত্তর,
বলিয়াছি হা বিধাতা কারে করি দ্বেষ
ধরা হতে রূপ তুমি করিলে নিঃশেষ ?
তুমি এসে সেইক্ষণে
ধরা দিলে আলিঙ্গনে,
লাবণ্যের ইন্দ্রনীলমণি,
সুষমার স্নিগ্ধ আগমনী।

*   *   *   *

বার বার মনোরথ মোর
জীবনের গতিমাঝে হারায়েছে পথ,
কটু স্বার্থ কুলিশ-কঠোর
তাহার উচ্ছেদতরে ক'রেছে শপথ,
শঙ্কাহত বেপথু অন্তর
দেখিয়াছে নিত্য নিরন্তর
মৃত্যুমুখী পীড়নের সে কি বিভীষিকা !
সে নিমেষে তুমি দিলে অভয়ের টিকা
আমার ললাট প'রে,
বসুধা সুধার ভরে
ভরি,' তুমি এলে বিমোহনী
মরমের প্রেম-আগমনী।

সহযাত্রিণী

মণীন্দ্রলাল বসু

হাওড়া ষ্টেশন।

পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্ম্মে বোম্বে মেল দাঁড়িয়ে।

সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। নানাবেশী নানাভাষী যাত্রী-জনতার চঞ্চল বন্যা বৈদ্যুতিক আলোকমালার তীব্র দীপ্তিতে অর্থহীন অদ্ভুত মূর্ত্তিস্রোতের মত। হাঁকাহাঁকি, ঠেলাঠেলি, ছুটোছুটির অন্ত নেই।

ষ্টেশনের এই জনতার দিকে ক্লান্ত চোখে চেয়ে কল্যাণ কুমার ঘোষ পাইপে তামাক ভরলে। ইংলণ্ডে সে যে তামাক খেত সে তামাক সে অনেক খুঁজে যোগাড় করেছে হিসেব করে খরচ করতে হবে। কিন্তু তাড়াতাড়ি ভরতে গিয়ে খানিকটা তামাক প্ল্যাটফর্ম্মে পড়ে গেল। চারিদিকের ভিড়ে কোলাহলে তার মাথা ধরে গেছে।

কল্যাণ সদ্যইংলণ্ডপ্রত্যাগত বেকার যুবক। ইয়োরোপীয় জীবনের রঙীন আভা তখনও তার চোখে লেগে আছে সুখস্বপ্নস্মৃতির মত। প্যারিসের গার্ দ্য নর্ডের জনতার রূপ তার চোখে ভেসে উঠল। সে জনতার উদ্বেল তরঙ্গলীলায় যেমন একটা ছন্দ আছে তেম্নি রঙের ঝলমলানি, ইম্প্রেসনিষ্ট চিত্রকরের চিত্রপটের নানা বর্ণের ছোপের মত। এ জনতার গতি অসংলগ্ন, বর্ণের বৈচিত্র্য বা উজ্জ্বলতা নেই।

পকেট থেকে ছোট্ট ঝক্‌ঝকে পেট্রোল-দেশলাই বাহির করে কল্যাণ পাইপে অগ্নিসংযোগ করলে। ছোট ভাগ্নি দীপিকা পাশে দাঁড়িয়েছিল, আইস-ক্রীম বিক্রেতার গাড়ী কাছে এলেই ডাকবে। ঝক্‌ঝকে পেট্রোল-দেশলাই দেখে সে লাফিয়ে উঠল। এমন আশ্চর্য্যকর দেশলাই সে আগে কখনও দেখেনি। একটা কল টিপ্‌লে আগুন জ্বলে ওঠে। সে ব্যগ্র হয়ে বল্লে, রাঙামামা, আমাকে দাও একবার, আমি জ্বালব না, শুধু হাতে ধরে থাকব।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মহিলা-গাড়ী হতে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে শিবাজী চেঁচিয়ে উঠল, আমি একবার জ্বালাব দিদি।

সরোজিনী ছোট খোকার বিছানা পাত্‌তে পাত্‌তে ধমক দিয়ে উঠল, শিবু আবার জানলায় মুখ বাড়িয়েছ, দীপা দিয়ে দাও দেশলাই—

দেশলাই পাবার কোন আশা নেই দেখে শিবু চেঁচিয়ে উঠল, রাঙামামা ইঞ্জিন দেখাবে বলেছিলে, ইঞ্জিন—

সরোজিনী একটু হতাশের সুরে বল্লে, দাদা, শিবুকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে এস, বড্ড গোলমাল করছে, আমি ততক্ষণ বিছানাগুলো পেতে নি।

মায়ের অনুমতি পেয়ে শিবাজী দরজা খুলে প্ল্যাটফর্ম্মে লাফিয়ে পড়ল। সরোজিনী একটু ভীতভাবে পঞ্চম সন্তানের দিকে চাইলে। ছোট খোকাকে নিয়ে সে ব্যস্ত তাদের দিকে মনোযোগ দিতে পাচ্ছে না। রায়গড়ে জন্ম হয়েছিল বলে তার নাম দেওয়া হয়েছিল, শিবাজী। সরোজিনীর আপত্তি ছিল, তার স্বামীই জোর করে এ নাম দিয়েছিলেন, এখন নামের গুণে ছেলেটি দিন দিন দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠছে।

সরোজিনী চেঁচিয়ে বল্লে, দাদা ওদের হাত ধরে নিয়ে যেও, আর আইস-ক্রীম দিও না। খোকা চেঁচিয়ে ওঠাতে আর কিছু বলা হল না। সরোজিনী ভাবতে লাগল, বোম্বেতে বোধ হয় টেলিগ্রাম করা হয়নি, দাদা নিশ্চয় ভুলে গেছে।

সরোজিনীর স্বামী বোম্বেতে বড় কাজ করে। কল্যাণ এসেছিল তাদের গাড়ীতে তুলে দিতে। সরোজিনীর বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কল্যাণও তাদের সঙ্গে যায়, কিন্তু মায়ের মনে বিশেষ আপত্তি বুঝে কিছু বলে নি। মায়ের ভয়, বোম্বে গেলে কল্যাণ হঠাৎ কোন দিন কোন ইয়োরোপগামী জাহাজ চড়ে বসবে। অনেক চিঠি লেখা ও টেলিগ্রামের পর সাত বছর পরে কল্যাণ বাড়ী ফিরেছে। সেজন্য জগৎ-তারিণীকে রীতিমত একটি অসুখ পাকিয়ে তুলতে হয়েছিল। এখন সে ছেলেকে তিনি সহজে ছাড়তে রাজী নন।

সরোজিনীর দৃষ্টির আড়াল হতেই কল্যাণ তার ভাগ্নে ভাগ্নির হাত ছেড়ে দিল, তারা ছুটে চল্ল সামনে। হন্‌হন্

করে সে-ও চল্ল। দ্রুতছন্দে চলার বিলিতী অভ্যাস ছ'মাসের মধ্যেই চলে যায় নি।

পাইপটা হাতে ধরে কল্যাণ নাড়া দিলে। তামাকটা একটু কড়া, ঠিক সেই স্বাদ, সেই গন্ধ পাওয়া যাচ্ছেনা। ভায়লেট এ পাইপ তাকে উপহার দিয়েছিল, আর তিন কৌটা তামাক। সে তামাকের স্বাদ গন্ধ কেন পাওয়া যায় না! ভায়লেট! সে এখন কোথায় কে জানে! নিশ্চয় গ্লাসগোতে নেই। ছ'মেল তার কোন চিঠি পাওয়া যায় নি।

পাইপ টানতে টানতে কল্যাণ এগিয়ে চল্ল। চেহারা লম্বা নয়, কিন্তু ছিপ্‌ছিপে বলে তাকে বেঁটে দেখায় না; স্নিগ্ধ গৌর মুখশ্রী; বোম্বে-বন্দরে যখন সে নেমেছিল তখন এ গৌরবর্ণের ঘন রক্তিমতা ছিল, এখন এ রঙ ফ্যাকাসে, ঘসা কাচের মত জৌলস-হীন। মুখখানি গোল, এখন একটু কৃশ দেখায়, পাকা আম শুকিয়ে চুপ্‌সে গেলে যেমন হয়। প্রথমেই চোখে পড়ে খুব ছোট-করে চুল-ছাটা বড় মাথা, ভারী নিরেট ওলের মত। দেখে মনে হয় না, সেই মাথার মধ্যে পরমাণু-তত্ত্বের নূতন নূতন থিওরী, অঙ্কশাস্ত্রের বড় বড় ফরমুলা, জাহাজ তৈরি করবার নানা নব পরিকল্পনা ভর্ত্তি আছে। সুন্দর সরু নাকের ছ'পাশে দীপ্ত চোখ ছ'টি দেখলেই বোঝা যায় এ তীক্ষ্ণধী। উজ্জ্বল চোখ ছ'টির উপর এখন ক্লান্তির ঔদাস্যের ছায়া এসে পড়েছে, যেমন তার গৌরবর্ণ মুখকান্তির ওপর পাইপের ধূম্রজাল ছড়িয়ে পড়ছে।

ক্রীম ব্লাউজ ধরণের সোনালী সিল্কের ঢিলে পাঞ্জাবী পরা; দেশী ধুতির কালোপাড় কোচা লুটিয়ে পড়েচে; পায়ে তালতলার নব সংস্করণের কটকী চটিজুতা; বেশের বাহুল্য নেই কিন্তু সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ব আছে; বিলাতে দীর্ঘকাল থেকেও সে বাঙ্গালীয়ানা ভোলেনি।

ইঞ্জিন তখনও এসে পৌছায়নি। কি একটা গোলমাল হয়েছে। ক্ষতিপূরণস্বরূপ দীপু ও শিবুকে আইস-ক্রীম খাওয়াতে হল।

ফেরার পথে কল্যাণ প্রথম শ্রেণীর এক কুপের (coupe) সামনে থমকে দাঁড়াল। পাইপে লম্বা টান লাগিয়ে সে শিবুর হাত ছেড়ে দিলে। গাড়ীর ভেতর রূপবতী বাঙ্গালী মহিলা একা বসে। গজদন্তশুভ্র কপোলের এক অংশ দেখা যাচ্ছে, চিবুকের চারু-রেখা যেন সুদূরে বিলীন, ঘননীল বর্ণের ব্লাউজের কোলা হাত রক্তবর্ণ স্থলপদ্মের মত। নয়নানন্দকর এ রূপলাবণ্য।

কল্যাণ চমকে উঠল। এ মুখ ত তার চেনা। ওই কালো ভুরুর টান, কপোলের কুঞ্চন, চিবুকের বঙ্কিমভঙ্গী, ওই মুখের প্রতি রেখা, ওই অদ্ভুত শুভ্র রঙ, বুঝি তার জানা। যেন কোন অপূর্ব্ব অজানা দেশে স্বপ্নে দেখেছিল তারপর ভুলে গিয়েও ভুলতে পারে নি।

পাইপের আগুন নিভে গেছে। দীপার হাত ধরে কল্যাণ এগিয়ে চল্ল। সরোজিনী উদ্বিগ্নভাবে জানলায় মুখ বাড়িয়ে আছে। চেঁচিয়ে বল্ল, দাদা আর গাড়ী ছাড়বার বেশী দেরী নেই, ওদের তুলে দিয়ে গাড়ীর দরজা বন্ধ করে দাও।

গাড়ীতে এক বর্ষীয়সী মহিলা উঠে হাঁপাচ্ছেন। তিনটি ট্রাঙ্ক, ছ'টো বস্তা, গুড়ের নাগরি, চারটে পুঁটলি, তাঁর জিনিষপত্তরে গাড়ীর ভেতর ভরে গেছে।

তক্‌মা-পরা এক চাপ্‌রাসী এসে কল্যাণকে লম্বা সেলাম করে বল্লে, মেমসাহেব আপনাকে সেলাম দিয়েছেন।

মেমসাহেব যে কে তা কল্যাণ বেশ জানে, তবু আশ্চর্য্যের ভান করলে।

সরোজিনী উদ্বিগ্ন হয়ে বল্লে, না, দাদা, তুমি এখন কোথাও যেও না, টেলিগ্রাম করেছ?

পাইপ ধরিয়ে কল্যাণ বল্লে, এক মিনিট, আমি আস্‌ছি, এখনও গাড়ী ছাড়তে দেরী আছে।

শিবাজী বলে উঠল, হাঁ, মা, এখনও ইঞ্জিন লাগেনি।

কৃষ্ণ ভ্রূলতার তলে আয়ত নয়নের কৃষ্ণতারকার রূপ তেমনি জ্যোতির্ম্ময়, তেমনি মায়াময়, তেমনি রহস্যঘন। কল্যাণের বুকের রক্ত দুলে উঠল। অন্তরের এ অপূর্ব্ব শিহরণ সে বহুদিন অনুভব করেনি। ইয়োরোপে তাকে একেবারে blase করে দেয় নি। মুগ্ধ হয়ে সে চেয়ে রইল।

—কল্যাণ নাকি!

—তাইত মনে হচ্ছে।

—মনে ত হচ্ছিল না, পেয়াদা দিয়ে মনে করিয়ে দিতে হল, ভেতরে এসো।

—গাড়ী ছাড়তে বোধ হয় বেশী দেরী নেই।

—টাইম-টেবিল অনুসারে নেই, কিন্তু ছাড়তে দেরী হবে।

দরজা খুলে কল্যাণ গাড়ীতে প্রবেশ করল।

—ভাই, পাইপটা—

—ভেরি সরি, মনে ছিল না।

অনেক কথাই ধীরে ধীরে কল্যাণের মনে হল। মনে পড়ল, অনুপমা এখন অতি উচ্চপদস্থ এক ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট অফিসারের স্ত্রী; মনে পড়ল, তামাকের ধোঁয়া অনুপমার সহ্য হয় না; মনে পড়ল, গলাকাটা ব্লাউজের রঙীন লেসের ফাঁক দিয়ে যে সুচিক্কণ শুভ্রচর্ম্মের আভা দেখা যায়, তাহারি কোমল আবরণতলে বক্ষপঞ্জরের মধ্যে দক্ষিণ ফুসফুসে যক্ষ্মা-জীবাণুর সঙ্গে সংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাস গোপনে লেখা আছে। হৃদ-যন্ত্রের ধক্‌ধক্ শব্দে সে সংগ্রামের জয়ধ্বনি কি অহর্নিশি বাজ্‌ছে, অথবা সে যুদ্ধ চলছে দিন রাত ধরে?

—কি দেখ্‌ছ, মোটা হয়েছি!

—বোধ হয় হয়েছ, কেমন আছ আজকাল?

—কেমন আছি? বেশ আছি, মন্দ কি, জ্বরটা অনেক দিন হয়নি—তারপর, কবে ফিরলে, এসে একটা খবরও দাওনি!

—মা'র অসুখে কোথাও যাওয়া হয়নি।

—হাঁ, জেঠাইমার অসুখ করেছিল, শুনেছিলাম, কেমন আছেন তিনি?

—মা'র অসুখের জন্যই ত তাড়াতাড়ি ফিরতে হল, গ্লাসগোতে কোর্স টা শেষ করে আসতে পারলুম না।

—তোমার ত কেম্ব্রিজে ডিগ্রি হয়ে গেছে।

—হাঁ, তারপর গ্লাসগোতে গেছলুম জাহাজ তৈরি শিখতে; খুব সুবিধা পাওয়া গেছল—

—ভালই করেছ, চলে এসেছ, শুনছি শীগগীর যুদ্ধ বাধবে।

কল্যাণের চোখে গ্লাসগোর ঘরের ছবি ভেসে উঠল। কাচের টেবিলের ওপর ককটেলের গেলাস। মিণ্টি ইজিচেয়ারে ভায়লেট এলিয়ে বসে। কি গভীর নীল তার চোখ! আর অনুপমার চোখ কি ঘন কৃষ্ণ! ভায়লেটের বাবা এক বড় পোত-নির্ম্মাতা কোম্পানীর ডিরেক্টার; তাঁরি সুপারিশে সে জাহাজ তৈরি শেখার সুবিধা পেয়েছিল। কল্যাণ চুপ করে রইল।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করে অনুপমা বল্লে, জেঠাইমা কেমন আছেন বল্লে না ত?

—মা, একরকম সেরে গেছেন, এ বয়সে এদেশে এর চেয়ে আর কি ভাল থাকবেন!

—দেখতে যাবার বড় ইচ্ছে ছিল।

—কিন্তু অন্য নানা ইচ্ছার মত কার্য্যে পরিণত হয়নি।

—ঠিক বলেছ। আমি যে কি বন্দিনী তুমি জাননা—

কল্যাণ অনুপমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাইল। অধর রাঙ্গা হয়ে উঠেছে, কালো চোখ শ্রাবণের জলভরা মেঘের মত আরও ঘন কালো।

—বন্দিনী, মুক্তির প্রতীক্ষায় বসে আছ? এ বন্ধন বড় সুখের!

—ঠাট্টা নয়, কল্যাণ। জানত সহর থেকে দূরে থাকতে হয়, তবে গঙ্গার ধারে বাড়ীটা বড় সুন্দর, মস্ত বড় আমবাগান আছে, সেই রাজসাহীর আমবাগানের মত—

—বা, এমন জানলে একদিন যেতুম।

রাজসাহীতেই দুই পরিবারের মধ্যে পরিচয় হয়, কল্যাণের মা অনুপমার জেঠাইমা হলেন। তারপর কলিকাতায় সে হৃদ্যতা ঘনীভূত হয়েছে। বন্ধু-মহল অনেক রকম অনুমান ও ঠাট্টা করেছে। কল্যাণ হঠাৎ বিলেত চলে যাওয়াতে সবাই বিস্ময় প্রকাশ করেছিল। তারপর অনুপমা যখন জগদীশকে বিবাহ করলে, বন্ধু-মহল আরও বিস্মিত হলেও, বিজ্ঞ-জনেরা বল্লে, অনুপমার সংসার-জ্ঞান আছে, যৌবন চাঞ্চল্যে শুভবুদ্ধি হারায়নি। বিবাহের ছ'মাস পরেই ঘুসঘুসে জ্বর আরম্ভ হল।

অনুপমা বলে যেতে লাগল, তারপর জানত, ওই পোড়া অসুখ, কখন যে তার কি মর্জ্জি হয়, শুয়ে আছি ত দিনের পর দিন শুয়েই আছি। তারপর ডাক্তারদের যদি অনুমতি পাওয়া গেল বাহির হবার, ভদ্রলোকের আর সময় হয় না, কাজ, খালি কাজ,—আর আমাকে একাও কোথা যেতে দেবেন না—খালি কাজ—

—এখানে ত একা ছেড়ে দিয়ে গেছেন দেখছি।

—দেখ না, এসেই গেছেন টেলিফোন করতে, এতদিন পরে ছুটি মঞ্জুর হয়েছে—কিন্তু ডাক পড়লেই ছুটে আসতে

হিরন্ময়। সবই ডাক্তারি বই। তোমার যদি কোন বই পড়তে ইচ্ছা করে বোলো—আনিয়ে দেবো।

বরুণ। বড্ড আঁকতে ইচ্ছে করে আমার। এখন কি আমি একটুও আঁকতে পারিনে ?

হিরণ্ময়। না, না, ছবি আঁকা-টাকা এখন চলবে না। সারা জীবনই তো প'ড়ে আছে।

বরুণ। সারা জীবন! জীবনকে কৃপণ ভেবে-ভেবে অভ্যেস খারাপ হ'য়ে গেছে। একটি-একটি ক'রে দিন যেতো, আর ভাবতাম—জীবন ফুরিয়ে এলো। এখন সবই বদ্‌লে গেছে।

হিরণ্ময়। ওর ইজি-চেয়ারটা একটু জানলার দিকে ঠেলে দাও, মালতী, পায়ে রোদ লাগুক। আর শোনো, একজন নর্স সারাদিনই রেখো।

মালতী। দরকার আছে ?

হিরণ্ময়। আছে দরকার। তুমি কাছাকাছি থেকো, তাহ'লেই হবে।

মালতী। আমার হাত থেকে সব কাজই কেড়ে নেবেন ?

হিরণ্ময়। ও-সব কাজ নর্সরাই ভালো পারবে তোমার চাইতে। মাঝে-মাঝে তুমি বেরোও তো বাড়ি থেকে ?

মালতী। না, কোথায় আর যাবো ?

হিরণ্ময়। মাঝ-মাঝে একটু ঘুরে আসা উচিত। বরুণের পক্ষে যা দরকার, তোমার পক্ষে তা অস্বাস্থ্যকর। ইচ্ছে হ'লে একটা গাড়ি নিয়ে যেয়ো।

বরুণ। কাকাবাবু, আপনার নাকি তিনখানা গাড়ি ? তিনখানা গাড়ি দিয়ে কী হয় ?

হিরণ্ময়। কী আবার হবে। বদ্‌খেয়াল।

বরুণ। জানেন, এখানে আসবার পর নিজেকে আমার রীতিমতো রাজার মতো লাগছে। এত বড়ো বাড়ি, এত চাকরবাকর, আর ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় যখন যা দরকার এসে হাজির হচ্ছে। বিশ্বাস করা শক্ত। আপনি এখন অনুতাপ করছেন না তো ?

হিরণ্ময়। কিসের জন্য ?

বরুণ। আমাকে এখানে রেখেছেন ব'লে।

হিরণ্ময়। না—অনুতাপ করছি না ব'লে নিজেই অবাক হচ্ছি। রাজারা, মন্ত্রীরা, নেতারা, সমস্ত ভারতবর্ষের ধনী ও মানী আমার কাছে আসে চিকিৎসার জন্য। তারা অনেকেই আমার বন্ধু, কিন্তু বন্ধুরাও আমার পাওনা চুকিয়ে দেয়—মনে করে টাকা না-দিলে চিকিৎসায় তেমন মন দেবো না। আমাকে ওরা কখনো ভুলতে দেয় না যে আমি ডাক্তার।

বরুণ। আপনার কী দারুণ রোজগার আমি বোধ হয় তা ধারণাও করতে পারবো না ?

হিরণ্ময়। লক্ষ টাকা এসেছে এই হাতে, লক্ষ টাকা উড়ে গেছে। টাকার কোনো মূল্য নেই আমার কাছে। এদিকে এমন অনেক লোক এসে আমাকে পুরো ফী দিয়ে যায়, ঐ টাকাটা জোগাড় করতে যারা প্রাণান্ত হয়েছে। এমনি প্রাণের দায়। (হেসে) রোগের হাত থেকে যদি বা তারা রেহাই পায়, ডাক্তার তাদের মারে।

বরুণ। না, না, ও-কথা বলবেন না। আপনারা মৃত্যু-বিজয়ী বীর, আপনাদের কাছে আমরা সকলেই তো ঋণী। সে-ঋণ এতই বড়ো যে রোগীদের সাধ্য কি আলাদাভাবে তা শোধ করে। আপনি

এক কাজ করেন না কেন? খুলে দিন না আপনার দরজা সকলকে, অন্ধকারে গুমরে যারা কাঁদে তারা সকলে আসুক, স্বাস্থ্য আর দীর্ঘায়ুর বর নিয়ে চ'লে যাক্।

হিরণ্ময়। ছেলেমানুষ!

মালতী। কিন্তু আপনিই তো বললেন যে টাকা আপনার পক্ষে অর্থহীন।

হিরণ্ময়। এ-ই তো মজা। টাকার আমার দরকার নেই অথচ টাকার একটা উঁচু দেয়াল দাঁড় করিয়ে রাখতেই হয়, নয়তো লোকের ভিড়ে আমি যে দু'দিনেই পাগল হ'য়ে যাবো! আর ডাক্তারি ভালো লাগে না আমার—প্রায়ই ইচ্ছে করে, সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে কোনো জঙ্গলে এক কুঁড়ে ঘরে বাসা বাঁধি।

বরুণ। হয়তো এটাও আপনার মনে হয় যে টাকা যাদের নেই তারাই সুখী?

হিরণ্ময়। মানুষ গরিব ব'লে, দুঃখ হয় না, মানুষ কাপুরুষ ব'লে লজ্জা হয়। চড়া সুদে ধার ক'রে আমার ফী জুটিয়েছে কত লোক, কক্ষনো কেউ বলেনি—দেবো না, মশাই, আপনার টাকা। কেউ বলেনি আপনাকে ছাড়া এ-রোগের চিকিৎসা হবে না, আসতেই হবে আপনাকে। এ-কথাও শুনিনি কারো মুখে—টাকা আবার কিসের? তুমি আমার বন্ধু না?···যে-কোনো লোকের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ টাকার হৃদয়হীন ধাতু দিয়ে গড়া। আমার আত্মীয় নেই, আমার বন্ধু নেই। আমার কাছে এলে সকলেই মমতাহীন, মেরুদণ্ডহীন হ'য়ে পড়ে।···তুমিই প্রথম, বরুণ যে আমার কাছে এসে এ-কথা বললে, 'আমাকে বাঁচাতেই হবে।' মানুষের মতো কথা তোমার মুখেই শুনলুম প্রথম।

বরুণ। কিন্তু আমার কথায় তো কোনো কাজ হয়নি। মালতী বলাতে তবে না আপনি রাজি হলেন।

মালতী। আপনি যদি আমাদের ফিরিয়ে দিতেন তাহ'লে যে আমাদের কী উপায় হ'তো ভাবলে এখনো আমার বুক কাঁপে।

হিরণ্ময়। কদ্দিনের আলাপ তোমাদের?

মালতী। বেশীদিনের নয়। আমিও একা, বরুণেরই মতো। সংসারের স্রোতে ভাসতে-ভাসতে দু'জনের হঠাৎ দেখা।

বরুণ। তখনই আমি বললুম, 'এই শহরে মোটাসোটা পয়সাওয়ালা এত লোক থাকতে এক কপর্দ্দক-হীন যক্ষ্মারোগীর সঙ্গেই তোমার কেন দেখা হলো, মালতী? তোমার সঙ্গে দেখা না হলে আমার পক্ষেও যে মরা সহজ হ'তো!'

মালতী। আর আমি বলেছিলুম—'আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে ব'লে বাঁচাও তোমার সহজ হবে।' এখন দেখলে তো?

বরুণ। আমি তো ভালো হচ্ছি—কিন্তু আমার মতো আরো কত আছে, যারা তিলে-তিলে পলে-পলে মরছে। তাদের বাঁচাবে কে? কাকাবাবু, আপনার তো অনেক টাকা—আপনি চমৎকার একটা হাঁসপাতাল করুন না যক্ষ্মার রোগীদের জন্য। এমন সুন্দর আপনার বাড়িটি, এখানেই তো হ'তে পারে।

হিরণ্ময়। হ্যাঁ—হ'তে পারে—জন পাঁচেক রোগী নেয়া যায়, আর চার্জ নিতে হয় রোজ অন্তত পঁচিশ টাকা। আর যক্ষ্মারোগী এদেশে হাজার হাজার, তাদের বেশির ভাগেরই রোজ এক টাকা খরচ করবারও

ক্ষমতা নেই। এদের বাঁচানো একজনের কাজ নয়, বরুণ, প্রত্যেকের সকলের সমস্ত সমাজের। আর সে-কথাই যদি বলো, এত লোকের অসুখই বা হবে কেন, বলো তো ? ভাল খেতে দাও, ভালো থাকতে দাও, রোদ আর খোলা হাঁওয়া একবার দাও না সকলকে—দেখবে, এত রোগ, এত রোগী যেন আর থাকবে না। হয়তো কোনোদিন পৃথিবী এমন হবে যে চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের আর বিশেষ দরকারই থাকবে না, আমাদের প্রধান কাজ হবে হাঁসপাতালে নয়, রোগশয্যার ধারে নয়, লেবরেটারিতে।

(সোমেশের প্রবেশ)

সোমেশ। স্যর, শেরপুর রাজবাড়ির ছোটো বাবু এসেছেন।

হিরণ্ময়। কে ? ঐ চর্ব্বির পাহাড়টা ? মানুষ কতটা মোটা হ'তে পারবে সে-বিষয়ে একটা আইন হওয়া উচিত।

সোমেশ। আজ্ঞে তাঁদের বাড়িতে একটা কেস—

হিরণ্ময়। হ্যাঁ, মনে আছে। যাচ্ছি। মদের মাত্রাটা একটু কমালেই আর ডাক্তার ডাকতে হয় না। তা এঁরা বলবেন—মদই যদি কমাবো তাহ'লে আর ডাক্তাররা রয়েছে কী করতে ?

সোমেশ। আপনি আজ কেমন আছেন, বরুণবাবু ?

বরুণ। ভালো আছি। অপারেশনের পর আপনি এখন ভালো আছেন তো ?

সোমেশ। হ্যাঁ, আমি একেবারেই সেরে গেছি।

বরুণ। শুনে সুখী হলাম। আশা করি আমার উপরেও আপনার এখন আর রাগ নেই ?

সোমেশ। কী যে বলেন ! ও-সব কথা ভুলে যান।

হিরণ্ময়। মালতী, আমি এখন যাচ্ছি।

মালতী। বেরুচ্ছেন ?

হিরণ্ময়। হ্যাঁ, বারোটার সময় আর একবার টেম্পারেচার নিতে ভুলো না।

সোমেশ। মিস মিত্র, আপনার শরীর কেমন আছে ?

মালতী। আমার আবার শরীরের কী হ'লো ?

সোমেশ। দেখবেন, অতিরিক্ত Strain না হয়।

মালতী। Strain কিছুই হচ্ছে না। মহা আরামে আছি।

সোমেশ। সত্যি, আপনি শুশ্রূষা করতেও পারেন ! আশ্চর্য্য !

মালতী। কিছুই পারিনে। মিছি মিছি এ-সব কথা ব'লে আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন।

হিরণ্ময়। সোমেশ, তোমার কুশলজিজ্ঞাসা শেষ হ'য়ে থাকলে এবার আমরা নিচে নামতে পারি।

সোমেশ। চলুন, স্যর, চলুন।

(হিরণ্ময় ও সোমেশ চ'লে গেল)

বরুণ। (একটু পরে) মালতী।

মালতী। উঁ।

বরুণ। কী ভাবছো তুমি ?

মালতী। কই, কিছু ভাবছি না তো।

বরুণ। আমি কী ভাবছি, জানো ?

মালতী। কী ?

বরুণ। ভাবছিলাম—এই তো সেদিন এ-বাড়িতে এসেছি, এর মধ্যে একমাস হ'য়ে গেলো।

মালতী। এ আর এমন আশ্চর্য্য কথা কী !

বরুণ। তা নয়। এক মাসে কতটা সারলুম তা-ই জানতে ইচ্ছে করে।

মালতী। কাকাবাবু তো বলছেনই যে তুমি রোজ একটু-একটু ক'রে ভালো হচ্ছ।

বরুণ। সত্যি ? সত্যি কথা, মালতী ? ফাঁকি নয় তো ?

মালতী। মিথ্যে আশা হিরণ্ময়, ডাক্তার কখনো দেন না তা তো তুমি জানো।

বরুণ। তোমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে তিনি অন্য-কিছু বলেননি তো ?

মালতী। পাগল !

বরুণ। দ্যাখো, মাঝখানে কিছুদিন আমার একেবারে জ্বর হয়নি আজকাল আবার রোজই একটু-একটু হচ্ছে।

মালতী। ও কিছু নয়, ওষুধের রি-এ্যাক্‌শন।

বরুণ। ও কিছু নয়, না ? হ্যাঁ, আমারও তা-ই মনে হয়। মালতী।

মালতী। উঁ।

বরুণ। এখন একবার দেবে নাকি থার্ম্মোমিটার ?

মালতী। এখন না ঠিক বারোটায়।

বরুণ। ক'টা বেজেছে এখন ?

মালতী। সাড়ে-দশটা।

বরুণ। ন'টায় নিয়েছিলে—তখন কত ছিলো ?

মালতী। তখন জ্বর ছিলো না।

বরুণ। সকালে তো একদিনও থাকে না, কিন্তু বেলা বাড়লেই—

মালতী। এত বাজে বকছো কেন বলো তো ? বরং একটা রেকর্ড শোনো। শুনবে ?

বরুণ। না, না, রেকর্ড আমার ভালো লাগে না। এমনিতেই বেশ লাগছে। দেখো তুমি, আজ আর আমার জ্বর হবে না। ভারি ভালো লাগছে আজ আমার। এত ভালো কোনোদিন লাগেনি। কোনোদিন যে আমার কোনো রোগ ছিলো তা যেন ভুলেই গেছি।

মালতী। হ্যাঁ, এ-ই তো তুমি সেরে উঠছো।

বরুণ। আর কদ্দিন লাগবে পুরোপুরি সারতে ? কাকাবাবু কিছু বলেছেন ?

মালতী। আর দু'মাস বড়ো জোর।

বরুণ। দু'মাস ? ততদিনে চৈত্র মাস আসবে। কৃষ্ণচূড়ার আগুনে লাল হ'য়ে উঠবে আকাশ। ভারি সুন্দর এই রাস্তাটি। এত ভালো লাগে আমার তাকিয়ে থাকতে।

মালতী। তোমার মাথায় রোদ লাগছে না তো ? চেয়ারটা একটু সরিয়ে দেবো ?

বরুণ। না, ঠিক আছে। দেখে-দেখে আমার চোখ ক্লান্ত হয় না, মালতী। এত আলো ছায়া,

এত আনন্দ, এমন অফুরন্ত ইঙ্গিত। পৃথিবীতে ছবির এগজিবিশন লেগেই আছে।···চৈত্রমাস আসবে শুকনো পাতাগুলি হাওয়ার ঘূর্ণিতে নেচে বেড়াবে, আকাশ লাল হবে কৃষ্ণচূড়ায়। তখন আমি ভালো হ'বো।

মালতী। আমি দেখে আসছি তোমার চিক্‌ন্-স্যুপ তৈরি হ'লো কিনা।

বরুণ। না, না, এখন যেয়ো না। কাকাবাবুর বাবুর্চি নিয়ে আসবে স্যুপ, তুমি এখানে বোসো। আচ্ছা, বলো তো সেরে উঠলে কোথায় যাবো হাওয়া বদ্‌লাতে ?

মালতী। কাকাবাবু যেখানে বলবেন সেখানেই যেতে হবে।

বরুণ। খুব ভালো হয়, যদি অনেক দূরে পাহাড়ে-ঘেরা ছোট্ট কোনো গ্রামে আমাদের যেতে হয়। সবুজ ভোর আসে সেখানে; আর বিকেলের বেগ্‌নি রঙের ছায়া দ্রৌপদীর অন্তহীন শাড়ির মতো পাহাড়কে জড়ায়। সারাদিন চুপ ক'রে ব'সে-ব'সে দেখবো। শুধু দেখবো।

মালতী। আর আমার এক মিনিট সময় নেই, এত ব্যস্ত। কোথায় জুটবে ডিম, কোথায় দুধ, হাটের দিনে কোমরে আঁচল জড়িয়ে বেরিয়ে পড়া, রান্নাঘরে ব'সে একটু অন্যমনস্ক হয়েছি কি মাছের ঝোলে নুন দিতেই ভুলে গেলুম—তুমি তা খেয়ে যা বলবে তা না বলাই ভালো।

বরুণ। (হেসে) ইস্, কতই যেন কাজ তোমার! শোনো, একটা কথা। তোমার সবুজ রঙের শাড়ি আছে ? খুব ঘন সবুজ ?

মালতী। কেন বলো তো ?

বরুণ। মনে করো পাইন-বন উঠেছে পাহাড়ের গা বেয়ে, তার ফাঁকে-ফাঁকে সবুজের ঢেউ-তোলা তোমার ঝিলিমিলি······কী সুন্দর! মনে হবে তুমিই যেন একটা গাছ, হঠাৎ শিকড় ছিঁড়ে চলতে শিখেছো।······একটু এসে দাঁড়াবে আমার কাছে, আবার স'রে যাবে, রান্নাঘরের দিক থেকে ভেসে আসবে তোমার গুনগুনানি গান।

মালতী। কিন্তু আমি তো গাইতে পারিনে।

বরুণ। তুমি তো গাইবে না, তুমি গান হ'য়ে উঠবে। সে-গানে একটিমাত্র কথা: তুমি আর আমি, তুমি আর আমি।

মালতী। (মুগ্ধের মতো) তুমি আর আমি!

বরুণ। তুমি আর আমি হিংসুক মৃত্যুকে পার হ'য়ে এলাম—এবার দ্যাখো না জীবনকে নিয়ে আমরা কী করি! আমি সেই জাতের মানুষ, পৃথিবীকে যারা নতুন করে।

মালতী। জানি সে-কথা, জানি।

বরুণ। (আস্তে আস্তে যেন ঘুমের মধ্যে) তুমি কি ভেবেছো মানুষ চিরকালই মানুষের হাতে অপমানিত হবে ? তা-ই যদি হ'লো, তাহ'লে জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্পকলা—যাকে আমরা সভ্যতা বলি—সব ব্যর্থ, সব ব্যর্থ, তা-ই যদি হ'লো, তাহ'লে গ্যালিলিও, নিউটন, দা ভিঞ্চি, মাইকেলেঞ্জেলো, শেক্সপিয়র বেইঠোফেন, রবীন্দ্রনাথ কেন এলেন জগতে ? শুনলে তো একটু আগে কাকাবাবু কী বললেন ? এমন দিন আসবে যখন রোগ আর থাকবে না, থাকবে না শরীরের অকারণ কষ্ট, শোচনীয় অপমৃত্যু। শরীরের দুঃখ প্রকৃতির নিয়ম নয়, মালতী, ওটা মানুষের সৃষ্টি।······কিন্তু মানুষ যে-নিয়ম গড়ে, মানুষই তা ভাঙে।

আমি ব'লে দিচ্ছি, পৃথিবী নতুন হবে।

(একটু চুপচাপ)

বরুণ। মালতী, দ্যাখো তো জ্বরটা আবার এলো নাকি ?

মালতী। দেখবো ঠিক সময়ে। তুমি এখন একটু চুপ করো।

বরুণ। হ্যাঁ, ঘুম লাগছে আমার। একটা বালিশ দাও তো ঘাড়ের নিচে। তোমাকে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন, মালতী ? তুমি কিচ্ছু ভেবো না—এ জ্বর নয়, এ জ্বর নয়। আমি সেরে উঠবো, আমি বেঁচে উঠবো। সে দিন কবে আসবে, যেদিন মানুষের বাঁচবার অধিকার মানুষ আর কেড়ে নেবে না! সেই দিনের আশায় আমি বাঁচবো।

মালতী। চুপ করো, একটু চুপ করো।

বরুণ। এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়বো, দেখো। কাকাবাবু এলে আমায় জাগিয়ে দিয়ো কিন্তু। আর আমি ঘুমোলেও তুমি এখানে ব'সে থেকো, এখান থেকে যেয়ো না। পৃথিবীকে যারা নতুন করবে তার মধ্যে আছি আমি, আছো তুমি, তুমি আর আমি, তুমি আর আমি।

(একটু চুপচাপ)

সোমেশ। (দরজার বাইরে)। আসতে পারি ?

মালতী। আসুন।

সোমেশ (ঘরে ঢুকে)। বাড়ি চলে যাচ্ছি, ভাবলুম তার আগে একবার খোঁজ নিয়ে যাই।

মালতী। একটু আস্তে কথা বলুন ; উনি এইমাত্র একটু ঘুমোলেন।

সোমেশ। (গলা নামিয়ে)। ও, ঘুমিয়ে পড়েছেন বুঝি ? দেখুন, মিস মিত্র, একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না।

মালতী। আপনি ডাক্তার, আপনার কথায় মনে করবার কিছু নেই।

সোমেশ। ঠিক ডাক্তার হিসেবে নয়, বন্ধু হিসেবেই বলছি কথাটা। আমাকে আপনার বন্ধু মনে করবেন না।

মালতী। আপনাদের কাছে আমি কত যে কৃতজ্ঞ, তা কি বলবার ?

সোমেশ। না, না, কৃতজ্ঞতা কিছু নয়। এটা আমাদেরই সৌভাগ্য যে বরুণবাবুর মতো একজন গুণী লোকের চিকিৎসার ভার পেয়েছি। তা একটা কথা। আপনি নিজেকে এমন অবহেলা করেন, সেটা কি ভালো ?

মালতী। কই, না তো।

সোমেশ। আশ্চর্য্য আপনার সেবা, মিস মিত্র, অসাধারণ আপনার নিষ্ঠা। চোখে না দেখলে বিশ্বাস হ'তো না।

মালতী। বার-বার এ-সব কথা বলছেন কেন ?

সোমেশ। এ-ভাবে চললে আপনিই হয়তো একদিন অসুখে পড়বেন।

মালতী। পড়লে পড়বো। আপনারাই তো আছেন—ভয় কী ?

সোমেশ। আমি বলি কী, নিজের দিকেও একটু তাকাবেন। সময়মতো স্নানাহার—

মালতী। সবই করি। আপনি আমার জন্যে অকারণে ব্যস্ত হচ্ছেন !

সোমেশ। ডাক্তারকে সব দিকেই নজর রাখতে হয়। এই তো এখন উনি ঘুমিয়েছেন, আপনি এই ফাঁকে স্নানাহার করে আসুন না।

মালতী। যাবো একটু পরে।

সোমেশ। আমি না-হয় রোগীর কাছে একটু বসছি।

মালতী। সে কি হয়, সোমেশবাবু! সকাল থেকে কাজ করছেন, এখন আপনি কত ক্লান্ত! এবার বাড়ি যান।

সোমেশ। আপনিও তো সকাল থেকে বিশ্রাম করেননি।

মালতী। তা নয় তো কী। বসে থাকাই তো আমার একমাত্র কাজ।

সোমেশ। আপনি শুধু ব'সে থেকে যা পারেন, আমরা দিনরাত্রি ছুটোছুটি ছটফট ক'রেও তা পারিনে।

মালতী। কিছুই পারিনে, সোমেশবাবু। পৃথিবীর কোনো কাজই হয় না আমাকে দিয়ে। অতি তুচ্ছ আমি, অতি নগণ্যা। বরুণের মতো মানুষের রোগশয্যার পাশে ব'শে থাকবার অধিকার যে আমি পেয়েছি, এতেই আমি ধন্য।

সোমেশ। আমি তো দেখছি আপনার দু'খানা হাতই মৃতসঞ্জীবনী।

মালতী। কী যে বলেন, সোমেশবাবু! আমিই যদি কিছু পারবো, তাহ'লে আর হিরণ্ময় ডাক্তারের কাছে ওঁর প্রাণ-ভিক্ষা চাইবো কেন ?···অনেক বেলা হ'লো, এবার বাড়ি যান।

সোমেশ। যাচ্ছি। যখন যা দরকার বলবেন আমাকে। হিরণ্ময়বাবু তো প্রায়ই বাড়ির বাইরে থাকেন।

মালতী। না থেকে ওঁর উপায় কী! কত লোক ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

সোমেশ। তবু তো আজকাল উনি একটু সময় পেলেই বরুণবাবুর ঘরে এসে বসেন।

মালতী। আপনি এখন যান। আমাদের কথাবার্ত্তায় ওঁর ঘুম ভেঙে যাবে।

সোমেশ। উঠি তাহ'লে। নমস্কার। আবার দেখা হবে।

(সোমেশ চ'লে গেলো)

মালতী। (মন্ত্রমুগ্ধ স্বরে) তুমি আর আমি।

তৃতীয় অঙ্ক

(দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কের মধ্যে ১৫ দিন কেটে গেছে)

মনোহর ও সোমেশ

সোমেশ। তেইশ তারিখে গ্যাঞ্জেস কেমিক্যাল-এর শেয়ারহোল্ডারদের অ্যানুএল মিটিং। কাগজপত্র তৈরী আছে, মনোহর-দা ?

মনোহর। তৈরী করবার দরকার নেই। হিরণ্ময়বাবু যাচ্ছেন না মিটিং-এ।

সোমেশ। যাচ্ছেন না ? কে বললে ?

মনোহর। তিনি নিজেই বলেছেন। সেদিন জেনারেল ম্যানেজার এসে আধ ঘণ্টা ব'সে থাকলেন,

দেখা পর্য্যন্ত করলেন না।

সোমেশ। আশ্চর্য্য!

মনোহর। আশ্চর্য্য আর কী! বরুণ দত্তকে নিয়েই তো তিনি এখন ব্যস্ত, সময় কোথায় অন্য কোনোদিকে মন দেবার!

সোমেশ। হ্যাঁ ক'দিন ধ'রে তাঁর বড়ো ফুরসৎই হয় না।

মনোহর। তিনি যা-খুসি করুন, এদিকে আমাদের যে প্রাণ যায়। এমনিতেই তাঁর রোগী দেখলেই পালিয়ে বেড়ানো স্বভাব, তার উপর এই উপসর্গ জুটে এমন হয়েছে যে রোগীরা আমারই মাংস ছিঁড়ে খেতে চায়। আমি যেন হিরণ্ময় ডাক্তারকে পকেটে ভ'রে লুকিয়ে রেখেছি!

সোমেশ। ওঁর পক্ষে এটা কত বড়ো ত্যাগ, ভাবতে পারো মনোহর-দা! রোজ পাঁচশো ছ'শো টাকা রোজগার হেলায় হারানো কি সোজা কথা! ক'টা লোক পারে!

মনোহর। এ-কথাটা ঠিক বলেছো, সোমেশ। লাখ-লাখ টাকা যার আছে, সে-ই শুধু পারে।

সোমেশ। আর বরুণের পিছনে খরচই কি কম হচ্ছে ভাবো!

মনোহর। তা যথেষ্টই হচ্ছে!

সোমেশ। হিরণ্ময় চৌধুরী মানুষটা যে সত্যি কত মহৎ, এই ব্যাপারে তার প্রমাণ হ'লো। ওঁর মহত্বের কি তুলনা হয়!

মনোহর। কী যেন ভাই, বড়লোকের খেয়ালের কি অন্ত আছে? কারো ঘোড়া, কারো কুকুর, কারো দেশোদ্ধার, কারো পরোপকার। তাঁরা যখন যা করেন, তাতেই বাহবা দেবার জন্যে তো আমরা আছি।

সোমেশ। মনোহর-দা, কিছু মনে কোরো না, তোমার মনটা ভারি ছোটো। সব জিনিস ট্যারচা ক'রে দেখা তোমার স্বভাব।

মনোহর। তা হবে। আমার মস্ত সংসার ভাই, অনেকগুলো পেট ভরাতে হয়। সেটাই আমার দোষ।

সোমেশ। আমাদের স্যর-এর কথা আমি যতই ভাবি ততই বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে আমার মন ভ'রে যায়।

মনোহর। আমার জায়গায় বসতে পারলে তোমার ভক্তিটা আরো বাড়বে—কী বলো, সোমেশ?

সোমেশ। তার মানে?

মনোহর। অপারেশনের পর তোমার শরীর ভালো হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধির কোন উন্নতি হয়নি, সোমেশ।

সোমেশ। আমি সাদা কথার মানুষ, অত ঘোরপ্যাঁচ বুঝিনে।

মনোহর। কথাটা খুবই সোজা। শ্বশুরবাড়ির দিক থেকে কিছু টাকা পেয়েছি। তা দিয়ে আমাদের পাড়ায় একটা ডিসপেন্সারি খুলে বসবো। হিরণ্ময় চৌধুরীকে গুড্-বাই।

সোমেশ। বলো কী, মনোহর-দা! হিরণ্ময় চৌধুরীর জুনিয়র হ'তে পারলে কলকাতার কত ডাক্তার যে বর্তে যায়! আর তুমি এমন অতুলনীয় সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দেবে!

মনোহর। জুনিয়র হ'য়ে আর কতকাল থাকবো, বয়েস তো কম হ'লো না। এবার দেখি যদি নিজে কিছু করতে পারি। এখনো সময় আছে। এখনো যদি কেটে না পড়ি, তবে কি আর যুদ্ধে নামবো বুড়ো বয়সে!

সোমেশ। সত্যি কি তুমি চ'লে যাচ্ছো, মনোহর-দা?

মনোহর। তুমি অকপটেই খুসি হ'তে পারো, সোমেশ, সত্যি আমি যাচ্ছি। তুমি থাকো তোমার স্যরকে নিয়ে। তোমার বয়েস অল্প, এখন অনেক আশা আছে। আশা করি একদিন হিরণ্ময় চৌধুরীর জীবনচরিত লিখবে তুমি।

সোমেশ। ঠাট্টা করছো?

মনোহর। না, না, ঠাট্টা করবো কেন? আমাদের স্যর যে-ভাবে পরোপকারে লেগেছেন তাতে একদিন তিনি হয়তো একটা মহাপুরুষ খেতাবই পেয়ে যাবেন। আমাদের দেশের মানুষের যা অভাব —কিছুই বলা যায় না। তা তুমিও একটু সতর্ক থেকো, সোমেশ, ক্রমাগত রোগী ফেরাতে থাকলে একদিন হয়তো রোগীদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। কলকাতায় তো আরো বড়ো ডাক্তার আছে। ইঁদুররা কখন জাহাজ ছেড়ে যায় জানো তো?

সোমেশ। (হেসে) তোমার এ-কথাটা মানতে পারলুম না, মনোহর-দা। হিরণ্ময় ডাক্তার ছাড়তে চাইলেও রোগীরা তাঁকে কখনও ছাড়বে না, এটা ঠিক জেনো।

মনোহর। তা হ'তে পারে। সবই হুজুগ, বুঝলে সোমেশ, সবই হুজুগ। হিরণ্ময় ডাক্তার দু'মিনিট দেখে চোখ বুজে একটা প্রেস্ক্রপশন লিখে দেবে, তার জন্য চৌষট্টি টাকা দিয়ে কৃতার্থ হবে কত লোক; আর আমি আধ ঘণ্টা ব'সে নানা কথা ব'লে রোগীকে ও রোগীর আত্মীয়দের উৎসাহ দিয়ে সেই প্রেস্ক্রপশনই লিখবো—তার জন্যে আটটা টাকা দিতে বুক যেন ফেটে যায়। ঘটি-বাটি বেচে হিরণ্ময় ডাক্তারের ভিজিট জোটায় গরিবরা; আবার গাড়িওলা বাড়িওলারা দয়া ক'রে আমাকে যদি ডাকেনই, চার টাকা বখশিষ দিয়েই বিদায় করতে চান। সবই উল্টোপাল্টা হ'য়ে গেছে সোমেশ, এ কি আর সহজে সোজা হবে!

সোমেশ। আমি এইমাত্র একটা জিনিষ অবিষ্কার করলুম, মনোহর-দা; হিরণ্ময় চৌধুরী সম্বন্ধে তোমার মনে ঈর্ষা আছে।

মনোহর। না, সত্যি অপারেশনের পর তোমার বুদ্ধি খুলেছে। দ্যাখো, মেডিক্যাল কলেজের ব্রিলিয়্যাণ্ট ছাত্র ছিলুম আমিও। হিরণ্ময়ের সুবিধে ছিলো, গেলেন বিলেতে; আমার মাথার উপর পাঁচটি অপোগণ্ড ভাই-বোন ঝুলছে—হাতের কাছে যা এলো তা-ই নিলুম, কর্পোরেশনে পঁচাত্তর টাকা মাইনের চাকরি। তোমার স্যর যেবার কাউন্সিলর হলেন, আমার উপর দয়া হ'লো—ওখান থেকে ছাড়িয়ে এনে এখানে বসালেন। মস্ত লিফ্‌ট্ হ'লো; সন্দেহ নেই, কিন্তু—

সোমেশ। কিন্তু?

মনোহর। থাক্, কথা আর না-ই শুনলে। নিজের ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবো।

সোমেশ। আমার আর ভবিষ্যৎ কী? কোনোরকমে খেয়ে প'রে থাকতে পারলেই হ'লো।

মনোহর। ব্যস্, তাহ'লে তো তুমি নিশ্চিন্তই।

সোমেশ। একটা কথা তোমাকে বলি, মনোহর-দা। প্রতিভাবানকে ঈর্ষা করবার মতো হীনতা আর-কিছু নেই।

মনোহর। আমি তো প্রতিভাকে ঈর্ষা করি না, ভাগ্যকে ঈর্ষা করি। প্রতিভার পূর্ণতার মধ্যে ভাগ্যের হাত তুমি কখনো দেখতে পাও না, সোমেশ? মাইকেল ফ্যারাডে যদি দৈবক্রমে স্যর হমফ্রি ডেভির বক্তৃতার টিকিট না-পেয়ে যেতেন, তাহলে কী হ'তো? কিন্তু সব ফ্যারাডে-ই কি আর টিকিট পায়? অনেকে হয়তো অন্ধকারে প'চেও মরে। কথাটা তুমি বিশ্বাস করবে না, জানি, কিন্তু অবস্থার একটু এদিক-ওদিক হ'লে হয়তো এই মনোহর ঘোষেরই অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হ'য়ে হিরণ্ময় চৌধুরীর দিন কাটতো।

সোমেশ (হেসে)। হাসলে মনোহর-দা!

মনোহর। জানি তুমি হাসবে। সকলেই হাসবে। যাক্‌গে, আমার জীবন তো শেষ হ'য়ে গেলো, আরকি। ভাবছি, এর পর তাদের মধ্যে প্র্যাকটিস করবো, হিরণ্ময় চৌধুরীর নামও যারা শোনেনি।

সোমেশ। এমন-কেউ আছে নাকি?

মনোহর। আছে, অনেক আছে, জাহাজের ডকে, লোহার কারখানায় পাটকলে চটকলে দেখতে পাবে তাদের। কলেরা আর বসন্ত বছর-বছর উজোড় করে, টিটেনাস নরকের দরজা খুলে দেয়, অনাহার, অপঘাত, অপমৃত্যু দৈনিক ঘটনা। তাদের বাঁচাবার কথা কোনো বড় ডাক্তারেরই মনে আসে না, কেননা তাদের কেউ না পারে নিজেকে প্রতিভাবান ব'লে জাহির করতে, না পারে সঙ্গে আনতে কোন লীলায়িত তরুণী—

সোমেশ। ছি-ছি, এ-সব তুমি কী বলছো, মনোহর-দা!

মনোহর। যাক্‌গে, কথাটা ভুলে যাও। এখন আমি ভাবছি ওদের যেটুকু পারি বাঁচাবো, নিজেও বাঁচবো। আমার ভিজিট হবে আট আনা, আর মাঝে মাঝে বুদ্ধি ক'রে হোমিওপ্যাথি চালাবো।

সোমেশ। হোমিওপ্যাথি! তুমি শেষটায় সায়ান্সকেও বিসর্জন দেবে?

মনোহর। সেই সায়ান্সই সব চেয়ে ভালো মানুষ যার নাগাল পায়। আমাদের দেশের যা আর্থিক অবস্থা, তাতে হোমিওপ্যাথিই সব চেয়ে ভালো চিকিৎসা, এ-বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। দেখো তুমি, আমার প্র্যাকটিস ফেঁপে উঠবে। মরবার আগে বালিগঞ্জে বাড়ি ক'রে যাবো।

সোমেশ। তোমার অধঃপতনে আমি দুঃখিত না-হ'য়ে পারছি না মনোহর-দা।

মনোহর। কেন, অধঃপতনটা কোথায় দেখলে? আমি তো মহৎ ব্রত নিচ্ছি জীবনে, হিরণ্ময় চৌধুরী এর মহত্ত্ব কল্পনাও করতে পারে না। কোথাকার কে এক ছবি-আঁকিয়ে পাগল ছোকরা নিয়ে নাচানাচি ক'রে পৃথিবীর তিনি কী উপকার করলেন তা তুমিই বুঝবে। আর তাও তো শেষ রক্ষা হ'লো না।

সোমেশ। কেন, শেষ রক্ষা হ'লো না কেন?

মনোহর। বাঃ, জানো না? ও তো টেঁশলো ব'লে।

সোমেশ। একটু ভদ্র ভাষায় অন্তত: কথা বলতে পারো, মনোহর-দা কিন্তু সত্যি নাকি? অবস্থা ভালো নয়?

মনোহর। বাঃ, সে তো কবে থেকেই। ও যে বাঁচবে না এ তো হিরণ্ময় ডাক্তার প্রথম থেকেই জানেন। It was a fool's game.

সোমেশ। উঃ, মিস মিত্র কী সংঘাতিক একটা শক্ পাবেন!

মনোহর। যে মারা যাচ্ছে তার কথা বরং ভাবো, সোমেশ। জীবিতের কথা ভাববার ঢের সময় পাবে।

সোমেশ। (নিচু গলায়) সত্যিই কি শেষ অবস্থা? আমি তো কালও দেখলুম……

মনোহর। রোগীকে দেখেও কি বোঝনি? খুব ডাক্তার তো তুমি!

সোমেশ। বলো কী! এতই!……আমি বরং একবার উপরে—

মনোহর। আরে বোসো, বোসো। হিরণ্ময় ডাক্তার তো সকাল থেকেই ও-ঘরে, আরো সব বড়ো-বড়ো রুই-কাৎলারা এসেছেন, এর মধ্যে তুমি আমি চুনোপুঁটি গিয়ে কী করবো?…ছোকরা লড়ছেও খুব। কিন্তু যা অবস্থা, এখন শেষ হ'য়ে গেলেই পারে।

সোমেশ। বিশ্বাস করা শক্ত যে ও সত্যি-সত্যি—

মনোহর। কেন, তুমি বুঝি ভেবেছিলে যে হিরণ্ময় ডাক্তার—

(হিরণ্ময়ের প্রবেশ তাঁর কণ্ঠস্বর চাপা, ঈষৎ ভাঙা ভাঙা)

হিরণ্ময়। মনোহর, মনোহর।

মনোহর। আজ্ঞে।

হিরণ্ময়। ও যে যাচ্ছে, ও যে চলে যাচ্ছে। কী করি বলো তো? কী করি বলো তো? সোমেশ, তুমি কি কিছু জানো…কেউ কি কিছু জানে যাতে ক'রে ওকে আর দুটো দিন, একটা দিন, একটা ঘণ্টা বাঁচিয়ে রাখা যায়! তোমাদের সকলকে বলি, এখন ওকে বাঁচাও—তারপর ওকে সুইৎসর্ল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেবো, সেখানে গিয়ে ও সেরে উঠবে?

মনোহর। ডাক্তার কাঞ্জিলাল আছেন তো উপরে?

হিরণ্ময়। আছেন, ওঁরা সকলেই আছেন। ওঁদের হাতে দিয়ে আমি চ'লে এসেছি। আমার আর কিছু করবার নেই, কিছু করবার নেই।

(মালতীর প্রবেশ)

মালতী। কাকাবাবু, একবার উপরে চলুন, ওকে দেখবেন।

হিরণ্ময়। (চমকে) মালতী! তুমি যে এখানে।

মালতী। আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এখন তো আর কোনো ভাবনা নেই।

হিরণ্ময়। মালতী তুমি ওকে একা ফেলে চ'লে এলে যে?

মালতী। একা? না, না, একা নয়। কোটি-কোটি মৃত এখন ওর সঙ্গী।

(একটু চুপচাপ)

হিরণ্ময়। তিরিশ বছর ডাক্তারি করছি, মৃত্যু আমার পুরাণো সঙ্গী। আমার চিকিৎসায় কত লোক মরেছে—আমার চিকিৎসা না-পেয়ে মরেছে তার ঢের বেশি। কিন্তু এতদিন পরে আজ প্রথম দেখলাম মৃত্যুকে।

মালতী। বড়ো সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে, একবার দেখবেন চলুন।

হিরণ্ময়। আমি ভেবেছিলুম মৃত্যুতে আমি অভ্যস্ত, আজ উপলব্ধি করলুন মৃত্যুকে।

সোমেশ। মিস্ মিত্র, এ কী সর্ব্বনাশ হ'লো, আমি তো ধারণাই করতে পারিনি—

মালতী। আমি প্রস্তুত হ'য়েই ছিলাম।

সোমেশ। কী আশ্চর্য্য আপনার ধৈর্য্য।

মালতী। হ্যাঁ আমার মধ্যে কত যে আশ্চর্য্য জিনিস আছে তা আপনার চোখেই শুধু ধরা পড়লো।

(টেলিফোন বাজলো)

মনোহর। 'টেলিফোনে' হ্যালো···আজ্ঞে?···(টেলিফোন রেখে দিয়ে)। শেরপুরের বাড়ি থেকে বলছে। বাবু আজ একটু ভালো আছেন, সেই ওষুধই চলবে কিনা জিজ্ঞেস করছে।

(হিরণ্ময় নিরুত্তর)

সোমেশ। (নিচু গলায়) তোমার একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই, এখন আবার ও-সব জিজ্ঞেস করছো। যা হয় ব'লে দাও।

মনোহর। (টেলিফোনে) হ্যাঁ, ঐ ঔষধই চলবে। ডাক্তারবাবু এখন একটু ব্যস্ত আছেন।··· আচ্ছা।

সোমেশ। মিস মিত্র, আমরা তো প্রাণপণ ক'রেছি, কিন্তু মানুষের চেষ্টায় আর কতটুকু হয়।

মালতী। আপনিও প্রাণপণ করেছেন সেটা আমার আশাতীত সৌভাগ্য।

(আবার টেলিফোন বাজলো)

মনোহর। (টেলিফোনে) হ্যালো···গ্যাঞ্জেস কেমিক্যাল থেকে বলছেন? ডক্টর চৌধুরী এখন বড্ড ব্যস্ত আছেন—কাল একবার ফোন করবেন। হ্যাঁ, কাল সকালে।

মালতী। ওকে দেখতে যাবেন না, কাকাবাবু?

হিরণ্ময়। (যেন তন্দ্রা থেকে জেগে উঠে) আমার হার হ'লো, আমার হার হ'লো।



কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রী অবনীনাথ রায়

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বারে বারে বলেছেন যে তাঁর জন্মোৎসব কোন একটা বিশেষ দিনের উৎসব নয়—সে উৎসব সর্ব্বকালের এবং সর্ব্বদেশের। কেবলমাত্র একটা বিশেষ দিনেই যাঁকে স্মরণ করতে হয় বুঝ্‌তে হবে তাঁর প্রভাব সর্বকালের উপর পড়ে নি—তিনি ঘরোয়া, তিনি পরিবারের, তিনি বিশেষের গণ্ডী পেরিয়ে যান নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ত সে-ধরণের নন—তাঁর কবিতা পড়ছি, আর সর্ব্বদা তাঁকে আমরা স্মরণ করছি, মনন করছি; যদি এক পঁচিশে বৈশাখ তারিখেই শুধু তাঁর কবিতা পড়তুম তবে তাঁর কবিতা আমাদের কাছে ব্যর্থ হ'য়ে যেত। এই কথা-টাই কবির বক্তব্য। কিন্তু কবির দিক থেকে কথাটা সত্য হ'লেও আমাদের অর্থাৎ তাঁর কবিতার পাঠক পাঠিকাদের তরফ থেকে আর একটু কথা বলার থেকে যায়। আমরা যদিও প্রতিদিনই তাঁর কবিতা পড়চি কিন্তু একটা বিশেষ দিনে তাঁকে আমরা অনুভব করতে চাই,—বুঝ্‌তে চাই যে তিনি আমাদের মধ্যে এসেছেন, আমাদের মধ্যে বেঁচে আছেন, ইচ্ছে করলেই তাঁকে আমরা দেখ্‌তে পারি, কথা কইতে পারি, চিঠি লিখ্‌তে পারি, এমন কি তাঁর স্নেহ ও আকর্ষণ করতে পারি। তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের যে এই মমত্ব বোধ, যে বোধ আমাদের শিখিয়ে দেয় যে রবীন্দ্র-নাথ সমগ্র বিশ্বের এবং সমগ্র কালের হ'লেও আবার নিতান্ত আমাদেরও হ'তে পারেন, সেই বোধই আমাদের সমবেত শ্রদ্ধাকে উৎসবের আকারে নন্দিত ক'রে তুলতে চায়। আর সেই শ্রদ্ধার অর্ঘ্যকে উৎসর্গ ক'রে দেওয়ার পক্ষে তাঁর জন্মদিনটি যেমন উপযোগী এমন আর কোন দিনটি নয়। কেননা এই দিনটিতে আমরা সহজভাবে অনুভব করতে পারি তাঁর আবির্ভাবকে, কোন কষ্টকল্পনার প্রয়োজন হয় না—তাঁর জন্মের পরম ক্ষণের ছন্দের সঙ্গে নিজেদের মনের ছন্দ যদি মিলিয়ে নিতে পারি তবে তাঁর অনুপ্রাণনা বোঝ-বার পক্ষে হয়ত সাহায্য হ'তে পারে।

এলম্‌হার্ষ্ট সাহেব একদা কবির সেক্রেটারি ছিলেন। কবির জীবনচরিত লিখবার দুরূহ কল্পনা তাঁর মনে ছিল। সেই উদ্দেশ্যে তিনি কবির সমস্ত কার্যাকলাপ, কথাবার্ত্তা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করতেন। এমন ঘটনা ঘটেছে যে কবি হঠাৎ কোন দর্শনার্থীর সঙ্গে কথা বল্‌তে সুরু করলেন, হাতের কাছে লিখ্‌বার উপকরণের অভাব—এলম্‌হার্ষ্ট সাহেব নিজের কামিজের শক্ত হাতার উপর পেন্‌সিলে নোট নিতে পশ্চাৎপদ হন নি। শুন্‌তে পাই শ্রীযুত মহাদেব দেশাই ও শ্রীযুত প্যারিলাল ও নাকি মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা করেন। এঁদের অভিজ্ঞতার শেষফল কি দাঁড়াবে বল্‌তে পারি নে কিন্তু এলম্‌হার্ষ্ট সাহেবের অভিজ্ঞতার ফল যা দাঁড়িয়েছিল সেটা জানি। কয়েক বছর নিষ্ঠাসহকারে এই নোট নেওয়ার পর তিনি একদিন তাঁর চেষ্টা ছেড়ে দিলেন। বল্‌লেন, কবির জীবন বিচিত্র—তাঁর জীবনে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার, সর্ব্বতোমুখী বৈচিত্র্যের শেষ নেই। তাঁকে কোন্‌খানে ছেড়ে দিয়ে কোন্ খানে ধ'রবো জানি নে। কখনো মনে হয় তিনি শ্রেষ্ঠ কবি, কখনো মনে হয় তিনি শ্রেষ্ঠ সাধক কখনো মনে হয় তিনি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টা, শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ্, শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ইত্যাদি। অতএব হে মহাপুরুষ, তোমার অপরিশেষ পরিচয়ের শেষ পরিচয় গ্রহণ করার সুযোগ আমার জীবনে ঘটলো না—আমি এই কাজে ইস্তফা দিলুম, এই আশঙ্কায় যে নিজের অনুপযুক্ততা দিয়ে পাছে তোমার বিরাট মানবত্বের অমর্য্যাদা করি।

নিজের সম্পদের দিকে তাকিয়ে যিনিই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু লিখ্‌তে যাবেন আমার ধারণা তাঁকেই এলম্‌হার্ষ্ট সাহেবের চিন্তা প্রতিহত করবে। কিন্তু উপযুক্ততা ছাড়া আর একটা দিকও ত আছে। সে দিকটা হচ্ছে আনন্দের দিক। কবি আনন্দিত মনে গান গেয়েছেন, আমরা আনন্দিত মনে তা' শুনেছি। এই আনন্দের দিকে যোগ্যা যোগ্য বিচার নেই। যে আনন্দ প্রসন্ন মনে আমরা তাঁর হাত থেকে গ্রহণ করেছি, আজকের অনুষ্ঠানের পূজা-উপচার তারই আনন্দ অভিব্যক্তি।

কবির জীবনের বৈচিত্র্য যতই সর্ব্বতোমুখী হোক্,

সর্ব্বোপরি তিনি যে কবি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি নিজেও এই দাবিটুকুই করেন অপর কোন আখ্যা তিনি নিজে গ্রহণ করেন নি। কিন্তু সাধারণ ভাবে কবি বল্‌তে আমরা যা' বুঝি রবীন্দ্রনাথকে তাই মনে করলে ভুল হবে। অধুনা সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় অনেক কবি কবিতা লিখে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের একজন ন ন। উপনিষদে আছে, "কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ"—যিনি ব্রহ্ম তিনি কবি, তিনি মনীষাসম্পন্ন তিনি সর্ব্বব্যাপী, তিনি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই হিসাবে কবি। চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারকাসমাকুল এই বিরাট বিশ্বে জন্মগ্রহণ ক'রে তাঁর মনে এক বিরাট বিস্ময় জেগেচে, সেই বিস্ময়ের উদ্বেলিত স্রোতোধারা কবিতার আকারে তাঁর ভিতর দিয়ে নেমে এসেছে। তাই তিনি বলেছেন,—

তোমার হোমাগ্নি মাঝে আমার সত্যের আছে ছবি,
তারে নমো নমঃ।
তমিস্র সুপ্তির কূলে যে বংশী বাজাও, আদি কবি,
ধ্বংস করি' তমঃ,
সে বংশী আমারি চিত্ত, রন্ধ্রে তা'রি উঠিছে গুঞ্জরি'
মেঘে মেঘে বর্ণচ্ছটা, কুঞ্জে কুঞ্জে মাধবী মঞ্জরী,
নির্ঝরে কল্লোল।
তাহারি ছন্দের ভঙ্গে সর্ব্ব অঙ্গে উঠিছে সঞ্চরি'
জীবন-হিল্লোল॥
এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্নতান, সুরের তরণী,
আয়ুঃস্রোত-মুখে
হাসিয়া ভাসায়ে দিলে লীলাচ্ছলে, কৌতুকে ধরণী
বেঁধে নিল বুকে।
আশ্বিনের রৌদ্রে সেই বন্দী প্রাণ হয় বিস্ফুরিত
উৎকণ্ঠার বেগে, যেন শেফালির শিশির-চ্ছুরিত
উৎসুক আলোক।
তরঙ্গ-হিল্লোলে নাচে রশ্মি তব, বিস্ময়েপূরিত
করে মুগ্ধ চোখ॥

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সত্তা সেই বিশ্ব-অধিপতির হাতে একখানি বীণার মত—তাঁর অনাহত সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের ভিতর দিয়ে অহর্নিশ বাজ্‌ছে—রবীন্দ্রনাথের এতে কোন কর্তৃত্ব নেই—তিনি নিজেকে তাঁর জীবন-দেবতার হাতে একখানি সুরপূরিত যন্ত্রের মত উৎসর্গ ক'রে দিয়েছেন। এই কথাটাই বারে বারে রবীন্দ্রনাথ নানা ভাবে বল্‌তে চেয়েছেন।

এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের চিত্তে বিশ্বের জন্য এত স্পর্শাতুরতা (Sensitiveness) ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ পর্যন্ত বিশ্বের কোন বস্তু, কোন প্রকাশই তাঁর কাছে নিরর্থক নয়—বিশ্বকে তিনি নিজের মধ্যে পেতে চেয়েছেন, আবার নিজেকে বিশ্বের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ক'রে দিয়েছেন। ভোরের পাখীর গান, আম্রমুকুলের গন্ধ, নদীর কলধ্বনি, দিগন্তবিস্তৃত নীলাকাশ ষড়ঋতুর লীলাপর্য্যায়, মানুষের মহত্ব, মানুষের ক্রূরতা, স্বদেশের জয়ধ্বনি, বিদেশের স্বৈরাচার—সমস্তই তাঁর স্পর্শাতুর মনে প্রতিধ্বনি জাগিয়েছে—আর সমস্তের উপরই তাঁর ঝঙ্কৃত মন থেকে ছন্দিত কবিতা নেমে এসেছে। তিনি ত কোন প্রকাশকেই পৃথক ক'রে দেখ্‌তে পারেন নি—ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশই এক যোগসূত্রে গ্রথিত হ'য়ে তাঁর সাম্‌নে বিরাট ভূমার আকার ধারণ করেছে।

মানুষের মহত্ব কবির মনে সাড়া জাগিয়েছে :—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশ-বন্ধু, স্বদেশ-আত্মার
বাণী-মূর্ত্তি তুমি।

মানুষের ক্রূরতাও কবির মনে প্রশ্ন জাগিয়েছে :—

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,—
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে॥

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশী সঙ্গীতহারা,
অমাবস্যার কারা।
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,
তাইত তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?

মানুষের প্রতি স্নেহকে কবি বহু কবিতার ভিতর দিয়ে স্বীকার করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুতে কবি লিখেছিলেন,

ধরণীতে প্রাণের খেলায়

সংসারের যাত্রাপথে এসেছি তোমার বহু আগে,
সুখে দুঃখে চলেছি আপন মনে ; তুমি অনুরাগে
এসেছিলে আমার পশ্চাতে, বাঁশিখানি ল'য়ে হাতে
মুক্ত মনে, দীপ্ত তেজে, ভারতীর বরমাল্য মাথে।
আজ তুমি গেলে আগে ; ধরিত্রীর রাত্রি আর দিন
তোমা হ'তে গেল খসি', সর্ব আবরণ করি' লীন
চিরন্তন হোলে তুমি, মর্ত্ত্য কবি, মুহূর্ত্তের মাঝে।
গেলে সেই বিশ্বচিত্তলোকে, যেথা সুগম্ভীর বাজে
অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সঙ্গীত-ধারায়
ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্য্যে তারায় তারায়।
সেথা তুমি অগ্রজ আমার ; যদি কভু দেখা হয়,
পা'ব তবে সেথা তব কোন্ অপরূপ পরিচয়
কোন্ ছন্দে কোন্ রূপে ?

উপরে রবীন্দ্রনাথের নানা সময়ের নানা কবিতা থেকে যে সব উদ্ধৃতি করেছি, তার উদ্দেশ্য এই কথা প্রমাণ করা যে কবির বীণাযন্ত্রে বিশ্বের সামান্যতম আঘাতটুকুও ব্যর্থ হয় নি—কবির চিত্ত তার ফলে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠেছে। এই দৃষ্টি দিয়ে যদি রবীন্দ্রনাথকে দেখা যায় তবেই কবিকে বোঝা সম্ভব হবে—নয়ত আমাদের ঝাপ্‌সা দৃষ্টির সংকীর্ণতার আড়ালে কবিচিত্তের একাংশই দৃষ্টিগোচর হ'বে মাত্র, যে সমগ্র নিয়ে কবির কারবার সেটা কিছুতেই নজরে পড়বে না। কবির জীবনের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে যে-কবি বা লেখক দু'মাস বা দু'বছর লিখে বাকি জীবন চুপ ক'রে থাকেন তিনি সত্যিকারের কবি বা লেখক ন'ন। তিনি বিধাতার বরমাল্য গলায় প'রে আসেন নি। সে মালা যিনি প'রে আসেন তাঁর বলার কথা দু'দিনেই ফুরিয়ে যাবার নয়। বিশ্বের প্রতি ঘটনা তাঁর বীণার তারে অনুরণন তুলবেই, তাঁর চুপ ক'রে থাকবার জো নেই। বিধি-নির্দিষ্ট এই চাপরাশ লাভ করেছেন বলেই রবীন্দ্রনাথ জোর ক'রে বলতে পেরেছেন,

আমার এই দেহখানি তুলে ধর
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ করো।

কবি তাঁর বিরাট কাব্যগ্রন্থের ভিতর দিয়ে বিশ্বের উন্মুখ নরনারীর সাম্‌নে নিজেকে প্রসারিত ক'রে ধরেছেন এ কথা সত্য কিন্তু তবু আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব আমাদের জাতির পক্ষে এক অতুলনীয় গৌরবের বস্তু। যাঁরা কবির নিকট সম্পর্কে আসেন নি, তাঁর কাব্যের ভিতর দিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের অসাধারণ সম্মোহন শক্তি অনুমান করতে পারবেন না। রবীন্দ্রনাথ কাব্যেই শুধু সুন্দরের প্রশস্তি করেছেন তাই নয়, জীবনের সর্ব পরিচয়েও তিনি সুন্দরকে প্রতিফলিত ক'রে তুলেছেন। অসুন্দর কিছু করতে বা বলতে তিনি অক্ষম। রবীন্দ্রনাথকে না জান্‌লে আমরা কিছুতেই কল্পনা করতে পারতুম না যে মানুষ এত সুন্দর ক'রে, এমন মিষ্ট ক'রে কথা বলতে পারে, মানুষের কণ্ঠে এমন ক'রে বীণা ঝঙ্কৃত হয়, মানুষ এমন ক'রে বেদনা সহ্য ক'রেও অপরকে বেদনা দিতে কুণ্ঠিত হয়। উত্তর-জীবনে যখনি দেখেছি অবিচার, নির্বিচার এবং কুবিচারের অন্ধ স্রোত মনুষ্য-সমাজে তীব্রবেগে ব'য়ে চলেছে, মানুষ মানুষকে অপমান করতে, আঘাত করতে, হানাহানি করতে নির্লজ্জ প্রতিযোগিতায় নেমেছে, ইতরতার বাহ্বাস্ফোট ভদ্র সমাজে পুরুষত্বের সম্মান দাবি করছে—তখনি সেই অসুন্দরের অপরিমেয় অপকীর্ত্তির সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আমার মনে পড়েছে রবীন্দ্রনাথের শান্ত, স্নিগ্ধ সুন্দর প্রতিচ্ছবি। যুক্তকরে বলেছি, হে কবি, হে মহাভাগ, আমাদের বহু পুণ্য যে তোমাকে দেখেছিলুম—তোমার সৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় হ'য়েছিল। তোমাকে বাদ দিয়ে, তোমার সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে যে অন্ধকারের বর্বর যুগকে কল্পনা করতে পারি, তার অপ্রতিকার্য ফল থেকে তুমি আমাদের রক্ষা করেছ।

সমসাময়িকতার (Contemporaneousness) একটা ক্রূর অভিশাপ আছে—সে তাৎকালীন বস্তুকে তার সত্যিকারের পরিপ্রেক্ষিতায় (perspective) দেখ্‌তে দেয় না। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ও আমাদের তাই ঘটেছে। নয়ত এখনো আমাদের দেশের অনেকে কেন ভাববে্ন যে রবীন্দ্রনাথ স্বপ্নালস কবি মাত্র, তাঁর আদর্শ জীবনসংগ্রামের সমস্যা সমাধানের কোন কাজেই লাগে না। তিনি যে বিশ্ব-ভারতী গ'ড়ে তুলেছেন, যেখানে ভারতের এবং বহির্ভারতের সমস্ত সভ্যতার এবং সংস্কৃতির বীজ নীড়ের আকার ধারণ করছে সেখানে আসার জন্যে, তার অন্তরের ইতিহাসটুকু জানার জন্যে বাঙালীর ছেলের বাঙালী অভিভাবকদের কোন উন্মুখতা নেই কোন কৌতূহল নেই।

যে প্রতিষ্ঠান গঠনসৌকুমার্য্যে বিশ্বজনীন হ'লেও বাঙালীর হাতের ছোঁওয়া নিশ্চিতভাবে বহন করতে পারতো সেখানে বাঙালীর কোন দাবি দাওয়া নেই। বাঙালী তাকে নিজস্ব ব'লে গ্রহণ করে নি। শ্রীনিকেতনে বয়নকার্য্য, চর্মকারিতা পল্লীগঠন, ম্যালেরিয়া বিতাড়ন, পানীয় জল সরবরাহ, অশিক্ষা দূরীকরণ প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষরোপণের ন্যায় প্রাচীন অনুষ্ঠানের যে সানন্দ দিতালি চলেছে তার সবিশেষ বাণী সংগ্রহ করবার জন্যে বাংলাদেশের লোকের কোন আগ্রহ নেই, কোন ধৈর্য্য নেই। তাই রবীন্দ্রনাথ গভীর দুঃখের সঙ্গে বলেছেন তোমরা স্বদেশের প্রতীক। তোমাদের দ্বারে আমাদের প্রার্থনা, রাজার দ্বারে নয়, মাতৃভূমির দ্বারে। সমস্ত জীবন দিয়ে আমি যা রচনা করেছি দেশের হ'য়ে তোমরা তা গ্রহণ করো। এই কার্য্যে এবং সকল কার্য্যেই দেশের লোকের অনেক প্রতিকূলতা পেয়েছি। দেশের সেই বিরোধী বুদ্ধি অনেক সময়ে এই ব'লে আস্ফালন করে যে, শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতনে আমি যে কর্মমন্দির রচনা করেছি আমার জীবিতকালের সঙ্গেই তার অবসান। এ কথা সত্য হওয়া যদি সম্ভব হয় তবে তাতে কি আমার অগৌরব, না তোমাদের? তাই আজ আমি তোমাদের এই শেষ কথা ব'লে যাচ্ছি পরীক্ষা ক'রে দেখ এ কাজের মধ্যে সত্য আছে কি না এর মধ্যে ত্যাগের সঞ্চয় পূর্ণ হয়েছে কি না। পরীক্ষায় যদি প্রসন্ন হও তা হ'লে আনন্দিত মনে এর রক্ষণ পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করো, যেন একদা আমার মৃত্যুর তোরণদ্বার দিয়েই প্রবেশ ক'রে তোমাদের প্রাণশক্তি একে শাশ্বত আয়ুদান করতে পারে।'

আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথকে এই ক্ষুব্ধ আবেদন জানাতে হয়েছে। স্রষ্টার যেমন সৃষ্টি করেও নিস্তার নেই সেই সৃষ্টিকে গ্রহণ করার জন্যে মানুষের মনে আবার শুভবুদ্ধির উদয় করিয়ে দিতে হয়, রবীন্দ্রনাথকেও তেমনি তাঁর কর্ম্মমন্দিরকে গ্রহণ করবার জন্যে ক্যান্‌ভ্যাসারের পর্য্যায়ে নামতে হয়েছে। এ আমাদের জাতীয় চিত্তের অসাড়তার পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে আমরা আনন্দিত উচ্ছ্বাসে গ্রহণ করেছি কেননা তার সঙ্গে কোন দায়িত্ব জড়িত নেই। বইখানার মূল্য চুকিয়ে দেওয়াই তার দায়িত্ব পালনের শেষ কথা। কিন্তু শান্তিনিকেতনকে শ্রীনিকেতনকে নিজের ব'লে গ্রহণ করতে হ'লে শুধু হৃদয়াবেগই যথেষ্ট নয়, তার রক্ষণ পোষণের তার সুষ্ঠু পরিচালনের, তার আত্মপ্রকাশের ধারাকে সত্য ক'রে তুলতে হ'লে জাতির পক্ষে চাই ত্যাগ, চাই গঠনশক্তির সাধনা। বাঙালী তার দায়িত্ব স্কন্ধে নিতে তার কর্তব্যের ভার গ্রহণ করতে তাই আজ পরাঙ্মুখ। বাঙালীর রাষ্ট্রীয় আত্মচেতনার জীবনে আজ উত্তেজনার মহোল্লাস পরিলক্ষিত হচ্ছে, তপোবনের শান্তচ্ছবির দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ার দিন এখনো সুদূরে। যেদিন এই উত্তেজনার বাষ্প মরীচিকার মত শূন্যে মিলিয়ে যাবে, সেদিন তার চোখে পড়বে তপোবনের শান্তরসাস্পদ স্নিগ্ধ রূপ যেখানে যুগে যুগে সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে, যেখানকার বাণী বহন করে যুগে যুগে নব নব ঋত্বিক মনুষ্যলোককে অমৃতলোকের পথে নিয়ে গিয়েছে।

কবির এই শুভ জন্মবাসরে বিশ্বের অধিদেবতার কাছে এই প্রার্থনাই জানাই যে আমাদের জাতির সেই ঈপ্সিত জন্মসন্ধিক্ষণ অদূরবর্তী হোক, রবীন্দ্রনাথের জন্মকে এবং তাঁর কর্মকে আমরা যেন তার সত্যিকার মূল্যে গ্রহণ করতে পারি।*

* এলাহাবাদে রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উৎসব-সভায় পঠিত।

বিভ্রম

প্রভাত দেবসরকার

একটি নয়, আধটি নয়—একেবারে দশ্‌-দশটি গণ্ডা পয়সা চোখের নিমিষে উধাও !!

মগের মুল্লুক নয় যে, যাবে বল্‌লেই যাবে ! আর রাস্তায়ও পড়েনি, জলেও কেউ ফেলেনি। চোখের পলকে নেই বললেই শুনবেন কেন তিনি !

এই তো তাঁর স্পষ্ট মনে পড়চে :

দেবু বাজার করে' এসে কলের জলে পয়সাগুলো ধুয়ে তাঁর হাতে তুলে দিয়েচে—হ্যাঁ হিসেব বুঝিয়ে গুণে দিয়ে গেচে। নির্ম্মলা দেবী বাঁ-হাত পেতে নিয়েছেন—নোড়াটাকে দু'হাতে বাগাতে হয় বলে' শিলের পাশে তখনকার মত রেখেছিলেন,...হ্যাঁ দেবুও চলে গিয়েছিল—সে বেচারীর কোন দোষ নেই,—ওদিকে আবার তাকে স্কুলের পড়াও ক'রতে হ'বে সারা সকাল দশ আনার হিসেব রাখ্‌লে চলবে কেন ?

এই তো বেশ মনে পড়চে :

একটা মোটা সিকি, দুটো দোয়ানি, একটা আনি, চারটে পয়সা, মোট আটটা জিনিষ—দশটি গণ্ডা পয়সা ! গোণার হ'বে কেন ? তিনি তো অনেকবার গুণেচেন—মনে-মনে, দেখে-দেখে, নেড়ে-নেড়ে, একটা একটা করে'। ঐ শিলটার ঠিক মাথার কাছে ছিল।

পয়সা কটার দিকে চেয়ে যে কথাগুলো ভেবেছিলেন, সে কথাগুলো পর্য্যন্ত স্পষ্ট তাঁর মনে পড়চে :

কতবার তো মনে হয়েছিল, একটা কড়কড়ে টাকা কিরকম টুক্‌রো-টুক্‌রো হ'য়ে ভেঙ্গে গেল। টাকাটা হাতে ক'রতে যে নিশ্চিন্ত ভাবটা হ'য়েছিল, এখন তা আর হ'চ্চে না।...তারপর মনে হ'য়েছিল শিবদাসের কথা। পয়সার জন্যে ছেলেটাকে কি রকম না ছুটোছুটি ক'রতে হয় উদয়-অস্ত !

আজ রান্না বন্ধ, কোন উপায় নেই—কর্ত্তা দিব্যি চুপ করে' নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছেন। শিবদাস কোত্থেকে যে, স্যুট করে' টাকাটা বার করে' দিলে কেউ বুঝ্‌তে পারলে না। ও যেন আগে থেকে গন্ধ পায়। আগে থেকে ব্যবস্থা করে রাখে। যখন পারে না পালিয়ে যায়। আশ্চর্য্য যেমন করে' হোক ও চালিয়ে দেবেই। একদিনও তাঁর হাঁড়ি বন্ধ হ'লো না—হ'লো হ'লো ক'রেও হয়নি। হ'তে চেয়েচে, শিবদাসই হ'তে দেয়নি। আহা শিবদাসের মত ছেলে হয় না ! কিন্তু ?

চোখের কোলটা তাঁর ভারি হ'য়ে এসেছিল। কনুই দিয়ে একপাশের আঁচল সরিয়ে চোখ মুছে-ছিলেন তিনি।

তারপর-ই ভেবেছিলেন—

নোড়ার উপর বাঁ-হাতের শাঁকের শাঁখাটা অনবরত ঘস্‌টানি খাচ্চে—ভেঙ্গে যেতে পারে, হাতের উপর তুলে দেওয়া দরকার। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আর তুলে দেওয়া হয়নি। পিছন দিকে 'তিজেল' থেকে ডালটা ভোঁস্‌ করে' উৎলে পড়লো।...

তারপর ডাল নামালেন, তরকারী চড়ালেন, শিল তুললেন, পিঁড়ি তুললেন—পয়সাগুলোকে আঁচলে বাঁধবেন মনে ক'রলেন। হঠাৎ পিছন ফিরে খুন্তি দিয়ে তরকারিটা নেড়ে দিলেন—বড় চড়-পড় শব্দ হচ্ছিল।

তারপর শিলের পাশে কুটনোর আনাজগুলো কলতলার টিনের মধ্যে ফেলে দিয়ে এলেন, মেঝের বাটনার জলগুলো বাইরে ফেলে দিলেন।

স্পষ্ট তাঁর মনে পড়চে সব কথা জলের মত—একটার পর একটা। হ্যাঁ—

এর মধ্যে খুকুটা রান্নাঘরের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে ছিল। পয়সা গুলো দেখে' বায়না ধরলে, হে মা, তোমার পায়ে পড়ি; একটা পয়সা দাও না—ঐতো অতোগুলো রয়েচে! একটা দাও না, বড্ড খিদে পেয়েচে, তোমার পায়ে পড়ি!

মনে পড়চে তাঁর:

পয়সা তিনি দেন্‌নি, বরং মার দিয়েছিলেন। বাটনা-রাঙ্গা হাতে মার খেয়ে মেয়েটার পিঠের উপর পাঁচ আঙ্গুলের হলদে দাগ পড়ে গিয়েছিল। তবু মেয়েটা নড়েনি—রান্নাঘরের কপাট ধরে তেমনি বায়না করছিল ঘ্যান্‌-ঘ্যান্‌ করে। অনেকবার দিই-দিই করেও নির্ম্মলা দেবীর দিতে মন সরেনি। বরং তিনি ব'লেছিলেন—পয়সা নিয়ে কি হ'বে, এখনি যত সব আজে-বাজে জিনিষ কিনে খাবে তো? খিদে-পেয়েছে? বেশ তো, চান ক'রে নাও না, ভাত দিচ্চি!...পয়সা দেখেচে কি মেয়ের অমনি টনক নড়ে উঠলো! কি অসভ্য মেয়ে রে বাব্বা!

তারপর তরকারিতে আরো খানিকটা জল দিয়ে রান্নাঘরের শিকল তুলে তিনি শোবার ঘরে এলেন।

কর্ত্তা তেমনি পথ জুড়ে মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন। দেখে নির্ম্মলাদেবীর একটু রাগ হ'য়েছিল বৈকি! শুধু শুধু পথজুড়ে মাঝখানে 'ওলপরামাণিক' হ'য়ে বসে' থাক্‌বার কি মানে হয়? উঠে বস্‌তেও কষ্ট হয় নাকি!!

ইদানিং কর্ত্তার উপর নির্ম্মলা দেবীর প্রায়ই এমন রাগ হয়। চিরটা কাল নাকি তিনি তাঁকে জ্বালিয়ে এসেচেন। আজ যে তাঁর এই দশা, তাও নাকি কর্ত্তার জন্যে! অমন একটা অবুঝ-বেপরোয়া লোক ভূভারতে আছে না কি?

এত কথা দুঃখ আর অভিমানের সঙ্গে নির্ম্মলা দেবী ভেবেছিলেন।

তারপর ঘরে ঢুকে লক্ষ্মীর জায়গা থেকে 'দেবী মাহাত্ম্য' বইখানা নিয়ে বাইরের রোদে পিঠ দিয়ে বসলেন। খুকুটা তখনও পেছনে ঘ্যান্‌-ঘ্যান্‌ ক'রচে। নির্ম্মলা দেবী মনঃস্থির কর'তে পারচেন না।

পাঁচ শত্রুদের জ্বালায় একটু ঠাকুর-দেবতারও নাম করবার উপায় নেই!

নির্ম্মলা দেবী কর্ত্তার আক্কেলখানা দেখলেন। দিব্যি আরামে বসে আছেন চোখ বুজে!

কাঁহাতক আর সহ্য করা যায়? রক্তমাংসের শরীর তো মানুষের! নির্ম্মলা দেবী ঝাঁঝের সঙ্গে চিৎকার করে' উঠ্‌লেন—"যত সব নিমুরুদের দল জুটেচে, কুটোটি নেড়ে সাহায্য করতে পারেননা! নড়ে বস্‌তে কষ্ট হয়!! কি বরাত করে' যে এসেছিলুম"—

কর্ত্তা চোখ তুলে বললেন, "কেন, কি হ'য়েছে শুনি? অত কথার কি হ'লো!"

নির্ম্মলা দেবী ফেটে পড়লেন, "হ'বে আর কি, তোমার মাথা! আমি মরলে তোমাদের হাড় জুড়োয় সে কি আর আমি বুঝি না! জানি গো জানি !!...বলি চোখের মাথা না-হয় খেয়েচো, তা কাণের মাথাটাও গেচে নাকি ?"

কর্ত্তা অবাক হ'য়ে বললেন, " কেন কাণে তো আমি বেশ শুনতে পাই এখনো! তুমি যা ব'ললে, তার একটি'ও না-শুনিনি তো! যাই বল কাণ আমার খুব খাড়া।"

নির্ম্মলা দেবী ভীষণ চটে গিয়েছিলেন। "দেবীমাহাত্ম্য" খানা বাঁ হাতের আঙুলের চাপে বন্ধ ক'রে ঝাঁপিয়ে উঠ্‌লেন "হাঁ গো হাঁ, জানি তোমার কাণ খাড়া! ওকি আর যে-সে কাণ, বনেদী জমিদারী কাণ! এখন দয়া ক'রে এদিকে একটু কাণ দাও না।"

"—কোন্ দিকে ?"

নির্ম্মলা দেবী সরল ভাষায় বললেন, কাণের মাথা খেয়েচো নাকি ? মেয়েটা যে তখন থেকে ঘ্যান্-ঘ্যান্ ক'রচে শুন্‌তে পাচ্চো না। দয়া করে' চুপ ক'রতে ব'লে না-হয় একটু অপকারই ক'রলে!"

—কর্ত্তা সোজা মানুষ। সোজা উপায় বলে দিলেন—"দাও না বাবু, চাইচে যখন একটা পয়সা ফেলে।"

"জানি, সাত-শকুনের নজর পড়চে এতে, আর রক্ষা আছে! দাও না একটা পয়সা!! আসে কোত্থেকে শুনি ? তোমার-কি, মুখের-কথা খসাতে কি আর কষ্ট বল! মুরোদ তো ভারি !!"

কর্ত্তা শিব, চোখ বুজে বললেন, "আহা, দাও না একটা!"

—"তার পর সাত-গুষ্টিতে শুকিয়ে মর! আছে যখন পাঁড়-পাঁড়িয়ে খরচ কর !!"

কর্ত্তা মোলায়েম করে' বললেন, "একটা পয়সাতে কী আর যাবে আসবে ? দিয়ে দাও না, মেয়েটা বড্ড বায়না ক'রচে, আহা পরে বরং ভুলিয়ে নিয়ে নিও, না-হয়।"

নির্ম্মলা দেবী আর সাম্‌লাতে পারলেন না। "দাও সর্ব্বস্ব খাও" বলে' আঁচলটা ছুঁড়ে কর্ত্তার দিকে ফিঁকিয়ে দিলেন।

কিন্তু একি! আলগা গেরো খুলে খালি চাবির গোছাটা কর্ত্তার হাঁটুতে গিয়ে লাগল, আঁচলটা মাঝ্‌ পথেই নেতিয়ে পড়্‌লো।

নির্ম্মলা দেবী সভয়ে তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে দেখ্‌লেন, আঁচল খালি—পয়সাগুলো নেই। বোবা বিস্ময়ে চেয়ে দেখলেন, কর্ত্তা তখন সযত্নে হাঁটুর উপর হাত বুলচ্চেন। মনে হলো ঠোঁটের কোণেও হাসি!

নির্ম্মলা দেবী চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন: পয়সা গুলো ?

রোরুদ্যমান খুকুটা হঠাৎ চমকে উঠে থেমে গেল। কর্ত্তা নড়ে-চড়ে উঠলেন।

নির্ম্মলা দেবী তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে কাপড় ঝেড়ে দেখ্‌লেন, 'দেবীমাহাত্ম্য' খানা ও'ল্টালেন, পাল্টালেন—কোমরের কসি পরখ ক'রলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য কোথাও পয়সা নেই !!

নির্ম্মলা দেবী ছুটে ঘরে ঢুকে লক্ষীর জায়গাটা ওল্টালেন, আবার বেরিয়ে এলেন ঝড়ের বেগে।

কর্ত্তা তেমনি বসে' আরাম করে' হাঁটুর উপর হাত বু'লচ্চেন। নির্ম্মলা দেবীর রাগে গা গস্‌-গস্ ক'রতে লাগল। তবু মিনতি করে' জিগ্যেস ক'রলেন, "ওগো পয়সা গুলো কোথায় রেখেচি বলনা !!"

কর্ত্তা চোখ তুলে বললেন, "রাখ্‌বার সময় আমায় বলে' রাখনি তো!"

ভিজে জড় কণ্ঠেড়ি নির্ম্মলা দেবী বললেন, "না হ'লেই বা ! তুমি দেখনি ? এই মাত্তর আঁচলেই তো ছিল গেল কোথায় ?"

ঈষৎ হেসে কর্ত্তা ব'ললেন, "তা আমি কি জানি বাপু ! ওরে খুকু, তুই জানিস্ নাকি ?"

খুকু মাথাটাকে একদিক থেকে আর এক দিকে হেলিয়ে দিলে।

নির্ম্মলা দেবী কি মনে করে' ঝড়ের বেগে রান্নাঘরের দিকে ছুটে চল্‌লেন। শিল-নোড়া সব তন্ন-তন্ন করে' দেখ্‌লেন, জলভর্ত্তি বাল্‌তিতে হাত পুরে দিলেন, ডালের কাঁসিতে খুন্তি ঢুকিয়ে নেড়ে-চেড়ে পরীক্ষা ক'রলেন।

কিন্তু-কৈ ? পয়সা গুলো গেল কোথায় ?

নির্ম্মলা দেবী আবার ঘরে ছুটে গেলেন, বিছানা-পত্তর সব নামিয়ে ঘেঁটে-ঘুঁটে তচ্‌নচ্‌ ক'রলেন। কিন্তু কৈ পয়সা ?

ঘরের মাঝ্‌খানটিতে দাঁড়িয়ে নির্ম্মলা দেবী অসহায়ভাবে চারিদিক তাকালেন। মাথার ভেতর সব যেন গুলিয়ে গুলিয়ে উঠতে লাগল। কেবলি ঘুরে- ফিরে মনের ভেতর খচ্‌ খচ্‌ ক'রতে লাগল : দশ্‌ দশ্‌টি আনা পয়সা চোখের নিমিষে উধাও—এক দণ্ডে, এক মুহূর্ত্তে ! দেখ্‌তে দেখ্‌তে নেই-ই !!

হাত-পা ঝিম্‌-ঝিম্‌ ক'রতে লাগল। নির্ম্মলা দেবী টল্‌তে টল্‌তে বেরিয়ে এলেন।

কর্ত্তা তেমনি বসে' আছেন নিশ্চিন্তে—খুকু ভয়ে নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। নির্ম্মলা দেবী তাকে নিয়ে পড়লেন—"বল হারামজাদী, বল তুই কোথায় রেখেচিস্ ! বল শিগ্‌গীর ভাল চাস্ তো ! কেবল পয়সা আর পয়সা !......সেই চুপ করে' আছিস্, বল শিগ্‌গীর বলচি ! কী শত্তুর জুটেচে সব !!"

খুকু হাউ-মাউ করে চেঁচিয়ে উঠলো। কর্ত্তা এতক্ষণে রুষ্ট হ'য়ে বললেন, "নিজে কোথাও রেখেচো দেখনা ! তা নয় দুধের মেয়েটাকে চোর সাব্যস্ত করে' বস্‌লেন। ঢের ঢের মেয়ে মানুষ দেখেচি বাববা : !"

ব্যস্। আর যায় কোথায় ! নির্ম্মলা দেবী উল্টে কর্ত্তার ওপর পড়লেন, "তুমিই রেখেচো, তাই এতক্ষণ সাধু সেজে বসা হ'য়েচে ! বেশ, খুব বদ মেয়ে আমি, দিয়ে দাওনা পয়সাগুলো—আর আলিওনা মিথ্যে।

হাঁটুর ওপর হাতের চাপ দিয়ে কর্ত্তা উঠে দাঁড়ালেন। ব'ললেন, "ক্ষেপেচো ! কোথায় পয়সা ? মাথা ঠাণ্ডা করে' ভেব দেখ রেখেচো কোথায়—হাত্‌পা নেই যে ঘর থেকে উড়ে যাবে !"

কিন্তু ? নির্ম্মলা দেবী স্থির থাক্‌তে পারলেন না, ফের ছুটে গেলেন রান্নাঘরের দিকে। বাটনা মশ্‌লার হাঁড়িগুলো এক-এক করে' নামালেন, মুখের সরাগুলো খুলে হাত পুরে পুরে দেখ্‌লেন।

নাঃ, কোথাও নেই !

অধিক নাড়চাড়া খেয়ে দু'একটা হাঁড়ি-সরা ভেঙ্গেও গেল। বহুদিনের বিবর্ণ সরা-ভাঙ্গার আওয়াজ হ'লো না বেশী, কিন্তু নির্ম্মলা দেবীর চোখ ফেটে জল এল !

কোথায় তবে পয়সাগুলো রাখ্‌লেন তিনি ?

এই এইখানেই ছিল, চোখের নিমিষে উড়ে গেল ?

অস্থিরভাবে আবার নির্ম্মলা দেবী শোবার ঘরের দিকে ছুটলেন। দেখ্‌লেন, কর্ত্তাও খুঁজ্‌ছে

লেগে গেলেন, খুকুটা ক্ষিদে ভুলে হামাগুড়ি দিয়ে তক্তাপোষের নীচে ঢুকেচে।

কি মনে করে' নির্ম্মলা দেবী আবার ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এলেন, দালানটা তিনপায়ে পার হ'য়ে পাশের একটা চোর-কুটরীর মত ঘরে ঢুকে পড়লেন। তাড়াতাড়িতে মাথাটা সজোরে কাঠের পার্টিশনে ঠুকে গেল।

হাঁপাতে হাঁপাতে জিগ্যেস ক'রলেন, "দেবু, পয়সাগুলো? দেবু গাছ-থেকে-পড়বার-মত-করে' বল্লে, "তার মানে? এই তো তোমায় দিয়ে এলুম! এর মধ্যে ভুলে গেলে? বারে!"

হঠাৎ যেন ধাক্কা খেয়ে নির্ম্মলা দেবী বেরিয়ে এলেন সটান দালানে। পেছন পেছন দেবুও বেরিয়ে এল।

শোবার ঘরে ঢুকে দেখ্‌লেন, কর্ত্তা সমস্ত জিনিষপত্তর ঘরের মাঝ্‌খানে ডাঁই করে' ফেলেছেন, খুকুটা তখনো হামাগুড়ি দিয়ে অন্ধকার তক্তাপোষের নীচে মাথা ঠুকে-ঠুকে প্রদক্ষিণ ক'রচে।

নির্ম্মলা দেবীর সব যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্চে। এই ছিল চোখের সামনে, এই নেই! এ কেমন করে হয়?

পেছন থেকে দেবু বললে, "মা, তুমি একটু ব্যস্ত কম হও্ ‍দিকি! মাথা ঠাণ্ডা করে' আস্তে আস্তে ভাববার চেষ্টা করনা। এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালে কি আর পয়সাগুলো তোমার হাতে এসে পড়বে?"

সে-কথা কে না জানে! নির্ম্মলা দেবী তো সেই চেষ্টাই ক'রচেন। মনটাকে যত হাত্‌ড়াতে চেষ্টা ক'রচেন, ততই সব গুলিয়ে যাচ্চে—জমাট অন্ধকারে পরিচিত দিনের আলোয় বহুবার দেখা জিনিষকে অনেক হাতড়ে না পাওয়ার মত। ছিল এই, এই খানেই, কিন্তু কিছুতে মিলচে না!

কর্ত্তা হাক্লান্ত হ'য়ে পড়েচেন। বিরক্ত হ'য়ে বললেন, "সে গেচে! বেশী সাবধানী হ'লে যা হয়!"

খুকু তক্তাপোষের নীচ্ থেকে বেরিয়ে এসে এক কোণে জড়সড় হ'য়ে দাঁড়িয়েচে। অতটুকু মেয়ে হ'লেও তার বুদ্ধিতে মনে হ'তে লাগল, পয়সাগুলো হারান'র জন্যে সে-ই দায়ী!

নির্ম্মলা দেবী কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এলেন। এঁদের আপাততঃ নিশ্চিন্ত ভাব দেখে তাঁর মনে হ'তে লাগলো, পয়সাগুলোর খোঁজ এঁরা জানেন, কিন্তু তাঁকে ভোগাবার জন্যেই চুপ করে যে-যার মন্তব্য ক'রচে।

রেগে নির্ম্মলা দেবী 'দেবীমাহাত্ম্য' খানা হাতে নিয়ে বসে পড়লেন। ওঁদের যখন গরজ নেই, তখন তাঁর-ই বা এত ব্যস্ত হওয়া কেন? আর সাত্‌শকুনের পাল্লায় যখন পড়েছে, তখন ও ক'টা পয়সা আর কতক্ষণ?

দেবু ব্যস্ত ভাবে চারদিক ঘুরে ফিরে বল্‌তে লাগল, "ভাল করে মনে ক'রে দেখ দেখি মা! তোমার হাতে দিলুম, তুমি বাঁ-হাত বাড়িয়ে নিলে—নিয়ে শিলের মাথার কাছে রাখ্‌লে···তার পর?"

নির্ম্মলা দেবী ঝাঁপিয়ে বললেন. "জানি না আমি। খেয়ে ফেলেচি···হ'লো তো!"

কর্ত্তা কিছুদূরে বসে' পড়ে' হাঁটুতে হাত বুলোচ্ছিলেন, বললেন, "কি আর হ'বে মিথ্যে মনে ক'রে! সে গেচে!"

নির্ম্মলা দেবী চীৎকার করে বললেন, "গেচে-ই তো! সাতসকুন যখন, সে কতক্ষণ?···গেচে! গেচে!! গেচে!!! ভারি সুখটা হ'চ্চে তোমার?"

নির্ম্মলা দেবী আর কথা বলতে পারলেন না, গলা ধ'রে এল। হু হু ক'রে চোখের কোণে জল নামলো।

ঘটনার গতিস্রোত উল্টোমুখো বইচে ভেবে দেবু মুখ বুঁজে নিজের সাধ্যমত খুঁজে বেড়াতে লাগল। দেখাই যাক্ না, মাকে না-খাটিয়ে সে যদি নিজে খুঁজে বার ক'রতে পারে!

খুকু বাপের কাছটিতে ব'সে সভয়ে মাঝে মাঝে দেখতে লাগল, তার মনে অনেক, অনেক প্রশ্ন জাগছিল সে যদি এখনো 'খুঁজে-খুঁজে নারি, যে-পায় তারি' ব'লে সারা বাড়িটা খোঁজে তা হ'লে হারান পয়সাগুলো সে পাবে-ই পাবে! সবাই-ই তো তাই পায়!

কিন্তু কাজ কি এখন মাকে ও সব কথা বলে' যে রেগে আছেন উনি!

মুখে যতই বয়ে-গেচে ভাব দেখান, নির্ম্মলা দেবী কিন্তু 'দেবী-মাহাত্ম্য' খানার ওপর চোখ রেখে মনটাকে পিছনে চালিয়ে আন্‌তে লাগলেন সাবধানে। আস্তে-আস্তে, ধীরে সুস্থে সব কথা মনে ক'রতে চেষ্টা ক'রলেন ঃ

...ডাল নামালেন, তরকারী চড়ালেন, শিল তুললেন, পিঁড়ি তুল্‌লেন, পয়সাগুলো আঁচলে বাঁধবেন ব'লে মনে ক'রলেন...তারপর? আঁচলে বাঁধলেন না—কিছুতেই মনে পড়চে না।

স্মরণশক্তিটা ঐ পর্য্যন্ত ঠিক এসে একেবারে ফাঁক হ'য়ে পড়ে। তারপর খানিকটা ঠেলে দিলে ঠিক ফলে সামনের দিকে কোথাও আট্‌কায় না।

নির্ম্মলা দেবী 'দেবী মাহাত্ম্যে' চোখ রেখে থেকে থেকে কেমন যেন নিশ্চল হ'য়ে যেতে লাগলেন। চোখের সাম্‌নে ঘরটা যেন দুলতে লাগলো—সব যেন টল-মল ক'রচে, কানের দু'পাশ গরম হ'য়ে বোঁ বোঁ ক'রচে।

তাড়াতাড়ি নির্ম্মলা দেবী নিজেকে চিম্‌টি কেটে দেখলেন। নাঃ, আগের মতই লাগচে তাঁর। কিন্তু?

ডাল নামালেন, তরকারী চড়ালেন, শিল তুল্‌লেন, পিঁড়ি তুললেন, পয়সাগুলো আঁচলে বাঁধলেন, কি, বাঁধলেন না? না, কিছুতেই মনে পড়ে না!

মাথাটাই কেবল ভারি হ'য়ে আস্‌চে। স্মৃতিশক্তির অক্ষমতায় নির্ম্মলা দেবীর মাথার চুলগুলো টেনে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করলেন, মাথা কুটে-কুটে রক্তগঙ্গা—তাহলে যদি তাঁর মনে পড়ে! হাত কাম্‌ড়ালে বোধ হয় তিনি আরাম পাবেন বেশী! কিন্তু? মনটাও যেন, কিছুতেই তাকে রেহাই দেবে না,—ঘুরে ফিরে কেবলি—

ডাল নামালেন তরকারী চড়ালেন, শিল তুললেন, পিঁড়ে তুললেন, পয়সাগুলো আঁচলে বাঁধলেন, না, বাঁধলেন না?

না, ঐ পর্য্যন্ত এসে থম্‌কে দাঁড়াতে হয়, কিছুক্ষণ থেমে বিস্মৃতি গহবরটা লাফিয়ে সাম্‌নে স্মৃতির পথে চলা যায়।

নির্ম্মলা দেবী চোখে যেন অন্ধকার দেখ্‌তে লাগলেন ঃ কর্ত্তার মুখ, খুকুর মুখ আস্তে-আস্তে ঐ অন্ধকারে যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। চোখের সামনে একটা কালো পর্দ্দা ঝুলচে।

ইতিমধ্যে শিবদাস ছেলে পড়িয়ে ফিরলো।

শিবদাসকে দেখে নির্ম্মলা দেবী যেন কেমন হ'য়ে গেলেন।

হঠাৎ স্মৃতিশক্তির প্রক্রিয়া তাঁর খেই হারিয়ে জটপাকিয়ে গেল। যতই তাড়াতাড়ি সফলকাম হ'বার চেষ্টা করলেন, ততই সেটা তাল পাকিয়ে উঠ্‌তে লাগলো। একবার মনে হ'চ্ছে—

পয়সাগুলো দেবু তাঁর হাতে দিতে তিনি সোজাসুজি আঁচলে বেঁধে ফেলেছিলেন।

আবার মনে হ'চ্ছে—

পয়সাগুলো দেবু তাঁকে দেয়নি। শুধু মুখে-মুখে হিসেব বলে গিয়েছিল। তাই-হ'বে, তখন তার পয়সা নেবার তাঁর সময় ছিল কোথায় ?

এও মনে হ'চ্ছে—

তিনি যেন বলেছিলেন, দেবু, এখন তুই-ই রাখ, পরে নেব—দেখ্‌ছিস্ তো বাবা হাত জোড়া !

কিন্তু খুকুটা তার পরেই যে কাঁদ্‌লে ? স্পষ্ট মনে হ'লো তাঁর : মেয়েটার কান্নার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আর একবার শিলের পাশে পয়সাগুলোকে ভাল করে দেখেছিলেন।

না না দেবু দিয়ে গিয়েছিল তাঁর হাতে, তিনিও গুণে নিয়েছিলেন—দেখে-দেখে, মনে-মনে, নেড়ে-নেড়ে, একটা-একটা করে'। দশ-দশটা গণ্ডা পয়সা মোট আট্‌টি জিনিষ !

কিন্তু যদি নিলেন-ই তো গেল কোথায়? ঘর ছেড়ে তিনি তো কোথাও যাননি ! ডানা হ'লো নাকি পয়সাগুলোর ?

শিবদাস জামা খুলে এসে গম্ভীর মুখে দালানে দাঁড়িয়ে তেল মাখ্‌তে লাগলো। পয়সা-হারাণ সংবাদ সে ইতিমধ্যে পেয়ে গেছে।

শিবদাসের গম্ভীর মুখ দেখে' নির্ম্মলা দেবী আরো অসহায় ভাবে স্মৃতি হাত্‌ড়াতে লাগলেন—

আরো প্রাণ-পণে, আরো ব্যস্ততার সঙ্গে। আরো একটু চেষ্টা ক'রলে পয়সাগুলোর সন্ধান তিনি এখনই পেয়ে যাবেন ! ঐ তো ওরা যেন নাগালের কাছে এসে পড়েচে !

কিন্তু ? ডাল নামালেন, তরকারী চড়ালেন, শিল তুল্‌লেন, পিঁড়ে তুল্‌লেন, পয়সাগুলো আঁচলে বাঁধলেন, না, বাঁধলেন না ? কিছুতেই মনে আস্‌চে না। আর এলেও দ্বিধাপূর্ণ হ'য়ে পড়ে দুয়ের মাঝামাঝি : বাঁধলেনও বটে, আবার বাঁধলেনও না ?

নির্ম্মলা দেবী হতাশ হ'য়ে পড়লেন। অশ্রু শুকিয়ে উঠলো। অদূরে কর্ত্তা পা-ছড়িয়ে চোখ বুঁজে ঝিমচ্ছেন। শিবদাস তেল মাখতে লাগল।—ভাবটা গেছে, গেছে !

ও যদি এদের মত ব্যস্ত ভাব দেখাত, প্রশ্ন ক'রে তাঁর সুপ্ত স্মৃতি জাগাতে চেষ্টা করতো, নির্ম্মলা দেবী এত দুঃখেও আরাম পেতেন যেন—পয়সা হারান'র ক্ষোভটা ভুলতে পারতেন।

শিবদাস কী বোঝে না কাটাঘায়ে নুনের ছিটের মত তার চুপ ক'রে থাকাটা নির্ম্মলা দেবীকে পীড়া দিচ্ছে ?...

নির্ম্মলা দেবী প্রাণ-পণে স্মরণ ক'রতে চেষ্টা ক'রলেন :

দেবু হাত বাড়িয়ে দিল, তিনি বাঁ-হাতে নিলেন, নিয়ে শিলের পাশে রাখ্‌লেন।...তার পর ডাল নামালেন, তরকারী চড়ালেন, শিল তুললেন, পিঁড়ে তুললেন, পয়সাগুলো আঁচলে বাঁধবেন মনে ক'রলেন—

বাঁধলেন কী বাঁধলেন না ?

না, কিছুতেই ঠিক মনে ক'রতে পারচেন না। এটুকুর পরের ঘটনা কিন্তু জলের মত মনে পড়চে তাঁর।

আচ্ছা—

ডাল নামালেন, তরকারী চড়ালেন, শিল তু'ললেন। পয়সাগুলো আঁচলে বাঁধলেন, না, বাঁধলেন না ?

নাঃ আর পারচেন না তিনি মনে ক'রতে—মাথা কুটলেও না। অক্ষমতার লজ্জায় নির্ম্মলা দেবী মনে মনে হাউ-হাউ করে' কেঁদে উঠ্‌লেন। অশ্রুর পথ তাঁর রুদ্ধ হ'য়ে গেল। শিবদাস এখনো সামনে দাঁড়িয়ে তেল মাখ্‌চে।

হঠাৎ কলতলা থেকে দেবু চেঁচিয়ে উঠলো ঃ পেয়েচি ! পেয়েচি !! পেয়েচি !!!

খুকু, কর্ত্তা ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লেন, নির্ম্মলা দেবী পড়ি-কি-মরি ক'রে কলতলার দিকে ছুটলেন। পেছন পেছন শিবদাসও এল।

দূর থেকে দাঁড়িয়ে সবাই বিস্ময়ে দেখলে—নোঙ্‌রা-ফেলা টিন্‌টা কাৎ হ'য়ে পড়ে আছে আর দেবু তার কাছে দাঁড়িয়ে বা-হাতের চেটোটাকে চিৎক'রে' ধ'রে বিজয়গর্ব্বে হারান পয়সাগুলোর রূপ দেখাচ্চে।

সবার মুখে হাসির চিহ্ন দেখা দিয়েচে। নির্ম্মলা দেবীর মুখে হাসি, চোখের কোলে অশ্রু টল-টল ক'রচে।

শিবদাস বল্‌লে, "পয়সাগুলো ওর মধ্যে এল কি ক'রে ? আশ্চর্য্য !"

কর্ত্তা বল্‌লেন, "আস্‌বে আর কি করে, বেশী সাবধানী যে !"

দেবু হঠাৎ দার্শনিক ব্যাখ্যা করে বসল পয়সা যে হাতের ময়লা, তাই মা ময়লা ভেবে কুটনোর খোলার সঙ্গে ফেলে দিয়েচেন !

মা একেবারে চুপ। সব দেখে-শুনে তাঁর তাজ্জব লাগচে। তিনি নিজেই কিছুতে ভাবতে পারচেন না, সজ্ঞানে ঐ নোঙরা টিনের মধ্যে কি বলে' পয়সাগুলো ফেলে দিলেন ? এমন ভুল চোখ চেয়ে ক'রলেন কি করে' ?

সাবধানী মন তাঁর এমন করে' চোখের ভুল করল কেন ?



বিষ

শ্রী সুশীল জানা

আদিত্য ডাক্তারী পাশ ক'রে গ্রামে এসে প্র্যাকটিস সুরু ক'রবে—এ তার কোনো শুভার্থীই কল্পনা করেনি। তারা যখন অনুযোগ ক'রলো—তখন আদিত্য ব'ললো, দেশের সেবা ক'রবো। গ্রামে একটা ভালো ডাক্তার নেই—সত্যি কথা। গরীব শুভার্থীরা ব'ললে, ভালোই হ'লো। আদিত্যর শুভ কামনা আর প্রশংসায় তারা চর্তুমুখ হয়ে উঠ্‌ল।

বনমালী অর্থাৎ ডাক্তারখানার বয় এবং বেয়ারা—সে ব'ললে, আমি মারা গেলুম বাবু। গরীবের এখানেও মরণ, ওখানেও মরণ।

কম্‌পাউণ্ডার শুনে ব'ললে, কেন? ভয় কি—মরবি কেন? দেখি তোর পিলেটা কত বড়। ব'লে হাত বাড়ালে বনমালীর পেটের দিকে। ব'ললে, বেড়ে গাঁ বাওয়া তোদের—সকলেরই পিলে—যে দিকে চাই! ব্যাটাছেলে-মেয়েছেলে ঠাওর ক'রবার যো নেই। দেখি তোরটা—

—পিলে-টিলে নয় বাবু—অসুখ-বিসুখ কোন কিছু নয়।

—তবে?

বনমালী ব'ললো তার ঘনায়মান আর্থিক মৃত্যুর কথা। তার তিন চার বছরের খাজনা বাকী, নতুন বিয়ে ক'রেছে টাকা ধার-ধোর ক'রে, ডাক্তারখানায় আবার মাইনের আশা নেই। আদিত্য ডাক্তারের বাবা নারায়ণ দেব জমিদার লোক—তার নগণ্য আশ্রিত প্রজা সে, অনুগত। ঋণের টাকা উশুলের জন্যে বনমালীর ডাক্তারখানায় চাকরী। বেতন আনতে গিয়ে এই কথা শুনে সে আস্তে আস্তে চলে এসেছে।

—কিন্তু রোজের পেট চালাবো কি দিয়ে?

এর কোন ওষুধ জানা নেই কম্‌পাউণ্ডারের। চুপ ক'রে হাত গুটিয়ে সে ব'সে রইল। লোকটা হাল্‌কা মেজাজের শুনে গম্ভীর হ'য়ে গেল।

ডাক্তারখানায় ডাক্তারও নেই—আর কোনো লোক জনও নেই। জলার ওপাশে উঁচু ক্ষেতে হল্‌দে সর্ষে ফুলের বন্যা। বনমালী সেই দিকে তাকিয়ে ব'লল, এর চেয়ে চাষ-আবাদ করাই ভালো ছিল বাবু, মিথ্যা তখন টাকার মোহে পড়ে—

হাই তুলে মুখ বিশ্রী বিকৃত ক'রে কম্পাউনডার বল্‌লে, মন-মেজাজ খারাপ ক'রে দিলি রে। কম্‌পাউনডার আড়মোড়া ভাঙলে—লিক্‌লিকে সরু লম্বা দেহটা অধিকতর লম্বা হ'লো। ব'ললো, কাল থেকে শরীরটা বর খারাপ।

বনমালী সহৃদয়তার প্রতিদানে ব'ললে আপনি আবার বড় রোগা বাবু। কত বার ভালো ভালো ওষুধ পত্তর ঘাঁটেন—তাতে কত লোকের ভালো হ'চ্ছে ধরুণ আপনার কিন্তু—

কম্‌পাউনডার ব'ললে, ওই পাঁচ রকম ওষুধ ঘেঁটে ঘেঁটেই তো চেহারাটা খারাপ হ'য়ে গেল রে

বাওয়া। ব'লে ব্রণের কালোচিহ্নবহুল ফর্সা তোবরা গালে হাত বুলোতে লাগল। ব'ললে, পাঁচরকম বিষাক্ত ওষুধের ঝাঁজে দেহটা দিলে একবারে সাবাড় ক'রে।

বনমালী স্বীকৃতিসূচক দুর্ব্বোধ্য হাসি হাসলে।

কম্পাউনডার ব'ললে, বিশ্বাস হ'চ্ছে না—না? জানিস, কি রকম বিষ নিয়ে সব ঘাঁটাঘাঁটি ক'রতে হয়! এমন বিষ আছে যে, একটুখানি অমনি মুখে দিয়ে একটা সাহেব শুধু মাত্র লিখে যেতেই পারলে না-তার স্বাদটা কেমন। তার গন্ধ নিলেই ব্যস…ওই আলমারীতে আছে—ওই যে বড় বোতলটার পাশে। আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দিলে কম্পাউনডার।

এমনতর সাংঘাতিক আবহাওয়ায় কেমন ক'রে কাটাতে পারলে সে—কতদিন খুলেছে ওই আলমারী! ভগবান ধন্যবাদ—বনমালী মরেনি। বনমালী স্তব্ধ হ'য়ে চেয়ে রইল।

কম্পাউণ্ডার খোঁচা দিয়ে ব'ললে, বিশ্বাস হচ্ছে না তবু, না? ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিস, পোটাসিয়াম সায়ানাইডটা কি চিজ। বুঝলি?

নামটাও দীর্ঘ ও গালভরা। বনমালী শুধু খানিকটা হাঁ ক'রলে।

এমন সময় একটি লোক ছুটতে ছুটতে এলো—হাঁপাতে হাঁপাতে কম্পাউণ্ডারের হাতে একটা কাগজ ধরে দিয়ে ব'ললে, ডাক্তার বাবু কাগজটায় যা যা লিখে দিয়েছেন, তাই নিয়ে ফুর্ত্তি আপনাকে যেতে ব'ললেন। কৈলাশের বৌ কষ্ট পাচ্ছে।

—বটে! কষ্ট পাচ্ছে! কিন্তু কষ্ট পাওয়ার তো তার কথা নয়। কম্পাউনডার কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে ব'ললে, শুনলুম তিন বছরে তার পাঁচ-পাঁচটা ছেলে হ'য়েছে, ছটায় গড়াবে এবার—কষ্ট কিসের! এ যে খাওয়া শোয়ার মত সহজ ক'রে ফেলেছে রে!

—পোয়াতি মানুষ-এবার বড় কাহিল ক'রে ফেলেচে বাবু, কেমন হল্‌দে হ'য়ে গেছে।

—সেত হবেই বাওয়া, বয়স মেরে কেটে তেইশ পেরোবে না। নেচারশ্‌ রিভেঞ্জ একটা আছে তো। বুঝলি।…

—তা বৈ কি বাবু বুঝি সব…

কম্পাউনডার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ব'ললে, কচু বুঝেচিস। চল্ চল্ ও বনমালী, ওই আলমারী থেকে তুলোর বাণ্ডিল নে কাঁড়ি খানেক। নে চট্ পট্।

বনমালী কিন্তু ঠায় দাঁড়িয়ে রইল: তুলো আর পোটাসিয়াম সায়ানাইড একই আলমারীতে। নতুন বিয়ে ক'রেছে বনমালী আর এমন সুন্দর পৃথিবী, ও আলমারীর পাশ ও ঘেঁষবে না সে, চাকরী যায়-যাক্। অমন সাংঘাতিক বিষ!…

শুনে কম্পাউনডার ধমকে ব'ললে শিশিতে ছিপি আঁটা আছে তো! তবু কি ছুটে বেরিয়ে এসে তোর মুখে ঢুকে যাবে!

বনমালী তবু নড়লো না। অগত্যা গালাগালি দিতে দিতে কম্পাউণ্ডার জিনিষ-পত্র গুছিয়ে চলে গেল। বনমালী সোজা চলে এল ঘরে—ভাবলো কি সাংঘাতিক বিষ আর সুন্দর পৃথিবী। আর এই জীবন—নগ্নকান্তি নারী ভীরুতা দিয়ে, মায়া দিয়ে তাকে অধিকতর সুন্দর ক'রে তুলেছে। তা ছাড়া সমস্যামূলক রূপচর্চ্চা। বাঁচার বিড়ম্বনা।

সহর থেকে নতুন আনা আদিত্য ডাক্তারের দামী কৌচের চেয়ে ঢের নরম তুল্ তুলে কন্‌কি। বনমালী তাকে টাকা ধার ক'রে ভিনগ্রাম থেকে কিনে এনেছে। আর সেই ধারের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে ঠাকুরদাস আদালতের সাহায্য গ্রহণ ক'রেছে। করুক—বনমালীর টাকা শোধ দেওয়ার অবস্থা নয়। কন্‌কির দৈহিক অস্তিত্বের কাছে সব সমস্যা চাপা পড়ে যায় বনমালীর। পৃথিবী, জীবন যার প্রতিটি মুহূর্ত্ত পরম আগ্রহে সে উপভোগ করে। এত উদ্দাম, এত ঐকান্তিক গভীর সে যেন অল্প পরেই কন্‌কি -পৃথিবী-সময় সব নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে। বেদুইনের মত দু হাতে সে লুঠে নিতে চায় সব কিছু। দিনগুলো বড্ড বড় মনে হয়—আর রাত্রিটা বড় ছোট।

কিন্তু সরকারী আদালত আর ঠাকুরদাস টাকা হিসেব করে—বনমালীর সময়ের হিসেব করে না। তাদের আসার সময় হ'লো। বনমালীর টাকার দরকার। জীবন উপভোগের মূল্য আছে, কন্‌কি বনমালীর কাছে একটা খণ্ড কবিতার মতো হ'লেও—সে উপভোগের মূল্য দিতে হবে ঠাকুরদাসকে।

কিন্তু শোধের আশা নেই উপায় নেই এই অজুহাতে কেউ টাকা দেবে না বনমালীকে। যাদের টাকা আছে তারা যেন এক যোগে ষড়যন্ত্র ক'রে ব'সলো বনমালীর বিরুদ্ধে। মনিব নারায়ণ দেবও তার মধ্যে। নিরুপায় বনমালী অগত্যা খোরাকী ধান যা ছিল—তাই দিলো বেচে। তবু কিছু টাকা কম পড়ল।

কম্পাউণ্ডার ব'ললো খাবি কি—মাইনের টাকা তো কাটা যায়।

—চাকরী ছেড়ে দিয়ে এবার চাষ-আবাদ ক'রবো বাবু।

কথাটা আদিত্য ডাক্তারের কানে গেল—তারপর নারায়ণের কানে। বর্ষা সুরু হ'য়েছে—লোক জন সকলে চাষে নেমে গিয়েছে। বনমালী যদি চাকরী ছাড়ে তা হ'লে এমন দিনে লোক আর পাবে না আদিত্য। অথচ ডাক্তারখানায় চাকর একজন নিতান্ত প্রয়োজন।

আদিত্য ব'ললে, ভারী মুস্কিলেই পড়লুম দেখ্‌চি এখন!

নারায়ণ ব'ললে মুস্কিল আবার কিসের। চাকরী ক'রবেনা ব'ললেই হ'লো। আমার জমির খাজনার টাকা শোধ হবে কিসে!

রাগে নারায়ণ বনমালীকে ডেকে পাঠাল।

বনমালী এল, নিজের অবস্থা গুছিয়ে ব'ললো—তাতে নারায়ণ বড় বেশী অগোছাল হ'য়ে পড়ল। বনমালীর মত লোকের স্পর্দ্ধিত স্পষ্ট কথা শোনার মতো ধৈর্য্য বা অভ্যাস তার নেই। চোয়াল যখন ব্যথায় টন্ টন্ ক'রে উঠ্‌ল আর দাঁতের পাটি থেকে রক্ত ঝরে পড়ল—বনমালী তখন বুঝল কথাটা। বুঝে এল: চাকরী তাকে ক'রতেই হবে খাজনার মূল্য পরিশোধে, অথবা নিরাশ্রয়—নিরবলম্ব। না, বনমালী তা ভাবতে পারে না, বাইরের বিস্তৃত পৃথিবীর সঙ্গে সে পরিচিত নয়।

বিকেলের দিকে তার কুঁড়ে ঘরের চালার কাছে আদিত্য ডাক্তারকে দেখা গেল। বনমালী শশব্যস্তে ছুটে এলো। কন্‌কি গায়ের ছেঁড়া কাপড়টা এদিক-ওদিক টানাটানি ক'রে নগ্নতাকে আরও সুস্পষ্ট ক'রে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুক্‌ল। আদিত্য লোভী দৃষ্টিতে চোখের কোনে তাকাল—অপাঙ্গে সেটুকু লক্ষ্য ক'রে গেল কন্‌কি আর নিঃশব্দে হেসে গেল বিজয়িনীর মতো।

আদিত্য তারপর বন্‌মালীকে ব'ললো, ডাক্তারখানায় আজ গেলিনে যে তুই?

—কাল থেকে যাবো বাবু।

—হ্যাঁ যাস্। তোকে ভাবতে হবে না, বুঝ্‌লি।

আদিত্যর হঠাৎ তারপর তৃষ্ণা পেয়ে গেল—ব'ললো, তোর বৌকে একটু খাওয়ার জল আনতে বল্ দেখি। কথাটা অকারণে চেঁচিয়ে ব'ললো আদিত্য।

বনমালী ব্যস্ত হ'য়ে নিজেই জল আনতে যাচ্ছিল—এমন সময় দেখা গেল, কন্‌কি জল নিয়ে আস্‌চে। আদিত্যর নিঃশব্দ হাসির ঝলক পড়ল কন্‌কির চোখে। আদিত্য জল খেতে খেতে ব'ললো, বাবাকে আমিও ব'লবো আর।—আদিত্য চোখের কোণে তাকাল একবার কন্‌কির দিকে—ব'ললো, আর তোর বৌকেও সন্ধ্যের পর আজ পাঠিয়ে দিস একবার—কেঁদে কেটে পড়লে একটা উপায় হবে। হাজার হোক-মেয়েমানুষের কান্না···

জলের গেলাস নিয়ে কন্‌কি ঠোঁট কামড়ে মুখ নীচু ক'রে চলে গেল।

আদিত্য চলে গেল শিস্ দিতে দিতে।

তখন থেকে বনমালী উপদেশ দিতে সুরু ক'রলো কন্‌কিকে: কেমন ক'রে তার কেঁদে পা জড়িয়ে ধরা উচিত, কেমন ক'রে বলা উচিত দুঃখ দুর্দ্দশার কথা ইত্যাদি। এ চল্‌ল সন্ধ্যে পর্য্যন্ত।

আবার ব'ললো, একখানা ছেঁড়া-ময়লা কাপড় পরে যাস্ বুঝলি!

কিন্তু কি বুঝ্‌ল কন্‌কি কে জানে। যাওয়ার জন্যে যখন সে বেরোল তখন দেখা গেল পরণের সাড়ী তার ছেঁড়াও নয়, ময়লাও নয়, চুলগুলি পরিপাটি ক'রে বাঁধা, মুখে আর মাথায় তেল চক্‌চক্ ক'রছে।

বনমালী ক্ষুণ্ন হ'য়ে ব'ললো ওই বেশে গিয়ে দাঁড়ালে কোনো লোকের দয়া হয়! এত ক'রে ব'ললুম তোকে—

মুখ ভার হ'য়ে গেল কন্‌কির। একবার বেঁকে ব'সে যদি সে তা হ'লে মুস্কিল। বনমালী আর কিছু ব'লতে সাহস পেল না। কন্‌কি সেই বেশেই গেল। যাওয়ার সময় বনমালীর কাছ থেকে ফের একবার উপদেশগুলো শুনে গেল।

আদিত্যের স্ত্রী রমা। ঢল্‌ঢলে খাটো আদুরে চেহারা। ভয়ে সে থম্‌কে দাঁড়াল অন্ধকার কড়িডোরের মাঝখানে—আদিত্যর ঘরের দিকে যেতে আর পা উঠ্‌ল না। আদিত্যর ঘরটা আবার দক্ষিণের কোন ঘেঁসে এক প্রান্তে। রমা সভয়ে দেখ্‌লো: সর্ব্বাঙ্গে কাপড়মোড়া একটা অস্পষ্ট মূর্ত্তি সন্তর্পণে আদিত্যর ঘর থেকে বেরিয়ে খিড়কীর দিকে অন্ধকারে মিশে গেল। কিছুক্ষণ গলা দিয়ে তার কথা সর্‌ল না। তারপর ভয়ে ভয়ে ব'ললে কে!

কোনো উত্তর নেই।

"চোর চোর" ব'লে রমা চেঁচিয়ে উঠ্‌ল।

বাড়ীর দাস-দাসী, স্বয়ং নারায়ণ পর্য্যন্ত ছুটে এলেন। লণ্ঠন নিয়ে জন কয়েক লাঠি-সোঁটা নিয়ে খিড়কীর দিকে ছুটলো। রমা আদিত্যর ঘরে ঢুকলো। আদিত্য এত চেঁচা-মেচিতেও দিব্যি ঘুমোচ্ছে। তাকে ডেকে তুললে রমা।

রমা সন্দিগ্ধ কণ্ঠে ব'ললো, কিছুক্ষণ আগে দেখে গেলাম—তোমার ঘরের দরজা বন্ধ, আবার খুল্‌লো কে?

আদিত্য ঘুমজড়িত কণ্ঠে ব'ললো, কেন—আমি। মানে ইয়ে···তুমি এসে ফের ডাকাডাকি ক'রে বিরক্ত ক'রবে তাই খুলে দিয়েছিলাম। কেন—কি হ'য়েচে ?

—ঠিক বলো—কিছু জানোনা তুমি, কিছু জানো না !

—বাঃ, কি ব'লছ তুমি, কি জানব !

—তোমার ঘরে চোর ঢুকেছিল—বোধ হয় কোন মেয়ে মানুষ—

—হ্যাঁ, মেয়ে চোর! কই আলো নিয়ে এসো তো! আদিত্য অধৈর্য্য হ'য়ে নিজেই দেশ্লাই জ্বালালো।

কিন্তু সমস্তই ঠিক আছে। আদিত্য চারিদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখ্‌লো! রমা শুধু একবার তাকালো বিছানাটার দিকে। তারপর উত্তেজিত কণ্ঠে ব'ললো, সত্যি বলো—কিছু জানোনা তুমি—কিছু জানো না!

—বারে, কি জান্‌ব।

—না না, কিছু···কিছু না। আমিই ভুল দেখেছিলুম—

—তাই হবে। অন্ধকারে ওরকম ভুল মানুষের মাঝে মাঝে হয়। কই কিছুই তো চুরি হ'য়েছে ব'লে মনে হচ্ছে না।

—জিনিষ-পত্র তোমার ঠিকই আছে। কিন্তু যা আজ হারালে তাকে ফিরে আর পাবে না।

রমা দ্রুত সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিশ্বাস! মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা! আদিত্য হাস্‌লো—অন্ধকারে সাদা দাঁত গুলো ঝক্‌মক্ ক'রে উঠ্‌ল—তারপর বিছানায় আবার শুয়ে পড়ল সে।

কন্‌কি এসে ঘরে ঢুক্‌ল।

বনমালী জিজ্ঞেস ক'রলো, অতো হাঁপাচ্ছিস্ কেন ?

—কে একটা লোক—মস্ত কালো চেহারা, বনের মধ্যে গিয়ে ঢুক্‌ল। বাবুদের বাড়ী থেকে ওদিকে 'চোর চোর' ব'লে চেঁচাচ্ছে।

—মরুক্ গে।

চোরের কাহিনী শোনবার জন্যে এতক্ষণ উৎসুক হ'য়ে ছিল না বনমালী। সে জিজ্ঞেস ক'রলো, কি হ'লো তারপর বল্—খুব কাঁদলি তো ?

—হুঁ উ। নাক্ খুঁটতে খুঁটতে কন্‌কি ব'ললো, তিনটে টাকা দিয়েছে।

—মাত্র তিন টাকা! কে দিলে ?

—ডাক্তার বাবুর বৌ, আসচি কাপড় ছেড়ে—দিচ্চি—

কাপড় ছাড়তে গেল ঘরের মধ্যে কন্‌কি। আঁচলে বাঁধা পাঁচটা টাকার দুটো কাপড়ের পুঁটলির এক কোণে রাখলে গুঁজে! তারপর তিনটে টাকা নিয়ে বনমালীকে এসে দিলো।

বনমালী ব'ললো, কি হ'লো সব বল্। আমার মাইনের সম্বন্ধে কিছু—

—না, ডাক্তার বাবুর বাবা ত চটে আগুন। শেষে ডাক্তার বাবুর বৌ ডেকে টাকা দিলে। কন্‌কি একটু থেমে আবার ব'ললো, মাঝে মাঝে দু-এক টাকা এমনি দেবে ব'ললে।

—তাতে করে কি হবে। অন্তত পাঁচটা টাকা আজ পেলেও কাল ঠাকুরদাসের সব টাকাটা শোধ ক'রতে পারতুম।

কন্‌কি চটে ব'ললো, তবে আমি কি ছিনিয়ে আন্‌ব, না—চুরি ক'রে আনব ?

বনমালী চুপ ক'রে গেল।

সকালে ঠাকুরদাসের টাকা মিটিয়ে দিতে গেল বনমালী।

ঠাকুরদাস টাকা গুণ্‌তে গুণ্‌তে ব'ললে, মামলা মোকর্দ্দমায় যে খরচা হ'লো—সেটা কে দেবে ?

বনমালীর চোখে জল না এলেও খানিকটা কান্নার ধরণে হাউমাউ ক'রে ব'লল, গরীবকে রক্ষা করুন বাবু। ঘরের যা ছিল বেচে এনেছি—খাওয়ার একটি ক্ষুদ কুঁড়োও নেই আর।

ঠাকুরদাস টাকা গোনা শেষ ক'রে ব'ললে, তা না হয় হ'লো—কিন্তু আসল থেকেই যে তিনটে টাকা কম্।

—এই মাসের মধ্যেই দিয়ে দেবো বাবু। ডাক্তারখানায় চাকরী করছি—মাইনে পেলেই দিয়ে দেবো।

—উঁহুঁ, ওসব চল্‌বে না। ঠাকুরদাস টাকা ছুঁড়ে দিয়ে বললে, নিয়ে যা তবে। আদালত থেকে যা হয় হবে।

—বাবু—

—উঁহুঁ—

ঠাকুরদাস পাহাড়ের মতো অনড়। অগত্যা কন্‌কির আনা সেই তিনটি টাকা দিতে বাধ্য হ'লো বনমালী। ভেবেছিল, ঠাকুরদাসকে কোনো রকমে রাজী করিয়ে রাখবে তিনটি টাকা তবু কিছু দিন চল্‌বে পেটখরচ। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও টাকা ক'টি তুলে দিলো ঠাকুরদাসের হাতে।

কিন্তু ঠাকুরদাস টাকা ফিরিয়ে দিয়ে ব'ললো, তিনটেই অচল—জাল টাকা কোথায় কুড়িয়ে পেয়েছিস।

—সে কি বাবু !

—হ্যাঁ—ও চল্‌বে না।

—আচ্ছা বদ্‌লে এনে দিচ্ছি।

বনমালী ছুটল আদিত্য ডাক্তারের অন্দর মহলে রমার কাছে টাকা বদ্‌লে আন্‌তে। কিন্তু রমাকে দেখে সে থম্‌কে দাঁড়াল। রমার চোখ লাল, ফুলে উঠেছে, চুল উস্কোখুস্কো—মুখ পাণ্ডুর। বনমালী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উস্‌খুস্ ক'রতে লাগল।

রমা জিজ্ঞেস ক'রলে, কি চাই রে !

—আপনার অসুখ !

—কেন, ওষুধ দিবি ?

—না এম্‌নি ব'লছিলুম। বনমালী তবু দাঁড়িয়ে র'ইল।

—কিছু চাই ?

—মানে ইয়ে···বনমালী মাথা চুল্‌কে ব'ললো বৌকে কাল যে তিনটি টাকা দিয়েছিলেন—সে তিনটে টাকাই খারাপ।

রমা বিস্মিত দৃষ্টি মেলে বনমালীর দিকে চেয়ে রইল। গত রাত্রির রহস্যাবৃত সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে প্রাঞ্জল হ'য়ে গেল। বনমালীর দিকে চোখ তুলে সে তাকাতে পারলো না—তবু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস ক'রলো, কাল টাকা নিয়ে গিয়ে কি ব'ললো তোর বৌ ?

কনকি যা ব'লেছিল তারই পুনরাবৃত্তি ক'রল বনমালী। রমা উঠে গেল তারপর।

ফিরে এসে দশ টাকার দু'খানা নোট বনমালীর হাতে দিয়ে ব'ললে, তোর টাকার দরকার—আমার কাছ থেকে তুই চাইলিনে কেন হতভাগা। এই টাকা নে—আর এখান থেকে যা—যেখানে খুসী তুই পালা এ গাঁ ছেড়ে। তোর অভাব—তুই আমাকে এসে একবার জানালিনে কেন ?

উত্তেজনায় রমার চোখের কোণ দিয়ে জল ঝরে পড়ল।

বনমালী বুঝ্‌ল রমার দয়ার্দ্র কোমল অন্তরটিকে, ভাব্‌ল—নারায়ণের গতকালের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে বোধ হয় এই অভিযোগ। সে ব'ললো, কোথায় আর যাবো মা—আপনাদের দয়াতেই তো বেঁচে থাকতে হবে।

মুখের ওপরে উড়ে এসে পড়া চূর্ণচুলগুলি সরিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে রমা ব'ললো, যে তোর সর্ব্বনাশ ক'রবে তবু তারই দয়ায় তোকে বেঁচে থাক্‌তে হবে ! এ বাঁচার চেয়ে তোদের মরণ ভালো। ব'লতে রমা কেঁদে ফেল্‌লো—বনমালীর সর্ব্বনাশের দুঃখে নয়—নিজেরই দুঃখে। উত্তেজিত কম্প্র কণ্ঠে রমা ব'ললো, তুই পালা—এখান থেকে যেখানে হোক যা। যেখানে তোর অভাবের দুঃখের জন্যে কেউ তোর সর্ব্বনাশ ক'রবে না—সেইখানে যা।

বনমালী বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল। রমা চলে যাচ্ছিল—বনমালী অচল তিনটে টাকা দেখিয়ে ব'ললো, আপনার এই তিনটে টাকা—

—ও টাকা আমি ছোঁব না—আমি দিই নি। তোর ডাক্তার বাবু তোর বৌকে দিয়েচে—তাকেই দিস্‌।

হতভম্ব বনমালী ফেরবার উপক্রম ক'রছিল এমন সময় আদিত্য সেইখানে এলো। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বনমালীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস ক'রলো কিরে—কি চাই !

—কালকে বৌ যে তিনটে টাকা নিয়ে গিয়েছিল আপনার কাছ থেকে—

—আমার কাছ থেকে ! কে ব'ললো !

উত্তরোত্তর আদিত্যর গলা চড়তে লাগল উঁচুর দিকে। একটা চড় পড়ল বনমালীর গালে—আবার একটা—তারপর অনেক। আদিত্য চিৎকার ক'রে ব'ল্‌ল, তোর বৌ টাকা চুরি ক'রেছে—তিনটা নয়—পাঁচটা, আর পাঁচটাই ছিল অচল টাকা। টেবিলের ওপরে ফেলে রেখেছিলুম আমি। ব্যাটা শয়তান—

রমা ফিরে এলো। বনমালীর দিকে তাকিয়ে ব'ললো তুই যা। তারপর আদিত্যর দিকে চেয়ে ব'ললো চেঁচা-মেচি করে নিজের লজ্জাকে আর সকলকে জানিও না। ছি ছি।

রমা চলে গেল—বনমালীও।

ঠাকুরদাসের টাকা মিটিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরল বনমালী। আগা গোড়া সমস্ত ব্যাপারটা তার মনে একটা ঘন সন্দেহ পুঞ্জীভূত করে তুল্‌ল। কিছু যেন বুঝেচে সে, সব যেন জেনেছে সে—তবু কিছুই যেন তার জানা হয় নি। কন্‌কিকে সে কিছুই জিজ্ঞেস্‌ করতে পারলোনা। সারা দিন শুধু ছট্‌পট ক'রে কাটাল।

রাত্রি এলো—সেই সুন্দর রাত্রি, যার ঔদ্ধত্যে সে ভিন্‌ গ্রামের শ্রীহীন কম্‌পাউণ্ডারকে করুণা করেছে একদিন। কন্‌কির রূপশ্রীর সমস্ত মাদকতা আজ কদর্য্যতায় সান্ত্বনা খুঁজতে লাগল। সুন্দরতম যদি কিছু থাকে সে মেয়ে মানুষ আর কদর্য্যতম যদি কিছু হতে পারে—সে ওই ওরাই। বনমালী ছট্‌পট্‌ করতে লাগল, তার ইচ্ছে হলো—কন্‌কিকে জাগিয়ে সব জিজ্ঞেস করে। তারপর কন্‌কি যদি সব স্বীকার করে—বনমালী যা সন্দেহ করছে, রমা যা ইঙ্গিত করেছে—তা হলে? পাগলের মত বনমালী নিজের চুল ধরে টানতে লাগল—মাথা চেপে ঝিম্‌ হয়ে কিছুক্ষণ ব'সে রইল।

এক সময়ে কন্‌কিকে ডেকে তুললো বনমালী।

বনমালী জিজ্ঞেস ক'রলো, টাকা তোকে কে দিয়েছিল—সত্যি বল্‌। আমি সব জানি।

থম্‌কে গেল কন্‌কি। ভয়ে ভয়ে ব'ললে,—ডাক্তার বাবুর বউ!

—না। বনমালীর অস্বীকারে সুদৃঢ় আন্তরিকতা কঠোর হ'য়ে ফুটে উঠ্‌ল।

কন্‌কি নতমুখে।

—বল।

কন্‌কি নীরব।

বনমালী কন্‌কির একটা আঙুল উলটো দিকে চাপ দিতে লাগল ক্রমশ। কন্‌কি যন্ত্রণায় ছট্‌পট্‌ ক'রতে লাগল। বনমালী শুধু চাপা গলায় ব'ললো, বল—

—উহু হু—ছেড়ে দাও ওগো—উহু, চুরি ক'রেছি আমি।

—না! বনমালীর চোখ ধক্‌ ধক্‌ ক'রে জ্বলে উঠ্‌ল। তবু চাপ দিতে লাগ্‌ল সে।

—উহু হু—চুরি ক'রেছি, ছাড়ো-ওগো।

—না না—বনমালী আরও জানতে চাইলে, স্বীকারোক্তি চাইলে, চাইলে সমস্ত প্রাঞ্জল হ'য়ে যাক।

বনমালী বললে, তোর কাছে আরও দুটো টাকা আছে—দে।

ফুঁপোতে ফুঁপোতে কন্‌কি টাকা বের ক'রে দিলে। বাজিয়ে দেখ্‌ল—সে দুটোও অচল বটে। বনমালী ব'ললো, টাকা কোথায় ছিল!

—বিছানায়, বালিশের তলায়।

—না, ডাক্তার বাবু ব'ললো, টেবিলের উপরে ছিল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ-টেবিলের উপরে ছিল। কন্‌কি ফুঁপোতে লাগল।

বনমালী তারপর অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ল। ট্যাঁকে সেই অচল পাঁচটা টাকা ছিল। পুকুরের দিকে ছুঁড়ে দিলো সেগুলো—নিঃশব্দ অন্ধকারে টুব্‌ টুব্‌ ক'রে শব্দ হ'লো। তারপর এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াল। দুর্ভেদ্য যন্ত্রণাকাতর রহস্যের মধ্যে শুধু পাক খেতে লাগল।

কম্‌পাউণ্ডার ঘুমোচ্ছিল—বনমালীর ডাকাডাকিতে উঠে দরজা খুলে দিলে। ঘুম জড়িত কণ্ঠে

জিজ্ঞেস ক'রল, তুই এমন সময়ে যে রে! বৌ কি তাড়িয়ে দিলে বিছানা থেকে?

বনমালী শুধু ব'ললো, এইখানে শোব কম্পাউণ্ডার বাবু।

—কেন—হঠাৎ?

বনমালী নিরুত্তরে একটা বেঞ্চি আশ্রয় ক'রে শুয়ে পড়ল। কম্পাউণ্ডারও শুয়ে পড়ল নীরবে—বুঝল—দাম্পত্য কলহ।

বনমালী হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বাবু ঘুমালেন?

—না, কেন?

বনমালী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকবার পর ব'ললো, ভেবেছিলুম ডাক্তার বাবু ভালো লোক, গরীবের দুঃখ বোঝে কিন্তু সব মিথ্যে।

কমপাউণ্ডার চটে ব'ললে, বেইমান কিনা। অতবড় একটা ডাক্তার, পসার-পয়সা সব ছেড়ে গাঁয়ে এসে ব'সল দেশে ভালো ডাক্তার নেই ব'লে, পাঁচ জনের উপকার হ'বে ব'লে। তার নিন্দে করবি বই কি।

—আপনি জানেন না বাবু—

—খুব জানি। তোর বৌ ছেঁড়া কাপড় প'রে লজ্জা পায়—গরীব লোক তুই, কাপড় দিতে পারিস না। আজই তো স্বচক্ষে দেখলুম—ডাক্তারবাবু আমাদের কাপড় কিনে পাঠিয়ে দিলেন। তুই তার নিন্দে ক'রবি বৈকি।

বমমালী অধৈর্য্য হ'য়ে ব'ললো গরীবের দুঃখ ওরা বোঝে না বাবু—বরং বড়লোক ব'লে ওই দুঃখীদের ওপরে আরও চাপ দেয়। সে দয়া নয় বাবু, সর্ব্বনাশ।

—চুপ কর্ চুপ কর্। সব বেইমান তোরা।—

বনমালী চুপ ক'রল।

কিছুক্ষণ পরে কম্পাউণ্ডারের নাক ডাকার শব্দ শোনা গেল, ঘুমিয়ে পড়েছে সে। বনমালীর ঘুম তো দূরের কথা, শুয়ে থাকতেই তার অসহ্য হচ্ছিল। কিছুই তার ভাল লাগছিল না। জীবনের এই বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকে দিনের পর দিন বেঁচে থাকতে হবে, এই জ্বালা অসহায়ের মতো মনের মধ্যে পুষে দিন কাটাতে সে পারবে না। তার চেয়ে মরা ভালো—বিষ খেয়ে···সেই বিষ খেয়ে। ঠিক্। বনমালী এক মুহূর্ত্তের মধ্যে ঠিক ক'রে ফেল্‌লে সব।

আলমারীর চাবি কম্পাউণ্ডারের বালিশের কাছে পড়ে আছে। বনমালী পা টিপে টিপে গিয়ে চাবি নিয়ে এলো। একদিন যে আলমারীটাকে সে সব চেয়ে বেশী ভয় ক'রতো—তারই পাশে সে আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়াল। আলমারী খুল্‌ল সে—একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালালে। সেই বড় বোতল তার পাশে ওই শিশিটা—পোটাসিয়াম সায়ানাইড। হাত কাঁপচে তার। বিষের শিশিটা সে হাতে ক'রে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল।

সাংঘাতিক বিষ—নিজে খাবে, না কন্‌কিকে দেবে, না আদিত্য ডাক্তারকে দেবে—যে তার জীবনের সমস্ত আনন্দকে, সৌন্দর্য্যকে হত্যা ক'রেছে! বনমালী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল।

স্বপ্ন ও বিস্মৃতি

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

সন্ধ্যা-পরীরা এলোচুল করি' ঢাকিছে গোধুলি-বিভা,
চকিতে কখন ম্লান হ'য়ে আসে দিবা।
রক্ত-করবী মুখ তুলে' চায়
আজিকার আধো আলো ও ছায়ায়
প্রাণবহ্নির শিখা কাঁপে তার হারানো দিনের রাগে,
আমার বীণার তারগুলি আজো বর্ষা-বিলাপে জাগে;
মহুয়া-মদির দ্বাদশীর চাঁদ
জাগায় হৃদয়ে ঘুমান কি সাধ
ইসারা যে আছে ভাষা নাই যার এমনি সে সুমধুর,
পাতালকন্যা এখনো রহিল দূর!

দিবসের আয়ু ফুরায় এখন ;—চৈত্রসন্ধ্যা, নিশি
কুসুমগন্ধে মাতাল হয়েছে দিশি।
শূন্য-তিমির অতনুর তূণ,
বিবাদ ঘটালো ক্রৌঞ্চ-মিথুন
লাজুক যে মেয়ে কভু ধরা দেয়, কখনো সে দিশাহারা,
বসন্ত আসে ক্ষণিক তবু কি দ্রাক্ষা-সুধার পারা।
বেদনা-ভ্রমর তবু উতরোল
স্বপ্ন-সায়রে খালি খায় দোল
মিলে না কিছুই ঘনায় নয়নে উষ্ণ অশ্রুকণা,
বন-বিহঙ্গ ফিরে নীড় বাঁধিল না।

আমি ব'সে আছি, অদূরে মাতিছে পেঁচা ও বাদুড়দল,
কুন্তলময়ী সন্ধ্যা সমুজ্জ্বল ;
জ্যোৎস্না-মেয়েরা কুঞ্জ-বিতানে
ভিড় করিয়াছে মঞ্জীর তানে
দৃষ্টি-গভীর আঁখির আড়ালে কাঁপে মৃদু ভ্রূবিলাস,
সে আসি' কখন পুরাবে মনের অনঙ্গ-অভিলাষ?
ফুটিল পলাশ, কৃষ্ণ-গোলাপ,
কেহ বুঝিল না আমার বিলাপ,
সোনার হরিণ শৃঙ্গ বাঁকায়ে গেল যে সে কোন্ দিকে,
মনের বালুতে চরণচিহ্ন লিখে।

এই পৃথিবীতে কি থাকে এমন স্বপ্ন-বিষাদহীন?
জোয়ারের শেষে নদী-যৌবন-ক্ষীণ।
হাসি ও অশ্রু এই দিয়ে গড়া
বিশাল মাটির সুন্দর ধরা,
সুর-পরীদের নাচ থেমে গেলে আহত পাখীর মত
শুধু হাহাকার ব্যর্থ প্রাণের জ্যোৎস্না যে অপগত,—
রঙিন যে আলো রামধনুকের
মেঘে সে ঢাকিয়া ম্লান হবে ফের,
কিবা আসে যায় দীপ্তি না এলে বিদ্যুৎ-ব্রততীর,
তার চেয়ে ভালো অন্ধকারের ভিড়!

খোকন ভাই'এর কথা

শ্রী—

আজকে আমার খোকন ভাই তার মায়ের সঙ্গে তাদের দেশে চলে গেছে। আসবার পর মাত্র তিনটি মাস তার মায়ের কোলে কেটেছিল, তারপর থেকেই, অর্থাৎ টিক্‌টিকির চেহারা ঘুচে গিয়ে মানুষের,—মানে আলুর পুতুলের, আদল আসবার সময় থেকেই,—সে আমার কোলে এসে আমার বন্ধুরূপে গণ্য হয়েছিল কিন্তু কোল বলতেই যে একটা বাৎসল্যরসের আধার বোঝায়, সেটা অন্ততঃ এক্ষেত্রে বললে ভুল হবে,—কেননা, খোকন জানত এবং আমিও জানতাম, যে কোলটা খোকনের উপযোগী একটা রাজকীয় আরামকেদারা বই আর কিছুই নয়। ওটার সঙ্গে বাৎসল্যরসের সম্পর্ক তেমন কিছু নেই, খোকনের সুবিধা অসুবিধার অনুভূতি ছাড়া। বস্তুতঃ, খোকনকে আরাম ও বিশ্রাম দেওয়ার কাজেই ওটার ব্যবহার। আসলে খোকন আর আমি দুটি অসমবয়সী বন্ধুই ছিলাম, নিতান্তই সহৃদয় বন্ধুতাই জমে উঠেছিল আমাদের দুজনের মধ্যে। আমার তো স্পষ্ট মনে পড়ে, আমাকে দেখবামাত্র চারমাসের কবি খোকনের চোখমুখ কেমন আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠতো, মুখে অব্যক্ত অস্ফুট ধ্বনি করে চোখমুখের ভঙ্গিমায় সে জানিয়ে দিত, আমার আসাতে সে কত খুসি হয়েছে। খোকনকে কোলে করে তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে আমি যখন অনর্গল ছড়া আবৃত্তি ক'রে যেতাম, অপরিসীম আনন্দোল্লাসে সে আমার হাসিভরা মুখের আবেদনটুকু সমস্তই আত্মসাৎ করে নিত। খোকন আমার আওড়ানো ছড়াগুলো যেন গিলত, আমি একটু চুপ করলেই সে চঞ্চল হয়ে আবার আমাকে ছড়া বল্‌তে ইঙ্গিত করত। বাক্যহীনের সে সব সঙ্কেত আমারও কেমন সহজ অনুভূতিবশতঃই চেনা হয়ে গিয়েছিল। ও কি বলতে চায়, তা' আমি বুঝ্‌তে পারতাম এবং ওকে খুসি করবার জন্যে বারে বারে সেই একই ছড়ার পুনরাবৃত্তি করতাম হাসতে হাসতে,—লক্ষ্য করতাম, এক একবার যেন ওরও ঠোঁট দুটি নড়ছে। আমার মুখের দিকে এক রকম অপলক দৃষ্টিতেই চেয়ে রয়েছে খোকন, যেন আমার মুখের প্রত্যেকটি ভাবভঙ্গী ওর ছোট্ট মনের মাঝে স্মৃতির পটে এঁকে নিতে চায়। আমি ওকে আর কারো কোলে দিয়ে উঠে গেলেই ও আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে কাঁদ্‌ত। যেন আমাকে কিছুতেই ছেড়ে দিতে চায় না। তারপর সাত আট মাসে ওর রীতিমত বুদ্ধি হয়েছে। টাইম মত খেতে না পেলেই তারস্বরে কাঁদা শিশুদের স্বভাব। খোকন কিন্তু আগেই কাঁদ্‌ত না। সে ঘুম থেকে উঠেই "এই" "এই" করে ডাকতো তার ধাত্রীকে। যেদিকে তার ধাত্রী তার পরিত্যক্ত কাঁথা কাপড় গুলি ধুয়ে শুকোতে দিতে যাচ্ছে, সেই দিকে তাকিয়ে সে ডাকতো "এই, এই, এ—ই"। তখন তো আর কিছু বলতে শেখে নি। ধাত্রীর খাবার নিয়ে আসতে দেরি হ'লে প্রথমতঃ খুব চেঁচিয়ে রাজকীয় কায়দায় ডাকত "এ—ই"। তথাপি সময়মত খাবার এসে না পৌঁছলে তবেই সে তারস্বরে কান্না জুড়ে দিত। সহজে নয়।

যেদিন খোকন নাচতে শিখ্‌লো,—প্রকৃতি দেবী তার পেলব পা দু'খানিকে কঠিন ধরার বুকে দাঁড়িয়ে থাকবার মত শক্ত করে তুললেন কঠোর নিষ্ঠুর ব্রতাভ্যাসের মধ্য দিয়ে নয়, সুন্দর মধুর নৃত্যকলার ছন্দের ভিতর দিয়ে। খোকন আমার ছড়ার ছন্দে ছন্দে নাচের তাল মিলিয়ে দিয়ে নাচতো, একটুও ছন্দোভঙ্গ হ'তে দিত না। যদি কোনোদিন ঘুমপাড়ানি গানের সঙ্গে নাচের গান মিশিয়ে ফেলতাম, খোকন তখনি প্রবল প্রতিবাদে সতর্ক করে দিত আমাকে। গানের তালে তালে হাঁটু দুলিয়ে ঘুম পাড়াতাম যখন, সুরের এতটুকু ত্রুটি বিচ্যুতি সইতে পারতো না সে,—গাইতে গাইতে হঠাৎ থেমে গেলে অমনি চোখ মেলে তাকিয়ে প্রবলভাবে প্রতিবাদ করত অস্ফুট গুঞ্জন-র্ভৎসনায়। আবার নাচের গান শুনে নাচতে, আর দোলার গান শুনে দুলতে কখনও ভুল হোতোনা তার। সে জানত কাকে বলে "নাচ" আর কাকে বলে "দোলা"।

এই রকম করে দিনে দিনে খোকন নাচের পালা আর

দোলার পালার সঙ্গে সঙ্গে উপুড় হওয়া, উঠে বসা, হামা দেওয়া, দাঁড়ানোর পালা শেষ ক'রে এখন এক পা দু'পা হাঁটতে শিখেছে। ঐসঙ্গে কথা বুঝতে এবং দুটি একটি করে কথা বলতে ও সুরু করেছে। কেউ কাঁদলে কেমন করে তাকে আদর করতে হয়, আবার কেউ দুষ্টুমি করলে কেমন করে তাকে তর্জ্জনী তুলে "ঠিক্ করে" দিতে হয়, তা' ও শিখেছে। সে যে এ বাড়ির কর্ত্তা,—সকলকে শাসন করা আর আদর করা তো তারই কাজ।

*　　*　　*　　*

একদিন খোকনকে নিয়ে লেকের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম, জলাশয়ের সম্বন্ধে ওর ধারণা জন্মাবার জন্যে। তখন বেলা প্রায় এগারোটা। টালিগঞ্জের কাছাকাছি লেকের ধারে একখানা পাথরের উপর আমি বসে। লেকের জল সূর্য্যকরে ঝিক্‌মিক্ ক'রে কাঁচের মত জ্বলছে। অদূরে একটি বেণুকুঞ্জ, সেখানে চড়াই শালিখের মেলা। খোকনের কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি নেই। আমি কত করে ওকে বুঝিয়ে বলছিলাম, "খোকন দেখ, লেক্—জল!" ও সেদিকে লক্ষ্যই করছে না। কেবল এদিক ওদিক চেয়ে কা'কে যেন খুঁজছে। হঠাৎ দেখা গেল বালিগঞ্জ ষ্টেশনের দিক থেকে রেলগাড়ী আসছে পুলের উপর দিয়ে। খোকন এর আগে আর কখনো রেলগাড়ী দেখেনি। এইবারে প্রথম রেলগাড়ী দেখেই নাচতে সুরু করলো। আমরা বললাম, "রেলগাড়ী" ওর মুখে এলো না, ও বললো "টিক গায়ী, টিক গায়ী," আর আহ্লাদে নাচতে লাগলো। খানিক পরে রেলগাড়ী চলে গেল যখন, ও ঘাড় ফিরিয়ে দেখে গাড়ী খানা ক্রমেই চলে যাচ্ছে ওর দৃষ্টির সীমানা থেকে দূরে।

তখন আনন্দ বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে খোকন দুই চোখ ভরে রেলগাড়ীকে দেখতে লাগ্‌লো, বাঁকের মুখে ঘাড় ফিরিয়ে আবার চেয়ে দেখলো, যখন আর দেখা যায় না, তখন কচি কচি পা'দুখানি দিয়ে আমাকে ঠেলতে ঠেলতে বলে, "চল্ চল্, টিক্ গারী টিক্ গারী" এইরূপে প্রথম দর্শনেই সে রেলগাড়ীকে যতটা ভালবেসে ফেলেছিল, বোধ হয় ততখানি ভালবাসে নি আমাকেও। আমার তাই আশ্চর্য্য লাগে। ওতো রোজ রোজই ট্রামগাড়ী দেখে, মোটরে চড়ে বেড়ায়, কই, এতখানি উচ্ছ্বাস তো দেখিনি। যা'ই হোক, একদিন সকালবেলা ওর মনের সাধটা পূর্ণ করে দেবার জন্যে ওকে নিয়ে গেলাম বালিগঞ্জ ষ্টেশনের ওভার ব্রীজের উপর। দুই চোখ ভরে ঐকান্তিক মমতা ও ঔৎসুক্য নিয়ে ও দেখ্‌তে লাগলো, শিয়ালদহের দিক থেকে এবং ডায়মণ্ড হারবারের দিক থেকে কত রেলগাড়ী যাতায়াত করছে। এক একবার এঞ্জিন সজোরে শিস দেয়, ওর সর্ব্বশরীর কেঁপে ওঠে, চম্‌কে উঠে হাত দিয়ে আমাকে আঁকড়ে ধরে, আমার মুখের দিকে চায়, তক্ষুনি ফিক্ করে ফেলে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, "ও"। খোকনের মনোভাব ব্যক্ত করবার এই একটি মাত্র শব্দ আছে, "ও", তার উচ্চারণের ধরণ ধারণ আর হাত মুখের ভাব ভঙ্গিমা দেখে আমরা বাকিটা আন্দাজ করে নিই।

গেলাম একটা সদ্য উপনীত এঞ্জিনের সাম্‌নে। ও অত্যন্ত তৃপ্তিসহকারে সেই এঞ্জিনের রূপ যেন চোখ দিয়ে গিলতে লাগল। বললাম, "হ্যাঁরে, রেলগাড়ীতে চড়বি?" খোকন বলল "ও"।

*　　*　　*　　*

আজকে খোকন সেই চির আকাঙ্ক্ষিত রেলগাড়ীতে প্রথম চড়তে পেয়েছে। আমিই কোলে করে তুলে দিয়েছি রেলগাড়ীতে। প্রথম প্রথম ভেবেছিল হয়ত, না জানি রেলগাড়ীর ভিতরটা কি আশ্চর্য্য চমৎকারই হবে। কিন্তু ভাব দেখে মনে হোলো, যেন হতাশ হয়েছে। একখানা ইণ্টার ক্লাসের কামরা, খোকন, খোকনের মা, ঠাকুরমা, পিসিমা, জ্যাঠাইমা, জ্যাঠতুত বোন দুটি, তা'ছাড়া আরো অনেক মহিলা যাত্রী আছেন। এর পর হয়ত ভিড় আরো বেড়ে যাবে। খোকন খানিকক্ষণ এর কোল থেকে তার কোলে বেড়িয়ে, এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে দেখে অস্বস্তি প্রকাশ করতে লাগ্‌লো। ওকে নিয়ে প্ল্যাটফরমে নেমে পায়চারি করলাম, ওকে আরো অনেকের কোলে দিতে গেলাম, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আবার আমার কোলে এলো ফিরে, যেন আমাকে ছেড়ে থাকতে ওর ইচ্ছে নেই। ফেরিওয়ালা এলো, একটা রবারের বল কিনে দিলেন ওর কাকা। একখানা খস্‌খসের পাখা দিলাম আমি। তারপর আবার মায়ের কাছে ফিরে গিয়ে খেলা করতে লাগলো। এখন ওর খাবার সময় হয়েছে। পার্শ্ববর্ত্তিনী সহযাত্রিনীর ফারকোট্‌খানাকে বালিশ করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েছে খোকন, মুখে দুধের বোতল। দুধ চুষে খেতে খেতে সে

এক একবার ডান পা'টি তুলে মায়ের নাসিকায় ঠেকিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করছে। মায়ের মুখে মৃদু হাসি। প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে খোকনের বাবা, তিনি জানালার ধারে এসে ছেলের কীর্ত্তি দেখে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলেন। খোকন পা বাড়ালো বাবার মুখের দিকে লক্ষ্য করে। বাবা ওর পায়ের তলায় একটি টোকা মারলেন। তখন পা ফিরে এলো মায়ের নাসিকার উপর লীলায়িত ভাবে। দুধ খাওয়া হোলো, খোকন উঠে পড়ে ট্রেনের কামরায় কা'র কি জিনিষপত্র আছে, পর্য্যবেক্ষণে লেগে গেল। সহযাত্রিনীর হাতের তালবৃন্তখানিই পছন্দ হোলো বোধ হয়। বিনা বাক্যব্যয়ে সেটি কেড়ে নিয়ে আমার কাছে এসে খোকন ব'লল "কাথা"। আবার আমি হয়ত বুঝতে পারিনি—ভেবে বুঝিয়ে বলল, "হাবা।" আমি ব্যস্ত হয়ে যাঁর জিনিষ, তাঁকে ফিরিয়ে দিতে যেতেই তিনি হেসে বললেন, 'থাক্ না, ও খেলা করুক, খোকন এসো তো, এসো তো আমার কোলে।" খোকন যায় না। জোর করে কোলে তুলে বসাতেই খোকন অত্যন্ত আপত্তি জানিয়ে হাত পা ছুঁড়ে কোল থেকে নেমে পড়লো। ট্রেনের ঘণ্টা পড়্‌ল আমি নেমে এলাম ট্রেন থেকে। দেখ্‌ছি, আমার কোলে আসতে না পেরে খোকন ভীষণ কান্না জুড়ে দিয়েছে। পাশের কামরায় পুরুষ অভিভাবকরা ছিলেন, দুই কামরার মাঝে ছিল দরজা। সুরেশ এসে খোকনকে ওদের কামরায় গেল নিয়ে। ছেলের কান্না আর থামে না। একে ভিড়, তাতে গরম, তার উপর পাচ্ছে না আমার কোলে আসতে, ওর কান্না থামে না কিছুতেই। সুরেশের কোলে হাত পা ছুঁড়তে দেখা গেল। আমি এগিয়ে যাচ্ছি ওর জানালার দিকে, আমাকে সরিয়ে দিয়ে ওর বাবা বললেন, "করেন কি, করেন কি, এখনি যে গাড়ী ছেড়ে দেবে। আপনি সরে আসুন এদিকে, ও আপনাকে দেখ্‌লেই আরো বেশি করে কাঁদবে।" আমার চোখে জল। চোখ মুছতে মুছতে সরে এলাম। বংশীধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ী ছেড়ে দিল। চললো রেলগাড়ী আসামের দিকে,—ভারতের এক শ্রেষ্ঠ রমণীয়দর্শন পার্ব্বত্য পথের উদ্দেশে, যে পথের দু'ধারে কত অরণ্য,—পর্ব্বত নদ নদীর মেলা, এতক্ষণে খোকন হয়ত কান্না থামিয়ে তার অননুভূত-পূর্ব্ব অভিজ্ঞতায় বিস্মিত চকিত আনন্দিত হয়ে উঠেছে, জানালার দিকে তাকিয়ে নিত্য নূতন জগৎ দেখতে দেখতে তার পুরোনো খেলার সাথীর কথাটা ভুলেই গেছে। মাঠে, বক্ দাঁড়িয়ে আছে, হয়ত সে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ডাক্‌ছে, 'আয় পাখী আয় আয়, হোনা ভাইকে নিয়ে যা।' এতক্ষণে তার শিশুমন নূতনতর বিস্ময়ে পুলকিত হয়ে হয়ত আসন্ন সন্ধ্যার আবাহন করছে,

"ছাজ্জি মামা ডুবে গ্যাও।
তান্ মামা উটে এও॥"



রতি-বিলাপ

শ্রী বিমলকান্তি সমাদ্দার

বিহ্বলা রতিবিকীর্ণ-কুন্তলা
ধূসরস্তনী বসুধা-আলিঙ্গনে,
বিলাপ করিতে লাগিল পুনর্বার
বনভূমি হ'ল ব্যথিত তাহার সনে।

অপরূপ দেহ সুপুরুষবাঞ্ছিত
নয়নে নেহারি এই তা'র পরিণতি,—
মরমে আজিকে জানিলাম নিশ্চিত,
রমণীজাতির হিয়া সুকঠিন অতি।

বিদীর্ণ-সেতু জলাশয় হ'তে যথা
নলিনীরে ত্যজি' বাহিরায় বারিরাশি
মধু-প্রণয়ের ক্ষণিকোৎসব-শেষে
অধীনারে ছাড়ি' কোথা হ'লে পরবাসী ?

জীবনে আমার করো নাই অপ্রিয়,
প্রতিকূল তব আমিও ভাবি নি কভু ;
দেখো নাকি চেয়ে কাঁদিছে তোমার রতি
কেন অকারণে দেখা নাহি দাও তবু।

আজ মনে ভাবি সকল-ই মিথ্যা বুঝি
বলিতে যে 'মোর হৃদয়ে তোমার স্থিতি,'
প্রিয় তুমি হলে শরীর-বিহীন যদি
কেমনে এখনো বাঁচিয়া রয়েছে রতি !

নবীন পান্থ তুমি পরলোকপথে
তব পথ-রেখা ধরিয়া চলিব আমি,—
শুধু দুখ এই নিখিল প্রেমিক সবে
তোমার বিরহে বঞ্চিত হবে স্বামী।

রজনী তিমিরে অবগুণ্ঠনবতী
মূর্চ্ছিত পথ মেঘগর্জ্জনগ্রাসে,
অভিসারিকারে তুমি ছাড়া বল প্রিয়
কে মিলাতে পারে তার প্রিয়তমপাশে।

স্খলিতকণ্ঠ আলস-অরুণ আঁখি
নব বিলাসিনী উন্মদ মধুপানে
সকলই তাদের বিফল হবে যে প্রিয়,
মদনোৎসবে তুমি অবর্ত্তমানে।

রঞ্জিত চারু অরুণ-হরিত রাগে
সূচিত-জন্ম কোকিলের কলতানে
বল মোরে প্রিয়, নবচূতমঞ্জরী
শায়ক হইবে কা'র শরসন্ধানে।

পরাইতে গুণ ভ্রমরপংক্তি দিয়া।
তোমার মোহন পুষ্প-ধনুর সনে
তোমার বিরহে আমার বিলাপে তা'রা
ঢালিতেছে সুর সকরুণ গুঞ্জনে।

ওঠ একবার—একবার ওঠ প্রিয়,
হৃদয়-হরণ দেবনিন্দিত-বেশ,
স্বভাবনিপুণ প্রেমালাপে কোকিলারে
রতির দৌত্যে পুনঃ দাও উপদেশ।

চাহিতে ভিক্ষা অবনত মস্তকে
থর-কম্পন সোহাগ-আলিঙ্গন
সে মধু-বিজন-প্রণয়-ললিতলীলা
স্মরিয়া আজিকে শান্তি না মানে মন।

নব বসন্ত-কুসুম-অলঙ্কারে
নিজ হাতে তুমি সাজালে অঙ্গময়,
সেই আভরণ এখনো বিরাজে দেহে,
তুমি কোথা প্রিয়, তুমি কোথা প্রিয়তম !

প্রিয়তম, আমি যদি-ও তোমার সনে
পরলোক-পথে হইব তোমার সাথী,
মদনবিহনে ক্ষণমাত্র-ও রতি
বেঁচে ছিল এই রয়ে গেল অখ্যাতি।

হে কুসুমশর, ক্রোড়ে রাখি' শরাসন
তোমার সলীল চাহনি আমার পানে
বসন্ত সনে চারু সস্মিত কথা,
মনে পড়ে আর ধৈর্য্য হারাই প্রাণে।

কোথা মধু তব অন্তরতম সখা?
কুসুম-শরের কুসুম-রচক জানি'
বন্ধুর পথে তারেও পাঠালো নাকি
উদ্যতরোষ কঠোর পিণাকপাণি?

কহে সরোদনে বসন্তপানে রতি,—
সখার তোমার কিছু আর রহিল না,
ওই দেখ চেয়ে মাধব, পবন ভরে
কপোত-পাংশু উড়িছে ভস্মকণা।

বন্ধু তোমার ফিরিবে না আর কভু
অনিলনিহত প্রদীপ শিখার মত
সে দীপশিখার বিরহ-ধূমের মাঝে
মোরে দেখ চেয়ে অর্ধ-চেতনাহত।

ঋতুরাজ, এই মিনতি তোমার প্রতি
স্মরসখা, এই বান্ধব-ব্রত ধরো,
বহ্নি-প্রদানে বল্লভ-বিয়োগিনী,
প্রিয়তমপাশে আমারে প্রেরণ করো।

শশধর সনে কৌমুদী মোদে আঁখি
জলধর পথে সৌদামিনীর গতি
অচেতন যারা তাদেরো মাঝারে হেরো
রমণীর পথ যে পথে গিয়েছে পতি॥

মৃদু-কিসলয়-রচিত শয়ন সম
লেলিহান শিখা অগ্নি শয়ন পরে,
প্রিয় কলেবর-ভস্ম-ধূসর-তনু
শয়ন করিব হরষিত অন্তরে।

কুসুম-শয়ন-রচনে সৌম্য তুমি
সহায়ক ছিলে, কুসুমশরের মিতা
প্রণতি করিয়া করপুট জুড়ে কহি
শেষের শয়ন রচি' দাও মোর চিতা।

মম চিতানল বীজন করার লাগি'
আবাহন ক'রো দক্ষিণ পবনেরে,
হে মাধব তুমি জানো ত যে সখা তব
রহিতে নারিত কখনো আমারে ছেড়ে।

তারপরে তুমি আমাদের উদ্দেশে
এক অঞ্জলি সলিল করিও দান,
পরলোকে বসি' মোর সাথে একযোগে
বন্ধু তোমার হরষে করিবে পান।

সখা ছিল তব আম্রমুকুলপ্রিয়,
বসন্ত তুমি তা'রে উদ্দেশ করি'
পরলোকপথে পাথেয় তাহারে দিয়ো
পল্লবশোভিসহকারমঞ্জরী।



শরৎ-পরিচয়

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রেঙ্গুনে, শরৎচন্দ্র ব'লতেন, স্পেন্সারের সমাজ-বিজ্ঞান তিনি একান্ত ধৈর্য্য সহকারে পাঠ ক'রেছিলেন। তাঁর পঠিত পুস্তকগুলি দেখলেও বুঝতে পারা যায় যে, সেই কথায় একটুও অতিরঞ্জন কি, অত্যুক্তি ছিল না। একটা কঠিন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হ'তে গেলে যে যত্ন, কষ্ট এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয়—তার কিছু মাত্র ত্রুটি হয়নি ব'লে অনায়াসে বিশ্বাস করা চলে। সেই বই গুলির পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে তার বহু নিদর্শন আছে।

কিন্তু সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের পুঁথিগত বিদ্যাই পুঁজি, কি মূল-ধন ছিল না। তার বহু পূর্ব্বেই তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় অনেক তথ্য আয়ত্ত ক'রেছিলেন। পরে এই অধীত বিদ্যা সেগুলিকে সুবিন্যস্ত ক'রে তোলায় সহায়তা ক'রেছিল। তাঁর লিখিত বহু পুস্তকে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সমাজের গভীর জ্ঞানের পরিচয় আছে। সেগুলি তাঁর স্বোপার্জ্জিত।

ভাগলপুর ব'লতেই মনে হয়, সেতো,—বেহার। সেখানে বাঙালী সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত হওয়ার সুযোগ এবং অবসর কোথায়? তাই, দেবানন্দপুরের কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক এবং সে রকম কথাও শুন্‌তে পাওয়া যায়! কিন্তু শরৎচন্দ্রের যৌবনে ভাগলপুরের প্রবাসী বাঙালী সমাজের বয়স সত্তর আশী অতিক্রম ক'রেছে। আরম্ভের সৌহার্দ্য কেটে গিয়ে সেখানে তখন জ্ঞাতিত্ব বোধের কলহ-সংগ্রাম পরিপূর্ণ রূপে প্রকটিত। পরস্পরের ঈর্ষা-বিদ্বেষ, সদর্পে মূর্ত্তিমান!

শরৎচন্দ্র দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মত গোঁড়া রক্ষণশীল পরিবারের মধ্যে মানুষ হ'য়েও প্রগতি-পন্থী ছিলেন। অতএব ব্যক্তিগত ভাবে ঘরে বাইরে তাঁকে অনেক লাঞ্ছনা-বিড়ম্বনা সহ্য ক'রতে হ'য়েছিল। সেই লাঞ্ছনা বিড়ম্বনার আশু প্রতিশোধের আকার ধারণ ক'রে যে চিন্তা তাঁকে ক্ষুব্ধ ক'রত, তার বহু উপলব্ধি তাঁর যৌবনের বইগুলিতে নিবদ্ধ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। "পল্লী-সমাজ" ক্ষুব্ধ যুবকের উষ্ণ নিশ্বাসের উষ্মায় অনেক স্থলে উত্তপ্ত; কিন্তু বয়সের স্থির বুদ্ধিতে 'বিপ্রদাসের' মধ্যে সেই সমাজেরই একটি সুসংযত উপলব্ধির চিত্র আছে। এক বয়সে, বিশ্বাসকে অন্ধ ব'লে মনে হয়,—আবার আর একটা বয়স আসে, যখন মনে হয় সেই বিশ্বাসই মানুষকে সিদ্ধির পথে উত্তীর্ণ করে! পল্লী-সমাজের মধ্যে লেখকের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের করুণ বেদনার কাহিনীর সঙ্গে একটি করুণ প্রেমের কাহিনী এমন নিগূঢ় ভাবে সম্বদ্ধ যে পাঠকের মনে শান্তির চেয়ে অশান্তির অস্বস্তি ব্যাথা দিতে থাকে! বিপ্রদাসের মধ্যে জীবনকে দেখার ভঙ্গীটি সুগম্ভীর এবং অনবদ্য। সেখানে না পাওয়ার মধ্যে ত্যাগের এমন একটি মহোজ্জ্বল ছবি আছে যাতে লালসা বিবর্জ্জিত নিরাকাঙ্ক্ষা জীবনের দুইকূলকে ভাদ্রের গঙ্গার মতোই পূর্ণ এবং আত্মোপলব্ধিতে নিষ্কম্প গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ ক'রে রেখেছে!

যে শিল্পীর তুলিতে জীবনের এই দুটি ছবি এমন নিখুঁত ভাবে ফুটে উঠেছে তার জীবন কোন

পথে এমন বিচিত্র পরিণতি লাভ ক'রলে তা' জানার কৌতূহল না থাকার মত দুর্ভাগ্য বোধ করি, মানুষের জীবনে আর দুটো নেই!

যৌবনের শরৎচন্দ্র যেন একটা ফুটন্ত কেৎলির মতোই ছিলেন। পরিণত বয়সে—সেই অধীর উত্তাপ আত্ম-সম্বৃত হ'য়ে লীন হ'য়ে গিয়েছিল তাঁর বিরাট আত্মোপলব্ধির মধ্যে! এই যে রূপান্তর, এটি কেমন ক'রে কোথা দিয়ে আসে—তা' চিরদিনই মানুষের অনুসন্ধান এবং অনুধ্যানের বিষয়। তাই শরৎ-পরিচয়ে শরৎচন্দ্রের যৌবনের জীবনের অভিব্যক্তি অকিঞ্চিৎকর এবং কোন দিক দিয়ে অবান্তর নয়-ই, নয়।

সেকালের ভাগলপুরের বাঙালী সমাজের ইতিহাস-তথ্য সংগ্রহ ক'রতে গিয়ে একটি মানুষকে অনেক দিক দিয়ে ধ'রতে পারা যায়। তিনি স্বনামধন্য রাজা শিবচন্দ্র। দরিদ্রের কুটিরে জন্মগ্রহণ ক'রে নিজের তীক্ষ্ণ তীব্র আকাঙ্ক্ষায় তিনি যেন, বীজের কণিকা থেকে যেমন বনস্পতি, বট বেড়ে উঠে আকাশ আড়াল ক'রে দেয়, তেমনই দিয়েছিলেন ভাগলপুরের সমাজকে আচ্ছন্ন ক'রে।

শিবচন্দ্রের অভ্যুদয়ের আগে ভাগলপুরের সমাজ কেদারবাহিনী নদীর মত ধীর, মন্থর গতিতে ব'য়ে চ'লেছিল। এই ক্ষণজন্মা পুরুষ সেখানে একটা ঘোর বিবর্ত্তন এনেছিলেন। ভাগলপুরকে তিনি সর্বান্তঃকরণে ভালোবাস্‌তেন। তার কল্যাণে যেখানে বাধা আস্‌তো সেখানে শিবচন্দ্র ব্রহ্মপুত্রের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে সেই বাধাকে খণ্ড বিখণ্ড, চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে দিতে কোন দ্বিধা বোধ ক'র্‌তেন না।

শেষ বয়সে রাজা—অন্ধ এবং বধির হ'য়ে গিয়েছিলেন। একখানি আরাম কেদারার উপর চিৎ হ'য়ে শুয়ে সমস্ত দিন তিনি অধীরভাবে চিন্তা ক'রতেন। যখন সেই চিন্তা তাঁর চিত্তকে মথিত করতো—তখন তিনি সিংহের মতো হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌তেন।

একদিনের একটা ঘটনা বলি :—গৃহ শিক্ষককে ডেকে রাজা বল্‌লেন :—ওহে—মাষ্টার,—ম্যানেজারের কাছ থেকে আমার নামছাপা চিঠির কাগজ আর খাম নিয়ে এসো।

মাষ্টার বেচারি বুঝেচে যে, তাকে তখন অনেকগুলি চিঠি লিখ্‌তে হবে। দশটা বাজে—স্কুলের সময় আসন্ন রাজার হাতের তেলোতে সে লিখ্‌লে : ১০।

অন্ধ এবং বধির, অতএব রাজার সঙ্গে কথোপকথনের এই একমাত্র উপায়। রাজা কথা কইতে পারতেন। তিনি ব'ল্‌লেন ; দশটা! তোমার ইস্কুল বসে কটায় হে?

১১।

তাইতো! আচ্ছা আজ কি বার?

শনিবার।

ব্যস্‌—ঠিক হ'য়েছে—তোমার ছুটি ছুটোয় তো?

২½টে!

কেন?

অফিসের কাজ।

বেশ ঠিক তিনটের সময় এসে তুমি আমাকে খান কয়েক চিঠি লিখে দেবে। শোন, এখানে তোমার জন্যে চা আর জলখাবার তৈরী থাকবে। বুঝেচ?—আমি যদি ঘুমিয়ে থাকি—তুল্‌বে,—কোন

ক্ষতি হবে না।

তিনটার সময় সবচেয়ে জরুরী চিঠি লেখা হ'ল জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সায়েবকে,—মাই ডিয়ার মিষ্টার অমুক,

হয়তো জানেন যে, আমি দৈহিক অক্ষমতা নিবন্ধন কারুর সঙ্গে দেখা ক'রতে পারিনে। জেলার কর্ত্তা হিসেবে আমারই যাওয়া উচিত ছিল। এই ত্রুটি মার্জ্জনা ক'রে যদি একবার আসেন তো বিশেষ আনন্দিত হ'ব। কয়েকটা ভারি দরকারি কথা আছে বলবার ইত্যাদি।

চিঠি পেয়ে সায়েব এসে উপস্থিত। বেচারি মাষ্টার, সায়েবের কথাগুলি রাজার হাতে লিখে দিতে লাগ্‌লো।

রাজা বল্‌লেন ঃ ভাগলপুর আমার বড় প্রিয় স্থান। আমি চোখে আলো দেখ্‌তে পাইনে; কিন্তু আমার হ'য়ে যদি ভাগলপুরের লোকে ঘরে ঘরে বিজলি-আলো দেখ্‌তে পায় তো—চিরকৃতজ্ঞ হ'ব। এই আমার জীবনের শেষ ইচ্ছে।

সাহেব প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন।

রাজা জীবিত থাক্‌তে আলো হয়নি; কিন্তু তাঁর অমর আত্মা—একদিন ভাগলপুর সহরে বিদ্যুতের আলো দেখে নিশ্চয়ই প্রসন্নতা লাভ ক'রেছিলেন।

যিনি অন্ধ এবং বধির তাঁর সঙ্গে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত যোগ ছিন্ন হ'য়ে যাবার কথা; কিন্তু রাজার তা একেবারে হয়নি। ম্যানেজার এবং মাষ্টার বেচারির সহকারিতায়—তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের খবর জোগাড় ক'রে সমস্ত দিন তার আলোচনা ক'রে দিন কাটাতেন।

সকালে নীচে নেবে এসে প্রথম কাজ ছেলেদের পড়ার ঘরে ঢোকা। একটি একটি ক'রে তাদের ডেকে নিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে, আদর। তারপর হাতখানা এগিয়ে দিয়ে গুড্‌-মর্ণিং মাষ্টার। মাষ্টারের বাড়ীর খবর, পাড়ার খবর, তার ইস্কুলের খবর। চ'লে যাবার সময় :

মাষ্টার কটা বেজেচে ?

আট-টা।

কখন এসেছো ?

সাড়ে ছটা।

আর কতক্ষণ ?

ঘণ্টা খানেক।

একবার এসো—আধ ঘণ্টা—আই শ্যাল থ্যাঙ্ক ইয়ু ভেরী মচ্‌ !

ব্রাহ্ম-সমাজের বাড়ী মেরামত হবে। চাঁদার খাতা বেরিয়েছে। সেই খবর পেয়ে রাজা উৎসাহ ভরে চেয়ারে উঠে ব'সে ম্যানেজারকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ম্যানেজারের আস্‌তে দেরি হচ্ছে—অধৈর্য্যের আর অবধি নেই !

ম্যানেজার লিখে দাও যে, যে মানুষটা সমাজের বাড়ী তৈরি করার সব খরচ একদিন দিতে পেরেছিল সে অনায়াসে—বেঁচে থাকা পর্য্যন্ত, মেরামতের ব্যয় নির্বাহ ক'রতে পারে। খরচের এষ্টিমেট চেয়ে পাঠাও।

শীত প'ড়েছে অত্যধিক।—ধনকুবের দেবীপ্রসাদ চন্‌চনিয়া দেখা ক'রতে এসেছেন। দেবীবাবুর শালের খুঁট টেনে ধ'রে: দেবি তোমার মুরুব্বি, ভুদড় আমার বন্ধু ছিল, জানো ?

জানি, রাজা সায়েব।

তোমার এই শালখানার দাম কত ?

জানিনে।

শয়তান ! মাড়ওয়াড়ির সন্তান,—তোমাদের পাই পয়সার হিসেব আছে। এক হাজার ?

বেশী।

শোন,—ভারী শীত,—অনাথ-আশ্রম, কুষ্ঠাশ্রমের—ছেলে-মেয়েদের—ব্যবস্থা কি কিছু ক'রেছ ?

না !

রাজা স্তব্ধ হ'য়ে হুঙ্কার ছাড়তে লাগ্‌লেন। সে হুঙ্কার নয়, হাহাকার—কান্নাকে নিরোধ করার বুক ফাটা গর্জন !

দোকানে কম্বল আছে ?

আছে।

দাম ?

ঠিক জানিনে।

দু'টাকায় হবে, এক, এক খানা ?

তা' হবে।

আমার বাড়ী দুশো কম্বল পাঠিয়ে দেবে ?

না।

কেন ?

আশ্রমে দিতে হবে।

চেয়েছে তারা ?

না।

পাঠিয়ে দেব—বিল্ আপনাকে পাঠাব।

ভয় দেখাচ্চ ? রাজা শিবচন্দর আজও কারুকে ভয় করেনি !—এই লাল্‌জি ! এই ডোমা !—কো হায় !—ম্যানেজার বাবুকো বোলাও।

ম্যানেজার,—ওহে হেম !—একবার দেবীর সঙ্গে গিয়ে কম্বল পছন্দ ক'রে—অনাথ আর কুষ্ঠাশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিও। দেবী বাবু বিল দিলে—

দেবী বাবু—মাথা নেড়ে জানিয়ে দেয়—ম্যানেজারকে,—বিল দিতে হবে না।

দিন ক'য়েকের মধ্যে—পাদরি সায়েবের চিঠি এলো। মেনি থ্যাঙ্কস্ !

রাজার শেষদিন গুলো এমনি ক'রেই কেটেছিল।

প্রবাসী বাঙালী সমাজের কেদারবাহিনীর শান্তধারা এই পর্বতের পাদমূলে এসে বহু তর্জন গর্জন ক'রে—মহাপারাবারে মিশে গেছে। সেদিনের বিরোধের খুঁটিনাটি শরৎচন্দ্রের মনে যে দাগ দিয়ে

গিয়েছিল—তারই রস, তারই সাহিত্যামৃতের সন্ধান শরৎ-সাহিত্যে আছে! ভাগলপুর কি দেবানন্দপুরের তর্ক অকিঞ্চিৎকর।

ইং ১৮৯৬ সালের শেষের দিকে শরৎচন্দ্রের মাতার মৃত্যু হয়। ভুবনমোহিনীর শেষ সন্তান একটি কন্যা; তার জন্মের অল্পদিনের মধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটে। এই মৃত্যুর পর মতিলাল গাঙ্গুলীদের বাঙালী-টোলার বাড়ী ছেড়ে খঞ্জরপুরে একটি বাসা ভাড়া ক'রে সেখানে থাকার ব্যবস্থা করেন।

এই সময়ে দুটি ব্যবস্থার যথা-যথ মর্ম্ম গ্রহণ করা অতিশয় কঠিন। মতিলাল সেই সময় চাকুরি ক'রে সামান্য বেতনে সংসার নির্বাহ ক'রতেন। সেই অবস্থায় বাড়ী ভাড়া করা অর্থের দিক দিয়ে যে ঠিক হয়নি, তা বলা যায়; কিন্তু পারিবারিক নানা কারণে হয়তো এই উপায় ভিন্ন আর অন্য গতি ছিল না। আর একটি ব্যবস্থাও—বিস্ময় উদ্রেক করে। ভুবনমোহিনীর অসুখের সংবাদ পেয়ে শরতের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী অনিলা দেবী ভাগলপুরে আসেন। অনিলার বয়স তখন বাইশ তেইশ হবে। তিনি অনায়াসে শিশু বোনটির লালন পালনের ভার নিয়ে—তাকে পাণিত্রাসে নিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু কেন যে এ ব্যবস্থা হয়নি তাও বুঝে ওটা শক্ত। ভুবনমোহিনীর অভাবে সংসারের কি অবস্থা ঘটেছিল তা অনুমান করা শক্ত নয়। শরতের বয়স কুড়ি—আর দুটি ভাই নিতান্ত ছেলে মানুষ—তার ওপর মাতৃহীন একটি শিশু। অর্থের জোর মোটে নেই। অন্যান্য বহু কারণ থাক্‌লেও শরতের শুধু আর্থিক অবস্থার জন্যেই উপার্জ্জন করা একান্ত আবশ্যক হ'য়েছিল! অতএব মামার বাড়ীর অবহেলায় লেখা-পড়া করা সম্ভব হয়নি এ কথা, যুক্তিতে টেঁকে না।

মাতুল নবীনচন্দ্রের চেষ্টায় বনেলি এষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সরকারের আনুকূল্যে শরৎচন্দ্রের একটি চাকৃরি হয়। তখন থেকে শরৎচন্দ্রকে কিছুকালের জন্য সাঁওতাল পরগণার গোড্ডায় গিয়ে থাক্‌তে হয়। অবশেষে তিনি বনেলি এষ্টেটের সার্লরুল অফিসার শিবশঙ্কর সহায়ের অধীনে চাক্‌রী করেন। শিবশঙ্কর শফরে বার হ'লে শরৎচন্দ্রকে শফরে যেতে হ'ত এবং সহরে ফিরলে সহরে আস্‌তে হ'ত।

গোড্ডায় শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ঘোষ বনেলি এষ্টেটে কাজ ক'রতেন। তিনি একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ছিলেন। সমাজপতির "সাহিত্য" পত্রে—নবীন পণ্ডিত মশাইএর অনেক লেখা বার হ'তো। শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মশাইকে বড় শ্রদ্ধা ক'রতেন। অনেক সময়ে তাঁকে তাঁর সাহিত্যের গুরু ব'লে স্বীকার ক'রতেন।

এই সময় শরৎচন্দ্র ইংরাজি নভেল খুব বেশী পরিমাণে প'ড়তেন। হেন্‌রি উড্, মেরিকরেলি এবং ডিকেন্সের বইগুলি বিশেষ যত্ন সহকারেই প'ড়তেন। "ইষ্টলিন্" প'ড়ে তিনি বইখানির অনুবাদ করেন। "অভিমান" বইখানি তাঁর সর্ব-প্রথম নভেল। ১৮৯৮ সালের মার্চ্চ মাসে সেই বইখানি তাঁর মাতুল মণীন্দ্রনাথকে প'ড়তে দিয়ে যান। মণীন্দ্রনাথ বইখানির উচ্চ প্রশংসা করেন। বইখানি বন্ধুদের হাতে হাতে ঘুরতো এবং অবশেষে তাঁর জনৈক বন্ধু কেদার সিংহ পড়তে পড়তে কুচবিহারে চ'লে যান। তারপর সেই বই আর পাওয়া যায় নি। হয়তো কোন দিন পাওয়াও যেতে পারে। এই বইখানি উদ্ধার করার জন্যে শরৎচন্দ্র খুব বেশী চেষ্টা করেন নি। এক সময় নিজে অনুবাদ ক'রলেও, অনুবাদ সম্বন্ধে তাঁর মত বড় বিচিত্র ছিল। তিনি বল্‌তেন অনুবাদ ক'রলে লেখকের মৌলিকতা নষ্ট হ'য়ে যায়।

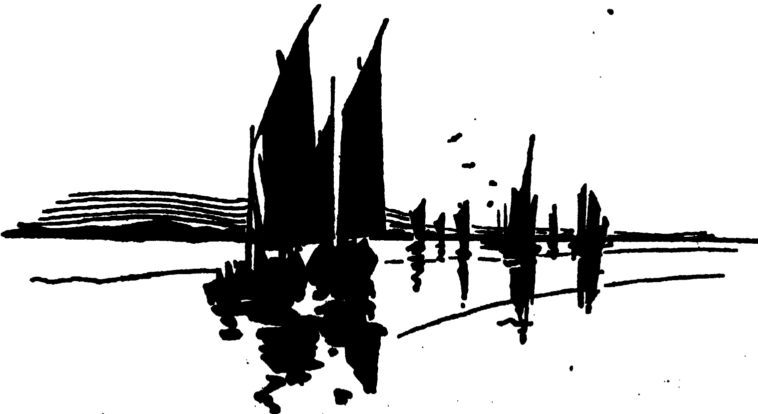
খঞ্জরপুরে গিয়ে তিনি একদিক দিয়ে বিশেষ লাভবান হন। নবীন সাহিত্য-ব্রতীদের দলবদ্ধ হ'য়ে

সাহিত্য-চর্চ্চার বোধকরি বিশেষ সুবিধা হয়। স্বদেশ-বিদেশে এমন অনেক দলের কথা—শুনতে পাওয়া যায়। ডাক্তার জনশনের সাহিত্যিক দলের কথা—ইংরাজি শিক্ষিতেরা জানেন। আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ—প্রভৃতির দল "সাধনা," "বালক" "ভারতী" কাগজের মধ্য দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের তেমন একটি দল ছিল ব'লে শুনতে পাওয়া যায়। "ভারতী-দলের" কথা আমরা জানি। সত্যেন্দ্রনাথ, মণিলাল, চারুচন্দ্র, মোহিতলাল, সৌরীন্দ্রমোহন, প্রেমাঙ্কুর, হেমেন্দ্রকুমার, নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি মিলে একটি দল গ'ড়ে সাহিত্য চর্চ্চা ক'রতে সুরু করেন। এখন এঁদের সকলেই সাহিত্যে খ্যাতি লাভ ক'রেছেন। পরে "সবুজ পত্রের" দলটি—বাংলা সাহিত্যকে নবতর চিন্তার ধারায় বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ ক'রেছে। "সাহিত্য" পত্রেরও একটা দল ছিল।

মতিলালের নূতন-পাতা সংসারে না ছিল সুখ না ছিল স্বস্তি। ভুবনমোহিনীর সংসারে অভাব ছিল। কিন্তু অবহেলা ছিল না। স্নেহ-ভালোবাসা, প্রীতি-প্রেমে দারিদ্র্য লজ্জায় অধোবদন ক'রে থাক্‌তো! সেবাময়ীর কল্যাণ হাত দু'খানি অভাবের সকল শূন্যতা পূর্ণ ক'রে দিত। ছোট ছেলে দুটি পেট ভরে ছাতু চিঁড়ে মুড়ি খেয়ে পথে পথে ঘুরে শ্রান্ত-ক্লান্ত হ'য়ে ফিরে ফিরে এসে ঘুমিয়ে রাত কাবার ক'রতো। মতিলাল নিজের নির্ব্বিকার ধৈর্য্যে সব কিছু সয়ে নিতেন। বাকি শরৎ। তার অবশেষে একটি আশ্রয় জুট্‌লো।

ক'য়েক পা এগিয়ে গিয়ে গঙ্গার তীরে প্রকাণ্ড বাড়ী। সেখেনের দারিদ্র্যের রুক্ষ শুষ্ক কর্কশতা নেই। লোকজন;—একটার জায়গায় পাঁচটা চাকর। বাটির পর বাটি চা আস্‌চে—তার দিনক্ষণ সময় নির্দ্ধারণ নেই। ছেলেদের বসার ঘরে চল্‌চে, তামাক, চুরুট, সিগারেট। জলখাবার সময়—থালা থালা খাবার। এবং আড্ডা দেওয়ার সঙ্গীর অভাব নেই। কেউ-না-কেউ আড্ডার ধুনি জ্বালিয়ে ব'সেই আছে! শরৎ সেই বাড়ীর নিত্য অতিথি হ'লেন।

কর্ত্তা সদরালা। সংসার তৃতীয় পক্ষের। গিন্নী স্বয়ং অন্নপূর্ণা! শরৎচন্দ্রের কথায় রস ছিল। ছেলেমেয়েদের মনে সাহিত্য-প্রীতি ছিল। এবং বাড়ী শুদ্ধ সবারই থিয়েটার করা এবং দেখার অদম্য উৎসাহ! চৌকির উপর বেওয়ারিশ মাল হারমোনিয়মটা খোলাই পড়ে আছে! কেউ-না-কেউ সুরে বেসুরে গান চালিয়ে চ'লেছে!



সহমরণ

শ্রী চারুচন্দ্র দত্ত

উপরের জাঁকাল নামটা দেখে কেউ যেন মনে করবেন না যে আমি ধর্ম্ম বা সমাজনীতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে বসেছি। প্রবন্ধ রচনা আমার মোটে আসে না। যা লিখছি সেটা নিছক গল্প, অতি-সামান্য আখ্যায়িকা মাত্র।

ছেলেবেলায় আমার এক মস্ত ব্যসন ছিল, পাখী শিকার। আজ বুড়ো বয়সে গলিত-নখ-দন্ত অবস্থায় সে অভ্যাস উবে গেছে। একেবারে অহিংসাপন্থী হয়ে পড়েছি। গল্পটল্প লিখে দিন কাটাই। তবু এখনও মাঝে মাঝে স্বপনে বন্দুক কাঁধে কত পাহাড় চড়ি, কত কাঁটাবন ভাঙ্গি, বিলজলার এক হাঁটু পাঁকে কত হেঁটে বেড়াই। তখনকার মত বেশ লাগে, কিন্তু ঘুম ভাঙ্গলে মনে হয়, "ছি, ছি, এখনও তোমার এই প্রবৃত্তি!" সেদিন শুয়ে শুয়ে এই গল্পটি মনে পড়ল। পাখী আমার হাতে প্রাণ হারাল বটে। কিন্তু সত্যি হারল কে, পাখী, না আমি?

আমি তখন বাস করি খান্দেশ প্রান্তে। বহুকাল থেকে শিকারীর স্বর্গ বলে এই প্রদেশের খ্যাতি ছিল। আমিও আর পাঁচজনের মত মনের সাধে পশুপক্ষী বধ করে বেড়াতাম। সদরের একেবারে কাছাকাছি মোতিতলাও বলে এক মস্ত বিল ছিল। অগ্রহায়ণ মাস পড়তে না পড়তে নানা বর্ণের, নানা আকারের, বুনো হাঁসে তার জলটা একেবারে ছেয়ে ফেলত। বিলের কিনারায় বড় বড় ঘাস, জলের মাঝে ছোট ছোট দ্বীপ, হাঁস মারবার ভারী সুবিধা ছিল। জব্দ হয়েছিলাম কেবল চকাচকীগুলোর কাছে। তারা বসত খোলা বালুচরের উপর, একেবারে জলের ধারে। কাছে যাবার উপায় ছিল না। বহুদূর থেকে শিকারীকে চিনে ফেলত আর তৎক্ষণাৎ কাঁ কাঁ করে আকাশপথে উধাও হয়ে যেত। ছোট বড় কত ভাল ভাল হাঁস রোজ ফেলছিলাম, কিন্তু এই চকাগুলোর কাছে হার মেনে মেনে সোয়াস্তি ছিল না।

এই চকাচকীই সংস্কৃত কবিদের আদরের চক্রবাক চক্রবাকী। এদের ভালবাসার কথা নিয়ে তাঁরা কত সুন্দর সুন্দর শ্লোক রচনা করে গেছেন! নিজেও ত দেখেছি যে চকীকে নদীর একপারে ফেলে রেখে চকা অপরপারে উড়ে গেল, শুধু সেখান থেকে কাঁ কাঁ করে বিভোর হয়ে চকীকে ডাকবে বলে। তা হোক গে, পাখীর প্রেমের খেলা দেখে কি আর কিরাতের পেট ভরে!

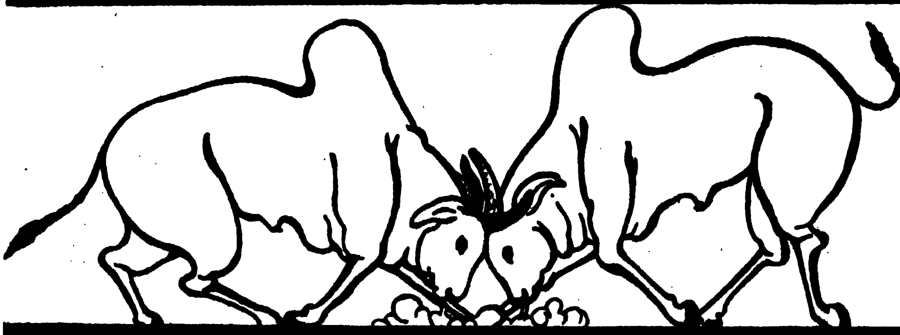
আমার শিকারী ছিল মালিয়া বলে এক ভীল। তাকে কেবলই বকতাম, "তুই বুনো মানুষ একটা কিছু হিকমত বার করতে পারছিস না!" সে উত্তর দিত, "রোসো সাহেব, দেখছি।"

কিছুদিন পরে একদিন কাছারী থেকে ফিরে দেখি মালিয়া বসে রয়েছে। বললে, "সাহেব, এখনই বন্দুকটা নিয়ে আমার সাথে এস। আজ তোমাকে চকা শিকার করাবই।"

আমি মহা উৎসাহে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লাম। পাশে Side Carএ বন্দুক হস্তে বসে মালিয়া। ক্রোশ দুই যাবার পর সে গাড়ী থামাতে হুকুম দিলে। সেইখানে একটি ছোট্ট জলস্রোত

মোতিতলাও থেকে এসে পাঁজরা নদীতে মিশেছে। শীতকালের বেলা। পাঁজরার জল ও বালি ডুবন্ত সূর্য্যের আলোয় অগ্নিবর্ণ। মালিয়া আমাকে নদীর পাড়ে এক জায়গায় কতকগুলো পাথরের চাঙড়ার মাঝে বসালে। বললে, "বন্দুকে টোটা ভরে নিয়ে চুপটি করে বস, সাহেব। চকা এল বলে! সন্ধ্যার সময়ে ওরা মোতিতলাও থেকে এসে বরাবর এই জল ধরে উড়ে চলে যায় ওদের রাত্রিবাসের জায়গায়। আমি গেল চারদিন জোর নজর করেছি।" নিঃশব্দে বসে রইলাম। পায়ের কাছে শুয়ে মালিয়া। সম্মুখের চরে একটা দহের মত। এই ভাবে এক দণ্ড কেটে গেল। পশ্চিম আকাশের রঙ্ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ দূরে আকাশে আওয়াজ শুনলাম, কাঁও কাঁও, কাঁ কাঁ। মালিয়া অস্ফুটস্বরে বললে, হুঁশিয়ার। দেখতে দেখতে মাথার উপর উড়ে এল দু জোড়া চকা চকি। বেশী উঁচু হবে না, হাত বিশ তিরিশ। মনের আনন্দে বন্দুক ছুঁড়লাম। একটা প্রকাণ্ড চকা ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ল দহের মাঝামাঝি। দেখলাম, মারাত্মক জখম হয়েছে, কোন রকমে কাত হয়ে ভাসছে। অপর তিনটি পাখী একসঙ্গে উড়ে পালাল বটে, কিন্তু খানিকদূর গিয়েই তার একটি ফিরল। সে আকুল হয়ে চীৎকার করতে করতে সোজা উড়ে এল দহের জলের উপর। জল থেকে আহত চকাটা ক্ষীণস্বরে তাকে সাড়া দিলে, কাঁও কাঁও। চকী মাথার উপরে করুণভাবে ডাকতে ডাকতে ঘুরপাক খেতে থাকল। এ দৃশ্য আগে কখনও দেখি নেই। মনে হল যেন চকী বলছে, "নিষ্ঠুর খুনে! আমার চকাকে যদি মারলি আমাকেও মেরে ফেল, আমি তোকে ডরাই না।" মন বড় খারাপ হয়ে গেল। নীরবে বন্দুক তুলে সাবধানে লক্ষ্য করে ঘোড়া টিপলাম। চকী আসন্ন বৈধব্যের হাত এড়াল। ঝুপ করে তার নিস্পন্দ দেহ এসে চকার উপর পড়ল। ক্ষণেকের মধ্যে দুটো দেহই চিত হয়ে পাশাপাশি ভাসতে লাগল। মালিয়ার দিকে তাকালাম, সে হাত দিয়ে চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল। আমার বন্দুকটা হাতে নিয়ে বললে, "ওঠ সাহেব, তোমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি। রাম, রাম, ও পাখী কি খাওয়া যায়! থাক পড়ে!"

নীরবে বাড়ী ফিরে গেলাম। নির্ম্মম পাখী মারা হলেও সেদিন আর অন্নগ্রহণ করতে পারলাম না। সারারাত্রি সেই সহমরণের দৃশ্য চোখের সামনে ভাসতে লাগল। সেই আমার শেষ চকা শিকার।



একমুঠো—(কবিতার বই)—শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী। প্রকাশক—ভারতী ভবন। মূল্য—একটাকা।

শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী প্রণীত নূতন কবিতার বই,—"একমুঠো" পড়ার সুযোগ আমাদের হয়েছে।

আপাত-দৃষ্টিতে "একমুঠোর" কবিতাবলী দুর্বোধ্য; তবে এর অন্তর্নিহিত ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে কবিতার রূপ চোখের সামনে সুস্পষ্টরূপে ফুটে ওঠে। কবি অমিয়চন্দ্র তাঁর স্বাতন্ত্র্যের ভিতর দিয়ে 'মিষ্টিসিজ্‌ম্‌' এর যে ধারা বহন করে এনেছেন তা সম্পূর্ণ নিজস্ব।

গ্রন্থটির "একমুঠো" নাম Blake-এর প্রসিদ্ধ উক্তি—"To hold Infinity in the palm of your hand" এরই প্রতিধ্বনি এবং এই নামকরণই গ্রন্থোক্ত কবিতাবলীর অন্তর্নিহিত ভাব ব্যক্ত করে।

কবির প্রথম কবিতা "বাস্তবিক" ও সম-উক্তিতেই সায় দেয়। কবি ফুলকে জগতের অন্যান্য বস্তু থেকে ছিন্ন-সূত্রে দেখতে চাননা, একসূত্রে গাঁথা দেখতে চান এবং তাঁর এই চাওয়া সুন্দররূপে বর্ণিত হয়েছে একটি কথায় "ফুলকে পাব বোঁটায়।" অমিয়চন্দ্রের দৃষ্টিতে জগতের সমস্ত বস্তুই পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গী Tennyson এর একটি কবিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়,—

" Flower in the crannied wall,
I pluck you out of the crannies,
I hold you here, root and all in my hand,
Little flower—but if I could understand
What you are, root and all, and all in all
I should know what God and man is."

"রামায়ণ" কবিতাটিতেও কবির মনে এই ঐক্যবন্ধনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। কবির ঈপ্সিত "সালোক্য" নয়, সামীপ্যও নয়, 'সাযুজ্য'। তাই কবিতাটির শেষের পংক্তিতে দেখা যায়,—

"করতলগত কৈ আমলকি,
উইটিবি থেকে ওঠ বাল্মীকি
আদি মুহূর্ত্ত চিরে।
সূত্রে বাঁধুক রাত জাগা ঘিরে,
শুধু নয় সান্নিধ্য—
শুতে যাই ছুঁয়ে তির্য্যক ধার
আস্তাবলের চালের ওপার
সকল চাঁদের ঈড্য॥"

'দরজা,' 'ঘুম,' 'বৃষ্টি,' 'সংসার,' 'আরোগ্য' প্রভৃতি কবিতা অতি সুন্দর।

বিশেষতঃ "গন্তব্য" কবিতাটি পড়বার সময় এর ভাব, ভাষা ও ছন্দের অপরূপ সমন্বয় মনের ভিতরে একটি অপূর্ব্ব চেতনার স্পন্দন এনে দেয়। এই কবিতাটির খানিকটা উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

"নিমতলার ঘাটে আস্তি মহানিমের গাছ
তারি তলায় বাদ্যি বাজায় শ্রোতকন্যের নাচ
—রাতদুপুরী।

ঝুরু ঝুরু ঝরা পাতা হু-হু হাওয়ার কাণ্ড
হা হা করে শুকনো শিকড়, ভাঙ্গা মাটীর ভাণ্ড
ও হো হোঃ হো।

যমভগ্নী যমুনা নয়, গঙ্গা বাজায় তালি
গঙ্গাতীরের নমুনা এই রুক্ষ হাড়ের বালি
ও কি ঢেউয়ের শব্দ।

এই কয়েকটি ছত্রের মধ্যে কবি সূক্ষ্ম মায়া-জাল বিস্তার করে' পাঠকের মনে যে অপার্থিব বিস্ময়-লোকের সৃষ্টি করেছেন তা' বাস্তবিকই বাংলা সাহিত্যে বিরল।

আজকালকার দিনে একটা জিনিষ প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় যে, আধুনিক কবিরা রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে মুক্ত

হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। "একমুঠো" তেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু ভাষার দিক থেকে অমিয়চন্দ্র সম্পূর্ণরূপে সফল হলেও ভাবের দিক থেকে হয়ত সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত হতে পারেন নি।

তার কারণ তিনি "মিষ্টিসিজ্‌ম্" এর যে রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন এবং বহুস্থানে মিষ্টিসিজ্‌ম্-এর পথ অনুসরণ করতে গিয়ে মিষ্টিফিকেসন্-এর দিকেই নজর বেশী দিলেও সেই রূপই রবীন্দ্রনাথের পুর্ব্বের বহুলেখায় দেখা যায়।

উদাহরণ স্বরূপ একটি উদ্ধৃত করছি—

"এক নিমেষে গণনাহীন
নিমেষ গেল টুটে।
একের মাঝে এক হয়ে মোর
উঠ্‌ল হৃদয় ফুটে॥
তোমার আমায় একটুখানি
দূর যে কোথাও নাই।
নয়ন মুদে নয়ন মেলে
এই ত দেখি তাই॥
যেই খুলেছি আঁখির পাতা
যেই তুলেছি নত মাথা
তোমার মাঝে অমনি আমার
জয়ধ্বনি উঠে॥ (গীতালি)

শেষের কথা এই যে যদি অমিয়চন্দ্র সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্ত নাও হ'ন এবং কবিতার অর্থস্পষ্টতার প্রতি তাঁর অবহেলা যদিও পাঠকের চোখে প্রথম দৃষ্টিতে যথেষ্ট অসুবিধাজনক তবুও "একমুঠো" যে যোগ্য আসনে নিজের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কারণ এটি এমন একটি বই যার রূপকের যবনিকা তুলতে পারলে অনুভব করা যায় নিজেকে বিচিত্র রহস্যের ভিতর দিয়ে এবং স্পর্শ পাওয়া যায় বিরাট বিশ্বের, কয়েকটি পাতার ভিতরে একত্রীভূত অবস্থায়।

জয়ন্তনাথ রায়





চলন্তিকা

'সম্বুদ্ধ'

আমাদের ও অঞ্চলে একটি গল্প চলিত আছে।

এক মুসলমান ভদ্রলোকের বাড়িতে ভোজ। নিমন্ত্রিতরা সকলে উপস্থিত হইয়াছেন, রাঁধাবাড়াও প্রায় শেষ, এমন সময় একটি দুর্বিপাক ঘটিল। হাঁড়িসুদ্ধ পোলাও উনানের পাশে নামাইয়া রাখা হইয়াছিল, এক দুরাত্মা কাক পোলাও-অপহরণমানসে ডেকচির কানায় আসিয়া বসিল, এবং পোলাও অতিরিক্ত গরম দেখিয়া মনের খেদে 'ধুত্তোর' বলিয়া ডেকচির মধ্যে কিঞ্চিৎ অপকর্ম করিয়া দিয়া পলায়ন করিল।

গৃহকর্ত্তা প্রমাদ গণিলেন। অল্পবুদ্ধি রাঁধুনি ও চাকরের দল উচ্চৈঃস্বরে আক্ষেপ করিয়াছে, ফলে ব্যাপারটা অতিথিদের কানেও পেঁাছিতে বাকি নাই। জানিয়া শুনিয়া এই পোলাও কেহ পাতে লইবে না। অথচ তখন না আছে নূতন করিয়া পোলাও রাঁধিবার সময়, না আছে তাহার আয়োজন তৈরি। বেগতিক দেখিয়া ভদ্রলোক বৃদ্ধ মেলৗভীসাহেবের শরণ লইলেন; বাঁচান, নহিলে মানসম্ভ্রম গেল। মৌলভী অভয় দিয়া কহিলেন, ঘাব্ড়াইও না বৎস, ব্যবস্থা আমি করিতেছি।

মৌলভী নিমন্ত্রিতদের সকলকে ডাকিয়া একত্র করিলেন, করিয়া তাহাদের সম্বোধন করিয়া একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দিলেন।

মৌলভী কহিলেন ভাইসব, তোমরা জান আমরা মুসলমান, হিন্দুদের সঙ্গে আমাদের বিরোধ। তাহারা যেখানে যাহা কিছু করে, আমরা ঠিক তাহার বিপরীতটি করি নহিলে আমাদের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে না।

শ্রোতারা কহিল, ঠিক কথা।

মৌলভী কহিলেন, দেখ, তাহারা পুবমুখে ফিরিয়া পূজা করে; আমরা পশ্চিমমুখে ফিরিয়া নামাজ পড়ি। কাছা না থাকিলেও তাহারা পূজার সময় কাছা আঁটিয়া লয়; আমরা কাছা আঁটা থাকিলেও

সেটাকে নমাজের সময় খুলিয়া লই। তাহারা তেল মাখিয়া স্নান করে; আমরা স্নান করিয়া তেল মাখি। তাহারা ঝট্‌কা ছাড়া মাংস খায় না; আমরা জবাই ছাড়া খাইনা। তাহারা মরিলে পোড়াইয়া ফেলে; আমরা মরিলে কবর দিই।

শ্রোতারা কহিল, জরুর।

মৌলভী কহিলেন, এখন তোমরা ভাবিয়া দেখ,—আজ এই কাণ্ড যদি কোন হিন্দুর বাড়িতে ঘটিত, তবে কি হইত? একজন মানুষও ও পোলাও খাইত ন। অতএব আমরা এখন কি করিব? আমরা সকলেই ঐ পোলাও খাইব। কেমন, ঠিক কিনা?

শ্রোতারা একবাক্যে কহিল, আল্‌বৎ।

* * * *

মৌলভীসাহেবের যুক্তিটা হয়তো হাস্যকর কিন্তু সে যুক্তিতে কাজ হয়, ইহার প্রমাণ রাশি রাশি পাইতেছি। কাজ হয় তাহার কারণ, ব্যক্তিগত-বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার নেশা আমাদের মজ্জাগত—বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার খাতিরে নিজেকে তিন-ঠেঙে গরু বা কিম্ভূতকিমাকার প্রতিপন্ন করিতেও আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। আমাকে অপরের চেয়ে পৃথক করিয়া দেখাইতে হইবেই, নূতন কিছু একটা করিতে হইবেই—এইটাই আমাদের মহাবাণী হইয়া উঠিয়াছে। এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবার উপায় বলিয়া আমরা জানিয়াছি অপরপক্ষের বিপরীতমুখে চলিবার শাশ্বত চেষ্টাকে, "উহারা উত্তরে চলিয়াছে? তবে নিশ্চয়ই আমরা দক্ষিণে চলিব"—ইহাই আমাদের মূলকথা। সে পথের শেষ কোথায় আমরা জানিনা, জানিতে চাহিও না। সে পথের দুইধারে কি আছে, তাহাতে পদক্ষেপ করা বুদ্ধিমত্তার বা বুদ্ধিহীনতার পরিচয় এ সকল বাজে তর্ক লইয়া আমরা মাথা ঘামাই না। উহারা যাহা করিতেছে তাহার উল্‌টাটি করিতে পারিতেছি, আর যাহাই লোকে বলুক 'উহাদের' সহিত মিল আছে এমন অপবাদ কিছুতেই দিতে পারিবে না—এইটুকুই আমাদের চরম সান্ত্বনা ও পরম তৃপ্তি। এই 'উহারা' কাহারা, এবং তাহাদের সঙ্গে আমাদের বাস্তবিক প্রভেদ কোন্‌খানে ও কতটুকু—এ প্রশ্নও আমাদের কাছে অবান্তর।

* * * *

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই মৌলভী যুক্তির আধিপত্য প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। তিন লক্ষ তিরাশি হাজারটা দল প্রত্যেকটা বিভিন্ন পথে চলিতে চাহিতেছে—পথটা কিপ্রকার এবং কোথায় গিয়া পৌঁছিবে, এ প্রশ্নের সমাধান লইয়া কেহ মাথা ঘামায় না; আমার পথটা অপরের পথের সঙ্গে এক নয়, এইটুকু জানিয়াই আমরা খুসি। ইহার বেশি জানিবার আমাদের কৌতূহল নাই জানিবার মত বিদ্যাবুদ্ধিও আছে কিনা সন্দেহ।

এই পথ বৈচিত্র্যের সাফাই হিসাবে একটা টেক্‌নিকাল টার্ম প্রবর্তিত হইয়াছে,—"আইডিওলজি"। প্রত্যেকেরই নাকি একটা করিয়া আইডিওলজি আছে, তাহার নির্দ্দেশেই ইহারা পথ চলিতেছেন। এই আইডিওলজির উৎপত্তি ইউরোপে; অ-জীর্ণ ইউরোপীয় কেতার ইহা আরেকটি উদাহরণ।

•

মজা এই, যে থিওরি লইয়া ইঁহারা কচকচি করেন, সেই থিওরির তলা পর্য্যন্ত যাইবার মত ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা অনেকেরই নাই, অপরের উদ্গীরণ গলাধঃকরণ ও চর্বিত চর্বণ করিয়াই ইঁহারা হৃষ্ট।

"কার্ল মার্কস্‌" নামের দোহাই পাড়িয়া ইহারা বাংলার জমি চষিয়া ফেলিলেন, কিন্তু আসলে বুলি যাহা মুখস্থ করিলেন ও ভক্তদের করাইলেন তাহা কার্ল মার্কসের বাড়ির ধার দিয়াও সর্বদা যায় না। কার্ল মার্কসের কথার বুখারিন্‌ যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন Versus কোল্‌-সাহেব যে ব্যাখ্যা দিলেন—এই মতদ্বৈধের ভিত্তিতে ইঁহাদের দল-গড়াগড়ি ও দল-ভাঙাভাঙি হইয়া যায়—'দেশসেবায় নামিবার সময় সংকল্পটা কি করিয়া নামিয়াছিলেন—ভারতের দৈন্যমোচন না মার্কস্‌ (বা অন্য যে কেহ) সাহেবের বাণী-প্রচার ও পুস্তকবিক্রীর সহায়তা—সে কথাটা নিজের মনেও আর স্পষ্ট থাকে না। প্রত্যেকে নূতন কথা বলিবার ফলে বাংলাদেশে অহর্নিশি নব নব 'বাদে'র আবাদ হইতেছে—'সাম্যবাদ' 'সমাজতন্ত্রবাদ' ঘুরিয়া গিয়া 'গান্ধীবাদ রায়বাদ সুভাষবাদ' এবং ক্রমে 'সুতাবাদ' 'দেশ্‌লাইবাদ' 'চোঙা-বাদ' 'ঠ্যাঙাবাদ' বঙ্গদেশের রাজনীতিক্ষেত্র ব্যাপিয়া শাখা ও শিকড় বিস্তার করিতেছে।

একদা যাঁহারা এই ক্ষেত্রে সোনার ফসল ফলাইবার দুঃস্বপ্ন দেখিয়া হলধারণ করিয়াছিলেন তাঁহারা হতাশ্বাস হইয়া পড়িতেছেন; আবার যদি কেহ কোনদিন এই ভূমিকে সুফলা করিয়া তুলিতে চান, কি বিপুল পরিমাণ আগাছা উৎপাটন করিবার ভার তাঁহাকে লইতে হইবে, ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিতেছি। 'বাদের' বিবাদারণ্যে দিশাহারা হইয়া ভাবিতেছি, সমস্ত 'বাদ'কেই একবারে বাঁচাইয়া বাদ দেওয়ার মহাব্রত কেহ কোনদিন লইবেন কি? যদি কেহ তাহা পারেন, তিনিই হইবেন জাতির ত্রাণকর্ত্তা। দেশ হইতে দেবমূর্ত্তির উৎখাত করিয়া Iconoclast মহম্মদ একদা মহাজাতির ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন; ভারতকে বাঁচাইতে হইলে তেমনই একজন Ideoclastকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে যিনি হাতে-কলমে কাজ করিতে জানেন, যিনি মিথ্যা কথার কচকচি লইয়া সময় নষ্ট করেন না, যিনি ছ'পেনি সিরিজের প্যাম্ফ্‌লেট্‌ ও ছ'আনা দামের sure suceess to life হইতে জীবন-পথের নির্দ্দেশ অন্বেষণ করেন না, যিনি কর্ত্তব্য ও স্বব্রত-ব্রতকে বিস্মৃত হইয়া ব্যক্তিগত কণ্ঠকে ফুলের মালায় ভূষিত ও ব্যক্তিগত কর্ণকে হাততালিতে তৃপ্ত করিবার ফিকির খুঁজিয়া বেড়ান না। এ যুগে ফুলের মালা ও হাততালির মোহ যিনি ত্যাগ করিতে পারেন তিনিই যথার্থ সর্বত্যাগী।

* * * *

না না, রাগ করিবেন না—এসকল কথা সত্যই ভাবি নাই। ভাবিব কিনা সেই কথাটা মোটে ভাবিতে আরম্ভ করিব করিব ভাবিতেছিলাম ঈশ্বর রক্ষা করিলেন—হকারের কণ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়া চিৎকার করিয়া কহিলেন, আমি আছি টাউনহলেও আছি।

ছুটিয়া গিয়া একখানা কাগজ কিনিয়া লইয়া আসিলাম এবং হেড্‌লাইনে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র হেড্‌-কোয়ার্টার্‌সে শান্তি 'প্রতিষ্ঠিত' হইয়া গেল। এমন সুসংবাদ বহুকাল শুনি নাই।

* * * * *

সভার অছিলায় টাউনহলে একত্রিত হিন্দু মহাসভার দল ও সুভাষীদল মারামারি করিয়াছে—ইহার চেয়ে বড় সুসংবাদ এই দুর্দিনে কল্পনাও করিতে পারিতাম না। এ যেন 'অশোকবাবু—বৃষ্টির' চেয়েও অধিকতর লোমহর্ষণ, অধিকতর মধুরধ্বনি।

যে-যুগে অপরের সহিত মত ও পথের অমিল তারস্বরে ঘোষণা করাই রাজনীতি ও ধর্ম, সেখানে দুই বিরুদ্ধদল একত্র মিলিত হইয়া মারামাবি করিল এবং পরদিন একেবারে একত্রে গলা মিলাইয়া বলিল 'উহারা আমাদের মারিয়াছে'—ইহার গুরুত্ব লঘুপ্রকৃতির লোকেরা বুঝিবেন না।

শুধু কি তাই? 'উহাদের নিয়োজিত গুণ্ডারা সভায় বসিয়া ছিল', 'তাহারা আমাদের এইরকম-করিয়া এইরকম করিয়া মারিল' 'অমুক অমুক আহত হইয়াছেন ইহারা আমাদের বন্ধু' আমরা তাঁহাদের জন্য সমব্যথিত ও হাঁসপাতালে তাঁহাদের দেখিতে গিয়াছিলাম, আমাদের পার্টির গাড়িতে চড়িয়াই তাঁহাদের হাসপাতালে পাঠানো হইয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি বিবৃতি উভয়পক্ষের কাগজে এমন অদ্ভুতরকম এক-ভাষায় ও এক-ভঙ্গিতে বাহির হইয়াছে যে দেখিয়া বিস্ময় লাগে; হঠাৎ মনে হয় বিবৃতিগুলো গোড়ায় একই হাতে লেখা, তারপর প্রয়োজনমত খালি স্থানবিশেষে নামধামগুলো বদলাইয়া বসাইয়া লওয়া হইয়াছে। দুইদলের কর্মপন্থা এবং তাহার চেয়েও Vital বস্তু 'বিবৃতি' এবং 'তীব্রপ্রতিবাদের রিজলিউসন পর্য্যন্ত যখন এমন আশ্চর্য-রূপে মিলিয়া যায়, তখন মনে আশা জাগে হয়তো আবার দেশে ঐক্যের দিন ফিরিয়া আসিল-বা।

গুণ্ডারা বাঙালী না হিন্দুস্থানী, তাহাদের 'উহারাই' ভাড়া করিয়া আনিয়াছিল কিনা, এবং কতটাকায় ঠিকা দিয়াছিল—ইত্যাদি বিবরণ পর্য্যন্ত কী চমৎকার মিলিয়া গিয়াছে; দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি।

* * * *

কিন্তু, অ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন মানুষের মন বড় নোংরা। নিজেকে জন্তু বলিতে রাজি নই, অগত্যা মানুষোচিত নোংরা মন আছে বলিয়া গর্ব অনুভব করি।

সেই মনটা বড় গোল বাধাইতেছে। ঐক্য-স্থাপনের ইঙ্গিত ও তজ্জাত আনন্দশিহরণকে ঠেলিয়াও ক্ষণে ক্ষণে পাপমনে একটা পাপকথা জাগিয়া উঠিতেছে—"ভাই, চিনিলে কি করিয়া?"

বিবৃতিতে প্রকাশ ভদ্রবেশধারী গুণ্ডারা সভায় প্রবেশ করিতেই উভয়পক্ষের লোকেরা তাহাদের তৎক্ষণাৎ চিনিয়া ফেলিয়াছিলেন। নারী-সভ্যেরা পর্য্যন্ত কে তাহাদের ডাকিয়া আনিল, ইহা লইয়া

অপর পক্ষকে টিপ্পনীও নাকি কাটিয়াছিলেন। পাপ মন মাথা নাড়িয়া বলিতেছে, উহুঁ, ইহার কোথায় যেন গলদ আছে। গুণ্ডাদের 'দেখিবামাত্র' ইঁহারা চিনিলেন কি করিয়া? গুণ্ডারা তো ল্যাঙোট কষিয়া গায়ে তেলকালি মাখিয়া হাতে লাঠি লইয়া যায় নাই—'ভদ্রবেশ' পরিয়াই নাকি গিয়াছিল। Best গুণ্ডার চেহারাও যে নিশ্চয়ই worst ভদ্রলোকের চেহারার চেয়ে বেশি খারাপ হইবে, এমন কোন কথা নাই—অনেক ভদ্র চেহারার গুণ্ডা লোক এবং আরও অনেক গুণ্ডা-গুণ্ডা চেহারার ভদ্রলোক আমরা অহর্নিশি দেখিতে পাই। তবে কি বুঝিতে হইবে, এই গুণ্ডাদিগকে বিবৃতিকারেরা আগে হইতেই চিনিতেন? এবং যদি তাই হয় সে পরিচয় কবে কোথায় কি কারণে হইয়াছিল?

*　　　*　　　*　　　*

গুণ্ডারা নিজেরা নিশ্চয়ই ইঁহাদের "Keep reporters photographers ready" বলিয়া সংবাদ দিয়া যায় নাই—হাততালি-বাতিক ও ফটো-ছাপার বাতিক গুণ্ডাদের থাকে না। থাকিলে তাহারা আর গুণ্ডা থাকিত না, নেতা হইয়া যাইত।

*　　　*　　　*　　　*

আরও একটা বৃহৎ প্রশ্ন মনকে ব্যাকুল করিতেছে—'টাকা গেল কত'? দুই পক্ষই একটা অতি অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন, খবরের কাগজে ছাপিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, 'উহাদের গুণ্ডার হাতে আমরা মার খাইয়াছি।' গুণ্ডাদের মূলত কোন্ পক্ষ আনিয়াছিল সেটা গৌণ প্রশ্ন; তাহারা যদি অনাহুত আসিয়া থাকে তাহাতেও যায় আসে না। মুখ্য কথাটা হইতেছে, 'মার খাইয়াছি' একথাটা দুই পক্ষই স্বীকার করিয়াছেন। প্রহৃত পক্ষ যদি প্রহার স্বীকার করে, তবে প্রহরণের প্রাপ্য পুরস্কার ফাঁকি দিবার আর পথ খোলা থাকে না। গুণ্ডাদের যদি বুদ্ধি থাকে, তাহারা এই সুযোগ উপেক্ষা করিবে না—দুইখানা কাগজ কিনিয়া দুই পক্ষকেই দেখাইয়া বলিবে, এই দেখুন উহারা স্বীকার করিয়াছে যে গুঁতা খাইয়াছে। গুঁতাইয়াছি আমরাই, অতএব আমাদের প্রাপ্য ইনামটা দিয়া দিন। এবং এইভাবে তাহারা দুই পক্ষ হইতেই সমানে টাকা আদায় করিবে। এটুকু ব্যবসাবুদ্ধি তাহাদের আছে সন্দেহ নাই, নহিলে গোলমালে উভয়পক্ষকেই কিছু কিছু ঠ্যাঙানি দিবে কেন? নিশ্চয়ই এই প্রকারে উভয়পক্ষকে একসঙ্গে দোহন করিয়া, একই কাজের জন্য ডবল মজুরি আদায়ের ফন্দি তাহারা আগে হইতে আঁটিয়া গিয়াছিল। গুণ্ডারা Income Tax ও War-profits Tax দেয় না। হিংসা হইতেছে—জন্মাইলাম যদি, গুণ্ডা কেন হইলাম না, এবং সেদিনের সভায় কেন গেলাম না ভাবিয়া দুঃখ হইতেছে। গেলে হাতের সুখও হয়তো হইত, ডবল-লাভের যোগটাও ফস্‌কাইত না।

*　　　*　　　*　　　*

কিন্তু হইবে কি করিয়া—আমাদের ভাগ্যই লোকসানের। সেদিনের মারামারিতেও লোকসান যা হইল আমাদেরই। আমরা একবার কংগ্রেসকে চাঁদা দিলাম একবার হিন্দুমহাসভাকে চাঁদা দিলাম—

আর দুইদিক দিয়া দুইবার সেই টাকা গেল গুণ্ডার পকেটে—ইহার চেয়ে বড় দুঃখ আর কি থাকিতে পারে। অন্তত যদি সেদিন মজাটা দেখিতেও যাইতাম! টিকিটের দাম বলিয়াও কিছু পয়সার দুঃখ উশুল হইত।

* * * *

আরও দুঃখ আছে। কেবল ব্যক্তিগত নয় রীতিমত জাতিগত দুঃখ। বাংলাদেশের দলাদলিতে মারামারি হইবে তাহাও হিন্দুস্থানী গুণ্ডা ছাড়া চলিল না—ইহা শুনিয়া মর্মে বড় আঘাত পাইয়াছি। পোড়া বাংলাদেশে কি গুণ্ডাও জন্মায় না? আর কিছু না থাক দুই পক্ষের ভলান্টিয়ার তো ছিল! হাউইটজার না, বোমা না—দু'টা চেয়ার সেটুকু ছুঁড়িতেও কি তাহারা পারিত না? ভলান্টিয়ার হইবার যোগ্যতায় বড় মাপকাঠি কি অকর্ম্মণ্যতা? এই পরমুখাপেক্ষিতায় বড় ক্লেশ অনুভব করিলাম। বাংলার দলগত মারামারি হিন্দুস্থানীরা করিয়া দিতেছে ভবিষ্যতে হয়তো বাঙালীর বাপ মরিলে শ্রাদ্ধটা ভাড়াটে হিন্দুস্থানীরা আসিয়া করিয়া দিয়া যাইবে।

* * * *

তবু এই তিন চার রকম দুঃখ ঠেলিয়াও ঈষৎ একটু আনন্দ অনুভব করিতেছি। সেদিনের মারামারিতে নাকি সমস্তটা যুদ্ধই গুণ্ডারা একা করে নাই, উভয়পক্ষের চাঁইয়েরাও নাকি কিছু কিছু হাতাহাতি স্বহস্তে করিয়াছেন—বিবৃতিতেই প্রকাশ। নিরাশার অন্ধকার ঘুচাইতে আশার স্ফুলিঙ্গই যথেষ্ট—বরাতে থাকিলে একদিন সেই স্ফুলিঙ্গই দাবানলের সৃষ্টি করিয়াছে দেখিতে পাইব। এবং তাহা যদি পাই আজিকার এই কেলেঙ্কারির কলঙ্ক সেদিন আর মনেই থাকিবে না।

মনে পড়িতেছে এই 'চলন্তিকা'র পৃষ্ঠায়ই একবার দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলাম, বাংলাদেশে নির্বীর্যতার ও কাপুরুষতার চাষ চলিতেছে। তাহার পর কয়েকমাস মাত্র কাটিয়াছে, ইহারই মধ্যে কর্মপ্রচেষ্টায় পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া আশান্বিত হইতেছি। কিছুকাল ধরিয়া পরস্পরের প্রতি পঙ্কক্ষেপনই বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও কাগজনৈতিক অস্ত্র হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার পরিবর্ত্তে যদি সোজাসুজি হাতাহাতি—মারামারির চর্চা আরম্ভ হয়, জাতির গ্লানি তাহাতে কাটিবার আশা আছে। গালাগালি ও নিষ্ঠীবনবৃষ্টির তুলনায় নখদন্তে মারামারি করায় অধিক গৌরব আছে, সেটা ভদ্রোচিত যদি নাও হয়, অন্তত পুরুষোচিত।

এবং এই মারামারির আরম্ভ টাউন হলে হইল বলিয়াই আশা জাগিতে পারিতেছে। বাংলার ইতিহাসে টাউনহলের স্থান পশ্চাতে নয়। একদা এই টাউনহলে দাঁড়াইয়াই বাঙালী বিদেশী-বর্জনের সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিল; এই টাউনহলেই বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা-সমরের বাণী প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল। ক্লৈব্য-বর্জনের মহাসাধনার হোমানলের প্রথম শিখাটি যদি সেই টাউন হলেই প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, তবে সে অগ্নি জন্মস্থলের গৌরবে গরীয়ান, তাহার নিকটে আমাদের প্রত্যাশা করিবার অনেক আছে।

একদিনে সে আগুন আমাদের পুড়াইয়া সোনা করিবে এমন অসম্ভব আশা করি না; হয়তো তাহার দহনে নিজেও ভস্মসাৎ হইব। হই তাহাতে ক্ষতি নাই—যে দাবানল মৃত পত্রস্তূপ ও লতাজালকে পুড়াইয়া বনকে নূতন জীবনীরসে অভিষিক্ত করে, তাহারই মুখে বহু তরুণ তরুকেও আত্মাহুতি দিতে হয়। বাংলারও আগুনে বহু জীবন্ত প্রাণ হয়তো অকালে বিনষ্ট হইবে; তাহার ধোঁয়ায় বহু ছুঁচা হয়তো অকালে কানা হইয়া যাইবে। যায় যাক, তাহার জন্য দুঃখ করিব না, শুধু যাহারা সেই দহন সহিয়া বাঁচিয়া থাকিবে তাহারা যেন খাঁটি সোনা হইয়া বাঁচে; যাহারা সেই দহনের পরে জন্ম লইবে তাহারা যেন মাথার উপরে উন্মুক্ত আকাশ ও স্বচ্ছ রৌদ্রালোকই দেখিতে পায়, যেন নির্ব্বিঘ্নে নির্দ্বিধায় সুস্থ জীবন লইয়া বাঁচিতে পারে, বাড়িতে পারে; যে বিষলতার জাল সমস্ত বনানীর ঊর্দ্ধগতিকে এতকাল আচ্ছন্ন করিয়া মূর্ছাহত করিয়া রাখিয়াছে, সে যেন আর তাহাদের ঘিরিয়া বাড়িতে না পারে তাহার মূল ও বীজ দাবানলে ভস্মীভূত হইয়া যাক, তাহার চিতাভস্মে ভবিষ্যতের তরুণ তরুর জন্য বলপ্রদ সারের সংস্থান হোক।

* * * *

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আঘাতে আঘাতে যুগে যুগে জীব বিবর্তনের পথে অগ্রসর হয় কীটজন্ম হইতে মনুষ্যজন্মে উত্তীর্ণ একদিনে হইব না জানি। কিন্তু লালাস্রাবী সরীসৃপ-জন্ম হইতে যদি নখদন্তশালী সারমেয় জন্মেও আমাদের উত্তীর্ণ হইবার আশা থাকে, তবে সেই বিপর্যয়কে মঙ্গলময় ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া সাগ্রহে বরণ করিব।

টাউন হলে যে বিদ্যুচ্চমকের ক্ষণিকস্ফুরণ হইয়াছে, সে সত্যই আমাদের বহুকাঙ্ক্ষিত বজ্র-বৃষ্টির অগ্রদূত হোক, ইহার বড় কামনা আমাদের আর কিছু থাকিতে পারে না।



দ্বিতীয় মহাসমর

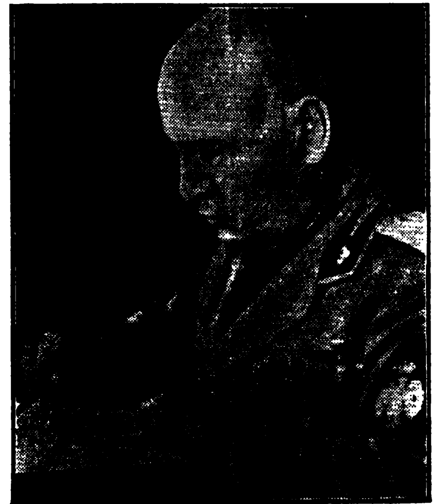
শ্রী ফণীভূষণ রায়

আজ ইউরোপে মহাসমরের আর এক অধ্যায় সুরু হইয়াছে। এই অধ্যায়ে—বিভিন্ন রাজ্যের পুনরায় উত্থান ও পতন। ১৯১৯ খৃঃ অব্দের ২৮শে জুন ভার্শাই সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হয় এবং ১৯৩৯ খৃঃ অব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর পশ্চিম ইউরোপে পুনরায় মহাসমর সুরু হইয়াছে। যে সকল জাতি গত মহাযুদ্ধে যোগ দিয়াছিল, তাহারাই আবার বর্ত্তমান যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইউরোপে এই বিশ বৎসর একটি যুদ্ধ বিরতির কাল মাত্র।



* * * *

গত মহাযুদ্ধ শেষ হইবার কিছুকাল পরে, ১৯১৮ খৃঃ অব্দের নভেম্বর মাসে জার্ম্মাণী যখন আত্মসমর্পণ করিল, প্রেসিডেণ্ট উইলসন বলিয়াছিলেন—"সশস্ত্র সাম্রাজ্যবাদের অবসান হইয়াছে।" কিন্তু সেদিন প্রেসিডেণ্ট ভুল করিয়াছিলেন। গত বিশবৎসরব্যাপী শান্তির মধ্যেও অনেক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সত্য কথা এই যে ভার্সাই সন্ধির সময় মিত্র পক্ষ প্রকৃত শান্তির জন্য প্রস্তুত ছিল না, এবং সে আদর্শে তাহারা অনুপ্রাণিতও হয় নাই। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে ফ্রাঙ্কো প্রুসিয়ান যুদ্ধে ফরাসীজাতির যে পরাজয় ঘটিয়াছিল ভার্সাই সন্ধি তাহারই প্রতিশোধ মাত্র। কিন্তু তখন কেহই এই নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন নাই এবং পরস্পরের প্রতি হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত এই 'শান্তি'র পরিণতি যে কিরূপ বিপজ্জনক তাহা অনেকে জানিলেও কেহ ভরসা করিয়া স্পষ্ট বলিতে পারেন নাই। ১৯১৯ খৃঃ অব্দে প্রধান শক্তি চতুষ্টয় জার্ম্মাণীর উপর এই সন্ধি চাপাইয়া দেয় এবং "হত্যাকাণ্ড আর কখনও এত ভদ্রভাবে অনুষ্ঠিত হয় নাই" এই বলিয়া জার্ম্মাণী সন্ধিপত্রে সাক্ষর করে। বর্ত্তমান যুদ্ধের বীজ ভার্সাই সন্ধিতেই রোপিত হইয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।



* * * *

১৯৩৩ খৃঃ অব্দে হিটলার জার্ম্মান চ্যান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত হইয়া পরাজিত জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "আমি মাত্র চার বৎসর সময় চাই; ইহার পর জাতি আমার সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবে—ইচ্ছা করিলে তাহারা আমাকে ক্রুশবিদ্ধ করুক।" তখন হইতেই জার্ম্মান জাতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর এবং জার্ম্মান-প্রভাব ইউরোপে বিস্তারলাভ করিতে সুরু করিয়াছে।

নাৎসীরা যখন ইউরোপে তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য আয়োজন সুরু করে সেই সময়ে দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রেট্‌বৃটেন ও ফ্রান্স তাহাদের বৈদেশিক নীতির অনুসরণে কয়েকটি ভুল করিয়া বসিল। ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে জার্ম্মাণ রাষ্ট্রদূত ডাঃ ব্রুণিংএর দাবী প্রত্যাখ্যাত হয়। কিন্তু তখন এই দাবী উপেক্ষিত হওয়ায় ভার্সাই সন্ধিতে যে ভাঙ্গন ধরে এবং এই সময় হইতে গণতন্ত্রগুলি অবস্থার যে পরিবর্ত্তন সুরু হয় তাহার প্রতিকারের কোন উপযুক্ত ব্যবস্থাই হইল না।

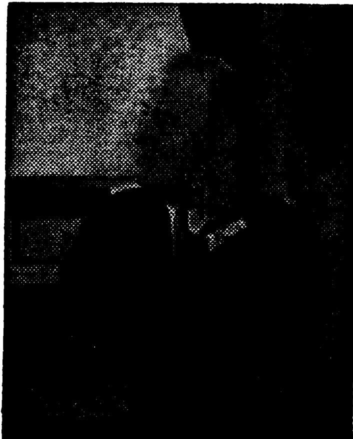


* * * *

তাহার পর সর্ব্বগ্রাসী রাষ্ট্রতন্ত্র ও হিটলারের অভ্যুদয়ে ইউরোপের রাজনীতির আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ১৯৩৬ খৃঃ অব্দে অকস্মাৎ হিটলার নিরস্ত্রীকৃত রাইন্‌ল্যাণ্ড অধিকার করিয়া ইউরোপের সম্মুখে এক নূতন সমস্যা স্থাপিত করিলেন। ফরাসীরা অবাকবিস্ময়ে এই ঘটনা প্রত্যাশা করিয়া ভবিষ্যতের জন্য কিঞ্চিৎ জ্ঞান সঞ্চয় করিল মাত্র; কিন্তু প্রতিবাদ করিল না। উৎসাহিত হইয়া হিটলার সমগ্র পৃথিবীকে পদানত করিবার স্বপ্ন দেখিলেন। ১৯৩৮ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে হিটলার রাতারাতি অষ্ট্রিয়া দখল করিয়া বসিলেন। শান্তি চুক্তির আরও কয়েকখানি পাতা বাতাসে উড়িয়া গেল। Whitehall ও Quai 'd' Orsay হইতে মৃদু প্রতিবাদ-গুঞ্জন ভাসিয়া আসিল মাত্র কিন্তু ফল কিছু হইল না।

* * * *

ইহার পর চেকোশ্লোভাকিয়ার অবসান। মিউনিকের নাট্যশালায় ইউরোপের দুর্ব্বল রাষ্ট্রগুলির শোচনীয় পরিণতির আভাস একে একে সূচিত হইল। হিটলারের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বে ইতিমধ্যে জার্ম্মাণীতে সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত হইতে লাগিল। দিবারাত্র পরিশ্রমে জার্ম্মাণী সীমান্তে সিগ্‌ফ্রীড্‌ লাইন প্রতিষ্ঠিত করিল। বহুপূর্ব্বেই লীগ্‌ অব্‌ নেশন্‌সের নাভিশ্বাস আরম্ভ হইয়াছিল; এখনও গতন্ত্রাম্ভিক রাষ্ট্রনায়কগণ সাহস সঞ্চয় করিতে পারিলেন না। জার্ম্মাণ ডিক্‌টেটারের অপ্রতিহত গতিরোধ করিবে কে? বিনা বাধায় Mussolini আবিসিনিয়া গ্রাস করিয়া বসিলেন এবং রোম বার্লিন মৈত্রীর রাস্তা ধরিয়া নাৎসী দানব ইউরোপে সগর্ব্বে বিবরণ করিতে লাগিল।



* * * *

সুদেতান অঞ্চল, মেমেল এবং শ্লোভাকিয়ার পরিণাম দেখিয়াও মিঃ চেম্বারলেন শান্তির আশা ত্যাগ করিলেন না, হিটলারকে শান্ত করিবার জন্য ব্যাকুল

হইয়া পড়িলেন। এদিকে পরপর কতকগুলি রাজ্যগ্রাস করিয়া ইউরোপের দ্বিতীয় নেপোলিয়ন শান্তির কোন প্রস্তাবেই কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করিলেন না।

* * * *

১৯৩৯ খৃঃ অব্দের ৩১শে আগষ্ট হিটলার সগর্ব্বে ঘোষণা করিয়া বসিলেন "ডানজিগ ও করিডর অঞ্চল জার্ম্মাণীর প্রয়োজন।" দুইদিনের মধ্যেই জার্ম্মাণ বাহিনী পোল্যাণ্ডে প্রবেশ করিল। এতদিনে ইংরাজ



জাতির ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। ৩রা সেপ্টেম্বরের মধ্যাহ্নে মিঃ চেম্বারলেন পৃথিবীর শত্রু হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন—দুর্ব্বল রাষ্ট্রগুলির পক্ষে তাঁহার পূর্ণ সমর্থন ও সাহায্যবাণী সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল এবং দ্বিতীয় মহাসমর সগৌরবে সুরু হইয়া গেল।

* * * *

দুই সপ্তাহের মধ্যেই জার্ম্মাণ বাহিনী পোল্যাণ্ড জয় করিয়া ফেলে এবং দ্বিতীয় মহাসমরের দ্বিতীয় অভিযানে রুষ জার্ম্মাণ মিতালী স্থাপিত হয়। ছয়মাসের মধ্যে পোল্যাণ্ড ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের সম্পূর্ণ পতন

ঘটিল। রুষ-জার্ম্মাণ অনাক্রমণ চুক্তির ফলে জার্ম্মাণী রাশিয়া হইতে অবাধে মালপত্র আমদানীর সুবিধা করিয়া লইয়াছে।

ফিন্‌ল্যাণ্ড অভিযানের ফলে রাশিয়া জার্ম্মাণীর উপর বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল; সুতরাং অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে ষ্টালিন ঘোষণা করিলেন, "রুষ জার্ম্মাণ পরস্পর মৈত্রীর সুবর্ণশৃঙ্খলে আবদ্ধ আছে।" শত্রুকে দুর্ব্বল মনে করিয়া অযথা সুলভ আত্মপ্রসাদে কোন লাভ নাই। সুতরাং একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে উত্তর ও পূর্ব্ব ইউরোপে হিটলার জয়ী হইয়াছে এবং ফিন্‌দের পতনেব পর তাহাদের সহিত রাশিয়ার চুক্তির ফলে রুষ-জার্ম্মাণ মৈত্রীই ইউরোপে আজ দৃঢ় সংস্থাপিত।

অতীতে নেপোলিয়ন ইউরোপকে রাশিয়ার জারের সহিত বাঁটিয়া লইবার চক্রান্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সংকল্প সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই বিখ্যাত ওয়াটারলুর যুদ্ধে তাঁহার সমস্ত আশা-ভরসা নির্ম্মূল হইয়া যায়। আজ মনে হইতেছে হিট্‌লারের মধ্যে সেই বিজিত নেপোলিয়নের প্রেতাত্মা যেন তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছে—কে জানে ওয়াটারলুর রণক্ষেত্রে পৌঁছিতে তাহার কত দেরী?

*　　　　*　　　　*　　　　*

৯ই এপ্রিল জার্ম্মাণ সৈন্য নরওয়ে ও ডেনমার্ক আক্রমণ করিবার পর বার্লিন হইতে ঘোষিত হইল "জার্ম্মাণ সৈন্যবাহিনী নরওয়ের নিরাপত্তা রক্ষার ভারগ্রহণ করিয়াছে।" চমৎকার অভিভাবকত্ব। ডেনমার্ক প্রতিবাদ করিল বটে কিন্তু আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। মিত্রশক্তির সহায়তায় নরওয়ে প্রথমে জার্ম্মাণসৈন্যের গতিরোধ করিয়াছিল কিন্তু জার্ম্মাণরা শীঘ্রই রাজধানী দখল করাতে মিত্রশক্তি নরওয়ে হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইল। এ কথা অনেকে মনে করেন যে নরওয়ের এই যুদ্ধে মিঃ চেম্বারলেন উপযুক্ত দূরদর্শিতা ও সাহসের সহিত সংগ্রাম পরিচালনা করিতে পারেন নাই।

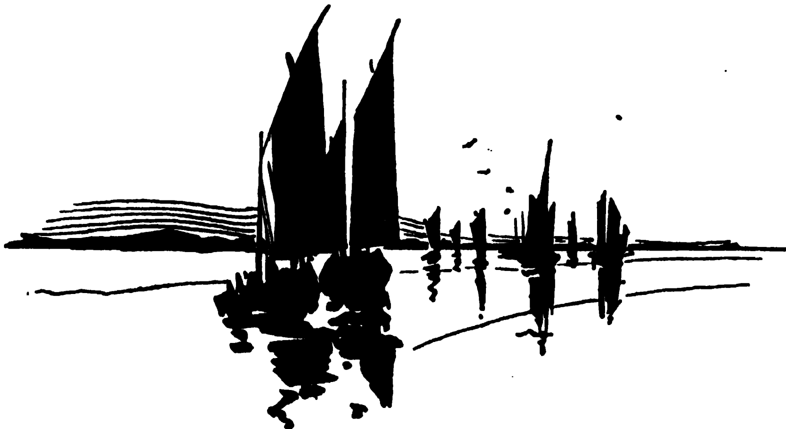
*　　　　*　　　　*　　　　*

নরওয়ে হইতে মিত্রশক্তির অপসারণে ইংরাজ জাতির সম্মান ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। অনেকের ধারণা যে নরওয়েতে জার্ম্মাণবাহিনীর জয়লাভ মিত্রশক্তির পক্ষে সত্যই অপমানকর। বিলাতে চেম্বারলেন গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হওয়াতে অচিরে মিঃ চেম্বারলেনের পদত্যাগ দাবী করা হইল। দেশের এই বিক্ষুব্ধ জনমতের বিরুদ্ধে চেম্বারলেন দাঁড়াইতে পারিলেন না। মিঃ চার্চ্চিলকে প্রধান মন্ত্রিত্বপদ ছাড়িয়া দিয়া অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা তাঁহাকে সহ্য করিতে হইল। মিঃ চেম্বারলেনের দেশ প্রেমের অভাব ছিল না। যুদ্ধ জয় করিবার প্রবল আশঙ্কা লইয়াই তিনি নামিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি জার্ম্মাণ শক্তি ও বর্ব্বরতার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহাকে পদত্যাগ করিয়া নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইয়াছে। বিলাতে মন্ত্রীমণ্ডলীর পরিবর্ত্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহাসমরের দ্বিতীয় পর্ব সুরু হইয়াছে। জার্ম্মাণী ভীষণ-ভাবে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া হল্যাণ্ড বেলজিয়ম ও ফ্রান্স আক্রমণ করিয়াছে। হল্যাণ্ড বশ্যতা স্বীকার করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে এবং এখানে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও অবশেষে বেলজিয়াম বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। প্রকাশ, যে মন্ত্রীমণ্ডলীর বিনা অনুমতিতে, নিজদায়িত্বে বেলজিয়াম-রাজ লিওপোল্ড অন্যায় এবং অবৈধভাবে রণে ভঙ্গ দিয়াছেন। অতর্কিতে সঙ্গী পরিত্যক্ত হইয়া শত্রুবেষ্টিত মিত্রশক্তি বেলজিয়মে আজ ভীষণ বিপদের সম্মুখীন। উত্তর ফ্রান্সেও মিত্রশক্তিকে অত্যন্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়িতে হইতেছে। জার্ম্মাণবাহিনী নির্ব্বিঘ্নে চ্যানেলের বন্দর গুলিতে সৈন্য

প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইংলণ্ড হইতে মাত্র ২৫।৩০ মাইল দূরে এখন অবস্থিত। মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধের পরিস্থিতি এখন যেরূপ সঙ্কটাপন্ন তাহাতে আরও বহু অর্থক্ষয় এবং ধনক্ষয় হইবার পূর্ব্বে অবস্থার উন্নতি হইবার কোনও আশা নাই। ইটালী আজও রণাঙ্গনের বাহিরে, তবে যে কোন মুহূর্ত্তে যোগদান করিতে পারে; সম্ভবত কোনো একপক্ষে জয়ের আশা সুনিশ্চিত মনে হইলেই মুসোলিনী বিনা দ্বিধায় সেই পক্ষে যোগদান করিয়া বসিবেন। আমেরিকাও এখন যুদ্ধ-ব্যাপারে লিপ্ত হয় নাই, তবে তাহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি মিত্রশক্তির পক্ষে বলিয়া প্রকাশ। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক, এবং বিগত মহাযুদ্ধের ন্যায় আমেরিকাও অবশেষে ইংরাজের পক্ষ গ্রহণ করিবে কি না, কে বলিতে পারে?

* * * *

যুদ্ধের বর্ত্তমান যে অবস্থা তাহাতে যুদ্ধের শেষে কি ফলাফল দাঁড়াইবে তাহা বলা কঠিন, তবে ইহা সুনিশ্চিত যে নাৎসী বর্ব্বরতা হইতে নিজেকে এবং পৃথিবীর সভ্যতাকে রক্ষা করিতে হইলে মিত্রশক্তিকে যথাসর্ব্বস্ব তুচ্ছ করিয়াও লড়িতে হইবে—যত দিন না জগতে আবার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য সেইভাবেই মিত্রশক্তি আত্মনিয়োগ করিয়াছে এবং বিগত মহাযুদ্ধের স্বনামধন্য জেনারেল ওয়াগাঁ আজ সম্মিলিত মিত্রশক্তির অধিনায়ক। যুগে-যুগে বিগতকালে যে অসীম বীরত্বের পরিচয় দিয়া মিত্রশক্তি আজ সকলের শ্রদ্ধার পাত্র, অজিকার এই ঘোর দুর্দিনেও তাহার ব্যতিক্রম হইবে না, ইহাই আশা করি।



লজ্জাহারী ভগবান্

অংশুলা দাশ

—শুন্‌ছ, তেল এক-ফোঁটা নেই যে ! তখন শীতকালের রাত্রির প্রায় দেড় প্রহর। প্রচণ্ড শীত পড়িয়াছে। সেই শীতের প্রকোপ এড়াইতে ভূপেন ঘরে ছিল ঘরের জানালা দরজা ভেজাইয়া দিয়া এবং গায়ের গরম কাপড় মুড়ি দিয়া শরীর বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছে—শীতবোধ একটুও নাই—আরামে ভূপেনের চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আছে। এমন সময় স্ত্রীর গলার আওয়াজ পাইয়া ধড়্‌ফড় করিয়া বাহির হইয়া সে বারান্দায় আসিল ; বলিল, —কিছু বল্‌ছ আমাকে ?

মল্লিকা বলিল,—বল্‌ছিই ত' ! তেল নেই এক ফোঁটা।

এত রাত্রে, রান্না যখন প্রায় শেষ তখন, রান্নার একটি প্রধান উপকরণ যে তেল তাহাই নাই বলিতে মল্লিকার লজ্জিত হওয়া উচিত ; কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে বুঝা গেল, লজ্জিত সে হয় নাই।

ভূপেন ভারি ব্যস্ত হইয়া উঠিল : "যাই, নিয়ে আসি,"···

—তুমি যাবে, আস্‌বে, দোকানে খানিক্ দাঁড়িয়ে থাক্‌বে, দোকানী দিতে দেরী করবে—ততক্ষণ আমি উনুনে কড়া চাপিয়ে বসে থাকি !

শুনিয়া ভূপেন মারাত্মক লজ্জায় অত্যন্ত লাল হইয়া উঠিল, যেন এতগুলি গুরুতর অপরাধ তারই !

মল্লিকা বলিল,—দাঁড়িয়ে থাক্‌লেই কাজ হবে না কি ! যাও, দৌড়ে গিয়ে নিয়ে এস তু'পয়সার তেল।

ও-ঘরের বারান্দায় স্ত্রী যেখানে অন্ধকারে দণ্ডায়মান সেই দিকে চাহিয়া ভূপেন ভয়ে ভয়ে বলিল, —"পয়সা···

উত্তর আসিল,—পয়সা আমি আঁচলে বেঁধে বসে' আছি কি না, তুমি চাইলে আর দিয়ে দিলাম !

কিন্তু ভূপেনের ধারণা পয়সা চাই-ই ; বলিল,—"তা' হ'লে চাবিটা দাও"···

—হ্যাঁ, চাবি দিই, বাক্স খোলা, পয়সা হাতড়াও—ততক্ষণে ওদিকে আমার আঁচ জল হ'য়ে যাক্। ধারেই না হয় নিয়ে এস তু' পয়সার তেল—দৌড়ে যাও···

কিন্তু বিড়ম্বনাও কি এত ! পয়সার দরকার না-ই বা হইল—কিন্তু তৈলের আধার না পাইলে ত' তৈল আনা অসম্ভবই !

"একটা বাটি কি বোতল"···

ভূপেনের কণ্ঠ অত্যন্ত কাতর।

মল্লিকা এবার আরো রাগিয়া উঠিল ; বলিল,—কত যে তোমার চাওয়া ! তোমার চাওয়ার যোগান্ দিতে দিতেই ওদিকে আমার তেলের দরকারই বুঝি ফুরিয়ে গেল !

ভূপেন গুটিগুটি অগ্রসর হইয়া ততক্ষণে মল্লিকার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে—

"এই যে পেয়েছি"। বলিয়া মল্লিকার পায়ের কাছেই যে কাঁসার বৃহৎ বাটিটা পড়িয়া ছিল, সেইটাই তুলিয়া লইয়া ভূপেন দৌড়াইয়া বাহির হইয়া গেল।

হাজার গুরুতর প্রয়োজনেও জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে ভূপেনের মুখে কথা ফোটে না।

ভূপেন পৌঁছিয়া দেখিল, দোকানী সে-রাত্রির মত দোকান বন্ধ করিতেছে। ঝাঁপ ফেলা হইয়াছে। ভূপেন নিঃশব্দে দেখিতে লাগিল, দোকানী টিনের ঝাঁপের ছিদ্রের ভিতর শিকল গলাইয়া তাহাকে খুঁটির সঙ্গে মজবুত করিয়া জড়াইল। শিকলের দুই প্রান্তে দুটি কড়া ছিল—দুই প্রান্ত একত্র করিয়া কড়ায় তালা ঝুলাইয়া দিল—তালায় চাবি পরাইল···

দোকানীর চলিয়া যাইতে আর বিলম্ব নাই; ওদিকে মল্লিকা তেলের প্রত্যাশায় বসিয়া আছে··· কিন্তু ভূপেন তেল লইবার বাটি হাতে করিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া দোকানীর প্রস্থানের উদ্যোগ দেখিতেছে—তার মুখে কথা ফুটিতেছে না···

দোকানী তালায় চাবি ঘুরাইল—টানিয়া দেখিল বন্ধ হইয়াছে কি না; নামাইয়া—রাখা লণ্ঠনটা তুলিয়া লইল—এবং মুখ ফিরাইতেই তাহার চোখে পড়িল, বৃহৎ একটা কাঁসার বাটি হাতে করিয়া খরিদ্দার দাঁড়াইয়া আছে; কিন্তু খরিদ্দার কখন আসিয়াছে এবং কতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছে তাহা সে জানে না—

জিজ্ঞাসা করিল,—কি, বাবু?

বাটিটা আগাইয়া ধরিয়া ভূপেন বলিল,—তেল দু'পয়সার।

—আগে আস্‌তে হয়! চলে গেলে ত' দিতে পারতাম না! বলিয়া লণ্ঠন নামাইয়া রাখিয়া তালা আর চেনের বাঁধন খুলিতে খুলিতে দোকানী বলিতে লাগিল,—তেলের কথা মনে পড়্‌ল এখন! দোকান বন্ধ করে' যদি চলে' যেতাম! আপনাকে দৌড়তে হ'ত সে-ই বাজারে। আস্‌তে যেতেই রাত দু'পুর হ'য়ে যেত'। যেত' না?

শুনিয়া ভূপেন অসময়ে তৈলাভাবের কথা মনে পড়ার এবং অন্যান্য প্রকারের সমস্ত ত্রুটি অপরাধ নিজের স্কন্ধে লইয়া সলজ্জভাবে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল···

—এই নিন্।

ভূপেন হাত বাড়াইয়া তেলের বাটিটা লইল; কিন্তু সাধ্য হইল না যে বলে, পয়সা সে আনে নাই—দাম বাকি থাকিবে, অথচ নিঃশব্দে চলিয়া আসাও চলে না। এ-সঙ্কটে উত্তীর্ণ হইবার কোন উপায় না দেখিয়া ভূপেন আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল···

দোকানী লণ্ঠন লইয়া নামিয়াই বলিয়া উঠিল,—ও; দাঁড়িয়েই আছেন—পয়সা দেবেন বুঝি?

পয়সা ভূপেন এখনই দিবে না; অস্বীকার করিতে যাইয়া সে দিশাহারার মত দাঁড়াইয়া রহিল!

গোবর্দ্ধন ভূপেনকে ভাল করিয়াই চেনে—তাহার মুখের দিকে চাহিয়া গোবর্দ্ধন হাসিয়া ফেলিল; বলিল,—নেই বুঝি? আচ্ছা, দেবেন কাল; যান্ এখন।

গোবর্দ্ধনের এই কথায়, অর্থাৎ গোবর্দ্ধন যাইবার অনুমতি দিলে, ভূপেনের গায়ের ঘাম বন্ধ হইল এবং পা নড়িল।

দু'পয়সার তেল সমেত বৃহৎ কাঁসার বাটিটা হাতে করিয়া ফিরিবার সময় পথে ভূপেনের বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। পথে লোক চলাচল তখনো একেবারে বন্ধ হইয়া যায় নাই; সুতরাং আলাপী

লোকের সঙ্গে দৈবাৎ দেখা হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়। আলাপী লোককেই তার যত ভয়…আলাপী লোক কি প্রশ্ন করিয়া বসিবে তার ঠিক্ নাই, আর তার জবাব সে কি দিবে!

কিন্তু ঠিক্ এই মুহূর্ত্তে তার ভাগ্য তার অনুকূলেই ছিল—আলাপী কাহারো সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার বিপদ তার ঘটিল না। কিন্তু সারাপথ সে নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রম করিয়া চমকিয়া উঠিল বাড়ীর দরজায় আসিয়া—চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কে?

তৎক্ষণাৎ বক্র কণ্ঠে উত্তর আসিল,—কে আবার! আমি মল্লিকামালা। তেলের ভেতর তলিয়ে গেছ কি না দেখ্‌তে যাচ্ছিলাম। এত দেরী দু'পয়সার তেল আন্‌তে! সের খানেক্ আন্‌তে হ'লে পোষের রাত পুইয়ে যেত'।

তেল যত বেশী, আনিতে দেরী হইবে তত বেশী, অর্থাৎ সেই অনুপাতে, ইহা লইয়া তর্ক করা যায়; কিন্তু ভূপেনের তা' ঘুণাক্ষরেও মনে হইল না—বিলম্বের দরুণ অপরাধের লজ্জায় সে মাথা নামাইয়া রহিল…

তাহার হাত হইতে তেলের বাটি টানিয়া লইয়া মল্লিকামালা রান্নাঘরের দিকে ছুটিল।

এই ভাবেই ওদের দিন চলে। এই দম্পতির জীবনে সুখ নাই বলিলে ভালোমানুষ ভূপেনকে অস্বীকার করা হয়; দুঃখ নাই বলিলে আন্‌মনা মল্লিকাকে বাদ দিতে হয়; কিন্তু অস্বীকার করা জবানে চলে জীবনে চলে না। ভূপেন আছে তাহা সে নিজেও অস্বীকার করে না; কিন্তু সে মাথা তুলিয়া থাকিতে পারে না—সে চেষ্টাও তার নাই; আর সেইটাই দাঁড়ায় তাহার পক্ষে সব চাইতে দুস্তর মুস্কিল! লোকে তাহার দিকে চাহিয়া কি অপরূপ বস্তু দেখে! ডাকিয়া দাঁড় করাইয়া তাহার কাছে লোকে অত কথা কেন জানিতে চায়!

বিবাহের কিছুদিন পরে ভূপেনের বড় শ্যালিকা বকুলমালা ভূপেনকে একখানি পত্র লিখিয়াছিল; তাহার ভাষা এইরূপ:

"ঘোষ মহাশয়, আমার ভগিনীটিকে আপনার পছন্দ হইয়াছে তো? সে অবলা সরলা কোমলা লতিকা; সে আপনার দেহ আশ্রয় করিয়াছে। তাহাকে যত্ন করিবেন—তাহা হইলেই সে আপনাকে সুন্দর সুন্দর পুষ্প উপহার দিবে"——

এ পর্য্যন্ত ভূপেন সহ্য করিতে পারিয়াছিল—'পছন্দ', 'লতিকা' 'উপহার', 'দেহ', 'পুষ্প' প্রভৃতি শব্দগুলি যতই লজ্জাকর হউক, ভূপেনকে তাহারা ঘরছাড়া করিতে পারে নাই; কিন্তু আঘাতে আঘাতে তাহার আসন টলিয়াছিল নিশ্চয়ই…

কাজেই চিঠির নীচেকার ছবিখানার দিকে এক পলক চাহিয়াই সে দাঁতে জিব্ কাটিয়া আপনাকে আর সম্বরণ করিতে পারিল না—ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল…

এ লজ্জা সে কোথায় রাখিবে, কি করিলে এই চিঠির স্মৃতি একেবারে মুছিয়া ফেলা যায়, উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে ঘণ্টা দুই মাঠে মাঠে বেড়াইয়াও তাহা স্থির করিতে পারা গেল না…

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বংশী ভূতলে রাখিয়া আর শিখিচূড়া বামে হেলাইয়া অভিমানিনী রাধার পদযুগল

দুই হস্তে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন—

জার্ম্মাণীতে প্রস্তুত এই জলছবি অবোধ বকুলমালা চিঠির কাগজে তুলিয়া দিয়াছে—উদ্দেশ্য এই যে, ভগিনীপতি 'ঘোষ মহাশয়' ছবিদৃষ্টে প্রণয় রীতি শিক্ষা করিবেন। মল্লিকা সে চিঠি আগেই পড়িয়াছিল; ছবিও সে না দেখিয়াছে এমন নয়—তাহার নামীয় চিঠির ভিতরেই বকুলের লেখা ঐ পদধারণের ছবিওয়ালা চিঠি ছিল।

ভূপেন ছবির কথা কিছুতেই ভুলিতে না পারিয়া অধোমুখে বাড়ীতে ফিরিলে মল্লিকামালা তাহাকে কাছে ডাকিয়া হাসিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, দিদির চিঠি পড়্‌লে?

"যা!" বলিয়া ভুপেন একটিবার মাত্র কৌতুকময়ীর দিকে মুখ তুলিয়া সেই যে মুখ হেঁট করিয়া ফেলিল, তারপর ঘণ্টা দশেক সে মল্লিকার দিকে ভাল করিয়া তাকাইতেই পারিল না...

রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে ভূপেন দু'ধারের বাড়ীগুলি ববাবর একবার দৃষ্টি চালাইয়া লয়—কোনো বাড়ীর দুয়ারে কি বারান্দায় লোক আছে কি না!—থাকিলে সে থম্‌কিয়া যায়, বুক ভারি দুরুদুরু করে···

ব্রজেন্দ্রভূষণের বাড়ীটাই তার প্রধান বিভীষিকা—সেখানে কি মধু আছে কে জানে, অষ্টপ্রহর ব্রজেন্দ্রভূষণের বাহির বারান্দায় ইয়ার লোকের ভন্‌ভনানির অন্ত নাই···

কালীপদ ঘোষের বাড়ীর পিছন দিয়া যে অপরিষ্কার পথটা আছে, সেই পথ দিয়া তিনটা নর্দ্দামা ডিঙাইয়া, দু'টি ছাই-গাদা এড়াইয়া এবং দুই স্থানে হাঁটু-সমান উচ্চ আগাছার জঙ্গল পার হইয়া ভূপেন পুনরায় সদর রাস্তায় ওঠে। ঐ উপায়ে লোকের দৃষ্টি পরিহার করিবার জো দৈবাৎ না পাইলে ভূপেন বাঁদিকের মানুষগুলির দিকে মুখ ফিরাইয়া রাস্তার ডা'ন ধার ঘেষিয়া কাটাইয়া উঠিবার চেষ্টা করে··· কোনোদিন কৃতকার্য্য হয়, নির্ব্বিঘ্নে পার হইয়া যায়—

কোনদিন কেউ হয়তো দেখিয়া ফেলে; দুষ্টামি করিয়া বলে,—ভূপেনবাবু, উঠে আসুন্; ড্রেণে পড়্‌লেন যে গিয়ে!

ভূপেন বোধ হয় ড্রেণে পড়িত না; কিন্তু তাহাকেই সম্বোধন করিয়া মানুষের গলায় বিদ্রূপাত্মক শব্দ হইতেই তার দু'খানা পা-ই কাঁপিয়া একখানা পায়ের স্থিতি ছাড়িয়া যায়—সেখানা হড়্‌কাইয়া ড্রেণে যাইয়াই পড়ে।

কিন্তু এ-সবও তুচ্ছ—

একদিন যা' বিপদ ঘটিয়াছিল তাহার তুলনা নাই—

শ্যামাপদ আর বৈদ্যনাথ বৈদ্যনাথের বাহিরের বারান্দায় পা ঝুলাইয়া বসিয়া ছিল···ভূপেনকে আসিতে দেখিয়াই তাহারা চুপিচুপি কি-একটা পরামর্শ আঁটিয়া ভূপেনের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল···

ভূপেন সাম্‌নে আসিতেই শ্যামাপদ জিজ্ঞাসা করিল;—ভূপেন, ভাল আছ?

ভূপেন থতমত খাইয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল—তারপর মুখ তুলিল···

শ্যামাপদ দেখিল, প্রশ্নের জবাব দিবার প্রয়াসের দরুণ ভূপেনের ঠোঁট কাঁপিতেছে···

হাসিতে হাসিতে শ্যামাপদ আবার জিজ্ঞাসা করিল,—জিজ্ঞাসা করছি, ভলো আছ ত' বেশ ?

ভূপেন এবার কথা কহিল ; চোখ নামাইয়া বলিল,—ভালো আছি।

এ সব প্রশ্ন অচল নহে, স্বাভাবিক ; কিন্তু শ্যামাপদর মনে করুণা বিন্দুমাত্র নাই ; একটি প্রশ্নের জবাব পাইয়া নিষ্ঠুর দ্বিতীয়বার যে প্রশ্ন করিয়া বসিল তাহা সাঙ্ঘাতিক—

জানিতে চাহিল বৌ ভাল আছে ? অসহ্য লজ্জায় সমস্ত রক্ত মুখে উঠিয়া ভূপেনের যেন চৈতন্য লুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল...

বৈদ্যনাথ বলিল,—এই রে মূর্চ্ছো যায় বুঝি ! যাও, ভাই, তুমি—তোমাকে আমরা কিছু বলিনি।

ভুপেন তখন বাজারে যাইতেছিল—শ্যামাপদ প্রভৃতির অত্যাচারে মাথার গোলমাল হইয়া বাজারের কথা ভুলিয়া যাইয়া ফিরিয়া আসিল বাড়ীর দুয়ারেই ; কিন্তু সেখানেও বিপদ—যম ছিল সন্নিকটেই—প্রশ্ন করিল, বাজার কই ?

একটা অস্পষ্ট আওয়াজ কি আসিল বুঝা গেল না—কেবল মুখের আধখানা দেখা গেল, তাহা অপূর্ব্ব লজ্জায় লাল...

মল্লিকা ডাকিল,—শোনো, ব্যাপার কি ?

কিন্তু ততক্ষণে ভুপেন পুনরায় দরজার বাহিরে চলিয়া আসিয়াছে—ডাক শুনিয়া সে পলায়ন করিল।

বাজারের যাবতীয় লোকের সে চেনা—চিরদিন সে আটপৌরে ; উড়ুনি সে কয়েকবার নিরুদ্দিষ্ট স্থানে ফেলিয়া আসায় মল্লিকা তাহাকে আর উড়ুনি লইতে দেয় না ; কোটের হাতায় আল্‌গা বোতামের দরকার হয় না বলিয়া মল্লিকা সার্ট ছাড়াইয়া কোটের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে ; দাড়ি বাড়িলে মল্লিকা ধম্‌কাইতে থাকে—না কামানো পর্য্যন্ত স্বস্তি দেয় না...

কিন্তু এ সব অন্দরের কথা—বাহিরের লোকে দেখে গৌরাভ বর্ণ, আয়ত চক্ষু, দীর্ঘ নাতিস্থূল দেহ, পরিচ্ছন্ন ধুতি জামা ; কিন্তু কাছা এমন ঢিলা যে, বাতাস বহিলে পালের মত ফুলিয়া উড়িতে থাকে ; ডান হাতের আঙুলগুলি মাঝে মাঝে অকারণেই কাঁপে, কিন্তু অলস ধনুর মত ভুরু দুটি স্থির—তারা বিস্ময়ে উচ্ছ্রিত হয় না, বিরক্তিভরে কুঞ্চিত হয় না, ভূপেন নিঃশব্দ জড়সড় লোক।—মানুষের সামনে তার কুণ্ঠা আর বিপন্ন কাতরতা দেখিয়া বাজারের লোক দু পাঁচ দিন হাসাহাসি করিয়া হাসা এখন ছাড়িয়া দিয়াছে, ওজন লইয়া কষাকষি নাই, দর লইয়া বিতণ্ডা নাই, বাছাবাছি লইয়া হাত কাড়াকাড়ি নাই—যা' দাও তা'ই সই ; দোকানীরা দেখিয়া দেখিয়া তাহাকে দরে ওজনে ঠকানো ছাড়িয়া দিয়াছে। বাছিয়া বাছিয়া ভালো জিনিষই দেয়। বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করিয়া বলে,—বাবু আসুন।

—ভূপেন, ভাই, দেখো ; আমি চল্‌লাম।—বলিয়া ভূপেনের সহকর্ম্মী প্রভাত কাঁধে ছাতা ফেলিয়া চলিয়া যায়। তাহার কাজ দেখিতে দেখিতে ভূপেনের পাঁচটার স্থানে সাতটা বাজিয়া যায়।

কিন্তু তার স্ত্রীভাগ্য অপ্রসন্ন নয়। মল্লিকা একটু ভুলো-মনের লোক—কড়াই উনানে চাপাইয়া তার তেলের কথা মনে পড়ে ; সেজন্য ভূপেনকে বিপন্ন হইতে না হইলেও সময় সময় বিশেষ বিব্রত হইতে হয়।

মল্লিকা বলে,—তেমন হুজ্জুতে হ্যাঙ্গামে লোক হলে ধমক্ খেয়ে মরতে হ'ত। কিচ্ছুটি বলে না,

এত যে আমার কাজে ভুল !

বনফুল ভূপেনের গল্প শুনিয়াছে—

হাসিয়া বলে,—আমি হ'লে ত' ভাই, হেসেই মারা যেতাম।

মল্লিকা ব্যথিত হয়; বলে—লোকে ঠাট্টা তামাসা করে—ভেবে বড় কষ্ট হয়।

বনফুল তার হাত ধরিয়া বলে,—আমায় ক্ষমা কর, ভাই।

ভূপেন একদিন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইয়া অভুক্তই ফিরিয়া আসিয়াছিল, নিজের মনঃকষ্টের কারণের দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহারই উল্লেখ করিয়া মল্লিকা বলে,—আমিই ঠেলেঠুলে' পাঠিয়েছিলাম ; যেতে কি চায় !···তার পরদিন ছিল একাদশী—একাদশী করে কি না—সকালবেলা উঠে বল্‌লে, "আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে।" আমি বল্‌লাম, "রেতে ভোজ খেয়ে এসে রাত না পোয়াতেই ক্ষিদে। চোঁয়া ঢেকুর উঠ্‌ছে বলো !"—বল্‌তে না বল্‌তে সেই বাড়ীর ঝি এসে হাজির···

আমি বল্‌লাম, "কি, কি ?"

কি বল্‌ল, বৌঠাকরুণ, আমাদের দাদাবাবু কত যে আপ্‌শোষ কর্‌ছে···

—কেন ?

কি বল্‌ল, "এই বাবু যে কা'ল না-খেয়েই চলে' এসেছে গো ! বাবু গোলমালে দেখ্‌তে পায়নি' মনেও পড়েনি'···আজ সকালে উঠে' বাবু বল্‌ল, কা'ল ভূপেনকে দেখিনি' ত' !···ঝি বল্‌ল, "আমি বল্‌লাম, এসেছিল ত' সে বাবু ! আমি দেখেছি তেনাকে আমড়াতলায় দাঁড়িয়ে থাক্‌তে !—আমার কথা শুনে' বাবুর আর গিন্নির হাত মাথায় উঠে গেছে"।

শুনিয়া তখন ভূপেনের কি কোথায় উঠিয়া গিয়াছিল—প্রাণ কণ্ঠে, কি চোখ কপালে—তাহা ভূপেন এখন উপস্থিত থাকিলে নিজেই প্রকাশ করিতে পারিত কি না সন্দেহ।

গল্পটি শেষ করিয়া ম্লান কণ্ঠে মল্লিকা বলিল্—এমন লাজুক !

শ্রোতৃবর্গের একজন জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি তখন কি বল্‌লে ?

মল্লিকা বলিল,—কি আর বল্‌ব' ! ঝি চলে' গেলে বল্‌লাম, তোমাকে আর আমি কিছু বল্‌ব' না ; বলে' কি লাভ ! ওদের মধ্যেই একজন বলিল,—তা' বটে।

পতিনিন্দা নিন্দনীয়—সুতরাং একই স্থানে কেন্দ্রীভূত থাকিয়া, অর্থাৎ ভূপেনকেই কেন্দ্র করিয়া, আলোচনা অতঃপর আর বেশি দূর অগ্রসর হইল না।

ভূপেন এম্‌নি ধারা···

তাহাকে খাড়া করিবার কি অটুট রাখিবার উপায় নাই—মল্লিকামালা হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে।

কিন্তু কয়েক মাস পরে একদিন বড়ো অঘটন ঘটিয়া গেল।

একদিন দেখা গেল, শ্যামাদাস, বৈদ্যনাথ, সতীশ মুখুজ্যে নং ২, কালাচাঁদ, হরিদুলাল, লক্ষ্মণ সোম প্রভৃতি উৎসাহী করদাতাগণ ভোটের তর্কে কেহ কাহাকেও চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করিতে না পারিয়া মানসিক অব্যবস্থিত অবস্থায় শরীর দিয়া রাস্তা জুড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে···

এমন সময় দেখা গেল কিছু দূরে ভূপেন আসিতেছে···

লক্ষ্মণ সোম সর্ব্বাগ্রে দেখিয়াছিল ; বলিল, ভুপেন ঘোষ আস্‌ছে।

শ্যামাপদ বলিল,—এ কি রকম হ'ল। আমাদের দেখ্‌তে পায়নি' নাকি! হন্‌হন্ করে' চলে' আস্‌ছে!

সতীশ মুখুজ্যে বলিল,—মাথা তুলে' সাম্‌নের দিকে চেয়ে বেশ সোজা চলে' আস্‌ছে! ব্যাপারখানা কি!

"দেখাই যাক্।" বলিয়া সবাই সাগ্রহে ভুপেনের দিকে চাহিয়া রহিল···

ভুপেনও দূর হইতে দেখিল, সকলেই তাহার দিকে চাহিয়া আছে, আর ফিক্‌ফিক্ করিয়া হাসিতেছে—কিন্তু আজ সে থামিল না—নির্ভয়ে সে নিকটবর্ত্তী হইল···

ভুপেন নিকটবর্ত্তী হইতেই ষড়ানন জিজ্ঞাসা করিল,—ভুপেন, কোথায় চলেছ?

প্রশ্ন করিয়া সে এবং অন্যান্য সবাই উদ্‌গ্রীব হইল— ভুপেন কেবল চম্‌কিয়া উঠিবে, না লাফাইয়াও উঠিবে!

কিন্তু কিছুই ঘটিল না—ভুপেন লজ্জা পাইল না, চমকিয়া উঠিল না, থমকিয়া দাঁড়াইল না, পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিল না—স্পষ্ট ভাষায় জানিতে চাহিল,—খাঁটি দুধ কোথায় পাওয়া যায় জানো কেউ ?

লক্ষ্মণ সোম বলিল,—চলো, আমি স্থান দেখিয়ে দিচ্ছি গিয়ে। কিন্তু কেন বলো' ত'?

—ছেলে খাবে।

—কবে হ'ল ছেলে?

—পর্‌শু। এস, ভাই, একটু তাড়াতাড়ি। বলিয়া ভুপেন ব্যূহের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া গেল···

তার সঙ্গে কেহ অবশ্য গেল না ; পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া ওরা অবাক্ হইয়া গেল!





সম্পাদকীয়

২৫শে বৈশাখ

গত পঁচিশে বৈশাখ কবি রবীন্দ্রনাথ অশীতিতম বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। যে সকল মনীষী যুগে যুগে আসিয়া ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাই পঁচিশে বৈশাখ বিশেষ করিয়া দুঃস্থ, স্বল্পপ্রাণ বাঙ্গালীর পক্ষে—বিশেষ আনন্দের দিন। জাতীয় সম্পদ বাঙ্গালীর এখন আর খুব অল্পই অবশিষ্ট আছে; এই দুর্দিনে যে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে নিঃশেষ করিয়া জাতির বহির্লোক ও অন্তর্লোক আলোকিত করিতেছেন ইহা আমাদের সৌভাগ্যের কথা। স্বীয় প্রতিভায় কবি জাতিকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলুন ইহাই প্রার্থনা।

যুদ্ধের নূতন পরিস্থিতি

গত মাসের প্রধান আলোচ্য বিষয় বর্ত্তমান মহাসমরের দ্বিতীয় অধ্যায়। যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া জার্ম্মাণী এবার ইউরোপের পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অবশ্য যুদ্ধমাত্রই ভয়াবহ, কিন্তু অল্প কয়েক দিনেই হতাহতের যে সংখ্যা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে স্তম্ভিত হইতে হয়। সমূলে নিঃশেষ না করিয়া অথবা নিজে নিঃশেষিত না হইয়া জার্ম্মাণী অথবা মিত্রপক্ষ কেহই রণে ক্ষান্ত হইবেন না বলিয়া আশঙ্কা হয়। জার্ম্মাণীর পরাক্রম বিস্ময়কর সন্দেহ নাই কিন্তু এই শক্তি জয়লাভ করিলে জগতে কোনও উন্নততর সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া আশা করিতে পারিনা; সুতরাং চমকপ্রদ হইলেও, আমাদের কাছে এই শক্তির কোনও সার্থকতা নাই।

যেভাবে যুদ্ধ চলিতেছে তাহাতে অনেকে মনে করেন যে অদূর ভবিষ্যতে, চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হইলেও বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলাফল শীঘ্রই অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে। যে সকল গুণ থাকিলে নিদারুণ বিপদেও নিজের শক্তি ও বিশ্বাস অটুট রাখিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারা যায়, সে সকল গুণের অভাব মিত্রশক্তির নাই। একথা সুনিশ্চিত যে তাহারই পরিচয় দিয়া মিত্রশক্তি জগতে শান্তি ও সভ্যতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবেন।

বর্ত্তমান যুদ্ধ ও ভারতবর্ষের দায়িত্ব

বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতবর্ষের কি দায়িত্ব এবং কি উপায়ে ভারতবর্ষ মিত্রশক্তিকে সাহায্য করিতে পারে, সে সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইতেছে। যে অবস্থায় কোনও জাতির পক্ষে দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া

অপরের সহায়তা করা সম্ভব, দুর্ভাগ্যবশতঃ সে অবস্থায় ভারতবর্ষ এখনো আসে নাই। ভারতবর্ষের সহায়তার যে কোনও মূল্য অথবা প্রয়োজন তাঁহাদের থাকিতে পারে একথা ইংরাজ পূর্ব্বে ভাবিতে চাহেন নাই। ইহা তাঁহাদেরও দুর্ভাগ্য এবং আমাদেরও।

তবে, উপস্থিত যাহাতে আমরা উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারি এবং সময়ে আত্ম-রক্ষায়—এবং প্রয়োজন হইলে, অপরের সহায়তায় সমর্থ হই, সে বিষয়ে বৃটিশ গর্ভমেণ্ট আমাদিগকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সংসারের পাকচক্রে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ভারতবাসী এখন সন্দিহান; সুতরাং এই প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে আমাদের নেতাদের মধ্যেও অনেক দ্বিধা ও সংশয় জাগিতেছে। অবশ্য এ বিষয়ে কংগ্রেসের মতই বলবান এবং স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীও একটি বিবৃতি দিয়াছেন। ইংরাজের এই বিপদে বিরোধিতা করিবার মতন উৎসাহ তাঁহার নাই কিন্তু এমন মতেরও অভাব নাই—যে এই সুযোগে সভাসমিতিতে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করিয়া এবং সাধ্যমত চেয়ার টেবিল ছুঁড়িয়া রাজশক্তিকে দ্বৈরথযুদ্ধে আহ্বান করিলেই ফল সুনিশ্চিত! এখন কোন পথে দেশ যাইবে তাহা দেশ-নেতারাই জানেন, তবে অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তি মনে করেন যে এখন স্ব স্ব প্রদেশে মন্ত্রীত্বভার কংগ্রেস নিজহাতে গ্রহণ করিবার কোনও উপায় থাকিলে ক্ষতির অপেক্ষা লাভের সম্ভাবনাই অধিক।

ফুটবল দ্বন্দ্ব

আই-এফ-এ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত মোহামেডান স্পোর্টিং দলের একটি আপোষ-মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। আই-এফ-এর মর্য্যাদা যে ক্ষুন্ন হয় নাই এবং মোহামেডান স্পোর্টিং আবার খেলায় যোগদান করিতে পারিয়াছেন, ইহা সুখের কথা। আরও সুখের কথা এই, যে, এই ব্যাপারে শেষ অবধি বাঙ্গালা-সরকারকে হস্তক্ষেপ করিতে হয় নাই। অবশ্য এই ব্যাপারে বাঙ্গলা সরকারের হস্তক্ষেপ কি ভাবে এবং সত্যসত্যই কতদূর প্রয়োজন ছিল, তাহা আমরা বলিতে পারিব না। তবে শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হইয়াছে, ইহাই দেশের বর্ত্তমান সময়ে, আহ্লাদের কথা। এখন এই শান্তি স্থায়ী হউক, ইহাই আশা করি।

মুসলিম লীগের পাকিস্থান পরিকল্পনা

অভাগা ভারতবর্ষে ঘরোয়া বিবাদের অপ্রাচুর্য্য কোনদিনই নাই। সুতরাং মুসলিম লীগের নবতম সৃষ্টি পাকিস্থান পরিকল্পনায় নূতন করিয়া আশ্চর্য্য হইবার বিষয় কিছুই নাই। ভারতবর্ষের খানিকটা অংশ আলাদা করিয়া, জঙ্গল সাফ করিয়া তাহাতে আঙ্গুরের চাষ হইবে এবং বোগদাদ হইতে বুলবুল আমদানি করা হইবে—ইহাই পাকিস্থানের ভিতরের কথা। ইহাতে হিন্দুরা ঘোরতর আপত্তি করিতেছেন এবং বহু বিশিষ্ট মুসলমান ভদ্রলোকও এই পরিকল্পনার বিরোধী। তবে কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম, সুতরাং শেষ অবধি এই হাস্যকর ব্যাপারটি কার্য্যে পরিণত করিয়া তুলিতে পারা যাইবে কি না তাহা বলা আমাদের সাধ্যাতীত। আমাদের দেশে, অনেক নেতা নাটকীয় প্রথায় বিশেষ আস্থাবান। জিন্না সাহেব রাজ-নীতি না করিয়া থিয়েটার খুলিলেই ভাল হইত।

ফ্লাউড্ কমিশন ঃ চিরস্থায়ী ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন

বাঙ্গলাদেশে ভূমিস্বত্ব-সংক্রান্ত চিরস্থায়ী ব্যবস্থার বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য গত বৎসর বাঙ্গলা সরকার একটি কমিশন স্থাপিত করেন। স্যর ফ্রান্সিস্ ফ্লাউড্ সেই কমিশনের সভাপতি। সম্প্রতি

কমিশনের এক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে অধিকাংশ সদস্যই এই চিরস্থায়ী ব্যবস্থা উঠাইয়া দিবার পক্ষপাতী; অপরপক্ষে কমিশনের দুইজন সদস্য, বর্ধমানের মহারাজা ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী স্বতন্ত্র রির্পোট দিয়াছেন।

চিরস্থায়ী ব্যবস্থার পক্ষে—এবং বিপক্ষেও অনেক কথা বলিবার আছে কিন্তু বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলার জমিদার গণ যে স্বত্ব পাইয়া আসিয়াছেন সহসা সামান্য মূল্যের বিনিময়ে, তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে তাহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত হইবে ইহা আমরা বলিতে পারিব না। তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলাদেশের কৃষককে চিরস্থায়ী ব্যবস্থার কল্যাণে, দৈন্য এবং দুর্ভিক্ষ অনেক কম ভোগ করিতে হইয়াছে। বিশেষ করিয়া, এই ব্যবস্থা লোপ পাইলে হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত ছাড়া লাভবান হইবেন না বলিয়া আশঙ্কা করি।

পরলোক

সম্প্রতি বাঙ্গলার বহু বিশিষ্ট ও কৃতী সন্তান আমরা হারাইয়াছি। জীবদ্দশায় প্রাপ্য সম্মানলাভ যাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া ওঠেনা, তাঁহাদের অবর্ত্তমানে শোক প্রকাশ করা আমাদের চিরাচরিত প্রথা। ইহাই কতকটা সান্ত্বনার বিষয়।

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ৬১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি শিক্ষিত সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং বহু বিভিন্ন ভাষা ও শাস্ত্রে তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। তাঁহার আরব্ধ "বঙ্গীয় মহাকোষ" সমাপনে সাহায্য করিয়া দেশবাসী তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান দিবে ইহাই আশা করি।

সম্প্রতি কবি নগেন্দ্রনাথ সোমের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি নির্ব্বিবাদী জনপ্রিয় এবং সকলের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন। তাঁহার "মধুস্মৃতি" কবি মাইকেল মধুসূদনের সহিত তাঁহাকেও স্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতনের শ্রীযুক্তকালীমোহন ঘোষ নীরব কর্ম্মী ছিলেন। শ্রীনিকেতনের পল্লী সংস্কার কার্য্যে তিনি আত্মনিয়োগ করেন এবং এজন্য প্রভূত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে দেশের যথেষ্ট ক্ষতি হইল।

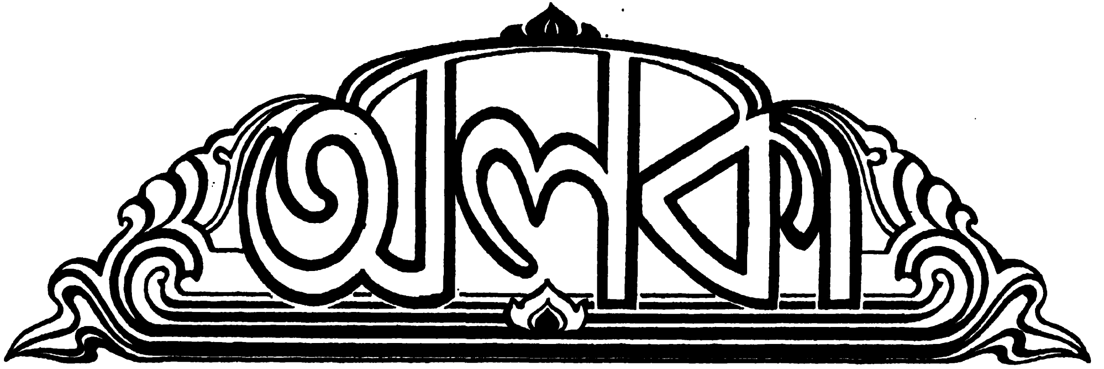
বাঙ্গলার এবং ভারতবর্ষের প্রথম সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। ইদানীং অসুস্থতা নিবন্ধন লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিলেও তিনি দেশের ও দশের ব্যবসায়ের জন্য এককালে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। বিখ্যাত হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানী —তাঁহার সহায়তায় ও বুদ্ধিকৌশলে যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ শান্তস্বভাব ও পরোপকারী ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুতে আমরা একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে হারাইয়াছি।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সরকার কর্ত্তৃক সম্পাদিত
শ্রীরূপনারায়ণ মহাপাত্র কর্ত্তৃক ৬০, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
"ভবানী প্রিন্টিং" হইতে মুদ্রিত ও ৩৬।১ এলগিন রোড্ হইতে প্রকাশিত



অবসর

শিল্পী—শ্রীঅনিলকুমার নাথ



দ্বিতীয় বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৪৭ | ১০ম সংখ্যা

দান *

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমার গ্রন্থ-দানের গ্রন্থি
বাঁধিল আমার চিত্ত,
তোমার ভক্তি ঋষির মন্ত্রে
স্মরণে রহিল নিত্য।
তব শ্রদ্ধার অমল পাত্র
ভরিয়া রহিবে দিবসরাত্র
উপনিষদের পুণ্য পদের
অমৃতবাণীর বিত্ত ॥

---

* শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসুর সৌজন্যে

সহযাত্রিণী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু

গাড়ীর দরজা ভাল করে বন্ধ করে পাশের ছুটো জানলার কাচ ফেলে দিয়ে মালতী পিঠে একটা কুশান ঠেস দিয়ে বসল। এত বড় গাড়ীতে সে একা। সব জানলা বন্ধ করে যাওয়া যায় না। যদি বর্দ্ধমানে কোন মেয়ে না ওঠে, আসানসোলেও কেউ না ওঠে, তাকে সারারাত্তি জেগে একা যেতে হবে।

মালতী টাইম টেবল খুলে দেখতে লাগল, গাড়ী কখন বর্দ্ধমান পৌছাবে। বোম্বে পৌছাতে ছু'রাত কাটাতে হবে এই ট্রেণে। কি লম্বা পাড়ি! ট্রেণগুলো একশ' দেড়শ' মাইল বেগে যায় না কেন ?

মালতী একটা নভেল খুলে বসল। রাসিয়ান উপন্যাস, সোভিয়েট রাসিয়ার শ্রমিক ও কৃষকদলের নবস্বপ্নের কথা।

বেশীক্ষণ সে নভেল পড়তে পারল না। গা কেমন ছমছম্ করছে। ট্রেণ ছুটে চলেছে ক্ষ্যাপা দৈত্যের মত। ট্রেণের ঝাঁকুনীতে বোধ হয় শরীর ভাল বোধ হচ্ছে না।

মালতী উঠে বেঞ্চির তলাগুলি ভাল করে দেখলে। না, কেউ কোথাও লুকিয়ে নেই।

একা সে কখনও ট্রেণে ভ্রমণ করেনি ; ইণ্টারক্লাসেও কখনও চড়েনি। থার্ডক্লাসে গেলে মন্দ হত না, সে গাড়ীতে ছুটো হিন্দুস্থানী মেয়েকে বসে থাকতে দেখেছে।

না, সাহসের পরীক্ষায় সে হার মানবে না। এ তার এ্যাডভেন্চার। বাড়ীর সবার অমতে দৃপ্ত যৌবনের গর্ব্বে জনসেবার প্রেরণায় সে একা চলেছে। প্রথমে সে ভারতবর্ষ ঘুরে দেখবে,—চাষীদের জীবন, শ্রমিকদের থাকবার ব্যবস্থা। তারপর যাবে ইয়োরোপে। বিবাহ এখন সে করছে না।

বই বন্ধ করে মালতী জানলার কাচ ফেলে দিলে। কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে, রূপালি নৌকা। গান গাইতে ইচ্ছা করে।

মালতী গান গেয়ে উঠল, নিবিড় অমাতিমির হতে বাহির হল—

এক লাইন গেয়ে সে থামল। মনে হল গাড়ীতে কে যেন প্রবেশ করেছে। কিন্তু কোথাও কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

মালতী আর একটা গান আরম্ভ করলে,—চলি গো, চলি গো, যাই গো চলে—

গাড়ীর চাকাগুলো সে গানের ছন্দে সুরে উন্মত্তের মত ছুটে চলেছে। সমস্ত ট্রেণ গান গাইছে—চলি গো, চলি গো!

এবার ট্রেণটা গানের একটা লাইন বার বার গাইছে, ছড়িয়ে চলি চলার হাসি—ছড়িয়ে চলি চলার হাসি—ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝক্—ছড়িয়ে চলি চলার হাসি—ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝক্—

যেন ট্রেণটা অগ্রসর হচ্ছে না, একই পথে বার বার ঘুরে ঘুরে গাইছে।

হঠাৎ গাড়ীতে কে হো হো করে হেসে উঠল।

মুখ ফিরিয়ে মালতী আঁৎকে চাইলে। ভয়ে কেঁপে সে চেঁচিয়ে উঠল।

তার সামনের বেঞ্চে একটা কুলী বসে! হাঁ, ষ্টেশনের কুলীর সাজ, কিন্তু মাথায় একটা খদ্দরের টুপি। লোকটা এল কোথা হতে!

—টানবেন না, অনুগ্রহ করে চেন টানবেন না।

কুলীর মত গলা নয়ত।

—কে তুমি ?

—হাঃ, হাঃ কমরেড মালতী, ভেবেছিলুম, তুমি শুধু সুন্দরী নও, তোমার সাহসও আছে।

—নিশ্চয়ই আছে!

—তবে চেন ধরে আছ কেন—স্থির হয়ে বোসো।

—কে তুমি!

মাথায় টুপি ও মোটা কালো গোঁফ খুলে যুবকটি বল্লে, এখন চিনতে পাচ্ছ বোধ হয়, চেঁচিও না। আমাকে সাহায্য করতে হবে।

—তুমি, সমর।

—চুপ, আস্তে কথা বল।

কলেজের সহপাঠি সোসিয়লিষ্ট সমর।

—কোথায় ছিলে?

গাড়ীর এক কোণে আঙুল দেখিয়ে সমর জানলার খড়খড়ি তুলে বসল।

হাসির তরঙ্গে দেহ দুলিয়ে মালতী বসল। কালো চোখ জল্ জল্ করছে। মুখে রক্তাভা, শরৎপ্রভাতের স্বর্ণদীপ্তির মত।

—হাঃ, হাঃ, কি চমকেই দিয়েছিলে! আমি ত ক্যাপিটালিষ্ট নই, আমাকে ভয় দেখাতে আসা কেন? ব্যাপার কি?

—যদি বলি, তোমাকে একা দেখে গাড়ীতে উঠে পড়েছিলুম, তাহলে খুসি হবে—

—মোটেই নয়। তাছাড়া তোমার কোন মৎলব আছে।

—সুন্দরী তরুণীর সঙ্গলাভ।

হঠাৎ ট্রেণের গতি মন্দ হ'য়ে এল।

সমর চম্‌কে দাঁড়িয়ে উঠল,—এ কি! শীগগীর একটা শাড়ী বের করো!

—তুমি পরবে নাকি?

—উপায় কি! যদি ট্রেণ থামিয়ে এখন সার্চ্চ করে—

—তুমি শাড়ী পরে ঘোমটা টেনে বসে থাকবে—হাঃ হাঃ—না, না,—আমি—হঠাৎ আমি হেসে ফেলব—সে আমি দেখতে পারব না।

ট্রেণ থামল না। আবার ক্রমবর্দ্ধমান গতিতে ছুটে চল্ল।

—বোসো, ট্রেণ থামছে না।

প্রথমশ্রেণীর কুপেতে আলো জল্‌জল্ করছে।

জগদীশ এক সরকারী ফাইলের পাতা ওল্টাচ্ছিল। অনুপমা অর্দ্ধশায়িতা, স্তব্ধ চেয়ে আছে আকাশের দিকে। ম্লান চাঁদের আলোভরা আকাশের টুকরা নীলার মত ঝকমক্ করে ওঠে, গাছের কালো ছায়া দৈত্যের মত ছুটে এসে চলে যায়, অন্ধকারের স্রোত স্বচ্ছ স্রোতস্বিনীর মত, এ যেন অসীম কাল-স্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছে তার চক্ষের সম্মুখে। এ অনন্ত-স্রোতে একবার উজান ঠেলে অনুপমা অতীতে যেতে চায়। কল্যাণ তার জীবনতরীর মুখ যেন ঘুরিয়ে দিলে।

ক্লান্ত উদাসস্বরে অনুপমা বল্লে, ওগো শুনছ!

মোটা ফাইল বন্ধ করে জগদীশ একটু চমকে চাইলে; ধীরে বল্লে, তোমার সেই ওষুধটা খাবার সময় হল বোধ হয়।

--না, ওষুধ আমি আজ খাচ্ছি না, এ ঝাঁকুনীতেই আমার গা গুলোচ্ছে—ফাইলটা রাখনা।

—এই ফাইল বন্ধ হল।

—এই ইয়ারিং আর হারটা তুলে রাখ দেখি।

হারের সঙ্গে কয়েকগাছা চুড়িও খুলে দিলে। অলঙ্কারশোভিতা হয়ে আরাম করে শোয়া যাচ্ছে না।

এ্যাটাচি-কেসে গয়নাগুলি রেখে জগদীশ ঔষধের শিশি বা'র করলে।

ওষুধ ত খাবনা বল্লুম; বরঞ্চ আমাকে সেই সরু মটরমালাটা দাও।

সোনার মালা অনুপমা গলায় পরলে না, হাতে জড়িয়ে খেলা করতে লাগল। জগদীশকে বল্লে, এবার তুমি শুয়ে পড়। একটা আলো নিভিয়ে দাও।

জগদীশ দু'টো আলোই নিভিয়ে দিলে।

একটু ভয়ের স্বরে অনুপমা বল্লে, না, না, একটা আলো জেলে রাখো, গাড়ীতে অন্ধকার করে যেতে আমার কেমন ভয় করে।

একটা আলো জেলে জগদীশ অনুপমার পাশে একটা বালিশ ঠেসান দিয়ে বসল। হেসে বল্লে, ধরো তোমায় যদি একা গাড়ীতে যেতে হত।

—যেতুম। চারটে আলো জেলে। ওগো মালতির গাড়ীতে মেয়েরা কেউ উঠেছে দেখলে? ধন্যি, সাহস মেয়ের!

—ওর গাড়ীতে আর কোন মেয়ে ওঠেনি

—সে কি! মেয়েটা একাই যাচ্ছে! বর্দ্ধমানে একবার খোঁজ কোরো, যদি আমাদের গাড়ীতে আসতে চায়—

—ভয় নেই, একা যাচ্ছে না। হীরাসিংকে কড়া নজর রাখতে বলেছি, ওর পাশের গাড়ীতেই বসিয়ে দিয়েছি। তার রিপোর্ট ত রীতিমত রোমান্টিক—

—কি, রোমান্টিক আবার কি? তোমরা সবতেই রোমান্স দেখছ?

—না, গো; তোমার বোন রীতিমত মডেয়ার্ণ—বুঝলে—শুধু একা দেশভ্রমণ নয়, elope করবার আনন্দও পেতে চান—

—কি হেঁয়ালী বলছ!

—হীরাসিংএর রিপোর্ট হচ্ছে, ট্রেণ ছাড়বার কিছু আগেই সে একটি বাঙ্গালী যুবককে ওই গাড়ীতে উঠতে দেখেছে; উঠেই যুবকটি এক কোণে লুকিয়ে রইল, আর মালতি-বাবা একটু হেসে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল; ব্যাপারটা আগে থেকে পরামর্শ করে ঠিক করা। এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং তোমার আধুনিকা মাতৃস্বসাদুহিতা তরুণ প্রেমিকের সঙ্গে আনন্দালাপ করতে কর্‌তে যাচ্ছে, একা নেই।

—বাবা, মালতির এত বিদ্যে। আচ্ছা, ছেলেটি কে দেখলে?

অনুপমা সোজা হয়ে উঠে বসল।

—আমি কিছুই দেখিনি। বলত, বর্দ্ধমানে পৌছলে দেখতে পারি। তবে খোঁজটা কাল সকালেও করা যেতে পারে।

—হাঁ, আজ রাতে থাক। তা, বাবু বল্লেই পারে, ওর মা'ত মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য পাগল।

মায়ের এক কথায় বিয়ে করে ফেল্লে, মদেয়ার্ণ গার্ল হবে কি করে—চাই লভ্, ট্রেণে র‍াঁদেভু—

—মালতি বোধ হয় জানত না, আমরাও এ ট্রেণে যাচ্ছি, বড্ড ধরা পড়ে গেছে।

মধুর হাসি খেলে গেল অনুপমার মুখে। জগদীশ মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল। অনুপমার এ রূপলাবণ্যময় হাস্যের অলৌকিক শক্তি আছে, জগদীশ মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে আসে, অনুপমা সরে যায়, হাসি মিলিয়ে যায় আলেয়ার আলোর মত।

অন্ধকার কোণে সরে গিয়ে জানলার দিকে একটু মুখ ফিরিয়ে অনুপমা এলিয়ে বসল, স্থির গম্ভীর রূপ।

অনুপমার মনের আকাশে কখন কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে, কখন চাঁদের আলো ভরে যায়, কখন অরুণের সোনার আভা ঝলমল করে, তার সুন্দর আননের রূপ-পরিবর্ত্তন দেখে, জগদীশ বুঝতে পারে। অসুখের আগে অনুপমার সহজ স্থির গাম্ভীর্য্য ছিল, সহজে সে চঞ্চলা হত না। এখন তার স্নায়ুমণ্ডল বীণা-যন্ত্রের ঢিলে তারগুলির মত, একটু আঘাতেই বেসুরো বেজে ওঠে। অতি সাবধানে জগদীশকে চলতে হয়। মাঝে মাঝে তার শ্রান্তি লাগে। সব সময় সপ্রেম ব্যবহার, আদর-ভরা কথা, মন খুসি করবার প্রয়াস। যেন সে অভিনয় করে চলেছে।

নির্ণিমেষ নয়নে অনুপমা চাইলে। কৃষ্ণতারকা হতে অদ্ভুত জ্যোতি বাহির হয়। জগদীশের ভয় করে। অগ্রসর হতে সে পারে না।

মুখের থম্‌থমে ভাব কেটে গেছে। হেঁয়ালীর সুরে অনুপমা বল্লে, ষ্টেশনে কার সঙ্গে দেখা হল জান! guess?

—পুরুষ না মহিলা?

—কল্যাণের সঙ্গে দেখা হল, বহুদিন পরে।

—কল্যাণ!

—তোমার সঙ্গে ত দেখা হয়েছিল বিলেতে,—জেঠাইমার ছেলে—

—ও, তোমার old flame!

জগদীশ কুশান চেপে বসে পড়ল।

—ফ্লেম্! আর ঠাট্টা করতে হবে না।

—আহা, আমি কিছু mean করিনি—কি পাশ করে এল?

—এই গাড়ীতেই যাচ্ছে, গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসতে পার

জগদীশ চুপ করে রইল। সে কথা কাটাকাটি করতে চায় না। ভাবলে, আগুন কি একেবারে নিভে গেছে? বোধ হয় অঙ্গার রয়েছে ছাই-চাপা। সে অঙ্গারের অগ্নি-আভা অনুপমার গণ্ডে লেগেছে বুঝি!

গাড়ী ছুটে চলেছে। দু'জনে স্তব্ধ। কালের স্রোত বয়ে চলেছে অসীমতার অভিমুখে।

একটু পরে অনুপমা হেসে উঠল।

জগদীশকে ঠেলা দিয়ে বল্লে, কি, গুম্ হয়ে বস্‌লে কেন? ওষুধটা দাও খাই।

—ওষুধ খাবে না, যে বল্লে।

—Changed my mind dear,—কি বল!

—ভাল কথা। ডাক্তারের কথা ত শোনা উচিত।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়, আর এত উদ্যোগ করে বেড়াতে নিয়ে চলেছ, হঠাৎ অসুখ করে বসলে হবে কেন—একটা কর্ত্তব্য-বোধ আছে ত।

কার প্রতি?

—শরীরের প্রতি এবং তোমার প্রতি, বুঝলে।

ওষুধ খেয়ে অনুপমা বল্লে, এবার তুমি শুয়ে পড়। ওপরের বাঙ্কে বিছানা পাতা আছে, স্লিপিং স্যুটটা বিছানার ওপর আছে বোধ হয়। চাপ্‌রাসীকে রাখতে বলেছিলুম।

নানারঙের কুশান্-ছড়ান রঙীন চাদর-পাতা বেঞ্চির দিকে জগদীশ চাইলে। সুপ্রশস্ত গদি-ওয়ালা বেঞ্চি, তার অর্দ্ধেক জুড়ে কোঁকড়ান চুল এলিয়ে ধূসর হলদে রঙের বালিশ ঠেসান দিয়ে অনুপমা পা ছড়িয়ে বসে, খোলা জানলার দিকে চেয়ে আছে। কিংশুক বর্ণের শাড়ীর প্রান্তভাগ নীচে ঝুলে পড়েছে।

জগদীশ ধীরে বল্লে, এর মধ্যে শোব কি! বর্দ্ধমানের পর শোয়া যাবে। বেঞ্চির আর এক কোণে বসে সে অনুপমার দিকে চেয়ে রইল। অনুপমার দৃষ্টি তারাভরা আকাশের দিকে।

এম্নি চুপ করে একা উদাসভাবে অনন্ত আকাশের দিকে চেয়ে বসে-থাকা অনুপমাকে দেখলে জগদীশের মন ব্যথায়, আশঙ্কায় ভরে ওঠে। এ যেন কোন অজানা, অপরূপা নারী; প্রতিদিনের-জানা অনুপমা তার কাছ থেকে কত দূরে সরে গেছে, কোন্ অজানা পথে বহুদূর চলে গেছে, সে পথে সে একাকিনী যাত্রিণী, জগদীশের সঙ্গ ত্যাগ করে চলেছে। অনুপমার রূপ তাকে মুগ্ধ করে; তার কালো চোখের চাউনিতে বক্ষের রক্ত দুলে উঠে, তারপর অনুপমা দূরে সরে যায়।

ওয়াল্টেয়ারের নির্জ্জন সমুদ্রতীরে অনন্ত আকাশের তলে এম্নি একা-বসে-থাকা অনুপমাকে দেখেই সে বিমুগ্ধ হয়েছিল, ভালবেসেছিল। সোণালী বালুচরে সন্ধ্যায় আলোয় এমনি খোলা চুলে কিংশুক বর্ণের শাড়ী পরে সমুদ্রের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে ছিল অনুপমা। যেন একা, বড় একা সে। যেন সে ভেনাসের মত শুক্তির দোলায় সমুদ্রের অতলতা হতে উঠে এসেছে, বিজন পৃথিবীতে পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

সেই একাকিনী সৌন্দর্য্যময়ীকে সে জীবন-সঙ্গিনী করেছে, প্রেম-প্রদীপ জ্বালিয়ে আহ্বান করেছে অন্তরে; নিবিড়ভাবে তাকে পেতে চায়। কিন্তু নিকটে গিয়েও, পরিপূর্ণভাবে মিলন হয় না।

অনুপমা জগদীশকে সরিয়ে রাখে না, কোথাও বাধা দেয় না, অথচ সহসা এক আবরণ সৃষ্টি করে, অদৃশ্য জালের মত। সৌন্দর্য্যমায়ার আবরণ, অসীম উদাস স্তব্ধতার আবরণ।

অনুপমা অজানা, সুদূরগতা, অদৃশ্য ভেদ-জাল কে ছিন্ন করতে পারে?

ব্যথায় জগদীশের মন খচ্‌খচ্ করে।

জগদীশকে সুপুরুষ বলা চলে না। কালো, মোটা দেখতে। থ্যাবড়া মুখ, নাক মোটা, ছোট চোখ; মোটা কাচ-ভরা কাচকড়ার চশমার ফ্রেম মুখখানি বিসদৃশ করে তুলেছে। অনুপমার পাশে বসলে জগদীশকে বিশ্রী দেখায়। "Beauty and the Beast" ছিল তার বিবাহের পরে বন্ধু-মহলে প্রচলিত ঠাট্টা।

সরকারী চাকরীর পদগৌরব ও মাহিনার মোটা অঙ্ক কষ্টিপাথরের গায়ে স্বর্ণাভরণের মত তার দেহের অসৌন্দর্য্য দূর করেছে।

অনুপমার সঙ্গে জগদীশের আলাপ হয়েছিল ওয়াল্‌টেয়ারের সমুদ্রতীরে। অহৈতুক আলাপ। বিবাহের কোন প্রস্তাব প্রথমে ছিল না।

জগদীশ বিশেষ আকৃষ্ট হলেও, প্রস্তাব করতে সাহস করে নি।

অনুপমারই এক মামা প্রস্তাবটি আনেন। অনুপমার মত নিয়ে তিনি এসেছিলেন। জগদীশ তাতেও সন্তুষ্ট হয় নি। নিভৃতে সে নিজে প্রশ্ন করে অনুপমার নিকট

হতে সম্মতি জেনেছিল। অনুপমা তাকে ভালবেসে বিবাহ করছে কি না, এ প্রশ্ন তখন মনে উদয় হয়নি। প্রশ্ন করলে বোধ হয় উত্তর পেত না। বিবাহের পর এ কথা বহুবার মনে হয়েছে, কিন্তু প্রশ্ন করতে সাহস হয় নি। দু'জনার মধ্যে যে অতি সূক্ষ্ম অদৃশ্য বাধার জাল রয়েছে, প্রশ্ন করতে তার ভয় করে। সে অনুভব করে, অনুপমাকে সে গভীরভাবে ভালবাসে। ভাল যদি না বাসত অনুপমাকে সে সহ্য করতে পারত না। অনুপমার আরোগ্যের জন্য অকাতরে এত অর্থব্যয় করতে পারত না।

—এখনও তুমি শোওনি, অমন চুপ করে বসে ভেবো না।

জগদীশ ধীরে উঠে দাঁড়াল। ওপরের বাঙ্কেই তাকে শুতে হবে। ধীরে বল্লে, তুমিও শুয়ে পড়। জানালাটা বন্ধ করে দি।

—জান ত, ট্রেণে আমার ঘুম হয় না। মিছে তুমি জেগে থাকবে আমার জন্যে।

—অত মুখ বাড়িও না। চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়বে।

—বেশ সুন্দর লাগছে রাতটা—যেন হু হু করে ভেসে চলেছি—আচ্ছা তুমি এরোপ্লেনে চড়েছ?

—হাঁ, সেবার দিল্লী থেকে এলুম।

—আমার এরোপ্লেন চড়তে ইচ্ছে করছে—খুব জোরে ছুটে যাবে—আকাশের নীলিমায় উল্কার মত ছুটে চলবে—আচ্ছা এরোপ্লেন ঘণ্টায় তিন চার শ' মাইল যেতে পারে?

—যেতে পারে, তবে যাত্রী-এরোপ্লেন নয়। জলের বোতলটা কোথায়?

—ওই কোণে রেখেছ—না, আমি জল খাবনা—দরকার হলে সোডা খাব'খন।

—শুয়ে পড়ি?

—হ্যাঁ, হাঁ।

—বর্দ্ধমানে ডেকে দিও। কেমন tired লাগছে।

অনুপমাকে আল্‌গা চুম্বন করে জগদীশ ওপরের বাঙ্কে উঠে শুয়ে পড়ল। ফাইলটা শেষ করে শুয়ে পড়লেই ভাল হত। ট্রেণেতেই রিপোর্ট লিখে পাঠাতে হবে। বড় ক্লান্তি লাগে। মাথায় নানা চিন্তা। কল্যাণ ঠিক এই ট্রেণে এল কি কোরে? যা প্ল্যান করা যায়, কামনা করা যায়,—কোথা থেকে অঘটন ঘটে—কোন দুষ্টগ্রহ সব সময়ে তাকে ব্যঙ্গ করছে।

বালিশে মুখ চেপে জগদীশ চোখ বুজলো।

মালতীর সামনের বেঞ্চিতে সমর বসেছে, মুখোমুখি। পাশে রুস-লেখক সোলেকভের "Virgin Soil Upturned" উপন্যাসখানি খোলা।

মালতীকে সে জিজ্ঞাসা করলে, এবার দেবগ্রামে কৃষক-কন্‌ফারেন্সে তোমায় দেখলুম না?

মালতীকে 'তুমি' বলবার মত ঘনিষ্ঠ আলাপ না থাকলেও, সমর কোন সমবয়স্ক মেয়েকে "আপনি" বলে না। তাছাড়া মালতী তাদের দলের; "আপনি" বলা বুর্জ্জোয়া মনোবৃত্তির পরিচায়ক। কোন মেয়েকেও সে "আপনি" বলতে দেয় না।

মালতী বল্লে, না, এবার কন্‌ফারেন্সে যাওয়া হয়নি, শরীর ভাল ছিল না।

—শরীরের কথা ভাবলে কি কাজ করা চলে। আজ সারাদিন ত আমার খাওয়া হয়নি।

—কিছু খাও নি? আমার সঙ্গে ত খাবার নেই কিছু।

—তিন কাপ চা আর দুটো ফাউল-কাট্‌লেট্—খাবার কথা যাক্, কোনরকমে আমায় বোম্বে পৌছাতে হবে। টাকাও হাতে নেই।

—টাকা কিছু দিতে পারি।

—টাকা থাক্। রেলওয়ে টিকিট থাকেত দাও। টিকিট নেই বলে শেষে ধরা না পড়ে যাই।

—তোমার নামে কি ওয়ারেণ্ট বাহির হয়েছে?

—না, ওয়ারেণ্ট বাহির হয় নি। তবে খোঁজ হচ্ছে। ভবেন্দ্রকে ধরেছে,—

—অপরাধ?

—রাধাকান্ত মিলে ধর্ম্মঘটের কথা শোন নি? বক্তৃতাটা গরম হয়ে গেছল। সিতিকণ্ঠ একটা স্লিপ পাঠালে, সরে পড়। তাই সরে পড়ছি।

—কেন, ভয় কিসের?

—জেলকে আমি ভয় করিনা, বুঝলে কমরেড—তবে কেন মিছিমিছি যাই—

—আমারও তাই মত।

—তাছাড়া, এবার লম্বা পাড়ি দেবার ইচ্ছে আছে—এতদিন বাহির হতে পারিনি মায়ের জন্য, এবার বুঝিয়ে এলুম, জেলে যাওয়ার চেয়ে ইয়োরোপ যাওয়া ত ভাল হবে

—তোমার মা নিশ্চয় খুব ভাবছেন!

—ভাবছেন বৈ কি! ভাবাটাই তাঁদের একমাত্র কাজ। তা আমার মা শক্ত আছেন। শোন কমরেড, আমার ঠিকানাটা লিখে নাও—কাল একটা চিঠি লিখে দিও মা'কে—ভণিতা কিছু করতে হবে না, শুধু লিখে দিও, আপনার ছেলের সঙ্গে দেখা হ'ল, ভাল আছে, তার অভীষ্টপথে চলেছে—বুঝলে—একটা জংসন ষ্টেশনে পোষ্ট কোরো,—খামে লিখে আর বেশ মেয়েলীছাঁদে ঠিকানা লিখো—'শ্রীচরণেষু', ওই সব লাগিয়ে দিও—

মালতীর বিবর্ণ মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে, কালো চোখ জলজল করছে অন্ধকার আকাশে শুকতারার মত।

ছোট নোটবুক বা'র করে সে ধীরকণ্ঠে বল্লে—বলো ঠিকানা। নামটা বলো।

—মা'র নাম? দেখ, মায়ের নাম মনে পড়ছে না, মা, মা—শুধু 'মা' লিখে দিও, কেয়ার অফ—মনে পড়েছে, 'যোগমায়া'—কাল সকালেই লিখে দিও।

ব্যাগ থেকে রেল টিকিট বা'র করে মালতী বল্লে, টিকিটটা রাখো। ব্যাগ নেই?

—ব্যাগটা কোথায় পড়ে গেছে দেখছি, একটা ছিল ট্যাঁকে।

—আচ্ছা এ মণিব্যাগটাও রাখ, বেশী টাকা নেই।

—থাক্ তোমার কাছে, পরে নেব। দরকার হবে না বোধ হয়।

—তুমি কি এই কম্পার্টমেণ্টেই থাকতে চাও?

—বর্দ্ধমানে নেমে একবার দেখব—অন্য গাড়ীতে যদি সুবিধে হয়—এক কাজ কর, জানলাগুলো সব তুলে দিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়।

—আলো না জ্বালা থাকলে আমার ভয় করবে।

—ভয়?

—না, ভয় নয়, কিন্তু অন্ধকারে আমি থাকতে পারি না, আমার ত ঘুম আসবে না।

—আচ্ছা আলো জেলেই চলো, আমি সহজে নড়ছি না

মালতী কোন উত্তর দিলে না। গণ্ডদেশে রক্তের ছোপ মিলিয়ে গেছে। মণিবন্ধে বাঁধা ছোট ঘড়িটা দেখলে। কলিকাতার এক ছোট গলিতে তাদের পুরাতন বাড়ীর এক অংশ তার চোখে ভেসে উঠল। মায়ের কথা মনে পড়ল।

মায়ের রান্না বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে। আজ আর বেশী রাঁধবেন না। ছোট ভাইপো মনু বোধ হয় এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। আসবার সময় তার মা চক্ষের জল কষ্টে রোধ করেছিলেন, কিন্তু মনু চিৎকার করে বাড়ী মাৎ করে দিয়েছিল।

মা যদি অবুঝ হন কি করা যায়! তার জীবনের আদর্শকে সে কত বোঝাতে চেষ্টা করেছে, মা কিছুতেই বোঝেন না: বলেন, গরীব দুঃখীর সেবা করতে চাও, খুব ভাল, কিন্তু সেজন্য বিয়ে না করে টো টো করে ঘোরা কেন! আজ রাতে মায়েরও ঘুম হবে না। মাকেও একটা চিঠি লিখতে হবে ট্রেণ থেকে।

মালতীর ইচ্ছা হ'ল সমরের সঙ্গে সে তার মায়ের গল্প করে। কিন্তু সঙ্কোচে সে চুপ করে রইল। সোসিয়ালিজ্‌ম্‌-মন্ত্রে সে দীক্ষিতা। হৃদয়ের কোনরূপ দুর্ব্বলতা প্রকাশ করলে চলবে না।

সমরের দিকে সে উৎসুকভাবে চাইলে সমরও বোধ হয় তার মায়ের কথা ভাবছে।

মালতী ভাবলে, সে যদি সমরের মত মুক্ত, স্বাধীন হত, চলে যেতে পারত দেশ দেশান্তরে!

রেস্তোরাঁ-গাড়ীতে ত্রয়ীর আহার শেষ হয়ে পান আরম্ভ হয়েছে। কল্যাণ ও আর্থার লিকার নিয়ে বসেছে, কনকের হুইস্কি চলছে।

সাক্রজের গেলাসে একটু চুমুক দিয়ে কল্যাণ বল্লে, আর্থার তোমার এ ছদ্মবেশ কেন?

পাঞ্জাবীর হাতটা গুটিয়ে আর্থার বল্লে এ দেশে এই

বেশ বড় আরামের। আর আমি ঠিক করেছি, যে দেশে যাব, সে দেশের বেশভূষা পরে ঘুরব।

—আইডিয়া ভাল, কিন্তু তোমার মৎলব কি?

—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমি একটা বই লিখ্‌ছি।

কনক বল্লে, দোহাই, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক বিদেশী আবর্জ্জনা জমেনি কি?

আর্থার বল্লে, আপনারা যদি নিজ দেশ সম্বন্ধে বই লিখতেন ত ভাল হত। আপনারা যে লেখেন না। দেখ, প্রাচীন ভারতের বিষয় জানতে হলে সেই বিদেশী হুয়েন সাঙের বৃত্তান্ত পড়তে হয়।

—তার কারণ নিজের ধর্ম্ম, সমাজ সম্বন্ধে বই লেখা যেতে পারে, কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বড় বড় মন্তব্য করে বই লেখা যায় না, অনেক ইংরাজ আমেরিকান সাংবাদিক পয়সার জন্য অথবা ভারতবর্ষকে হেয় করবার জন্য অনেক বই লিখেছে, তুমি ত তা করবে না আর্থার।

—আমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বই লিখছি বল্লে ঠিক হবে না, এ হচ্ছে ভারতবর্ষকে আমার বুদ্ধি হৃদয় দিয়ে বোঝবার চেষ্টা, তার ধর্ম্ম, তার সভ্যতা—বইখানার নাম দিচ্ছি Soul of India.

গেলাসে সোডা ঢালতে ঢালতে কনক হেসে উঠল, Soulকে খুঁজে পেয়েছ কি? ওই কথাগুলি হচ্ছে তোমাদের সম্মোহন বাণ, একেই ত আমরা ধর্ম্মের গাঁজা খেয়ে বুঁদ হয়ে আছি—

—সেজন্য স্কচ হুইস্কি দিয়ে নেশা কাটাবার চেষ্টা করছ!

—ঠিক বলেছ, আজ পৃথিবী জুড়ে ইয়োরোপীয় সভ্যতার শক্তি ও সম্পদ্ দেদীপ্যমান, ভারতবর্ষ যদি সেই সভ্যতাকে, এই যন্ত্র-শক্তি, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারে, তবেই সে বাঁচবে।

—তোমার মত শিল্পীর কাছ হতে এ কথা আশা করিনি।

শিল্প কি আমাদের রক্ষা করতে পারল? লৌহ-যন্ত্র কি জয়ী হল না? জয় যন্ত্র! জয় যন্ত্র!

এক চুমুকে গেলাস শূন্য করে কনক চেঁচিয়ে উঠল, শোন যন্ত্রের জয়ধ্বনি—ঝক্ ঝক্, ভক্ ভক্, ঘড় ঘড় চলেছে—গরুর গাড়ীর চাকার সুর আপনার কাছে যতই মধুর লাগুক মিষ্টার গ্রেগরি—

—কিন্তু যন্ত্র-দানবের তাণ্ডব নৃত্যের প্রলয়ধ্বনি আপনি শোনেন নি—বিগত মহাযুদ্ধে আমি ফ্লান্ডারসের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ছিলুম—

—তুমি যুদ্ধে ছিলে, তোমার বয়স তখন খুব অল্প হবে।

—হাঁ বয়স ভাঁড়িয়ে আমি গেছলুম। যৌবনের রঙীন আদর্শবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে গেছলুম। ভেবেছিলুম, এই পৃথিবীর শেষ যুদ্ধ, তারপর মানব সভ্যতার নবযুগ আরম্ভ হবে, জাতিতে জাতিতে প্রীতি, দেশে দেশে শান্তি কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হবে—তার জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত

—তোমার মত কত যুবক প্রাণ দিয়েছে, তারা শুধু দেশরক্ষার জন্য, সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যায়নি। মানব সভ্যতার এক নূতন যুগের জন্ম দেবার জন্য তারা পৃথিবীকে নিজেদের রক্তে রাঙা করেছিল।

—কিন্তু ফল কি হ'ল! পেশাদার রাজনৈতিক নেতাদের চক্রান্ত আরও কুটিল হয়েছে, জাতীয় দম্ভ আরও ভয়ানক, শক্তিলোলুপতা আরও তীব্র, শ্রেণীগত স্বার্থপরতা আরও উগ্র হয়েছে—যুদ্ধের ঝঞ্ঝা আসন্ন।

গ্রেগরি অতি গম্ভীরভাবে বল্লে, ভগবান ইয়োরোপকে রক্ষা করুন, আগামী যুদ্ধ যে কি ভয়ানক হবে, আমি কল্পনা করতে পারি না।

—কেম্ব্রিজে তুমি ত প্যাসিফিষ্ট ছিলে।

—এখনও আছি। তবে কোন বিশেষ মতকে আঁকড়ে ধরে থাকতে আমি চাই না। আসল কথা, যুদ্ধ কোরবো না বল্লে ত হবে না। যুদ্ধ যাতে করতে না হয়, যুদ্ধ করা যাতে প্রয়োজন না হয়, পৃথিবীর সেরূপ ব্যবস্থা করতে হবে।

—সে ব্যবস্থা কি করে হবে?

—প্রথমত আমাদের মনকে তৈরি করতে হবে, জাতির প্রতি জাতির মনোভাব বদলাতে হবে—moral armament—

—কথাটা আগে কোথায় শুনেছি, খৃষ্টের প্রেম-নীতিরই নূতন সংস্করণ করতে চাও।

বোতলটা নিঃশেষ গেলাসে ঢেলে কনক বল্লে, মিষ্টার গ্রেগরি, আপনি এতদিন ভারতবর্ষে না ঘুরে যদি

ইয়োরোপে ঘুরতেন আপনার প্রেমের বাণী প্রচার করে, এই আসন্ন যুদ্ধ আপনি ঠেকাতে পারতেন মনে হয় ?

গ্রেগরি চমকে উঠল। প্রশ্ন করলে, যুদ্ধ কি বাধছে ? আমি কয়েকদিন খবরের কাগজ পড়িনি। একটা দূর গ্রামে গেছলুম।

—কাগজ পড়নি ?

—না, খবরের কাগজ পড়তে শুধু বিরক্তি নয়, কেমন বেদনা অনুভব করি। তাছাড়া কাগজগুলিতে থাকে ঝুড়ি-ভরা মিথ্যা—নিজ দলের প্রপাগাণ্ডা, আমার হাতে শক্তি থাকলে আমি খবরের কাগজের রূপ ও ভঙ্গী বদলে দিতুম।

—দেখ, তুমিও শক্তিকামী হয়ে উঠছ।

—আচ্ছা, আজ নতুন খবর কি আছে কাগজে ?

—পোল্যাণ্ডের কাছে জার্ম্মানী যা দাবী করেছে, তার ultimatum বোধ হয় এতক্ষণে শেষ হয়ে এল—তারপর জার্ম্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করবে সুনিশ্চিত।

গ্রেগরি উত্তেজিত হয়ে বল্লে, তাহলে ইংলণ্ড তার সর্ত্ত রাখবে, তার কর্ত্তব্য করবে—

কল্যাণ হেসে বল্লে, তাহলে দেখছ আর্থার তুমি শান্তিবাদী নও, যুদ্ধবাদী, অর্থাৎ বন্দুক কামান নিয়ে যুদ্ধ করে সমস্যার সমাধান করতে চাও, ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাও, মহাত্মা গান্ধীর মত নিরস্ত্র ধর্ম্মযুদ্ধ নয়।

—ওখানে আমি গান্ধীকে বুঝতে পারি না।

টেবিলে গেলাস ঠুকে কনক বল্লে, তাহলে আপনি ভারতবর্ষকেও বুঝতে পারবেন না। সত্যিকথা বলতে কি, আমিও বুঝতে পারি না। তুমি পার ঘোষ ?

কল্যাণ কোন কথা বল্লে না। সিগারের বাক্স খুলে তাদের সামনে ধরলে, তারপর নিজে একটা সিগারে অগ্নি সংযোগ করলে।

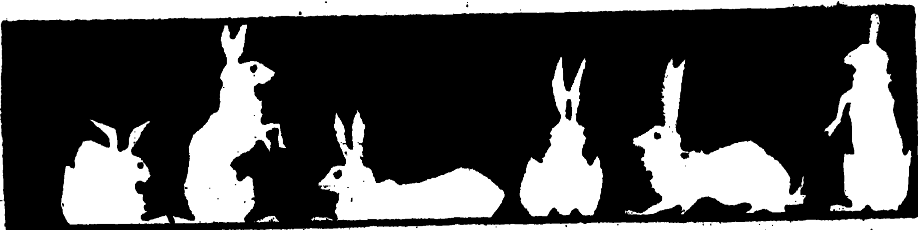
বাংলার উন্মুক্ত প্রান্তর দিয়ে ট্রেণ ছুটে চলেছে। আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ, চাঁদ ঢাকা পড়েছে। যেন অন্ধকার রাতে দৈত্যের দল মশাল জেলে হুঙ্কার করে ছুটে চলেছে।

ড্রাইভার ড্রামণ্ড এতক্ষণ সার্চ্চলাইট-আলোকিত লৌহবর্ত্ম দেখছিল। জাতিতে স্কচ্; হাইল্যাণ্ডে এক পার্ব্বত্য গ্রামে তার বাড়ী। বাড়ীতে বুড়ি মা আছে, তার স্ত্রীও মার সঙ্গে বাস করছিল, একমাস হল হেলেন লণ্ডনে এসেছে, কার সঙ্গে লণ্ডনে আছে লেখেনি, নিশ্চয়ই ওগিলভির সঙ্গে। ব্যাপারটা ডাইভোর্স কোর্টে শেষ পর্য্যন্ত না গড়ায়। গত মেলে হেলেনকে সে লিখেছে, ছুটির জন্য দরখাস্ত করেছে। কিন্তু ছুটি পাবার এখন সম্ভাবনা নেই। হেলেনকে ভারতবর্ষেও সে আনতে চায় না। বাংলার গগনচুম্বী অবারিত মাঠের মধ্যে স্কটলণ্ডের গিরিচূড়া, বনভূমি, হ্রদের ছবি জেগে উঠল ড্রামণ্ডের চোখে। সহকারী ইঞ্জিনচালককে সে বল্লে, তুমি চালাও। তার চোখ ঝাপ্সা হয়ে আসছে।

ঘননীল সার্ট-পরা, আস্তিন-গোটান, মাথায় কালো beret টুপি, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবকটি এগিয়ে বসল। কুলীকে বল্লে, বয়লারে কয়লা ঢালতে।

(ক্রমশঃ)

(উপন্যাসের সকল ঘটনা ও নরনারীর চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক।)



বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বৈতরূপ

শ্রী হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

যেদিন 'Rajmohan's Wife'-কে পরিত্যাগ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'-কে বরণ করিলেন, সেই দিন বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের এক স্মরণীয় দিন—তাহা নব-বঙ্গসাহিত্যের শুভ জন্মদিন।

বিদেশিনী-রূপমুগ্ধ বাঙ্গালী আপন ঘরের এই অসামান্যা রূপবতী মেয়েটিকে দেখিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। কোথায় লুকাইয়া ছিল তিলোত্তমা এই মেয়েটি এতদিন! কৈ তাহাকে ত' কোনদিন তাহারা দেখিতে পায় নাই! এই মেয়েটির রূপে আকৃষ্ট হইয়াই পরমুখো বাঙ্গালী একে একে ঘরমুখো হইতে আরম্ভ করিল।

সুলক্ষণা এই মেয়েটিই গৃহবিমুখ বাঙ্গালীর অসংযমকে সর্ব্বপ্রথম সংযত করিল। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতকের বঙ্গদেশ যাহা মূলতঃ বঙ্কিম-সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল—'দুর্গেশনন্দিনী'র শুভ আবির্ভাবই তাহার প্রথম সূচনা।

ইহার পর কপালকুণ্ডলাকে নবকুমার যখন হাত ধরিয়া বাঙ্গলার অন্তঃপুরে আনিয়া দাঁড় করাইল, তখন বাঙ্গালীর বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

ক্রমে ক্রমে 'মৃণালিনী' 'মনোরমা' প্রভৃতি আসিয়া আমাদের অন্তঃপুরে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল।

তাহার পর আসিল 'বিষবৃক্ষ'। বঙ্কিম দুশ্চর তপঃ-সাধন দ্বারা অমরাবতী হইতে যে ভাবের স্রোত আনিয়া-ছিলেন এইবার তাহার গতিমুখ পরিবর্ত্তিত হইল; তাহা একেবারে আমাদের গৃহকে স্পর্শ করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে দূর হইতে যাহার শোভা দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলাম এখন আমরা তাহার তীরবাসী হওয়ায়, তাহা প্রতিদিনের প্রয়োজনে আমাদের দৈনন্দিন স্নানে ও পানে আমাদের নিত্য-সঙ্গিনী হইয়া উঠিল। এতদিনে সত্য সত্যই তাহার সহিত আমাদের অন্তরের যোগ স্থাপিত হইল।

'বিষবৃক্ষে' বাঙ্গালী-গৃহ ও সমাজের যে প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া উঠিল, তাহা অভূতপূর্ব্ব। সামাজিক আবেষ্টনীর মাঝে, পরিবার পরিজন দাসদাসী-পরিবৃত আমাদের দাম্পত্য-জীবনের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখে, বিরহ-মিলনে, আনন্দ ও বেদনায়, আশা ও নৈরাশ্যে, স্খলন-পতন ও ত্রুটি-বিচ্যুতিতে সমগ্র-সুন্দর যে অতি-পরিচিত ছবি তাহাই ফুটিয়া উঠিল।

বিষবৃক্ষের যবনিকার সহিত বাঙ্গালী বধূ-হৃদয়ও সেই প্রথম উদ্ঘাটিত হইল। 'ভার্য্যা সূর্য্যমুখী মাথার দিব্য দিয়া বলিলেন "দেখিও ঝড় উঠিলে নৌকা কিনারায় লাগাইও"।' অজ্ঞাত অনিশ্চিত অশুভের আশঙ্কায় স্বামীর শুভ কামনা করিয়া সূর্য্যমুখীর এই যে ব্যাকুলতা, ইহাতেই এক মুহূর্ত্তে বাঙ্গালী-বধূ-হৃদয় ধরা পড়িয়া গেল। সূর্য্যমুখীর এই স্বল্প ভাষণের মধ্য দিয়াই হিন্দু দাম্পত্য-জীবনের সুগভীর প্রণয়-মাধুর্য্য সূর্য্যালোকের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিল; প্রেমের সহিত মঙ্গলের অবিচ্ছিন্ন একাত্ম রূপটিকে আমরা একই সঙ্গে দেখিতে পাইলাম।

বঙ্গসাহিত্যে যথার্থ সামাজিক বা গার্হস্থ্য উপন্যাসের সর্ব্বাবয়ব রূপ আমরা প্রথম দেখিলাম এই বিষবৃক্ষ উপন্যাসে। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যভূমিতে স্বহস্তে এই যে ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন—পরবর্ত্তিকালে ইহাকে অবলম্বন করিয়াই বাঙ্গলার তাবৎ উপন্যাস-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে।

ইহার পর 'চন্দ্রশেখর' 'রজনী' 'ইন্দিরা' প্রভৃতির মধ্যে বাঙ্গালীর এই সামাজিক গার্হস্থ্য-জীবনকে আমরা বিভিন্ন আবেষ্টনী ও নব নব সংঘাতের মাঝে দেখিতে পাইলাম। বিষবৃক্ষে বাঙ্গালী গার্হস্থ্য জীবন-চিত্রের যে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাই পরবর্ত্তিকালে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ অধিকতর উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহ' এক অনুপম সৃষ্টি। মোগল-রাজপুত দ্বন্দ্বের একটি স্মরণীয় পৃষ্ঠা

বীরকেশরী রাজসিংহকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের যাহা যথার্থ ধর্ম্ম, তাহা একমাত্র 'রাজসিংহ' উপন্যাসেই সম্পূর্ণভাবে বর্ত্তমান। ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহকে অক্ষত রাখিয়া, মানব-হৃদয়বৃত্তি-বিশ্লেষণে 'রাজসিংহ' অভূতপূর্ব্ব। ইতিহাসের প্রবাহের সহিত, মানব-হৃদয়-প্রবাহ সমান গতিতে এম্‌নি পাশাপাশি ছুটিয়া চলিয়াছে যে, কেহ কাহাকেও অতিক্রম করিতে পারে নাই। ইতিহাস ও উপন্যাস-ধর্ম্মের এইরূপ সামঞ্জস্যে 'রাজসিংহ' অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

'আনন্দমঠ' 'দেবীচৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' এই তিনখানি উপন্যাসের মধ্যে আমরা দেশাত্মবোধের জনক, স্বদেশপ্রেমের পুরোহিত, মাতৃমন্ত্র-প্রচারকারী বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিতে পাইলাম। বর্ত্তমান প্রচারমূলক উপন্যাসসমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চরিত্রগুলি অস্বাভাবিকভাবে জড় যন্ত্রের মত কতকগুলা theory-র বুলি আওড়াইয়া চলিয়াছে; তাহাদের না আছে রূপ, না আছে জীবনের স্পন্দন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষত্ব এই যে তাঁহার প্রচার-মূলক উপন্যাসের চরিত্রসমূহ স্বাভাবিক কোনও বৃত্তিকে অস্বীকার করে নাই—তাহারা সকলেই দেশ ও কালের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া স্বচ্ছন্দে গড়িয়া উঠিয়াছে। একটা সুনির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া সংযত গতিতে আপন আপন লক্ষ্যপথে তাহারা অগ্রসর হইয়াছে; সেই পথে, সম-ব্যবধান তাহাদের প্রতিটি পদক্ষেপের সুস্পষ্ট চিহ্ন আমরা দেখিতে পাই। কেহই আমাদের অলক্ষ্যে হঠাৎ আসিয়া দেখা দেয় নাই—তাহাদের ক্রমবিকাশের একটা অবিচ্ছিন্ন ধারা সুপ্রত্যক্ষ।

তাই, ভবানী পাঠকের নিকট নিষ্কাম কর্ম্মযোগের আদর্শে, সুদীর্ঘ বৎসরের ক্রম-দীক্ষায় প্রফুল্লকে আমরা সহস্রের কর্ত্তৃরূপিণী দেবীরূপে পাইয়াছি। জীবানন্দ, ভবানন্দ, শান্তি, কল্যাণী, মহেন্দ্র ও সন্তানদলের সকলকেই স্বদেশসেবার অধিকারী হইবার জন্য কঠোর সাধনা করিতে হইয়াছে। গুরু সত্যানন্দের দেশমাতৃকার পূজার আদর্শে তাহাদের প্রত্যেককেই, তাঁহার নিকট সন্তানধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র কোনও চরিত্রকেই নিরুদ্ধ-ইন্দ্রিয় অতি-মানব করেন নাই। তাহারা পৃথিবীর রক্ত-মাংসে গঠিত ও তাহাদিগকে আমাদের অব্যবহিত আত্মীয় বলিয়া চিনিতে পারি। দোষে, গুণে ও ত্রুটি-বিচ্যুতিতে তাহারা একান্তই মানব—অপরিচয়ের অস্ফুটতায় তাহারা কোথাও রহস্যময় হইয়া উঠে নাই।

তাই ভবানন্দের মত শ্রেষ্ঠ সন্তানও, লোলুপ পতঙ্গের মত কল্যাণীর রূপ-যৌবন প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিয়াছে এবং জীবানন্দের জীবনও শান্তিকে কেন্দ্র করিয়া দৌর্ব্বল্য-বিচলিত হইয়া উঠিতে আমরা দেখিয়াছি।

যে সীতারাম আপন বাহুবল ও চরিত্রবলের উপর ভিত্তি করিয়া একটা সুনিয়ন্ত্রিত স্বাধীন-রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই সীতারাম রায়কেও—পরিণতিতে বিগত-রাজশ্রী ও হৃতসর্ব্বস্ব হইতে হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র মূলতঃ আদর্শবাদী ছিলেন; কিন্তু আদর্শের অনুরোধে স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহের অপমৃত্যু ঘটাইয়া, মানুষের জীবনকে তিনি কোথাও অস্বীকার করেন নাই। আদর্শবাদ (Idealism) ও বাস্তববাদের (Realism) সংঘাত ও সমন্বয়, বঙ্কিম-সাহিত্যের সর্ব্বত্র সুপরিস্ফুট। বঙ্কিমচন্দ্রের মত মানবতার একনিষ্ঠ সাধক আমরা আর বঙ্গসাহিত্যে দ্বিতীয় দেখি নাই।

'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের বৎসর অর্থাৎ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৮ অবধি বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা প্রধানতঃ রস-স্রষ্টা কবি রূপেই দেখিয়াছি। কিন্তু ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্রের যে রূপের আমরা সাক্ষাৎ পাইলাম তাহা প্রচারকের রূপ। সজল-কালো মেঘের মধ্য হইতে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইয়া উঠিল। প্রেমিকের নিকট হইতে মঙ্গল ও কল্যাণের নিমিত্ত সুকঠোর কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ আসিল।

কুরুক্ষেত্রে অসহায় পাণ্ডবগণের সেই ঘোর দুর্দ্দিনে যেমন শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া পার্থের সারথ্য স্বীকার করিয়া-ছিলেন, তেমনি খৃষ্টীয় উনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধের নব্য-পাশ্চাত্যশিক্ষায় দিগ্‌ভ্রান্ত বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবনে আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাহার সারথ্য গ্রহণ করিলেন। আদর্শ-হীন লক্ষ্যহীন বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনকে একটা স্থির লক্ষ্য, একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সুবিচারিত আদর্শের পথে সুসংযত ভাবে পরিচালনা করিবার ভার লইলেন। ইহা যে কত বড় প্রতিভার পরিচায়ক, তাহা আজিকার বাঙ্গালী বুঝিবে না। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক অবধি বাঙ্গলা যে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, জ্ঞানে ও কর্ম্মে সকল প্রদেশের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া ভারতের সর্ব্ববিষয়ে নেতৃত্ব করিয়াছে, তাহার মূলে দেখিতে পাই সেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব।

রস-সাহিত্য, সমালোচনা, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, বেদ প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়, 'বঙ্গদর্শন' ও 'প্রচার'-এর মধ্য দিয়া—উনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী প্রশ্নমুখর বাঙ্গালীর আত্মপ্রত্যয়কে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করে এবং তাহার জাতীয়তাবোধকে সর্ব্বপ্রথম জাগরিত করিয়া তুলে। 'বঙ্গদর্শন' ও 'প্রচার' আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীর অন্ধকার জাতীয়জীবনে এই যে আলোকসম্পাত করে, তাহাই—বাঙ্গলা এমন কি সমগ্র ভারতে নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করিল। মনস্বী বিপিন চন্দ্র পাল তাঁহার "The Memories of my Life and Times" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"The years 1875-1878 which synchronised with my life in the University in Calcutta, saw the birth of our new Nationalism, had its origin in a renaissance in Bengalee literature brought about by our contact with modern European thought. Bankimchandra was, in a special sense the prophet of this renaissance. The 'Bangadarshan' started in 1873-74 was the organ of it.........

The 'Bangadarshan' school did for contemporary Bengalee thought and literature what the French Encyclopaediests did for 18th century European thought and French literature."

মিল, বেন্থাম, হার্ব্বাট স্পেন্সার, কোম্‌ৎ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মতবাদ বঙ্গদর্শনের বঙ্কিমচন্দ্রের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু পরবর্ত্তিকালে বঙ্কিমচন্দ্রকে এই পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাব হইতে আমরা সম্পূর্ণ মুক্ত দেখিয়াছি। ভারতীয় ও য়ুরোপীয় উভয়বিধ দর্শনেই তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল কিন্তু ভারতীয় দর্শনকে ভিত্তি করিয়াই প্রচারক বঙ্কিমচন্দ্র দেখা দিলেন। পূর্ণ মনুষ্যত্বই ছিল তাঁহার আদর্শ এবং ধর্ম্মতত্ত্বে ইহারই বিস্তৃত আলোচনা তিনি করিয়াছেন।

মনুষ্যত্বের পূর্ণ-বিকাশ-সাধনই এই ধর্ম্মের মূল-কথা। তাঁহার মতে পূর্ণ-মনুষ্যত্বই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম।

মানবের বৃত্তিনিচয়কে বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ চারিভাগে ভাগ করিয়াছেন, যথা—শারীরিকী জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী। পূর্ণমনুষ্যত্বলাভ করিতে হইলে মানবকে তাহার সমুদয় বৃত্তিরই সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। এইখানে ইহা আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, মানবের কোনও বৃত্তিরই উচ্ছেদ বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ নহে। তিনি বলিয়াছেন—"ইন্দ্রিয় সকলের সম্পূর্ণ বিলোপ ধর্ম্মানুমত নহে। তাহাদের ধর্ম্মানুমত। বিলোপে ও সংযমে অনেক প্রভেদ।" তিনি যে পুরুষকে পূর্ণমনুষ্যত্বের প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন তিনি অর্জ্জুনকে উপদেশনিরত শ্রীকৃষ্ণ। অর্জ্জুনকে এই শ্রীকৃষ্ণ এক ভীষণ সমরে প্রবুদ্ধ করিতেছেন। অর্জ্জুনের ঘর্ঘর-চক্রিত সমর-রথের হয়-বল্গা ইঁহার হাতে। ইহাও বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, পূর্ণমানবতার আদর্শ এই শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসী নহেন—তিনি গৃহী।

পূর্ণমনুষ্যত্বলাভের ভিত্তি হইতেছে পূর্ণজ্ঞানলাভ। এই জ্ঞান দ্বিবিধ—বহির্ব্বিষয়ক ও অন্তর্ব্বিষয়ক। জীব, জগৎ ও ঈশ্বর এই ত্রিবিধ বিষয়ে জ্ঞানের মধ্যে জীব এবং জগৎ সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান অর্থাৎ যে জ্ঞানের অধিকারে য়ুরোপ ও আমেরিকা—এবং তাহারই অনুকরণ করিয়া জাপান, আজ এত শক্তিসম্পন্ন তাহাই বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান। ঈশ্বর বিষয়ক যে জ্ঞান অর্থাৎ যে অধ্যাত্ম জ্ঞানের অধিকারে প্রাচীন হিন্দু জাতি জগতে গৌরবের আসন অধিকার করিয়াছিল তাহাই অন্তর্ব্বিষয়ক জ্ঞান।

বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত এই যে, পূর্ণ মনুষ্যত্বলাভের নিমিত্ত এই উভয়বিধ জ্ঞানই অপরিহার্য্য। এই জ্ঞান শুদ্ধমাত্র তাত্ত্বিক দিক্ হইতে লাভ করিলেই হইবে না—ব্যবহারিক জীবনে তাহার যথাযথ প্রয়োগও চাই। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য, মঙ্গলের জন্য, ভারতবাসীর পক্ষে এই বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান যে একান্ত

আবশ্যক ইহা উপলব্ধি করিয়া, বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে ভারতবর্ষকে য়ুরোপের শিষ্যত্ব স্বীকার করিবার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব ও আনন্দমঠের উপসংহার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পূর্ণ মনুষ্যত্বলাভের এই আদর্শের সন্ধান বঙ্কিমচন্দ্র পাইয়াছিলেন গীতায় উক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগের মধ্যে। গীতা ব্যতীত পৃথিবীর কোনও দর্শন বা ধর্ম্মশাস্ত্রে, পূর্ণ মনুষ্যধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যাত হয় নাই, ইহাই ছিল তাঁহার সুস্পষ্ট অভিমত। অন্ধ অনুরক্তি দুর্ব্বল ভাবপ্রবণতা বা সুলভ উচ্ছ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি গীতার নিষ্কাম কর্ম্মযোগকে পূর্ণ-মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার প্রত্যেকটি মতবাদ বলিষ্ঠ ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি লোকদুর্ল্লভ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। কোনও কিছু গ্রহণ বা পরিহার করিতে হইলে তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে তাহা তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া, তবে সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন। যাহার উপর ভিত্তি করিয়া পরবর্ত্তী বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত সৃষ্টি দণ্ডায়মান—গীতার সেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগমূলক ব্যাখ্যা, বর্ত্তমানযুগে বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট হইতেই আমরা প্রথম শুনিতে পাইলাম।

বৈদিক যুগ হইতে হিন্দুর বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ পূর্ণজ্ঞানলাভের দ্বারা চরম সাধ্যে বা মুক্ত অবস্থায় উপনীত হওয়ার পর দ্বিবিধ নিষ্ঠার নির্দ্দেশ দেন ; যথা—

(১) সাংখ্য (কর্ম্মসন্ন্যাস)

(২) যোগ (কর্ম্মযোগ)

যাঁহারা সাংখ্য বা কর্ম্মসন্ন্যাসে বিশ্বাসী তাঁহারা মুক্তি সাধনের পথে কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু পূর্ণজ্ঞান ভক্তি বা ব্রাহ্মীস্থিতিরূপ চরমসাধ্যে উপনীত হওয়ার পর সকল কর্ম্ম এমন কি লোক সংগ্রহার্থ কর্ম্মও পরিত্যাগ করিবার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এই নির্দ্দেশ কেবলমাত্র ব্রাহ্মীস্থিতি বা চরম সাধ্যে উপনীত হওয়ার পরই নহে, যে কোনও অবস্থায়, বৈরাগ্যের সঞ্চার হইলেই, তাঁহারা সংসার ত্যাগ ও কর্ম্মত্যাগ বিহিত করিয়াছেন—

"যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।"

ইঁহাদের মতে জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে স্বভাবতঃই বিরোধ বিদ্যমান এবং কর্ম্মমাত্রই বাসনাত্মক নিবন্ধন বন্ধনস্বরূপ।

অপর পক্ষে যাঁহারা যোগ বা কর্ম্মযোগে আস্থাবান, তাঁহারা পূর্ণ জ্ঞানলাভের পরও কর্ম্মকে স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে কর্ম্মের কোনও বন্ধকত্ব নাই, কর্ত্তার বাসনাত্মক বুদ্ধিই বন্ধনের কারণ। ইঁহারা বলেন সাধনার দ্বারা পূর্ণজ্ঞানীর চিত্ত এমন শুদ্ধ অবস্থায় উন্নীত হয়, যখন আকাঙ্ক্ষাবিরহিত ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করাও সম্পূর্ণ সম্ভবপর। ইঁহারা, পূর্ণজ্ঞানীর পক্ষেও স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া লোক-সংগ্রহার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ দেন।

এই দুই পন্থীর পরস্পরের মতবাদ লইয়া আবহমান কাল হইতেই বিবাদ ছিল। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই দুই বিরোধী মতের অর্থাৎ জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় আমরা প্রথম পাইলাম। জ্ঞান ভক্তি-সমন্বিত কর্ম্মযোগের প্রাধান্যই গীতায় গূঢ়ভাবে সূচিত হইয়াছে।

কিন্তু জ্ঞান ও ভক্তি সমন্বিত কর্ম্মযোগ গীতার তাত্ত্বিক বিচারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও ভারতবাসীর ব্যবহারিক জীবনে তাহার বিকাশের অবকাশ আসিল না।

গীতার অব্যবহিত পরবর্ত্তিকালেই বুদ্ধের আবির্ভাব হয় এবং বৌদ্ধমতের প্রভাবে ভারতের জাতীয়-জীবন নৈষ্কর্ম্ম ও সন্ন্যাসের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে। অবশ্য কয়েক শত বৎসরের মধ্যেই বৌদ্ধমতাবলম্বিগণ হীনযান ও মহাযান এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়েন ও কর্ম্মসমর্থক মহাযান পন্থীদের অভ্যুদয় হয়। যদিও মহাযান পন্থার মুখ্যপ্রবর্ত্তক নাগার্জ্জুন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কর্ম্মযোগের সূত্রাবলম্বনে প্রচলিত বৌদ্ধ মতবাদের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মকে বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া তুলেন, তথাপি গীতায় উক্ত জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি সমুচ্চয়ে জাতীয়-জীবনে কর্ম্মের প্রেরণা লক্ষিত হয় নাই, অথবা সন্ন্যাস ও নৈষ্কর্ম্মের প্রতি জাতির মজ্জাগত আসক্তিরও কোনও পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই।

বুদ্ধের মৃত্যুর প্রায় ত্রয়োদশ শত বর্ষকাল পরে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবে বৌদ্ধপ্রভাবিত ভারতবর্ষ আলোড়িত হইয়া উঠে। শঙ্করাচার্য্য তাত্ত্বিক বিচারে

বৌদ্ধ শূন্যবাদ সম্পূর্ণভাবে খণ্ডন করিয়া, অদ্বৈত ব্রহ্মবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেন; কিন্তু যে তাত্ত্বিক বিচারের উপর অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠা তাহার তত্ত্বাঙ্গের মধ্যেও কর্ম্ম পূর্ব্ববৎ গৌণই রহিয়া গেল। বর্ত্তমানে গীতার ভাষ্য সকলের মধ্যে শঙ্কর-ভাষ্যই প্রাচীনতম। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে গীতার নিষ্কাম কর্ম্মযোগমূলক ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া কর্ম্ম সন্ন্যাসকেই প্রতিষ্ঠিত করেন, ফলে ভারতের জাতীয়-জীবনে কর্ম্মবিমুখতা ও সন্ন্যাসের প্রতি আসক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হয়। লোকমান্য তিলক তাঁহার 'গীতা-রহস্য' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তকেরা কাপিল সাংখ্যের মত স্বীকার করিয়া, সংসার হইতে বাহির হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ ব্যতীত মোক্ষ নাই এই মত বিশেষরূপে প্রচলিত করেন। স্বয়ং বুদ্ধ ত' যৌবনেই রাজ্য ও স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন; ইহা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে। জৈন ও বৌদ্ধমত শ্রীশঙ্করাচার্য্য খণ্ডন করিলেও, জৈন ও বৌদ্ধেরা যে সন্ন্যাস ধর্ম্ম বিশেষরূপে প্রচলিত করিয়াছিলেন তাহাই শ্রৌত-স্মার্ত্ত সন্ন্যাস বলিয়া আচার্য্য বজায় রাখিয়াছেন এবং গীতায় সেই সন্ন্যাস ধর্ম্মই প্রতিপাদ্য বিষয়, গীতার এইরূপ অর্থও তিনি বাহির করিয়াছেন।"

(গীতা-রহস্যের বঙ্গানুবাদ—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ)

শ্রীঅরবিন্দ ও এই ঐতিহাসিক ধারা লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার গ্রন্থ "Essays on the Gita"য় লিখিয়াছেন—

"The Brahman of the Mayavādins is silent, immutable and inactive; so too is the Purusha of the Sankhya; therefore for both ascetic renunciation of life and works is a necessary means of liberation. But for the Yoga of the Gita, as for the Vedantic Yoga of works, action is not only a preparation but itself the means of liberation; and it is the justice of this view which the Gita seeks to bring out with such an unceasing force and insistence,—an insistence unfortunately, which could not prevail in India against the tremendons tide of Buddhism, was lost afterwards in the intensity of ascetic illusionism and the fervour of world-shunning saints and devotees and is only now begining to exercise its real and salutary influence on the Indian mind."

শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী গীতার ভাষ্যকারগণেরও কাহারও ভাষ্যে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ছত্রপতি শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামীকৃত মারাঠি ভাষায় লিখিত 'দাসবোধ' নামক গ্রন্থে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের প্রাধান্য স্থাপন প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা সাধারণ্যে প্রচার লাভ করে নাই। ব্যক্তিগত ভাবে শিবাজী এবং তাঁহার অনুগামিগণের জীবনের উপর তাহার প্রভাব কতকটা পড়িলেও, ভারতের বৃহত্তর জাতীয়-জীবনে তাহার কোন প্রভাবই লক্ষিত হয় নাই।

বর্ত্তমান যুগে অর্থাৎ খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মনস্বী বঙ্কিম তাঁহার গীতার ব্যাখ্যায় জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি সমুচ্চয়ে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের প্রাধান্য সর্ব্বপ্রথম সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—

"পূর্ব্বগামী হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ—কর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ। গীতার উপদেশ—কর্ম্ম এমন চিত্তে কর যে, তাহাতেই সন্ন্যাসের ফল প্রাপ্ত হইবে। নিষ্কাম কর্ম্মই সন্ন্যাস।...গীতায় উক্ত সন্ন্যাসবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মহীন সন্ন্যাস নিকৃষ্ট সন্ন্যাস; ভক্ত্যাত্মক কর্ম্মযুক্ত সন্ন্যাসই যথার্থ সন্ন্যাস।"

"সন্ন্যাস কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥"

বঙ্কিমচন্দ্র কর্ম্মযোগের এই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবার কালে—প্রচলিত মত-বিরুদ্ধ বলিয়া ইহার তাৎকালিক সর্ব্বজনস্বীকৃতি বিষয়ে তিনি সন্দিহান ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—

"বলা বাহুল্য যে, এই কথা জ্ঞানবাদী শঙ্করাচার্য্যের মতের বিরুদ্ধ। তাঁহার মতে জ্ঞান-কর্ম্মে সমুচ্চয় নাই। শঙ্করাচার্য্যের মতের যাহা বিরোধী, শিক্ষিত সম্প্রদায় ভিন্ন আর কেহ আমার কথায় তাহা এখনকার দিনে গ্রহণ করিবেন না, ইহা আমি জানি।"

পরবর্ত্তিকালে লোকমান্য তিলক তাঁহার 'গীতা-রহস্যে' এবং শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার "Essays on the Gita" নামক পুস্তকে স্ব স্ব ধারায় গীতার যে নিষ্কাম কর্ম্মযোগমূলক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা মূলতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিক ব্যাখ্যারই পূর্ণ পরিপোষক।

লোকমান্য তাঁহার 'গীতা-রহস্য' নামক গ্রন্থের প্রস্তাবনায়, বর্ত্তমানযুগে তিনিই যে প্রথম গীতার নিষ্কাম কর্ম্মযোগমূলক ব্যাখ্যা প্রদান করিতেছেন তৎসম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—"গীতার উপর যে শাঙ্কর ভাষ্য আছে তাহার তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে পুরাতন টীকাকারদের অভিপ্রায়ের উল্লেখ আছে ; এই উল্লেখ হইতে জানা যায় যে গীতার উপর পূর্ব্বে সম্ভবতঃ কর্ম্মযোগপ্রধান টীকা ছিল। কিন্তু এ সময়ে এই টীকা উপলব্ধ নাই ; অতএব ইহা বলিতে ক্ষতি নাই যে, গীতার কর্ম্মযোগপ্রধান ও তুলনাত্মক বিচার ইহাই প্রথম

(গীতা-রহস্যের বঙ্গানুবাদ—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ)

লোকমান্য বঙ্গভাষার সহিত পরিচিত ছিলেন না এবং সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের গীতার কর্ম্মযোগপ্রধান ব্যাখ্যা সম্বন্ধেও তিনি অনভিজ্ঞ ছিলেন। কারণ ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে রাজদ্রোহ অপরাধে ছয় বৎসর ব্যাপী কারাদণ্ড ভোগকালে, কারাকক্ষে বসিয়া লোকমান্য তাঁহার গীতা-রহস্য লিপিবদ্ধ করেন। গীতা-রহস্যে তাঁহার স্বলিখিত প্রস্তাবনায় দেখিতে পাওয়া যায়—"সন ১৯১০-১১র শীতকালে (সম্বৎ ১৯৬৭ কার্ত্তিক, শুক্ল ১ হইতে চৈত্র ৩০শের ভিতরে) এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি (মুসাবিদা) মাণ্ডালের জেলখানায় সর্ব্বপ্রথম লিখিত হইয়াছিল।"

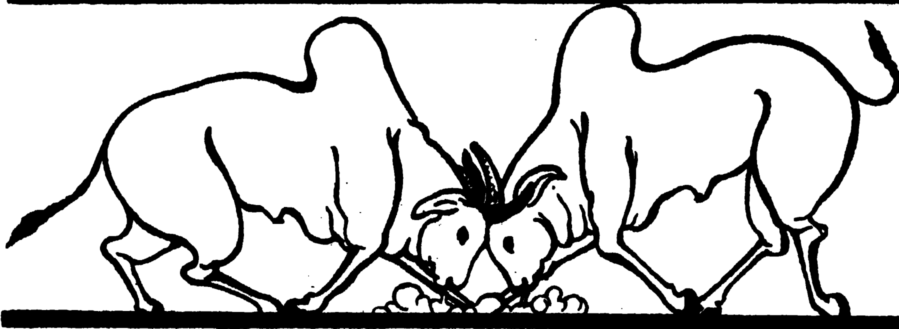
(গীতা-রহস্যের বঙ্গানুবাদ—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ)

বঙ্কিমচন্দ্রের গীতার ব্যাখ্যা ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে 'প্রচার' নামক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহারও পূর্ব্বে 'নবজীবন-এ' অনুশীলন ধর্ম্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র গীতার নিষ্কাম কর্ম্মযোগের তত্ত্বকেই মানবের পূর্ণধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং 'প্রচার'-এ কৃষ্ণচরিত্রে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বিশ্লেষণের দ্বারা, সেই তত্ত্বেরই পূর্ণপ্রকাশ বা প্রতীকরূপে শ্রীকৃষ্ণকে উপস্থাপিত করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র লোকান্তরিত হ'ন।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার "Essays on the Gita" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"The great writer Bunkim Chandra Chatterjee first gave to the Gita, this new sense of a Gospel of Duty."

বহুশত বৎসর পরে, ভারতের কর্ম্মবিমুখ পঙ্গু ও আড়ষ্ট জাতীয় জীবনে খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে যে অভূতপূর্ব্ব কর্ম্মপ্রেরণা দেখা দিয়া নবযুগ সূচনা করিয়াছে সেই জাগরণের মূলে বঙ্কিম ব্যাখ্যাত কর্ম্মযোগ প্রধান গীতা-ধর্ম্মের প্রভাব কতখানি তাহা ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসকারই নিরূপণ করিবেন।

বাঙ্গলার এবং ভারতের দুর্ভাগ্য যে তিনি গীতার মাত্র চারিটি অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষ করিবার অবসর পাইয়াছিলেন ; অপ্রত্যাশিত অকালে তাঁহার ডাক পড়িল—বঙ্কিমচন্দ্র মধ্য-গগনেই অস্তমিত হইলেন।



মারণের মহাযজ্ঞে

শ্রী রাধাকান্ত গোস্বামী

১

হে রুদ্র প্রলয়ঙ্কর,
জীবনের ধ্বংস লাগি' মরণের অস্ত্র ভয়ঙ্কর
তোমার কল্পনা হ'তে সৃজন করেছ তুমি যত
সৃষ্টির প্রথম প্রাতে,—আজি তারা জীর্ণ পরাহত।
বজ্র-শিরে পড়ে বাজ, ভূমিকম্প কাঁপে থরহরি',
ঝঞ্ঝা ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস, দাবানল হ'তে অশ্রু ঝরি'
পড়ে ধূর্জটীর পায়, ধূমকেতু পুচ্ছ ফেলি' ছুটে,
সূর্য্য চায় স্নিগ্ধ চোখে, ব্যাধির বিজয়-গর্ব্ব টুটে।

২

হে করাল মহাকাল,
তোমার তাণ্ডব-লীলা মানবের বক্ষে মোহজাল,
করেছে বিস্তার এতদিন—ভয়কুণ্ঠ আর্ত্তনাদে
তব স্তব গেয়েছে সে জুড়ি' পাণি নম্র আঁখিপাতে।
আজি তব শস্ত্রশালে ব্রহ্মাগ্নি-আয়ুধ-তেজোবল
নিমেষে উগারি' অগ্নি ধ্বংস করে শূন্য-জল-স্থল।
দেবতার দণ্ড হ'তে নরদণ্ড তীব্র শতগুণে—
কে জানে কাহার লাগি' মৃত্যুবাণ গুপ্ত আছে তূণে!

৩

নিঃশব্দ রুদ্রের ভেরী
মহাপ্রলয়ের মুখে মানুষের রুদ্র মূর্ত্তি হেরি'।
মহাশূন্যে গ্রহতারা ভ্রষ্টপথে যাত্রা করে সুরু,
সমুদ্র-তরঙ্গবক্ষ স্তম্ভিত স্পন্দিত দুরু-দুরু,
কুসুমে কণ্টক ফুটে, বনভূমে পক্ষী-পশু কাঁপে,
নরনারী ঊর্দ্ধমুখে বিধাতায় দিবারাত্র শাপে,
মারণের মহাযজ্ঞে দেবতারে ছাড়ায়ে মানব,
পূর্ণ-বিকশিত-অঙ্গ আপনারে গড়িল দানব।

নিশীথে

শ্রী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

রায় বাহাদুর দ্বিজনাথ চৌধুরীর কন্যার বিবাহ আগামী কল্য।

দ্বিজনাথ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, দস্তুরমত সাহেব, ঘোরতর নীতিপরায়ণ এবং কর্ত্তব্যপালনে সম্পূর্ণ দয়ামায়াশূন্য। অত্যন্ত, রাশভারি লোক; তাঁহার সম্মুখে গুরুতর বিষয় ছাড়া অন্য কথা উত্থাপন করিতে গেলে মনে হয় ধৃষ্টতা করিতেছি। আইন বা নীতি যে-ব্যক্তি একবার রেখামাত্র ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, দ্বিজনাথ বাবুর গৃহে তাহার প্রবেশ নিষেধ—তা সে যতবড়ই পরমাত্মীয় হোক না কেন।

তাঁহার স্ত্রী, প্রথম শ্রেণীর ট্রামের পশ্চাতে দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রামের মত, সর্ব্বদা স্বামীর অনুগামিনী ছিলেন; স্বনির্ব্বাচিত পথে চিন্তা করিবার শক্তি তাঁহার ফুরাইয়া গিয়াছিল। মাঝে মাঝে অতি গোপনে তাঁহার শীর্ণ গণ্ড বাহিয়া অশ্রুর ধারা নামিতে দেখা যাইত কিন্তু তাহা কেবল অন্তর্যামী দেখিতে পাইতেন।

মেয়ের বয়স আঠারো উনিশ। সাহেবিয়ানার দৌলতে সে সমশ্রেণীর স্ত্রীপুরুষ সকলের সহিত মিশিতে পাইত; এমন কি স্বামী নির্ব্বাচন ব্যাপারেও তাহার অভিরুচিকে সম্পূর্ণ অবহেলা করা হয় নাই। কিন্তু দড়ি আল্‌গা হইলেও খোঁটা এতই শক্ত ছিল যে নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর বাহিরে পা বাড়াইবার শক্তি তাহার ছিল না।

মেয়ের নাম রূপলেখা। সুন্দরী মেয়ে, চোখের দৃষ্টি ভারি নরম, সর্ব্বদাই চোখদুটিতে হাসির টুক্‌রা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। আবার কদাচিৎ বেদনার মেঘে ছায়াচ্ছন্ন হইয়া আসিতেও পারে। অন্তরের গভীরতা মুখের সহজ স্মিত প্রসন্নতায় সহসা ধরা পড়ে না। রূপলেখাকে তাহার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবী সকলেই লেখা বলিয়া ডাকিত। কেবল দুই জন বলিত—রূপু। একজন তাহার মা; আর অন্য জন—

কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম প্রকাশ্যে উল্লেখযোগ্য নয়, দ্বিজনাথবাবু জানিতে পারিলে অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা।

রূপলেখার বিবাহের আগের সন্ধ্যায় দ্বিজনাথ বাবুর ড্রয়িংরুমে একটি মাঝারি গোছের মজলিশ বসিয়াছিল। বাহিরের লোক বড় কেহ ছিল না; দু'চার জন আত্মীয়, রূপলেখার কয়েকটি ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবী এবং ভাবী বর।

দ্বিজনাথবাবু কোথায় একটা সরেজমিন তজবিজে গিয়াছেন এখনও ফেরেন নাই; বোধ করি কর্ত্তব্য কর্ম্মের শেষ বিন্দুটুকু অবশিষ্ট রাখিয়া ফিরিবেন না। গৃহিণী ঘরের এক কোণে একটি বৃহৎ চেয়ারে প্রায় নিমজ্জিত হইয়া বসিয়া আছেন এবং মাঝে মাঝে এদিক ওদিক চাহিয়া সময়োচিত প্রফুল্লতার সহিত হাসিবার চেষ্টা করিতেছেন। আশেপাশে বৃহদায়তন ঘরের এখানে-ওখানে অতিথিরা বসিয়া মৃদুস্বরে গল্পগুজব করিতেছেন। মাঝে মাঝে তক্‌মাধারী ভৃত্যেরা আসিয়া চা প্রভৃতি পরিবেশন করিয়া যাইতেছে। ঘরে আলোর বাহুল্য নাই, অথচ অন্ধকারও নয়; বেশ একটি মোলায়েম আবহাওয়া ঘরটিকে পরিবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

ভাবী বরের নাম প্রমথ। সে লাজুক ও ভালমানুষ গোছের যুবক; ওকালতীতে সুবিধা করিতে না পারিয়া সুপারিশের জোরে মুন্সব পদে উন্নীত হইয়াছে। ওকালতী করিবার জন্য যে সব সদ্গুণ আবশ্যক, হাকিমীতে তাহার প্রয়োজন নাই, তাই সকলেই আশা করিতেছেন—

কিন্তু প্রমথর আদ্যোপান্ত পরিচয়ের প্রয়োজন নাই; সে ভালমানুষ ও সুশ্রী, রূপলেখা তাহাকে পছন্দ করিয়াছে এবং দ্বিজনাথ বাবুর আপত্তি হয় নাই—আমাদের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

ড্রয়িংরুমের যে-দরজাটা একটা বারান্দা পার হইয়া পাশের বাগানে গিয়া পড়িয়াছে তাহারই এক পাশে একটা কৌচে বসিয়া প্রমথ একাকী চা পান করিতেছিল ও চকিতভাবে এদিক ওদিক তাকাইতেছিল। এই চকিত চাহনির কারণ, রূপলেখা এতক্ষণ এই ঘরেই ছিল কিন্তু সহসা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। দ্বিজনাথ বাবুর একটি বর্ষীয়সী আত্মীয়া হঠাৎ আসিয়া প্রমথর সহিত গল্প জুড়িয়া দিয়াছিলেন; প্রমথ তাঁহাকে লইয়াই ব্যস্ত ছিল। তারপর তিনি হঠাৎ উঠিয়া গিয়া আর একজনের সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিলেন। প্রমথ তখন ঘরের চারিপাশে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল রূপলেখা ঘরে নাই—অলক্ষিতে কখন ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

অভাবনীয় ব্যাপার কিছু নয়। কিন্তু তবু প্রমথ একটু উৎকণ্ঠিতভাবেই ইতি-উতি চাহিতেছিল। প্রেমিকের চক্ষু নাকি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়; আজ এখানে পদার্পণ করিয়াই প্রমথ অনুভব করিয়াছিল কোথায় যেন একটু খিচ্ আছে। তাহাকে দেখিয়া রূপলেখার চোখে আলো ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিয়াছিল বটে কিন্তু সেই আলোর পশ্চাতে অজ্ঞাত উদ্বেগের বাষ্প মেঘের আকারে পুঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে তাহাও যেন সে কোনও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছিল। তারপর রূপলেখা হাসিয়াছে কথা কহিয়াছে, একবার চা দিবার ছলে ক্ষণেকের জন্য তাহার পাশে বসিয়াছে—কিন্তু তবু প্রমথর মনের কাঁটা দূর হয় নাই। তারপর দ্বিজনাথ বাবুর বর্ষীয়সী আত্মীয়ার নিকট মুক্তি পাইয়া যখন সে দেখিল রূপলেখা ঘরে নাই, তখন সে বাহিরে ধীরভাবে চা পান করিতে থাকিলেও মনে মনে বেশ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

চায়ের বাটি শেষ করিয়া প্রমথ কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া অনিশ্চিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে এমন সময় পাশের দরজা দিয়া রূপলেখা প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। প্রমথ দেখিল ঘরের মৃদু আলোকেও তাহার মুখখানা ফ্যাকাসে বোধ হইতেছে, নিশ্বাস যেন একটু দ্রুত চলিতেছে; চোখে চাপা উত্তেজনা।

প্রমথ কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই রূপলেখা চমকিয়া তাহার পানে তাকাইল, তারপর আত্মসম্বরণ করিয়া একটু ফিকা রকমের হাসিল।

প্রমথ বলিল,—'তোমাকে ঘরে দেখতে না পেয়ে—। বাগানে গিছলে বুঝি?'

'—হাঁ—ঘরে গরম হচ্ছিল—তাই—একটু বাগানে গিয়ে বসেছিলুম—' রূপলেখার নিশ্বাসের দ্রুততা তখনও শান্ত হয় নাই।

প্রমথ গলা খাটো করিয়া সাগ্রহে বলিল,—'চল না—তাহলে বাগানেই খানিক বসা যাক—।'

'বাগানে? না না—এখন থাক, এখন আর আমার গরম বোধ হচ্ছে না—।'

গরম বোধ হইবার কথা নয়, কারণ সময়টা মাঘ মাস। এবং বাগানের অন্ধকারে বৃদ্ধ আর্দ্দালি চৈত সিং চুপি চুপি কাগজের যে টুক্‌রাটা তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া প্রস্থান করিয়াছিল, তাহাতে উত্তাপের

সংস্পর্শ কতখানি ছিল অন্তর্যামীই জানেন; কিন্তু বুকের অত্যন্ত নিকটে লুক্কায়িত থাকিয়া কাগজের টুক্‌রাটা রূপলেখার বুকে দুরু দুরু কম্পনই জাগাইয়া দিয়াছিল।

বুকের উপর একবার হাত রাখিয়া সে ভীতভাবে আবার হাত সরাইয়া লইল।

'—আমি—আমি এখুনি আসছি—'

প্রমথ দাঁড়াইয়া রহিল; রূপলেখা সহজতার একটা বাঁধা হাসি মুখে লইয়া সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া ঘরের অন্য একটা দরজা দিয়া অন্দরের দিকে প্রস্থান করিল।

কিন্তু সহজতার অভিনয় করিলেও কৌতূহলীর দৃষ্টি এড়ানো সহজ নয়। ঘরের মধ্যেই কেহ কেহ রূপলেখার মানসিক অ-সহজতার আভাস পাইয়াছিলেন, এবং নিম্ন কণ্ঠে কিছু কিছু জল্পনাও চলিতেছিল।

ঘরের নির্জ্জন কোণে এক মিথুন বসিয়া বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলেন। মহিলাটি দৃষ্টি দ্বারা রূপলেখার অনুসরণ করিয়া শেষে বলিলেন,—'আজ লেখার কী যেন হয়েছে—ছট্‌ফট ক'রে বেড়াচ্ছে।'

পুরুষটির অধর কোণে একটু হাসি খেলিয়া গেল, তিনি মহিলাটির প্রতি একটি অর্দ্ধ নিমীলিত কটাক্ষ করিয়া বলিলেন,—'ও কিছু নয়।—বিয়ের আগের রাত্রে মেয়েদের অমন হয়ে থাকে।'

মহিলাটি একটু মাথা নাড়িলেন।

'না, ও সে জিনিষ নয়।—কিছু একটা হয়েছে।'

রূপলেখা তখন ঘরের বাহির হইয়া গিয়াছে। পুরুষটি ঘরের চারিদিকে চাহিতে চাহিতে বলিলেন,—'আজ আত্মীয় বন্ধু সকলেই এসেছেন দেখছি—শুধু—'

'—শুধু একজন নেই।'

'চুপ,—দ্বিজনাথ বাবু।'

গৃহস্বামী বাহির হইতে দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তীক্ষ্ণ চক্ষে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মাথার হেল্‌মেট্‌ খুলিয়া ফেলিলেন। ঘর নিস্তব্ধ হইয়া রহিল; কেহ কেহ উঠিয়া দাঁড়াইল। দ্বিজনাথ বাবু তুষারকঠিন কণ্ঠে বলিলেন,—'আমার দেরী হয়ে গেল। কাজ ছিল।—আসছি এখুনি—' বলিয়া টুপী মস্তকে স্থাপন করিয়া ভিতরের দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন।

দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া তিনি একবার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—'রূপলেখা কোথায়?' তারপর উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই প্রস্থান করিলেন।

দ্বিজনাথ বাবুর স্ত্রী উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, আবার ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলেন। ঘরের মধ্যে বহু দীর্ঘনিশ্বাস পতনের সমবেত শব্দ হইল, যেন সকলে এতক্ষণ শ্বাসরোধ করিয়া বসিয়াছিল।

* * * * *

যে কন্যার বিবাহ আগামী কল্য, মধ্যরাত্রে তাহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করা রুচিবিগর্হিত কিনা এ বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও থাকিতে পারে; কিন্তু ঐ কন্যার মনের মধ্যে প্রবেশ করা একেবারেই ভদ্রতা বিরুদ্ধ। কথায় বলে স্ত্রিয়শ্চরিত্রং—। তাহাদের মন লইয়া নাড়াচাড়া করা নিরাপদ নয়; কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ বাহির হইয়া পড়িতে পারে। তাই আমরা ফটোগ্রাফের ক্যামেরার মত রূপলেখার বহিরাচরণ লিপিবদ্ধ করিয়াই নিরস্ত হইব, তাহার মনের ধার ঘেঁষিয়াও যাইব না।

গভীর রাত্রি। ঘর নিস্তব্ধ। সিঙার—মেজের উপর একটি মোমবাতি জ্বলিতেছে। বাহিরের

দিকের জানালা ঈষৎ খোলা, কন্‌কনে বাতাস নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া বাতির শিখাটাকে মাঝে মাঝে কাঁপাইয়া দিতেছিল।

সন্ধ্যা বেলার পোষাকী সাজ ছাড়িয়া রূপলেখা মামুলি শাড়ি শেমিজের উপর একটা র‍্যাপার জড়াইয়া নিজের বিছানায় পা ঝুলাইয়া বসিয়া ছিল। রাত্রি বারোটা অনেকক্ষণ বাজিয়া গিয়াছে; পাশের ঘরে দ্বিজনাথ বাবু ও তাঁহার স্ত্রীর কথাবার্ত্তার শব্দ আধঘণ্টা পূর্ব্বে থামিয়া গিয়াছে, বোধহয় তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। রূপলেখার চোখে কিন্তু ঘুম নাই; ঈষৎ-খোলা জানালাটার দিকে অপলক চক্ষে চাহিয়া সে বসিয়া আছে।

ঠং করিয়া কোথায় একটা ঘড়ি বাজিল।

রূপলেখা উঠিয়া দাঁড়াইল। মেঝে কার্পেট পাতা; তবু সে অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। ভেজানো দরজার ওপারে বাবা—মা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন; রূপলেখা কান পতিয়া শুনিল, ও ঘরে শব্দ মাত্র নাই। দ্বিজনাথ বাবুর প্রচণ্ড দাপটে বাড়ীতে কাহারও নাক ডাকিত না।

ফিরিয়া আসিয়া রূপলেখা সিঙার-মেজের সম্মুখে দাঁড়াইল। মোমবাতির পীতাভ শিখার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বুকের ভিতর হইতে সেই কাগজের টুকরা বাহির করিল। সেটা খুলিয়া মোমবাতির আলোয় পড়িতে পড়িতে তাহার ঠোঁট দুটি কাঁপিতে লাগিল।

চিঠিতে লেখা ছিল:

"এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ কি মনে হল ট্রেন থেকে নেমে পড়লুম। হঠাৎ চৈত সিংয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল; বুড়োর কাছে শুনলুম কাল তোমার বিয়ে!! রাত্রে শোবার ঘরের জানলা খুলে রেখো। আমি আসব। তোমাকে একবার দেখতে ইচ্ছে হচ্চে।"

চিঠিখানা পেন্সিলের আকারে পাকাইয়া রূপলেখা মোমবাতির শিখার কাছে লইয়া গেল; কিন্তু আগুনে সমর্পণ করিতে পারিল না—কি ভাবিয়া সেটাকে খুলিয়া ভাঁজ করিয়া আবার বুকের মধ্যে রাখিয়া দিল। বুকের ভিতর হইতে একটি শিহরিত নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

"রূপু!"

অতি মৃদু ডাক কাণে যাইতেই রূপলেখা চমকিয়া জানালার দিকে বিস্ফারিত চক্ষু ফিরাইল; তারপর ছুটিয়া গিয়া জানালার কবাট খুলিয়া ধরিল।

অবলীলাক্রমে জানালা উল্লঙ্ঘন করিয়া যে যুবকটি ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল তাহার বয়স বোধ করি বাইশ কি তেইশ। মাথায় রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল, গায়ে একটা টুইলের আধ-ময়লা কামিজ; মুখে বেপরোয়া দুঃসাহসিক ধৃষ্টতার ভাব, চোখদুটা জ্বলজ্বলে এবং অত্যন্ত সতর্ক। ঘরে অবতীর্ণ হইয়াই সে জানালা বন্ধ করিয়া দিল, তারপর রূপলেখার দুই হাত নিজের দুই মুঠিতে ধরিয়া তাহাকে বুকের কাছে তুলিয়া লইল। ব্যগ্র আনন্দে কথা কহিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া শ্যেন দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাইল।

তাহার দৃষ্টি সমস্ত ঘর ঘুরিয়া যখন রূপলেখার মুখের উপর ফিরিয়া আসিল তখন রূপলেখার দুই চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রুর ধারা নামিয়াছে; ঝাপসা অশ্রুর ভিতর দিয়া সে যুবকের মুখের পানে ক্ষুধিত চক্ষে চাহিয়া আছে।

নিঃশব্দ হাসিতে যুবকের মুখ ভরিয়া গেল। সে রূপলেখার হাত ছাড়িয়া দিয়া দু'হাতে তাহার কাঁধ

ধরিয়া কাছে টানিয়া আনিল, তারপর তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল,—'ও ঘরের খবর কি ?'

রূপলেখা যুবকের বুকের কামিজের উপর গাল ঘষিয়া গালের অশ্রু মুছিয়া ফেলিল ; ভগ্নস্বরে চাপা গলায় বলিল,—'মা—বাবা ঘুমিয়েছেন।'

যুবক তখন চিবুক ধরিয়া রূপলেখার মুখখানি তুলিয়া ধরিল, কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া শেষে যেন নিজ মনেই বলিল,—'রূপুরাণীর কাল বিয়ে। আশ্চর্য্য ! আমিও ঠিক এই সময়েই এসে পড়লুম !'

রুদ্ধস্বরে রূপু বলিল,—'আমি জানতুম—আজ সকালে ঘুম ভেঙে অবধি কেবল তোমার কথা—' তাহার গলা বুজিয়া গেল।

যুবক রূপলেখার হাত ধরিয়া খাটের দিকে লইয়া চলিল।

'এস—বসি।'

দু'জনে পাশাপাশি পা ঝুলাইয়া বসিল। বিছানাটি নরম ও শুভ্র ; পায়ের কাছে লেপ পাট করা রহিয়াছে। যুবক আড়চোখে সেই দিকে একটা লুব্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া সবলে লোভ সম্বরণ করিয়া ফিরিয়া বসিল। বলিল,—বেশীক্ষণ থাকতে পারব না—ক্ষণিকের অতিথি। সন্দেহ হয়, চৈত সিং ছাড়া আরও দু'একজন আমাকে চিনে ফেলেছে। আজ রাত্রেই পালাতে হবে।'

ত্রাসে রূপলেখার চক্ষু ডাগর হইয়া উঠিল ; যুবকের হাত চাপিয়া ধরিয়া সে বলিল,—'তবে ? কি হবে ? যদি ধরা পড়—?'

রূপলেখার ভয় দেখিয়া যুবক নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল, শেষে বলিল,—'যদি ধরে ফ্যালে, ঝুলিয়ে দিতে বেশী দেরি করবে না। পুলিস সব ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছে।'

যুবকের ঠোঁটের উপর হাত রাখিয়া রূপলেখা আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল,—'চুপ্ কর, চুপ্ কর—বোলো না—'

'আচ্ছা, ও কথা থাক।'—

যুবক একটু চুপ করিল, ঘাড় বাঁকাইয়া একবার দরজার পানে তাকাইল ; পাশের ঘরে নিদ্রিত থাকিয়াও দ্বিজনাথবাবু ইহাদের উপর অদৃশ্য প্রভাব বিস্তার করিতেছেন, তাঁহার অদূর-স্থিতি ইহারা মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারিতেছে না।

যুবক রূপলেখার আর একটু কাছে ঘেঁষিয়া বসিল, বলিল,—'ভাবী বরের নাম শুনলুম প্রমথ। পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়নি। লোকটি কেমন ?'

রূপু ঘাড় বাঁকাইয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল। যুবকের ঠোঁটে একটু হাসি খেলিয়া গেল ; সে আবার প্রশ্ন করিল,—'দেখতে কেমন ? শুনিই না।—আমার চেয়ে দেখতে ভাল নিশ্চয়ই ?'

রূপু পলকের জন্য যুবকের মুখের পানে চোখ তুলিয়া আবার চোখ নত করিয়া ফেলিল।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। ক্ষীণালোক ঘরে দু'জনে পাশাপাশি শয্যার উপর বসিয়া আছে। যুবক রূপলেখার আপাদমস্তক চোখ বুলাইয়া মৃদু হাস্যে বলিল,—'গায়ে একটু মাংস লেগেছে দেখছি।—বিয়ের জল ?'

পরিহাসে কাণ না দিয়া রূপলেখা মর্ম্মপীড়িত চোখ তুলিয়া বলিল,—'কিন্তু তুমি যে—তুমি যে বড্ড রোগা হয়ে গেছ।—কেন ? কেন ?'

যুবক শুধু একটু হাসিল। রূপলেখা বলিতে লাগিল,—'এই শীতে—মাগো—ঠাণ্ডা জামা—বলিতে বলিতে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

যুবক কামিজ তুলিয়া দেখাইল ভিতরে একটা সস্তা জাপানী সোয়েটার আছে।

মাথা নাড়িয়া রূপলেখা বলিল,—'তা হোক, ওতে কি শীত ভাঙে!'—

যুবক রূপলেখার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল,—'রূপু, বুকের রক্ত যার গরম তার গরম জামা দরকার হয় না।—কিন্তু এবার যেতে হবে। বিয়েটা দেখবার বড় সাধ হচ্ছিল, তা আর হ'ল না।'

খামখেয়ালী হাসিয়া যুবক উঠিবার উপক্রম করিল।

রূপলেখা তাহার হাঁটুর উপর হাত রাখিয়া তাহাকে উঠিতে দিল না, ব্যগ্র মিনতির স্বরে বলিল,—'আমার একটা কথা শুনবে?'

'কি?'

আঙুল হইতে আংটি খুলিতে খুলিতে রূপলেখা বলিল,—'এটা নাও।—যদি কখনো দরকার হয়—বিক্রি করলে -'

যুবকের মুখ কঠিন হইয়া উঠিল, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—'রূপু, এ বাড়ীর একটা কুটো আমি ছোঁব না।'

কাঁদিতে কাঁদিতে, আংটিটা তাহার হাতে গুঁজিয়া দিতে দিতে রূপলেখা বলিল,—'এ বাড়ীর নয়; এ আমার।—উনি আমাকে দিয়েছেন—'

যুবক সচকিতে আংটিটার দিকে চক্ষু ফিরাইয়া যেন পরম বিস্ময়ে সেটার পানে তাকাইয়া রহিল। তারপর রূপলেখার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল। নিঃশব্দ হাসি, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হয়, দুর্নিবার অট্টহাসির ধমকে সে এখনি ফাটিয়া পড়িবে।

দীর্ঘকাল পরে হাসি থামিলে যুবক সংযত ভাবে বলিল,—'আচ্ছা, নিলুম।' বলিয়া ক'ড়ে আঙুলে আংটি পরিধান করিল।

ঠং করিয়া কোথায় একটা ঘড়ি বাজিল। একটা—না দেড়টা?

যুবক নিতান্ত সহজভাবে বলিল,—'চললুম।—আবার কবে কোথায় দেখা হবে জানিনা। হয় ত—' কথা শেষ না করিয়া যুবক থামিয়া গেল, তারপর একটু হাসিয়া জানালার দিকে অগ্রসর হইল।

জানালার সম্মুখে পৌছিয়া কবাট খুলিয়াছে এমন সময় পিছন হইতে রূপলেখার সংহত কণ্ঠস্বর আসিল।

'যাচ্ছ?'

যুবক আবার ফিরিয়া আসিয়া রূপলেখার সম্মুখে দাঁড়াইল, ক্ষণকালের জন্য একটা ব্যথার ভাব তাহার মুখের উপর দিয়া খেলিয়া গেল।

'হ্যাঁ—চললুম। আড়াইটার সময় একটা ট্রেণ আছে, সেইটে ধরব।'

তারপর গভীর স্নেহে তাহাকে জড়াইয়া লইয়া কপালে একটি চুম্বন করিল, অস্ফুটস্বরে বলিল,—'সুখী হও—চিরায়ুষ্মতী হও।'

জানালা ডিঙাইয়া যুবক নিঃশব্দে বাহিরের অন্ধকারে মিশাইয়া গেল। মোম বাতিটা পুড়িয়া পুড়িয়া

প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল; খোলা জানালা পথে শীতল বাতাস প্রবেশ করিয়া তাহার শিখাটাকে কাঁপাইয়া দিতে লাগিল।

রূপলেখা বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। রোদনের অদম্য উচ্ছ্বাস শাসন মানিতে চায় না কিন্তু জোরে কাঁদিয়া মনের ব্যাকুলতাকে মুক্ত করিয়া দিবার উপায় নাই; পাশের ঘরে দ্বিজনাথ বাবু ঘুমাইতেছেন। রূপলেখা সজোরে বালিস কাম্‌ড়াইয়া ধরিয়া ভাঙা ভাঙা স্বরে বার বার বলিতে লাগিল—'দাদা! দাদা—!'

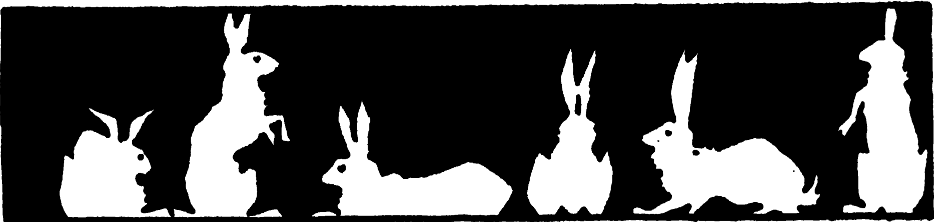
—•—

প্রভাতী

শ্রী সমীর ঘোষ

পূর্বাশার আলো লাগি' বাতায়ন গিয়াছে খুলিয়া
চৈত্রের রজনী তার নির্মাল্যের ডালিখানি লয়ে
চলে গেছে পৃথ্বীপারে; গেছি তাই আমিও ভুলিয়া
যামিনী বিগত হ'ল কা'র কানে কি বারতা ক'য়ে;
ভুলে গেছি প্রেমস্পর্শে কা'রো বক্ষ উঠিল দুলিয়া
ফুটিল কুমুদ কলি—শুভ্রাংশুর রাজত উদয়ে;
উষ্ণ কা'রো ছোট হাতে সেই ফুল দিয়াছি তুলিয়া
বলিয়াছি, এই সাথে দিনু তোরে আমার হৃদয়ে!

পূর্বাশার আলো এলো; বাতায়ন পৃথিবীর ডাক
শুনিয়াছে মেলে দিয়ে শ্যামবর্ণ পক্ষ দু'টি তার,
শুনায়েছে, এসো শুধু, তাই হোক—কণ্ঠে তব থাক
সুকোমল হাতে গাঁথা অনিন্দিত কুসুমের হার!
বসন্ত-বাসর-বাস-বিলাসের বাহিরে বৈশাখ
তোমারে দেখাবে আছে জীবনের সৌন্দর্য্য অপার!



দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান

শ্রী বিনায়ক সান্যাল

হাসিতে মানুষের জন্মগত অধিকার। ব্যঞ্জনে যেমন লবণ, মানুষের জীবনেও তেমনি এই হাসি। রচনা যতই ভাব-সমৃদ্ধ হোক্ না, তার মধ্যে যদি হাসি ছড়িয়ে না থাকে তবে তা কখনই আমাদের হৃদ্য হয় না। হাসির লবণ আছে ব'লেই তো তার লাবণ্য—প্রাণ-ভাণ্ডারের সেই উদ্বৃত্ত সঞ্চয় উন্মুক্ত হয় যাঁর রস-সৃষ্টিতে তিনি আমাদের নমস্য। রসিকতা সহজসাধ্য বস্তু নয়; সমবেদনায় ও বুদ্ধির বিভায় এর অঙ্গ ঝলমল!

বিদ্রূপ কর্‌বার অধিকার আছে তাঁরই, বেদনার উৎস আছে যাঁর অন্তরে। দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয় ছিল মমতায় ভরা; অশ্রুকে হাস্যে পরিণত করার ইন্দ্রজাল ছিল তাঁর!

জাতির জীবনকে মধুর ও সুন্দর করাই সাহিত্যের কাজ; বিশেষত, যে জাতি বহুদিনের পরাধীনতার ফলে তার স্বাধীন আনন্দকে একরকম ভুলেই গিয়েছে, সেই দুর্ভাগ্য জাতির জীবনে নির্মল হাস্য-রস যে কি সম্পদ তা' বলে' শেষ করা যায় না। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের এই হাসি কি কেবলই হাসি—চিন্তাশূন্য, মনের অহেতুক, তরল উচ্ছ্বাস? না; এ হাসি অশ্রুরই রূপান্তর। হাসি এবং কান্নাকে আপাতদৃষ্টিতে বিপরীত বলে' মনে হ'লেও তাদের মধ্যে ব্যবধান খুবই সামান্য। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসি কতকটা এই জাতীয়। ব্যক্তিগত আঘাতের উল্লাস এতে নেই—আছে সমাজ-জীবনের নানা অনাচারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ। এই সব সামাজিক ব্যাধির প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ ক'রেই তিনি ক্ষান্ত হ'ন নি, নির্মম ভাবে চাবুক চালিয়ে তাদের দূর কর্‌বার করেছেন চেষ্টা, আর সে চাবুকের অনেকখানিই পড়েছে তাঁর নিজের পিঠে; কারণ তিনিও সমাজেরই একজন। সমাজের সে নিন্দা-গ্লানির স্পর্শ থেকে তিনিও মুক্ত নন! তাঁর রস-রচনা তাই lampoon নয়, বিশুদ্ধ satire.

এই প্রসঙ্গে হাস্যরসের প্রধান প্রকার-ভেদগুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক মনে করি। ইংরাজিতে Wit, Humour, Satire, Lampoon, Invective প্রভৃতির সাহায্যে হাস্যরসের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারগুলি নির্দিষ্ট করা হয়। বাঙ্‌লা ভাষাতেও বিভিন্ন স্তরনির্দেশের জন্য রঙ্গ, ব্যঙ্গ, কৌতুক, শ্লেষ প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত আছে। নানা কারণে ইংরাজি অভিধান হিসাবে এগুলি ব্যবহার করা চলে না; তা ছাড়া, শব্দগুলি আমরা অনেক সময়েই অত্যন্ত অসংলগ্নভাবে ও অসাবধানে ব্যবহার করি। সুতরাং ইংরাজি শ্রেণিবিভাগের অনুসরণই বোধ করি নিরাপদ।

জীবনের নানা অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য সহজ সৌন্দর্য-বোধকে যে রূঢ় আঘাত করে তারই নাম Humour. হাসির স্বচ্ছ আবরণ দিয়েই কবি জীবনের এই হাস্যকর অসঙ্গতির দিকটা আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলেন। এর মধ্যে আছে উদার সহৃদয়তা ও গভীর করুণা।

'Wit' এর মধ্যে আছে শব্দের প্রয়োগ-কৌশলে কৌতুকের সৃষ্টি। Wit মনকে নাড়া দেয়, কিন্তু গহন মর্মতলে তার সাড়া জাগে না। আবেগ বা অনুভূতির চেয়ে বুদ্ধির তৃপ্তিবিধানের দিকেই তার অধিক লক্ষ্য। Pun, Epigram অথবা শ্লেষ, যমক প্রভৃতি এই শ্রেণিরই অন্তর্ভুক্ত।

Satire অনেকটা চক্রস্থ মধুরসের মত—সে রসের আস্বাদ পেতে হ'লে সঙ্গে সঙ্গে হুলের আঘাতকেও স্বীকার ক'রে নিতে হয়। কিন্তু satire যেখানে কেবল রসবর্জিত নিষ্ঠুর আঘাতে পর্যবসিত, আঘাতের জন্যই যেখানে আঘাত, সেখানে তা' হ'য়ে দাঁড়ায় Invective. ব্যক্তিগত বিদ্বেষে যে হাসির জন্ম, তার নাম Lampoon. এর পিছনে সমাজ-কল্যাণের কোন মহৎ পরিকল্পনা নেই—সঙ্কীর্ণ, বাঁকা পথে এর আনাগোনা।

Pope এবং Swift এর মত দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় কোথাও নেই প্রতিপক্ষের প্রতি উপেক্ষা, অথবা অধিক শক্তিশালী কবির প্রতি ঈর্ষা। Bickerstaff's Almanac অথবা Dunciad, এ নয়—এর মধ্যে বিদ্বেষের জ্বালা

নেই। তরজা বা কবির লড়াই ছিল আমাদের দেশে চিরকালই—এবং একটা সময় এসেছিল এদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে যখন এই গালাগালির সুর পৌঁছেছিল 'খেউড়' ও 'লহরের' শেষ সপ্তকে। এণ্টনি, ভোলা ময়রা, ঠাকুর সিংহ, দাশুরায় প্রভৃতির ব্যঙ্গ-রচনা সাহিত্যের পৃষ্ঠায় অতীতের সাক্ষি-রূপে আজও রয়েছে অক্ষয় হ'য়ে। তাঁদেরই পথ ধরে' দ্বিজেন্দ্রলালও যদি মোটাসুরে শুধু খেউড়ের আলাপ ক'রতেন, তবে তাঁকে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করতাম না।

বাঙলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ satire ডি. এল. রায়ের নিজস্ব দান। এই বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর দান অবিস্মরণীয়। অনেকেই হয়ত মনে করেন তাঁর নাট্যপ্রতিভা ছিল আরও বড় এবং নাটকের দারুণ দুর্ভিক্ষের সময় গিরিশচন্দ্র ও তিনি এনেছিলেন বিপুল পরিপ্লব। একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে তিনি ইতিহাসের—বিশেষত রাজপুত ইতিহাসের যে সব নাটক লিখে গিয়েছেন তার সৌন্দর্যে বঙ্গ-সাহিত্য উজ্জল হ'য়ে থাকবে। কিন্তু একথা অসঙ্কোচে বলা চলে যে, নাটকের পক্ষে এগুলি একটু বেশি মাত্রায় আবেগময় এবং এমন অনেকস্থলেরই উল্লেখ করা যেতে পারে যা সত্যিই clap-trap. নাটকীয় চরিত্রের রচনায় যে দৃষ্টি থাকা একান্ত প্রয়োজন তার অভাব অনেকস্থলেই চোখে পড়ে। তাই চিতোরের রুক্ষ বন্ধুরতার মধ্যেও দেখি বাঙলার স্নিগ্ধ সুষমা। অবশ্য এদের ভাষা স্থানে স্থানে মুদ্রা-দোষ-দুষ্ট হ'লেও সুন্দর, বেগবান এবং বিশেষ ক'রে এই ভাষাই এদের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। নাট্যকার হিসাবে গিরশচন্দ্র তাঁর চেয়ে উচ্চতর আসনের দাবী করতে পারেন। মানবজীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল আরও গভীর ও ব্যাপক, সমাজের ছোট-বড় নানাস্তরের লোকচরিত্র সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল বিস্ময়কর।

মোট কথা, আমার বক্তব্য দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যকার হিসাবে বড়, কিন্তু তার চেয়েও তিনি বড় হাস্যরসস্রষ্টা হিসাবে। 'হাসির গান' তাঁর—নিজস্ব ও অপূর্ব! অবশ্য এদের মধ্যে শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মত উদার রসবোধ নেই, থাকার কথাও নয়, যেহেতু এদের আকার এবং প্রকার দুইই ভিন্ন; এদের লক্ষ্য হ'ল আঘাত দিয়ে জাগিয়ে আত্ম-বিস্মৃত জাতিকে বাঁচিয়ে তোলা—অনুকরণ-লোলুপ অন্ধ সমাজকে দেশের সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহশীল ও অনুরাগী ক'রে তোলা। পেশাদার বিদূষকের সস্তা ভাঁড়ামি এ নয়, হাল্কা হাসির তরল উচ্ছ্বাসও নয়, রবীন্দ্রনাথের হাসির মধ্যে যে দীপ্তি ও শালীনতা আছে, দ্বিজেন্দ্রলালের গ্রন্থে তা' দুর্লভ। অবশ্য অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস বুদ্ধির সন্তোষ-বিধান যে পরিমাণে করে, প্রাণকে নাড়া সে পরিমাণে দেয় না। কোন কোন স্থলে এই উক্তি সত্য হ'লেও, এটা তাঁর রস-রচনার নিয়ম নয়, নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। যাঁরা তাঁর 'গোড়ায় গলদ', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রভৃতি প্রহসন প'ড়েছেন, তাঁরাই জানেন কি অনাবিল সেই হাস্যোচ্ছ্বাস! ব্যঙ্গ-কবিতাও যে রবীন্দ্রনাথ একেবারেই রচনা করেন নি তা' নয়; কিন্তু তার গঠন-প্রকৃতি দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গ-কবিতার অনুরূপ নয়। 'হিং টিং ছট্' তাঁর এই শ্রেণীর রচনার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 'কৌতুকের' কবিতাগুলিও কতকটা এই পর্যায়ের; কিন্তু সেখানেও আঘাত দেওয়াটা উপলক্ষ্য মাত্র,আনন্দ দানই তার প্রকৃত তাৎপর্য। এবং এইখানেই দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য। দ্বিজেন্দ্রলালের 'বিলাত-ফের্তা' ও রবীন্দ্রনাথের 'উন্নতি-লক্ষণ' কবিতা দুটি পাশাপাশি রাখ্‌লে উভয় কবির ব্যঙ্গ-রচনার স্বরূপ উপলব্ধি সহজ হবে। এক কথায়, রবীন্দ্রনাথ মূলত humourist, দ্বিজেন্দ্রলাল satirist.

তবুও 'কৃষ্ণ-রাধিকা-সংবাদ' অথবা 'রাম-বনবাসের' রুচির আমরা প্রশংসা করি না। যুগে যুগে যাঁরা ভক্তির পাত্র, তাঁদের নিয়ে এরূপ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নিছক ছেলেখেলা, আমার তো মনে হয় 'sacrilege' এর কোঠায় গিয়ে পড়ে। আর এতে লাভই বা কি? এ কেবল বড়কে শুধু শুধুই ছোট করা। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'কল্কি-অবতারের' ভূমিকায় লিখেছেন, "স্থানে স্থানে দেব দেবী লইয়া একটু আধটু রহস্য আছে। তাহা ব্যঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে নহে! গ্রন্থখানির প্রধান উদ্দেশ্য, সমাজ-বিভ্রাট। তাহা দেখাইতে গেলেই দেবদেবী বিষয়ক একটু আধটু কথার অবতারণা অপরিহার্য। বঙ্কিমবাবু ও দীনবন্ধুবাবুর লেখনীপ্রসূত দেবদেবীবিষয়ক রহস্যে যখন কাহাকেও কখন আপত্তি

করিতে শোনা যায় নাই তখন এ দীনের দুই এক স্থলে অতি সামান্য রহস্যগুলিতে কাহারও আপত্তি প্রকাশ করা রাগের কথা।" দেব-দেবীদের নিয়ে রহস্য করতেই হবে অথবা 'বঙ্কিম-দীনবন্ধু তাঁদের নিয়ে রহস্য করেছেন তাতে যখন আপত্তি হয় নি তখন আমার বেলায় হবে কেন' এরূপ যুক্তির মর্ম অনুধাবন ক'রতে আমরা অক্ষম। তাছাড়া, সময় সময় দেব-দেবী অথবা মহাপুরুষদের নিয়ে এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সম্পূর্ণ অযাচিত ও অপ্রাসঙ্গিক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'পাষাণী' নাটকের প্রথম দৃশ্যে গৌতম-শিষ্য চিরঞ্জীব ও মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সংলাপের উল্লেখ করা যেতে পারে। গীতার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কিন্তু আমরা এ আপত্তি করি না। কথায় কথায় আমরা বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রের দোহাই পাড়ি, বড়াই করি, যদিচ এদের সঙ্গে পরিচয়ের দৌড় অনেকেরই ঐ নামগুলি পর্যন্ত। সত্যই "গীতার মত নাইক শাস্ত্র, গীতার পুণ্যে বাঁচি—বেঁচে থাকুক গীতা আমার—গীতায় মরে' আছি" এই ব্যঙ্গোক্তি আমাদের অনেকের পক্ষেই একটুও অতিশয়োক্তি নয়। এর উপরে চাবুক চালাবার প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই। 'বিলাত-ফের্তা', 'Reformed Hindoos', 'নন্দলাল', 'জিজিয়া কর', 'পাঁচটি এয়ার', 'তা সে হবে কেন', 'বদ্‌লে গেল মতটা', 'হিন্দু', 'হ'তে পার্‌তাম' প্রভৃতি গান ও কবিতা তাঁর এই ধরণের রচনার মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। 'নন্দলাল'কে আমরা বাল্য হ'তেই জানি; তার মধ্যে আমরা নিজস্ব রূপটিকেই প্রতিবিম্বিত দেখি। ভীরুতা আমাদের অস্থি-মজ্জায়, বাহিরের কোন সজ্জা দিয়েই তো সে লজ্জা ঢাকা যায় না! "নৌকা ফি সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে কলিশন হয়; হাঁটিতে সর্প, কুক্কুর আর গাড়ি-চাপা-পড়া ভয়; তাই শুয়ে শুয়ে কষ্টে বাঁচিয়ে রহিল নন্দলাল! সকলে বলিল—ভ্যালারে নন্দ বেঁচে থাক্ চিরকাল!" সকলের সম্মিলিত আশীর্ব্বাদ নিষ্ফল হয় নি; বাঙ্‌লা সাহিত্যে নন্দলাল অমর হ'য়েই বেঁচে আছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বেও রঙ্গনাট্যের কিছু কিছু নিদর্শন আমরা পাই। সাধারণত এগুলি প্রহসন নামে পরিচিত। উদাহরণ স্বরূপ বাঙ্‌লার রামনারায়ণ তর্করত্নের 'চক্ষুদান' প্রহসনখানির উল্লেখ করা যেতে পারে। দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী', 'জামাই-বারিক' প্রভৃতির নাম কে না জানে? তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যেও অনেকে সমাজ ও দেশের বহু অনাচারের কঠোর সমালোচনা ক'রে ব্যঙ্গ বা কৌতুক-নাট্য রচনা করেছেন। অমৃতলালের এই শ্রেণির 'রূপক'-রচনাগুলি এক সময়ে বাঙ্‌লার সমাজে সমাদর লাভ ক'রেছিল প্রচুর। কিন্তু এই জাতীয় সাহিত্যের সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের রস-রচনার একটি প্রাকৃত পার্থক্য আছে।* প্রহসনও তিনি লিখেছেন কয়েকখানি, কিন্তু এগুলি সেরূপ জনাদর লাভ করে নি। অমৃতলালের প্রহসনগুলিই তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি; দ্বিজেন্দ্রলালের সম্বন্ধে এর বিপরীত উক্তিই বোধ করি করা চলে। সমাজের দোষ-ত্রুটিগুলি নিয়ে নিছক কৌতুক করা তিনি পছন্দ করেন নি। তিনি যা লিখেছেন তা রঙ্গ নয়, তীব্র ব্যঙ্গ —অলস কৌতুক-বিলাস নয়, ক্ষুরধার, মর্মভেদী সঙ্কেত; লক্ষ্য তার জাতির অবনত মেরুদণ্ডকে ঋজু ও বলিষ্ঠ ক'রে তোলা। দেশের গৌরবই ছিল তাঁর একমাত্র কাম্য—তাই বেছে নিয়েছিলেন তিনি জীবনে জাতির কল্যাণ সাধনের এই মহৎ ব্রত এবং তাই আজও আমরা তাঁকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি, যে অকৃত্রিম দেশানুরাগ প্রবুদ্ধ ক'রেছিল তাঁকে 'মেবার পতন', 'রাণা প্রতাপ' প্রভৃতি আবেগ-মুখর নাটকগুলি লিখ্‌তে, সেই অনুপম দেশ-প্রীতিরই এক সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকাশ দেখি তাঁর ব্যঙ্গ-রচনায়। সাহিত্য যদি জীবনের সমালোচনা হয়, তবে 'হাসির গান' জাতির ভাব-ভাণ্ডারে বহুমূল্য রত্নের মতই সযত্নে সঞ্চিত থাকবে। কেউ যেন মনে না করেন যে এই সাহিত্য বিনাশধর্মী বা জাতির অগ্রগতি মাত্রকেই তিনি সংশয়ের চোখে দেখ্‌তেন। ধর্মান্ধতা বা গোঁড়ামি দূর থেকেও তাঁকে স্পর্শ করে নি কোন দিন, চিন্তায় ও কর্মে তিনি ছিলেন খাঁটি যুক্তিবাদী। যেমন জীবনে, তেমনি সাহিত্যে, দীপ্ত বুদ্ধিশ্রীই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। আবার অন্যদিকে তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় আবেগ-প্রবণ, তাই যুক্তির সমস্ত সমারোহ সহজেই ভাবের কোমলতার মাঝে গেছে মিলিয়ে!

* 'ত্র্যহস্পর্শ', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'কল্কি-অবতার', 'আনন্দ-বিদায়', 'পুনর্জন্ম'

ক্ষণেকের মোহ

শ্রী চারুচন্দ্র দত্ত

আমি তখন থাকতাম উত্তর কোঁকনে। সে দেশের বর্ষা কতকটা আমাদের গৌড়বঙ্গের বর্ষার মতনই। ভাদ্র মাস, সকাল থেকে অবিরাম ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়ছে। সুয্যিমামা যেন দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। সমস্ত দেহমন সেঁতিয়ে গেছে। চারটের মধ্যে কাছারীর কাজকর্ম্ম সমাধা করে বাড়ী এসে গরম গরম দু জামবাটি চা খেয়ে কোন রকমে একটু চাঙ্গা হয়ে বসেছি। আজ টেনিস খেলার কোন সম্ভাবনা নেই, বেড়াতে বেরোনও অসম্ভব। শুধু তাস-পাশা খেলতে ক্লাবে যেতে মন চাইছিল না। কাপড় চোপড় বদলে একটুক্ষণ দালানে টহল দিলাম। তারপর খানিকটা এঘর ওঘর করে, কেতাব-পত্র উটকে পাটকে, সময় কাটালাম। সন্ধ্যাগমের এখনও অনেক দেরী। এরই মধ্যে বাতি জ্বেলে পড়তে বসতেও ইচ্ছা হল না। আমার শোবার ঘরে ছিল একটা ছোট পাঁচ সপ্তকের পিয়ানো বাজনা। আনমনা হয়ে তার সামনে বসে পড়লাম। সঙ্গীত বিদ্যায় আমার কোনও দখলই ছিল না কস্মিন্ কালে। তবু পিয়ানোটা খুলে টুং টাং করে বাজাতে আরম্ভ করলাম। কি মাথামুণ্ড বাজাতে চেষ্টা করছিলাম জানি না। কিন্তু খানিক পরে শুধু একটা আরোহণের scale বাজতে লাগল—সা গ ম প নি সা। একঘেয়ে ঐ ছটি সুর শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে কেমন যেন একটু ভাবের আমেজ এল। হয় ত বা ঝিমোতেও আরম্ভ করেছিলাম। মশালচি বাতি নিয়ে ঘরে ঢুকতেই হুঙ্কার ছাড়লাম, "নিয়ে যা বাতি, আলো চাই না!" বেচারা পালাল। পিয়ানোতে বাজতে থাকল, সেই সা গ ম প নি সা, নানা সপ্তকে। কতক্ষণ এই ছেলেমানুষী সুরচর্চ্চা চলল, তা আজ ঠিক বলতে পারি না।

হঠাৎ লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম। সমস্ত ঘরটা অতি তীব্র বেলফুলের গন্ধে ভরে গেছে। গন্ধটা এত ভারী, এত চড়া, যে মনে হল যেন আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে এ জানলা ও জানলা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম, গন্ধ আসে কোথা থেকে। আমার বাড়ীতে কোথাও ত বেলফুলের কেয়ারী নেই! বারান্দায় বেরিয়ে পড়লাম। দেখি, দৌলত নামক আমার এক অল্প বুদ্ধি চাপরাসী বসে বসে ঢুলছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এই! বেলফুলের বাস আসে কোথা থেকে রে!" সে চোখ রগড়াতে রগড়াতে দাঁড়িয়ে উঠল, বোকার মতন বললে, "বেল ফুল! আজ্ঞে না, হুজুর। বেলফুল ত আমাদের বাগানে নেই।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "গন্ধ পাচ্ছিস না, উল্লুক!" সে আমতা আমতা করে উত্তর দিলে, "গন্ধ! খুব সামান্য গন্ধ যেন পাচ্ছি, সাহেব।" বুঝলাম, মিথ্যা কথা বলছে। তার হাত ধরে হিড় হিড় করে শোবার ঘরে টেনে নিয়ে গেলাম। দোরগোড়াতেই সে চেঁচিয়ে উঠল, "হাঁ হুজুর, এখানে খুব জোর গন্ধ।" লোকটাকে ঠেলে ঘর থেকে বার করে দিয়ে দোর ভেজিয়ে দিলাম। বাস্তবিক তখনও গন্ধ খুব রয়েছে, যদিচ আগের চেয়ে কম। আর গন্ধের চোটে দম আটকে যাচ্ছে না। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে এ পাশ ও পাশ তাকিয়ে আবার বসে পড়লাম পিয়ানোর সামনে। আবার টুং টাং করে বাজতে লাগল সেই scale, সা গ ম প নি সা, সা গ ম প নি সা। ততক্ষণে ফুলের গন্ধ প্রায়

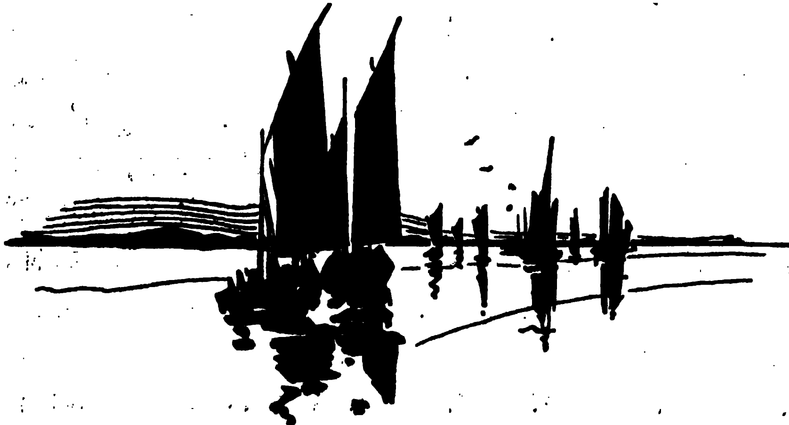
মিলিয়ে গেছে। অকস্মাৎ চমকে উঠে পিছনে মুখ ফেরালাম। নজর পড়ল দেওয়ালে টাঙ্গান এক ছবির উপর। মহারাষ্ট্রীয়া তরুণী, মুখে মিষ্টি মিষ্টি হাসি, খোপায় জড়ান বেলফুলের গড়ে মালা। দৌড়ে ছবিটার কাছে গেলাম। খোপার কাছে মুখ নিয়ে যেতেই স্পষ্ট নাকে এল সুন্দর মৃদু মৃদু বেলফুলের গন্ধ। চিত্রাঙ্কিতা সুন্দরী, তার মাথায় চিত্রাঙ্কিত ফুল, সুবাস এল কোথা থেকে! গালে হাত দিয়ে বসে পড়লাম।

অবশ্য মোহবিভ্রমও টেকে না, এ ক্ষেত্রেও টিকল না। গন্ধ ধীরে ধীরে উবে গেল। বাতি এলে ছবিটা ভাল করে দেখলাম। কই, তরুণীর মুখ এমন কি সুন্দর! ছবিটা একটা বাজে Calendar পঞ্জী। প্রায় ছ মাস ঐ দেওয়ালে লটকান ছিল। আগে কোন দিন তার দিকে ভাল করে নজরই করি নেইকো। তবে এমনটা হল কি করে! আমাকে ভর সন্ধ্যায় পেয়ে বসেছিল কে! পাঠক কি বলতে পারেন!

জীবন-মরণ

শ্রী মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

চলে মরণের রথ নিত্য এ সংসারে
এক মুহূর্ত্তও তা'র নাহিক বিরাম ;
দেখি, বুঝি জীব যায় মরণের পারে
ভয় পাই তবু শুনে মরণের নাম।
জীবন করায় সদা মরণ স্মরণ,
মরণের পরে পুন নূতন জীবন!



একাচলে উদয়াস্ত

শ্রী কালীকিঙ্কর সেন গুপ্ত

অসীম বিস্ময়বস্তু মানবের এই দেহগৃহ,
দেহ শুধু গৃহ নয়, মনে হয় সমগ্র জগৎ ;
দেহ গেলে কি রহিল নির্বন্ধন রিক্ত জীবাত্মার
সম্পর্ক নিখিল সনে ?
স্বতঃসিদ্ধ নিত্য নিরুপাধি
নিরস্ত নির্ম্মোক নগ্ন, নিয়তির নিয়ত নির্দ্দেশে,
নিতান্ত আগ্রহহীন, শঙ্কাহীন সিংহ ফেরুপালে
ফিরায় তর্জ্জনে যথা, নিশ্চেষ্ট শয়নে পশুপতি
নিরুদ্বেগ একেশ্বর ভ্রূক্ষেপবিহীন।
দেহাধীশ,
দেহরাজপুরে দেহী, অনাসক্ত পান্থশালাবাসী,
দিবস না করে গত, অতিক্রান্ত করে যদি তিথি,
বসুধার আতিথেয়তায়।
দশেন্দ্রিয় বুদ্ধিমন
মমত্ব সম্বল করি' উর্দ্ধমূল অশ্বত্থের মূলে
করিয়া কুঠারাঘাত, পর্ণপুষ্পকাণ্ডক্রম সহ
ভূতল শয়নে ফেলি, শুক্ল কৃষ্ণ এক পন্থা ধরি
উর্দ্ধমুখী হংস সম পক্ষ মেলি'চলে উর্দ্ধ পানে।
মুষ্টিমেয় ভূতলের দগ্ধভস্ম মাত্রে অবসান
অট্টালিকা চূর্ণ শরীরীর, নির্বহিত রসায়ন
উর্দ্ধ নিপাতনে, পুটপাকপ্রোত্থরস লব্ধ যথা
হিঙ্গুল নিঃসৃত, পাতিত পারদ সম।
গিরিগাত্রে
শিলাজতু, সৈকতের স্নেহসিক্ত বালুকা সঞ্চয়—
প্রবাহনিঃসৃত ফেন তটিনীর তরঙ্গ ভূষণ
ক্ষণিক বুদ্বুদপুঞ্জ অনাবিল সলিল প্রপাতে
জটিল শঙ্করচূড়ে জাহ্নবীর একাবলী মালা
তেমতি প্রাণের স্রোত ত্রিধারায় বহে অনিবার
স্থিতি-বৃদ্ধি-গতি-পথে করে খেলা আশা-আকাঙ্ক্ষায়
সন্তোষ সান্ত্বনা শান্তি প্রবোধের মধ্যস্থ বিধানে
আনন্দ আস্বাদ করি ঔষধের বিস্বাদের শেষে
সুপক্ক সুস্বাদ ফল দাড়িম্ব দ্রাক্ষার।
অহর্নিশি,
অঘটন পটীয়সী ঘটনার বিচিত্র মালায়,
জীবন পথের পন্থী, গলে দোলে বরবর্ণ-মালা,
সুরঞ্জিত বহু রূপ যাযাবর ফকিরের মত,
তীর্থঙ্কর অবধূত নিরবধি চলে পথে পথে
যাবৎ পথের সীমা যতদিন আয়ু।
নাম মাত্র
রূপমাত্র পলাণ্ডুর কোষমাত্র আচ্ছাদন হ'তে
বরষের গ্রীষ্ম বর্ষা শরতের বস্ত্র দিলে খুলি
দিগম্বর মহাকাল দেশ কাল পরিচ্ছেদ হীন
অখণ্ডিত ব্যোমকেশ বিবস্বান নখরের প্রভা
রোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড নিকর।
দেহ যার অব্যাহত
অন্তরীক্ষ পূর্ণ করি দশাঙ্গুল চূড়া নাহি আঁটে
একাচলে উদয়াস্ত একদিকে অরুণ শাশ্বত
অন্যদিকে প্রভাহীন আশাহত সূর্য্য বসে পাটে।

নর-শার্দ্দূল

শ্রী গঙ্গাপদ বসু

—শীতের সকাল বেলা।

ধারওয়ার জঙ্গলের উপকণ্ঠবর্ত্তী ছোট্ট সহরটি কুয়াসায় আচ্ছন্ন—নিস্পন্দ। যেন বোমা বর্ষণের পর ফিন্‌ল্যাণ্ডের তুষারাবৃত হেল্‌সিঙ্কি।

সেই সহর থেকে একখানা বিরাটকায় পুরোনো মোটার তীব্র বেগে ছুটে বেরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ কর্‌লো। অপ্রশস্ত—অসমতল জঙ্গলের পথ দিয়ে ছুটে চলেচে মোটার—ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে।......

মোটরের আরোহী—অলক বোস—এই জঙ্গলের নতুন ফরেষ্ট অফিসার। সুদূর বাঙ্গালা থেকে সুধু চাকরীর মায়ায় এই পার্ব্বত্য জঙ্গলের মধ্যে এসে আশ্রয় নিয়েচে অলক বোস, এ কথা কেউ মনে করবে না—অন্ততঃ যারা তাকে জানে, তারা তা করবে না। সে এই চাকরী নিয়ে ছিল—একটা দুর্দ্দম প্রাণশক্তির পীড়নে, বিচিত্র সম্ভাবনাময় রোমাঞ্চকর জীবনযাত্রার স্বেচ্ছাবৃত দুঃখব্রতের আনন্দে। বৈচিত্র্যহীন নাগরিক জীবনের শান্ত সুনিয়ন্ত্রিত সচ্ছরেপনাকে সে ঘৃণা করে। এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে কুয়াসাচ্ছন্ন, অন্ধকার, অপরিসর অসমতল পথে মোটার চালনায় প্রতি মুহূর্ত্তে যে বিপদের আশঙ্কা আছে, অলক তা জানে, কিন্তু গ্রাহ্য করে না। তাই তার মোটার ছুটেচে বে-পরোয়া ভাবে।

এই পথে ত্রিশ মাইল জঙ্গল পার হয়ে সে এর আগেও একদিন গিছলো তার এক ইংরেজ বন্ধুকে নিয়ে। সেদিন দশ মাইলের মাথায় এই পথটা আকস্মিকভাবে যেখানে ভয়ানক রকমে বেঁকে গেছে সেখানে ওরা একটা প্রকাণ্ড বাঘের সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি হ'য়ে গেছলো। বন্দুক বাগিয়ে ধরবার আগেই ভীষণ গর্জ্জন কোরে এক লাফে বাঘটা রাস্তা থেকে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। সেখান থেকে কিছু দূর এগিয়ে আস্‌তেই ওরা দেখেছিল, দু'টি গ্রাম্য বালিকা স্বচ্ছন্দ মনে শুক্‌নো কাঠ কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। বাঘ বেরিয়েচে বলে ওরা তাদের সাবধান হ'তে বল্‌লে তারা বলেছিল: 'ও, ঐ বুড়ো বাঘটা? ও কাউকে কিছু বলে না। আমরা ওকে রোজই দেখ্‌চি!'

আজ ঠিক সেই জায়গাটায় এসে অলকের মনে পড়্‌লো সেইদিনকার কথা। এমন সময় হঠাৎ অলকের গাড়ির সামনে একটা লোক দেখে সে গাড়ি থামালো। সাড়ে ছয় ফুট দীর্ঘ বলিষ্ঠদেহী সীমান্ত দেশীয় লোক। অদ্ভুত তার সাজ-পোষাক একটা হল্‌দে ডোরা কাটা আলখেল্লা গায়ে—মাথায় পাগড়ী—পায়ে নাগরা। অলক ওকে বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানীতে জিজ্ঞাসা কর্‌লো—'তুমি পথ ভুল করেছ নাকি?'

লোকটা অলকের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে নিয়ে বিশুদ্ধ বাঙ্গলাভাষায় উত্তর দিল—'না। পথ ভুল করিনি। এ জঙ্গল আমার চেনা। আমি শীকারে বেরিয়েছি।'

'আশ্চর্য্য! আপনি কি বাঙালী?' অলক বিস্মিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা কর্‌লো।

সে বল্‌লো: 'এক সময় আমি বাঙালী পল্টনের সঙ্গে এক সঙ্গে কাজ করেছি। তারপর বাঙালায় এক মহারাজার কাছে আমি চাকরীও করেছি। আমাকে বাঙালীই মনে কর্‌তে পারেন।'

'আসুন না আমার গাড়ীতে' অলক বল্‌লো 'আমি আপনাকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেব। আমি এই জঙ্গলের নতুন ফরেষ্ট অফিসার। মাসখানেক এখানে বদলী হ'য়ে এসেছি।'

লোকটা দ্বিরুক্তি না করে গাড়ীতে উঠ্‌লো। অলক গাড়ীতে আবার ষ্টার্ট দিল। মাইল পাঁচেক গিয়েই সে বল্‌লো: 'অশেষ ধন্যবাদ। এখানেই আমাকে নাবিয়ে দিলে চল্‌বে।'

বাঙলার বাইরে কোন বাঙালী দেখ্‌লে বা বাঙলা ভাষায় কথা কইতে শুন্‌লে বাঙালীর যে কি আনন্দ হয় তা এই অবস্থায় না পড়্‌লে ঠিক বোঝা যায় না। অলক গাড়ী থামিয়ে কিছুতেই ওকে না খাইয়ে ছাড়বে না বল্‌লো। ওর সঙ্গে খাবার ছিল। লোকটা খাবার কথায় কোন আপত্তি কর্‌লো না। গাড়ীতে বসে দুজনে এক সঙ্গে খাবার খেতে লাগলো। ওর খাওয়া দেখে অলকের মনে হ'লো, বোধহয় চার পাঁচ দিন ওর পেটে কিছু পড়েনি। দু তিন মিনিটের মধ্যে এক রাশ খাবার ও যেন গো-গ্রাসে গিলে ফেল্‌লো।

অলক জিজ্ঞাসা করলো: 'আপনি সেনাদলে ছিলেন—সেই জন্যেই বোধহয় আপনার সাহসও অসীম।'

পাঁচ ছ'খানা লুচি এক সঙ্গে গালের মধ্যে পুরে দিয়ে ও হেসে বল্‌লো: 'সাহস তো আপনারও কম দেখ্‌চিনে?'

অলক একটা ডিমের আধখানা মুখে দিয়ে বল্‌লো—'কেন?'

'তা না হলে, এই অন্ধকার জঙ্গলে কেউ এ ভাবে একলা বেড়াতে পারে? ভয় করে না আপনার?'

'নাঃ। ভয় আর কি?' অলক তাচ্ছিল্যভরে বল্‌লো।

'কেন, আপনি কি শোনেন নি এই জঙ্গলে মানুষ-বাঘ আছে?'

অলক হো হো করে হেসে উঠ্‌লো। বল্‌লো: 'মানুষ-বাঘ? সে আবার কি?'

লোকটা গম্ভীরভাবে গোটা সাতেক মিষ্টি মুখে পুরে দিল। তারপর দু'তিনবার চিবিয়েই সমস্তটা গলাধঃকরণ করে বল্‌লো: 'আপনি হাসচেন। কিন্তু ব্যাপারটা মিথ্যে নয়। ওরা হচ্চে এমন কতকগুলো পুরুষ বা স্ত্রীলোক যারা ইচ্ছামত বাঘের আকৃতি ধারণ করতে পারে। অথবা এমনও হ'তে পারে যে আসলে ওরা বাঘ—ইচ্ছামত পুরুষ বা স্ত্রীলোকের আকৃতি ধারণের ক্ষমতা ওদের আছে। অবশ্য কথাটা শেষ পর্য্যন্ত একই দাঁড়ায়, তাই না?

অলক ওর দিকে তাকিয়ে প্রথমটায় ভাব্‌লো, লোকটা পাগল বোধহয়—কোন লুনাটিক এসাইলাম থেকে ও পালিয়ে এসেচে। কিন্তু মনের ভাব চেপে রেখে অলক জিজ্ঞাসা করলো: 'আপনি নিজের চোখে কখনো এই ধরণের জীব দেখেননি নিশ্চয়ই?'

'নিশ্চয়ই দেখেচি। কয়েক বছর আগে এই ধরণের একটি জীবকে দুর্ভাগ্যক্রমে আমায় বিয়ে কর্‌তে হ'য়ে ছিল।'

'বলেন কি!' অলক বিস্ময়ে প্রায় চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো 'এ কথা কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক বিশ্বাস কর্‌তে পারে?'

'তা হ'লে অনুগ্রহ কোরে আমার জীবনের এই অধ্যায়ের গল্পটা আপনি শুনুন। তারপর যদি পারেন, অবিশ্বাস করবেন।'

'নিশ্চয়ই শুনব। আমার সহস্র কাজের ক্ষতি হ'লেও শুনব। আপনি বলুন।'

লোকটা চা না খেয়ে ঢক ঢক কোরে খানিকটা ঠাণ্ডা জল খেয়ে নিয়ে আরম্ভ কর্‌লো—"আট বছর আগেকার কথা। আমি তখন এক সেনাদলে মেজরের পদে কাজ করচি। আমার সখ হ'লো—বিয়ে করব। যুবকরা যখন বিয়ের জন্যে ব্যাকুল হয় তখন কনে পছন্দ কর্‌তে তাদের বিলম্ব হয় না, এটা আপনি লক্ষ্য করে দেখ্‌বেন। আমি অতি সহজেই একটি মেয়েকে পছন্দ কোরে ফেল্‌লাম। পাঞ্জাবের এক হিল-ষ্টেশনে আমরা তখন ক্যাম্প কোরে আছি—এক ছোট সামন্ত রাজার রাজ্যের ঠিক সীমানায়। কয়েকদিনের ছুটী নিয়ে বেরিয়ে পড়ে খুঁজে খুঁজে যে মেয়েটিকে পছন্দ কর্‌লাম—সে রেলের এক ষ্টেশন-মাষ্টারের মেয়ে—নাম, ধরুন রিনা। মেয়েটি ভারি সুন্দরী, ছিপ্‌ছিপে লম্বা গঠন—গায়ের রং ঠিক ছোলার ডালের মত।

বিয়ের পর সে সীমান্তের জঙ্গলে শীকারে যাবার জন্যে জিদ ধরলো।' বল্‌লো, আমাদের সামরিক জীবনের 'হানিমুন' জঙ্গলে শীকার কোরে কাটানোই সঙ্গত হ'বে। আমি আপত্তি কর্‌লাম না। এমন সময় হঠাৎ সীমান্তের একজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী আমাদের দুজনকেই নেমন্তন্ন কর্‌লেন—এক জঙ্গলে ক্যাম্প কোরে শীকার, খাওয়া-দাওয়া ও আমোদ স্ফূর্ত্তি করা হ'বে। বউ তো একেবারে যেন হাতে আকাশের চাঁদ ধরে ফেললো। বল্‌লো ঐ সামরিক কর্ম্মচারীর পার্শোন্যাল এসিষ্ট্যাণ্ট মিষ্টার সেন তার পরিচিত বন্ধু। সে-ই এ-নেমন্তন্নের ব্যবস্থা করেছে। সময়টা বেশ কাটবে। যেতেই হবে।'

—বিয়ের পর থেকেই লক্ষ্য করেছিলাম, রিনা ফ্লার্টিং কর্‌তে ভালোবাসে—কলকাতার পড়ুয়া মেয়েদের মতো একটু ককেটিশ ভাব ওর মধ্যে ছিল। আপনারা হ'লে হয় ত এতে খুসীই হ'তেন; কিন্তু সত্যিকথা বল্‌তে কি, আমার এটা তেমন ভাল লাগ্‌তো না। তবে নতুন বউ—ওকে ভালও বাসতাম—কাজেই ওর কোন কিছুতে আমি আপত্তি করতাম না। সীমান্তের জঙ্গলে যাবার নেমন্তন্নও ঠিক এই একই কারণে অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রহণ করলাম।......

—বড়দিনের ছুটী।

আগে থেকে আমরা প্রস্তুতই ছিলাম। সুতরাং ঠিক সময় মত আমরা জিনিষপত্র সহ যথাস্থানে গিয়ে পৌছলাম। যে জঙ্গলে ক্যাম্প করা হ'য়েছিল সেটা এক মুসলমান নবাবের। নবাব ভারি ভালো লোক। আমাদের যাতে কোন রকম অসুবিধা না হয় সেজন্যে তিনি তার আমীর-ওমরাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন। আটটি বলিষ্ঠদেহ হাতী সব সময় তিনি আমাদের ব্যবহারের জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন। ওখানে পৌছে সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ কোরে তার পরদিনই আমরা হাতীর পিঠে চড়ে বাঘ শীকারে বেরিয়ে ছিলাম। আপনি শুনে অবাক হবেন—সেদিন আমিই একটা প্রকাণ্ড বাঘ শীকার করে ছিলাম। সে-ই আমার জীবনে প্রথম বাঘ শীকার।

আমি আর আমার স্ত্রী রাতে আলাদা ভাবে থাক্‌তাম। সে বল্‌তো—ঘুমোলে নাকি আমার নাক এমন ভয়াবহভাবে গর্জ্জন করে যা'তে তার ঘুম হয় না—ভয় করে। এখানে এসেও তাই সমগ্র ছাউনির প্রান্তদেশে একটু দূরে দূরে আমাদের দুজনের জন্যে দুটি ছোট তাঁবু খাটান হ'য়েছিল।

খ্রীষ্টমাস্‌ ডে উপলক্ষে আমরা সকলে এক প্রশস্ত কানাতের নিচে বসে এক সঙ্গে চা খাচ্চি আর তার আগের দিনকার বাঘ শীকারের গল্প কর্‌চি এমন সময় একজন পাঠান প্রহরী ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লো: 'কাল রাতে ছাউনির মধ্যে বাঘ ঢুকে ছিল, মিষ্টার সেনের ক্যাম্পের দরজার বাইরে স্পষ্ট পায়ের দাগ দেখা যাচ্ছে।'

আমরা সকলে ছুটে গেলাম। সত্যিই তাই। স্পষ্ট বাঘের পায়ের দাগ। সেন তো ভয়ে শুকিয়েই উঠ্‌লো। আমরা অবিশ্যি ব্যাপারটিকে সেদিন তেমন আমল দিলাম না। কিন্তু তার পর দিনও যখন জানা গেল—আবার বাঘ এসেছিল—আর এবার তার পায়ের দাগ আমার স্ত্রীর ক্যাম্পের সামনে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে তখন আর ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করা গেল না। সকলেই বল্‌লো—রাত জেগে পাহারা দিয়ে ওটাকে শেষ করতে হ'বে।

শীকার করতে জঙ্গলে এসে বাঘের ভয় কর্‌লে অবিশ্যি চলে না। কিন্তু বাঙালী সেন মশায়ের অবস্থা দেখে সকলেই হাসাহাসি কর্‌তে লাগ্‌লো। সে যেন কেমন শুকিয়ে যেতে লাগলো—কথা কয়না—চোখের কোনে কালি পড়ে গেছে—এক অদ্ভুত চেহারা হ'য়ে গেল তার এই দু'দিনে।…

সেদিন রাতে পাহারা দিয়ে বাঘ শীকার করবার ভার আমিই নিলাম। একটা গাছের তলায় একটা ছাগল বেঁধে রেখে আমি ওপরে উঠে বসে আছি। রাত হ'য়ে গেল দুপুর। বাঘের দেখা নেই। ছাগলটা নিশ্চিন্তে শুয়ে—বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়্‌লো। আমি নেবে এলাম। ক্যাম্পে গিয়ে খেয়ে দেয়ে বন্দুকটা পাশে রেখে শুয়ে পড়লাম জুতোজামা না ছেড়েই। শুয়ে শুয়ে একটা সিগারেট খাচ্ছি আর ভাবচি এখানে না এলেই ভাল হ'তো। ঐ সেনটাকে আমার মোটেই ভাল লাগে না। রিণা ওর সঙ্গে যেন কেমন অত্যন্ত মাখামাখি ভাব প্রকাশ করে। প্রথম দু'দিন সেন রিণার সঙ্গে আমার সামনেই অত্যন্ত আপত্তিকর ভাবে মেশামিশি করেছে। অবিশ্যি এই শেষ দু' দিন সেন আর রিণার সামনে আসে নি—কথাও বলে নি।

এই সব ভাবচি এমন সময় আমার অন্ধকার তাঁবুর পর্দ্দার ওপর একটা প্রকাণ্ড জানোয়ারের ছায়া পড়তেই আমি চমকে উঠে বস্‌লাম! সেই বাঘ! এক মিনিট নিঃশব্দে অপেক্ষা করে কর্ত্তব্য স্থির কোরে ফেল্‌লাম। তারপর বন্দুকটা হাতে করে অতি সতর্ক চোরের মত বেরিয়ে পড়্‌লাম। কিন্তু জানোয়ারটা তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে।…আমি ধীরে ধীরে আমার স্ত্রীর ক্যাম্পে গেলাম। রিণা কোথায়? তার শয্যা শূন্য! এত রাতে সে গেল কোথায়? আমার ইচ্ছে হ'লো, একদৌড়ে গিয়ে সেনের ক্যাম্পের মধ্যে ঢুকি। নিশ্চয়ই রিণাকে সেখানে পাওয়া যাবে। কিন্তু একি! রিণার নৈশবাস, এমন কি ঘুমোবার সময়কার গাউন আর স্যাণ্ডাল জোড়া পর্য্যন্ত পড়ে আছে! এত রাতে সে কি তবে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে—ছি-ছি-ছি। ঘৃণায় লজ্জায় রাগে আমার যেন আত্মহত্যা কর্‌তে ইচ্ছে হ'তে লাগলো। আমার মাথায় তখন খুন চেপেচে। সেন আর রিণা। রিণা আর সেন। দুটোকে একসঙ্গেই খুন কর্‌বো। বন্দুকে দুটো টোটাই ভরা আছে কিনা দেখে নিয়ে রিণার ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে পড়লাম অতি ক্ষিপ্র গতিতে।

কিন্তু ক্রমশঃ একটা কেলেঙ্কারীর ভয় আমাকে এমন ভাবে পেয়ে বস্‌লো যে আমি আর কিছুতেই এগোতে পারলাম না। নিজের ক্যাম্পে নিঃশব্দে গিয়ে প্রবেশ করলাম এবং বন্দুকটা রেখে দিয়ে আর একটা সিগারেট ধরালাম। যে কোন অবস্থাতেই অতি সহজে আমি ঘুমুতে পারি। কাজেই এত উত্তেজনা সত্বেও কখন যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সে রাতে তা আমি নিজেই জানি না।

—পরদিন সকালবেলা রিণা এলো।

রোজকার মত ছোট হাজারীতে যাবার জন্যে আমাকে ডেকে তুল্‌লো। আমি উঠে তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে সকালবেলাকার পোষাক পর্‌তে পরতে শান্ত ভাবেই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—'কাল রাতে ক্যাম্প ছেড়ে তুমি কোথায় গেছলে?'

সে বিস্মিতকণ্ঠে বল্‌লো : 'তার মানে ?'

'তার মানে অত্যন্ত সোজা' আমি দৃঢ়কণ্ঠে বল্‌লাম 'কাল রাত দু'টোর সময় আমি তোমার ক্যাম্পে গিয়ে তোমাকে দেখ্‌তে পাইনি। তোমার নৈশবাস এবং স্যাণ্ডাল তোমার শূন্য শয্যার পাশে পড়ে ছিল।'

সে যেন আকাশ থেকে পড়্‌লো। আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল কোরে তাকিয়ে সে বল্‌লো : 'তোমার কথা শুনে আমি অবাক হচ্ছি। নিশ্চয়ই তুমি স্বপ্ন দেখেচ। রাত দুটোর সময় এই শীতে উলঙ্গ হ'য়ে আমি বাইরে বেরোবো, এটা কি সম্ভব ? কোথাও যাবার দরকার থাক্‌লে পোষাক পরেই যাওয়া যেত। তুমি বলছ কি ?'

একথার কোন জবাব পেলাম না। মুহূর্ত্তের জন্যে আমার মনে হ'লো, 'হয়ত বা সত্যি সত্যি আমি স্বপ্নই দেখে থাকবো। কাজেই ব্যাপারটা চেপে গেলাম। আমার ধারণা যদি সত্যি হয় তবে, শীঘ্রই নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে।...

ছোট হাজারীতে গিয়ে দেখি মহা হৈ চৈ লেগে গেছে। আবার বাঘের পায়ের দাগ দেখা গেছে। আমার ক্যাম্পের পাশে সুস্পষ্ট দাগ পড়েচে। আমরা যেতেই সেন যেন বিভীষিকা দেখে চম্‌কে ওঠ্‌বার মত অবস্থায় তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল এবং জ্বর আস্‌চে বলে নিজের ক্যাম্পে চলে গেল।

আমি কাউকে কিছু বল্‌লাম না—এমন কি, রিণাকেও না। মনে মনে স্থির কর্‌লাম—আজ সমস্ত রাত জেগে থাকবো—বাঘটাকে শীকার করবই আজ।...

সেদিন রাতে যে ঘটনা ঘটলো কোন মানুষের জীবনে কখনো যেন তা না ঘটে। রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে আমার তাঁবুর দরজাটার পর্দ্দাটা একটু ফাঁক কোরে রেখে একখানা ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে চুরুট টান্‌তে লাগলাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাত কাটে, আমার একটার পর একটা চুরুট পোড়ে। ঘড়িতে যখন দু'টো বেজে গেল তখন আমার চোখ একটু তন্দ্রার আবেশে যেন বুজে এসেছিল। হঠাৎ বাইরে মৃদু ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ হ'লো! মাথাটায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আমি সোজা হ'য়ে বস্‌লাম।...সেই বাঘটা!...উঃ! কি ভয়ঙ্কর আকৃতি! বন্দুকে দুটো টোটা ভরা আছে কিনা দেখে নিয়ে মুহূর্ত্তের মধ্যে অতি সন্তর্পণে আমি তাঁবু থেকে বেরিয়ে ওর পিছু নিলাম।...নিস্তব্ধ জঙ্গল...ছাউনিতে সবাই যেন মরে গেছে...অতীত মধ্য রাত্রির অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে প্রেতের মত নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আমি এক হিংস্র জানোয়ারের পেছনে ছুটলাম।...সর্ব্বনাশ! বাঘটা যে সোজা সেনের তাঁবু লক্ষ্য করে এগোচ্ছে। আমি বন্দুক তুলে ধরতেই হঠাৎ একটা কালো পেঁচা বিকট চীৎকার কোরে আমার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল! আমার হাত থেকে আর একটু হ'লেই বন্দুকটা পড়ে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়েই চেয়ে দেখি, বাঘটা সেনের তাঁবুর পর্দ্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল! নিশ্চয়ই ওটা মানুষ-খেকো বাঘ। সেনকে এক্ষুণি সাবাড় করবে মনে করে দৌড়ে ওর তাঁবুর কাছে গেলাম। এক কোণের পর্দ্দাটা একটু সরিয়ে দেখ্‌লাম—বাঘটা স্থির হয়ে সেনের ক্যাম্প খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে আর আতঙ্কগ্রস্ত বিকারের রোগীর মত বিহ্বল দৃষ্টিতে সেন উঠে বসে তার দিকে তাকিয়ে আছে। নিঃশব্দে বন্দুক তুলে লক্ষ্য স্থির করলাম। বাঘটার ঠিক বক্ষস্থল লক্ষ্য করে পর পর দুটো গুলী ছুঁড়লাম—গুড়ুম, গুড়ুম !!

বাঘটা তৎক্ষণাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

আমি তাঁবুটা প্রায় ছিঁড়ে ফেলেই ঘরে ঢুকে গেলাম—'সেন, ভগবানকে ধন্যবাদ দাও। আমি ঠিক সময়েই এসে পড়েছিলাম তুমি ভয় পাওনি তো?'

সেন যেন মরা মানুষ! অপলক দৃষ্টিতে সে সেই জানোয়ারটার দিকে তাকিয়ে আছে! আমার কথার কোন জবাবই সে দিল না। সুধু নিঃশব্দে আঙুল দিয়ে রক্তাক্ত বাঘটার দিকে ইঙ্গিত করলো। আমিও ঐ মৃত জানোয়ারটার দিকে তাকালাম—এ কী! ক্রমশঃ বাঘের মৃত দেহে যেন একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হচ্চে! ওর হাত পা গুলো ক্রমশঃ মানুষের হাত পায়ের মত হলো—তারপর বক্ষস্থল—ঠিক নবযৌবনা নারীর পীনোন্নত বক্ষস্থলের মত হলো—তারপর মুখ!…এ কী! এ আমি কী দেখচি! এ যে রিণা!! বিবসনা রিণার হিম শীতল মৃত দেহ!!!… ‥

আতঙ্কে একটা অদ্ভুত চীৎকার করে উঠ্‌লাম। সেনকে দুহাতে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উচ্চ কণ্ঠে বল্‌লাম—সেন—সেন—কথা বলো—কথা বলো—এ সব কী দেখচি?

সেনের চোখ দিয়ে জল পড়্‌চে। সে মৃদু কণ্ঠে বল্‌লো: 'আমাকেও তুমি গুলী করো, বন্ধু! আমি তোমাকে প্রতারিত করে তোমার স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমে পড়ে ছিলাম। খ্রীষ্টমাসের দিন রিণাকে আমার তাঁবুতে আসবার জন্যে আমি অনুরোধ করেছিলাম।—'

'বিশ্বাসঘাতক—শয়তান—' আমি তার গলা টিপে ধরলাম।

সে বল্‌লো: 'আমি প্রস্তুত। তবে একটু দেরী করো। আমার কথাগুলো শুনে যাও। ঐ রাতে তোমার স্ত্রী এলো আমার তাঁবুতে—ঠিক রাত দুটোর সময়। আমার ঘুম ভাঙ্‌তেই আমি দেখ্‌লাম—রিণা সম্পূর্ণ উলঙ্গ—শুধু আমার ওভার কোটটা গায়ের ওপর ফেলে সে আমার শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাস্‌চে।…একটা বন্য উন্মাদনায় সে সেই রাতে আমার কাছে প্রথম আত্মদান ক'রেছিল। চম্‌কে উঠো না বন্ধু! শোনো, তারপর যখন সে চলে যায় তখন দেখলাম সে কোন কাপড় চোপড় আনে নি। বল্‌লাম—রিণা, তুমি যাবে কি কোরে? তোমার কাপড়-চোপড় কৈ?' সে হেসে বল্‌লো, আমার ওসব কিছু দরকার হয় না। তারপর দেখলাম—আমার চোখের সামনে সে ক্রমশঃ একটা প্রকাণ্ড বাঘের আকৃতি ধারণ করলো এবং ধীরে ধীরে আমার ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে গেল। আতঙ্কে আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোলো না। সেই সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত আমার চোখে ঘুম নেই—আতঙ্কে আমার গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না। প্রতি রাতে রিণা এই ভাবে আসাযাওয়া করচে আর আমাকে দিয়ে যথেচ্ছ ভাবে—উঃ, আমি আর সহ্য করতে পার্‌চি না—আমি কি এখনও উন্মাদ হ'য়ে যাই নি? হাঃ হাঃ হাঃ—'

—এই সময় ছাউনির অন্যান্য লোক বন্দুকের শব্দে জেগে উঠে চীৎকার শুনে এই ক্যাম্পে এলো। আমাকে সবাই জিজ্ঞাসা কর্‌লো রিণাকে আমি গুলী কর্‌লাম কেন? আমি যা বল্‌লাম, কেউ তা বিশ্বাস কর্‌লো না।

এর পরের ঘটনা আর বল্‌বার প্রয়োজন নেই। "অনিচ্ছাকৃত নরহত্যা" বলে ভারতীয় ফৌজদারী আইনে যে ধারা আছে সেই ধারায় আমাকে তিন বছর কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েচে। আদালত আমার কথা বিশ্বাস করে নি। আমার একমাত্র সাক্ষী সেন। কিন্তু সে সেই থেকে পাগল হ'য়ে গেছে। যারবেদা

জেল থেকে বেরোবার পর এই ভাবেই আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি—থাকবার জায়গা নেই—খাবার সঙ্গতি নেই—চাকরী নেই—আমি আজ মুক্ত, স্বাধীন।

লোকটা এইখানেই তার কাহিনী শেষ করে উঠে দাঁড়ালো। তারপর হাত দুটো ওপরের দিকে তুলে আলিস্যি ছাড়বার মত ভাব করে সমস্ত শরীরটাকে লম্বা করে দিল। অলক ভাবছিল—লোকটাকে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টে কোন চাকরী দেওয়া যায় কি না। হঠাৎ ওর দিকে তাকিয়ে অলক দেখলো, ওর শরীরটা অদ্ভুতভাবে পরিবর্ত্তিত হচ্চে। হাতের মুঠোটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটা জানোয়ারের থাবার মতো হ'লো। সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠবার মত লোমগুলো খাড়া খাড়া হয়ে উঠ্‌লো—মুখখানা বিকট জন্তুর মুখের মত হ'য়ে উঠ্‌লো—দেখ্‌তে দেখ্‌তে ক্রমশঃ সে প্রকাণ্ড একটা বাঘের আকৃতি ধারণ করচে। কর্কশ কণ্ঠে সে বলে উঠ্‌লো—'তোমার কাছে টাকাকড়ি যা আছে দাও—নইলে—'

অলক মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্য স্থির কোরে চীৎকার করে উঠ্‌লো: 'ঐ দেখ—তোমাকে গুলী কর্‌চে—সরে দাঁড়াও, সরে দাঁড়াও—'

সেই নরদানবটা মুখ ফেরাবামাত্র চক্ষুর নিমেষে অলক মোটারে ষ্টার্ট দিলো। ষ্টার্টের শব্দে ওটা এক লাফে অলকের ঘাড়ের ওপর পড়বার উপক্রম করতেই অলক প্রচণ্ড বেগে ওর মাথায় এক মুষ্ট্যাঘাত কর্‌লো। তারপর জোরে মোটার চালিয়ে দিল। অলকের টিফিন ক্যারিয়ার ও খাবারের বাস্কেট পড়ে রইল। কিছু দুর এগিয়ে অলক বুঝ্‌তে পারলো তার পুরোনো মোটারের ছ'টি সিলিণ্ডার কাজ কর্‌চে না—চারটা সিলিণ্ডারে কোন মতে টান্‌চে। পেছনে চেয়ে দেখেই অলকের প্রাণ উড়ে গেল—সেই নরদানবটা উর্দ্ধশ্বাসে মোটর ধরবার জন্যে ছুটে আসচে। এখন সেটাকে সুস্পষ্ট একটা প্রকাণ্ড বাঘের আকৃতির জানোয়ার বলে বোঝা যাচ্ছে। অলক এক্সিলেটরটায় যত চাপই দিচ্চে গাড়ীর স্পীড তাতে একটুও বাড়চে না। বাঘটা ওকে ধরে ফেলেচে। পেছনে তাকিয়ে অলক দেখলো হুডের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে বাঘটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ কর্‌চে আর গাড়ীতে ওঠবার চেষ্টা কর্‌চে! ওর পায়ের কাছে ষ্টার্ট দেবার হাণ্ডলটা পড়ে ছিল। বাঁ হাতে ষ্টিয়ারিং ধরে ডান হাতে সেটাকে তুলে নিয়ে ও বাঘটার মাথায় সজোরে আঘাত কর্‌লো। বিকট শব্দ কোরে জানোয়ারটা মাঠিতে পড়ে গেল—আহত হ'য়ে।

সেই অবসরে অলক গাড়ীতে সেকেণ্ড গিয়ার দিয়ে পাহাড়ের উঁচুর দিকে রাস্তায় উঠ্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লো। পেছনে তাকিয়ে দেখ্‌লো—বাঘটা আবার উঠেচে—আবার তার দিকে হিংস্র বিক্রমে ছুটে আসচে! অলক গাড়ীর স্পীড বাড়িয়ে দেবার জন্যে থার্ড গিয়ার দিতেই ইঞ্জিন একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেল।...সর্ব্বনাশ! এক মিনিটের মধ্যে বাঘটা ওকে ধরে ফেল্‌বে। আর রক্ষা পাবার কোন উপায় নেই। অলক প্রাণপণে সেল্‌ফ ষ্টার্টার ব্যবহার করেও কোন ফল পেল না—গাড়ীতে ষ্টার্টই হয় না—ও নেবে পড়লো। হাণ্ডল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাড়ীতে কোন মতে ষ্টার্ট হতেই মুহূর্ত্তে সে উঠে পড়লো এবং পাহাড়ের ঢালু পথে গাড়ীকে দিলে ছেড়ে। বাঘটা এই জায়গায় ক্রমে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লো। পথটা ঘুরে গেছে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গেলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আবার পথে ওঠা যায়। মানুষের বুদ্ধিসম্পন্ন বাঘ সেই জন্যেই জঙ্গলের মধ্যে নামলো, অলক এটা স্পষ্টই বুঝ্‌তে পার্‌লো। সে আবার এক্সিলেটারে চাপ দিতে লাগ্‌লো। হঠাৎ গাড়ীর ছটা সিলিণ্ডারই অতি সুন্দরভাবে কাজ করতে লাগলো এবং গাড়ীখানা ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে ছুটতে আরম্ভ কর্‌লো। জঙ্গল যেখানে শেষ হ'য়ে গেছে গাড়ীখানা

সেখানে আসতেই অলক শুনতে পেল পরিচিত কণ্ঠে কে একজন বললো : ধন্যবাদ—'সকাল বেলায় আদর কোরে খাওয়াবার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ—'

অলক দেখ্‌লো : বাঘ নয়—সেই লোকটা ! রাস্তার এক পাশে দাড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসচে !

অলক উন্মাদের মতো গাড়ী চালিয়ে চলে যাচ্ছে। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ওর সমস্ত চেতনা যেন ক্রমশঃ বিলুপ্ত হ'য়ে আসচে। ধারওয়ার এসে পৌছলে ওকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্মিথ সাহেব এগিয়ে এলেন। অলক বলে উঠ্‌লো : 'মিষ্টার স্মিথ, আপনি কি কখনো শুনেছেন, এমন কতকগুলো পুরুষ বা স্ত্রীলোক আছে যারা ইচ্ছামত বাঘের আকৃতি ধারণ করতে পারে ? অথবা আসলে তারা বাঘ—ইচ্ছামত পুরুষ বা স্ত্রীলোকের আকৃতি ধারণের ক্ষমতা তাদের আছে ? শুনেছেন কি ? দেখেছেন কি ? বলুন—বলুন মিষ্টার স্মিথ—'

বলতে বলতে ষ্টিয়ারিংএর ওপর ওর মাথাটা এলিয়ে পড়লো। ওর তখন জ্ঞান নেই।



মতপরিবর্ত্তন

শ্রী রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নন-কো-অপারেশনের পর হইতে আমাদের পাড়ার রামবাবুর স্বভাব একেবারে বদলাইয়া গেল। তাঁর বারো আনা চার আনা চুল সমান হইয়া আট আনা আট আনা হইল। কপালে ফোঁটা, মাথায় টিকি, গলায় মালা দেখা দিল। বাড়ীর অন্য সকলেরও পরিবর্ত্তন হইল। ছেলেটা ইংরাজী স্কুলে পড়িতেছিল, নাম কাটাইয়া টোলে ভর্ত্তি করা হইল, আর মেয়েটার পড়ার বালাই রহিল না।

যে রামবাবু ইংরাজী ধরণে চলিবার আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন তিনি এই পরিবর্ত্তনে পাড়ায় একটা কেষ্ট বিষ্টু হইয়া পড়িলেন। সবাই আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলে—হ্যাঁ, মানুষ বল্‌তে রামবাবু; গভর্ণমেণ্টের আফিসে বড় চাকুরী করে, যে মাসে ৩০৲ টাকার সিগারেট খেতো সেই লোক আজ এই ভাবে দিন কাটিয়ে দেয়! স্বার্থত্যাগের ইহার চেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের পাড়ায় অন্তত আর নাই।

রামবাবুর ইংরাজ-বিদ্বেষ যেন একেবারে চরমে উঠিয়াছে। কোনও অজুহাত পাইলেই রামবাবুর গোপন আনন্দ আর ধরে না। পাশের বাড়ীর শ্যামবাবুকে ইসারায় বলেন—কেমন হে, এবার কর্ত্তারা মজা বুঝবে; বাঙালীকে ঘাঁটান ভাল নয়; আরে, সাধে কি গোখেল বলে গেছে— What Bengal thinks to-day, India thinks tomorrow. তবে ভাই, ছেলেপুলে সাবধান; terrorist-দলে না যায়!

কিন্তু রামবাবুর বাহিরে যতই প্রশংসা থাকুক না, ঘরে তাঁহার শান্তি নাই। স্ত্রী, যেদিন রামবাবু ছেলেমেয়েকে স্কুল ছাড়াইলেন সেই দিন হইতে স্বামীর সহিত কথা বন্ধ করিয়াছেন। স্বামী যখন ছেলেকে স্কুল ছাড়াইয়া টোলে ভর্ত্তি করিলেন, তখন অবলা স্ত্রী কথা বন্ধ করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু মাতৃহৃদয় অধিক উদ্বেলিত হইল মেয়েটার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া। তাহার আদরের মেয়েটি প্রতিবৎসর পরীক্ষায় প্রথম হইয়া ক্লাসে উঠিতেছিল, মেয়ে একে সুন্দরী তদুপরি লেখাপড়ায় ভাল আর সুনিপুণভাবে তাকে গৃহকর্ম শিখাইতেছিলেন, তাই মনে আশা গোপনে বর্দ্ধিত হইতেছিল ভাল ঘর ভাল বরে মেয়েকে সমর্পণ করিয়া নারীর কাম্য সুখের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। সব আশার মূলেই কুঠারাঘাত করিল নন-কো-অপারেশন। তিনি মনে মনে আশ্চর্য্য হইয়া ভাবেন এই নন-কো-অপারেশন মানুষকে কি রকম অন্ধ করিল! কিন্তু ঘরের কর্ত্তার বিরুদ্ধে ভিন্ন মত পোষণ করার মানে অন্তরে জ্বলিয়া মরা, রামবাবুর স্ত্রীরও তাহাই হইল—তিনি অন্তরে জ্বলিতে লাগিলেন। রামবাবুর আর একটা উৎপাত বাড়িয়াছে, পূজা, অর্চ্চনা, ঠাকুর দেবতার উপর অস্বাভাবিক ভক্তি। রাস্তায় ঠাকুর দেবতা বা মন্দির দেখিলে তাঁহার অন্তর্নিহিত ভক্তি-প্রকাশ যেন শেষ হইতে চাহে না; এ বিষয়ে তিনি খুব ক্যাথলিক—মন্দির, চার্চ, সিঁদুরমাখান বটগাছ যাহাই হোক না কেন, তাঁহার হৃদয়ে সমানভাবে ভক্তির উদ্রেক করে!

পাড়ায় রামবাবুর প্রায় অপ্রতিহত প্রভাব। সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে, এক

রমানাথবাবু বাদে। রমানাথবাবু বরাবর রামবাবুকে ভণ্ড বলিয়া আসিতেছেন—হুজুগে, বিকৃতমস্তিষ্ক ইত্যাদিও বলিয়া থাকেন। রামবাবুর এক ভক্তের সহিত রমানাথবাবুর একদিন হয় তর্ক। ভক্ত বলে—আর যাই বলুন রামবাবুকে ভণ্ড বল্‌বেন না। দেখুন কি Sacrifice! যিনি মাসে ৩০৲ টাকার সিগারেট খেতেন গান্ধিজীর কথায় তা একেবারে ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন।

রমানাথবাবু হাসিয়া বলেন—তাতে ওর লাভই হয়েছে, মাসে সিগারেটের টাকাগুলি জম্‌ছে; আর সিগারেট খাবে কোত্থেকে? রেসে হেরে হেরে টাকা হাওয়া হয়ে উড়ে গেছে; ওটা Sacrifice নয় ওটা Compulsion. তাই যদি না হবে গান্ধিজীর আদেশে চাকুরীটা ছাড়্‌চে না কেন বলুন? যারা প্রকৃত স্বদেশী, তারা গভর্ণমেন্টের চাকুরী-করাকে গোলামী মনে করে।

ভক্তও এ বিষয়ে একটু নিরাশ হইয়াছে। গান্ধিজীর এমন শিষ্য যে কেন চাকুরীটার মায়া কাটাইতে পারিতেছে না তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তাহার মনে হয় চাকুরীটা ছাড়িলে রামবাবু বাংলাদেশের একজন বড় লীডার হইবেন সুনিশ্চিত।

ভক্ত মাথা চুলকাইয়া তবু তর্ক করে,—সবটাই কি পারা যায়? যে যা পারে তাই প্রশংসনীয়।

রমানাথ উত্তরে বলিয়া বসেন—তাই বলুন, কিন্তু সেটা কি অন্যের পক্ষেও প্রযোজ্য নয়? আমি 'রায় বাহাদুর' উপাধীটা ছাড়্‌তে পাচ্ছিনা ঠিক সেই কারণে, সব কি পারা যায়? কংগ্রেসে চাঁদা দিচ্ছি, সভাসমিতিতে গরম গরম বক্তৃতাও কয়েকবার দিয়েছি, কাউন্‌সিলে যাবার ইচ্ছে আছে তখন কিছু খদ্দরও কিন্‌ব কথা দিয়েছি, তবে আমি ওর চেয়ে কম স্বদেশী কিসে? বড় লোকের সঙ্গে গরীব লোকের কথা কাটাকাটি করা চলে না, তাই তর্ক অমীমাংসিত ভাবেই আসিয়া যায়। সব কথাই রামবাবুর কাণে যায়, রামবাবু সব শুনিয়া 'গুম' হইয়া থাকেন, একটা ভায়লেণ্ট (Violent) চিন্তা ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেবল মাথায় পাক খাইতে থাকে, কি করিয়া রমানাথবাবুকে জব্দ করা যায়—ঐ গভর্ণমেন্টের খয়ের-খাঁটাকে। রমানাথবাবুরও রামবাবুর প্রতি যথেষ্ট রাগ আছে। রামবাবুর অপমান করার কথা সে ভোলে নাই। নন-কোঅপারেশনের সময়ে রমানাথবাবুর খাওয়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল রামবাবুর কারসাজিতে, অপরাধ রামবাবুর অনুরোধ রমানাথবাবুর রায় বাহাদুর খেতাব পরিত্যাগে অনিচ্ছুকতা; নেহাৎ কলিকাতা বলিয়াই সেবার রমানাথবাবু বাঁচিয়া গেলেন।

হোলী উৎসব আসিয়াছে। ঘরে ঘরে রংএর ছড়াছড়ি। সকলেই উৎসবে মাতিয়াছে। রামবাবু প্রৌঢ় হইলেও উৎসাহ তাঁর যেন যুবকের চেয়েও বেশী। তিনি আবার পিচকারীতে নানা রংএর কালি গুলিয়া রং পাকা করিয়াছেন যেন কাপড়ের রং কিছুতেই উঠিয়া না যায়। পাড়ার ছেলেদের এমন একজন উৎসাহীর অনুগত হওয়া স্বাভাবিক। তাই রামবাবুর বাড়ীর পাশ দিয়া আজ 'অক্ষত' দেহে যাইবার উপায় নাই; যতবড় পদস্থই হোক তাহার কাপড় রঞ্জিত হইবেই হইবে। এমন কি রমানাথ বাবুও এ দিনটায় রাম বাবুর বাড়ীর পাশ দিয়া যাইতে সাহস করেন না। তিনি অবশ্য হোলীর উপরে হাড়ে হাড়ে চটা; হোলীকে তিনি ইতর লোকের আমোদ মনে করেন; কিন্তু তাহার মতে কি আসিয়া যায়!

দুই একটা incident হইতে লাগিল এবং সেগুলি রামবাবুর বাড়ীর কাছেই। গঙ্গায় যাইবার পথে একজন মহিলার কাপড়ে রং দেওয়া হইল। মহিলাটি অতি সংযত ভাষায় বলেন "কি অসভ্য ছেলে তুমি,

মেয়েদের গায়ে রঙ্ দিতে নেই, মা তোমাকে বারণ করে দেন নি তোমার হাতে পিচকিরি দেবার আগে ?” মহিলাটি লেডি টিচার।

রামবাবু আসিয়া পড়েন ব্যাপারটা মিটাইয়া দিতে ; যোড়হাতে তিনি মহিলাটিকে বলিলেন—মা, সন্তানের অপরাধ নিবেন না ; আজ হোলী।

মহিলাটি দেখাইলেন তাঁহার গরদের সাড়ীখানা রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। রামবাবুর একই কথা—মা, সন্তানের অপরাধ নিবেন না, আজ হোলী।

মহিলাটি চলিয়া যান। এত সহজে ব্যাপারটা মিটিয়া যাইবে কেহ ভাবে নাই। সবাই রামবাবুর বুদ্ধির প্রশংসা করিতে থাকে ; রামবাবুও নিজের উপস্থিত বুদ্ধিতে খুসী, বলেন এমনি করে কাজ হাঁসিল কর্ত্তে হয় ; মুখভঙ্গী করিয়া বলেন—“আজ হোলীর দিনে চলেছেন গরদের সাড়ী নিয়ে গঙ্গায় নাইতে, বোঝ মজা।” উপস্থিত সবাই হাসিয়া উঠে যেন মস্ত বড় একটা রসিকতা হইল।

একটি ভদ্রলোক ভাবিয়াছিলেন কোট, প্যাণ্ট পরিয়া বাটীর বাহির হইলে নিষ্কৃতি পাইবেন। কিন্তু রামবাবুর বাড়ীর নিকট আসিতেই চারদিক হইতে চারিটি পিচকারী তাঁহার উপর তাক্ করা হইল, শুধু যেন সংকেতের অপেক্ষা।

ভদ্রলোকটি একেবারে এতটুকু হইয়া কাতর নয়নে রামবাবুর দিকে চাহিয়া বলেন,—মশাই, ছেলেদের থামিয়ে আমায় রক্ষা করুন ; আমাকে আফিসে যেতেই হবে, সাহেবের কাছে রঙিন পোষাক নিয়ে কি ক'রে যাব ?

রাম বাবু অতি সদাশয়ের মত বলিয়া উঠিলেন “থাম, থাম তোরা কি করিস ?”—আর কি করিস্ ? বোধ হয় পূর্ব্বেই “কোড ওয়ার্ড” ছিল ‘কি করিস’ বলিলেই পিচ্কারী নিঃশেষ করিয়া দিবার।

ভদ্রলোকটি রাগতভাবে বলিলেন, “এটা কি ভাল হ'ল ? গরীব লোকের টাকা নষ্ট করে আপনাদের কি লাভ হ'ল মশাই ? রামবাবু একেবারে হাত জোড় করিয়া বলেন—কি কর্‌বো মশাই, দেখলেন তো থামাতে পারলুম না ; আজ হোলী আপনাকে ধর্ম্মের জন্য একটু আর্থিক কষ্ট স্বীকার কর্ত্তেই হবে।”

ভদ্রলোকটি ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন—আমিও দেখ্‌বো আপনিও ধর্ম্মের জন্য আর্থিক কষ্ট স্বীকার কর্ত্তে প্রস্তুত আছেন কি না।—বলিয়া চলিয়া যান। লোকটি চলিয়া যাইতেই সবাই হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠে ; রামবাবু হাসিয়া বলেন, “আবার সাহেবের মেজাজ দেখান হচ্ছে। লজ্জাও করে না হোলীর দিনে গোলামী কর্ত্তে ? হুঁঃ।”

প্রৌঢ় লোকের যখন এইরূপ ধারণা, ছেলেদের কথা আর বলা নিষ্প্রয়োজন। তাহারা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত হোলী উৎসবে মাতিয়া গেল।

এর চেয়ে আরও বড় একটা ঘটনা ঘটিল। রমানাথ বাবু তসরের পাঞ্জাবী ও চাদর পরিয়া বাহির হইলেন একজায়গায় নিমন্ত্রণে যাইতে হইবে। মোটরখানা বাড়ীতে নাই ; ট্রামের রাস্তা পর্য্যন্ত হাঁটিতেই হইবে। ভয় শুধু রামবাবুর বাড়ীর ধারটা, তা না হইলে এমন পোষাকে বাহির হইলে কলিকাতার অন্য কোথাও নির্ভয়ে ও অক্ষত দেহে চলিয়া যাইতে পারিবেন বলিয়াই ঐ দামী পোষাকটি পরিয়া বাহির হইলেন।

দূর হইতেই রামবাবু রমানাথবাবুকে আসিতে দেখিতে পাইলেন ; ইঙ্গিতে ছেলেকে বলিলেন রমানাথবাবু

আসিলেই যেন রং সব উজাড় করিয়া দেওয়া হয়। রমানাথকে জব্দ করিবার এক সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

গম্ভীরবদন রমানাথবাবু বদন আরও গম্ভীর করিয়া চলিয়াছেন; কিন্তু বৃথা গাম্ভীর্য্যের চেষ্টা। রামবাবুর বাড়ীর নিকট আসিতেই বিনা বাক্যব্যয়ে রমানাথবাবুর তসরের পাঞ্জাবী চাদর রঞ্জিত হইয়া গেল তদুপরি কে যেন এক দোয়াত কালি পিঠে ঢালিয়া দিল। রক্তচক্ষু রমানাথ রামবাবুর দিকে চাহিয়া বলেন এর মানে? নিশ্চয় আপনার ইঙ্গিত আছে; নচেৎ আমার গায়ে রঙ্ দেবার সাহস ছেলেদের হ'তে পারে না এবং হওয়া উচিতও নয়।

রাম বাবু পূর্ব্বের মত বিনয়ের সহিত বলেন ক্ষমা কর্‌বেন, ছোট ছোট ছেলেদের আজ হোলী।

ক্রুদ্ধস্বরে রমানাথবাবু বলেন—হোলী তো আমার কি? যারা হোলী করে তাদের নিয়ে উৎসব করুক যারা হোলী করে না তাদের জড়াচ্ছ কেন?

রাম বাবুর এক কথা—আজ হোলী, ক্ষমা কর্‌বেন।

দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া রমানাথবাবু চলিয়া গেলেন, বাড়ীর দিকে নয়, ট্রামের দিকে।

রমানাথ বাবু চলিয়া গেলে পূর্ব্বের মত সকলে উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠে, ভাবখানা রায়বাহাদুরটাকে আচ্ছা জব্দ করা গেছে কিন্তু এবার হাসিল না কেবল হোলীর নেতা রামবাবু।

রমানাথ বাবু যখন ঐ পোষাকে ট্রামের দিকে চলিয়া গেলেন তখন রামবাবুর চৈতন্য হইল কাজটা ভাল হয় নাই; এবং পূর্ব্বের মহিলা ও ভদ্রলোককে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে পড়িল। যাহারা অনিচ্ছুক তাহাদের লইয়া উৎসব করার চেষ্টা যে উৎসবের বিঘ্ন তাহা যেন নতুন করিয়া তাঁহার উপলব্ধি হইল। কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে তার উপায় কি?

ব্যাপারটা যে কোর্ট পর্য্যন্ত গড়াইবে তাহা কেহ মনে করে নাই; কেবল রামবাবুর একটু আশঙ্কা হইয়াছিল। পরে দেখা গেল ক্ষমা কেহই করে নাই। মহিলাটি ও বাবুটি থানায় পূর্ব্বেই ডায়েরী করিয়াছে এবং সর্ব্বশেষে রমানাথ বাবু।

একই ব্যক্তির নামে একদিনে তিনটা অভিযোগ ম্যাজিষ্ট্রেট অবজ্ঞা করিতে পারিল না। তদুপরি সে ইংরাজ। এই সব নোংরা উৎসব তাহার শিক্ষিত মনের পক্ষে বিরক্তিকর। তাই বিচার রামবাবুর বিরুদ্ধেই চলে; ফলে রামবাবুর ১৫০৲ টাকা জরিমানা হইল।

রামবাবুকে রায়ের বিরুদ্ধে উর্দ্ধতন আদালতে আপীল করিতে পাড়ার সবাই বলিয়াছিল কিন্তু রামবাবুর কেমন যেন মনে হইল শাস্তি তাঁহার ঠিকই হইয়াছে। শুধু তাহাই নয় তাঁহার মতের আবার পরিবর্ত্তন হইল। নন-কোঅপারেশনের পরিবর্ত্তনগুলি পরিত্যাগ করিয়া তিনি পূর্ব্বের অবস্থায় ফিরিয়া গেলেন; ছেলে টোল ছাড়িয়া স্কুলে ভর্ত্তি হইল; মেয়ে আবার স্কুলের গাড়ীতে উঠিতে লাগিল। সর্ব্বোপরি স্ত্রীর মুখে ফুটিয়া উঠিল আনন্দের হাসি। পর বৎসর হোলীর দিনে রমানাথ-বাবু তসরের পাঞ্জাবী ও চাদর পরিয়া একেবারে অক্ষত দেহে রামবাবুর বাড়ীর পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন। পিচকারী হাতে সেখানে একটি ছেলেও ছিল না। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই রামবাবু একরাশ বিরক্তি মুখে করিয়া বাড়ীতে ঢুকিলেন, দেখা গেল কে যেন তাঁহার সুন্দর 'সুট'টা রঞ্জিত করিয়া দিয়াছে।

রূপ-কথা *

সম্বুদ্ধ

এই নাটকের ঘটনাস্থল, ম্যাডক্স স্কোয়ারের কাছে একটি বাড়ির তিন তলার ফ্ল্যাট্। সেই ফ্ল্যাট্ ভাড়া লইয়া একটি বাঙালি ক্রিশ্চান পরিবার বাস করে। পরিবারে লোক পাঁচ জন:

মিসেস সরকার—(বয়স ৬০)

তাঁহার কন্যা—জ্যোতি (মিসেস দত্ত)—(বয়স ৩৫)

জ্যোতির দুই মেয়ে—রেণু (বয়স ১৬) ও বুলি (বয়স ১২ হইতে ১৩'র মধ্যে)

বাড়ীর পুরানো দাসী—হেমজা—(বয়স ৪০)

ইহা ছাড়া, বাহিরের লোক আমরা দেখিব দু'জন:

ডক্টর সেন—বাড়ির পুরাণো ডাক্তার ও বিশ্বস্ত বন্ধু, (বয়স ৬০)

জয়ন্ত চৌধুরী—ব্যারিষ্টার (বয়স ৪০ হইতে ৪২)

নাটকের কাল, ডিসেম্বরের প্রথম কি দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনটি দিন—বুধবার বিকাল হইতে শুক্রবারের সকাল পর্য্যন্ত।

নাটকের দৃশ্যস্থল দুইটি:

বসিবার ঘর: (তৃতীয় অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য ছাড়া সকল ঘটনাই এই ঘরে ঘটে।)

ঘরটি খুব বড় নয়, কিন্তু সুন্দর করিয়া সাজানো-গোছানো। আসবাব পত্র যাহা আছে তাহার কতক দামী—এককালীন সুদিনের চিহ্নাবশেষ। কতক আসবাব নুতন, তাহার দাম হয়তো বেশি নয়, কিন্তু তাহারও সর্বত্রই একটা সুষ্ঠু ও সংযত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। ঘরে দরজা দুইটি—ডান দরজা বাহিরে ও বাম দরজা ভিতরের পথ।

প্রয়োজনীয় আসবাবের মধ্যে আছে:

একটা বড় সেটি—পিছনের দেওয়ালের কাছে। তাহার বাম কোণে একটা সোফা—মিসেস সরকারের অত্যন্ত স্থান। দিনে রাতে অনেকখানি সময়ই তিনি এই-খানে বসিয়া কাটাইয়া দেন—হাঁটুর বাতের জন্য তাঁহার বেশি নড়াচড়া করা হইয়া উঠে না। হাঁটিতে হইলে লাঠি লইয়া খোঁড়াইয়া হাঁটিতে হয়। সোফা ও সেটির পিছনের কোণে একটি ছোট টেবিলে তাঁহার সময় কাটাইবার উপকরণ খুচরা জিনিষ পত্র থাকে—সেলাই ও এমব্রয়ডারির সরঞ্জাম, চশমা, ছোট্ট একটি টেবিল ঘড়ি, দু-একখানা বই, কয়েকটি মাউন্ট-করা ছোট ফটোগ্রাফ—তাঁহার স্বামীর, কন্যার, দৌহিত্রীদের। টেবিলে ও টেবিলের ড্রয়ারে তাঁহার এই সমস্ত দ্রব্য সম্ভার সাজানোই থাকে, যেন হঠাৎ কোন কিছুর জন্য তাঁহাকে মুস্কিলে পড়িতে না হয়।

ঘরের অন্যত্র কয়েকটা সোফা চেয়ার প্রভৃতি সাজানো। দেয়ালে কয়েকখানা ছবি। তাহার মধ্যে বিশেষ করিয়া চক্ষে পড়ে, একেবারেই সম্মুখেই (পিছনের দেওয়ালে) পাশাপাশি দু'খানা বাঁধানো বড় অয়েল পেন্টিং। একখানা জ্যোতির, তাহার তরুণ বয়সের প্রতিকৃতি। অন্যখানা তাহার মৃত স্বামীর—সৈনিকের পোষাক পরা যুবা, গৌরবর্ণ, সুন্দর, তীক্ষ্ণ চেহারা। দু'টা ছবি গায়ে গায়ে বসানো—জ্যোতির প্রথম জীবনের স্মৃতিচিহ্ন।

সেটির ডান কোণে আরেকটি ড্রয়ার-ওয়ালা ছোট টেবিল। তাহার উপরে ফুলদানি একটা থাকিতে পারে। এই টেবিলটা অন্য সকলে প্রয়োজন মত ব্যবহার করিবে।

দরজা দুইটি ফুট-লাইটের দিকে, বিলাতি ধরণের এক-পাল্লা কবাট, প্রেক্ষাগৃহের দিকে সে দরজা খোলে। ডান দিকের দেয়ালে জানালা। ডান দরজা ও জানালার মধ্যে দেয়ালে সুইচবোর্ড ও টেলিফোন বসাইবার জন্য প্লাগ্-পয়েন্ট।

ফ্ল্যাটের বাহিরে যাইবার দরজা, ঘরের ডান দরজা হইতে কিছুটা দূর; এবং এই ঘরের ভিতর দিয়া ছাড়াও, বাহির হইতে আসিয়া ফ্ল্যাটের অন্দর-মহলে যাতায়াত করিবার পথ আছে।

রেণু ও বুলির শুইবার ঘর: (তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য):

অল্প বয়স্ক মেয়েদের শুইবার ঘর যেমন হয়। দু'দিকে দু'খানা ছোট খাটে দু'জনের বিছানা, খাটের মাথা প্রেক্ষাগৃহের দিকে। ছাতে বাতি, খাটের মাথার দিকে

---

* ইংরাজী নাটক অবলম্বনে।

দু'কোণে টেবিলে দু'টি রিডিং ল্যাম্প্। পায়ের দিকে দেয়ালের গায়ে কাপড় রাখিবার দু'টি আলমারি বা আল্না। আলমারিতে তাহাদের কাপড় চোপড় প্রসাধন দ্রব্য প্রভৃতি থাকে।

ইহা ছাড়া কিছু খুচরা আস্বাব আছে, দু'খানা চেয়ার, মুখ ধুইবার জন্য ওয়াশ্-ষ্ট্যাণ্ড্ ইত্যাদি।

ঘরের দরজা একটি—পিছনের দেয়ালে, মাঝখানে। দ্বারের পাশে সুইচ্‌বোর্ড। বোর্ডে ঘরের সকল আলোরই সুইচ আছে। কিন্তু রিডিং ল্যাম্প দু'টির ইহা ছাড়াও আলাদা সুইচ আছে, দুই খাটের গায়ে।

পূর্বাভাস—

এই পরিবারটি ধনী নয়, কিন্তু একদা ইহারা সম্ভ্রান্ত বলিয়া পরিচিত ছিল। তারপর ইহাদের জীবনে দারিদ্র্য আসিয়াছে, কিন্তু জ্যোতির মনের ও শিক্ষার আভিজাত্যকে মলিন করিতে পারে নাই। বিধবা হইবার পর হইতে, প্রাণপণ যত্নে সে কন্যাদের শিক্ষা ও স্বাধীনতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছে, তাহাদের বাহিরে অন্য কিছু লইয়া ভাবিবার সময় সে বড় একটা পায় না।

মাস খানিক হইল, জোর খানিকটা জ্বরে ভুগিবার পর, শরীর সারিবার জন্য সে পুরীতে তাহার এক বন্ধুর বাড়িতে অতিথি হইয়া চলিয়া গিয়াছে, এখনও সপ্তাহ খানেক তাহার ছুটি আছে। নিজের আয়েই সে সংসার চালায় —একটা বড় ষ্টেশনারী দোকানে সে shop-assistant.

এদিকে বুধবারে রেণুর জন্মদিন, কিন্তু ক'দিন ধরিয়া জ্যোতির একটা চিঠি পর্যন্ত আসে নাই, জন্মদিন বিকালে হেলিয়া পড়িল, তখনও না। তাহার এই স্বভাববিরুদ্ধ নীরবতায় বাড়ির সকলেই অল্প বিস্তর উদ্বিগ্ন হইয়া আছে। বিশেষ করিয়া রেণু, স্বভাবত নম্র ও শান্ত এই মেয়েটি মাকে তাহার সমস্তখানি প্রাণ ও চেতনা দিয়া ভালবাসে।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বুধবার বিকাল

বসিবার ঘর

যবনিকা যখন উঠিল, বেলা সাড়ে চারটা হইতে পাঁচটার মধ্যে। মিসেস সরকার তাঁহার সোফায় বসিয়া একটা রঙিন্ কাপড়ের জামায় শেলাইয়ের শেষ ক'টা ফোঁড় তুলিতেছেন—জামাটা একটা ব্লাউজ্। শেলাই শেষ করিয়া তিনি সযত্নে জামাটাকে ভাঁজ করেন, তারপর টেবিল হইতে একটা ছোট্ট সুন্দর কার্ডবোর্ডের বাক্স তুলিয়া লইয়া তাহার মধ্যে জামাটাকে রাখিয়া, খানিকটা লাল রিবন্ দিয়া বাক্সটা বাঁধিতে আরম্ভ করেন।

মিসেস সরকারের বয়স ষাটের মত। একদা সুন্দরী ছিলেন, এখনও তাহার ছাপ একেবারে মিলাইয়া যায় নাই। মুখে চক্ষে বুদ্ধি ও কৌতুকপরায়ণতার একটা স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্য আছে—ইহার জন্য তাঁহার বয়স অনেক কম দেখাইত, যদি-না হাঁটুর বাতে অষ্টপ্রহর তাঁহাকে কাবু করিয়া রাখিত। দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরবচ্ছিন্ন এই বাতের যন্ত্রণা ভুগিবার ফলে তাঁহার মুখে স্বতই একটা শ্রান্তির ভাব থাকে। তাঁহাকে দেখিয়া বোঝা যায়, তাঁহার শিক্ষা ও সহবৎ দুইই আছে, জন্মগত ভদ্রত্বের একটা স্পষ্ট আভাস তাঁহার মধ্যে সর্বদাই পাওয়া যায়। এবং সকল অবস্থায়ই এমন স্থির শান্ত ও অবিচলিত থাকিয়া তিনি চলিতে পারেন, যে অতি-অভিজাত একটা চেতনা না থাকিলে তাহা অসম্ভব। যৌবনে তিনি সুখ ও সমৃদ্ধির মুখ দেখিয়াছেন; পরে সেই সমৃদ্ধি হইতে বঞ্চিত হইয়াও মনের আভিজাত্য তিনি হারান নাই; অথচ এই অনভ্যস্ত দারিদ্র্যের পীড়ন তাঁহার মনে একটা সচকিত ভাবও আনিয়া দিয়াছে—আরও বড় দুঃখ আসিতে পারে এ ভয় তাঁহার আছে। এবং এই আকস্মিক দুরবস্থা প্রথম আঘাতে তাঁহাকে একটু বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া, এখন তিনি স্বভাবতই অপরের সুখ সুবিধার জন্য খুব বেশিমাত্রায় চিন্তা করেন—সেই করুণা তাঁহার স্বভাবগত আভিজাত্য ও ব্যক্তিগত দুঃখের-অভিজ্ঞতা এই দু'য়ের মিশ্রণে জন্মলাভ করিয়াছে। সংসারে তাঁহার সমস্তখানি সত্তা ও চেতনাই ফেরে তাঁহার কন্যা ও দুই দৌহিত্রীকে ঘিরিয়া—ইহাদের বাহিরে পৃথিবীতে আপনার বলিতে তাঁহার আর কেহ নাই।

বাহিরের দরজা খোলা ও বন্ধ হওয়ার শব্দ হয়। সঙ্গে সঙ্গে একটা তীক্ষ্ণ ও কচি উচ্চ কণ্ঠ কানে আসে, বুলি। (নেপথ্যে) বাপ্‌রে বাপ্! বুলি স্বভাবসিদ্ধ গতিতে দ্বারে ধাক্কা খাইয়াছে। তাহার সঙ্গে

আসে একটা মৃদু শান্ত স্বর রেণুর। দু'টা স্বর ক্রমে পৃথক হইয়া যায় কচি গলাটা দূরে, পিছন দিকে যাইতে থাকে—এই ঘরের বাহির দিয়াও ফ্ল্যাটের ভিতর-বাড়িতে যাইবার যে-পথ আছে সেই পথে ক্রমে মিলাইয়া যায়। মৃদু স্বরটা সোজা এই ঘরের দিকেই আসে। ইহাদের স্বর কানে যাইয়া মিসেস সরকারের মুখে একটু প্রফুল্ল হাসি ফুটিয়া উঠে—স্নেহ ও প্রিয়জনের অভ্যর্থনার হাসি। তাড়াতাড়ি বাক্স বাঁধা শেষ করিয়া সেটাকে টেবিলে রাখেন, তারপর চশমা খুলিয়া সেটাকেও টেবিলে রাখেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলিয়া রেণু প্রবেশ করে।

রেণুর বয়স ষোল। শান্ত স্নিগ্ধ ও সুন্দর। স্কুলে যাইবার উপযোগী কাপড় পরা, গায়ে কব্জি-পর্য্যন্ত হাতা-ওয়ালা ব্লাউজ। হাতে একটা ষ্ট্রাপে বাঁধা বই খাতা। বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণতায় দীপ্ত মুখ, স্কুলের পরে বলিয়া একটু ক্লান্ত। সে ঢুকিতেই মিসেস সরকার স্মিতমুখে অভ্যর্থনা করেন:

(রেণুর প্রবেশ)

মিসেস সরকার। ছুটি হ'ল?

রেণু। হ্যাঁ। (ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিয়া) মার চিঠি এসেছে?

সরকার। (এই আশঙ্কাই করিতেছিলেন) আসেনি এখনও। কিন্তু আরও তো ক'টা ডেলিভারি রয়েছে।

রেণু। (সহজ সুরে কথা বলিতে চায়) একটা তো এক্ষুণি রাস্তা দিয়ে চলে গেল। (মনের উদ্বেগ চাপিয়া রাখিতে পারে না) আবার জ্বর হ'ল নাকি কে জানে।

সরকার। না, জ্বর হ'লে বোসেরা টেলিগ্রাম করত।

রেণু। পাঁচদিন ধরে একটা চিঠি এল না। আজ আমার জন্মদিন তাও তো জানে। (বই টেবিলে রাখিয়া সেটিতে আসিয়া বসে)।

সরকার। উড়ের দেশের পোষ্ট অফিস তো। সে দেশে পাশের বাড়ির ঠিকানায় চিঠি লিখ্‌লে যেতে সাতদিন লাগে। (একটু হাসিয়া) ছিঃ; অমন মুখ কালো করে না। তোর মা শুন্‌লে কি বল্‌বে?

রেণু। কিন্তু আমি যে না ভেবে থাক্‌তে পার্‌ছিনে। মা মরার মত দেখ্‌তে হয়েছে।

সরকার। জ্বরের পরে অমন রোগা চেহারা সবারই হয়। আর গেল চিঠিতে তো লিখেইছে, খুব ভাল আছে এখন। ফিরে এসে আবার কাজে বেরোতে পার্‌বে ব'লে পর্য্যন্ত লিখেছে, সেরে না গেলে কি আর ওকথা লিখ্‌ত? অসুখের মধ্যেও সেইটেই তার মস্ত বড় ভাব্‌না ছিল।

রেণু। (ব্যগ্র স্বরে, কাছে সরিয়া বসিয়া) আমিও তোমাকে তাই বল্‌ব ভাবছিলাম দিদিমা। এই ফাঁকে ব'লে নিই, বুলিটা এসে পড়বার আগে।

সরকার। কি?

রেণু। এই মার্চে আমার ম্যাট্রিক দেওয়া হ'য়ে যাবে তো। তার পরে আমি আর কলেজে পড়্‌ব না। ভাল দেখে একটা দোকানে কাজ শিখ্‌তে যাব। তাহলে দরকার মত মার বদ্‌লি কাজ ক'রে দিয়ে মাকে একটু ছুটি দেওয়া যাবে। কেমন তো?

সরকার। (শেলাইয়ের ডালা হইতে একজোড়া মেয়েদের মোজা বাছিয়া বাহির করেন) কাজ করতে যাবার বয়স কি তোর এখুনি হয়েছে?

রেণু। (স্মরণ করাইয়া দেয়) বা, আজ আমার ষোলোবছর পুর্‌ল।

সরকার। বিশ্বেস করা শক্ত। (ছুঁচ সুতা খুঁজিয়া বাহির করিয়া রেণুর দিকে আগাইয়া দেন)

রেণু। (ছুঁচে সুতা পরাইয়া দিতে দিতে) কেন? আমাকে এখনও খুকির মত দেখায় নাকি?

সরকার। না। কিন্তু এই সেদিনও ত খুকি ছিলি তুই। তারপর কদিনই বা হয়েছে।

রেণু। (ব্যগ্র হইয়া তাহার কথা বলিতে চায়) বেলা মিত্তির তো চাকরি কর্‌ছে। তার বয়স মোটে পনেরো। আমি ষোলো বছরে পার্‌ব না কেন কর্‌তে?

সরকার। এ পারা না-পারার কথা নয় তো। তোর সম্বন্ধে তোর মার ইচ্ছে অন্যরকম।

রেণু। (কথাটাকে আমল না দিয়া) কোন্ রকম। (ছুঁচ সুতা ফিরাইয়া দেয়) মা নিজে আমার বয়সে যে রকম ক'রে কাটাত! খালি দামী কাপড় পরে মোটরকারে চ'ড়ে সোসাইটিতে ঘুরে বেড়ানো?

সরকার। তখন কি আর এত মোটরকার ছিল,

সব ঘোড়ার গাড়ি। আর সোসাইটিতে সে বেড়াত, সে তো শুধু নিষ্কর্ম্মা ব'লেই নয়। সব মহিলাদেরই তাই করতে হ'ত তখনকার দিনে। কি হ'ল!

রেণু। (মুখ কুঞ্চিত করিয়া) 'মহিলা'টা কি বিচ্ছিরি শুনতে। যেন বেজায় ভারিক্কি আর নির্ভাবনা আর চালিয়াৎ—স্কুল ইনস্পেক্ট্রেসের মতো।

সরকার। ভারিক্কি আর নির্ভাবনাটা কম কথা নয়, পরে বুঝ্‌বি। বিশেষ ক'রে নির্ভাবনা হওয়া।

রেণু। (মায়ের ছবির দিকে তাকায়, তাহার মুখে একটা প্রীতি ও স্নেহের স্মিত হাসি ধীরে ফুটিয়া উঠে) মা কি চমৎকার দেখ্‌তে ছিল তখন। একটুও মহিলা ইন্‌স্পেক্‌ট্রেসের মত নয়। মা খালি 'মা', আর কিচ্ছু নয়। (পিতার ছবির দিকে চায়) সত্যি বাবা যদি এখন বেঁচে থাকৃত! বাবার মত সুন্দর মানুষ আমি আর একজনও দেখিনি।

সরকার। ও কতকটা ঐ পোষাক পরে আছে ব'লে। এমনিতেও ভারি সুন্দর ছিল তোর বাবা, তায় সৈন্যের পোষাকে তাকে আরও ভাল দেখাত। দু'টিতে এমন মানিয়েছিল! (তাঁহার নিঃশ্বাস পরে)

রেণু। বাবা এখন থাকৃলে তো কথাই ছিল না। যদ্দিন বাবা বেঁচে ছিলো, মাকে কখনও কোন কষ্ট পেতে হয়নি। তবু ভাগ্যিস্ তখনকার কথা মনে করে একটু শান্তি সে এখনও পায়! তাই না?

সরকার। হ্যাঁ, সান্ত্বনার মধ্যে ঐটুকুনই তার আছে।

রেণু। (একটু স্তব্ধ থাকিয়া) কিন্তু এখন যা ক'রে মা চালাচ্ছে......লক্ষ্মীটি দিদিমা আমাকে বারণ কোরো না। মাকে যতটুকু পারি সাহায্য করৃতে আমাকে দাও।

সরকার। তুই বুঝছিস্ নে। তোর মা চায় সংসারের চাপ থেকে তোকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে, যেন আরও ক'টা বছর তোর এম্‌নি হেসে খেলে কেটে যায়। তোরা লেখাপড়া শিখ্‌বি, বড় হবি--সেই আশা নিয়ে সে কত কষ্ট ক'রে টাকা জমাচ্ছে।

রেণু। কিন্তু সে টাকা তো সব ফুরিয়ে গেছে তার অসুখে।

সরকার। না যায়নি। দোকান থেকে ছুটির মধ্যেও সে মাইনে পেয়েছে। ডক্টর সেন তো ভিজিট প্রায় নেনই না। আর চেঞ্জে যেতেও তার খরচার মধ্যে লেগেছে শুধু রেলভাড়া।

রেণু। (নীরব)

সরকার। শোন্, সে তোকে একটু আরামে রাখ্‌তে চায়, তা না পারৃলে সে বরং দুঃখই পাবে। এখন ওসব কথা তুলিস্ নে। তার পরে বড় হ'য়ে (একটু হাসিয়া) বিয়ে যদি নাই হয় তখন তো কাজকর্ম্ম এমনিই করতে হবে।

রেণু। কিন্তু আমাদের জন্যে মা খেটে খেটে মুখে রক্ত উঠে মরৃছে—আর আমি বেশ স্বচ্ছন্দে আরাম ক'রে কাটাচ্ছি, এর কোন মানে হয়? আমার এরকম বাবুগিরি করা উচিত নয়।

সরকার। (ঈষৎ লঘু স্বরে) বটে! বাবুগিরি করা হচ্ছে বুঝি আজকাল মেয়ের?

রেণু। (সে কথায় কান না দিয়া বলিয়া চলে) আগে অবশ্য আমি এসব কথা এমন ক'রে ভেবে দেখিনি। কিন্তু জ্বরের মধ্যে মার যখন ডিলিরিয়াম্ হ'ল, আমি তার কাছে ছিলাম তো। সেইদিন মা ডিলিরিয়ামের ঝোঁকে অনেক কথা ব'লে ফেল্‌ল, যা এমনিতে সে কক্ষনো মুখ খুলে স্বীকার করৃত না।

সরকার। (মনে মনে সন্ত্রস্ত হইয়া) কি কথা?

রেণু। তার সমস্ত শরীর মন খাটুনিতে ভেঙে পড়ছে, এমন ক'রে আর চালাতে পারৃছে না—এম্‌নি সব। ডক্টর সেনকে জিজ্ঞেস করৃলাম, তিনি বল্‌লেন মানুষ যে সব দুশ্চিন্তা মনের মধ্যে চেপে চেপে রাখে, ডিলি-রিয়ামের সময় ছাড়া পেয়ে সেইগুলো বেরিয়ে পড়ে। এখন আমি বুঝ্‌তে পারৃছি মার ওপরে এমন ক'রে বোঝা হ'য়ে থাকা আর আমার উচিত নয়।

সরকার। সে কি তোকে বোঝা ব'লে মনে করে?

রেণু। তা হোক, তবু আমি নিজের ভার নিজেই নিতে চাই, মাকে সাহায্য করৃতে চাই। তোমারও নিশ্চয়ই এতে মত আছে। বল দিদিমা, মত দিলে? (সরকার নীরব) তুমি আমার পক্ষে না থাকৃলে আমি পারব না। (রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিতে থাকে) দিলে?

সরকার। (কিছুক্ষণ পরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া) হ্যাঁ, দিলাম। (রেণুর নিঃশ্বাস পড়ে) তার পক্ষে সত্যিই এটা

বড় বেশি বোঝা, আমাদের সকলের দায়িত্ব বওয়া। আমারও অনেকদিন ধ'রে কথাটা মনে হচ্ছিল। কিন্তু কি করব, উপায় তো নেই।

রেণু। আচ্ছা, হঠাৎ যদি এমন একটা কিছু ঘট্‌ত, মাকে আর এমন ক'রে খেটে টাকা রোজগার করতে হ'ত না—কী মজা হত তাহলে। তাই না?

সরকার। সে কি আর সত্যি ক'রে হয় রে। ও বইয়েই পড়া যায়।

রেণু। এবার আমরা দু'জনে মিলে আয় করব, তারপর আরও অনেক টাকা জমিয়ে জমিয়ে তাই দিয়ে আমাদের নিজেদের একটা দোকান করব। (তাহার চক্ষু আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে) ভারি মজা হবে তখন, না? দু'জনে মিলে দোকান চালাব আমরা, আর বাড়িতে থাক্‌বে তুমি। বুলিটার অবশ্য বিয়ে হয়ে যাবে বড় হ'লে।

সরকার। আর তোর? তুই বিয়ে কর্‌বিনে?

রেণু। হয়তো করব কোনো দিন।

সরকার। বিয়ে না কর্‌লে খোকাখুকু পাবি কোথায়? তুই এত ছেলেপিলে ভালোবাসিস্।

রেণু। কেন, বুলির খোকাখুকুরাই তো থাক্‌বে। এমনিতেও আমি তাদের মাসিমা হবো তো।

সরকার। সে কি আর নিজেরটির সমান হয়।

রেণু। সবার আগে হচ্ছে মা।

সরকার। (ঈষৎ হাসেন) এখন তাই ভাব্‌ছ, কিন্তু……ও কিসের গোল?

যে কচি গলাটা আমরা একবার শুনিয়াছি সে হঠাৎ একটা মাছির সুর ধরিয়া তীব্র স্বরে বাজিয়া ওঠে। শব্দটা আসে ভিতরের দরজার বাহির হইতে। সুরের সঙ্গে সঙ্গে বাজনাও আছে—একটা কিচেন-ট্রের উপরে বড় চামচ ঠুকিয়া তাল রাখা হইতেছে। দরজাটা এক ধাক্কা খাইয়া খুলিয়া যায়। দেখা যায়, দরজার মুখে বুলি দাঁড়াইয়া 'মার্ক-টাইম' করিতেছে, হাতে ট্রে ও চামচের অপরূপ বাজনা তাহার পা খালি, পরণে শাদা স্কুল-ফ্রকের উপরে একটা কিচেন-অ্যাপ্রন বাঁধা হইয়াছে। অ্যাপ্রনটা খুব বড়, তাহার পা অবধি পড়িয়াছে। মাথায় বব্‌ছাটা চুলের উপর টুপি—কাগজের ঠোঙার তলার দিকটা কাটিয়া মিলিটারি টুপি বানাইয়া লওয়া হইয়াছে। পিছনে আর একজন কেহ আসিবার অপেক্ষায় সে দাঁড়াইয়া :

বুলি। (বাজনার তালে তালে) Rum ta tum ta tum tum tum. Rum ta tum ta tum tum tum. চলে এসো, হিমুদি।

হেমজা। (নেপথ্যে) যাচ্ছি বাবাঃ, একটু হাঁপ ছাড়তে দাও। এবংবিধ দৃশ্য এ বাড়ীতে নূতন নয়, বুলি যেখানে থাকে সেখানে ইহা হয়ই। মিসেস সরকার ও রেণু যথোচিতরূপ উদ্‌গ্রীব হইয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। হেমজা—তাহারো অ্যাপ্রন ও টুপি পরা, হাতে ডিশের উপরে একটা সুন্দর ঝালর ও ফুলের নক্সাওয়ালা বার্থডে কেক—বুলির পিছনে আসিয়া সার দিয়া দাঁড়ায়।

বুলি। (সিধা সম্মুখে চাহিয়া) Ready?

হেমজা। (টুপিটাকে টানিয়া ঠিকমত বসাইয়া, গম্ভীরভাবে) হ্যাঁ, বাবা।

বুলি। Quick—March! Rum ta tum ta tum tum tum ইত্যাদি।

[বুলি ও হেমজার প্রবেশ—সমানে বলিতে বলিতে সে ঘর প্রদক্ষিণ করে—পরম গম্ভীর সামরিক কায়দায়। হেমজাও ঠিক তাহার অনুসরণ করে। এই-রূপে চলিয়া তাহারা গিয়া মিসেস্ সরকার ও রেণুর সম্মুখে দাঁড়ায়।]

বুলি। (থামিয়া) Halt! Present Arms!

বুলির বয়স সবে বারো পার হইয়াছে। অতি সুশ্রী, সেই ধরণের শিশু যাহাকে দেখিলেই একটু আদর করিতে চট্‌কাইতে ইচ্ছা করে। ঘোরতর বস্তুতান্ত্রিক। কোন কিছু 'হইতেছে' জানিলেই সে মাতিয়া উঠে এবং লাফাইয়া চ্যাচাইয়া হাট বাধায়। ভয়ঙ্কর চট্‌পটে ও ছট্‌ফটে। অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রায় কিছুই তাহার চক্ষু এড়ায় না; এবং এই সজাগ মন আছে বলিয়াই হয়তো বা একটু অকালপক্ক কথাবার্তা বলিতে পারে। কিন্তু বুদ্ধি থাকিলেও 'বুদ্ধিমতী' সে এখনও নয়, যাহাই মনে আসুক অনর্গল চিৎকার করিয়া বলিয়া ফেলিতে কোথাও এতটুকু সঙ্কোচ নাই।

হেমজার বয়স চল্লিশের মত। ভৃত্যশ্রেণীর মধ্যে অভিজাত, এবং সেই আভিজাত্যের সম্বন্ধে সচেতন। দীর্ঘ সান্নিধ্যের ফলে এখন সে বাড়ির একজনই হইয়া গিয়াছে —ইহাদের জন্য তাহার অভিজাত-ভৃত্য-হিসাবে সজাগ কর্ত্তব্য জ্ঞানও আছে, দরদও আছে। বাড়ির সকলেরই সে বন্ধু ও অকপট সুহৃৎ; কিন্তু বিশেষ করিয়া তাহার টান বুলির প্রতি। এমনিই দু'জনে খুব মিল, তার উপর বুলির উপরে তাহার একটা দাবিও আছে, জন্মের পর হইতেই বুলি তাহার হাতে মানুষ বলিয়া। বিধবা। নিজের আত্মীয়স্বজন থাকিলেও সে এই বাড়িতেই বাস করে; এই পরিবারের ঘরকন্না হইতে সুরু করিয়া অনেকখানি তারই তাহার হাতে নিঃসঙ্কোচে ন্যস্ত।

সরকার। (বুলি ও হেমজা থামিতে) এ কি কাণ্ড!

বুলি। (মিলিটারি, brisk কথায়) বার্থ-ডে কেক—একটা—আইস্-কুল্ড্—

রেণু। বার্থ-ডে কেক! আমার?

হেমজা। হ্যাঁ।

বুলি। (তৎক্ষণাৎ হেমজাকে ধমক দিয়া) এই, কথা বল্‌লে কেন?

হেমজা। Sorry, miss.

বুলি। Miss?

হেমজা। এঁ—Sir, miss.

বুলি। (আবার সাম্‌নে চায়) Stand at—ease!

হেমজা। তার মানে কি এটাকে এবার নামাতে পারি হাতে থেকে?

বুলি হঠাৎ স্বাভাবিক হইয়া যায়, ট্রে ও চামচ ফেলিয়া এক লাফে গিয়া দিদিমার সোফার হাতলে চড়িয়া বসে। তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া—

বুলি। কী fine হয়েছে, না দিদিমা? ভালো করে ভাখো আগে। ফুল আছে কটা জান ষোলোটা—সব চিনির। ষোলোটা মোমবাতি বসাবার জন্যে। দিদির আজ ষোলো বছর হ'ল ব'লে তাই ষোলোটা।

সরকার। (তাহার উদ্দাম উল্লাস সাম্‌লাইয়া) আমি আগেই দেখেছি।

বুলি। (রেণুকে) জানিস, হিমুদি নিজে বানিয়েছে।

রেণু। (সে ইতিমধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, মুগ্ধ হইয়া) সত্যি, হিমুদি? ঠিক সায়েব দোকানে কেনার মতো দেখ্‌তে। (ডিশটা হাতে লইয়া, ভাল করিয়া দেখে) অবিকল দোকানের মতো।

হেমজা। দেখ্‌লাম তোমার মা বাড়িতে নেই, দোকান থেকে কে কিনে দেবে। (সগর্ব্বে—এ গর্ব সে করিতে পারে) কিন্তু তাই যদি বল, ভেতরে বাইরে কোথাও এতটুকু খুঁত পাবে না। খেতেও ভালো হবে দেখো—একগাদা মশলা না দিলে কি আর কেক হয় না?

রেণু। আমারও তাই ভালো লাগে—কম মশলা দিয়ে।

(ডিশটা কোলে লইয়াই আবার বসে)

বুলি (খাদ্যের নামে তাহার জিভে প্লাবন আসে। দিদিমার কাঁধ হইতে নামিয়া আসিয়া সে সেটিতে রেণুর পাশে বসে) কত ক্রীম আছে জানিস? দু' আঙুল করে পুরু। তার ওপর আবার সব প্রেজেন্ট।

রেণু। প্রেজেন্ট?

বুলি। ক্রিস্‌মাস্ পুডিং'এর মত। টাকা, থিম্বল্, আংটি। আংটিটে কিন্তু আমার তা আগেই বলে রাখ্‌ছি। আর টাকাটা।

হেমজা। এই লুভী। একজনের জন্যে একটার বেশি নয়। (মিসেস সরকারকে) বরফটা ভারি চমৎকার ধরেছে। আঙুল দিয়ে দেখুন একটুখানি। এইখেনে, ঝালরের নিচেয় আঙুল দিন, তাহলে আর দাগ দেখা যাবে না। (রেণুর হাত শুদ্ধ কেকটা আগাইয়া ধরে।)

সরকার। (সস্নেহে একটুখানি স্পর্শ করিয়া) ভারি নরম হয়েছে তো।

হেমজা। (গর্বিত আর্টিষ্ট) ও করা কিছু শক্ত নয়। ডিমের শাদাটাকে আগে বেশ করে ফেটিয়ে নিতে হয়। তারপর চিনি আর নেবুর রসের সঙ্গে সেইটেকে মিশিয়ে দিলেই হ'ল। একদম সোজা, অথচ অনেক নামজাদা রাঁধুনিকে দেখেছি এ কর্‌তে জানে না। আমি শিখেছিলাম অনেকদিন আগে, গুরু হরিনাথের বাড়িতে যখন কাজ কর্‌তাম সেই তখন।

বুলি। (অস্থির হইয়া) মোমবাতিগুলো কি কর্‌লে হিমুদি?

হেমজা। এই যে। (অ্যাপ্রনের ঢোলা পকেট

হইতে ছোট রঙিন মোমবাতির তিনটা প্যাকেট বাহির করে। সরকারকে—) তিন প্যাকেটই কিনতে হ'ল। এক প্যাকেটে সাতটা ক'রে থাকে। ছ' প্যাকেটে চোদ্দটা। আমাদের লাগ্‌বে ষোলোটা—পাঁচটা বাড়তি থেকে যাবে। একটু লোকসান হ'ল, এত হাল্‌কা বাতি আর কোনো কাজে তো লাগ্‌বে না। (বলিতে বলিতে সেগুলা বুলির হাতে দেয়)

বুলি। (প্যাকেট নিয়া) কেন আমার জন্মদিনের জন্যে রেখে দিলেই হয়।

হেমজা। সে তো এখনও পাঁচ-ছ' মাস।

রেণু। এবার জন্মদিনে তোর লাগ্‌বে তেরোটা। এই পাঁচটা, আর এক প্যাকেট কিন্‌লে হবে বারো। ছ' প্যাকেট কিন্‌লে আবার ছ'টা থেকে যাবে।

হেমজা। (রেণুকে) সে ছ'টা আবার থাক্‌বে তোমার জন্মদিনের জন্যে।

সরকার। তখন হিসেব কি দাঁড়াবে?

বুলি। (প্যাকেট খুলিতে লাগিয়া গেছে) পরের বারে দিদির সতেরো সতেরো ইন্টু—(খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া) এই, ইন্টু কী?

রেণু। সতেরোটা হ'ল ছ' প্যাকেট তিন। রইল তিনটে। তার পরের বারে তোর চোদ্দ। থাক্‌বে তিন্‌টেই। তারপর আবার আমার আঠারো। তিন প্যাকেট আর এই তিন—বাকি ছ'টা। বাবাঃ, আবার নতুন ক'রে সব সুরু হ'ল, যথা।

বুলি। (দুরবস্থাটা উপভোগ করে) বারে মজা। এমনি ক'রে খালি চল্‌তেই থাক্‌বে—চল্‌তেই থাক্‌বে—চন্দ্রসূর্য্য—যতদিন—বিশ্ব-চরাচর—আমেন (ছ' বোনে খিল খিল করিয়া শিশুর হাসি হাসিতে থাকে, হেমজা ও সরকারও হাসিতে যোগ দেন। তারপর বুলি একটা মোমবাতি তুলিয়া লইয়া, রেণুর হাত হইতে কেকটা টানিয়া নেয়) দে না, আমি মোমবাতি বসিয়ে দিই।

হেমজা। (সাম্‌লাইয়া দেয়) আস্তে, আস্তে। এক্ষুণি ফুলটুলগুলো সব ভেঙে ফেলো না।

সরকার। এই বুলি, এটা রেণুর কেক--রেণুকেই দে না বাতি পরাতে।

বুলি। (অতি সন্তর্পণে চিনির ফুলের মধ্যেকার ছিদ্রে মোমবাতি বসাইয়া দিতে থাকে) আমি পরালে দিদি একটুও রাগ কর্‌বে না। কর্‌বি, দিদি? (উত্তরের জন্য অবশ্য সে অপেক্ষা করে না। একটু পরে—) আঃ, পার্টিটা শনিবারে না হয়ে যদি কালই হ'ত!

হেমজা। (জানালার ধারে যাইয়া জানালা বন্ধ করে) শনিবারেই ভাল—তার ধাক্কা সাম্‌লাতে তোমার সারাটা রোব্‌বার লেগে যাবে না? (বন্ধ করিতে করিতে জানালা দিয়া একবার বাহিরে চায়) যা হাওয়া দিয়েছে, বিচ্ছিরি বাদ্‌লা কর্‌বে কাল। (জানালা বন্ধ করিয়া পর্‌দা টানিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে ফেরে) দিদিমণি এ সময় বাইরে গিয়ে ভালই হয়েছে। নইলে এই মেখলায় ঠিক আবার অসুখ কর্‌ত।

সরকার। আমিও রেণুকে সেই কথাই বল্‌ছিলাম, তোমরা আস্‌বার আগে।

বুলি। (মোমবাতি পরাইতে পরাইতে, রেণুকে) মার চিঠি পেয়েছিস্?

রেণু। (তৎক্ষণাৎ ব্যগ্র হইয়া) কই চিঠি?

বুলি। আসেনি?

রেণু। (তাহার আশা ভাঙিয়া পড়ে) না।

বুলি। অজ্ঞাতে যে বেদনা দিল তাহার সম্বন্ধে চেতনাহীন) বেচারী! (কেকের দিকেই চক্ষু রাখিয়া, ঘরের সকলকে একত্রে সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলে) সারাটা রাস্তা যা ঘোড়ার মত ছুটে এসেছে।

সরকার। কিসের মত?

বুলি। (ভ্রূক্ষেপহীন, দাঁত বাহির করিয়া) ঘোড়ার মত। (ইহার পরের কথাটা বলিতেও তাহার খেয়ালই হয় না যে কথাটা কাহাকেও আঘাত করিতে পারে, কারণ আঘাতের চেতনা তাহার নাই। অবলীলাক্রমে বলিয়া যায়—) মা ঠিক ভুলেই গেছে আজ তোর জন্মদিন।

সরকার। (ভর্ৎসনা করিয়া) বাজে বকিস্‌নে বুলি। ভুলতে কখনও দেখেছিস্ তাকে?

বুলি। তবে চিঠি এলো না কেন?

রেণু। দিদিমা বল্‌ছিল পোষ্ট অফিসে দেরি হচ্ছে।

হেমজা। (বুলিকে তাড়া দিয়া) নাও শিগ্‌গির করে দ্বিকিন্। কেক তুলে রেখে তবে আবার আমি চা ক'রে দিতে যাব।

বুলি। এই আর একটা মোটে। (বাতি পরানো শেষ করিয়া) কী সুন্দর দেখাচ্ছে, না? বাতিগুলোকে জ্বালিয়ে দাও না এখুনি।

সরকার। তোর কি সব কিছুই তখন-তখুনি না হ'লে চলে না?

বুলি। দেরি ক'রে ক'রে হ'লে মজা লাগে নাকি!

হেমজা। একটু তর সয়না—ঠিক বাপের স্বভাবটি পেয়েছে!

বুলি। (গর্বিত স্বরে) হবই তো বাবার মত।

হেমজা। (ডিশ সুদ্ধ কেকটা তুলিয়া লয়) সে হলে তো হ'তই, বাপের মতো সুন্দর যদি হ'তে।

বুলি। (অমায়িক কণ্ঠে) হব না কে বল্‌লে। এখনও আমার সুন্দর হবার বয়স হয়নি তো।

হেমজা। নাও এবারে ওঠো,—ওই ট্রে আর চাম্‌চে নিয়ে এসো তো আমার সঙ্গে, যেখান থেকে এনেছিলে আবার রেখে দেবে।

বুলি। (সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ানক পরিশ্রান্ত হইয়া সেটিতে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়ে) উরে ব্বাবারে। আমার ভীষণ টায়ার্ড লাগ্‌ছে।

হেমজা। দুষ্টুমি হচ্ছে! এসো বল্‌ছি। তখন কথা ছিল না, আবার সব ঠিক জায়গাতে তুলে রাখ্‌বে?

রেণু। (উঠিয়া, মেঝে হইতে ট্রে ও চামচ তুলিয়া লয়) আচ্ছা, আমি নিয়ে যাচ্ছি। (হেমজা ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে, তাহাকে বুঝাইতে) এমনিই মুখ ধুতে যাব তো।

হেমজা। (বুলিকে) মেয়ে যা একখানা হবে তুমি। (রেণুকে) চলো।

রেণু। তুমি আগে যাও, তোমার তো হাত জোড়া। (দরজা খুলিয়া ধরে)

হেমজা। (যাইতে যাইতে) আচ্ছা।

[হেমজার প্রস্থান]

(হেমজার পিছনে রেণুও বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিতেই মিসেস্ সরকার হঠাৎ মনে পড়িয়া ডাকেন—)

সরকার। এই, রেণু, দেখে যা। (টেবিল হইতে কাগজের বাক্‌সটি তুলিয়া লইয়া তাহার দিকে বাড়াইয়া দেন)

বুলি। (তৎক্ষণাৎ তিড়িং করিয়া লাফাইয়া ওঠে) দেখি দেখি কি। (রেণু হাতের ট্রে দরজার পাশেই নামাইয়া রাখিয়া ফিরিয়া আসে) কে দিয়েছে?

সরকার। দিদিমা।

বুলি। বা, সকালবেলা ওকে তুমি দশ টাকা দিলে না?

সরকার। সেটা ফাউ।

বুলি। আমারও দুটো প্রেজেন্ট হবে তো?

রেণু। (বাক্‌স লইয়া, দিদিমাকে নমস্কার করে) কিন্তু তোমার এসব ভারি অন্যায়।

সরকার। অন্যায় আবার কি। ইচ্ছে ছিল নিজের হাতে বানিয়ে তোকে একটা কিছু দিই। তা সকালবেলা তখনও শেষ কর্‌তেই পার্‌লাম না।

বুলি। (ইতিমধ্যেই হাতাহাতি করিয়া রেণুকে বাক্‌স খুলিতে সাহায্য করিতে লাগিয়া গেছে—) ফিতেটা আমি নোব? (ফিতাটা পাকাইয়া ব্লাউজের মধ্যে পুরিয়া ফেলে)

রেণু। (বাক্‌স খুলিয়া, তাহার মধ্যেকার টিশু পেপার তুলিয়া দেখে) সাটিন, লেস্—

সরকার। বার করেই ভাখ্‌ না। ছুঁলে কি ওরা কাম্‌ড়ে দেবে তোকে?

রেণু। ওরা? (জামাটা হাতে করিয়া তোলে— স্লীভ্‌লেস ব্লাউজ)

বুলি। (চ্যাঁচাইয়া) আরে —ব্লাউজ, শাড়ি— বাব্বা! (থাবা মারিয়া সেগুলা টানিয়া বাহির করিয়া পাট খুলিয়া ফেলে।)

রেণু। (কাপড়ের ডিজাইনটা দেখে, তারপর কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে দিদিমার দিকে চাহিয়া) কি ক'রে জানলে তুমি? এমনি একটা কাপড় কিন্‌তে আমারও এমন ইচ্ছে করছিল ক'দিন ধ'রে। মার অসুখ ব'লে আর কাউকে বলিনি।

সরকার। তাই তো মুখ গুণে বার কর্‌লাম।

বুলি। মুখ গুণে কি?

সরকার। মুখ দেখে মনের কথা জেনে নিয়ে।

বুলি। (রেণুকে) কী fine পাড়টা দেখেছিস্! পর না এক্ষুনি।

রেণু। (উল্লাসের ছোঁয়াচ তাহারও লাগিয়াছে) পর্‌ব, দিদিমা ?

সরকার। কাপড় পর্‌বার জন্যেই কেনা হয়, এমনি ধারা একটা কথা কোথায় যেন শুনেছিলাম।

রেণু। (কাপড় ও ব্লাউজ আবার বাক্‌স'র মধ্যে পুরিয়া লইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করে) আচ্ছা তবে প'রে আসি।

বুলি। আমিও যাই তোর সঙ্গে ?

রেণু। না। তুই এইখেনে থাকবি। তুই একজন পাব্‌লিক।

বুলি। (অভিনয় করিবার আগ্রহে তৎক্ষণাৎ রাজি হইয়া) হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক দোকানের ড্রেস-প্যারেডের মত

রেণু। (দ্বারের কাছে যায়, একহাতে ট্রে ও চামচটা তুলিয়া লয়) আমি হব একটা ম্যানিকিন।

বুলি। আর আমি একটা বড়লোক। আমি অর্ডার দেব (গম্ভীর অর্ডার-দেওয়া গলায়) "হ্যাঁ, ঠিক এম্‌নি ডিজাইন তিনটে পাঠাবেন।"

রেণু। (বাহির হইয়া যাইতে যাইতে) বোস্‌, আস্‌ছি।

[রেণুর প্রস্থান]

বুলি। (একটুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া, তারপর হঠাৎ ঘুরিয়া গিয়া দিদিমার কাঁধে চাপে। তাঁহার সোফার হাতলে ঘন হইয়া বসিয়া, খুব প্রসন্ন-করা আব্‌দারের সুরে) আমার জন্মদিনেও অম্‌নি একটা শাড়ী দেবে, দিদিমা ?

সরকার। এবার জন্মদিনে নয়। তোমার যখন ষোলো বছর হবে, তখন।

বুলি। (আঙুল গণিয়া, বিমর্ষমুখে নিঃশ্বাস ফেলে) তিন বচ্ছর! দিদি আমার চাইতে এত বেশি বড় হ'লে বিচ্ছিরি লাগে।

সরকার। ভয় নেই, বড় হ'তে তোরই বা আর ক'দিন।

বুলি। (সোফা হইতে নামিয়া গিয়া সেটির উপর ধুপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়ে। ক্ষুণ্ণস্বরে) এর পরের জন্মদিনে দিদির ফার্‌-কোট কিনে আস্‌বে সব সময় তার এমন সব জিনিষ থাক্‌বে যা আমার নেই।

সরকার। (তিনি জানেন বুলির কোন্‌খানে সুড়সুড়ি দিলে কাজ হইবে) তাতে তো তোরই লাভ। তোর আবার যখন সেই সব জিনিষ আস্‌বে তখন দিদির গুলো প'রে পুরোনো হ'য়ে গেছে।

বুলি। (ইহাতেও ভেজে না) ছাতি।

সরকার। (মনে মনে হাসিয়া) দে তো সুতোটা পরিয়ে। বুলি গম্ভীর মুখে ছুঁচে সুতা পরাইয়া দেয়, মন খারাপ বলিয়া তাহার বেশ একটু দেরি লাগে। মিসেস্ সরকার থামিয়া থামিয়া তাহাকে সকৌতুকে প্রশ্ন করিতে থাকেন) প্রাইজ দেওয়া কবে হবে ইস্কুলে ?

বুলি। (সংক্ষেপে) পরের শনিবারে। (বোঝা যায় সে ক্ষেপিয়াছে।)

সরকার। তোর ক'টা প্রাইজ এবার ?

বুলি। (নীরব)

সরকার। প্রাইজের দিন খাওয়া হবে না ইস্কুলে ?

বুলি। হ্যাঁ।

সরকার। ইস্কুলে আজ সারাদিন কি হ'ল ?

বুলি। কিচ্ছু না।

সরকার। মিস্ মুখার্জি এসেছিলেন আজ ? তাঁর জ্বর সারে নি ?

বুলি। হ্যাঁ।

সরকার। নাচের ক্লাশ হয়নি আজ ?

বুলি। হয়েছে।

সরকার। তোর সেই যেখানটা ঠিক হচ্ছিল না সেটা সেরে নিয়েছিস ? আজ দেখে কি বল্‌ল টীচার ?

বুলি। জানিনে।

সরকার। তোর বন্ধু কেমন আছে ? মণি মল্লিক ?

বুলি। ভাল।

সরকার। তার কাশি হয়েছিল, সেরে গেছে ?

বুলি। (এখন সে প্রিয় বন্ধুর সম্বন্ধেও নিস্পৃহ) হ্যাঁ। ইহার পর আর কথা জমে না, দু'জনেই স্তব্ধ হইয়া যায়। মিসেস সরকার শেলাই করিতে করিতে বুলির রকম দেখিয়া নিঃশব্দে একটু কৌতুকের হাসি হাসেন। বুলি ঠায় বসিয়া উদাস নেত্রে শূন্যে চাহিয়া

গম্ভীর হইয়া থাকে—তাহার গাম্ভীর্যটা একটা দেখিবার মত বস্তু। মিনিট দুই তিন এই ভাবে কাটে, তারপর হঠাৎ দরজা খুলিয়া হেমজা ঘরে আসে। তাহার হাতে ছোট ট্রের উপরে দু' বাটি আইস্ ক্রীম্। মিসেস সরকার চাহিয়া দেখেন, বুলি তাকাইয়াও দেখে না।

হেমজা। দেখ্‌লেই তো আবার মেয়ের গায়ে জ্বর আস্‌বে। খাব না বল্‌লে কিন্তু চল্‌বে না তা ব'লে দিচ্ছি।

বুলি। (নড়ে না, নিস্পৃহ ভাবে) কি ?

হেমজা। (কাছে আসে, হাতের বস্তুটা একটু দেখায়) থাক, চেয়ে দেখ্‌তেও যদি আলিস্যি হয়, তবে ফিরিয়েই নিয়ে যাই।

বুলি। (বস্তুটা চিনিয়াই তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া ওঠে) আইস্‌ক্রীম ! (কাছে যায়) এক্ষুণি খাব তো ?

হেমজা। না আগে রেণু আসুক। নইলে আমি এখুনি দিই, আর তুমি নিজেরটা গাত তাড়াতাড়ি গিলে ফেলে তারপর আবার রেণুরটায় ভাগ বসাও।

বুলি। না না বসাব না সত্যি বল্‌ছি। (বলিতে বলিতেই একটা বাটি সে তুলিয়া লইয়াছে। ঢাকা খুলিয়া) কখন কিনে আন্‌লে ? (ধীরে সুস্থে একধার হইতে খাইতে আরম্ভ করে।)

হেমজা। (ট্রেটা টেবিলে নামাইয়া রাখে।) মোমবাতি কিনে ফিরে আস্‌বার সময়। দোকান থেকে অমনি এক প্যাকেট পাউডার দিয়ে দিলে, তা দিলে চার ঘণ্টা অবধি একদম ঠিক থাকে, গ'লে যায় না।

বুলি। (খাইতে খাইতে) পার্টির দিনেও আইস্‌ক্রীম থাক্‌বে তো ?

হেমজা। (সরকারের দিকে চাহিয়া) বড্ড বেশি খরচা প'ড়ে যায়। অন্তত দু'বার ক'রে যদি সবাইকে না দেওয়া যায় তবে সে কর্‌তে না যাওয়াই ভাল।

(বুলি আইসক্রীম শেষ করিয়া বাটিটা টেবিলে নামাইয়া রাখে, তারপর হাতের তালু দিয়া মুখ মুছিয়া ফেলে।)

[রেণুর প্রবেশ]

হাত মুখ ধুইয়া স্কুলের কাপড় ছাড়িয়া সে স্লিপার ও নূতন শাড়ি ব্লাউজ পরিয়াছে, তাহার উপরে একটা পাৎলা ড্রেসিং গাউন জড়ানো।)

হেমজা। (সবিস্ময়ে) এ আবার কি কাণ্ড ?

বুলি। (মুখ কুঁচ্‌কাইয়া) ম্‌ঃ—ম্যানিকিন অমনি হয় নাকি ! এটা খুলে ফ্যাল্। (আগাইয়া আসিয়া ড্রেসিং গাউন ধরিয়া ঝট্‌কা মারে)

রেণু। (ড্রেসিং গাউন খুলিয়া ফেলে, লজ্জিত স্বরে) গলাটা এমন বড়ো হ'য়ে গেছে।

হেমজা। (তারিফ করার দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে) তা হয়েছে একটু।

বুলি। কেন, এই তো ভালো—ঠিক বিলিতি ম্যাগাজিনের ছবির মতো।

সরকার। সেই ছবি থেকেই তো ডিজাইন নিয়েছি।

হেমজা। এখন দিদিমণি দেখে আবার রাগ না করে।

সরকার। তা করুবে। (একটু দুষ্টু হাসি হাসেন) কিন্তু কি আর করা, যায় প্রাণ ফলারেই যাক।

হেমজা। তা আজকালকার ফ্যাসানই হচ্ছে এই। ও দু'দিন পরলেই অভ্যেস হয়ে যাবে।

(দূরে বাহিরে দরজায় কলিং বেল বাজিয়া ওঠে।)

কে এলো আবার !

রেণু। (তাড়াতাড়ি) দাঁড়াও আমি আগে পালাই। (ড্রেসিং গাউন তুলিয়া লয়, তারপর হেমজার কথা শুনিয়া আবার নামাইয়া রাখে।)

হেমজা। (দ্বারের দিকে অগ্রসর হয়) দাঁড়াও না, ছুটতে হবে না এখুনি। বাইরের লোক কেউ এসে থাকলে তাকে ডাইনিং রুমে বসাব'খন একটু।

[হেমজার প্রস্থান]

বুলি। (রেণুকে তাহার আইস্‌ক্রীমের বাটি দেখাইয়া দিয়া) তোর।

রেণু। কি ? (টেবিলের কাছে যায়, হাতের ড্রেসিং গাউনটা সেটির পিঠে রাখে।)

বুলি। (তাহারটা শেষ হইয়া গিয়াছে, কাজেই একটু ঈর্ষামিশ্রিত করুণস্বরে) আইস্‌ক্রীম।

রেণু। (বাটিটা তুলিয়া লয়) কিন্তু আমার এখন এর চাইতে একটু চা পেলে ভাল হ'ত।

বুলি। চায়ের পরে খেলে পেটে ব্যথা করবে না ?

রেণু। তোরটা কোথায় ?

বুলি। (দুঃখিতচিত্তে) ফুরিয়ে গেছে।

রেণু। (রীতিমত দিদি) এইটে নিবি ?

বুলি। (ইহা তাহার অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য, এমন ভাবে) তুই খাবিনে ?

রেণু। আমার তো এখন গিয়ে চ্যাঁচাতে বসতে হবে। আর সে সারা হ'তে হ'তে এ গ'লে জল হয়ে যাবে। নে।

বুলি। (বাটিটা নেয়, লুব্ধ নেত্রে তাহার দিকে তাকায়, তারপর তাহার ভদ্র চেতনা জাগিয়া ওঠে। বাটি রেণুকে ফিরাইয়া দেয়।) হিমুদি একরকম পাউডার এনেছে, তাই দিলে চার ঘণ্টা অবধি ঠিক থাকে, গ'লে যায় না।

রেণু। আঃ, নে না, খেয়ে ফ্যাল্। আমার এখন আর আইসক্রীম খেতে ভাল লাগে না। ও ছেলেমানুষে খায়।

বুলি। (তাহার কাছে এই উক্তি রীতিমত heresy) বাবাঃ যেন বুড়ি থুত্থুড়ি হ'য়ে গেছেন। মোটে তো তিন বছরের বড় আমার চাইতে।

রেণু। আজ ভাল লাগছে না খেতে।

(বুলি আর প্রতিবাদ করে না, নীরবে খাইতে সুরু করিয়া দেয়। তাহার খাওয়া শেষ না হইতেই দ্বার খুলিয়া হেমজা প্রবেশ করে, তাহার হাতে একটা হলুদে টেলিগ্রামের খাম ও পিওনের চটি-খাতা পেন্সিল, মুখ গম্ভীর। তাহাকে দেখিয়াই বুলি সচকিত হইয়া উঠে, কোনরকমে তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিয়া বাটিটা তাহার অলক্ষ্যে টেবিলে রাখিয়া দেয়।]

হেমজা। টেলিগ্রাম এল একটা।

রেণু। (হঠাৎ তাহার কণ্ঠে ভয়ার্ত্ত সুর ফুটিয়া ওঠে) টেলিগ্রাম ? ঘরের মধ্যে একটা আসন্ন দুঃসংবাদের ছায়া ঘনাইয়া আসে। বুলি পর্য্যন্ত একমুহূর্ত্ত স্থির হইয়া চাহিয়া থাকে। মিসেস সরকার টেলিগ্রামটা হাতে লইয়া, যথাসাধ্য সহজ কণ্ঠে কথা বলিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তবু তাঁহার গলা একটু যেন কাঁপিয়া যায়—

সরকার। (চশমা হাতড়াইয়া, চেষ্টাকৃত সহজ স্বরে) আমার চশমাটা কোথায় রাখলাম আবার।

হেমজা। কখন পরেছিলেন এর আগে ?

সরকার। (টেলিগ্রামটা রেণুকে দেন) নে, পড়ত খুলে।

রেণু। (খামটা লইয়া একবার খুলিতে যায়, তারপর তাহার হাত শিথিল হইয়া আসে। রুদ্ধস্বরে) আমি পারব না।

(ক্রমশঃ)

পয়লা আষাঢ়ে

শ্রী গিরিজাকুমার বসু

আজি মেঘদূত-উৎসব-দিনে
হৃদয়ে নাহিক বেদনা-লেশ—
শুনিয়া অদ্ভুত প্রবীণে নবীনে
নিয়ত আমায় করিছে শ্লেষ।
কহিছে তাহারা, "তনু, মন, হিয়া
দিলে যারে তুমি, দূরে সে আজি
বিরহের ব্যথা, তাহারে স্মরিয়া
চিত্তে তোমার উঠে না বাজি ?"

না জানি কেমনে বুঝাবো সবায়
সব চেয়ে যারে বেসেছি ভালো
অভাবে তাহার, নাহিক উপায়,
করিব বিষাদে মুখটি কালো।
দেখা না দেখায় ক'রেছি সমান—
মরমে, নিখিল বিশ্বমাঝে,
তাহারি প্রতিমা নিশিদিনমান
প্রেমের পরশে সতত রাজে।

কৃষ্ণবর্ত্মা

শ্রী হেমচন্দ্র বাগ্‌চী

তাহাকে খুব ছোট দেখিয়াছিলাম। বৎসরের অধিকাংশ সময় সে ম্যালেরিয়ায় ভুগিত—চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, বড় বড় চোখ্—আমাদের গ্রামের মৈত্রদের একটি ছোট মেয়ে। তাহার মা ছিল না। বাবা থাকিতেন বিদেশে। মাঝে মাঝে অবসর পাইলে বাড়ী আসিতেন। কিছুদিন থাকিয়া আবার তিনি বিদেশে কর্ম্মস্থলে চলিয়া যাইতেন। মাতৃহীন ছোট মেয়েটি তাহার ঠাকুরমার কাছে মানুষ হইত। ঠাকুরমা দূর সম্পর্কের, তিনি তাহাদের বাড়ীর কাছেই থাকিতেন অন্য বাড়ীতে। চারিদিকে খেজুর আর বাঁশের বন; বাঁশের বনের উত্তরে এক অর্ধনিমজ্জিত পুষ্করিণী। অর্ধ নিমজ্জিত হইলেও তাহার আয়তন বিপুল। বর্ষায় তাহাকে একটি ছোটখাট দহের মত মনে হইত। ঠাকুরমার বাড়ীর চারিপাশে শুধু বন আর বন—অশ্বত্থ, বাঁশ, পিটুলি, আম প্রভৃতির ঘন সমারোহ। এই বনের মধ্যে ঠাকুরমা তাঁর ছোট নাতিনীটিকে লইয়া থাকিতেন।

ঠাকুরমার আর কেহই ছিল না। দূর সম্পর্কের এক ভগিনী ছিলেন। প্রায়ই দেখিতাম, তাঁহার অসুখ। রুগ্ন, শীর্ণ দেহ। তবু সেই দেহ লইয়া তিনি সংসারের কাজকর্ম্ম করিতেন। মাঝে মাঝে ঠাকুর মা'রও অসুখ হইত। তখন ছোট মেয়েটির যাবতীয় ভার সেই রুগ্না বৃদ্ধার উপর পড়িত। এই উভয় বৃদ্ধার মধ্যে সেই ছোট মেয়েটি মানুষ হইয়া উঠিতেছিল।

* * মাঝে মাঝে বাড়ী আসিয়া দেখিতাম মেয়েটি অসুখে ভুগিতেছে। ম্যালেরিয়া। শুধু তাহার দুইটি বড় বড় চোখ সার হইয়াছে। শরীরের হাড়গুলি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। পেটটি বড় হইয়াছে—প্লীহায় লিভারে তাহা ভরা। একদিন রাস্তায় দেখিলাম, সে তাহার খেলাপাতি লইয়া ডোবার জলে সেগুলি ধুইয়া আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে ফিরিতেছে। তাহাকে দেখিয়া কষ্ট হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মেনু, তুমি এত রোগা হইয়া গিয়াছ কেন?'

সে বলিল, 'রোজ জ্বর হয়।'

বলিলাম, 'ঔষধ খাও না?'

সে বলিল, 'মাঝে মাঝে খাই।'

'মাঝে মাঝে না, রোজ খেও।'

'আচ্ছা' বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া উঁচু ঢিবীর উপর দিয়া সে বাড়ী চলিয়া গেল।

এমনি তাহাকে নিত্য দেখিতাম। কখনো ডোবার ধারে, কখনো বাগ্‌দী পাড়ায় যেখানে মাছ ধরা হয়, কখনো বা দেয়াসীনদের বটতলায় কখনো বা তাহার ঠাকুরমার হাত ধরিয়া গ্রামের পথে। বর্ষা শেষে সে সারিয়া উঠিল।

আজ দূর হইতে তাহার সমস্ত মূর্ত্তিটি ভাবিতেছি। কলমের প্রত্যেকটি রেখায় শুধু তাহার অসুখের ছবিই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। যতবার বাড়ী গিয়াছি, ততবার দেখিয়াছি সে অসুখে ভুগিতেছে—যেমন

আরও অনেকে অসুখে ভোগে। শেষে এমনও দেখিয়াছি, তাহাকে কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া যাইত না। মুখ নামাইয়া সে ছুটিয়া পলাইত। এমন কতদিন হইয়াছে, হয়ত জিজ্ঞাসা করিয়াছি, মেনু তোমার মা কেমন আছেন (ঠাকুরমাকেই সে মা বলিত) তোমার বাবা আর আসিয়াছিলেন কি না— আমার এসব প্রশ্নে সে কান দিত না। বাড়ীর দিকে ছুটিয়া পলাইত। তখন তাহার বয়স আট কিংবা নয় হইবে।

সেই সময়ে একদিন তাহার বাবা বিদেশ হইতে বাড়ী আসিলেন। সঙ্গে নানারকম জিনিষপত্র। তিনি প্রায়ই যখন বাড়ী আসেন, সঙ্গে যত পারেন জিনিষপত্র লইয়া আসেন। দুই এক মাস বাড়ীতে থাকিয়া আবার তিনি অন্তর্ধান করেন। সেই বারেই তিনি তাঁহার মেয়ের বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাহার ঠাকুরমা বলিলেন, এখন আমি মেয়ের বিবাহ দিব না। অত ছোট মেয়ে, ও বিবাহের কি বুঝিবে? না, এখন বিবাহ-টিবাহ হইবে না।

মেনুকে তখন দেখিয়াছি, মাথায় একেবারেই চুল নাই। অসুখে অসুখে চুল সব পাংলা হইয়া উঠিয়া গিয়াছে। চওড়া কপালের নীচে দুইটি রোগক্লান্ত ম্লানদৃষ্টি বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ। রঙ্‌ তাহার ফর্সা। আর রুগ্ন, অস্থিসার দেহ।

তাহার বিবাহ হইবে শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। শুনিলাম, তাহার বাবা বলিয়াছেন, আমি বারোমাস বিদেশে থাকি, মেয়েকে পরের ঘরে পাঠাইতে হইবেই। সুতরাং আমি আমার সুবিধামত সুযোগমত মেয়ের বিবাহ দিব। আপনি নিষেধ করিতেছেন বটে, তবে আপনি ত চিরদিন আমার মেয়েকে ঘরে রাখিয়া খাওয়াইতে পারিবেন না। সুতরাং বিবাহ আমি দিয়া যাইব। আবার কবে ফিরি কি না ফিরি কে জানে?

মেনুর বিবাহ তিনি নির্বিঘ্নে শেষ করিয়া গেলেন। তাহার চুল-উঠিয়া-যাওয়া চওড়া কপালে সিঁদুর লেপিয়া সে শ্বশুরঘর করিতে গেল। মেনুর ঠাকুরমা এই বিবাহের পর তাঁহার ঘটি-ঘড়া প্রভৃতি অস্থাবর বিক্রয় করিয়া তীর্থে চলিয়া গেলেন। যে মাতৃহীন মেয়েটিকে তিনি মানুষ করিয়া তুলিতেছিলেন, তাহার বিবাহে তিনি সুখী হইলেন না।

মেনুর বিবাহ কোথায় হইয়াছিল, কে তাহার বর হইল—এ সব খবর কিছুই জানিতাম না। একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছি। গ্রামের লোকেরা শুষ্ক বাঁশপাতায় আগুন দিয়াছে দেখিলাম। পূর্ব্ব, উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম—গ্রামের চারিদিকে যত বাঁশের বন ছিল, সব বনেই আগুন দিয়াছে। কৃষ্ণবর্ত্মা তাঁহার সব পথগুলিকেই দগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সময়টা আমাদের গ্রামের সহিত পশ্চিমের বেহার অঞ্চলের তুলনা করা যাইতে পারে। দ্বিপ্রহরে যখন গাছের পাতাগুলি দগ্ধপ্রায় হয় এবং পশ্চিম দিক হইতে শুষ্ক মাটির গন্ধ লইয়া গরম হাওয়া বাড়ীর দরজা জানালা এবং বাগানের গাছগুলির মাথা লইয়া বিষম আন্দোলন করিতে থাকে, তখন মনে হয় বুঝি গাছতলায় গেলে শান্তি পাওয়া যাইবে। কিন্তু তাহার মত ভুল আর নাই। এইরূপ ভুল করিয়া একদিন গাছতলায় খোলা গাড়ীর উপর শুইয়া আছি। অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে অনুভব করিলাম যেন আমার পাশ দিয়া একটি মেয়ে পিতলের ঘড়া লইয়া পুকুরের দিকে চলিয়াছে। কেমন একটা ঔৎসুক্য হইল, চাহিয়া দেখি, সে আমাদের মেনু। তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। গাড়ীর উপরেই উঠিয়া বসিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মেনু তুমি আসিলে কবে?' সে হাঁ কি না কিছুই বলিল না।

নিঃশব্দে পিতলের ঘড়া লইয়া ঘাটে জল আনিতে গেল। আমার মনে হইল মেনু একটু বড় হইয়াছে।

বাড়ীতে কথায় কথায় শুনিলাম, মেনু এখন বাপের বাড়ীতেই থাকিবে। শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা তাহাকে পছন্দ করে নাই। তাহারা বলিয়াছে, মেয়ে দেখাইবার সময় অন্য মেয়ে আমাদের দেখাইয়াছে, বিবাহের সময় তাহা বুঝিতে পারা যায় নাই। আমাদের সঙ্গে যখন এমন জুয়াচুরি করিয়াছে, তখন ও মেয়ে বাপের বাড়ীতেই থাকুক। আমরা ছেলের আবার নূতন করিয়া বিবাহ দিব। মেনু—নয় বছরের মেনু তাহাদের অত্যাচারে জর্জ্জরীভূত হইয়া একদিন অন্ধকার রাত্রে শ্বশুর বাড়ী হইতে পলাইয়া আসিয়াছে, পথ চিনিতে না পারিয়া রৌদ্রে মাঠের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, গ্রামের লোকদের পথের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া পথ চিনিয়া বাড়ী আসিয়াছে। তাহার মুখ হইতে কথা বাহির করা শক্ত। তবে সে কাহাকে জানি না তাহার সব কথা বলিয়াছিল। এই ভাবে লোকের মুখে মুখে তাহার কথা আমার কাণে আসিল। নির্ব্বাক মেনু একা একা তাহার বাপের বাড়ীতে থাকে। বনবাদাড় হইতে শাকপাতা তুলিয়া আনে, বাঁশবন হইতে শুক্নো কঞ্চি কুড়াইয়া আনে। কোনোদিন বা বাগ্‌দীদের নিকট হইতে মাছ চাহিয়া আনে। গোলায় তাহাদের যে ধান আছে, তাহাই ভানিয়া আনিয়া ভাত রাঁধে। শাকপাতা রাঁধিয়া খায়। নির্ব্বাক্ মেনু একা থাকে।

ইস্কুল কলেজে পড়া সভ্যতার সংস্পর্শে আমরা মানুষ হইয়া উঠিতেছিলাম। ছুটি হয়, বাড়ী আসি, আবার চলিয়া যাই। কিন্তু মনে হইল, মেনুর মত মেয়ে আরও কত আছে। কে কাহার খবর রাখে? সে তাহার চুল-উঠিয়া-যাওয়া চওড়া কপালে সিন্দুর লেপিয়া বৎসরের ছয়মাস ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া একা একা পিত্রালয়ে কাটাইয়া দিল অনেকদিন। লেখাপড়া সে শিখে নাই। সুতরাং সে তাহার বাবাকে চিঠি লিখিয়া নিজের খবর দিতে পারিত না এবং তাহার বাবা তাহার খবর লইতেন কি লইতেন না—এ সব সংবাদ রাখিবার সময় পাই নাই। ছুটি শেষ হইত, বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতাম। নির্ব্বাক্ মেনু লোকচক্ষুর কতকটা আড়ালেই একান্তই তাহার নিজেকে লইয়া থাকিত।

মধ্যে আরও কয়েক বছর কাটিয়া গেল। আবার ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছি। তখন পড়াশুনার অধ্যায় সাঙ্গ হইয়াছে, চাকরিতে ঢুকিয়াছি। সঙ্গে স্ত্রী এবং একটি শিশু আছেন। স্ত্রীর পাড়াগাঁ সহ্য হয় না। কাজেই তাঁহার জন্য সর্ব্বপ্রকারের সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই গ্রামের পুকুরে অবগাহন স্নান করিয়া এবং পরিপুষ্ট ঘন সবুজ টাট্‌কা ভিটামিন-প্রধান তরি-তরকারি ও খাঁটি দুধ খাইয়া ও খাওয়াইয়া তিনি সুস্থ ত রহিলেনই উপরন্তু একদা সন্ধ্যায় আমার ছাদের দুষ্প্রাপ্য একাকিত্বের মধ্যে সমাহিত আমাকে আক্রমণ করিলেন এবং বলিলেন, 'তোমাদের দেশ বেশ ভাল। আরও কিছুদিনের ছুটি লইয়া এখানে থাকো।'

নূতন একখানি বিদেশী বই-এর মধ্যে ছিলাম। মুখ তুলিয়া কহিলাম, 'উত্তম কথা, যদি ভালো মনে করো, থাকিতে পারো। ছুটি হয়ত আর দরকার না হইতেও পারে। যে ছুটি আছে, ইহাতেই হইবে।'

দেখিলাম, তিনি একখানি নীলাম্বরী পরিয়াছেন এবং তাঁহার স্বল্প অবগুণ্ঠনের ফাঁক দিয়া

তাঁহার অবেণীবদ্ধ কেশভার কাঁধের সাদা ব্লাউজের উপর লুটাইতেছে, বাতাসে খেলা করিতেছে এবং তিনি ঘুরিতেছেন ফিরিতেছেন আর কোনো দামী এসেন্সের গন্ধ আমাকে ব্যাকুল এবং আমার অন্তরাত্মাকে উৎকেন্দ্রিত করিয়া তুলিতেছে।

তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিলাম,—আজ সন্ধ্যায় এত কেন? আমাদের পাড়াগাঁয়ে এত দেখিলে লোকনিন্দা হইবে।

তিনি অতি অদ্ভুত ভঙ্গীতে ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন এবং কহিলেন, 'তোমাদের পাড়াগাঁকে এত দীন ভাব' কেন? আমি ত আজ তোমাদের পুকুরের ঘাটে দেখিলাম, একটি মেয়ে (চমৎকার চেহারা তার) কোনো কথা না কহিয়া সাবান মাখিয়া চলিয়াছে। তাহার সুন্দর শরীরের গঠন দেখিলে হিংসা হয়।—এই কথা বলিয়া তিনি মুখ নামাইলেন।'

অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, সাবান মাখিবার মত এখানে কে আছে? কাহাকেও মনে পড়িল না। বলিলাম, তাহার নাম কি?

—নাম জানি না, সাবান মাখিতে দেখিয়াছি তাহাই বলিলাম।

বলিলাম, 'বেশ করিয়াছ। কে সে মেয়েটি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।' তারপর অকস্মাৎ জানালার বাহিরের তারালোকিত আকাশের দিকে চাহিয়া কহিলাম, 'আজ তোমাকে বড় সুন্দর দেখাইতেছে। তবে কি জান, পাড়াগাঁয়ে আটপৌরেই লাগে ভালো।' বোধ হয় তিনি দুঃখিত হইলেন এবং কহিলেন, 'তুমি কি চা বর্জ্জন করিয়াছ?' কহিলাম, 'মোটেই না। চা আনিতে পারো।'

তাহার পর চা এবং তিনি এবং নানা আলোচনা এবং শেষ অবধি স্থির হইল, পল্লীগ্রামে নীলাম্বরী এবং এসেন্স চলিতে পারে। পরাজিত হইয়া মনটা খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল।

পরদিন একা একা বাহির হইয়াছি। কতদিন গ্রামে আসি নাই। বহুদিনের পুরাতন স্মৃতিবিজড়িত গ্রাম ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা হইল। এ পাড়া ও পাড়া ঘুরিয়া বেড়াইলাম। বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। দক্ষিণপাড়ার আমবাগানগুলি পার হইয়া শরতের মেঘ ও রৌদ্রের লীলার মধ্যে বিহগকাকলি মুখরিত পল্লীর দূর প্রসারিত মাঠে বাহির হইয়া পড়িলাম। একস্থানে দেখি মাঠের মধ্যে কয়েকঘর চাষী ঘর বাঁধিয়াছে। সেইখানে আমাদের গ্রামের ব্রহ্মাণীতলা। দূর হইতে দেখিলাম, পাকা ধানের ক্ষেতের ওপারে রৌদ্রঝলমল সেই ব্রহ্মাণীতলায় সাদা আলখাল্লাপরা এক বাউল নাচিয়া নাচিয়া একতারা এবং চিমটি বাজাইয়া গান ধরিয়াছে—

গৌর, কোন্ বা দেশে রইলি ভুলে প্রাণ।
তোমায় না দেখিলে গৌর বাঁচেনা আমার প্রাণ!
গৌর রাখ্‌ব না কুলমান।
যেমন শিমূলের তুলো ওড়ে
ওরে তেম্‌নি ক'রে ওড়ে আমার প্রাণ!
তোমায় না দেখিলে গৌর বাঁচে না
আমার প্রাণ!

গৌর রাখ্‌ব না কুলমান—
কোন্ বা দেশে রইলি ভুলে প্রাণ!
আমি রাখ্‌ব না কুলমান
তোমায় না দেখিলে গৌর বাঁচে না আমার প্রাণ।

এক একটি চরণ সে বহুবার আবৃত্তি করিতেছে। আর তাহার ঝুমুরবাঁধা পায়ের নৃত্য কিছুতেই যেন থামিতে চাহিতেছে না। তাহার চারিপাশে লোক জমিয়াছে বেশ।

ধানের ক্ষেত পার হইয়া তাহার কাছে গিয়া অনেকগুলি গান শুনিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি এখানে থাকো?

সে কহিল, আজ্ঞে হাঁ, আমি এখানেই ঘর বাঁধিয়াছি।

বাউলদের প্রতি আমার বিশেষ একপ্রকার পক্ষপাত আছে। আমার মনে হয়, এই বাংলার দিগন্তচুম্বিত স্বপ্নঘন উদাসীন প্রান্তরের যদি কোন সুর থাকে, তবে সে সুর বাউল তাহার একতারায় এবং বৈশাখ-বায়ু-স্পন্দিত অশ্বত্থ-পল্লবের অনাহত মর্ম্মরের মত তাহার উদাস, উদাত্ত কণ্ঠস্বরে ধরিয়া রাখিয়াছে। মনে হয়, তাহার এক-একটি তান যেন সে অতিদূর মাঠের দিকে ছাড়িয়া দেয় এবং তাহার সেই তান যেন কাঁপিতে কাঁপিতে এক মাঠ হইতে আর এক মাঠে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। বাউল গানকে আমার এই বাংলার মাঠের সুর বলিয়া মনে হয়।

সুতরাং বাউলের সহিত আলাপ জমাইয়া তুলিলাম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার নাম কি?'

সে হাসিয়া কহিল, 'শ্রীরতনদাস বৈরাগ্য।'

শ্রীরতনদাস বৈরাগ্যের কথা বাড়ীতে আর বলিবার আবশ্যক হইল না। বয়স কম হইলে হয়ত তাহার সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতাম। তাহার গানগুলি লিখিয়া লইতাম। বাউলদের জীবন কি রকম, কি তাহাদের আচার ব্যবহার—হয়ত সে সবের সহিত আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিত। কিন্তু সে সুযোগ আর আসিল না। আর দু' একদিন পরেই আমাকে চলিয়া যাইতে হইবে। ছাদে সন্ধ্যার পর বসিয়া আছি। অনতিদূরে স্ত্রী বসিয়া শিশুটিকে দুধ খাওয়াইতেছেন। ঝিনুকের মৃদু ঠুন্‌ঠান্ শব্দ হইতেছিল। নিকটেই একটি বিড়াল থাবা পাতিয়া বসিয়া দুধ খাওয়ানো দেখিতেছিল। স্ত্রী দুধ খাওয়াইতে খাওয়াইতে বলিলেন, 'জানো, সেদিনের যে মেয়েটি সাবান মাখিতেছিল, তাহার নাম মেনু, মৈত্রদের বাড়ীর।'

বলিলাম, 'তাই নাকি?—মেনু নামটি শুনিয়া চম্‌কাইয়া উঠিয়াছিলাম। স্ত্রী ঝিনুকের দুধ নিঃশেষে খোকার মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া কহিলেন, হ্যাঁ। বলিলাম, মেনুকে অনেকদিন দেখি নাই! সে ত বড় কষ্টে থাকে। তাহার স্বামী তাহাকে লয় না। তাহার বাবাও তাহার খোঁজ করে না। তুমি এ সব কিছু জানো?'

—কতক কতক শুনিয়াছি। তারপর একটু হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু সে আর নাই।

—কে?

—সেই মেনু।

—কেন? সে কোথায় গেল? কোনো বিপদ—

আবার তিনি হাসিলেন এবং আর এক ঝিনুক দুধ খোকার মুখের মধ্যে ঢালিতে ঢালিতে বলিলেন, সে পলাইয়াছে।

—তাই নাকি? কোথায়?

—কি জানি? শুনিলাম এক বৈরাগীর সঙ্গে সে উধাও হইয়াছে। বড় দুঃখ হয়। ভাবিয়াছিলাম, তাহাকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া আলাপ করিব। কিন্তু সে এ সবের্ মায়া কাটাইয়াছে।

মনে মনে অনেকদূর চলিয়া গিয়াছি। পাকা ধানের ক্ষেতের ওপারে রতনদাস বৈরাগীর কথা মনে হইল। বোধ হয় তাহার 'সাঁই' অন্ধকার নিশীথ রাত্রে মালাবদলের বা কণ্ঠিবদলের ফুল ফুটাইয়া দিয়া গিয়াছেন। মেনুর কথা ভাবিয়া মনে একেবারেই দুঃখ হইল না। সে দুর্ভাগা মেয়ে কঞ্চি কুড়াইয়া শাক তুলিয়া দিন কাটাইত, আজ সে যখন আপনার পানে চাহিয়াছে, তখন সন্ধ্যায় পুকুরের জলে শুধু সাবান মাখিয়াই তাহার তৃপ্তি হয় নাই। মনে আমার আনন্দই হইল; ভাবিলাম, তাহার সত্যকার মালাবদল হইয়াছে।

স্ত্রী বোধ হয় আমার মন বুঝিয়াছিলেন; চাহিয়া দেখি তিনি উঠিয়া নীচে চলিয়া গিয়াছেন।

জ্যোতিষী বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা লেখক হিসাবেই জানি; তিনি যে একজন উৎকৃষ্ট জ্যোতিষী ছিলেন তাহা আমরা অনেকেই জানি না। তিনি কি ভবিষ্যৎবাণী করিয়া গিয়াছিলেন এবং কেমন করিয়া তাহা অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছে তাহা বলা প্রয়োজন।

তাঁহার রচিত "লোক-রহস্যে" জন্ ডিক্‌সন সাহেব মাছ চুরি করিয়াছিলেন এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার পকেটের আধখানা বই না থাকাতে, সেই মাছ বাহির হইয়া পড়ে। ফলে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং কোর্টে জুরিশডিক্‌সনের কথা উত্থাপিত করেন। সম্প্রতি বি, এন, রেলওয়ের গার্ড ব্রাসেট সাহেব কিঞ্চিৎ মাছ চুরি করিয়াছিলেন, তবে মাছটি বড় হওয়াতে পকেটে না করিয়া কুলী মারফৎ পাঠাইতেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি ধরা পড়িয়া গ্রেপ্তার হন এবং দণ্ডের বিরুদ্ধে জুরিশডিক্‌সনের কথা তুলিয়া উচ্চতর আদালতে আপীল করেন। আপীল নাকচ হইয়া ২০০৲ শত টাকা অর্থদণ্ড বহাল রহিয়াছে।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম ব্রাসেট সাহেবই পূর্ব্বজন্মে জন্ ডিক্‌সনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।



চলন্তিকা

'সম্বুদ্ধ'

ইউরোপের রণাঙ্গনে যুদ্ধের দামামা বাজিতেছে। ছয় হাজার মাইল দূরে বসিয়া আমরা সেই যুদ্ধ লইয়া জল্পনা-কল্পনা করিতেছি। দামামার ধ্বনির খানিকটা সংবাদপত্র ও রেডিও-বাহিত হইয়া আসিয়া কাণে পৌঁছাইতেছে, খানিকটা সেন্সর ও তথ্যগুপ্তির চালুনিতে আট্‌কাইয়া যাইতেছে।

তবুও সে বেড়াজালের ফাঁস গলাইয়া টুক্‌রা টুক্‌রা বিক্ষিপ্ত সংবাদ আমাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়; বাহিরের চক্ষুকে যেই যত কঠিন বাঁধনে বাঁধুক, মনের চক্ষুকে বাঁধিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। সেই চক্ষে ইউরোপীয় পরিস্থিতির দর্শন লাভ করিয়া তাহার প্রাখর্যে বিহ্বল হইয়া যাইতেছি।

* * * * *

জার্মান সেনা ফরাসী রাজধানী পারীতে প্রবেশ করিয়াছে, এই সংবাদে উল্লসিত জার্মানির তরুণ ও তরুণীবৃন্দ মিউনিকের বীয়ার-সেলে এক সভায় হের্ হিট্‌লারকে সম্বর্ধিত করিয়াছে। একদা নির্বাসিত ও অধুনা প্রত্যাগত ভূতপূর্ব কাইজার উইল্‌হেল্‌ম্ সভায় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভার প্রারম্ভে ফ্রাউ আডা স্মিট্ ও ফ্রয়লাইন্ মার্থা স্মিথ্‌স্লাব্ সমস্বরে গান করেন।

"Sind Sie ein gross Tzambhuwahn"—

এই গানটি রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত "জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে" গানটির অনুকরণে রচিত।

গানের শেষে জার্মান্ নারীবাহিনীর অধিনেত্রী ফ্রাউ নাখ্‌ফিখ্‌টিগ্ হিট্‌লারকে চন্দন ও পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন এবং সুললিত কণ্ঠে একটি বন্দনাগীতি পাঠ করেন। অতঃপর নবীন জার্মানির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ফুয়েহ্রারকে মানপত্র প্রদান করা হয়। সকলের শেষে ফুয়েহ্রার একটি ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়া সকল অভিনন্দনের উত্তর প্রদান করেন। জলযোগান্তে সভার কার্য শেষ হয়।

* * * * *

জার্মানি-প্রবাসী বাঙালী শ্রীযুত জীমূতবাহন দত্ত, ফ্রাউ নাখ্‌ফিখ্‌টিগের বন্দনা এবং হিট্‌লারের বক্তৃতাটির যে বাংলা অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা এইখানে উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

ফ্রাউ নাখ্‌ফিখ্‌টিগ্ বলেন,

হে জার্মান জাতির জীবনমরণের একমাত্র অধীশ্বর,

তোমাকে প্রণাম। সমগ্র বিশ্বের ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ক'রে তোমার উন্নত মস্তক আজ

আকাশে ঠেলে উঠেছে; তোমার অনমিত কণ্ঠে মালা পরাতে পেয়ে আজ আমি ধন্য। জয়ের অম্লান গৌরবে ভাস্বর তোমার প্রদীপ্ত ললাট—সেই ললাটে আজ মাখিয়ে দিলুম আমি চন্দন-চর্চা। হে আর্যশ্রেষ্ঠ, আর্যজাতির বিজয়প্রতীক ঐ শীতচন্দনবিলেপন শীতল রাখুক তোমার মস্তিষ্ককে, সংহত করুক তোমার বুদ্ধিকে।

তরুণ জার্মানির তরুণ সেনারা আজ তোমার পতাকাতলে সমবেত হয়েছে, জাতির লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতে। আমরা মেয়েরা ঘরে ব'সে রইলুম আজ তোমারই আদেশ মেনে নিয়ে। কি আর বলব তোমাকে হে হৃদয়েশ্বর, আমাদের জীবন যৌবন সমস্ত নিঃশেষে তোমার হাতে তুলে দিলুম আজ—আমাদের আশীর্বাদ করো।

হিট্‌লার উহার উত্তরে বলেন :

নবীন জার্মানি,

আজকের সভায় যে অবিচলিত নিষ্ঠার নিবেদন আমি পেলাম, তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে। আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

আপনারা আমাকে মালা পরিয়ে দিয়েছেন—সে মালা আপনাদের ঐকান্তিক প্রেমের সৌরভে সুরভিত। কিন্তু আমার কণ্ঠে উঠেছে তবুও এই মালা আমার একার উদ্দেশে নিবেদিত নয়—নিবেদিত সমগ্র জার্মান সেনার, সমগ্র জার্মান জাতির উদ্দেশে। আমি তারই প্রতিনিধি মাত্র।

তাই আমার গলায় মালা পরিয়েই ক্ষান্ত হবেন না আপনারা, এ বিশ্বাস আমি করি। সত্যিই যদি চান্ জার্মানি জয়লাভ করুক, যদি চান তার বিজয়ী সেনাদল এমনই অপ্রতিহত গতিতে জয়ের পথে অগ্রসর হোক, তবে যে আত্মনিবেদন আজ আমাকে সম্বোধন ক'রে আপনারা করলেন, তাকে উচ্চারণ করুন সেই সেনার প্রতিটি সেনানী প্রতিটি সৈনিকের দিকে তাকিয়ে। অগ্রগামী সৈন্যদল ধেয়ে চলেছে রণক্ষেত্রে—তাদের সঙ্গী হোক আপনাদের মঙ্গল-কামনা, সঙ্গী হোক আপনাদের বিদায়-করুণ আঁখির কল্যাণ-দৃষ্টি, সঙ্গী হোক আবার আপনাদের পাশে ফিরে আস্‌বার উৎকণ্ঠ আমন্ত্রণ। রণশ্রান্ত সৈনিকেরা রণভূমি থেকে ফিরে আসছে ক্ষণিক বিশ্রামের আশায়—আপনাদের দ্বার উন্মুক্ত থাক তাদের জন্যে। আপনাদের নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে স্থান হোক তাদের সমরস্বেদসিক্ত ক্লান্ত দেহের। সেই দ্বার যেন কখনও রুদ্ধ না হয়, সেই আলিঙ্গন যেন না হয় শিথিল। বিশ্রামের পরে আবার যখন তারা ফিরবে রণক্ষেত্রে, বুকে পুরে যেন নিয়ে যেতে পারে নবীন উন্মাদনা, পকেটে পুরে যেন নিয়ে যেতে পারে প্রেয়সীর ফটোগ্রাফ।

আপনাদের কাছে এর বড় প্রার্থনা আমার নেই। আর বেশী কথা বলবার সময় আমার এখন হবে না—আমার পরম শুভকামনা গ্রহণ করুন।

নমস্কার। আপনারা করতালি দিন। হেইল মিসেল্‌ফ্।

* * *

জার্মানির এই বিজয়োল্লাসের পাশাপাশি কানে আসিতেছে আহত ফ্রান্সের মরণ-আর্তনাদ। এইখানেই জীবনের ট্রাজিডি—ইহারই নাম বিধাতাপুরুষের রসবোধ।

ফরাসীর রক্তমাংসে মাটি কর্দমাক্ত পিচ্ছিল করিয়া অগ্রসর হইতেছে জার্মানির দানবকায় জয়রথ ট্যাঙ্ক। ফরাসীরা লড়িতেছে, মরিতেছে—কেহ কেহ পলাইতেছেও। তবু নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে পলাইতে পলাইতেও মানুষ এক-একবার চকিত দৃষ্টিতে ফিরিয়া তাকায় তাহার চিরপ্রিয় বাসভূমির দিকে;

হউক ক্ষীণ তবু সেই কণ্ঠস্বর আকাশে তুলিয়া একবার শেষ প্রতিবাদ জানাইতে চায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে। পলায়নশ্রান্ত ফরাসী প্রজা মার্সাই নগরীতে এক জনসভায় জার্মান-আক্রমণের তীব্র নিন্দা করিয়াছে, এইটুকুই বোধ হয় এবারকার যুদ্ধের সর্বাপেক্ষা করুণ সংবাদ।

* * * *

মার্সাইয়ের সভায় সেদিন বহু সহস্র লোক একত্র হইয়াছিল। সভায় উপস্থাপিত প্রস্তাবগুলির প্রত্যেকটিই বিনা-দ্বিধায় গৃহীত হয়। 'পঞ্চম কলাম্'এর বিভীষিকা সত্ত্বেও সেদিন যে মতৈক্য লক্ষিত হইয়াছে, তাহা ভরসার বস্তু।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলি মোটামুটি এইরূপ :

(১) এই সভা জার্মান সেনার পারী নগরীতে প্রবেশের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছে, এবং দাবি করিতেছে, অবিলম্বে সমস্ত জার্মান সেনা পারী হইতে প্রত্যাহার করা হউক।

(২) ফ্রান্সের সর্বত্র জার্মান যন্ত্র-বাহিনী যে বীভৎস সংহারলীলা চালাইতেছে তাহা স্মরণ করিয়া এই সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ শিহরিয়া উঠিতেছেন।

(৩) ফরাসী সেনা হতবল; জার্মান সেনাকে বাধা দিবার শক্তি তাহার নাই। বিপন্নকে রক্ষা করেন যে বিধাতা, তাঁহার বজ্র আকাশ হইতে নামিয়া আসুক, জার্মানির দুর্জয় ট্যাঙ্কবাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিক—এই সভা বজ্রের দেবতা জুপিটারের চরণে এই প্রার্থনা জানাইতেছে। জুপিটার যদি এই বিপদে ফ্রান্সকে রক্ষা করেন, তবে অচিরে এথেন্সের মন্দিরে তাঁহার উদ্দেশে একশত আটটি বলীবর্দ বলি দেওয়া হইবে, এই মানত সভা অঙ্গীকার করিতেছে।

(৪) এই সভা প্রস্তাব করিতেছে, সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর প্রতিলিপি এবং উপস্থিত সভ্যবৃন্দের ফটোগ্রাফ সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হউক।

* * * *

নরওয়ে, বেলজিয়ম্, হল্যাণ্ডের শক্তি অল্প, সেনা ক্ষুদ্র। জার্মানির সম্মুখে দাঁড়াইবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না। কিন্তু ফ্রান্সের মানুষ বেশি, অর্থ বেশি, রণসজ্জা বেশি। ফ্রান্স কেন এত সহজে পরাজয় স্বীকার করিল, ভাবিয়া অনেকে বিস্মিত হইতেছেন।

অথচ সত্যই বিস্ময়ের কিছু ইহাতে নাই। ফ্রান্স কেন লড়িতে পারিল না, তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে বার্ণ' হইতে প্রাপ্ত একটি সংবাদে।

বিতাড়িত ফরাসী সেনা ও প্রজা অনেকে সীমান্ত পার হইয়া সুইট্জারল্যাণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে। সুইস্ সরকার ইহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া বন্দীশালায় পুরিয়া রাখিতেছেন, কিন্তু ত্রাস-বিহ্বল ফরাসী পলাতকদের তাহাতে আপত্তি নাই—তাহারা জানে, এখন বন্দীশালায় ঢুকিয়া বসিতে পারিলেও তাহারা শোণিত-লিপ্সু জার্মান সেনার হাত হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা পাইবে।

কিন্তু পশ্চাদ্ধাবক জার্মানকে এড়ানো আর প্রতিবেশী ফরাসীকে সহিয়া চলা এক বস্তু নয়। বার্ণের সংবাদে প্রকাশ, সুইস্ বন্দীশালায় আবদ্ধ ফরাসীরা কর্তৃপক্ষের নিকটে এক আবেদন পাঠাইয়াছে। বন্দী ফরাসীদের মধ্যে ডিমোক্রাট্, সমাজতন্ত্রী, সাম্যবাদী প্রভৃতি নানা মতের ও নানা দলের লোক আছে; বন্দীদের দাবি, বন্দীশালায় সকলকে একত্র না রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন দলের জন্য আলাদা 'পাকশালা' ও গৃহের

ব্যবস্থা করা হউক। সুইস্ সরকার এই দাবি উপেক্ষা করিলে অচিরে অনশন ধর্মঘট আরম্ভ হওয়াও বিচিত্র নয়।

ফরাসী-জাতির দুর্বলতার মূল কোথায়, এই সংবাদটি হইতে তাহা স্পষ্ট হইবে।

* * * *

অবশ্য এ সমস্তই রাজাদের সঙ্গে রাজাদের যুদ্ধের কথা; আমরা উলুখড়রা অবশ্যম্ভাবী ভাগ্যকে মানিয়া বসিয়া আছি মাত্র। প্রাণ আমাদের যাইতে পারে এইটুকুনই মোদ্দা কথা; সে প্রাণ কোন্ পক্ষীয় চরণস্কন্ধে পড়িয়া গেল সেটা নিতান্তই বাহুল্য কৌতূহল।

তবুও তাহা লইয়া দুঃখ করিতাম না। আমরা প্রাজ্ঞ, পরার্থে প্রাণ উৎসর্গ করা আমাদের বহুকালের অভ্যাস। কিন্তু দুঃখ হয় নিজের দুর্ভাগ্য স্মরণ করিয়া। মরিলাম কিন্তু কেন মরিতেছি জানি না—ইহার মধ্যে একটি নিগূঢ় হাস্যরস লুকানো আছে। মরিতে মরিতেও যদি সেই হাসিটুকু হাসিয়া মরিতে পাইতাম, মৃত্যুযন্ত্রণার চেতনা কিঞ্চিৎ কম হইত। কিন্তু মরিবার সময়েও উলুখড়ের হাসিবার অধিকার নাই, হাসিলে পুলিশে ধরে। দৈববিপাকে রসিকতা করিয়া ফেলিলেই অরসিকের হাতে গুঁতা খাইবার নিমন্ত্রণ সাধিয়া লইতে যদি হয়—তাহার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর হইতে পারে না। একান্ত যখন কে কোথায় গুঁতাইতে উদ্যত হইয়া বসিয়া আছে জানিনা তখন সময় থাকিতে মাথা বাঁচাইতে যত্নশীল হওয়াই সুযুক্তি। সেই যুক্তি মানিয়া স্বীকার করিতেছি, উপরে উদ্ধৃত কথাগুলা সমস্তই মিথ্যা। জার্মানিতে, ফ্রান্সে, সুইট্জারল্যাণ্ডে সত্যই কিছু ঘটে নাই। যাহারা সত্যই রাজনীতি ও যুদ্ধের চর্চা করে, তাহাদের ঘাড়ে, বঙ্গদেশের অভ্যস্ত ন্যাকামি-কাল্ট্ চাপাইয়া দিলে কেমন হয় তাহাই একটু মনে মনে সাজাইয়া দেখিতেছিলাম।

* * * *

তথাপি আমাদের হতাশ হইবার কারণ নাই। আমাদের রাষ্ট্রপতি ও রাষ্ট্রোপপতিরা ভরসা দিতেছেন, আর ভয় নাই। কেন ভয় নাই এবং কে অভয় দিতেছে ঠিক বোঝা যাইতেছে না বটে, কিন্তু নির্ভয় যে আমরা হইতে পারি ইহাতে সংশয় থাকিতে পারে না। যে পাপিষ্ঠ সংশয় রাখিবে সে নাস্তিক—তাহার ধর্মে মতি নাই, নেতায় আস্থা নাই; তাহার জন্য ইহলোকে কর্পোরেশনের চাকুরি নাই, পরকালে গতি নাই।

* * *

শৈশবে শ্রুত একটি গল্প মনে পড়িতেছে।

গৌড়েশ্বর সম্রাট্ বাণীবৈভব চক্রবর্ত্তী ঠ্যাং চুলকাইতেছিলেন।

রাজ্যরক্ষার খাতিরে দিল্লীর মুঘলবাদশাহের সঙ্গে সম্প্রীতি রাখিতে হইত; যবনসংস্পর্শে আর্যবংশোদ্ভব গৌড়েশ্বরের আজ দদ্রুর উদ্ভব হইয়াছিল। রাজবৈদ্য ঔষধ দিতে চাহিয়াছিলেন; রাজকীয় ভূষণ বলিয়া রাজা রাজি হন নাই।

মন্ত্রী আসিয়া কহিলেন, মহারাজ, গুর্জর-সেনা আসিতেছে, সীমান্ত পার হইল বলিয়া।

রাজা চিরদিন কর্তব্যনিষ্ঠ, তৎক্ষণাৎ খাড়া হইয়া বসিয়া কহিলেন, বর্ম লইয়া আইস।

পার্শ্বরক্ষী অনুচর বর্ম লইয়া আসিল। বেশ উন্মোচন করিয়া বর্ম পরিতে যাইবেন, এমন সময় শ্রীচরণ আবার চুলকাইয়া উঠিল। রাজা কহিলেন, বর্ম ধর, একটু চুলকাইয়া লই। বর্ম একবার পরিলে তো আর চুলকানো যাইবে না।

সজ্জিত অশ্ব বাহিরে দাঁড়াইয়া হ্রেষাধ্বনি করিতে লাগিল। সজ্জিত সেনা প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। বর্ম ও অস্ত্র লইয়া পার্শ্বচর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল—রাজা নিমীলিত-নেত্রে কুঞ্চিতমুখে মেরুদণ্ড আনমিত করিয়া নিবিষ্টচিত্তে কণ্ডূয়নসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

• মন্ত্রী অধীর হইয়া উঠিলেন। বেলা বাড়িয়া যায়। সজ্জিত অশ্ব রৌদ্রতাপে ক্লান্ত হইয়া উঠে, অপেক্ষমাণ সেনা অস্থির হইয়া উঠে, শত্রুসৈন্য সীমান্ত পার হইয়াছে সংবাদ লইয়া দূত ছুটিয়া আসে—মহারাজের কণ্ডূয়ন আর শেষ হয় না। একবার চুলকান, আবার চুলকাইতে ইচ্ছা হয়, এক পা চুলকাইতে চুলকাইতে অন্য পা কুড়্কুড়্ করিয়া উঠে; দ্রুত সঞ্চরণশীল হস্ত জঙ্ঘা হইতে জানুতে, জানু হইতে উরুতে, উরু হইতে পার্শ্বে ও পৃষ্ঠে কেবলই ঘুরিয়া ফিরিতে থাকে।

মন্ত্রী বারবার ডাকেন, মহারাজ।

রাজা তন্ময়। বলেন, এই-যে হইল।

কিন্তু হয় না। হাত থামাইতে না-থামাইতেই আবার দ্বিগুণ তেজে অঙ্গ চুলকাইয়া উঠে; আবার দ্বিগুণ আগ্রহে রাজা হস্তচালনায় ব্যাপৃত হন।

শেষে মন্ত্রী কাতর হইয়া ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন। ঈশ্বরের করুণা হইল, তিনি রাজার নখ ধারালো করিয়া দিলেন। সেই নখে বাধিয়া রাজদেহের ছালচামড়া ছিঁড়িয়া উঠিয়া আসিল, জ্বলুনির তলায় কণ্ডূয়ন চাপা পড়িল। রাজা এতক্ষণে মুখ তুলিয়া চাহিলেন; কণ্ডূয়নশ্রমে স্কন্ধ ও পৃষ্ঠ বহিয়া ঘর্মধারা ঝরিতেছিল, উত্তরীয়ে তাহা মুছিতে মুছিতে কহিলেন, শত্রুর সংবাদ বল।

মন্ত্রী কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, আর সংবাদ। শত্রু রাজ্য পার হইয়া আসিয়াছে, পরিখার অপর তীরে শিবির করিয়া রাজধানী বেষ্টন করিয়াছে। তাহাদের গৌড়-অভিযান অর্ধেক সম্পূর্ণ।

রাজা কহিলেন, ভয় নাই, আমার রণসজ্জাও অর্ধেক সম্পূর্ণ হইয়াছে। বর্ম দাও।

* * * *

সমস্ত বৎসর ধরিয়া অকারণ ও অনর্থক দেশভ্রমণের অন্তে, "The first phase of the battle is over" বলিয়া শ্রুত-মুখস্থ বাণী প্রচার করিবার বহর দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইতেছি। সত্যই আমরা বীরের জাতি যে জাতির পুরুষ হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিত, যে জাতির নারী হাসিমুখে চিতায় আরোহণ করিত, সেই জাতির মানুষই আমরা বটে। জীবনমরণ সমস্যার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এমন অকুণ্ঠিত রসিকতা করিতে অন্য কোন জাতির মানুষ পারিত না।

* * * *

কিন্তু হাসিতে বসিয়াও অঙ্ক মনে পড়ে—ইহারই নাম দুষ্প্রবৃত্তি। মনে প্রশ্ন জাগিতেছে—"First phase বা half of the battle" এর চেহারা যদি সত্যই এই হয়, তবে নিশ্চয় ইহার দুইগুণ কাণ্ড কারখানা করিলেই যুদ্ধের সমস্তখানি 'over' হইয়া যাইবে। এখনও যায় নাই ইহার অপরাধ সমস্তখানিই দেশের লোকের। হতভাগ্য জাতি—ব্যাটল যেখানে ওভাব হয়-হয়, সেখানে আর-একটু অবহিত হইলে কী এমন দোষ হইত? অর্ধেক যুদ্ধে কি কি লাগে তাহা তো দেখিলেই; ইহার দুইগুণ মিটিং করা, ইহার দুইগুণ 'বাণী' প্রচার করা, ইহার দুইগুণ ফুলের মালা কেনা,—ইহার দুইগুণ রেলষ্টীমারে চড়া (পরের পয়সায়), ইহার দুইগুণ গালাগালি ছাপিয়া কাগজ বাহির

করা—কোন কাজটা সত্যকার অসাধ্য বা দুঃসাধ্য ছিল? এক হয়তো একটু কঠিন হইত, দ্বিগুণ-কাগজ বিক্রয় করা—সেটাও এমন কিছু অসম্ভব কাণ্ড নিশ্চয়ই নয়। যুদ্ধের বাজার—দাম অর্ধেক করিলেই আড়াইগুণ কাগজ অক্লেশে বিকাইয়া যাইত। শেষ পর্যন্ত লোকসান হইত না, হইলেও না হয় সে টাকাটা চাঁদা করিয়া তুলিয়া দেওয়া যাইত। সিনেমাতে টাকা ঢাল, খেলার মাঠে পয়সা দাও—কেবল রণজয়ের বেলাই কিছু দিতে পারিলে না? হা ধিক্!

এই সুযোগ আর আসিবে না। ইউরোপীয় যুদ্ধের ধাক্কায় পরিস্থিতি ঘনঘন বদ্‌লাইয়া যাইবে। রেলকোম্পানি ইতিমধ্যেই ভাড়া বাড়াইয়াছে—টাকায় এক আনা বাড়িলে ফার্স্ট ক্লাস টিকিটে কত বাড়ে হিসাব করিয়া দেখিয়াছ কোনদিন? মূর্খ!

একটু ধৈর্য নাই, একটু তিতিক্ষা নাই—ইহাদের আর বলিব কি! একবার ব্যাট্‌ল্‌টা ওভার হইয়া গেলে তারপর কি আর—কিন্তু, তারপর কি হইত? বাঁচিতাম, না মরিতাম? হারিতাম না জিতিতাম? ব্যাট্‌ল্ over হইত তিনি বলিয়াছেন, 'won' হইত কিনা সেকথা বলেন নাই, কৌশলে চাপা দিয়া গিয়াছেন। ইহার নাম রাজবুদ্ধি। এই বুদ্ধি যাঁহার আছে তিনিই রাজা হইবার উপযুক্ত। তোমার আমার মাথায় সে বুদ্ধি খেলে না। আমার মাথায় খেলিলে আমি ভ্যাগাবণ্ড্‌গিরি করিতাম না। তোমার মাথায় খেলিলে তোমার নাম ক্যাবলকেষ্ট থাকিত না।

* * *

অতএব স্বাধীন ভারতে আমরা তাঁহাকেই রাজা করিব। ভারত স্বাধীন এবার হইবেই, স্বয়ং জওহরলাল ইহা বলিয়াছেন। কি প্রকারে হইবে অবশ্য বলেন নাই; কিন্তু যুদ্ধের বাজারে সকল কথা মুখ খুলিয়া বলা যায় না। তাঁহার যাহা বলিবার তিনি বলিয়াছেন—ইহা পর্যন্ত বলিয়াছেন, আমাদের আর কোন চেষ্টা চরিত্রও করিতে হইবে না সেজন্য। এখন কেবল একদিন বসিয়া ভবিষ্যৎ ভারতের জন্য Government of India Actএর একটা নূতন সংস্করণ স্থির করা এবং সেই অনুসারে প্রেসিডেন্ট কাউন্সিল নির্বাচন করিয়া ফেলা বাকি।

কংগ্রেস আয়োজনে লাগিয়াছেন। প্রথম হইতেই মতের দ্বৈধ দেখিয়া ভরসা জাগিতেছে, ফল কিছু দর্শাইবেও বা। মতের বিজাতীয় ঐক্য দেখিলেই আমাদের মনে শঙ্কা জাগে; অনৈক্য দেখিলে বুঝি ভয় নাই, ওটা দেশি জিনিষ।

* * *

ভারত-রক্ষা লইয়া ওয়ার্কিং কমিটি ও গান্ধীজির মতে অহিংস অসহযোগ আরম্ভ হউক; সেই বিভেদেই আমাদের জয়। আমাদের আপ্রাণ অভিশাপ সহিয়াও আমাদের মুহুর্মুহু সভাসমিতির রিপোর্ট দেখিয়াও কংগ্রেস মরে নাই—এইবার গৃহবিবাদে কংগ্রেস ভাঙুক, বাংলাদেশ আবার ভারতের রাজদণ্ড স্বহস্তে তুলিয়া লইবে; আমাদের চিরসঞ্চিত আশা আমরা এবার পুরাইব, বাংলার পরমপ্রিয় রাজকুমারকে আমরা স্বাধীন ভারতের রাজা বানাইব। আপনারা হুলুধ্বনি দিন; স্বাধীন ভারতে সরকারি চাকুরি যদি চান যুদ্ধের বাকি অর্ধেক শেষ করিতে লাগিয়া যান। আমেন।

শ্যামদেশের কথা

শ্রী ফণিভূষণ রায়

ইয়োরোপের মহাযুদ্ধ লইয়া আমরা এত ব্যস্ত হইয়া আছি যে আমাদের ঘরের নিকটেই যে সকল সুন্দর দেশ আছে তাহার সংবাদ রাখিবার বড় একটা অবকাশ পাই না। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্যামদেশের উল্লেখ করা যাইতে পারে।



শ্যামরাজ আনন্দ মহিদল

মাত্র কিছুকাল পূর্ব্বেও শ্যামদেশের সম্বন্ধে নূতন করিয়া উল্লেখ করিবার মতন বিশেষ কিছু ছিল না, কিন্তু গত বিশ বৎসর ধরিয়া এই ক্ষুদ্র স্থানটি তাহার রাজনৈতিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে এত দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছে যে তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। এই জাতীয়তাবোধের ফলেই আজ শ্যামদেশ জগতের শিক্ষিত ও তথাকথিত সভ্য দেশ সমূহের মধ্যে নিজের স্থান করিয়া লইয়াছে এবং জাতীয় জীবনে নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছে।

বহু শতাব্দী ধরিয়া শ্যামদেশে যে নৃপতিগণ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এই ধারণা পোষণ করিতেন যে তাঁহারা দৈবশক্তি ও দৈব অধিকারের প্রতীক এবং সেজন্য রাজ্য-শাসন বিষয়ে সাধারণ প্রজার কিছুমাত্র অভিমত অথবা অধিকার তাঁহারা গ্রাহ্য করেন নাই। বস্তুতঃ ইহাই সেই যুগের রীতি এবং ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্বে সাধারণ ফরাসীর জীবন যেরূপ তুর্ব্বিষহ ছিল, শ্যামদেশের জনসাধারণ তাহা অপেক্ষা কোনপ্রকারেই আপনাকে অধিকতর সুখী জ্ঞান করিতে পারে নাই। ক্রমে এই অশিক্ষিত, তুঃস্থ এবং উৎপীড়িত প্রজাবৃন্দ ধীরে ধীরে বুঝিতে পারিল যে রাজ্য-শাসন ব্যাপারে আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত না হইলে তাহাদের উন্নতির আর কোনও আশা নাই এবং সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে যাহা হইয়াছে—সেই বিদ্রোহী জনমতের বিরুদ্ধে রাজশক্তিকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল।



মানচিত্রে শ্যামদেশের পরিচয়

আট বৎসর পূর্ব্বে, ১৯৩২ খৃঃ অব্দের জুন মাসে শ্যামরাজ প্রজাধিপক স্বেচ্ছায় স্বীয় রাজশক্তি ও অধিকার প্রজাদের হাতে তুলিয়া দিলেন। শ্যামদেশের জাতীয় জীবনে উন্নতির নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হইল !

কিন্তু দেশবাসী রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিলেও তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে অনুরূপ উন্নতি সাধিত হইল না। দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্যের সর্ব্ববিধ উপসর্গ জাতীয় উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় হইয়া রহিল এবং শ্যামদেশের বর্ত্তমান পররাষ্ট্র-সচিব লুয়াঙ্ প্রোদিতের অধীনে পুনরায় দেশে বিদ্রোহ জাগিয়া উঠিল।

সৌভাগ্যবশতঃ শ্যামরাজ প্রজাধিপক ফরাসীদেশের ষোড়শ লুই-এর পন্থা অবলম্বন না করিয়া এই বিদ্রোহের স্বপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। নৃপতিদিগের ইতিহাসে যে স্বার্থত্যাগ ও উদারহৃদয়তা দুর্ল্লভ, তাহারই পরিচয় দিয়া তিনি আপন প্রজাদের প্রতি সমস্ত ভার অর্পণ করিলেন এবং স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে জীবনের বাকি অংশ অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার রাজ্যত্যাগ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবং একমাত্র প্রজাদের সন্তোষ বিধানের জন্যই তিনি ইহা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মহারাজ আনন্দ মহিদল, ১৯৪১ খৃঃ অব্দে ১৬ বৎসরে পদার্পণ করিলে রাজসিংহাসন লাভ করিবেন। তিনি সুইটজারল্যাণ্ডে শিক্ষিত এবং মাত্র ১৯৩৮ সালে সর্ব্বপ্রথম স্বদেশে আগমন করেন। শ্যামরাজ প্রজাধিপকের রাজ্যত্যাগের পর হইতে প্রধান মন্ত্রী লুয়াঙ্ পিবুল ধীরে ধীরে অতি বিচক্ষণতার সহিত স্বদেশকে উন্নতির পথে চালিত করিয়া আসিয়াছেন। ম্যাপে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে এই ক্ষুদ্র দেশটি একদিকে বৃটিশ-সাম্রাজ্য ও অন্যদিকে ফরাসী সাম্রাজ্য ইন্দো-চীনের মধ্যে অতি সঙ্কটজনক ভাবে অবস্থিত। এই দুই বিরাট শক্তির প্রভাব সত্ত্বেও শ্যামদেশ আপন ইচ্ছা অনুসারে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছে।


শ্যামদেশের রণসজ্জা


বিমানধ্বংসী কামান

শ্যামদেশ জাপানের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতাসূত্রে আবদ্ধ এবং তাহার রাজ্যশাসনপ্রণালীতেও এই ঘনিষ্ঠতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই দেশের অধিকাংশ রাজপুরুষই জাপানী ; জাপানের সাহায্যে শ্যামদেশের অস্ত্র শস্ত্র ও সমরোপকরণের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। আপন শক্তির অনুপাতে ইহাদের

সৈন্যবাহিনী, নৌশক্তি এবং সামরিক বিমান বিভাগ গড়িয়া উঠিয়াছে। শ্যামদেশ বহুবিধ খনিজ পদার্থের অধিকারী এবং ইহার মধ্যবর্ত্তী সমতলভূমিতে প্রায় বিনা ক্লেশে চাউল উৎপন্ন হইয়া থাকে। শতকরা নব্বুই জন দেশবাসী কৃষিকর্ম্মে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে কিন্তু শ্যামদেশের অধিকাংশই গভীর অরণ্যে পরিপূর্ণ এবং উহা বন্যহস্তী, ব্যাঘ্র এবং বহুবিধ বন্যজন্তুর বাসস্থান।

কিম্বদন্তী আছে যে, শ্যামদেশ শ্বেতহস্তীর আবাসস্থল কিন্তু বাস্তবিক শ্বেতহস্তী প্রকৃতির বিপর্য্যয় ব্যতীত দুর্ল্ভ এবং শ্যামদেশে শ্বেতহস্তীর আবির্ভাব বিশেষ মঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া সূচিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য শ্বেতহস্তীর আবির্ভাব হইলেই তৎক্ষণাৎ রাজসরকারে সংবাদ প্রেরণ করা হয় এবং উহা রাজসম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইয়া থাকে।


শ্যামদেশের কৃষক পরিবার— ইহারা নিজস্ব প্রথায় ধান ভানিতেছে

শ্যামদেশ বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত দেশ এবং শ্যামসভ্যতা প্রায় সম্পূর্ণ ভাবেই প্রাচীন ভারত হইতে আমদানী করা হইয়াছিল। ভারতীয় ধর্ম্ম, দর্শন, কৃষ্টি ও সভ্যতার নিদর্শন শ্যামদেশের জাতীয় আচার ব্যবহারে এবং সামাজিক ও ধর্ম্মজীবনে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। শ্যামদেশে প্রায় চারিশত মন্দির আছে এবং তাহার মধ্যে উষার মন্দির অথবা Temple of Dawnই বহুখ্যাত; এই দেশে অসংখ্য বৌদ্ধ পুরোহিত বর্ত্তমান।

বর্ত্তমানে এই দেশ আধুনিক সভ্যতা লাভ করিয়াছে। ইহার পুরাতন নাম অধীনতার পরিচায়ক বলিয়া গত জুন মাসে সরকারী ভাবে 'শ্যামদেশ' এই নাম পরিত্যাগ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহা থেইল্যাণ্ড নামে অভিহিত। শ্যামদেশের বর্ত্তমান উন্নতির পরিচয় এই সঙ্গে যে ছবিগুলি দেওয়া হইল তাহার মধ্য দিয়া কিয়দংশ পাওয়া যাইবে।



য়ুরোপে দ্বিতীয় মহাসমর

শ্রী—

যুরোপের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ গোড়ায় গোড়ায় তেমন জমিয়া উঠে নাই। সিনেমা হলে এবং রেস্তরাঁয় বসিয়া আমরা সমস্ত ব্যাপারটিকে একটা চরম ঠাট্টা বলিয়াই ধরিয়া লইতেছিলাম; কোনো চতুর ব্যঙ্গচিত্রী ছবি আঁকিলেন, মাজিনো ও সিগ্‌ফ্রিডের নির্ধূম কামানের নলে বসিয়া যুরোপীয় শান্তির প্রতীক ঘুঘুপাখী প্রচুর শুষ্ক তৃণের সাহায্যে বাসা বাঁধিতেছে। আজ সেই প্রজ্বলিত শুষ্কতৃণের প্রচুরতর ধূমে জগতের আকাশ আচ্ছন্ন।



জার্মাণীর নূতন অস্ত্র,—প্যারাশুট সৈন্য

সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে বিস্ফোরণ আনিবার মত প্রচণ্ড সমরানল প্রথম জ্বলিল ফ্ল্যাণ্ডার্সে। জার্মানির যুদ্ধরথ, আকাশ-পোত এবং দুর্ধর্ষ পদাতিকদল সেখানে যাহা করিয়াছে, বাংলা সংবাদপত্রের ভাষায় তাহাকে একটি নরমেধ যজ্ঞ বলা চলে। মিত্রবাহিনী সেখানে বীরত্বপূর্ণ সৈন্য-অপসরণ ব্যতীত বিশেষ কিছুই করিতে পারে নাই। যুদ্ধের ইতিহাসে ফ্ল্যাণ্ডার্স যুদ্ধের স্থান কতখানি উচ্চে হইবে তাহা এখন বলা কঠিন, কারণ বর্তমান মহাযুদ্ধ এখনো চলিতেছে। ফ্ল্যাণ্ডার্স-এর সঙ্গে সঙ্গে বেল্‌জিয়ামের লিওপোল্‌ড্‌ আত্মসমর্পণ করিলেন; তাহাতেও মিত্রপক্ষের বলহানি ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সাময়িক ভাবে বেল্‌জিয়াম্‌ নিশ্চিত ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচিয়াছে সম্ভবতঃ এই আশার ছলনায় লিওপোল্ড রণে ভঙ্গ দিয়াছেন।

লিওপোল্‌ডের আত্মসমর্পণের পর হইতেই আট্‌লান্টিক উপকূলে মিত্রবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইল; 'ডান্‌কার্ক' বন্দর জার্মান বোমায় বিধ্বস্ত হইল; এবং হতাবশিষ্ট মিত্রবাহিনী চরম দুর্দশার মধ্যে জাহাজে করিয়া ইংলণ্ডে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলিতেছেন, এরূপ গৌরবময় আত্মরক্ষা ইতিহাসে বিরল ঘটনা। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ইহাকে A. clossal military disasterই বলিয়াছেন। ডান্‌কার্ক-এর পর হইতেই ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ-মহলে জয়াশা সম্বন্ধে হতাশা দেখা দিয়াছিল। ইহার অল্পদিনের মধ্যেই শত্রুবাহিনী দুর্বার গতিতে প্যারিস্‌ অভিমুখে অগ্রসর হয়। অবশেষে ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মশিয়ে রেনো প্যারিস পরিত্যাগের সংকল্প করিলেন, যুরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্রভূমি আজ প্রায় সত্তর বৎসর পরে বিজেতার পদতলে দলিত হইল। প্যারিস যদি যথাসময়ে পরিত্যক্ত না হইত, তাহা হইলে সেই নগরীর ভাগ্যে যাহা ঘটিত তাহা সহজেই কল্পনা করা যায়। ধ্বংসস্তূপে পরিণত না হইয়া সেই সুরম্য নগরী এখন স্বস্তিকলাঞ্ছিত পতাকাতলে শোকমন্থর শান্ত জীবনযাপন করিতেছে।

গত ১০ই জুন মুসোলিনী পতনোন্মুখ ফ্রান্সের উপর আক্রমণের বাসনা প্রকাশ করিলেন। বহুদিন পূর্বেই নগ্নপদ, নিরস্ত্রকল্প, কৃষ্ণকায় আবিসিনীয়েরা ইতালীয় মারণাস্ত্রের কবলে স্বাধীনতা



হের হিটলারের ও ফিল্ড মার্শাল গোয়েরিংএর নাৎসী সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত আলোচনা

বিসর্জন দিয়াছে; কিছুদিন পূর্বে আল্‌বানীয়াও ইতালীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছে। এখন তাহার বহুবাঞ্ছিত, টিউনিসিয়া, কর্সিকা, জিবুতি এবং নিস্‌ দখলের সুযোগ আসন্ন। অতএব জার্মানির প্রবল সহায়তায় সে যুদ্ধে নামিল। দুইদিক হইতে যুগপৎ আক্রান্ত, বিধ্বস্ত ফ্রান্‌স্‌ রোম-বার্লিনীয় বাহিনীর কাছে পরাভব স্বীকার করিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী রেনো হার মানিয়া লইতে অসম্মত হইয়া পদত্যাগ করিয়াছেন। নূতন সৈনিক মন্ত্রী মার্শাল পেতঁ্যা রোম ও বার্লিন সকাশে যে "সৈনিকোচিত শান্তির" আবেদন জানাইয়াছিলেন, কিছু বিলম্বের পর সম্মিলিত শত্রু-শক্তি তাহা গ্রাহ্য করিয়াছে। উভয় রাষ্ট্রের সহিত স্বতন্ত্রভাবেই সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে। ফলে আজ ফ্রান্‌স্‌ শত্রুহস্তের ক্রীড়নকে পরিণত। তাহার অর্দ্ধাংশেরও অধিক ভূমিভাগ অনির্দিষ্ট কালের জন্য জার্মান্‌ বাহিনীর অধিকারে থাকিবে; তাহার শাসনতন্ত্র বার্লিন্‌ হইতেই নির্দিষ্ট হইবে, এবং যুদ্ধাবশিষ্ট রণসম্ভার জার্মানির সাহায্যে নিয়োজিত হইবে। প্রসাদ হইতে রোমও বাদ পড়ে নাই; তাহার নানা সুবিধার মধ্যে ভূমধ্যসাগরীয় ফরাসী বন্দরে অধিকার প্রাপ্তি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাই হইল মার্শাল্‌ পেতঁ্যার সৈনিকোচিত সম্মানজনক সন্ধি। এই সন্ধির ফলে জার্মানি পেতঁ্যা-শাসিত ফ্রান্‌স্‌কে তাহার পূর্বতন যুদ্ধসঙ্গীর বিরুদ্ধেই রণসম্ভার যোগাইতে বাধ্য করিবে সন্দেহমাত্র নাই। ইংলণ্ডের প্রতি নিরপরাধ সাধারণ ফরাসী শত্রুভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবে ইহাই হইল বর্ত্তমান যুদ্ধের একটি পরম শোচনীয় দিক। সুখের বিষয়, পরাজিত পোল্‌, ওলন্দাজ এবং ডাচ্‌দিগের ন্যায় বহু ফরাসী এই অপমানসূচক সন্ধিকে অমান্য করিতে বদ্ধ-পরিকর; বহু ফরাসী উপনিবেশ হইতেও প্রবল প্রতিবাদ উঠিয়াছে।

শেষ পর্য্যন্ত কী হইবে, অদূর ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। ঘটনার চাপে মানুষের চরিত্র রাষ্ট্রগত-ভাবেও কতদূর পরিবর্তিত হয়, ব্রিটেনের পক্ষ হইতে প্রস্তাবিত ইঙ্গ-ফরাসীয় একরাষ্ট্রীকরণের প্রস্তাব তাহার প্রমাণ। আজ পেতঁ্যা বলিয়াছেন ফরাসীর আত্মসমর্পণ ভিন্ন গতি নাই, কিন্তু অন্যদিকে

ফরাসী বীর জেনারেল ডে গোল্ আজ পরাজিত স্বদেশের লুপ্তগৌরব পুনরধিকারের আশায় ফরাসী নৌশক্তি এবং অবশিষ্ট ফরাসীশক্তি আহরণ করিয়া ইংলণ্ডকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে যত্নবান হইয়াছেন। তাঁহার শ্রম ও অধ্যবসায় সফল হইলে জগতের ইতিহাসে তাঁহার দান অসাধারণ হইয়া থাকিবে।



মার্শ্যাল পেতাঁ

ভীষণ শত্রুর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আজ নিতান্ত একাকী। দক্ষিণ আফ্রিকীয় জেনারেল্ হার্টজগের জার্মানপ্রীতিও ব্রিটেনের বিশেষ অসুবিধার কারণ হইবে বলিয়া আশংকা হয়। সম্প্রতি আমেরিকার বৈমানিক কর্ণেল্ লিণ্ডবার্গও আমেরিকাকে নিরপেক্ষ থাকিবার যে উপদেশ দিয়াছেন তাহাও উল্লেখযোগ্য। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদলের চাপে পড়িয়া প্রেসিডেণ্ট্ রুজ্‌ভেল্‌ট্‌ও আশ্বাসবাণী ব্যতীত বিশেষ কিছু সাহায্য ব্রিটেনকে পাঠাইতে পারিতেছেন না, ইদানীং তিনিও বিপদ বুঝিয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছেন এবং Munroe Doctrine ভঙ্গ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ বর্তমানে আমেরিকায় দেখা যাইতেছে না।

কলিকাতাস্থ ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ পত্রিকার সম্পাদক, বহু ভারতবর্ষীয়ের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া রোটারি-ক্লাবে সম্প্রতি যে বক্তৃতাটি করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ যে আমেরিকার জনসাধারণ, যুদ্ধের পূর্ব্বে যে সমস্ত বৃটিশ প্রচারক সে দেশে গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বড় একটা আমোল দেয় নাই; সম্পাদক মহাশয়ের ধারণা, নেহেরু এবং শাস্ত্রীপ্রমুখ ভারতীয় বাগ্মীরা যদি ভারতের 'ডোমিনিয়ন্ ষ্টেটাস্' লাভের পর সেখানে গিয়া অস্ত্রসম্ভার সংগ্রহের জন্য আবেদনমূলক বক্তৃতা করিয়া আসেন, তবে আমেরিকার হৃদয় কথঞ্চিৎ কোমলতর হইতে পারে। ইহার যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে আমরা অক্ষম। কারণ অপরের প্রাণে সহানুভূতি অপেক্ষা নিজে টিকিয়া থাকাই এখন আমেরিকার পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয়। বিশেষ আমেরিকার সহানুভূতির মূল্য কতদূর তাহা আমরা জানি না!

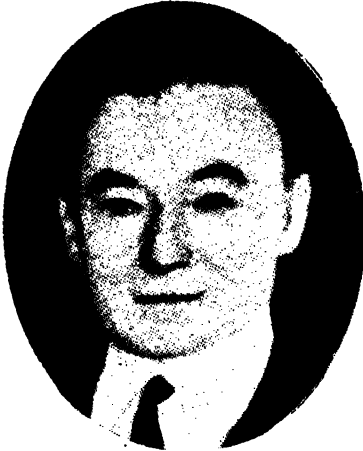


জেনারল ওয়াগাঁ

বর্ত্তমানে ডানকার্কের যুদ্ধের পর যে ক্ষণবিশ্রাম চলিতেছে তাহা আসন্ন ঝড়ের পূর্ব্বে ক্ষণিক বিশ্রাম বলিয়া অনেকে মনে করেন। তবে সুখের কথা এই যে জার্মানীর পক্ষে ইংলণ্ডে সেনাবাহিনী পাঠাইয়া বৃটিশসাম্রাজ্য চূর্ণ করা হয়ত ততটা সুখসাধ্য হইবে না। বিশেষ করিয়া ইংলণ্ড এখন সম্ভব এবং অসম্ভব সর্ব্বপ্রকার বিপদেরই বিরুদ্ধে লড়িবার আয়োজনে তৎপর। তবে ফরাসীজাতির রণত্যাগ এবং আত্মসমর্পণ যাহা বিশেষ অতর্কিতভাবে ঘটিয়াছে এবং যুদ্ধ ব্যাপারে ফ্রান্সের সম্মিলিত চেষ্টার অভাবেই ঘটিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস—

তাহা ইংলণ্ডকে যৎপরোনাস্তি বিপদে ফেলিয়াছে। এই অবস্থায় যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তন করা কি দুঃসাধ্য ব্যাপার তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারিবেন। যে অসীম সাহস ও নিষ্ঠার প্রয়োজন তাহার পরিচয় দিয়া ইংলণ্ড জগতে পুনরায় শান্তি স্থাপন করুক ইহাই প্রার্থনীয়।

প্রধান রণাঙ্গনে যুদ্ধ বিরতি হইলেও ছোটখাট ঘটনার অভাব নাই। বৃটিশ ও ইতালীয় উপনিবেশ সমূহে আঠার রকমের শক্তি পরীক্ষা চলিয়াছে। রুশিয়া আজ রুমানিয়ার সাম্রাজ্যভার লাঘব করিতে ব্যস্ত। বেসারেবিয়া এবং পার্শ্ববর্ত্তী দেশ আজ তাহার অধিকারে। রুমানিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে এই ব্যবস্থা মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে, তবে বলকানের দিকে রুশিয়ার এই অভিযান জার্ম্মানী ও ইতালীর কতটা সুখকর হইবে তাহা বলা কঠিন। হয়ত এই দুই শক্তির সহিত পূর্ব্বেই মীমাংসা করিয়া রুশিয়া তাহার পূর্ব্বরাজ্য অধিকারে অগ্রসর হইয়াছে কিন্তু যেখানে সকলেই প্রতিবেশী শক্তিকে ভীতি ও সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে, সেই স্থলে পরস্পরের মধ্যে আপোষ মীমাংসা কতদূর স্থায়ী ও বিশ্বাসযোগ্য তাহা বলা কঠিন। বলা বাহুল্য লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ লইয়া রুশিয়া ও জার্ম্মানীতে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইলে তাহা ইংলণ্ডের পক্ষে পরম সুবিধাজনক হইবে।



ভূতপূর্ব্ব ফরাসী প্রধান মন্ত্রী রেণো

প্রাচ্যেও ঘটনার অভাব নাই। সুবিধা বুঝিয়া জাপান এসিয়াতে মনরো নীতি পালন করিবার অজুহাতে বৃটিশ ও ফরাসী উপনিবেশ সমূহের প্রতি ক্রমশঃ অধিকতর মনঃসংযোগ করিতেছে। আজ ফরাসীর পক্ষে ইন্দোচীন রক্ষা করিবার শক্তি বা সামর্থ্য নাই। পশ্চিমে রণাঙ্গনে যে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়িতে হইতেছে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া সম্ভবতঃ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারে যথেষ্ট শক্তিপ্রয়োগ করিতে পারিবেন না। এবং সুদূর সমুদ্রে আসিয়া এই শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা আমেরিকার পক্ষেও কতখানি সম্ভবপর হইবে তাহা বলা কঠিন। সকল দিক দিয়াই আজ ভাগ্যবিধাতা এসিয়াতে মনরো নীতির সহায়তা করিতেছেন।

যে সকল অভাবনীয় ও অসম্ভব বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া যুগ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে আজ তাহার বহু লক্ষণ বর্ত্তমান। এই সন্ধিক্ষণে কোনও নীতি অথবা পূর্ব্ব চিন্তিত ধারা অনুসারে দেশ ও সভ্যতার উত্থান পতন ঘটেনা, সম্পূর্ণ অতর্কিতে এবং প্রলয়ের মধ্য দিয়া এই পরিবর্ত্তন আসিয়া থাকে। বর্ত্তমানে ঘটনা যেরূপ দ্রুতগতিতে ও অচিন্তনীয় ভাবে চলিতেছে, তাহাতে এই যুগ সম্পূর্ণ হইয়া আবার যে কোন নূতন যুগ কি ভাবে দেখা দিবে তাহা কে জানে!

——:——

স্বপ্ন

শ্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ

ফাল্গুন মাসের একদিন শেষ বেলায় কাজলদীঘির কাল জল মৃদু বাতাসে নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছিল—তাহারই শানবাঁধান ঘাটে দাঁড়াইয়া তখন রেণু একমনে কত কী ভাবিয়া চলিয়াছিল। বাংলা দেশের আঠার বৎসরের মেয়ের মনোরাজ্যে যত আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আশঙ্কা জুড়িয়া বসিতে পারে, রেণুর মন তার সব গুলিতেই ছিল পরিপূর্ণ। রেণু তাই একমনে একের পর এক ভাবিয়া চলিয়াছিল—বাবা আজ তিন দিন হইল লক্ষ্মীপুর গিয়াছেন—কালই তো ফিরিবার কথা ছিল কিন্তু আজ এ পর্য্যন্তও ফিরিলেন না কেন? তবে কি সেখানে পাকা কথা হইয়া গেল! তাহা হইলে কিন্তু বেশ হইত। বাবা বলেন, ছেলেটি নাকি দেখিতে শুনিতে দিব্যি! আবার কলেজেও পড়ে—মস্ত বড় অবস্থা বাড়ীতে দালান কোঠা পুকুর। কিন্তু বাবা তাদের অত টাকা দিবেন কি করিয়া? তারা যে নগদ হাজার টাকার কমে কিছুতেই রাজি হইবে না। হাজার টাকা! বাবা বলেন—বাড়ীঘর জমিজমা সব বিক্রি করিলেও এই দিনে হাজার টাকা যোগাড় করা যাইবে না। কিন্তু ওরা অত চায় কেন? টাকা না দিলে কি ছেলের বিয়ে হয় না? টাকাই বড়, মেয়ের দাম কি এক কানা কড়িও নয়? এই তো সে দিন সুষমার বিয়ে হলো—কেমন দিব্য ফুট্-ফুটে বরটি! ওদের কিন্তু একটি পয়সাও দিতে হয় নাই। সেই তো সুষমার বাবা, কিছু গহনা আর কিছু যৌতুক দিলেন—ওরাও নাকি তার বেশী আর কিছু চায় নাই। আচ্ছা, সা'দের মেয়ের বিয়েয় যদি টাকা না দিতে হয় তবে বামুনদের মেয়ের বিয়েয় টাকা লাগবে কেন? সুষমার বর সেদিন তাহাকে চিঠি দিয়াছে—ছেলেটি দিব্যি বিনাইয়া বিনাইয়া লিখিতে পারে। সুষমা না লিখিয়া লিখিয়াছে—"প্রাণের সু"—কত রসিকতা ঠাট্টা তামাসা করিয়াছে—বেশ আছে সুষমা। একমনে কতক্ষণ ধরিয়া এমনি ভাবিয়া চলিয়াছে সে। শূন্য কলসীটি পায়ের কাছে রহিয়াছে পড়িয়া—জল লইবার কথাই গিয়াছে সে ভুলিয়া। হঠাৎ কি একটা শব্দে রেণু পিছন ফিরিয়া তাকাইল—দেখিল সুষমা ঠিক তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। এতক্ষণে সে একেবারে খিল খিল করিয়া হাসিয়া রেণুর গায়ের উপরে হেলিয়া পড়িল।

—কি ভাবছিলি ভাই এতক্ষণ ধরে?

—কই ভাবছিলাম?

—না, কিছু কি আর ভাবছিলে? অমনি অমনি শ্রীরাধিকা যমুনার ঘাটে এসে কলসী ফেলে হা পিত্যেশ করে তাকিয়ে আছেন!—বুঝি লো—সব বুঝি।

—আ মর্; কি আবার তুই বুঝলি বল্‌তো?

—তোর মনের কথা।

—আমার আবার মনের কথা কি?

—তবে শোন, বলিয়া সুষমা তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—যে কেষ্ট ঠাকুর দুদিন বাদে আস্‌বেন তাঁরই কথা ভাবছিস্ তো?

—দুর মুখপুড়ী! কে আসবে বলতো? বলে—মাথা নেই তার মাথা ব্যথা। নিজের স্বপ্ন বুঝি পরকে দেখাস্—তুই রাত দিন ঐ ভেবেই মরিস কিনা!

—সে আর মিথ্যে কথা কি লো। বিয়ের আগে-থাকতেই তো তাকে ভাব্‌তে সুরু করেছি—তুই যেমন ক'রে আজ ভাবছিস্!

—বিয়ের আগে কেমন ক'রে ভাবতিস ভাই? কার কথা ভাবতিস আর পেলি কাকে?

—কেন যাকে ভাবতাম—তাকেই তো পেয়েছি। আহা কি আমার ন্যাকা, কিছুই যেন জানেন না।

—সে কেমন করে হয় ভাই? তুই রহস্য করছিস নে বল?

—রহস্য কি লো!

—তবে যাকে কোন দিন দেখিস নাই—তাকে ভাবতিস কি করে?

—ওখানে যখন বিয়ের কথা হয়—তখন তো শুনেছিলাম সব—ওর চেহারার কথা—ওদের বাড়ী ঘরের কথা। সেই সব শুনে তখন থেকেই ভাব্‌তে সুরু করেছিলাম। একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখি কি, আমি যেন তাদের কোঠা-ঘরে তারই পাশে শুয়ে আছি। ঘুম ভেঙ্গে আমার কী যে ভাল লাগ্‌লো!

—কিন্তু সে যে আর কেউ নয়, তা জানলি কেমন করে!

—জান্‌তে পারা যায় লো—তুইও জানবি। সেদিন স্বপ্নে যাকে দেখেছিলাম, আমি জানি সে আমার স্বামী-ছাড়া আর কেউ নয়। আমার তো আজও মনে আছে—তার সেই ভাসা ভাসা চোখ, টিক্‌লে নাক, মাথায় কোঁকড়ান চুল আর কারও নয়—ওরই। আজ আমার কথা না বুঝলেও বিয়ের পরে সব বুঝবি ভাই—দেখ্‌বি মনে প্রাণে যেমনটি চেয়েছিস, তেমনটিই পেয়েছিস।

—কি জানি ভাই যদি তাই হয়, তবে কেউ কেউ এত দুঃখ কষ্ট পেয়ে ভুগে মরে কেন বল্‌তে পারিস? ওপাড়ার সুধার কথা ভাবতো—আহা বেচারীর কি দুঃখ! তার বর তাকে মার-পিট করে, শাশুড়ী ননদ কেউ দেখতে পারে না—এবার রোগে ভুগে একেবারে শুকনো কাঠিটি হ'য়ে ফিরে এসেছে। এমন কেন হয়?

—তারা মনে প্রাণে চাইতে জানেনা ভাই—জান্‌লে এমন হতো না।

—কি জানি ভাই—তোর মত করে আমি এসব বুঝতে পারিনে। ইহাদের সকল আলোচনা আজিকার মত এখানেই বন্ধ হইয়া গেল। রেণুর পিসিমা ঝড়ের মত আসিয়া গর্জ্জিয়া পড়িলেন—বলি, এতক্ষণ ধরে ঘাটে বসে কি দরবার হচ্ছে শুনি? ওদিকে যে মা ডাকাডাকি ক'রে গলা ফাটালে—তা কি মেয়ের কাণে গেল?

রেণু তাড়াতাড়ি কলসী ডুবাইয়া বাড়ীর দিকে পা বাড়াইল। কোন এক গল্পের বইতে রেণু পড়িয়াছিল—"রাজপুত্র তাহার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া রওনা হইলেন—দৈত্যপুরীতে বন্দিনী রাজকন্যার উদ্দেশ্যে। তারপর কতকষ্টে কত কৌশলে রাজকন্যার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শিয়রে রূপার কাঠি আর পায়ের দিকে সোণার কাঠি দিয়া দৈত্যেরা রাজকন্যাকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছিল। রাজপুত্র শিয়রের

কাঠি পায়ের দিকে আর পায়ের কাঠি শিয়রে আনিয়া রাখিলেন—অমনি রাজকন্যার ঘুম ভাঙ্গিল। তারপর দুই জনে হইল পরিচয়। পরিচয় শেষে দাঁড়াইল ভালবাসায়। তারপর কত কৌশলে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় নিজের পাশে রাজকন্যাকে বসাইয়া নিজের রাজ্যে উড়িয়া আসিলেন।" রেণুর মনে সমস্ত গল্পটা একেবারে জীবন্ত হইয়া ভাসিয়া উঠিল। রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে, হুস্‌হুস্ করিয়া রাত্রি বারোটার ট্রেণ তাহাদের গ্রামের ষ্টেশনে আসিয়া থামিল।

—এখন তো আর পক্ষীরাজ ঘোড়া হয় না। হয়ত একদিন এই গাড়ীতে চড়িয়াই তাহার রাজপুত্র আসিবে—সঙ্গে আসিবে আরও কত লোক। বাজনা বাজিবে কত লোকজনের আনাগোনা হইবে তাদেরই মাঝে বিবাহের পরের দিন সে তাহার বরের সহিত গিয়া গাড়ীতে চাপিবে—ট্রেণ হুস্‌হুস্ করিয়া ছুটিয়া চলিবে। ভাবিতে ভাবিতে কখন রেণু ঘুমাইয়া পড়িল—ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিল সেই কলেজের ছেলে চমৎকার তাহার দেহশ্রী—তাহাদের কোঠা বাড়ী, ঘর পুষ্করিণী!

সকালবেলা উলুধ্বনি শুনিয়া রেণু ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল। উলুধ্বনি কিসের? বাহিরে তাহার পিতার কণ্ঠস্বর শুনা গেল—"এত সহজে কাজটা হবে তা কখনও ভাবিনি।"

পিসিমা বলিলেন—"যাক্ এখন ভগবানের ইচ্ছায় ভালয় ভালয় দুই হাত এক হলে বাঁচি।" রেণু খাটের উপর বসিয়া বসিয়া সব শুনিতে লাগিল—ঘুমের ঘোর তখনও তাহার ভাল করিয়া কাটে নাই। বাবা ফিরিয়া আসিয়াছেন, মা উলুধ্বনি দিতেছেন—তাহা হইলে বোধ হয় ওখানেই সব ঠিক্ হইয়া গিয়াছে —ভাবিতেই রেণুর বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল—অসহ্য পুলকে তাহার সারা অঙ্গ ভরিয়া গেল, খাট হইতে নামিয়া অতি সন্তর্পণে আসিয়া দরজার আড়ালে দাঁড়াইল—দুই কান বাহিরের প্রতিটি কথার জন্য রহিল উন্মুখ হইয়া।

মা বলিলেন—কিন্তু এত সহজে যে ওরা রাজি হলো?

বাবা বলিলেন—আরে ছেলের বাপ কি সহজে রাজি হয়—পরশু সারাটা দিন গিয়েছে তো কেবল ফর্দ্দ শুন্‌তে শুন্‌তে—হেন চাই তেন চাই। বিয়ে তো একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল আর কি। বলে নেহাত সাতশ টাকার কমে আর ছেলের বিয়ে দেবে না। আমিতো একেবারে জবাব দিয়ে দিলাম—টাকা আমি দিতেই পারবো না—কিছু গহনা নিয়ে যদি হয় তবেই পারি। তারপরে, বুঝলে দিদি,—ছেলে তার একেবারে বেঁকে বস্‌লো। সত্যেন নাকি বলেছিল, এখানে তার বিয়ে না হলে আর বিয়েই কোরবে না। এক ছেলে তাই না বাপ্‌কে রাজি হ'তে হ'লো।

মা বলিলেন—ছেলেটির নাম বুঝি সত্যেন?

—হাঁগো, হাঁ। কিন্তু আসল কথাই তো এখনও বলা হয়নি। ও এসে আমাদের রেণুকে দেখে গেছে—তাই না এত টান এখানে। টান্ হবে না? এমন মেয়ে শ'তের ভেতর কয়টা মেলে শুনি?

পিসিমা বলিলেন—দেখে গেছে? ওমা, সেকি কথা—আমরা কিছু জানলাম না!?

—তোমরা জান্‌বে কি ক'রে? সে গোপনে এসেছিল—কা'ল সব কথা শুন্‌লাম—পাকা কথা হবার পর বেয়াই সব ভেঙ্গে বললে। ওপাড়ার আমাদের নরেন আর সত্যেন এক সঙ্গে কলেজে পড়তো। নরেনের বাড়ীতে একদিন বেড়াতে এসে—সত্যেন রেণুকে দেখে গেছে। নরেনইতো তাই এখানে কাজের কথা তুলেছিল—নইলে আমরা কি কেউ জানতাম!

অমন ছেলে হয় না দিদি—কি চেহারা, কি স্বভাব—বি, এ, পড়ছে—মস্ত বাড়ী—কত জমিজমা! বিয়ে হলে তোমরা দেখো, আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে—বলিতে বলিতে হরনাথ আনন্দে গর্ব্বে একেবারে স্ফীত হইয়া উঠিলেন। পিসিমা মাকে ডাকিয়া বলিলেন—"ও বউ, আজ মঙ্গলবার, মা মঙ্গলচণ্ডীর পূজোর যোগাড় কর।"

রেণুর বুকের ভিতরে কে যেন হাতুড়ি পিটিতেছিল—সারা মুখ চোখ ক্ষণে ক্ষণে উঠিতেছিল রাঙা হইয়া।—সে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া গিয়াছে—অথচ সে কিছুই জানিতে পারে নাই—আচ্ছা দুষ্টু তো! রেণুর মনে হইতেছিল, এখনই একবার সুষমার নিকটে ছুটিয়া যায়, গিয়া বলে ভাই তোর কথাই ঠিক—সত্যি সত্যি যাহাকে মনে প্রাণে ভাবা যায়, সে কি না আসিয়া পারে?

মা ডাকিতে ডাকিতে ঘরের ভিতরে ঢুকিলেন—ওমা রেণু ওঠ মা। রেণু তাড়াতাড়ি লজ্জায় দরজার আড়াল হইতে সরিয়া আসিল। মা হাসিয়া বলিলেন—যা মা, হাতমুখ ধুয়ে আয়—আজ আর সকালে কিছু মুখে দিস নে—মা মঙ্গলচণ্ডীর পূজো হলে খাস।

আজ ২৮শে ফাল্গুন, রেণুর বিবাহের দিন। সারাটা বাড়ী ভরিয়া আত্মীয় কুটুম্ব গিস্ গিস্ করিতেছে। হরনাথের বরপণ কিছু দিতে হয় নাই, কাজেই এদিকে একটু স্বচ্ছল ভাবে খরচপত্র করিতেছেন। আজ রেণু সেই কোন ভোর বেলায় উঠিয়া চাট্টি দই খই খাইয়াছে—তারপর আরতো সারাটা দিন কিছু খাওয়া নিষেধ। সেই সকাল হইতেই আজ ছোট বড় সকল মেয়েরা তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। শুধু তাহার জন্যই বিশেষ করিয়া আজিকার এই সমারোহ—তাহারই হইবে বিবাহ—একাধারে বিদ্যায় বুদ্ধিতে, রূপে, গুণে অলঙ্কৃত যে বর, যাহার আগমন-প্রতীক্ষায় আজ সারা বাড়ী, সমস্ত আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে—সেই হইবে তাহার একেবারে নিজস্ব। এই উৎসব—এই সমারোহ, তাহার বড় ভাল লাগিতেছিল। বৌদিদের ঠাট্টা বিদ্রূপ আজ আর তেমন গায়ে লাগিতেছে না—রেণু হাসি মুখে সমস্তই সহ্য করিতেছিল—তাহার ভালই লাগিতেছিল। এমন দিন জীবনে আর আসিবে না—রেণুর ইচ্ছা হইতেছিল এই দিনটি চিরদিনের মত ধরিয়া রাখিয়া দেয়।

বিকাল ৫টার গাড়ীতে বর আসিবে—সময় প্রায় হইয়া আসিল। বাদ্যকর ও পাল্কী বেহারা সঙ্গে করিয়া আত্মীয় স্বজনেরা ষ্টেশনে রওনা হইয়া গিয়াছেন। ওধারের ঝাউ গাছটায় বাতাস লাগিয়া মাঝে মাঝে সাঁ সাঁ শব্দ হইতেছিল,—রেণু বারে বারে সেই শব্দে চমকিয়া উঠিতেছিল—ঐ বুঝি ৫টার গাড়ী ষ্টেশনে আসিয়া থামিল।

একেবারে ঠিক সময়েই ৫টার গাড়ী ষ্টেশনে আসিয়া ঢুকিল। কন্যাপক্ষীয়েরা গাড়ীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিতে লাগিল। বর কই—বর কই—বর? কিন্তু বৃথা চেষ্টা,—বর নাই, বরযাত্রী নাই, অন্য ২।১ জন যাত্রী ছাড়া কেহই গাড়ী হইতে নামিল না। যুবকেরা তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত কামরা খুঁজিয়া দেখিল। মিনিট তিনেক পরে গাড়ী বাঁশী বাজাইয়া ছাড়িয়া গেল। প্লাটফরমে কন্যাযাত্রীরা হায় হায় করিতে লাগিল। হরনাথ প্লাটফরমের উপরে একেবারে অসাড়ের মত বসিয়া পড়িলেন—তাঁহাকে ঘিরিয়া একটি ভিড় জমিয়া উঠিল। সেই ভিড় ঠেলিয়া একটি লোক আগাইয়া আসিয়া বলিতে লাগিল—"সর্ব্বনাশ হ'য়েছে মশায়—আমি

লক্ষ্মীপুর থেকে আস্‌ছি খবর নিয়ে। আজ সকালে বর যাত্রা করে আস্‌বে এমন সময় পুলিশ এসে সত্যেনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে—অর্ডিন্যান্সে করেছে তাকে বন্দী। ওদিকে সত্যেনের বাপ মা তো একেবারে পাগলের মতো হয়েছেন। আমি এলাম আপনাদের খবর দিতে।"

সংবাদ শুনিয়া হরনাথ একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। বিদ্যুৎগতিতে সংবাদ আসিয়া বাড়ীতে পৌঁছিল। রেণুর মা, পিসিমা কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির কাণ্ড করিয়া তুলিলেন। এক নিমিষে মন্ত্রবলে যেন সমস্ত কোলাহল—লোকজনের চীৎকার, হৈ চৈ একেবারে নিশ্চুপ হইয়া গেল। রেণু ঘরের ভিতরে পাথরেগড়া মূর্ত্তির মতো বসিয়াছিল। এই এতক্ষণ ধরিয়া তাহাকে ঘিরিয়া, কতনা কোলাহল, হাসি তামাসা চলিতেছিল এখন আর কেহই নাই—তাহাকে একা ফেলিয়া একে একে কে কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে। কোথা দিয়া কি হইয়া গেল—সে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। তাহার সমস্ত শরীর অবশ হইয়া আসিতেছিল—মাথার ভিতরে করিতেছিল—ঝিম্ ঝিম্। সে শুইয়া পড়িতে পারিলে বাঁচিয়া যাইত। এই আনন্দের পরে—এই বিপদ, সে একা সহ্য করিতে পারিতেছিল না—কিন্তু কেহ তো আর তাহার নিকটে আসিতেছে না—কেহ একটা সান্ত্বনার বাণীও উচ্চারণ করিতেছে না! এইতো একটু আগে সুষমাকে দেখা গেল, কিন্তু সে একটা কথাও না বলিয়া মুখ নীচু করিয়া চলিয়া গেল। সে একটু কাঁদিয়া লইতে পারিলে বাঁচিয়া যাইত—কিন্তু সে কি বলিয়া কাঁদিবে—কিই-বা মনে করিবে, আর সকলে!

এদিকে হরনাথের তো আর বসিয়া থাকিবার উপায় নাই—দণ্ড যে হাহুতাশ করিবেন সে সময়ই বা কই? আজ রাত্রের মধ্যেই যে দিতে হইবে মেয়ের বিবাহ—তাহা না হইলে যে জাত যাইবে—সমাজে হইবে দুর্ণাম—এ মেয়ের আর বিবাহই হইবে না। সমাজের কয়েকজন মাথা লইয়া পরামর্শ-সভা বসিল। অনেক পরামর্শ ও গবেষণার পর অবশেষে উপায় একটা স্থির হইল। ওপাড়ার যাদব চক্কোত্তি সম্প্রতি বিগতপরিবার হইয়াছেন—তিন চারটি ছেলে মেয়ে লইয়া বেচারা বড়ই অসুবিধায়ও পড়িয়াছেন সকলে মিলিয়া তাহাকে ধরিয়াই রাজি করান হইল। প্রৌঢ় যাদব আঠার বৎসরের মেয়ে, রেণুর বর নির্ব্বাচিত হইলেন। অসহায় ছাগশিশুর মতো নিরুপায় রেণু, যূপকাষ্ঠে গলা বাড়াইয়া দিল। বিবাহ প্রথম লগ্নেই হইয়া গেল—বাজনা আর তেমন বাজিল না—লোকজনের কোলাহল হইল না—এ যেন আঁধারে লুকাইয়া লুকাইয়া কি একটা গোপন কাজ সম্পন্ন হইল।

বাসর ঘর। বাসর ঘরের হাসি ঠাট্টা উৎসব কিছুই কিন্তু হয় নাই—উৎসাহী মেয়েরা কে কোথায় যে চলিয়া গিয়াছে—কাহারও আর কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। মেয়ে জামাইকে সকলে শান্তিতে ঘুমাইতে দিয়া সরিয়া পড়িলেন—দুই একজন বৃদ্ধা দিদিমা শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া ছিলেন—রাত একটু বাড়িতেই তাঁহারাও রণে ভঙ্গ দিলেন।

রাত প্রায় একটা—প্রৌঢ় যাদব অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার কাঁচা পাকা মাথার চুলগুলা বাতির আলোয় চিক্ চিক্ করিতেছে—রেণু এক মুহূর্ত্ত সেই দিকে তাকাইয়া ভয়ে একেবারে শিহরিয়া উঠিল। একি হইল! এই কি তাহার পক্ষীরাজ ঘোড়ার রাজপুত্র—যে গিয়াছিল বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার করিতে? না, সে স্বপ্ন দেখিতেছে? তাহার সারা বুকখানার ভিতরে সে একটা অসহ্য বেদনা অনুভব করিতে লাগিল—

মাথা ঘুরিতে লাগিল। নাঃ, সে আর কিছুই ভাবিতে পারিতেছেনা। রেণু উঠিয়া জানালার ধারে আসিয়া জানালাটা খুলিয়া দিল। সমস্ত বাড়ীখানা একেবারে খাঁ খাঁ করিতেছে—কোথাও একটা জন মানবের সাড়া পর্য্যন্ত নাই! ওকি? বাহিরে কে যেন ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে না? তাই তো! রেণু দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল—ঠিক তাই তো—মা-ইত ও ঘরের বারান্দায় বসিয়া কাঁদিতেছেন।

তাহাকে দেখিয়া মা দু চোখ্ মুছিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বলিলেন—"একি মা, তুই বাইরে এলি কেন? যা মা, ভিতরে যা—বাইরে আসা আজ দোষ।" রেণুর দুই চোখ বাহিয়া তখন অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল। মা, তাহাকে জোর করিয়া ঘরের ভিতরে ঠেলিয়া দিয়া দরজা টানিয়া দিলেন।

রেণু জানালার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল—বাহিরে আজ কী জ্যোৎস্না! রেণু জানালার শিকের উপরে মাথা ঠেকাইয়া কতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—তাহার সমস্ত দেহমন ছাইয়া যেন তন্দ্রার ঘোর নামিয়া আসিল—একে একে মনে পড়িল সেই রাজপুত্রের কথা—যে গিয়াছিল বন্দিনী রাজকন্যার উদ্ধারের জন্য—তাহার সেই পক্ষীরাজ ঘোড়া—সুন্দর চেহারা। তন্দ্রায় জাগিয়া উঠিল—সেই দিনের স্বপ্নে দেখা সেই সুন্দর মুখ, চোখ!





সম্পাদকীয়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

ফ্লাণ্ডার্সের যুদ্ধে মিত্রশক্তির পরাজয় ঘটিয়াছে, ইটালী যুদ্ধে যোগদান করিয়াছে এবং ফ্রান্স রণে ভঙ্গ দিয়া শত্রুর সহিত শান্তি স্থাপন করিয়াছে—ইহাই ইয়ুরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বর্ত্তমান অধ্যায়। আমাদের দেশে এই যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট। সেনাপতি ও মন্ত্রীগণ কি কি ভুল করিয়াছেন, কি করিলে আরো ভালো হইত এবং ভবিষ্যতে কি করিলে ঐ সব ভুলের প্রতিকার হইবে তাহা সকলেই বলিয়া দিয়াছেন; এমন কি, প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্র মন্থন করিয়া এ সম্বন্ধে অনেক নির্ভুল ব্যাপার আমরা পুর্ব্বাহ্নেই জানিয়া ফেলিয়াছিলাম। কিন্তু মাত্র কয়েকদিনের যুদ্ধেই যে ফ্রান্স আত্মসমর্পণ করিবে ইহা অনেকের সম্ভব অথবা অসম্ভব কল্পনার মধ্যেও আসে নাই।

কিন্তু মাত্র কল্পনা করা হয় নাই বলিয়াই যে কোনও দুর্ঘটনা ঘটিবে না এরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বেশী নাই। সুতরাং সেই নীতি অনুসরণ করিয়া আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে এই যুদ্ধের ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্বন্ধে নির্বাক থাকাই নিরাপদ। তবে ইংরাজ জাতির সহিত আমাদের ভাগ্য জড়িত, আমরা ভরসা করি এবং সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাই চাই যে, এই যুদ্ধে ইংরাজ জয়লাভ করুক কারণ অন্যথা সকলকে প্রভূত ক্ষতি ও অন্যায় সহ্য করিতে হইবে। এস্থলে ইংরাজের বিরোধিতাপূর্ব্বক উৎকট দেশভক্তি না দেখাইয়া আমরা যে তাহাদের সহায়তা করিতেছি, ইহা আনন্দের কথা কারণ ইংরাজ অপেক্ষা জার্ম্মাণ যে আমাদের অধিকতর হিতৈষী একথা মনে করিবার বিন্দুমাত্র কারণ নাই।

ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া ও শ্রীকৃষ্ণ

সম্প্রতি উক্ত দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক, মিঃ এটকিন্‌সন, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে বহু বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আর আলোচনা বাড়াইবার প্রয়োজন নাই, তবে আমরা ইহাই বলিতে পারি যে এই উক্তি করিয়া ঐ পত্রিকা স্বাভাবিক নির্বুদ্ধিতার পরিচয়ই দিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা অনেক লঘু অপরাধে কলিকাতায় শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সেনকে হত্যা করা হইয়াছিল।

তবে আমাদের টাউন-হল ও করপোরেশন ভিন্ন গতি নাই, সুতরাং গভীর অধ্যবসায়ের সহিত ঐ দুই স্থানে মিটিং, রেজুলিউসন এবং জ্বালাময়ী বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে। এ সামান্য ব্যাপার পুর্ব্বেই শেষ

করিলে ভাল হইত। Grierson সাহেব তাঁহার পুস্তকে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধাকে লইয়া যে বৈষ্ণব সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার ভাষাকে "Language of the brothel"এর সহিত তুলনা করিয়াছেন। অবশ্য এই ভাষার বিচার বিলাতী আদর্শে হইবে কিনা, তাহা স্বতন্ত্র কথা, তিনি বলিয়াছেন। তবে অশ্লীল তুলনাই যদি আপত্তিকর হয়, তাহা হইলে এই ব্যাপারে আমরা কতটুকু আপত্তি জানাইয়াছিলাম ?

ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফলাফল

গত ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফলাফল বাহির হইয়াছে। মহিলারা, এ বৎসর পরীক্ষায় বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছেন ইহা অত্যন্ত আনন্দের কথা। তবে এসম্বন্ধে পুরুষ পরীক্ষার্থীর দিক হইতেও কিছু বলিবার আছে।

যেভাবে ইয়ুনিভার্সিটি এই পরীক্ষার ফলাফল বিচার করিয়া থাকেন তাহাতে মহিলা ও পুরুষদের স্বতন্ত্র লিষ্ট বাহির হওয়া উচিত। ইহার প্রধান কারণ এই যে, মহিলাদিগের পক্ষে যাহা পরীক্ষার বিষয়, পুরুষদের পক্ষে তাহা নহে। রন্ধন, সেলাই, সঙ্গীত, ইত্যাদি অনেক বিষয় মহিলারা লইতে পারেন এবং বলা বাহুল্য এই সকল বিষয় যেভাবে পরীক্ষা করা হইয়া থাকে, তাহা পুরুষদের বিষয় অথবা পরীক্ষা প্রণালী হইতে ভিন্ন, এবং তাহা হওয়াই স্বাভাবিক। এস্থলে অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ ইয়ুনিভার্সিটি যে প্রথা অবলম্বন করিয়া থাকেন সেই অনুসারে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলাদিগের ভিন্ন তালিকা প্রকাশ করাই যুক্তিসঙ্গত। ইহাতে মহিলারা শিক্ষালাভব্যাপারে যে উৎসাহ পাইয়া থাকেন, তাহা কিছুমাত্র ব্যাহত হইবে বলিয়া মনে করিনা।

মিউনিসিপ্যাল বিল

নূতন মিউনিসিপ্যাল বিলের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। এই বিলের উদ্দেশ্য কলিকাতা করপোরেশনের হাত হইতে সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার সরাইয়া লওয়া, গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কোনও সরকারী কর্ম্মচারীকে চীফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসারের পদে নিয়োগ করা এবং মূলতঃ করপোরেশনকে সরকারী বিভাগ বানাইয়া তোলা। এই নূতন বিল আনিবার কারণ এই যে, কলিকাতা করপোরেশন নিজ ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেছেন এবং তাহাদের কাজকর্ম্ম মোটেই সন্তোষজনক নয়।

অবশ্য কলিকাতা করপোরেশন যেভাবে কাজকর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন এবং যেসব বহুবিধ অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে, তাহা সত্যই অত্যন্ত লজ্জার কথা! ইহার আমূল পরিবর্ত্তন হওয়া প্রয়োজন কিন্তু এইভাবে নূতন আইন না করিয়া, মাত্র Supersede করিয়াই গভর্ণমেণ্ট নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারিতেন। করপোরেশন যে ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত সেই ব্যবস্থাতে কোনও গলদ নাই; যদি ব্যক্তিবিশেষের অথবা কোনও বিশেষ ব্যক্তিমণ্ডলীর অক্ষমতায় এবং অপরাধে কাজকর্ম্ম খারাপ হইতে থাকে, তাহা হইলে কয়েক বৎসরের জন্য গভর্ণমেণ্ট কার্য্যভার নিজহাতে লইলেই যথেষ্ট হইত। মিউনিসিপাল ব্যাপারে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভাবে সরকারের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নহে, বিশেষ আজকাল যে প্রথায় সরকারী চাকরীতে কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হয়, সেই রীতি অনুসারে অবশেষে বাহির হইতে চীফ্ এক্সিকিউটিভ্ অফিসারের পদে কোনও মুসলমান আমদানী করা হইবে কি না, এই ভাবিয়া আমরা শঙ্কিত আছি।

হল্‌ওয়েল্‌ মনুমেণ্ট

সম্প্রতি কলিকাতায় হল্‌ওয়েল্‌ মনুমেণ্ট লইয়া কিছু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই স্মৃতি-চিহ্নটি ড্যালহৌসি স্কোয়ারে অবস্থিত এবং "অন্ধকূপ হত্যা" বলিয়া যে উপাখ্যানটি চলিত আছে এবং যাহা শিশুকালে স্কুলে আমাদের যত্নসহকারে শিখানো হইয়াছিল, ইহা তাহারই সহিত জড়িত। গত ৩রা জুলাই 'সিরাজুদ্দৌল্লা দিবস" ঘোষিত হইয়াছিল। ঐ দিনটির উদ্দেশ্য নাকি হিন্দু মুসলমানের মিলনের চেষ্টা এবং তৎসঙ্গে ঐ স্মৃতি চিহ্নটি ধ্বংস করা।

এ সম্বন্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই তবে অধুনা বঙ্গদেশে এতগুলি বিভিন্ন 'দিবস' চলিত আছে, যে বৎসরে মাত্র তিনশত পঁয়ষট্টি দিনে কুলাইবে কি, না, সে বিষয়ে সন্দেহ! বিশেষ করিয়া গভর্ণমেণ্ট শীঘ্রই ঐ স্মৃতিচিহ্নটি অপসারিত করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সুতরাং এক্ষেত্রে এই বিষয়টির জন্য আর অত্যধিক শক্তি, অথবা সময় নষ্ট করা যুক্তিসঙ্গত নহে। বর্ত্তমান দেশে যে অবস্থা তাহাতে এই শক্তি ও সময় অন্য কোনও দিকে নিয়োগ করিলে অধিকতর লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে করি।

রবীন্দ্রনাথের গান

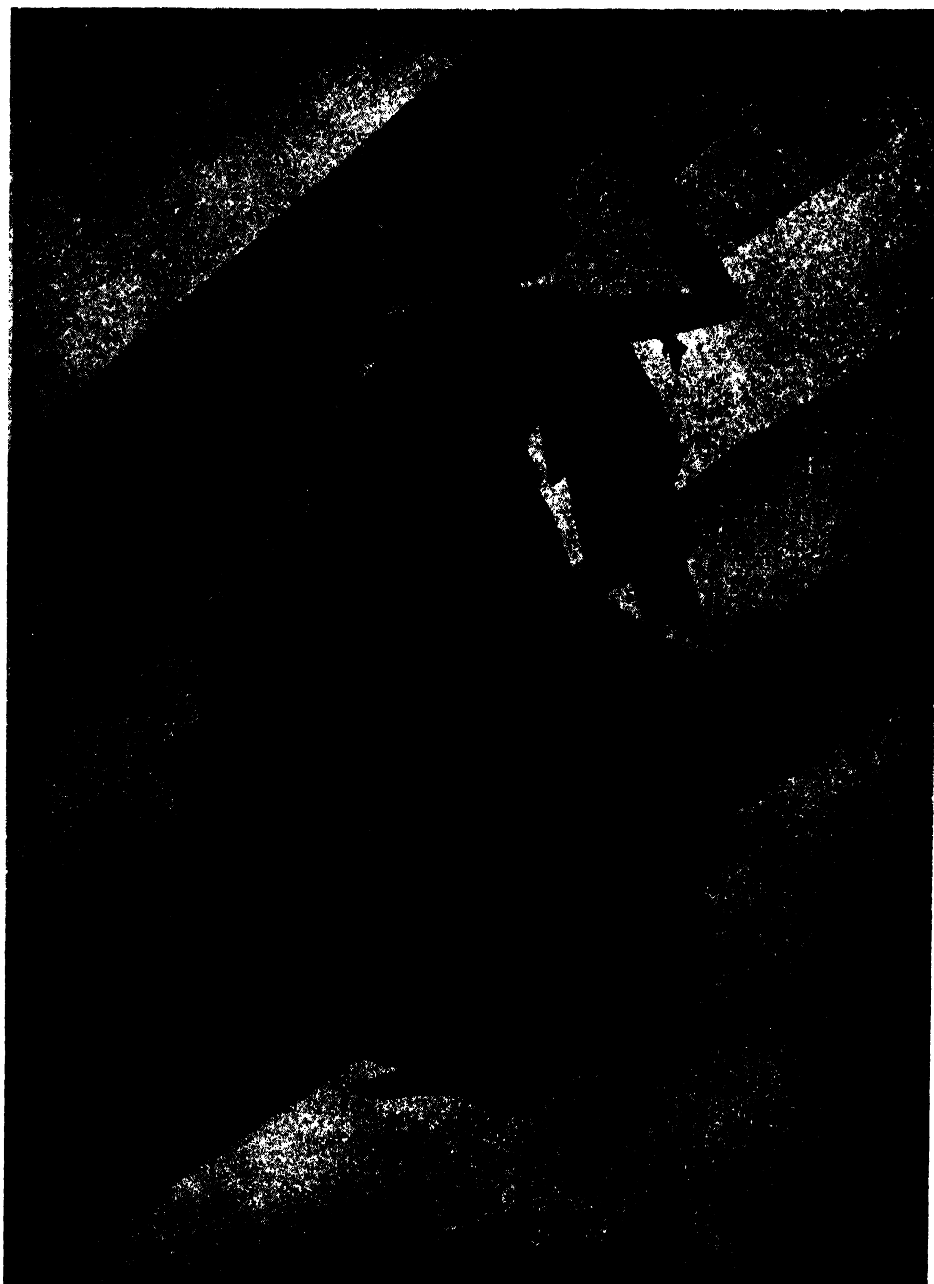
সম্প্রতি কবি রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করিয়াছেন যে তাঁহার রচিত গানগুলি লইয়া যথেচ্ছাচার চলিতেছে। ইহার ফলে তাঁহার গানগুলিতে যে নিজস্ব ভঙ্গী ও মাধুর্য্য ছিল তাহা নষ্ট হইতে বসিয়াছে। অবশ্য ভিন্ন সুরে গাহিবার ফলে এই গানগুলির সৌন্দর্য্য যে কোনও ক্ষেত্রেই বজায় থাকিবে না এরূপ আশঙ্কা আমাদের নাই, কারণ তাঁহার সঙ্গীত গুলির বৈশিষ্ট্য যে কেবলমাত্র সুরেই তাহা নয়, কথাতেও। তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে এই অত্যাচারের ফলে লাভের অপেক্ষা ক্ষতির আশঙ্কা বহু-পরিমাণে অধিক। এই অত্যাচারকে রবীন্দ্রনাথ অপাত্রে কন্যা সমর্পণের সহিত তুলনা করিয়াছেন। আমরা মনে করি অপাত্রে কন্যা সমর্পণ ত বটেই, তাহার অপেক্ষাও অধিকতর সঙ্কটাপন্ন ব্যাপার হইতে পারে!



এই সংখ্যায় "জ্যোতিষী বঙ্কিমচন্দ্র" নিবন্ধে ভুলক্রমে ই, বি, রেলওয়ের স্থলে বি, এন, রেলওয়ে লেখা হইয়াছে।

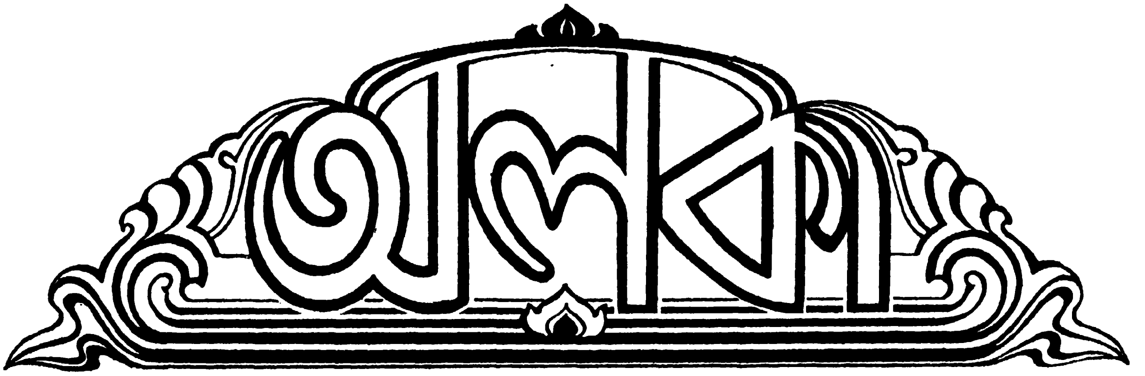
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সরকার কর্ত্তৃক সম্পাদিত

শ্রীকৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ২৫৯নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীপ্রমথনাথ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও ৩৬।১ এল্‌গিন রোড হইতে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত



রামধনু নৃত্য

শিল্পী—শ্রীসুধীরকুমার রায়



দ্বিতীয় বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩৪৭ { ১১শ সংখ্যা

এসিয়া ও ইয়োরোপ

ইয়োরোপে এমন অনেক মনীষী আছেন, যাঁহাদের পক্ষে আর ইয়োরোপীয় সভ্যতা যথেষ্ট নয়; ইয়োরোপের জীবন ও চিন্তাধারার মাঝে পড়িয়া আজ তাঁহাদের আধ্যাত্মিক জীবনের মৃত্যু ঘটিয়াছে। যে দেশ আজ তাঁহাদের স্থায়ী সম্পদ্ কিছু দিতে পারিল না, যেখানের ধর্ম্ম ও কৃষ্টি আজ তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনের অসম্পূর্ণতা ও গ্লানি হইতে রক্ষা করিতে পারিল না, সেই দেশের মধ্যেই আজ আর তাঁহাদের দৃষ্টি আবদ্ধ নহে। মুক্তির জন্য আজ তাঁহারা অন্যত্র শান্তি খুঁজিতেছেন—সেই দেশ এসিয়া!

ইয়োরোপে আজ যাহারা অন্ধকারের যাত্রী, বাঁচিবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় আজ যাহারা আদিম অসভ্য বর্ব্বর জাতির ন্যায় অপরকে হত্যা করিতেছে তাহাদের এখন কে রক্ষা করিতে পারে? যে এসিয়া সহস্র সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লইয়া বিরাজমান, যেখানে যুগে যুগে শান্তি, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচারিত হইয়াছে আজ সেই মহাদেশ তাহাদের রক্ষা করুক!

এ কথা সত্য যে ইয়োরোপ কখনো এসিয়াকে অবহেলা করে নাই। যুগে যুগে তাহাদের দেশবাসী এসিয়ার গহন অরণ্যে, প্রান্তরে, নদীবক্ষে ও পর্ব্বত-চূড়ায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে, কিন্তু তাহা কি মাত্র নিজের স্বার্থ অন্বেষণেই ঘটে নাই? যখনই ধর্ম্ম অথবা সভ্যতা প্রচারের অজুহাতে লুণ্ঠন ও আত্মসাৎ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে, তখনই দলে দলে বিদেশী এদেশে আসিয়াছেন, কেহ বা প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন কেহ বা রত্ন আহরণ করিয়া নিজে ও নিজের দেশকে লাভবান্ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু কোন্ রত্নের সন্ধান তাঁহারা পাইয়াছেন অথবা অন্বেষণ করিয়াছেন? যে গভীর অন্তরের সম্পদ্ এসিয়ার সম্পূর্ণ নিজস্ব, তাহা তাঁহারা কতটুকু চাহিয়াছেন? তাঁহাদের আহরিত সম্পদ্ আজিকার ইয়োরোপের এই ঘোর দুর্দিনে তাহাদের কতটুকু রক্ষা করিতে পারিয়াছে?

একথা সত্য যে ক্বচিৎ কখনও মুষ্টিমেয় দর্শকের দল অথবা সত্যান্বেষী এই মহাদেশে আসিয়াছেন এবং এসিয়ার অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার হইতে শিক্ষালাভ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় মাত্র কতজন?

তাঁহাদের কথায় ইয়োরোপের জনসাধারণ কতটুকু কর্ণপাত করিয়াছে—তাঁহাদের দ্বারা ইয়োরোপের আধ্যাত্মিক জীবনের কতটুকু উন্নতি ঘটিয়াছে ?

আজ ইয়োরোপে যাহারা জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত, আজ যাহাদের পক্ষে রুগ্ন শিশু ও অসহায় দেশবাসীকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছে কি ভারতবর্ষ ও চীনদেশের চারি সহস্র বৎসরের পুরাতন সভ্যতা ও শিক্ষায় আজ তাহারা কোনও শান্তি লাভ করিতে পারে কি না ? যে সংক্রামক ব্যাধি আজ তাহাদের দৈনন্দিন জীবন ও তাহাদের আত্মাকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে, সেই ব্যাধিকে নিরাময় করিবার মতন কোনও সম্পদ্ এই মহাদেশ তাহাদের দান করিতে পারে কি না ? যাহারা বারে বারে সত্যের দ্বারদেশে আসিয়া নিষ্ফলে ফিরিয়া গেল, যাহাদের স্বাভাবিক কর্ম্মপ্রেরণা এই সত্য ও এই জ্ঞানকে বাস্তব জীবনে অপূর্ব্ব সহায়রূপে পরিণত করিতে পারিত, কিন্তু পারিল না, তাহাদের মতন দুর্ভাগ্য আর কে আছে ?

কিন্তু ইহাই সব নয়। আজ ইয়োরোপের সংস্পর্শে আসিয়া এসিয়া নিজ কৃষ্টি ও নিজ আদর্শ হারাইতে বসিয়াছে ! এই দুই মহাদেশের সমন্বয়ে জগতে যে উন্নততর সভ্যতা ও শান্তি স্থাপিত হইতে পারিত আজ সে সুযোগ বিলুপ্তপ্রায়। আজ এই ধ্বংসের হাত হইতে এসিয়াকে রক্ষা না করিতে পারিলে ইয়োরোপের কি গতি হইবে ? এসিয়ার পতনে যে তাহাদেরও পতন অনিবার্য্য এই সত্য এত সুস্পষ্টরূপে আর কবে দেখা দিয়াছে ?

আজ এসিয়ার সভ্যতা ও আদর্শে যে তাহাদের কোনওরূপ প্রয়োজন থাকিতে পারে—একথা উদ্ধত ইয়োরোপ মনে করে না। যে এসিয়াকে শত শত বৎসর ধরিয়া ইয়োরোপ পদদলিত করিয়াছে—যে দেশ হইতে তাহারা আপন অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছে মাত্র, কিন্তু ইহা ব্যতীত যাহাদের প্রতি আর কোনও উল্লেখযোগ্য দান নাই, সেই এসিয়াই ঐ সংক্রামক ব্যাধির সংস্পর্শে আসিয়া যে অবশেষে তাহাদের পৃথিবী হইতে লুপ্ত করিয়া দিতে পারে—একথা কয়জনে ভাবিয়াছে ? বিজয়ী বর্ব্বরগণ রোমের নিকট পরাজিত হইয়াছে—গ্রীক সভ্যতার অভ্যুদয়ে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছে—তেম্নি করিয়া এসিয়ার উত্থানে ইয়োরোপের পতন যে ঘটিবে না একথা কে বলিতে পারে ?

বহু শতাব্দীর আক্রমণ ও অত্যাচারে আমাদের জাতীয় ও সামাজিক জীবনে দোষ ত্রুটি আসিয়াছে একথা সত্য ; ইয়োরোপের পার্থিব শক্তি ও কর্ম্মপ্রেরণার প্রয়োজন আজ আমাদের ঘটিয়াছে, কিন্তু পার্থিব সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়াও যে জাতি আজ অন্তর্লোকে একান্ত দীন ও নিঃসহায় সেই জাতিকে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার মতন ক্ষমতা আজ কাহার আছে ? *

* রোমাঁ রোঁলার প্রবন্ধের উপর ভিত্তি করিয়া এই রচনা লেখা হইয়াছে :

সহযাত্রিণী

শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বর্দ্ধমান যাবার রাজপথ দিয়ে একটি গরুর গাড়ী চলেছে, ভারতবর্ষের পথপ্রান্তর জুড়ে লক্ষ লক্ষ গরুর গাড়ী যেমন ভাবে চলে তেম্নি মন্থরগতিতে এঁকে বেঁকে চলেছে। রাজা গণেশ যখন বাংলার রাজা তখন গ্রামের পথ দিয়ে গরুর গাড়ী যেভাবে যেত, সম্রাট আক্‌বর যখন দিল্লীর সিংহাসনে অথবা মুর্শিদ কুলি খাঁ যখন মুর্শিদাবাদে সুবেদার তখন বর্দ্ধমানের এই পথ দিয়ে রাতের অন্ধকারে গরুগুলি যেমন ঘুমের ঘোরে গাড়ী টানত, চাষা-চালক যেমন ঝিমোতে ঝিমোতে গাড়ী চালাত, তেম্নি তন্দ্রা-ভরা চোখে পথের দিকে না চেয়ে গরুগুলি পিঠের বোঝা টানতে টানতে সামনে এগিয়ে চলেছে; মাঝে মাঝে গাড়ীতে বোঝাই-করা খড়ের গন্ধে চঞ্চল হয়ে জোরে ছুট্‌ছে, আবার মন্দগতিতে চলেছে; হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে চালকটির ঘুম মাঝে মাঝে ভেঙে যাচ্ছে, গরুগুলিকে গালাগাল দিয়ে সে আবার খড়ের গাদায় ঠেস দিয়ে আরামে ঝিমোচ্ছে। ষ্টিভেন্‌সন্ যে ষ্টীম ইঞ্জিন তৈরি করেছেন, আমেরিকায় এডিসনের জন্ম হয়েছিল, ফোর্ড মোটর গাড়ী নির্ম্মাণ করছেন—পৃথিবীর এসব ঘটনা বাংলার এ গরুর গাড়ী চালকের জীবন-ব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তন করতে পারেনি। রাতের অন্ধকারে তারার আলোয় সে সনাতন গরুর গাড়ীতে বসে ঝিমোচ্ছে, গরুর গাড়ী চলছে মন্দগতি

চাষাটির নাম গদাধর মণ্ডল। সে শুধু ঝিমোচ্ছে না, সে ঝিমোতে ঝিমোতে ভাব্‌ছে। সে ভাব্‌ছে টাকার কথা। গায়ে জাপানী ছিটের হাত-কাটা ফতুয়া, পরণে হাটে-কেনা আট-হাতি বোম্বে মিলের মোটা ধুতি; হাতে একটা লাঠি গোঁজা। খড়গুলি বেচ্‌তে সে বর্দ্ধমান চলেছে।

গদাধর ভাব্‌ছে, খড় বেচে সে কত টাকা পেতে পারে। ষ্টেশনের কাছে এক দোকান আছে, সেখানে বেচলে কিছু বেশী পাওয়া যেতে পারে, তিন চার আনা বেশী ত হবেই, কিন্তু সেদিকে যাওয়া চলবে না। সেদিকে রামহরি পোদ্দারের দোকান তার কাছে ধার রয়েছে; খড়ের গাড়ী দেখলে আটক করে বসতে পারে। খড়গুলি রাতারাতি বেচে বর্দ্ধমান ছাড়তে পারলেই সুবিধে; রামহরির সঙ্গে আবার পথে দেখা হয়ে না যায়!

অথচ উকিল বাবুর সঙ্গে একবার দেখা করে না আসতে পারলে হবে না। সালিশী-বোর্ড ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝতে পারছে না। সেটা নাকি খুব সুবিধের, দেনার টাকা কিছুই দিতে হবে না, শুধু একটা দরখাস্ত হাকিমের কাছে,—দেখাতে হবে তার কিছু নেই। এদিকে উকিল বাবু দেড় টাকার কম কথা কইবেন না বলেছেন। তা হলে ত খড় বেচে—

গাড়ীর চাকা এক গর্ত্তে পড়ে যাওয়াতে গদাধর ঝাঁকুনী খেয়ে চোখ মেলে চাইলে, গরু দু'টোকে গালাগাল দিয়ে উঠ্‌ল।

গরুর গাড়ির পর গরুর গাড়ি পার হয়ে গণেশ হালদার তার মোটরকার হাঁকিয়ে চলেছে। সুবৃহৎ নীল নতুন-কেনা মোটরকার, লম্বা সুচোলো বনেট গণ্ডারের দাঁতের মত; রাত্রের আলোছায়ায় গাড়ীটাকে কালো দেখাচ্ছে, যেন একটা বন্যবরাহ ক্ষেপে ছুটে চলেছে

গণেশ সাধারণতঃ নিজে গাড়ী চালায় না। কারণ সে আস্তে গাড়ী চালাতে পারে না। মোটর গাড়ী যদি ঘণ্টায় ষাট সত্তর মাইল বেগে না যায়, তা'হলে ঘোড়ার গাড়ীর সঙ্গে প্রভেদ রইল কি! বর্ত্তমান জগতে বাঁচতে হলে জীবন উপভোগ করতে হলে স্পীড্ চাই, এই তার মত। শান্ত ছন্দে মধুর ভাবরসাভিষিক্ত হয়ে চলা নয়, চাই উদ্দাম গতি, নটরাজের নৃত্যের ছন্দ, বন্যার স্রোতের মত উচ্ছল চঞ্চল জীবন।

গণেশকে টাকা রোজগার করতে হয়নি। তার পিতৃপিতামহগণ পাঁচ পুরুষ ধরে যে টাকা জমিয়ে গেছেন, বহু বৎসর সঞ্চিত ধনরাশি সে এখন স্পীডের সঙ্গে খরচ করে চলেছে। সে বলে, live intensively, live dangerously—অনুভব কর তুমি বেঁচে আছ বর্ত্তমান যুগে।

গণেশকে দেখ্‌লে লক্ষপতি যুবক বলে মনে হয় না। লম্বা পাৎলা চুলগুলি উস্কোখুস্কো, মাথার মাঝখানে টাকের আভাস; চওড়া কপালে কয়েকটি ক্ষতের চিহ্ন; লম্বা ফোলা মুখ শুক্‌নো, যেন রক্তহীন; মাঝে মাঝে গণ্ডে যে দীপ্তি দেখা যায়, সেটা অস্বাভাবিক কারণে; কালো কাচ-ভরা সোণার ফ্রেমের চশমা, দুই ঠোঁটের প্রান্ত রেখা কালো হয়ে গেছে, মুখের বাঁদিকে একটা সিগারেট সব সময়ই জলছে। স্থূলদেহ, অত্যধিক বিয়ার পানের ফল। গায়ে সিল্কের গলা-খোলা সার্ট অথবা লংক্লথের পাঞ্জাবী; পরণে দেশী জরি-পাড় ময়লা ধুতি, জরি-পাড় দেশী ধুতি ছাড়া সে পরে না, কিন্তু সব সময় ময়লা; পায়ে মাদ্রাজী স্যাণ্ডেল।

কলিকাতার পথে সে নিজে গাড়ী চালায় না। তা'ছাড়া তার গাড়ী বন্ধু বান্ধবেরা প্রায়ই নিয়ে চলে যায়, তাকে ঘুরতে হয় ট্যাক্সিতে।

সে সন্ধ্যায় গণেশ নিজে গাড়ী চালিয়ে চলেছে, তার কারণ, সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী মধুরা শিপ্রা তার সঙ্গিনী। শিপ্রাকে নিয়ে সে বোম্বে চলেছে।

ইতিহাসটি এইরূপ: কোন বন্ধুর প্রমোদ উদ্যানে নিশীথ উৎসবে শিপ্রাকে নাচ্‌তে দেখে গণেশ মুগ্ধ হয়ে গেছল। শিপ্রা সুন্দরী নয়, রং কালো, মেয়েরা যাকে বলে, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। কিন্তু মুখচোখের গঠন বড় নিখুঁত, পাথরে খোদাই-করা গ্রীকমূর্ত্তির মত, প্রতি রেখা উজ্জ্বল, স্পষ্ট; দীর্ঘ তনুলতা, কখনও পদ্মনালের মত নুয়ে পড়ে, কখনও অগ্নিশিখার মত কাঁপে।

শিপ্রাকে গণেশ পেলে না। কোন সিনেমা কোম্পানীর ডিরেক্টারের প্রেমাস্পদা সে। গণেশ বুঝলে, এর মধ্যে ব্যবসাদারি আছে। মুগ্ধতা আরও গভীর হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে বোম্বের কোন সিনেমা-কোম্পানী এক নতুন ফিল্মে অভিনয় করবার জন্য শিপ্রার সঙ্গে চুক্তি করেছে। কলিকাতা হতে মস্ত দল যাচ্ছে। ট্রেণে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

গণেশ শিপ্রাকে বল্লে, চলো আমার সঙ্গে, মোটরকারে তোমায় বোম্বে পৌঁছে দেব।

শিপ্রা প্রথমে রাজী হয়নি। গণেশ বল্লে, আচ্ছা, এই নতুন মোটরকার, তুমি যদি এ গাড়ী করে যাও আমার সঙ্গে বোম্বে পর্য্যন্ত এ গাড়ী তুমি উপহার পাবে।

শিপ্রা ভাবলে, ফিল্ম কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি ত হয়ে গেছে; ম্যানেজারের ব্যবস্থা অনুসারে যে ট্রেণেতেই যেতে হবে, তার কোন কারণ নেই। কাউকে না জানিয়ে সে গণেশের সঙ্গে চলে গেল বারাকপুরের বাগান বাড়ীতে। বোম্বেতে ঠিক সময়ে পৌঁছে সবাইকে অবাক্ করে দেবে। ইতিমধ্যে চারিদিকে খোঁজাখুঁজি চলুক। কাগজে বাহির হোক, চুক্তিপত্র সই করে অভিনেত্রী অন্তর্হিতা।

গণেশ বল্লে, সিগারেটটা আবার নিভে গেল, ধরিয়ে দাও ত।

শিপ্রা বল্লে, ওটা ফেলে দাও, একটা নতুন ধরিয়ে দিচ্ছি।

—দেখত, পকেটে সিগারেট আছে কিনা।

গণেশের পকেটে সব সময় একটা বড় গোল সিগারেটের টীন ও দেশলাই থাকে।

সিগারেটের টিন বাহির করে শিপ্রা বল্লে, দুটো আছে।

—আচ্ছা, ওইতেই চলবে। বর্দ্ধমান আর বেশীদূর হবে না।

গণেশ গাড়ীর গতি আরও বাড়িয়ে দিলে। শিপ্রা দেখলে, গতি-জ্ঞাপক যন্ত্রের কাঁটা ষাট হতে সত্তর সংখ্যার মধ্যে দুলছে। তার বুক কাঁপছে।

—আস্তে চালাও বাপু!

—কেন?

—দেশলাই জ্বালতে পাচ্ছি না।

—ভয় করছে তোমার?

শিপ্রা কোন উত্তর দিলে না।

গণেশ গাড়ীর গতি কমিয়ে দিলে, কাঁটা ত্রিশ মাইলে নেমে এল।

অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটা ফেলে দিয়ে গণেশ হেসে উঠল।

—Live dangerously বুঝলে শিপ্রা, তবে জীবনে থ্রিল পাবে—

—ইচ্ছে করে বিপদ ডেকে আনার ত কোন মানে বুঝিনা।

—তাহলে ট্রেণে আরামে ঘুমোতে ঘুমোতে গেলেইত হত। সারারাত জেগে যেতে হবে আমার সঙ্গে, দেখনা, আসানসোলটা পার হই, তারপর কি রকম স্পীড্ দেব—

—কত?

—এ গাড়ী ঘণ্টায় আশি নব্বই মাইল সহজে যেতে পারে।

—অর্থাৎ মেলট্রেণের চেয়ে জোরে, মিনিটে দেড় মাইল!

—ভয় করছে শুনে? আচ্ছা, চলো আজ সারারাত তারপর গতির নেশা তোমায় পেয়ে বসবে, তখন আস্তে যেতেই পারবে না—

না, বাপু, আমার কেমন দম আটকে যায়। এই নাও সিগারেট।

—বর্দ্ধমানে গলাটা ভিজিয়ে নিতে হবে, বড় তেষ্টা পেয়েছে।

সোনার কঙ্কণ ঘুরিয়ে শিপ্রা গণেশের মুখের দিকে চাইলে।

এই অদ্ভুত লক্ষপতি যুবক অর্থকে তুচ্ছজ্ঞান করে, প্রাণেরও মায়া করেনা; সে সুখের সন্ধানে ঘোরে অথচ সুখ চায় না, জীবনটা হৈরৈ করে কাটাতে চায়।

সে কেন বিবাহ করে না? বিবাহ করে সংসারী হলে সে সুখী হবে। গণেশের জন্য শিপ্রার কেমন মমতা জন্মে গেছে। একথা বল্লে, লোকে হাসবে, বলবে, এ শিপ্রার বড় রকম ব্যবসাদারি চাল।

মোটরগাড়ীর তীব্র দীর্ঘ আলোকে সম্মুখের পথ সমুজ্জ্বল; দূরে এক গরুর গাড়ীর সোণালী খড়ের গাদায় সে আলো ঝলমল্ করছে।

শিপ্রা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, দেখ দেখ সামনে ওটা কি? কি একটা হল্‌দে—বোধ হয় গাছ—হর্ণ দাও—

—খড়ের বোঝা, গাড়ীটা দেখা যাচ্ছে না—হর্ণ দিলে গরুগুলো ভড়কে যেতে পারে।

গণেশ গাড়ীর গতি কমালে না। গরুর গাড়ীর পাশ দিয়ে সে জোরে বেরিয়ে চলে যাবে।

গদাইয়ের খড় বোঝাই গরুর গাড়ী এঁকে বেঁকে চলেছে। সোনালী খড়ের স্তূপ মোটরগাড়ীর আলোয় অপরূপ দেখাচ্ছে।

মোটরকার গরুর গাড়ীর কাছাকাছি এসেছে। গণেশ ঠিক করলে বাঁদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে। গরু-গুলো চমকে উঠে জোরে ছুটেছে। গণেশ বাঁ দিকে গাড়ী ঘোরাল; গরুর গাড়ীও তার সামনে এসে পড়ল, পথের বাঁ দিকে; পাশে হয়ত যাবার রাস্তা আছে, অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না। প্রাণপণে ব্রেক-টেনে গণেশ আরও বাঁদিকে গাড়ী ঘোরাল।

পথপার্শ্বে বৃহৎ মহীরুহ। তার কালো শক্ত গুঁড়িতে বনেট জোরে ধাক্কা মারলে; প্রাচীন বনস্পতি অটল দাঁড়িয়ে রইল। মোটরগাড়ী ঝন্‌ঝন্ শব্দে কেঁপে উঠে থেমে গেল। সামনের চাকা কাদায় ডুবে গেছে। গাড়ী কাৎ হয়ে পড়েছে, আলো নিভে গেছে, ইঞ্জিন স্তব্ধ। ঝিল্লীরবে মুখরিত অন্ধকার রাত্রির ছায়া চারি-দিকে ঘিরে এল।

ড্যাম—বলে গণেশ ব্রেক ছেড়ে হাত ঝাড়তে লাগল। কব্জিদুটো ঝন্‌ঝন্ করছে। এবার বাহির হবার চেষ্টা করতে হবে। উঠ্‌তে গিয়ে সে অনুভব করলে তার কাঁধের ওপর একটা নরম বোঝা। একটু ঘুরে বসতেই, শিপ্রার সুন্দর দেহ তার বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ল বাণবিদ্ধ পক্ষিণীর মত।

—শিপ্রা!

কোন উত্তর নেই।

গণেশ ভাবলে, শিপ্রা মূর্চ্ছিতা হয়নি ত? শিপ্রার দেহ ধরে নাড়া দিলে। তপ্তপ্রশ্বাস তার হাতের ওপর পড়ল।

—শিপ্রা!

কোন উত্তর নেই, শুধু একটা চাপা হাসির শব্দ।

গণেশ শিপ্রাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে। চারিদিকে কি গভীর স্তব্ধতা, কি নিবিড় রহস্যময় অন্ধকার! ঝোপে জোনাকীর দল, আকাশে তারাগুলি রিমঝিম করছে।

ইতিমধ্যে ড্রাইভার শোভনলাল গাড়ীর দরজা খুলে কোন রকমে বাহির হয়েছে। সে পেছনে বসেছিল।

—হুজুর, কোন চোট লাগেনি ত?

শোভনলালের কণ্ঠস্বরে গণেশ চমকে উঠল।

—না, শোভন, আমরা অল্‌রাইট্‌।

—তাহলে ওই গাড়োয়ান বেটাকে ধরে নিয়ে আসি।

গণেশ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। শিপ্রার বুক ধক্‌ধক্‌ করছে। জীবনে এ সব মুহূর্ত্ত ক'টাই বা আসে!

চাঁদের মৃদু আলোকে খড়-বোঝাই গরুর গাড়ীর মন্থরগতি বড় সুন্দর।

একটা সিগার তুলে নিয়ে গ্রেগরি বল্লে, আচ্ছা ভারতবর্ষে কত গরুর গাড়ী আছে, বলতে পারেন রায়?

সিগারে অগ্নিসংযোগ করে কনক বল্লে, এ সম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেন্টের নিশ্চয় রিপোর্ট লেখা আছে, তবে আমার জানা নেই।

—আমি এক বইতে দেখ্‌ছিলুম, ভারতবর্ষে পঁচিশ লক্ষ গরুর গাড়ী আছে

কল্যাণ হেসে বল্লে, কনকের মত হচ্ছে, এই পঁচিশ লক্ষ গরুর গাড়ী লুপ্ত হয়ে যেদিন পঁচিশ লক্ষ মোটর গাড়ী ভারতের পথপ্রান্তর জুড়ে মত্তবেগে ঘুরে বেড়াবে, সেদিন ভারতবর্ষ সভ্য স্বাধীন হতে পারবে।

—অর্থাৎ ভারতবর্ষকে আমেরিকা করে তোলা।

—ভারতের অনাদিকালের সমাতন আত্মার কি হবে?

ঠাট্টা করবেন না। ভারতের আত্মা নব কলেবর ধারণ করবে। বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষের বিশেষ কাজ আছে। গত ছ'মাস আমি এক গ্রামে গিয়ে বাস করছিলুম, সেখান থেকে নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেশন তিন দিনের পথ। নদীর ধারে অবারিত মাঠের মধ্যে ছোট গ্রাম। যেখানে খোলা আকাশের নীচে দীপ্ত সূর্য্যালোকে স্নিগ্ধ তারার আলোয় আমি যে গভীর শান্তি অনুভব করেছি, ইয়োরোপের কোন গ্রামে আমি তা পাইনি। সেখানে এক বাউলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—এ গ্রামের এক রিপোর্ট লিখেছি, তোমাদের শোনাতে চাই।

—দেখ আর্থার, প্রাচীন ভগ্ন প্রাসাদের ভগ্ন মন্দির ধ্বংসস্তূপের একটা সৌন্দর্য্য আছে, যে শিল্পী তা আঁকতে আসে, যে পথিক দেখতে আসে, তার কাছে এসব সুন্দর, এমন কি জ্যোৎস্নালোকে অপরূপ মনে হতে পারে, কিন্তু যাদের সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে বাস করতে হয়, ভাঙা ছাদ দিয়ে দুঃখ দৈন্যের জলধারা যাদের মাথায় অবিরাম ঝরে পড়ে, তাদের কাছে সব ভেঙে নতুন ইমারত বানানই যুক্তিযুক্ত মনে হয়, পশ্চিমের ঝোড়ো বাতাসে যে অট্টালিকা অটল থাকবে।

—তোমরা সব সময় ইয়োরোপের সঙ্গে তুলনা করে ভাব, এই হয়েছে মুস্কিল।

—ঠিক বলেছ, ইংরাজ মাষ্টারদের কাছে আমরা যেমন সেক্সপিয়ার ব্রাউনিং পড়েছি, অথবা সর্টহাণ্ড টাইপরাইটিং শিখিছি অথবা কি করে সাত তলা বাড়ী বানাতে হয়, পোল করতে হয়, কলকারখানা চালাতে হয় জেনেছি, তেম্নি ইয়োরোপের ইতিহাসের শিক্ষাও লাভ করেছি,—আইডিয়া, আইডিয়া হচ্ছে সব—ডেমক্রেসি, কম্যুনিজম্—যে জাহাজ ভরে তোমরা আমাদের মাল বেচতে এসেছ, সে জাহাজের পালের বাতাসে ইয়োরোপের আইডিয়ালও ভাসিয়ে এনেছ—

—কিন্তু ইয়োরোপের ইতিহাস এখনও শেষ হয় নি—কি লণ্ডভণ্ড সুরু হয়েছে ইয়োরোপে দেখতে পাচ্ছ কি?

—ও কথা বলে আমাদের ভোলাতে বা ঠেকাতে পারবে না।

—সেজন্যই আমি ভারতবর্ষে এসেছি, এখানকার পণ্যের হাটে আমদানি রপ্তানির বাজারে নয়, আমি এসেছি তার ধর্ম্মের মন্দিরে জ্ঞানের প্রদীপ যেখানে জ্বলছে, ভারতবর্ষ যেখানে নিত্যকালের অমৃতভাণ্ড নিয়ে বসে আছে।

—তুমি বেশ সুন্দর বলতে পার, আর্থার। সিগারটা ধরাও।

—ভারতবর্ষে জন্মালে এমনভাবে বল্‌তে না। আলোচনাটা এখন মুলতুবী থাক, বর্দ্ধমান ষ্টেশন বোধ হয় এল।

—আর এক পেগ্‌ হবে?

—তার চেয়ে সঙ্গে একটা বোতল নিয়ে যাওয়া যাক, এত শীগগিরও ঘুম আসবে না।

—তেষ্টাও পাবে। ট্রেণে আমার ঘুম হয় না।

ট্রেণ বর্দ্ধমান ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে প্রবেশ করল।

রেস্তোরাঁ গাড়ীর বয়কে ডেকে কনক অর্ডার দিলে, এক বোতল হুইস্কি, তিনটে গেলাস ও ছ বোতল সোডার জল তাদের গাড়ীতে দিয়ে আসতে।

সিগার টানতে টানতে ত্রয়ী চল্ল তাদের গাড়ীর দিকে।

প্রেমদাসের সঙ্গে তখন দেবপ্রিয়ের তর্ক জমে উঠেছে।

বস্তুতঃ দেবপ্রিয় তর্ক না করে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। কারণ সে কোন জিনিষ মানতে রাজী নয়। তার মনে সত্যানুসন্ধিৎসা যেমন প্রবল যুক্তির শাণিত বাণগুলি তেমনি উদ্যত—ভাবের রঙ্গীন কুহেলিকা সে সহ্য করতে পারে না। বুদ্ধির কষ্টিপাথরে সকল ভাব যাচাই করে নিতে চায়।

প্রেমদাসের কথা কিছুক্ষণ লেখার পরই আলোচনা সুরু হয়েছে। বিরিঞ্চি প্রথমে আলোচনায় যোগ দিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু দেবপ্রিয়ের বড় বড় ইংরাজী কথার মানে না বুঝতে পেরে, ওপরের এক বাঙ্কে আশ্রয় নিয়েছে। রাধাকান্ত মাঝে মাঝে এই দুই তার্কিকের দিকে বিস্মিত নেত্রে চাইছে। ওদের আলোচনা তার কাছে শুধু অবোধ্য নয় নিরর্থক। অন্য সময় হলে সে বাধা দিতে বলত, দর্শন ও শাস্ত্রের কূট আলোচনাই ভারতবর্ষের অবনতির কারণ। ভারতের প্রতিভাসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিগণ বিজ্ঞানচর্চ্চা না করে, দর্শন ও ধর্ম্মের আলোচনা করে কাটিয়েছে,—এখন তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে।

তত্ত্বালোচনায় যোগ বা বাধা দেবার মত মন রাধাকান্তর ছিল না।

সে ভাবছিল, ইয়োরোপে যদি সত্যই যুদ্ধ বাধে, তার সুবিধে হবে কি না। লোহার কলটা তাড়াতাড়ি সারান দরকার। বোম্বেতে খোঁজ করলে ভাল ইঞ্জিনিয়ারের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। না, তখন ইয়োরোপ যাওয়া হবে না। ঝোঁকের মাথায় সে পাসপোর্টটা নিয়ে বাহির হয়েছে। কলটা ভাল করে চালিয়ে তারপর সে আমেরিকা যাবে। দু' লাখ টাকার জন্যে আটকে যাচ্ছে। এ কি কম আপশোষ! শেষে কি বাটালি-ওয়ালার কাছে গিয়ে ধার করতে হবে। কলের শেয়ার তাকে কিছুতেই দিতে চায়নি।

ইয়োরোপে যদি যুদ্ধ বাধে, গভর্ণমেণ্ট তার কল সারাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারে, আর এই ধর্ম্মঘট আইন করে বন্ধ করতে হবে, গভর্ণমেণ্ট তার লোহার কল নিয়েও নিতে পারে, তেম্নি পাটের কলে লাভ প্রচুর হবে।

সন্ন্যাসী বলছেন, দেখ দেবপ্রিয়, তুমি যে সমস্যা বলছ, তার একমাত্র সমাধান হচ্ছে—প্রেম।

প্রেম, প্রেম, বার বার এ কথা শুনে দেবপ্রিয়ের বিরক্তি ধরে গেছে। কবিরাজী সর্ব্বজ্বর বিনাশক বটিকার মত, সকল ক্ষতের মহৌষধি প্রলেপের মত, সকল প্রশ্নের উত্তরে প্রেমদাস বলেন, প্রেম জাগাও অন্তরে, প্রেম বিলাও জগৎজনে।

দেবপ্রিয় বল্লে, 'প্রেম' কথাটা আপনি বার বার ব্যবহার করছেন, প্রেমের অর্থ কি? প্রেম কি? define করুন।

—এই ইংরাজী-পড়া বিদ্যে আরম্ভ করলে। এ যে অনুভূতির ব্যাপার দেবপ্রিয়, অন্ধকার রাতে বসে তুমি যদি বলো, প্রভাতসূর্য্যের সোনার আলো কিরূপ বলুন,—সাধনা ভিন্ন এ ত জানতে পারবে না, এ যে বোধের ব্যাপার, বুদ্ধির অগম্য, বৈষ্ণবশাস্ত্রে বলে—

—বৈষ্ণব শাস্ত্রে কি বলে আমি জানি, আপনি কি বলেন, শুনতে চাই।

—তুমি জান না, তাহলে এ প্রশ্ন করতে না। মানুষের মধ্যে নানা কামনা, বাসনা রয়েছে—

—তাদের মধ্যে দুটি কামনা সবচেয়ে প্রবল, ইংরাজীতে বল্লে কথাটা স্পষ্ট হয়—Sex and possession.

—অর্থাৎ সৃষ্টিরক্ষার জন্য নারীরূপিণী প্রকৃতির সুন্দরী মায়া, আর স্থিতির জন্য শক্তি ও সম্পদসঞ্চয়। কি বল?

—শেষটা বল্লেন না, নারীর জন্য, সম্পদের জন্য শক্তির সংঘাত—প্রলয়! সংগ্রামটা আপনি বাদ দিতে চান।

—তুমি যাকে সংগ্রাম বলছ, আমি বলব লীলা—শিব ও শক্তির লীলা—

রাধাকান্ত ক্ষুব্ধ চক্ষে সন্ন্যাসীর দিকে একবার চাইল। লীলা! করতে হত টাকা রোজগার, চালাতে হত লোহার কল, ধর্ম্মঘট ভাঙতে হত—তাহলে বুঝতে লীলা কাকে বলে! দু' লাখ টাকা আনতে পার!

কথাগুলি যে সে আপন মনে উচ্চ স্বরে বলে উঠল, সে জ্ঞান তার ছিল না। দেবপ্রিয় বল্লে, প্রেমের লীলা নয়, এটা ঠিক। রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাসংঘের, ভূম্যধিকারীর সঙ্গে কৃষকের, ক্যাপিটালিষ্টের সঙ্গে শ্রমিকের, জাতির সঙ্গে জাতির সংগ্রাম চলেছে—

বিরিঞ্চি বাঙ্কে উঠে বসল। ধর্ম্মের গভীর কথা হচ্ছে। এ সব সে বোঝে না। ছোকরাটি অত্যধিক বাচাল, নিজে খুব জানে ও বোঝে এ কথাই প্রমাণ করতে চায়। আরে বাপু, পণ্ডিত হতে পার, গাদা গাদা বই পড়তে পার, কিন্তু ভক্তি না হলে কোন জ্ঞানই হবে না। বিশ্বাসে মিলায়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।

বিরিঞ্চি আবার শুয়ে পড়ল। পেটে কেমন ব্যথা বোধ করছে। কয়েকমাস আগে তার ভয়ানক অসুখ করেছিল, পেটে অসহ্য যন্ত্রণা, নাড়ীগুলি যেন নীচে নেমে যেতে চায়! এ্যালোপাথিক ডাক্তারেরা কেউ বল্লে, টিউমার, কেউ বল্লে ক্যানসার। কাটতে হবে। বিরিঞ্চি রাজী হল না। কারণ খরচ যা হবে, হিসেব করে দেখা গেল, সে টাকায় বিরিঞ্চির ছোট মেয়ের বিবাহ হয়ে যায়। মরতে ত হবেই একদিন। অনূঢ়া কন্যা নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে ঘটা করে চিকিৎসা না করে মরাই যুক্তিযুক্ত। ডাক্তারেরা কেউ বলতে পারছে না, রোগটা কি, ঠিক সারবে কি না। সস্তার কবিরাজী চিকিৎসা করে সে সেরে গেল। খুব সস্তার চিকিৎসা নয়, দুধ, ঘি, পোলাও হ'ল পথ্য। বৃদ্ধ কবিরাজের ঔষধের গুণে পেটের ব্যথা ত গেলই, দেহে ত কোনরূপ ব্যথা বোধ করবার শক্তিই প্রায় লোপ পেল। দাঁত ফোলে, কিন্তু কোনরূপ ব্যথার অনুভূতি নেই। জিহ্বায় রসাস্বাদের অনুভূতি নেই। ফজলি আম খাও বা রাবড়ি খাও বা দুধ সাবু খাও, সব একই আস্বাদ। হয়ত পেটে তার ব্যথা হয় কিন্তু ব্যথানুভূতির স্নায়ুগুলি অসাড় হয়ে গেছে বলে, ব্যথা বোধ করে না। তাই মাঝে মাঝে মনে হয় ব্যথা হচ্ছে। কল্পনাও হতে পারে।

এবিষয়ে প্রেমদাস ঠাকুরের কাছে নিবেদন করে, একটা ঔষধ নেবার তার বিশেষ ইচ্ছা। প্রেমদাস আশ্চর্য্যকর দৈব ঔষধ জানেন। কিন্তু কথাটা বলবার সুযোগ পাচ্ছে না। এ রাতে ঔষধ প্রার্থনা করবার কোন আশা নেই দেখে, বিরিঞ্চি শুয়ে পড়ল।

শুয়ে সে ভাবতে লাগল কবিরাজের দেওয়া এ ঔষধে যেমন দেহের ব্যথা দূর হয়ে গেছে, জিহ্বায় কটু কষা তিক্ত সব স্বাদ এক হয়ে যায়; তেম্নি সন্ন্যাসী এমন মনের ঔষধ জানেন, যা পেলে জীবনের সকল দুঃখবোধ চলে যায়, সুখদুঃখ এক হয়ে যায়—কিন্তু সে যে সাধনার দরকার, ট্রেণে এক কথায় সে জিনিষ লাভ করা যাবে না—ঠাকুরের সঙ্গে সে যাবে দ্বারকায়—সে অমৃত যদি লাভ করতে পারে। ছোকরাটা কি তর্কই করতে পারে!

দেবপ্রিয় তখন বলছে, দেখুন এ বিষয়ে আমার একটা থিওরি আছে। আমার মত হচ্ছে, বাস্তবকে মেনে নিয়ে সত্যরূপে জানতে আমরা চেষ্টা করি না—সেজন্য আমরা মুক্তির ঠিক উপায় খুঁজে পাচ্ছি না,—সত্য হতে আমরা পালাতে চাচ্ছি সারাক্ষণ, আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির সত্য, মনের নানা বাসনা কামনার সত্য—আমরা সত্যকে মানতে চাইনা, কল্পনার রঙে রঙীন, ভাবের মধুর রসে স্নিগ্ধ করতে চাই—ইংরাজীতে একে বলে escapism.

—যেমন সংসার থেকে পালিয়ে লোকে সন্ন্যাসী হয়, পথটা সহজ কিন্তু সত্য নয়, এই তুমি বলতে চাও।

—আমি বলতে চাই, তাতে সংসারের দুঃখ সমস্যার সমাধান হল না। এটা পালিয়ে জেতা।

সুন্দর কথা বলেছ। এ বিষয়ে ভেবে তোমার সঙ্গে কাল কথা হবে। বর্দ্ধমান ষ্টেশন এল বোধ হয়। escapism কথাটা বেশ।

ট্রেণের গতি মন্দ হয়ে এল।

দেবপ্রিয় দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে, কথাটা খুব গভীর অর্থে ব্যবহার হয় না। আমি চাই, অম্লান বুদ্ধি দিয়ে বাস্তবের সমীক্ষণ, সত্য কি জানা, তারপর উপায়ের সন্ধান। মানুষ

আঘাত সইতে রাজী নয়, সুখের সন্ধানে সে মায়ার সৃষ্টি করে, কাল্পনিক সুখলোকে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করছে; দুঃখ ভুলতে মানুষ নেশা করে,—মদের নেশা, নারীর নেশা, টাকা জমাবার নেশা—কাব্য রচনা করে ছবি আঁকে নতুন নতুন আইডিয়ায় মেতে অদ্ভুত সমাজ ব্যবস্থা রাষ্ট্র-রূপের কল্পনা করে, সোসিয়ালিজ্‌ম্‌, কম্যুনিজম্‌, ফ্যাসিজ্‌ম —পুরাতন ভাঙতে চায়, কিন্তু ভাঙার আগে দেখেনা সত্যিকার গলদ কোথায়, সে সত্যি কি চায়—সে জানে না।

ট্রেণ থেমে গেছে। রাধাকান্ত দাঁড়িয়ে উঠেছে। দূরে রেস্তোরাঁ গাড়ীর এক খান্ত পরিবেশককে দেখে তার ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বোধ প্রবল হয়ে উঠেছে। দেবপ্রিয়ের দিকে কটমট্‌ করে চেয়ে সে বল্লে, মাফ করবেন, মানুষ কি চায়, তা সে খুব সুস্পষ্টই জানে!

দেবপ্রিয় একটু থতমত খেয়ে চুপ করে দাঁড়াল। লক্ষপতি রাধাকান্তের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা করতে সে রাজী নয়।

সন্ন্যাসী হেসে বল্লে, আপনি কি চান বলতে পারেন? মাথায় টুপি জোরে চেপে রাধাকান্ত বল্লে, সে বলে কোন লাভ নেই আপনাকে, সন্ন্যাসীর ওষুধ বা ধর্ম্ম-কথা নয়।

প্রেমদাস পলকহীন নয়নে রাধাকান্তের দিকে চাইলে, তারপর ধীরকণ্ঠে বল্লে, আপনি চান দু'লাখ টাকা, আপনি চান মিল চালাতে, ধর্ম্মঘট ভাঙতে, কিন্তু তাতে আপনার শান্তি অথবা পৃথিবীর শান্তি হবে কি?

গদি-ওয়ালা রেলের বেঞ্চে রাধাকান্ত আবার বসে পড়ল। সন্ন্যাসীর দিকে চাইতে তার সাহস হল না। লোকটা তার মনের কথা জানল কি করে? অলৌকিক শক্তি আছে নাকি? যদি অলৌকিক শক্তি থাকে, তাকে দু'লাখ টাকা জোগাড়ও করে দিতে পারে। সন্ন্যাসীকে ঠাট্টা করা ঠিক হয় নি।

রাধাকান্ত আবার চুপ করে বসল। ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে গেল। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল লোহের কলের বৃহৎ বাড়ী, শূন্য, অন্ধকার; ফারনেসে আগুন জ্বল্‌ছে না, চিম্‌নীতে ধূমের চিহ্ন নেই। দুইচোখ জলে ভরে এল।

প্রেমদাস মৃদুকণ্ঠে দেবপ্রিয়কে বল্লেন, তোমায় বলেছিলুম এ লোকটি বড় অসুখী।

সে কথা রাধাকান্তের কানে গেল না।

তিন বন্ধু যখন রেস্তোরাঁ গাড়ী হতে এ গাড়ীতে এসে উঠল, তাদের পেছনে বয় মদ ও সোডার বোতল, গেলাস দিয়ে গেল, বেঞ্চির এক কোণে সে গুম্‌ হয়ে বসে রইল।

তারপর ট্রেণ যখন একটু চলতে সুরু হয়েছে, হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে উঠল, গাড়ীর দরজাটা তাড়াতাড়ি খুলে দিলে।

দেবপ্রিয় ভীতভাবে রাধাকান্তের দিকে চাইলে, লোকটা লাফিয়ে পড়বে নাকি!

এক যুবক লাফিয়ে গাড়ীতে উঠল, তারপর এক তরুণী।

হাঁপাতে হাঁপাতে গণেশ বল্লে, বাবা এ যে ভরা গাড়ী!

শিপ্রা মাথা ঝাঁকুনী দিয়ে বল্লে, ভাগ্যিস চলন্ত ট্রেণে ওঠার রিহার্সেলটা ভাল করে দিয়েছিলুম।

গাড়ীর পেছনের লম্বা বেঞ্চে তিন বন্ধু পাশাপাশি বসেছিল, তাদের দিকে অভিবাদনের ভঙ্গীতে মাথা একটু নত করে গণেশ বল্লে, বোধ হয় আপনাদের Disturb করলুম,—মশাই, পথে যা Accident হ'ল—তারপর পরশু সকাল থেকে ওঁর সুটিং সুরু হবে—

পার্শ্বের বেঞ্চে সন্ন্যাসীর স্থিরস্নিগ্ধ মূর্ত্তি দেখে শিপ্রা লজ্জিত হয়ে উঠল। জর্জেট-শাড়ীর লাল জরির সুরাটী পাড় মাথায় টেনে দিলে। গণেশের দিকে চেয়ে মিনতির সুরে বল্লে, চুপ করে বোসো, কি বক্‌ছো! *

(ক্রমশঃ)

* (উপন্যাসের সকল ঘটনা ও নরনারীর চরিত্র কাল্পনিক)

মেঘদূত

শ্রী হেমচন্দ্র বাগ্‌চী

'মেঘদূত' এই নামটিতেই আমাদের অন্তরাত্মা পুলকিত হয়। ফাল্‌গুনের শেষ হইতেই যে গ্রীষ্মদাহ আরম্ভ হয়, তাহার পর চৈত্র, বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ মাস ধরিয়া যে গ্রীষ্ম বিরহমিলননির্বিশেষে আমাদের জ্বালাইয়া মারে, তাহার অবসান হয় আষাঢ়ের প্রথম দিনে, যেদিন গোপবেশধারী বিষ্ণুর স্ফুরিতরুচি বর্হের ন্যায় ইন্দ্রধনুরঞ্জিত নূতন স্নিগ্ধ মেঘভার দক্ষিণ সমুদ্রের তালীবনশ্যাম বেলাভূমির প্রান্ত হইতে বায়ুতাড়িত হইয়া দাহপিঙ্গল আকাশে ছড়াইয়া পড়ে। সেই প্রাচীন দিনের বিরহসন্তপ্ত জনপদবধূর ন্যায় মেঘমেদুর আকাশের দিকে চাহিয়া মনে হয়—'আঃ বাঁচিলাম!' আমরা আতপতাপ হইতে বাঁচিয়া যাই, আর 'মেঘদূতের' বিরহিণীরা নব মেঘ দেখিলে বিরহতাপখেদ ভুলিয়া যায়। যাহা নয়নাভিরাম, মনের উপর তাহার স্নিগ্ধ ছায়া পড়ে। মাত্র কয়েকটি চরণে মহাকবি আষাঢ়ের নবমেঘের যে বিশেষণ দিয়াছেন, তাহাতে দুঃখাভিতপ্ত মানবমন এবং মেঘোদয়ের সম্বন্ধে আমাদের একটি সুন্দর ধারণা জন্মে।

> সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তত্‌ পয়োদপ্রিয়ায়াঃ
> সন্দেশং মে হর ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্য।
> গন্তব্যা তে বসতিরলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং
> বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্যা ॥ ৭

হে মেঘ, তুমি সন্তপ্তদিগের শরণ। সেইজন্য কুবেরের ক্রোধে প্রিয়াসঙ্গবঞ্চিত আমার সংবাদ আমার প্রিয়ার নিকটে তুমি লইয়া যাও। যক্ষেশ্বরদিগের বাসভূমি অলকা নগরীতে তোমাকে যাইতে হইবে। সেই নগরীর সৌধাবলি বাহিরের উপবনে সংস্থিত শিবের শিরসংলগ্ন চন্দ্রকিরণে ধৌত। 'সন্তপ্ত' বলিতে টীকাকার বলিতেছেন, "সন্তপ্তানাং আতপেন বা প্রবাসবিরহেণ বা সংজ্বরিতানাম্।" টীকার এই সংস্কৃত শব্দগুলি আমার বড় ভালো লাগিল। গ্রীষ্মদাহে বা প্রবাসবিরহে যাঁহারা সংজ্বরিত, তাঁহাদিগকেই কবি 'সন্তপ্ত' বলিতেছেন। আমার মনে হয়, শুধু গ্রীষ্মদাহ ত নয়, শুধু প্রবাসবিরহ ত নয়, আরও কত প্রকারের তাপ আছে, মন নামক এই বিচিত্র রহস্যময় মহাদেশের খবর কে লইবে? সে যাহা হউক, আষাঢ়ের নব মেঘ সত্যই সন্তপ্তচিত্তের শরণস্বরূপ। কবি-মননে এই আষাঢ়ের নবমেঘ কি বিচিত্র রূপেই না দেখা দিয়াছে! রবীন্দ্রনাথের ঘনগম্ভীর ধ্বনিময় কাব্য মনে আসে :

> বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বদ্বারে
> বাজাইল বজ্রভেরী, হে কবি, দিবে না সাড়া তা'রে
> তোমার নবীন ছন্দে! আজিকার কাজরী গাথায়
> ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে পাতায় পাতায়—

বর্ষার রূপের এই আনন্দ, এই বিরহরোমাঞ্চময় আবির্ভাব কত প্রাচীন কত আধুনিক কবিই না অনুভব করিয়াছেন! কেন্দুবিল্বের জয়দেব 'গীতগোবিন্দের' প্রথমেই সুর ধরিয়াছেন :

> মেঘৈর্মেদুরমম্বরং, শ্যামাস্তমালদ্রুমাঃ, নক্তং, ভীরুরয়ং,
> ত্বমেব তদিমং রাধে, গৃহং প্রাপয়।

ঘনসন্নিবিষ্ট শ্যামল তমালতরুরাজির অন্ধকারে রাত্রি নামিতেছে। অম্বর মেঘমেদুর। হে রাধে, হয়ত তমাল-বনের অন্ধকারে আসন্ন মেঘের অন্ধকারে ভীরু শ্রীকৃষ্ণ পথ হারাইয়াছেন, তুমি তাঁহাকে গৃহে লইয়া যাও।

তাহার পর কত কবির নাম করিব? রবীন্দ্রনাথ ত 'মেঘদূত' পড়িয়া আর একখানি নূতন 'মেঘদূত' রচনা করিয়াছেন। তাহার স্থানে স্থানে এত সুন্দর কবিতা আছে, যে উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করা সুকঠিন।

> কতকাল ধ'রে
> কত সঙ্গিহীন জন, প্রিয়াহীন ঘরে
> বৃষ্টিক্লান্ত বহুদীর্ঘ লুপ্ততারাশশী

আষাঢ় সন্ধ্যায় ক্ষীণ দীপালোকে বসি'
ওই ছন্দ মন্দ মন্দ করি' উচ্চারণ—
নিমগ্ন করেছে নিজ বিজন-বেদন।
…… কোথা' আছে
সানুমান আম্রকূট! কোথা' বহিয়াছে
বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্যপাদমূলে
উপলব্যথিতগতি। বেত্রবতীকূলে
পরিণতফলশ্যামজম্বুবনচ্ছায়ে
কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা!
পথতরুশাখে কোথা' গ্রামবিহঙ্গেরা
বর্ষায় বাঁধিছে নীড়, কলরবে ঘিরি' বনস্পতি!

এমনি মেঘদূতের সুন্দর সুন্দর শ্লোকগুলির মর্ম্মানুভাব আমরা এই কবিতায় পাই। 'মেঘদূত' এইভাবে আধুনিক মহাকবির মনে রসমধুর স্নিগ্ধ ছায়াপাত করিয়াছে। স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথও 'মেঘদূতের' ছন্দধ্বনি বাংলাকাব্যে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল কৈ গো কৈ মেঘ উদয় হও!
সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ধরি' তা'র মন্দ্রমন্থর বচন কও!
সূর্য্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ, দাও হে কজ্জল পারাও ঘুম।
বৃষ্টির চুম্বন বিথারি' চলি যাও, অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধূম!

আরও কত কবি মেঘদূত পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। সকলের নাম মনে আসিতেছে না। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথের মেঘদূতের ত্রিপদীতে অনুবাদ সুন্দর। স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ সেনের মন্দাক্রান্তা ছন্দ বাংলায় আনিবার চেষ্টা তাঁহার কাব্যে দেখিয়াছি। সুকবি নরেন্দ্র দেবের 'মেঘদূত' অনুবাদ জনপ্রিয়। সুকবি কৃষ্ণদয়াল বসু, এবং সুকবি প্যারীমোহন সেনগুপ্তের অনুবাদের নামও শুনিয়াছি। আরও হয়ত অনেকে আছেন, জানি না।

এই সব দেখিয়া মনে হয়, 'মেঘদূত' কালজয়ী কাব্য। কোথায় সে কাল, যে কালে কালিদাস জন্মিয়াছিলেন, উজ্জয়িনীর নবরত্ন সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহার কাব্যে তাঁহার রচনাভঙ্গীতে তাঁহার চিহ্ন খুঁজিয়া খুঁজিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকেরা হয়রান্ হইয়াছেন, —সাহিত্যের ইতিহাসে ইহা লইয়া বাদবিসম্বাদের ত অন্ত নাই। মন স্বভাবতঃ বিরক্ত হয়—তথাপি মনে হয়, তিনি যে কালেই জন্মান, তিনি কালজয়ী মহাকবি। 'মেঘদূত' মানবহৃদয়ের চিরন্তন প্রিয়াবিশ্লেষদুঃখের গম্ভীর, মন্থর, বিষাদাকুল শ্লোকমালা। কাজেই মনে হয়, পরবর্ত্তীকালে প্রিয়াবিচ্ছেদদুঃখকাতর মানবচিত্ত ইহা পাঠ করিয়া পরম সান্ত্বনা লাভ করিবে।

তবে তাঁহাকে সংস্কৃতজ্ঞ হইতে হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যের রসাস্বাদে যিনি অভ্যস্ত, যিনি 'কাব্যভাবনা পরিপক্কবুদ্ধি, সহৃদয়'—তিনিই 'মেঘদূতের' মধুরধ্বনি শ্লোকমালার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন। অন্যথা 'মুকুলিতচক্ষু' হইয়া 'মেঘদূত' 'মেঘদূত' করিয়া চীৎকার করিয়া কোনো লাভ নাই।

একেবারেই যে লাভ নাই, তাহা নহে। এই অবস্থা আমাদের সাধুকাব্যপাঠের ঠিক পূর্ব্বেকার রসায়িতচিত্তের অবস্থা। ইহাকে নিরস্ত করা যায় না— 'মেঘদূতের' জনপ্রীতির ইহাই প্রমাণ।

২

একখানি অতি পুরাতন সটীক সানুবাদ মেঘদূত (বাংলা সংস্করণ) হাতে আসিল। সন্ধ্যার ঘনায়িত ছায়ায় আষাঢ়-শেষের মেঘমেদুর আকাশের দিকে চাহিয়া এবং সেই পুরাতন ছিন্ন বিস্রস্তপত্র মেঘদূতের দিকে চাহিয়া বহুদিনের স্মৃতি মনে গুঞ্জন করিয়া উঠিল। সে স্মৃতির দিকে ফিরিয়া চাহিলে রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' কবিতাটিই মনে আসে, আর ক্লান্ত কবিমনে ভাসিয়া উঠে বর্ষার ধারাবাহিক কাব্য-কথা। 'মেঘদূত' কবিতাটি যে কেন মনে আসে, তাহাই বলি। সংস্কৃত মেঘদূত কাব্য কোনো দিন ভালো করিয়া পড়ি নাই। কিন্তু তাহার সম্বন্ধে মনে মোটামুটি রকম একটা ধারণা ছিল। আসল কাব্য ভালো করিয়া না পড়িলে, কাব্যের যথার্থ সৌন্দর্য্য লাভ করা যায় না। আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' কবিতা পড়িলে আসল কাব্য-পাঠের ফললাভ হয়। আমাদের আধুনিক যুগের মহাকবি সংস্কৃতানভিজ্ঞদের এই মহদুপকার করিয়াছেন।

এখন যে কথা বলিতেছিলাম। আমি এমন একজন কালিদাসভক্তের কথা জানি, যিনি কালিদাসের কাব্য হইতে প্রবাদাদি সংগ্রহ করিয়া মহাকবি যে বাঙালী

ছিলেন, তাহাই প্রতিপন্ন করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি নগ্নপদে একখানি উত্তরীয়মাত্র সম্বল করিয়া ভারতবর্ষের তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিয়াছেন এবং কালিদাসের বাঙালিত্ব প্রতিপন্ন করিতে সুদূর রামগিরি-শিখর পর্য্যন্ত গিয়া সভা সমিতি করিয়াছেন। কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন কি না সে তর্ক করিতেছি না। বহুদিন পূর্ব্বে একবার সেই কালিদাস-ভক্তের একখানি নিমন্ত্রণ লিপি পাইয়াছিলাম। চিঠি খুলিয়া দেখিলাম, সুদূর রামগিরিশিখরে তিনি আমাকে আহ্বান করিয়াছেন। চিঠি খুলিলাম আমাদের গ্রামের মাঠের আমবাগানে। আকাশে চাহিয়া দেখি, আষাঢ়ের নব মেঘ উঠিয়াছে। রামগিরি এবং আষাঢ়ের নব মেঘ আর মেঘদূত-উৎসবের চিঠি—আমাকে কল্পনার নিবিড় জালে ঘিরিয়া ধরিল। মাঠে 'আউস' ধানের উপরে পূবালি বাতাস হিল্লোল তুলিতেছে, সদ্য-অঙ্কুরিত 'আমন' ধানের সোনালি সৌন্দর্য্য, চারি পাশে ঘন সবুজ আম্র-পনস-বন-বীথি, দূরে দূরে রহস্যময় নিরুদ্দেশা আলিপথের ইসারা, আরও দূরে দূরে মাঠের একেবারে দিক্‌প্রান্তে গ্রামতরুপুঞ্জের রেখাঙ্কিত সাঙ্কেতিক—এ সবের উপরে আষাঢ়ের ভেরীনিনাদোন্মুখ নবীন মেঘ আমার মনকে আকুল করিয়া তুলিল। আষাঢ়ের স্বচ্ছ নির্ম্মল ধারা বাপী তড়াগ পূর্ণ করিবে, দৃষ্টির সম্মুখের শূন্য ভরিয়া নব বারিধারা নামিবে, কেতকী, কদম, কুরুচি ফুল ফুটিয়া উঠিবে এবং গ্রামান্তের অবহেলিত উপবনে শুভ্র শুচি রজনীগন্ধা মুখ তুলিবে আর ডোবার ধারের পরিণতফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে অসংখ্য ভেক রজনীর অন্ধকারকে মুখরিত করিবে—চিঠি পাইয়া এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম। অনেক কথাই মনে হইল। মেঘদূতের কবি বাংলা দেশের বর্ণনা কেন তাঁহার কাব্যে করেন নাই? 'মেঘদূতে' যাহা পাই, তাহা ত উত্তর ভারতের বা মধ্য ভারতের চিত্র। বাংলা দেশের শুধু একটি চিত্র মনকে আকুল করে—ঐ কেতকীর বেড়া দিয়া ঘেরা পরিণতফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ের দশার্ণ গ্রাম। আর, গ্রামবিহঙ্গদের কলরব। 'মেঘদূতে'র কামরূপ মেঘ ঘুরিতে ঘুরিতে আবর্ত্তিত হইতে হইতে যদি দৈবাৎ বাংলাদেশের উপর দিয়া চলিয়া যাইত, তাহা হইলে সিদ্ধাঙ্গনা না হউক, বঙ্গাঙ্গনাগণের পূজোপচার পাইত সন্দেহ নাই। আর, সেই চিত্র আমরা মেঘদূতে পাইয়া এখনকার দিনের সহিত তখনকার দিন মিলাইয়া লইতাম। যাহা হউক, সেবার আমার রামগিরি যাওয়া হয় নাই। তবে ১লা আষাঢ় আসিলেই যে 'অন্যথাবৃত্তি-চেতঃ' হইতে হয়, তাহার প্রমাণ পাইলাম।

পুরাতন মেঘদূতখানি দেখিতেছি, আর ভাবিতেছি। মনে হইতেছে সমগ্র কাব্যখানি আবার লিখিয়া লই। মন্দাক্রান্তা ছন্দই শুধু নয়, প্রত্যেকটি শব্দই আমার ভালো লাগিতেছে। কি সুন্দর পদবিন্যাস, শব্দচয়নের কি অনুপম সৌন্দর্য্য এবং দুরূহ হইলেও উপমার কি মাধুরী! মেঘদূতের বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছুই নাই। অলকাপুরীতে বিরহিণী প্রিয়া আছেন। আর, কুবেরশাপগ্রস্ত কনক-বলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠ যক্ষ সানুসংশ্লিষ্ট মেঘজালকে প্রিয়ার নিকট সন্দেশবাহীরূপে পাঠাইতেছেন। এই বিষয়বস্তু। ভাষাভঙ্গী এবং ছন্দের সৌন্দর্য্য ছাড়াও ইহার অপর সৌন্দর্য্য আছে—ইহা পুরাণ-কথা নহে, কালিদাস যে যুগের মানুষ, মেঘদূত সেই যুগের ভারতবর্ষের একটি নিখুঁত চিত্র আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করে। কত নগরী, কত জনপদ, কত প্রদেশের উপর দিয়া মেঘ যাইবে—অনেক ঘুরিয়া সে 'অলকা পুরীতে' পৌছিবে। বিরহ-বিধুর যক্ষ মেঘকে ভারতবর্ষের সেই সেই জনপদ, নগরী এবং প্রদেশের এক একটি মনোহর বর্ণনা দিতেছেন। আজ ত সাহিত্য বাস্তবতার জয়গান গাহে। আজিকার দিনের নিরানন্দ ভারতবর্ষের চিত্র এইরূপ বিরহভাব-দ্যোতনার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠে না কেন? কৈ, 'মেঘদূতে'র মত এমন একখানি বাংলা কাব্যের নাম মনে পড়ে না কেন? রাজৈশ্বর্য্যমণ্ডিত স্বাধীন ভারতের কবি কালিদাস—এ কথাটি ভুলিয়া গেলে বোধ হয় চলিবে না। দেশের মত আমাদের লেখনীও বোধ হয় পীড়াগ্রস্ত।

* * আষাঢ়ের কোনো বর্ষণক্লান্ত দিনে বসিয়া বসিয়া মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দ মৃদুগুঞ্জনে আবৃত্তি করা ছাড়া অন্য পন্থা দেখি না। কত চিত্র, ঐশ্বর্য্যময় স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিক জীবনের কত বিলাস, ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞ জনপদবধূগণের ভীত চকিত নয়নের সরল স্নিগ্ধ দৃষ্টি, কত মালভূমি, ধরণীর 'শেষবিস্তারপাণ্ডু স্তনের' ন্যায় কত পর্ব্বত, ধারাসারসিক্ত বনলতাগুল্মের গন্ধময় কত

অরণ্যভূমি—আর উপমার পর উপমা, অলঙ্কারের ক্ষণ বিদ্যুদ্দীপ্তি আবৃত্তির ফলে এইগুলি নয়ন ও মনের উপর দিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু একটা কথা কেবলি মনে উঁকি দেয়। রামগিরির আশ্রমে নির্ব্বাসিত যক্ষ বিরহের তীব্রদাহনে এত কথা কি করিয়া কহিলেন এবং এত বর্ণনা কি করিয়া করিলেন? বিরহ কি এত কথা বলায়? আমার মনে হয়, বিরহলীনা নারী বেশী কথা কহে না। বিরহবিলীন পুরুষ কথা কহে, উন্মাদ হয়, গান গাহে, কাব্য রচনা করে—এককথায় বিরহবিলীন পুরুষ স্রষ্টা। আমার আরও মনে হয়, মেঘদূতের বিরহী যক্ষ স্বয়ং কালিদাস। আর, সংস্কৃত কাব্যের Romance যদি কিছু থাকে, তবে তাহা 'মেঘদূতে'ই আছে। মহাকবি বোধহয় তৎকালপ্রচলিত কাব্য-সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া 'মেঘদূত' রচনা করিয়াছিলেন। মেঘদূত অভিনব, নূতন।

'মেঘদূতের' নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি রবীন্দ্রনাথের বড় প্রিয়। তাঁহার অনেক প্রবন্ধে এই শ্লোকটি দেখিয়াছি এবং বহুদিন পূর্ব্বে 'শেষ বর্ষণ' অভিনয়ের দিন তাঁহার স্বকণ্ঠে এই শ্লোকটির আবৃত্তি শুনিয়াছি—

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোহপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ।
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনী জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে ॥ ৩

মেঘদর্শনে সুখীদের চিত্তও অন্যথাবৃত্তি হইয়া থাকে, অর্থাৎ উতলা হয়। প্রিয়জন, যিনি কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া থাকেন, তিনি দূরে থাকিলে মেঘদর্শনে সুখীদের চিত্ত কিরূপ হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। চিত্তের এই আকুলতা বাংলা কাব্যে বর্ষার দিনের বর্ণনায় কি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য:

চেয়ে আছি শূন্যপানে কোনো কাজ হাতে নাই
কোনো কাজে নাহি বসে মন।
তন্দ্রা আছে, নিদ্রা নাই, দেহ আছে, মন নাই
ধরা যেন অস্ফুট স্বপন।
এই উঠি, এই বসি, কেন উঠি, কেন বসি,
এই শুই, এই গান গাই—
কি গান, কাহার গান, কি সুর, কি ভাব তা'র
ছিল কভু, আজ মনে নাই।

[—অক্ষয়কুমার]

রবীন্দ্রনাথের: এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়
এমন মেঘস্বরে বাদল ঝর ঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়।
এমন দিনে তা'রে বলা যায়॥

প্রভৃতি কবিতায় এবং

"কাছে তা'র রই তবুও
ব্যথা যে রয় পরাণে
আঁখি মোর ঘুম না জানে"—

প্রভৃতি গানে অন্তরের এই ব্যাকুলতার পরিচয় আছে। 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' হইতে টীকাকার অনুরূপ আর একটি পরিচিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। রাজা দুষ্মন্তের উক্তি:

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বম্
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥

মেঘ দেখিয়া যেমন সুখী ব্যক্তি উদাসী হয়, তেমনি সুন্দর শব্দ শুনিয়া এবং সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া সুখী প্রাণী বিচলিত হয়, আর, পূর্ব্বে কখনও যাহা সে অনুভব করে নাই, এমন ভাবস্থির জন্মান্তর-স্বপ্ন তাহার মনকে আকুল করে। রবীন্দ্রনাথের "স্বপ্ন" প্রভৃতি কবিতা পাঠে মনে যে বেদনাময়, রহস্যময়, অনুভূতি জাগিয়া উঠে ইহা অনেকটা সেইরূপ।

'মেঘদূতে'র আরও কয়েকটি শ্লোকার্দ্ধ পাঠকদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া আমার প্রবন্ধ শেষ করিব।

ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ
সন্দেশার্থাঃ ক্ব পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ।
ইত্যৌৎসুক্যাদপরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে
কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু॥ ৫॥

ধূম, জ্যোতিঃ, জল এবং বায়ুর সঙ্ঘাত যে মেঘ, সেই মেঘ কি সুনিপুণভাবে যক্ষকথিত সংবাদ বহন করিতে পারিবে? মেঘ ত অচেতন,—সে কিরূপে দেশদেশান্তরে ঘুরিয়া মানববাণী বহন করিবে,—এইপ্রকার সন্দেহ মনে গণনা না করিয়াই গুহ্যক অর্থাৎ যক্ষ মেঘকেই সংবাদবাহীরূপে স্থির করিল। কবি বলিতেছেন, যক্ষের পক্ষে তাহা সম্ভব, কারণ বিরহাতুর ব্যক্তি চেতন অচেতনে

পার্থক্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলে। ইহার দৃষ্টান্ত সীতা বিরহে রামের বৃক্ষলতানদীতড়াগাদিকে সম্বোধন করিয়া কাতর সখেদ উক্তি। রাম তখন চেতন অচেতনে পার্থক্য জ্ঞান হারাইয়াছিলেন। উর্ব্বশী-বিরহে পুরুরবার বৃক্ষ লতা প্রভৃতিকে প্রিয়াজ্ঞানে সম্বোধন। তিনিও চেতন অচেতনে পার্থক্যজ্ঞান হারাইয়াছিলেন। সুতরাং যক্ষের পক্ষে মেঘকে সম্বোধন করা অস্বাভাবিক নহে।

ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ
প্রীতিস্নিগ্ধৈর্জনপদবধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ।
সদ্যঃ সীরোৎকর্ষণসুরভি ক্ষেত্রমারুহ্য মালং
কিঞ্চিৎপশ্চাদ্ ব্রজ লঘুগতির্ভূয় এবোত্তরেণ॥ ১৬।

কথায় বলে, মেঘের দিকে তাকাইয়া থাকা। মেঘ উঠিবে, বৃষ্টি হইবে, তাহার পর বারিসিক্ত উর্ব্বর জমিতে ভাল ফসল ফলিবে। একথা তখনকার দিনের গ্রামবাসীরা যেমন বিশ্বাস করিত, এখনকার দিনের গ্রামবাসীরাও ঠিক তেমনি বিশ্বাস করে। দেখা যাইতেছে প্রাচীন ভারতে কৃষি পূর্ব্বেও যেমন ছিল, এখনও ঠিক তেমনি আছে। বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই। মেঘের উপর তখনকার দিনের জনপদবধূদেরও সরল বিশ্বাস ছিল। তাহারা ভ্রূবিলাস শিখে নাই। স্নেহপ্রীতি-বাৎসল্যবিহ্বল তাহাদের স্নিগ্ধ নীলনেত্র বিস্ফারিত করিয়া তাহারা মেঘ দেখিত। রবীন্দ্রনাথ এই ভাবটি তাঁহার মেঘদূত কবিতায় এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন :

ভ্রূবিলাস শিখে নাই, কা'রা সেই নারী
জনপদবধূজন, গগনে নেহারি ঘনঘটা
ঊর্দ্ধনেত্রে চাহে মেঘপানে—
ঘননীল ছায়া পড়ে সুনীল নয়ানে।

'লোচনৈঃ পীয়মানঃ' কথাটি মহাকবি বড় সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার পরে সদ্য হলোৎকর্ষণ-সুরভিত শস্যক্ষেত্রের উপরে উঠিয়া একটু পশ্চাতে যাইয়া পুনরায় উত্তরাভিমুখে লঘুগতিতে অগ্রসর হইবে। মাঠে লাঙল দেওয়া হইলে কর্ষিত মৃত্তিকা হইতে একটি সুন্দর স্নিগ্ধ গন্ধ বাহির হইতে থাকে। মহাকবির দৃষ্টিতে কিছুই বাদ যায় নাই।

তাহার পরে কতকগুলি শ্লোকের পর রেবা বা নর্ম্মদার বর্ণনা :

স্থিত্বা তস্মিন্ বনচরবধূভুক্তকুঞ্জে মুহূর্ত্তং
তোয়োৎসর্গদ্রুততরগতিস্তৎপরং বর্ত্ম তীর্ণঃ
রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং
ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য ॥১৯।

'রেবা' নাম শুনিলেই আমার কবি করুণানিধানের "রেবা" কবিতা মনে পড়ে।

জলবেণী রম্যা রেবা তরঙ্গিয়া জলকান্তি
উন্মাদের প্রায়—
উপলবিষমপথে চলিয়াছে দ্রুতগতি
তুরন্ত ধারায়।
আবর্ত্তশোভননাভি অলঙ্কৃতকটিতট
হংসমেখলায়
কোথায় রূপসী রেবা ভুলাইলে কালিদাসে
যৌবনবিভায় ?—

[করুণানিধান—শতনরী]

সেই বনচরবধূভুক্ত কুঞ্জে [লতাগৃহে] কিছুকাল থাকিয়া ইচ্ছামত তথায় বিচরণ করিয়া এবং বর্ষণ করিয়া লঘু দ্রুতগতিতে পথ পার হইয়া উপলাকীর্ণ বিন্ধ্য পর্ব্বতের পাদদেশে রেবা বা নর্ম্মদা নদীকে দর্শন করিবে। রেবাকে দেখিলে তোমার মনে হইবে বিশাল মেঘধূসর বনমাতঙ্গের অঙ্গে কে যেন শৃঙ্গারসজ্জারেখা অঙ্কন করিয়াছে। এখানে বনমাতঙ্গ বিন্ধ্যকে বুঝিতে হইবে এবং রেখাগুলিকে নর্ম্মদার শ্বেতশুভ্রবৎ স্রোতোরেখা বুঝিতে হইবে।

তাহার পরে পূর্ব্বোক্ত পরিণতফলশ্যামজম্বুবনান্ত দশার্ণ গ্রাম।

পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈঃ
নীড়ারম্ভৈর্গৃহবলিভুজামাকুলগ্রামচৈত্যাঃ।
ত্বয্যাসন্নে পরিণতফলশ্যামজম্বুবনান্তাঃ
সম্পৎস্যন্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসা দশার্ণাঃ ॥২৩

তাহার পরে উদয়নকথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধের কথা :

প্রাপ্যাবন্তীনুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্
পূর্ব্বোদ্দিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাং॥

এই ছবিটি আমার চোখে স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে। বাসবদত্তা এবং উদয়নের গল্প-বর্ণনানিপুণ গ্রামবৃদ্ধেরা গ্রামচৈত্যের নীচে বসিয়া সেই পুরাতন কাহিনী শুনায়। তুমি মেঘ, আকাশপথে তাহাদিগকে একবার দেখিয়া

লইবে এবং তারপরে বিশালা নগরী অভিমুখে অগ্রসর হইবে।

'মেঘদূত' পড়িতে পড়িতে প্রাচীন ভারতবর্ষের সুন্দর চিত্রগুলির কথা স্মরণ করিয়া মনে বেদনাবোধ হয়। যে ভাষার কাব্য, সে ভাষা আজ অনাদৃত, চর্চ্চার অভাবে এক একটি অপরিচিত শব্দে আসিয়া কাব্যপাঠ ব্যাহত হয়। কত দেশ, কত জনপদের নাম, সেই সব নাম এখন অপরিচিত। তখনকার দিনের গৃহসজ্জা, নাগরিক-জীবনের শতবিধ সংস্কার, তখনকার নারীদের প্রসাধন, তাহাদের লীলাবিলাস আজ কোথায়? সেই কেশসংস্কার-ধূপ, ভবনশিখির নৃত্যোপহার, সূচিভেদ্য অন্ধকারে সঙ্কেত গৃহাভিমুখে অভিসারিণীর নূপুরশিঞ্জিত পদধ্বনি,—এ সকল স্বপ্নের মত মনে হয়। একটি অতিসুন্দর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আজিকার মত প্রবন্ধ শেষ করি :

পশ্চাদুচ্চৈর্ভুজতরুবনং মণ্ডলেনাভিলীনঃ।
সান্ধ্যং তেজঃ প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তং দধানঃ
নৃত্যারম্ভে হরপশুপতেরার্দ্রনাগাজিনেচ্ছাং
শান্তোদ্বেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্টভক্তির্ভবান্যা ॥৩৬

হে সন্ধ্যারাগরক্ত মেঘমালা, মহাকাল তোমাকে রক্তিম জবাপুষ্পের মত হাতের উপর লইয়া দিগন্তপ্রসারী সমুন্নত তরু বাহু বিস্তার করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিবেন। তখন তুমি যেন তাঁহার গজাজিন হইবে। তোমার ভক্তিদর্শনে দেবী পার্ব্বতী পরমানন্দে নির্ভয়ে তোমার দিকে চাহিয়া থাকিবেন।



কম্পিতা

শ্রী গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

আমারই কল্পনা-তুলি তোমারে দিয়াছে রূপ,
রূপের অতীত মোর হে মানস-প্রিয়া !
কামনার পাত্র ভরি' ঢালিয়া প্রাণের মধু
গড়েছি তোমারে আমি—নিরলস-হিয়া !
তোমার ও সুচিকণ, হিল্লোলিত, সুকোমল
অলি-কালো সুনিবিড় কুন্তলের ভার,
ওই তব মদনের চাপসম জোড়াভুরু,—
আকর্ণবিস্তৃত আঁখি,—কমদৃষ্টি তার ;—
গোলাপী অধরফাঁকে মুক্তাসম দন্তপাঁতি—
দেখে মনে হয় বুঝি দাড়িম্ব ফেটেছে,
আপেল রঙের ওই তুল্‌-তুলে দুটি গালে
যেন লাল মদিরার আঁওার জমেছে :
এ-সব আমারি সৃষ্টি,— আমিই গড়েছি প্রিয়ে,
প্রীতির মাধুর্য্য দিয়ে সর্ব্বাঙ্গ তোমার ;
যে অঙ্গ যেরূপে সাজে,—যেখানে যা' লাগে ভালো,—
তার তরে করিয়াছি সাধনা অপার !
কিন্তু কি বিচিত্র ওগো, কল্পনার মধ্য দিয়ে
পরিপূর্ণ মূর্ত্তি ধরি' উদিলে যখন :
চমকি' উঠিনু আমি, হইলাম আত্মহারা,—
চিত্তে মোর খেলে গেল নব শিহরণ !
তুমি যে আমারি গড়া,—ভুলিয়া গেলাম তাহা,
মনে হ'লো হে সুন্দরী লভিতে তোমারে—
লক্ষ যুগ-জন্ম ধরি' ক'রেছি সাধনা আমি,
আজো তাই করিতেছি পুনঃ জন্মান্তরে !
আমার সৃষ্টির কাছে আমিই ভিখারী শেষে,—
গৌরব-আনন্দে তবু ভ'রে যায় বুক :
কল্পনার লোক হ'তে পার্শ্বেতে নামিয়া কি-গো,
প্রেমের চুম্বনে মোর ভরিবেনা মুখ ?

———

রূপ-কথা

পূর্বানুবৃত্তি : প্রথম অঙ্ক

সমুদ্ধ

বুলি। (এতক্ষণ দূরেই দাঁড়াইয়াছিল) বাবাঃ করুছে দেখ না। আমি খুলব, দিদিমা ? (আগাইয়া আসে)

সরকার। (তাঁহার চক্ষু রেণুর উপরে নিবদ্ধ) খোল্। পড়্ কি লিখেছে।

সকলে অপেক্ষা করেন। বুলি রেণুর অবশ হাত হইতে খামটা লইয়া খোলে, তারপর টাইপ করা টেলিগ্রামের কাগজ বাহির করিয়া পড়ে—

বুলি। Renu Dutt. Many happy returns. Reaching this evening. Love to all. Jyoti…… কী মজা—সত্যি সত্যি মা আসবে আজ ? (সেটিতে বসিয়া পড়ে)

তাহার কথার কেহ উত্তর দেয় না। এক মুহূর্ত ঘর একেবারে নিস্তব্ধ থাকে—অপ্রত্যাশিত সুসংবাদে সকলে বিহ্বল হইয়া গিয়াছে। তারপর হঠাৎ রেণু নিঃশ্বাস ফেলিয়া

রেণু। (মুগ্ধস্বরে বলিয়া উঠে) আঃ বাঁচলাম! (সেটিতে, দিদিমার কাছাকাছি, বসিয়া পড়িয়া দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকায়)

হেমজা। (একটু পরে) লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সরকার। তাকে কিছু বখশীস দিয়ে দাও। আমার ব্যাগটা কোথায় গেল ? (টেবিলে খোঁজেন)

হেমজা। থাক আমিই দিয়ে দেব'খন। (বুলিকে দিয়া খাতা সই করাইয়া লইয়া চলিয়া যায়)

[হেমজার প্রস্থান]

বুলি। আমরা স্টেশনে যাব না ?

সরকার। আগে দেখি গাড়ির সময় কখন। বেশি রাতে হলে আর কি ক'রে যাবে।

বুলি। (টেলিগ্রামটা পর্যবেক্ষণ করিয়া) ক'টার গাড়ি কিছু লেখেনি।

সরকার। টেলিগ্রাম করেছে কখন ?

বুলি। (দেখিয়া) ন'টা পনেরো।

সরকার। গাড়ি কখন কখন আছে তো মনে পড়ছে না। টাইম টেবলটা কোথায় গেল ?

রেণু। (মুখ তোলে, একহাতে চুলটা পিছনে ঠেলিয়া দেয়) মার ঘরে, ডেস্কের ওপর।

সরকার। (বুলিকে) যা তো, নিয়ে আয়।

বুলি। (বসিয়াই থাকে—তাহার নড়িবার ইচ্ছা নাই) ডেস্কের ওপর কোথায় ?

রেণু। (উঠিয়া) আমি যাচ্ছি।

সরকার। তুই কেন, ও-ই যাক্ না। যা তো বুলি, ছোট্ট।

রেণু। থাক্ আমিই যাই। ও গেলেই মার কাগজ-পত্তর সমস্ত হাঁটকে একশা ক'রে দেবে।

[রেণুর প্রস্থান]

বুলি। (রেণু অন্তর্হিত হইবার পর) ওর কি হয়েছে ? টেলিগ্রামটা খুলতে পারল না কেন ?

সরকার। চিঠি না পেয়ে ওর ভয় হয়েছিল। ভেবেছিল তোর মার আবার অসুখ ক'রেছে।

বুলি। কেন, তুমি ওকে বললে না, পোস্ট অফিসে দেরি হচ্ছে ?

সরকার। ভেবেছিল আমি সেটা বানিয়ে বলছি, ওকে শান্ত করবার জন্যে।

বুলি। সত্যি সত্যি বানিয়ে ব'লেছিলে ?

সরকার। না। আমিও পোস্ট অফিসে দেরি হচ্ছে ব'লেই মনে করেছিলাম।

বুলি। (একটু থামিয়া) আচ্ছা, মা কী নিয়ে আসবে আমাদের জন্যে ?

সরকার। ছি। সে নিজে ফিরে আসছে তাতে হ'ল না, আবার 'কি নিয়ে আসবে' ?

বুলি। বা, মা কোথাও গেলেই তো আমাদের জন্যে কত-কি নিয়ে আসে। আমি ভাবছিলাম এবারে কি আনবে।

[রেণুর প্রবেশ]

টাইমটেব্‌লের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে রেণু ফিরিয়া আসে। বিড়বিড় করিতে করিতে ট্রেণের সময় খুঁজিয়া বাহির করে—সেটিতে গিয়া বসিয়া।

রেণু। একটা গাড়ি আস্‌বে চারটে পাঁচ মিনিটে। আরেকটা আট্‌টা সতেরোয়। এখন ক'টা ?

বুলি। (টেবিলে ঘড়ি দেখিয়া) পাঁচটা বেজে কুড়ি মিনিট।

রেণু। চারটের গাড়িতে এলে তো কখন বাড়ি পৌঁছে যেত।

সরকার। (আশা দিয়া) তা গাড়ি তো লেট্‌ও হয় অনেক সময়।

রেণু। সকালের গাড়ি কি আর ধর্‌তে পেরেছে। এমনিতেই যা দেরি ক'রে মার ঘুম ভাঙে। তায় আবার এখন অসুখের পরে।

বুলি। এর পরের গাড়িতে ঠিক আস্‌বে। স্টেশনে যাব তো, দিদিমা ? (উত্তরের অপেক্ষা করে, আবার যুক্তি দেখায়) আট্‌টায় তো মোটে সন্ধ্যেবেলা।

সরকার। হিমু যদি সঙ্গে যায় তবেই যেতে পার, নইলে নয়।

বুলি। (জানে, হেমজাকে রাজি করিতে তাহাকে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হইবে না। নিশ্চিন্ত হইয়া, রেণুকে) কি প'রে যাব ?

রেণু (নিস্পৃহভাবে) যা খুসি—নীল জামা, লাল মোজা।

বুলি। তার চেয়ে ছেয়ে জামাটা ঢের ভাল। আর তুই পরবি নীল কাপড়।

রেণু। (তাহার মনের আনন্দ চোখে মুখে ফুটিয়া বাহির হইতেছে) আমার যাহোক একটা হ'লেই হ'ল।

■ (উঠিয়া বুলির হাত ধরিয়া তাহাকে বোঁ বোঁ করিয়া পাক কয়েক ঘুরাইয়া দেয়) আঃ, কী মজা, না রে ? নাচ্‌ তো আজকের নতুন গানটা—রেণু গান ধরিয়া দেয় ; তাহার তাড়ায় বুলিও নাচিতে সুরু করে।* রেণুও ক্রমে নাচে যোগ দেয়। চাহিয়া চাহিয়া মিসেস সরকারের চক্ষু মমতায় আর্দ্র হইয়া আসে, তিনি একদৃষ্টে চাহিয়া বসিয়া প্রায় নিজের অজ্ঞাতেই হাতে গানের তাল রাখিতে থাকেন। নাচের মাঝখানে (হেমজা প্রবেশ) করে।

[হেমজার প্রবেশ]

হেমজা। (তাহার মনেও এই আনন্দের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে) বাবাঃ, এর মধ্যে নাচ পড়ে গেল !

মুগ্ধনেত্রে সে নাচ দেখিতে থাকে। ক্রমে দু'জনে একটু শ্রান্ত হইয়া থামিয়া যায়, সেটিতে গিয়া বসে। ■

হেমজা। মা আস্‌বে শুনে খুসি আর ধর্‌ছে না, না ? (মিসেস সরকারকে) দিদিমণির জন্যে আলাদা রান্না করব তো ?

সরকার। এমনি আজ কি কি হচ্ছিল ?

হেমজা। আপনাদের জন্যে হচ্ছিল ছোলার ডাল, ভাজা, কপিকড়াইশুঁটি, রুইয়ের মুড়িঘণ্ট, কইমাছের ঝোল ফুলকপি দিয়ে, আর মাটনচপ। মিষ্টি দু'টো।

বুলি। [আঙুল গণিয়া বলে] গ্র্যাম্‌ফেড্‌ মাটন, হিমুদি ?

হেমজা। হ্যাঁ, (সরকারকে) কিন্তু দিদিমণি কি এসব খাবেন ?

সরকার। তা আর কিছু করো না হয়, ভাল বুঝে।

বুলি। (আশ্বস্ত হইয়া, রেণুকে) চল্‌, রেডি হ'তে হবে না ?

রেণু। চল্‌। (ড্রেসিং গাউন তুলিয়া লইয়া গায়ে জড়ায়)

সরকার। এখুনি কোথায় চল্‌লি। হাওড়া যেতে কি আর বারো বচ্ছর লাগে। এখনও ঢের সময় আছে।

রেণু। তা হোক, আমরা একটু আগেই যাব। নইলে শেষে যদি মিস্‌ করে ফেলি মাকে ?

[জ্যোতির প্রবেশ]

বলিতে বলিতেই দ্বার ঠেলিয়া নিঃশব্দে জ্যোতি প্রবেশ করে। দরজায়ই দাঁড়াইয়া দৃষ্টি মেলিয়া ইহাদের দেখিতে থাকে, ইহাদের দিকে চাহিয়া তাহার চক্ষে স্নেহ ও আনন্দ উছলিয়া উঠে। রেণু ও বুলি একই সঙ্গে তাহাকে দেখিতে পায়। রেণু এই আকস্মিক বিস্ময় ও আনন্দে নির্বাক হইয়া যায়, যেন নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না এম্‌নি ভাবে সেই স্থানেই স্থির

* অভিনয়ে গান ও নাচ বাদ দিতে হইলে (■ ■) চিহ্নের মধ্যবর্তী অংশটুকু পরিত্যক্ত হইবে।

দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। বুলি উচ্চ সহর্ষ চিৎকার করিয়া ছুটিয়া গিয়া মায়ের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়ে—

বুলি। মা!

জ্যোতি। (আক্রমণের বেগ কোনমতে সাম্‌লাইয়া) মাণিক!

সস্নেহে সে বুলিকে বাহুতে জড়াইয়া লয়, বুলির মাথার উপর দিয়া তাহার দৃষ্টি গিয়া পড়ে রেণুর উপরে। দুই জনের চক্ষু এক হয়, দু'জনেরই মুখে ধীরে ধীরে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠে—পরম স্নেহ প্রীতি ও পরিচয়ের হাসি।

একমুহূর্ত্ত রেণুর প্রতি নিবদ্ধ থাকিয়া তারপর তাহার দৃষ্টি ঘুরিয়া গিয়া মিসেস সরকারের উপর পড়ে; সেখান হইতে গিয়া পড়ে হেমজার উপরে। তাহাদের সম্ভাষণ করিবার সময় তাহার কণ্ঠে বুলিকে অভ্যর্থনা করার তীব্র উচ্ছ্বাস নাই, কিন্তু তবু প্রচুর আনন্দের স্বাচ্ছন্দ্য আছে।

মা কেমন আছ? হিমু তুমি ভাল তো?

হেমজা। (সে-ই প্রথম কথা বলিবার মত কণ্ঠ খুঁজিয়া পায়। কলরব করিয়া) কি আশ্চর্য! এই কদিনেই কি রকম মোটা হয়ে এসেছেন দেখেছ! এমন তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে আমি তো আর দেখিনি মানুষকে—জন্মেও না। (মিসেস্ সরকারকে) তাই নয়?

সরকার। হ্যাঁ, আশ্চর্য রকম সেরে গেছে।

বুলি। (জ্যোতিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া) তোমাকে একেবারে নতুন রকম দেখাচ্ছে মা। আবার ঠিক আগেকার মত সুন্দর হ'য়ে গেছ।

জ্যোতি। (সকৌতুকে, সকলকে) আমার টেলিগ্রাফ পেয়েছিলে?

সরকার। হ্যাঁ, এই—মাত্তর এল।

জ্যোতি। এখন? আরও অন্তত ঘণ্টাতিনেক আগে আস্‌বার কথা। (ঘরের মধ্যে আগাইয়া আসে; বুলি তাহার হাত ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে আসে)

বুলি। জানো, আমি প'ড়ে শোনালাম সবাইকে। দিদিমার গেছে চশমা হারিয়ে, আর দিদি তো ভয়ে খুলতেই পারল না।

রেণু। (এতক্ষণে সে মাটির পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে। প্রতিবাদের স্বরে) বুলি!

জ্যোতি। (রেণুর দিকে চায়) ভয়ে!

রেণু। (দুর্বলতা ধরা পড়িয়া অপ্রতিভ) আমি ভাবলাম আবার তোমার অসুখ বেড়ে গেছে।

জ্যোতি। (বুলির হাত ছাড়াইয়া রেণুর কাছে যায়)

সরকার। (অপ্রতিভ অবস্থা হইতে রেণুকে উদ্ধার করিতে যান) ওর জন্মদিন, অথচ আজও তোর চিঠি এলো না দেখে—তাই।

জ্যোতি। (রেণুকে একহাতে বেষ্টন করিয়া নেয়, অনুতপ্ত কণ্ঠে) আমারই অন্যায় হয়েছে। (রেণুকে লইয়া সেটিতে বসে) ঠিক করেছিলাম কাউকে না জানিয়ে রাতারাতি চলে আসব, তারপর আজ ভোর বেলায় আচম্‌কা এসে প'ড়ে সবাইকে অবাক্ করে দেব। তাই চিঠি লিখিনি।

বুলি। তারপর দেরি করলে কেন? (আসিয়া মার অন্যপাশে বসে)

জ্যোতি। শেষ পর্য্যন্ত হয়ে উঠ্‌ল না আর কি। এটা সেটা কিনতে ঘোরাঘুরি ক'রে দেরি হয়ে গেল।

রেণু। তুমি আসবে তাই তো আমরা জানতাম না। এখনও সাত আট দিন তোমার থাক্‌বার কথা না?

জ্যোতি। এদিকে-যে তাড়া পড়্‌ল। দোকান থেকে টেলিগ্রাম পেলাম শিগগির করে চলে আসতে— তাদের আরও কটা মেয়ের জ্বর হ'য়ে গেছে এদিকে। আর দেখ্‌লাম বেশ সেরেও যখন গেছি, তবে আর মিছিমিছি সেখানে ব'সে থাকি কেন।

সরকার। তবু এমন ভালই যখন ছিলি ওখানে গিয়ে, আরও ক'টা দিন থেকে এলেই পারতিস্।

জ্যোতি। ভরসা হল না-যে। সাম্‌নে বড়দিনের সীজ্‌ন, দেরি করলে শেষে যদি ওরা অন্য লোক নিয়ে নেয়? সেই ভেবেই তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম। আর তা ছাড়া এমনিও হয়তো চলেই আসতাম আজকাল। (রেণুর দিকে চায়) আমার বরাবরই ইচ্ছে ছিলো রেণুর জন্মদিনে বাড়ি থাকবার চেষ্টা করব। (রেণুর চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠে। জ্যোতি একবার রেণুর একবার বুলির দিকে চায়) কিন্তু দেখা যাচ্ছে এদের নিয়ে আমি

না ভাবলেও পার্‌তাম। এই একমাস এরা খুব যত্নেই ছিলো দেখ্‌ছি।

হেমজা। যেমন দেখে গিয়েছিলেন ঠিক তেমনিটি রয়েছে কিনা তাই বলুন।

জ্যোতি। তার চেয়েও ঢের ভাল। এর চাইতে বেশি তাজা এদের আর কখনও দেখেছি ব'লে মনে হয় না। (বুলির মাথায় আঙুল দিয়া খিমচাইয়া দেয়—সে খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠে) (মিসেস সরকারকে) তোমার হাঁটু আজকাল কেমন আছে, মা ?

সরকার। (একটু হাসেন) যেমন থাকে বারোমাস। তবু এই কটা দিন গরম প'ড়ে একটু ভাল ছিলো।

জ্যোতি। তোমার ওযুধই হচ্ছে রদ্দুর। সূর্যের তেজ যেখানে যখন বেশি থাকে তার সঙ্গে সঙ্গে সারা বছর যদি ঘুরে বেড়াতে পার্‌তে—কিন্তু সে আর কি ক'রে হবে !

সরকার। হ্যাঁ, আমি গেলাম ব'লে ঘুর্‌তে। এক যদি তোরা সবাই আমার সঙ্গে যেতে পারিস, সে আলাদা কথা।

বুলি। (খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসে) কি মজা—আমরা সবাই মিলে পাগ্‌লা হ'য়ে সূর্যের পেছন পেছন খালি ছুটছি—ছুটছি—

(তাহার কল্পনার কৌতুক সকলের মুখেই হাসি আনে)

হেমজা। দিদিমণি, চা খাবেন তো এখন ?

জ্যোতি। এখন থাক। একটু আগেই খেয়েছি।

হেমজা। তা হোক। আমি যাই, জল বসিয়ে দিই গে। (দ্বারের কাছে গিয়া থামে) ভাল কথা, আপনার মালপত্তর সব কই ?

জ্যোতি। মালপত্তর সঙ্গে আনিনি কিছু। স্টেশন থেকে একজন সেগুলো নিয়ে আস্‌ছেন।

হেমজা। ও।

জ্যোতি। যাও, আমিও একটু পরেই আস্‌ছি রান্নাঘরে।

হেমজা। আচ্ছা।

[হেমজার প্রস্থান]

বুলি। মালপত্তর কে নিয়ে আস্‌ছে ?

জ্যোতি। (তাহার কান মলিয়া দেয়) সব কথা জানা চাই, না ? একজন লোক।

বুলি। আমরা চিনি তাকে ?

জ্যোতি। না। সেইখানে ব'সে চেনা হ'ল।

বুলি। পুরুষ না মেয়ে ?

জ্যোতি। পুরুষ।

বুলি। কি রকম দেখতে ?

জ্যোতি। একটু পরেই দেখতে পাবি।

রেণু। তিনি নিজেই আস্‌বেন লগেজ নিয়ে ?

জ্যোতি। হ্যাঁ।

রেণু। আমি যাই, জামা কাপড় বদ্‌লে আসি গে।

জ্যোতি। বোস্‌ না, তাড়া কিসের। তাঁর এসে পৌঁছোতে এখনও আধ ঘণ্টা। অত সব লটবহর, ছাড়ানো, মেলানো, তবে তো। (ড্রেসিং গাউনের দিকে ইঙ্গিত করিয়া) কিন্তু—এটা জড়িয়েছিস্‌ কেন ?

বুলি। আহা, ন্যাখা না মাকে। খোল্‌।

রেণু। উঠিয়া দাঁড়ায়; view দিবার জন্য একটু দূরে সরিয়া, ড্রেসিং গাউন খুলিয়া ফেলে; তারপর দেখিবার-মত করিয়া সুন্দর ভঙ্গিতে দাঁড়ায়। দেখিয়া মার কেমন লাগে তাই দেখিবার জন্য তাহার দৃষ্টি মার মুখের উপরে নিবদ্ধ।

জ্যোতি। (হৃষ্ট স্বরে) বাঃ, চমৎকার।

রেণু ও বুলি। (প্রায় একত্রে) দিদিমা নিজের হাতে বানিয়েছে।

জ্যোতি। (মিসেস সরকারের দিকে চায়, চক্ষু টিপিয়া—) কিন্তু মা, তোমাকে নিয়ে আর পার্‌লাম না। জানো আমি কত ক'রে ওদের গলাবন্ধ ফুল্‌-হাতা জামা পরাই।

সরকার। (কৃত্রিম অনুতাপ দেখাইয়া) তখুনি বলেছি আমার প্রাণ যাবে এই নিয়ে।

জ্যোতি। (হাসিয়া, তাঁহাকে আশ্বস্ত করে) তা হোক, ডিজাইনটা সত্যি চমৎকার হয়েছে।

বুলি। জানো মা, দিদিমা ওকে দশ টাকার একটা নোট্‌ দিয়েছে, আজ সকালে। সেটা কাউ।

জ্যোতি। (রেণুকে) কাছে আয় তো, দেখি এম্‌-ব্রয়ডারিটা। (রেণু সানন্দচিত্তে কাছে যায়। জ্যোতি জামার কারুকার্যগুলা লক্ষ্য করিয়া দেখে। তারপর, মিসেস সরকারকে—) এত সুন্দর ফুল, সব তুমি নিজে তুলেছ !

সরকার। (প্রীত) আমি খাঁটি মেমের কাছে শিখেছিলাম তা জানিস্? আচ্ছা, তোর দোকানের জন্যে এম্‌ব্রয়ডারির কাজ করে দিলে নেয় না?

জ্যোতি। (দ্বিধার সহিত) হাতের কাজে এত কম পয়সা দেয় ওরা—মোটেই খাটুনি পোষায় না। (বুলির দিকে দৃষ্টি পড়িয়া) ও কি, তুই ও কি কর্‌ছিস্?

বুলি ইতিমধ্যে একটানে মাথা গলাইয়া তাহার ফ্রক খুলিয়া ফেলিয়াছে। তাহার পরণে এখন আছে অন্তর্বাসের উপরে শুধু শাদা ইজার ও ব্লাউজ।

বুলি। (রেণুর শাড়ি ধরিয়া টান দিয়া) এই, আমাকে দে না একটু পরি।

রেণু। এত বড়, তোর গায়ে হবে কেন?

বুলি। তাতে কিছু হবে না। (ব্লাউজ খুলিতে আরম্ভ করে)

রেণু। তাহ'লে চল্ শোবার ঘরে, খুলে দিচ্ছি।

বুলি। (মুখ কুঞ্চিত করিয়া) ঈঁহ্! বাবা, কে এখানে তোকে দেখ্‌তে আস্‌ছে। আচ্ছা, এইটে প'রে খুলে দে। (ড্রেসিং গাউনটা রেণুর হাতে তুলিয়া দেয়)

রেণু একবার অনুমতির জন্য মা ও দিদিমার দিকে তাকায়, তারপর ড্রেসিং গাউন জড়াইয়া তাহার নিচে শাড়িটা ছাড়িয়া দেয়। বুলি সেটাকে কুড়াইয়া লয়।

বুলি। (শাড়ি লইয়া) বা, ব্লাউজ শুদ্ধ।

রেণু। ব্লাউজ খুল্‌ব কি ক'রে? দেখ তো দিদিমা।

বুলি। কেন, ঝুলিটা একটুক্ষণ খুলে নিলেই তো হয়।

রেণুর পরণে আছে শুধু শেমিজ আর ব্লাউজ, সেই অবস্থায় সে ড্রেসিং-গাউন খুলিতে রাজি নয়। অসহায় দৃষ্টিতে সে মা ও দিদিমার দিকে তাকায়। বুলি অস্থির হইয়া উঠে। অগত্যা রেণু ড্রেসিং-গাউন খুলিতে উদ্যত হয়। ঠিক এমনি সময়ে অতর্কিতে দরজা খুলিয়া হেমজা প্রবেশ করে।

(হেমজার প্রবেশ)

তাহার ভাবে বোঝা যায় সে কাহাকেও আগাইয়া লইয়া আসিয়াছে। দ্বার খুলিয়া ধরিয়া সে ভিতরে চায়, দরজার বাহিরের দিকে ইঙ্গিত করিয়া জ্যোতিকে খবর জানায়, ওদিকে দ্বারের মুখে জয়ন্তকে অর্দ্ধপ্রবিষ্ট দেখা যায়

(জয়ন্তর প্রবেশ)

হেমজা। দিদিমণি, মিঃ চৌধুরী এসেছেন।

রেণু। (চমকাইয়া, ভয়ার্ত কণ্ঠে) অ্যাঁ—না না না, হিমুদি—! (গাউনটাকে যথাসাধ্য আঁট করিয়া গায়ে জড়াইয়া ঘরের পিছনের ডান কোণে সরিয়া যায়।)

বুলি। (প্রায় তাহার সঙ্গে সঙ্গেই, চিৎকার করিয়া) এই, পুরুষ মানুষ না—পুরুষ মানুষ কেউ যেন আসে না। (বোতাম খোলা ব্লাউজ তাহার তখনও পরা। শাড়ি ফেলিয়া ছুটিয়া গিয়া, সে দিদিমার সোফার পিছনে লুকায়।)

হেমজা। (প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, ঘরের মধ্যেকার অবস্থাটা চোখে পড়িয়া) এ কি! (মুখ ফিরাইয়া, খুব তাড়াতাড়ি জয়ন্তকে) আজ্ঞে, একটুক্ষণ· ·মানে মেয়েরা রয়েছে······

জয়ন্ত। (অবস্থা বুঝিয়া, একটু হাসেন) আচ্ছা (আবার দ্বারের বাহিরে সরিয়া যান)

[জয়ন্তর প্রস্থান]

জ্যোতি। (এই আকস্মিক আতঙ্ক ও ছুটাছুটি দেখিয়া হাসিয়া ফেলে, তাড়াতাড়ি যাইয়া দ্বার আগ্‌লাইয়া দাঁড়ায়) এক মিনিট, মিঃ চৌধুরী। ডাইনিং রুমটায় গিয়ে একটুক্ষণ বসুন। মানে এত শিগগির এসে পড়্‌বেন আমরা মনে করি নি।

হেমজা। (বাহির হইয়া গেছে) এই-যে, এই দিক দিয়ে Sir, (বোঝা যায় সে জয়ন্তকে পথ দেখাইয়া গেল) [হেমজার প্রস্থান]

জ্যোতি। দরজা ভেজাইয়া দিয়া, ঘরের মধ্যে মুখ ফিরাইয়া চায়) হয়েছে এবার বেরিয়ে আয়। বাঘ চ'লে গেছে।

বুলি। (বাহির হইয়া আসে) বাবাঃ কী ভীষণ বেঁচে গেলাম, তাই না?

রেণু। সে ইতিমধ্যে ড্রেসিং গাউনে নিজেকে প্রায় প্যাক করিয়া ফেলিয়াছে) তোর আর কি। তুই তো এখনও বাচ্ছা।

বুলি। আমার ইজেরটা যা বিচ্ছিরি।

জ্যোতি। (সকৌতুকে) যাঃ পালা। গিয়ে কাপড় চোপড় প'রে ঠিক হয়ে আয়—শিগগির।

রেণু ও বুলি বিনা বাক্যব্যয়ে খুলিয়া-ফেলা জামা কাপড় তুলিয়া লইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করে। ওদিক দিয়া হেমজা ফিরিয়া আসে।

[হেমজার প্রবেশ]

হেমজা। (অনুতপ্ত কণ্ঠে, রেণুকে) আমারই দোষ রেণু। নানান্ গোলমালে আমার খেয়ালই ছিলো না তোমরা এখানে রয়েছ।

রেণু। (যাইতে যাইতে) তাতে কি—তুমি তো আর জান্‌তে না।

[রেণুর প্রস্থান]

হেমজা (বুলিকে) তুমিও ন্যাংটো হ'য়ে ব'সে আছ তো ?

বুলি। দিদির মত সাটিনের ইজের থাক্‌লে আমার একটুও লজ্জা কর্‌ত না।

সরকার। (মৃদু ধমক দিয়া) এই, বুলি!

বুলি। Sorry. (তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে)

[বুলির প্রস্থান]

জ্যোতি। (হাসিয়া) ও, তাই! (হেমজাকে) মিঃ চৌধুরীকে আমি বুঝিয়ে বল্‌ব'খন।

[জ্যোতির প্রস্থান]

হেমজার মুখে চোখে কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠে। জ্যোতি যাইবার জন্য সে দ্বার খুলিয়া ধরে, তারপর দ্বার ভেজাইয়া দিয়া মিসেস্ সরকারের কাছে আসে।

হেমজা। আমার একবারে মাথা কাটা যাচ্ছে। রেণুকে এমন লজ্জায় ফেল্‌লাম—ছি ছি।

সরকার। না না, ও নিয়ে মন খারাপ কোরো না। তোমার তো আর দোষ ছিল না, সেকথা রেণুও বুঝবে।

হেমজা। (আশ্বস্ত হইয়া) তা বুঝবে। আর বুলিটি যা হয়েছে—যেখানে থাক্‌বে সেইখানেই একটা না একটা কাণ্ড বাধিয়ে রাখবে।···যাই, ভদ্রলোককে চা এনে দিই।

সরকার। হ্যাঁ, যাও।

দ্বারের বাহির হইতে জ্যোতি ও জয়ন্তর স্বর ভাসিয়া আসে।

হেমজা। (কান পাতিয়া) এই যে এসে পড়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখে ও দেহে শিক্ষিত ভৃত্যের কেতা-দুরস্ত ভাব ফুটিয়া উঠে। দরজার দিকে আগাইয়া যাইতেই দ্বার ঠেলিয়া জ্যোতি ও তাহার পিছনে জয়ন্ত প্রবেশ করেন।

[জ্যোতি ও জয়ন্তর প্রবেশ]

হেমজা তাড়াতাড়ি একপাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাদের পথ ছাড়িয়া দেয়, তারপর তাঁহাদের পিছনে দরজা ভেজাইয়া দিয়া, চলিয়া যায়।

[হেমজার প্রস্থান]

জ্যোতি। (কথা বলিতে বলিতে আসে) আচ্ছা, তার জন্যে আট্‌কাবে না। এক আধদিন চালিয়ে নেবার মত কাপড়চোপড় বাড়িতেও আছে তো।

আমার সেক্রেটারিকে ব'লে দিয়েছি, পরের ট্রেনটা meet কর্‌বার জন্যে। সেই ট্রেনেই এসে পড়বে ঠিক।

জ্যোতি। (আগাইয়া আসিয়া, পরিচয় করাইয়া দেয়) এই যে মা—ইনি হচ্ছেন মিঃ জয়ন্ত চৌধুরী। আমার মা, মিসেস্ সরকার।

মিসেস্ সরকার জয়ন্তর দিকে চাহিয়া দেখিয়াই, যেটুকু চক্ষে পড়ে সেটুকুকে একনিমেষে পছন্দ করিয়া ফেলেন। ইচ্ছা থাকিলেও হঠাৎ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া অভ্যর্থনা করা তাঁহার সাধ্যের বাহিরে। অগত্যা যথাসাধ্য নড়িয়া চড়িয়া সচল হইয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করেন, জয়ন্ত প্রতি-নমস্কার করিয়া কাছে আগাইয়া যান।

সরকার। নমস্কার।

জয়ন্ত। নমস্কার। আপনাদের সবার কাছে একটু মাপ চাইবার আছে আমার।

সরকার। না না, বরং ঠিক তার উল্‌টো। বসুন।

জ্যোতি। (সেটিতে মার কাছাকাছি বসে) বসুন, মিঃ চৌধুরী।

জয়ন্ত। (তাহার আহ্বান সত্ত্বেও, সেটিতে না বসিয়া মিসেস্ সরকারের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসেন) ওঁকে কেমন দেখছেন বলুন। বেশ সেরে গেছেন না ?

সরকার। হ্যাঁ, চেঞ্জটাতে ভারি কাজ দিয়েছে। আমরাও তাই বলাবলি করছিলাম। এত আশ্চর্য ফল হবে আমরা কেউ ভাবিনি।

জয়ন্ত। (জ্যোতির উপর দৃষ্টি রাখিয়া) হ্যাঁ, ফল হয়েছে সত্যিই।

জ্যোতি। (তাড়াতাড়ি, নিজের বিব্রত অবস্থা লুকাইতে চায়) মিঃ চৌধুরী আমাকে খুব রোগা অবস্থায় প্রথম দেখেছিলেন কিনা। যাবার দিনে উনি আমাকে নিতে স্টেশনে এসেছিলেন, হেনার সঙ্গে।

সরকার। ও, আপনিও বোসেদের বাড়িতে ছিলেন?

জয়ন্ত। হ্যাঁ। আমার তাঁরা অনেকদিনের বন্ধু।

[হেমজার প্রবেশ]

বড় ট্রে করিয়া তিনজনের উপযোগী চায়ের সরঞ্জাম লইয়া হেমজা প্রবেশ করে। নিচেকার folding পায়া খাড়া করিয়া সেটা জ্যোতির সম্মুখে বসাইয়া দেয়।

জ্যোতি। (জয়ন্তকে) এই হচ্ছে মিসেস্ দাস। বুলি হবার সময় থেকেই আমাদের বাড়িতে আছে।

হেমজা। (ফিরিয়া, নমস্কার করে)

জয়ন্ত। (নমস্কার ফিরাইয়া দিয়া) ও, বুলির হিমুদি?

হেমজা। (সবিনয় স্বাচ্ছন্দ্যের স্বরে) আজ্ঞে।

জয়ন্ত। তোমার নামে অনেক কথাই আমি শুনেছি।

হেমজা। (একবার জ্যোতির দিকে চায়) নিন্দের কিছু শোনেন নি আশা করি?

জয়ন্ত। (সকৌতুকে) তা ঠিক ক'রে কী বলা যায়।

হেমজা। (সে সুশিক্ষিত ভৃত্য, সবিনয় নীরব মৃদু হাস্যে এই কৌতুকটুকুকে মানিয়া নেয়। জ্যোতিকে) দেখুন, আরও কিছু চাই?

জ্যোতি। (সে ততক্ষণ চা তৈরি করিতে সুরু করিয়াছে) না, এইতেই হবে। তুমি ওদের হ'য়ে গেলে এখানে পাঠিয়ে দিও।

হেমজা। দিচ্ছি।

[হেমজার প্রস্থান]

জ্যোতি। (চা ও খাবার আগাইয়া দিয়া) মিঃ চৌধুরী।

জয়ন্ত। (চা নিতে অগ্রসর হইয়া) মিসেস্ সরকার?

সরকার। না, আমার এখন অসময়ে খাওয়া বারণ।

জয়ন্ত সেকথা কানে না তুলিয়া উঠিয়া যান, চা ও খাবার লইয়া মিসেস্ সরকারের সম্মুখে ধরেন।

সরকার (অগত্যা) আচ্ছা, একটু চা শুধু। থ্যাঙ্ক্ ইউ। (চা নেন)

জয়ন্ত। (জ্যোতিকে) আপনি আরও কিছু খাবার নিলেন না যে? জার্নির পরে খালিপেটে থাকা উচিত নয়।

জ্যোতি। না, এই ঢের। এখন আর একগাদা গিলব না। (জয়ন্তর দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসে) এমনিই বেশ সুস্থ আছি।

জয়ন্ত। (নিজের চা ও খাবার তুলিয়া লইয়া আবার আসিয়া স্বস্থানে বসেন) রুগী নিজের ইচ্ছেমত চললে হবে কেন।

তিনজনে বসিয়া ধীরে ধীরে চায়ে চুমুক দিতে দিতে কথা বলিতে থাকেন। রেণু-বুলির প্রবেশের একটু আগেই তাঁহাদের খাওয়া শেষ হইয়া যায়।

সরকার। পথে কোন অসুবিধে হয়নি তো?

জ্যোতি। একটুও না।

সরকার। বড়দিনের মুখ—ভিড় হয়নি গাড়িতে?

জয়ন্ত। দেখিনি তো। দমদমে এসে পৌঁছানো পর্যন্ত আমরা মেঘের ওপরেই ছিলাম কিনা।

জ্যোতি। (জানে কথাটা শেষপর্যন্ত গোপন থাকিবে না, কাজেই বলিয়া দেয়) আমরা এরোপ্লেনে করে এলাম।

সরকার। (শঙ্কিত হইয়া) এরোপ্লেনে ক'রে! (তাঁহার মুখ গম্ভীর হইয়া যায়)

জ্যোতি। হ্যাঁ। (মার মুখে গাম্ভীর্য লক্ষ্য করিয়া) শুনতে যেরকম, সত্যি তেমন ভয়ের কিছু নয়। আর তার উপরে আমি একটা accident insuranceও ক'রে নিয়েছিলাম।

সরকার (ক্ষুব্ধস্বরে) সত্যি সত্যি একটা কিছু ঘটে গেলে সে টাকা আমার ভারি কাজে লাগত! এই বাদলার দিনে—

জ্যোতি। অসুখ সেরে গিয়ে আমার মনে হচ্ছে যেন নতুন ক'রে আবার বেঁচে উঠেছি। তাই তাকে নিয়ে একটু উৎসব করলাম।

জয়ন্ত। দোষটা আমার, মিসেস্ সরকার। আমিই জোরজার ক'রে ওঁকে রাজি করেছিলাম।

জ্যোতি। উড়ে আসতে আমার এমন আরাম লেগেছে মা, জানলে তুমি কক্ষনো রাগ করতে না। এমন মজা অনেক—অনেক বছর পাইনি।

সরকার। (শান্ত কণ্ঠে) কিন্তু শুধু মজার লোভে তুই যদি নিজের জীবনকে বিপন্ন করিস্, সেটা কি আমার ভাল লাগবার কথা ?

জ্যোতি। (উঠিয়া কাছে যায়, মাকে একটু আদর করিয়া) রাগ করে না, বাইরের লোকের সামনে। আর পরের বারে তো তুমিও থাক্‌বে আমাদের সঙ্গে।

সরকার। (কিঞ্চিৎ ভিজিয়া) তা অবিশ্যি, কেমন লাগে একবার চ'ড়ে দেখলেও হয়।

জ্যোতি। (বিজয়িনী) কেমন, এইবার ? নিজের বেলায় আঁটিসুটি—না ?

সরকার। সবাই মিলে একসঙ্গে থাকলে সে অন্য কথা।

জয়ন্ত। ভয় সেই, আপনার অনুমতি না হ'লে ওঁকে আর আমি এরোপ্লেন চড়তে দিচ্ছিনে।

দরজার বাহির হইতে হঠাৎ বুলির উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ আসে, তাহার সঙ্গে রেণুর চাপাগলায় মৃদু ভর্ৎসনা। তারপর আবার নিস্তব্ধতা। ঘরের সকলে সচকিত হইয়া উঠেন।

জ্যোতি। (জয়ন্তকে) এতক্ষণে বুঝি হ'ল ওঁদের।

জয়ন্ত উৎসুক দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকান। দরজা খুলিয়া রেণু ও তাহার পিছনে বুলি আসে।

(রেণু ও বুলির প্রবেশ)

দু'জনেরই চালচলন পরম ভদ্র। জ্যোতি হাসিমুখে আগাইয়া যাইয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করে। জয়ন্তও উঠিয়া একটু আগাইয়া যান। রেণু ও বুলি উভয়েই ইতিমধ্যে কাপড় বদ্‌লাইয়া বেশ সাদাসিধা অথচ সুষ্ঠু জামাকাপড় পরিয়াছে। তাহাদের সমস্ত পরিচ্ছদের মতই, এই পোষাক বেশি দামের না হইয়াও সুন্দর ও সংযত সুরুচির পরিচায়ক। তাহাদের পিছনেই আসে হেমজা।

(হেমজার প্রবেশ)

মিসেস্ সরকারকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়া, সে চায়ের সরঞ্জাম গুছাইয়া তুলিতে থাকে।

এদিকে জ্যোতি মেয়েদের জয়ন্তর সহিত পরিচয় করাইয়া দেয়।

জ্যোতি। আয়। ইনি হচ্ছেন মিঃ জয়ন্ত চৌধুরী। আমার বড় মেয়ে রেণু।

রেণু নম্র নমস্কার করে। জয়ন্ত প্রতি নমস্কার করিয়া হাত বাড়াইয়া তাহার প্রসারিত হাত স্পর্শ করেন। দু'জনে পরস্পরের চোখে একটুক্ষণ চাহিয়া থাকেন, তারপর দু'জনেরই মুখে বন্ধুত্ব-স্বীকৃতির মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠে।

জয়ন্ত। (হ্যাণ্ডশেক করিয়া) হঠাৎ এসে প'ড়ে তোমাদের বিপদে ফেলেছিলাম, তার জন্যে রাগ করোনি তো ?

রেণু। না না। আমাদেরই অন্যায় হয়েছিল বস্‌বার ঘরকে ড্রেসিংরুম ক'রে তোলা।

জ্যোতি। আর এঁর নাম হচ্ছে বুলি।

জয়ন্ত গম্ভীরভাবে নমস্কার করেন, বুলি তাড়াতাড়ি প্রতি-নমস্কার করে।

জয়ন্ত। (তাহার প্রসারিত হাত ধরিয়া ঝাঁকি দিয়া) কেমন আছেন ?

বুলি। (সে সারাক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাঁহাকে অধ্যয়ন করিতেছিল) ভাল আছি। থ্যাঙ্ক ইউ।

হেমজা। (পিছন হইতে, কাছে আসিয়া, মৃদুস্বরে) দিদিমণি।

জ্যোতি। (ফিরিয়া) কেন ?

হেমজা। (মৃদুস্বরেই) রাতের খাবার—? কিছু বাজার ক'রে আন্‌তে হয় যদি। (ইঙ্গিতে প্রশ্ন করে, জয়ন্ত খাইবেন কিনা)

জ্যোতি। (মৃদুস্বরে) কেন এমনি যা আছে তাই দিয়েই চল্‌বে না একটা বেলা ?

হেমজা। (মৃদুস্বরে) এমনি তো আজ হচ্ছিল ভাল, ভাজা, কপি, মুড়িঘণ্ট, মাছ আর মাটন চপ্।

বুলি। (তাহার কাণে কিছুই এড়ায় নাই। চুপি চুপি বলিয়া দেয়) গ্র্যাণ্ড্‌ফেড্।

জ্যোতি। (মৃদুস্বরে) আমার জন্যে আর নতুন কিছু কর্‌তে হবে না। তবে—(জয়ন্তকে) মিঃ চৌধুরী, অমনি এখানে চারটি খেয়েই যান না।

জয়ন্ত। তার চেয়ে আমি একটা কথা বল্‌তে পারি? সবাই মিলে চলুন না আমার সঙ্গেই দু'টি খেয়ে আস্‌বেন। (বলিতে রেণু ও বুলির দিকে চাহিয়া তাহাদেরও কথার মধ্যে টানিয়া নেন) তারপর বরং একটু থিয়েটারে যাওয়া যাবে?

রেণু ও বুলি একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চায়,—এতখানি সুসংবাদ তাহাদের বিশ্বাস হইতেছে না। তারপর পরস্পরের দিকে তাকায়। ইহাদের প্রতি হেমজার অসীম স্নেহ, তাহারও মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠে। কিন্তু প্রসন্ন হইতে পারে না নিঃসংশয়ে, জ্যোতি নিজে। মেয়েদের হ্যাংলা করিয়া তোলার সে অত্যন্ত বিরোধী, সে চেতনা তাহার সদাজাগ্রত। সবিনয়ে সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু উত্তর দিতে তাহার দেরি হয় না।

জ্যোতি। (একটু থামিয়া) অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু সে হয় না।

রেণু ও বুলি মিনতির দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকায়—আশাভঙ্গের ম্লান ছায়া তাহাদের মুখে পরিস্ফুট, বিশেষ করিয়া বুলির। হেমজাও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে। কিন্তু মুখ ফুটিয়া জ্যোতিকে বলিবার সাহস কাহারও হয় না।

জয়ন্ত। (জানেন, জ্যোতির কোথায় বাধিতেছে) অন্তত আজ রেণুর জন্মদিন ব'লেও? আমি ভারি দুঃখিত হব আপনারা না এলে।

জ্যোতি। (একটুক্ষণ দ্বিধাভরে মৌন থাকে, তারপর বুঝিতে পারে প্রতিবাদ করিয়া জয়ন্তকে নিরস্ত করা যাইবে না) আচ্ছা—আজ যখন রেণুর জন্মদিন—।

রেণু ও বুলির আবার নিশ্বাস বহিতে সুরু করে। হেমজা স্পষ্টই আনন্দিত হইয়া উঠে।

রেণু। (আনন্দে উজ্জ্বল চক্ষে) থ্যাঙ্ক ইউ।

বুলি। (কথাটা প্রায় তাহার উচ্চারণই হয় না, সে এত হৃষ্ট) থ্যাঙ্ক ইউ।

হেমজা। (আশ্বস্ত হইয়া) দিদিমণি, ওদের পার্টির কাপড় বার করে দেব তো?

জ্যোতি। দাও।

হেমজা। আমি যাই, সেগুলোকে ইস্তিরি করে দিই গে। (চায়ের ট্রে তুলিয়া লইয়া চলিয়া যায়, গতিভঙ্গিতে আনন্দের পরিচয় ছড়াইয়া)

[হেমজার প্রস্থান।]

জয়ন্ত। (হৃষ্টচিত্তে) এবারে, কি প্লে দেখ্‌তে যাবেন বলুন। আপনি, মিসেস সরকার।

সরকার। আমি? আমি যাবনা তো।

(প্রায় একত্রে, কোলাহল করিয়া)

রেণু। বা কেন দিদিমা?

বুলি। বা রে, যেতেই হবে তোমাকে।

জ্যোতি। চলো না, মা।

সরকার। আমাকে নিয়ে গেলে তোমরাই মুস্কিলে পড়্‌বে। তোমাদের সঙ্গে পা চালিয়ে হাঁটা আমার কর্ম নয়।

জয়ন্ত। (কোলাহলে যোগ দিয়া) কি বিপদ, হাঁটতে বলেছে কে আপনাকে—যাবেন তো আমার গাড়িতে ক'রে। ওসব ওজর টিক্‌ছে না।

সরকার। (সম্মতি জানাইতে একটু হাসেন) তাহলে অবিশ্যি···আচ্ছা। থ্যাঙ্ক ইউ। (রেণুর দিকে চাহিয়া) কিন্তু প্লেটা রেণুর ইচ্ছেমতনই হোক না, যখন ওরই জন্মদিন।

সকলে রেণুর মতামতের জন্য প্রতীক্ষা করেন।

রেণু। (নম্রভাবে, জয়ন্তকে) আপনার কোন্ কোন্ বই দেখা হয়ে গেছে?

জয়ন্ত। সে তোমার ভাব্‌তে হবে না। তুমি কোন্‌টা কোন্‌টা দেখেছ?

জ্যোতি। সেটা বলা শক্ত নয়। (পরিবারকে উদ্দেশ করিয়া) আমি যদ্দিন বাইরে ছিলাম তার মধ্যে তোমরা থিয়েটারে যাও নি বোধ হয়? (সকলে মাথা নাড়িয়া 'না' জানায়) আমার অসুখের মধ্যেও নিশ্চয়ই যাওনি। (জয়ন্তকে) তা হলে তো কথাই নেই—সব কটাই আমাদের কাছে নতুন, যেটাতে খুসি যেতে পারি আমরা।

বুলি। (আর কথাটা চাপিয়া রাখিতে পারে না) আমরা 'রীতিমত নাটক'টা দেখ্‌বার জন্যে একেবারে।······*

* সুবিধামত যে-কোনো একটা তখনকার craze বইয়ের নাম করা যাইতে পারে।

জয়ন্ত। বাঃ, আমারও তো ঠিক ওইটেই দেখ্‌বার ইচ্ছে ছিলো।

রেণু। (এই কথাটা অকপটে বিশ্বাস করে। আনন্দিত স্বরে) সত্যি ?

জয়ন্ত। আচ্ছা, আর খাওয়াটা চীনে হোটেলে—কেমন ?

বুলি। হ্যাঁ, হ্যাঁ।

রেণু। আচ্ছা।

জয়ন্ত। কখন বেরোবেন তাহ'লে—স'সাতটা ?

বুলি। (এ সমস্ত খবর তাহার মুখস্থই থাকে) সাড়ে আট্‌টায় প্লে সুরু।

রেণু। লেট্‌ হয়ে যাব না তো ?

বুলি। ও বাবা, না না, তার চেয়ে আগেভাগে যাওয়াই ভাল।

সরকার। এই ধরুন সাতটা।

জয়ন্ত। তা আরও একটু আগে যাওয়া যায়—পৌনে সাতটা ?

বুলি। (ততক্ষণে জয়ন্তকে একেবারে অন্তরঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছে) হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই বেশ। খুব অনেকক্ষণ ধ'রে ব'সে ব'সে খাওয়া যাবে।

রেণু। বুলি !

বুলি। (তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংযত করে) sorry।

জয়ন্ত। (জ্যোতিকে) আমি বরং এখুনি একটা ফোন ক'রে দিই সীটের জন্যে।

জ্যোতি। তা দিন্‌। (দেয়ালে প্লাগ্‌-পয়েন্টের দিকে চাহিয়া) ফোন্‌টা কোথায় গেল ?

রেণু। ও ঘরে তো ছিল।

বুলি। (জয়ন্তকে মুগ্ধ করিতে চায়, সগর্বে) আমাদের ফোনটাকে খুলে যেখানে খুসি নিয়ে বসানো যায়। দিদিমার বাতের অসুখ ব'লে তাই। নিয়ে আস্‌ব এখুনি ?

জয়ন্ত। থাক, আমিই ওঘরে যাচ্ছি। আরও কটা call অমনি সেরে নোব।

বুলি। (ততক্ষণে সে দরজার কাছে গিয়া হাজির হইয়াছে) চলুন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাকে।

জ্যোতি। তোকে যেতে হবে না। উনি চেনেন।

বুলি। সত্যি চেনেন ?

জয়ন্ত। (যাইতে যাইতে) হ্যাঁ।

[জয়ন্তর প্রস্থান]

বুলি। (তাহার আর তর সহিতেছে না) আমি যাই মুখটুখ ধুয়ে আসিগে।

রেণু। এই, বাথরুম জুড়ে সারাদিন ব'সে থেকোনা আবার।

বুলি। আমার দু'মিনিটের মধ্যে হ'য়ে যাবে। (ছুটিয়া চলিয়া যায়)

[বুলির প্রস্থান]

জ্যোতি। (পিছন হইতে ডাকিয়া বলিয়া দেয়) বেশ ভাল ক'রে মুখ ধুস্‌ কিন্তু।

সরকার। (ইতিমধ্যে হাতের শেলাই-পত্র গুছাইয়া তুলিয়া রাখিতেছিলেন, শেষ করিয়া একটু উঠিবার চেষ্টা করেন) আয়তো রে রেণু, ধ'রে একটু তুলে দে আমায়।

রেণু। দাঁড়াও আমি Start দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। তাড়াতাড়ি যাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া সন্তর্পণে খাড়া করিয়া দেয়, তারপর একটা বাহুর উপরে তাঁহার ভার নেয়।

দেখি, সোজা হয়ে দাঁড়াও আগে—

(মিসেস সরকার চেষ্টা করিয়াও ঠিক খাড়া থাকিতে পারেন না)

একভাবে অতক্ষণ ব'সে থাকলে পা ধ'রে যাবে না তো কি।

সরকার। (কষ্টে মৃদুমন্দগতিতে দ্বারের দিকে যাত্রা করেন) হ্যাঁ, তাই গেছে দেখ্‌ছি।

রেণু। (যাইতে যাইতে) একসারসাইজ ক'রেছিলে আজ ?

সরকার। (অপরাধীর মত) না।

জ্যোতি। (উঠিয়া) আমিও ধর্‌ব ?

সরকার। থাক, এতেই হবে।

রেণু। ডক্টর সেন কি বলেছেন মনে আছে ? রোজ একসারসাইজ কর্‌তে হবে, ফাঁকি দিলে চল্‌বে না।

সরকার। আমার হাঁটু দু'টো আর পিঠটা ডক্টর সেনকে দিয়ে দিতে পার্‌লে তখন দেখতাম তিনি

নিজে কতখানি একসারসাইজ করেন।···থাক আর লাগবে না।

[মিসেস সরকারের প্রস্থান]

রেণু তাঁহার জন্য দরজা খুলিয়া ধরে, দ্বারে দাঁড়াইয়া একটুক্ষণ দেখে তিনি ঠিক যাইতে পারিতেছেন কিনা, তারপর ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসে। জ্যোতি তাহার প্রতীক্ষায় সেটিতে বসিয়া আছে।

রেণু। বেচারী! শক্ত ক'রে কথা বল্‌তেও এমন দুঃখ হয়।

জ্যোতি। (ঈষৎ একটু হাসি গোপন করিয়া) ওঁর নিজেরই ভালর জন্য বলা, সেকথা মাও জানেন।

রেণু ধীরে ধীরে মার কাছে যায়—এতক্ষণে এই অত্যন্ত চাপা ও নম্র মেয়েটি নিজের আনন্দপ্রকাশের নিভৃত অবসর পাইয়াছে। পাশে বসিয়া মার গায়ে মুখ লুকাইয়া বলে—

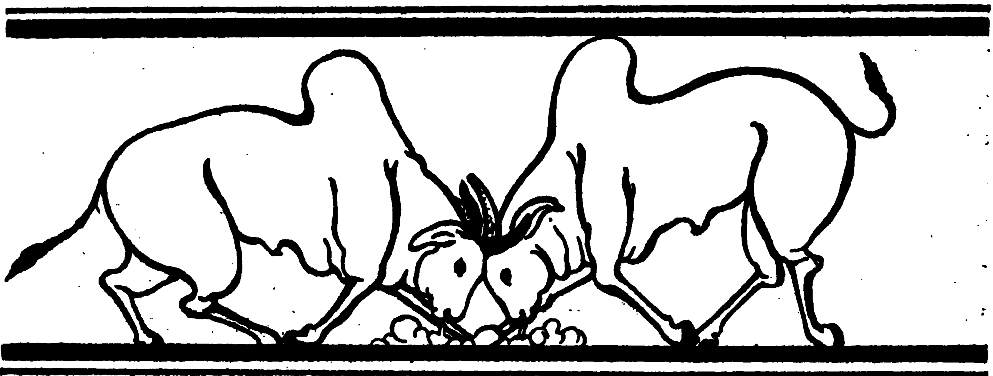
রেণু। তুমি ফিরে এসেছ ব'লে আমার এমন ভাল লাগ্‌ছে, মা।

জ্যোতির মুখ স্নেহ ও আনন্দে টলটল করিতে থাকে, একটা হাত দিয়া সে রেণুকে বেষ্টন করিয়া লয়—আরেক হাতে নিঃশব্দে তাহার চুল গুছাইয়া দিতে থাকে।

একমুহূর্ত এম্‌নি নিবিড় হইয়া তাহারা বসিয়া থাকে; তারপর হঠাৎ রেণু আনন্দের আবেগে দুই হাত ছুঁড়িয়া মাকে জড়াইয়া ধরে—

Is'nt lifes weet ! ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িয়া যায়।

—ক্রমশঃ



শোভাযাত্রা

শ্রীহেমচন্দ্র বাগ্‌চী

গ্রীসীয় বাহিনী

আমার ভুবন ভরি' চলিয়াছে গ্রীসীয় বাহিনী—
শুভ্র, ঋজু, সুঠাম, সুন্দর !
শুধু তা'রা চলিয়াছে সারি সারি দীপ্ত যোদ্ধৃবেশ
উদয়-সমুদ্র হ'তে অস্ত-সাগরের প্রান্ত পথে—
পার হ'য়ে এল তা'রা কত মরু, কত না সাহারা।
মিশরের নাগরীর রক্ত ওষ্ঠ খুঁজিছে তা'দের।
রুধিরাক্ত অভিযান শেষ হ'ল মরণ-সাগরে।
তবু তা'রা চলিয়াছে সারি সারি দীপ্ত যোদ্ধৃবেশ—
শুভ্র, ঋজু, সুঠাম, সুন্দর !
নেত্রে ভাসে ধূলিধূম, কানে আসে অশ্বক্ষুরধ্বনি
—কত মরুপথ হ'ল পার
রৌদ্রখর কত মরুপথ
সে পথের মেলে না উদ্দেশ !

রণকোলাহল

আমার জগতে শুধু উঠিতেছে রণকোলাহল,
পুরাতন সারাসেন স্কন্ধে বহে শাণিত কুঠার,
সদ্যশ্ছিন্ন শত্রুশির পদতলে পড়িছে লুটায়ে
—কঠোর, কঠিন, মূঢ় রক্তলোলুপতা।
গিরিসঙ্কটের পথে কভু কৃষ্ণসাগরের বুকে
খর্জ্জুরআসবসিক্ত ওষ্ঠাধরে নাহিক করুণা
খররৌদ্র ধরিয়াছে আঁখিপ্রান্ত নেশার মতন—
কত ওয়েসিস্ হ'ল পার—
শ্রান্ত হ'ল কত মরীচিকা
আমার জগৎ ভরি' শুনি সেই রণকোলাহল।

আরণ্যক

আমার নিকুঞ্জবনে শুনি শুধু বিহগঝঙ্কার।
সহস্র বিহগ ধরে একসাথে বৈতালিক গান।
শেষ নাই সে বনের, প্রান্তান্তরে পড়েছে ছড়ায়ে—
কোবিদার, শাল আর সেগুনের বন,
অযত্নসম্ভূত শুধু কামিনীর বন—
ফুল ঝরে তারার মতন—
শ্যামবনবক্ষে কভু উল্কার মতন।
সেই বনে শুনি আমি বিহগ-ঝঙ্কার সারাদিন।
বনান্তের স্নিগ্ধ বায়ু ধীরে ব'য়ে যায়।
সেই বনে আমি আর প্রিয়া চিরন্তনী
শিশুহাস্যধ্বনিত কুটীর।
মালঞ্চে বৈকালে ফোটে পীতবর্ণ শীর্ণ ঝিঙা ফুল
শিশুদের চোখের মতন,
অশথের পাতা কাঁপে, শিহরায় দূর দেউদার,
শোনা যায় মাঝে মাঝে বৈরাগীর খঞ্জনী-ঝঙ্কার
সেই বনে আমি আর প্রিয়া মোর প্রতিদিবসের।
হলোৎকীর্ণ মৃত্তিকায় বর্ষাগমে শস্য-সম্ভাবনা।
সেই বনে এই জনপদ।
পার হ'য়ে আসিলাম কত আয়ু, আর কত পথ—
সে অরণ্য প্রান্তান্তরে পড়েছে ছড়ায়ে।
আমি যেন আয়ুষ্মান্ বৈদিক দেবতা
জুহু ভরি' হবিদানে তুষিলাম সূর্য্যদেবতায়।
আমার নিকুঞ্জে তাই শুনি শুধু প্রাণের ঝঙ্কার।

রূপাতীত রূপ

তথাগত আসিবেন বৈশাখী পূর্ণিমা রাতে
শান্ত, শিব, রূপাতীত রূপ।
সর্ব্বশাস্ত্র-তথ্য-সার শিলীভূত মূর্ত্তি তথাগত—
নিষ্পলক নেত্রে তাঁর করুণার মধুর ব্যঞ্জনা—
স্বপ্ন দেখিলাম আমি বৈশাখী পূর্ণিমা রাতে
তথাগত আসিবেন, শান্ত, শিব, রূপাতীত রূপ।
সেইদিন হ'তে হায় মৃত্যুঞ্জয়ী তথাগত
আমার ভুবন ভরি' করিছে বিরাজ।
আমার ভুবন ভরি' আমার নগরী ভরি'
সেইদিন হ'তে

প্রত্যহের কর্ম্মবন্যা রুদ্ধ করি' দিয়া
পথ হ'তে উপপথে, সৌধপ্রান্তে, বিপণি-তোরণে
চলিয়াছে পীতাম্বর বৌদ্ধভিক্ষু মুণ্ডিত মস্তক
একে একে দুয়ে দুয়ে সারে সারে হাজারে হাজারে
কোন্ দূর অতীতের গুহাদ্বার বিদীর্ণ করিয়া
বক্ষে বহি' ঐতিহ্যের গুরুভার ব্যর্থতার শব।
মাঝে মাঝে কানে আসে তাহাদেরই শান্ত তূর্য্যরব
চলিয়াছে পীতাম্বর বৌদ্ধ ভিক্ষু হাজারে হাজারে।
ক্লান্ত যত ম্লানমুখ, অস্খলিত শান্ত পদপাত—
হয়ত বা তারা জানে
তথাগত আসিবেন আর কোনো ভাবীযুগে
বৈশাখী পূর্ণিমা রাতে, শান্ত শিব রূপাতীত রূপ।

শিশু-পদাতিক

দেখিলাম গঙ্গাতীরে চলে শিশু পদাতিক-দল
তালীবনচ্ছায়া-ঘেরা কুটীরের পাশে পাশে
খর্জ্জুর তিন্তিড়ী আর পনসের ঘনবনতলে
আঁকা বাঁকা মেঠোপথে চলে শিশু পদাতিক দল।
শান্ত মুখ, অনলস শিশুদল ভুবনে আমার
নীল উত্তরীয় গলে চলিয়াছে বনদেবতার
অর্ঘ্য বহি' সুকুমার কম করপুটে। স্রোতসীর
তীরে তীরে বনে বনে দূর লোকালয়ে
আমার ভুবন ভরি'
আমার জীবন ভরি'
চলিয়াছে শান্তমুখ শিশুর বাহিনী।

বর্ষা-অভিসার

আমার ভুবনে শুধু ঘনবর্ষা—কদম্বের বন,
কদম্বকেশরে ভরা বনপথে চলে বধূদল।
কলস ভরিয়া তা'রা ফিরে যায় কুটীরে কুটীরে।
কোথা দূর বনচ্ছায়ে বাঁশী বাজে দ্রুত উচ্চতান।
সারা মাঠ ভরি' যেন, বাঁশী বাজে ছায়ায় ছায়ায়।
কে বাঁশী বাজায় তা'রে চিনিনাক' জানি না কখনো
মনে হয় বাঁশী বাজে সারাদিন ভরি' হিয়াতল,
রাধিকার অভিসার—গান গাই গুঞ্জরি' গুঞ্জরি'।
আবার বধূরা আসে বারিসিক্ত বনপথ দিয়া
অসীম রহস্যে ঘেরা সন্ধ্যা নামে দীঘিকালোজলে,
ঘরে বসেনাক' মন, ধীরে ধীরে উঠে সে চঞ্চলি'।
কোথা' যেন বাঁশী বাজে, কোথা' যেন বাজিছে নূপুর,
মৃদঙ্গের মেঘমন্দ্রে কোথা' যেন নাচিছে ময়ূর!
কণ্টকিত কেয়াবনে জ্বলে বুঝি ভুজঙ্গের মণি—
সচকিতা প্রণয়িনী ফেলে যায় কনক-কেয়ূর
কদম্বরেণুতে ভরা দূর বনপথে। এ ভুবনে
নব বর্ষা, শিহরিত কদম্বের বন। আর চলে
নায়িকারা অতিদূর সুরভিত অভিসার-পথে।



ব্যর্থ যাত্রা

শ্রী বিমল সেন

জেনোয়ার জাহাজ ঘাটা। ভারতগামী বিরাট ইটালিয়ন জাহাজ 'এস্ এস্ ভিক্টোরিয়া'র তখনো ছাড়িতে বিলম্ব ছিল। জাহাজ ঘাটার বাড়ীটি যাত্রীদের ভীড়ে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা যাইবে, তাহাদের মধ্যে কেহ নিজেদের জিনিষ পত্র লইয়া চলিয়াছে customs shed এর দিকে। কেহ যাইতেছে, আফিসে passport এবং জাহাজের টিকিট দেখাইতে। কেহ কেহ খোলা 'জেটির' উপর পায়চারি করিতেছে।

মিঃ এন, কে, রয় সেই দিনই সকাল বেলার ট্রেনে জেনোয়া পৌছিয়াছেন। বম্বেতে তিনি মোটা মাহিনার চাকরি করেন। ছুটি লইয়া, এই তৃতীয়বার 'কন্টিনেন্টাল টুর' শেষ করিয়া দেশে ফিরিতেছেন। তাঁহার বয়স ৪৩ বৎসর। জাহাজ ছাড়িতে দেরি আছে দেখিয়া তিনিও জাহাজ ঘাটার দোতালার উপর খোলা বারান্দায় পায়চারি করিতেছিলেন।

চমৎকার দৃশ্য। এক দিকে খোলা সমুদ্র। অপর দিকে জেনোয়া শহর। অন্যদিকে বিশ্ববিখ্যাত 'ভিস্যুভিয়স' আগ্নেয়গিরি—অবিরাম ধূমোদগীরণ করিয়া চলিয়াছে।

ক্রমে জাহাজ ছাড়িবার সময় আসিল। জাহাজের খালাসী হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যে অনেকেরই আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু বান্ধবীরা আসিয়াছিল বিদায়-সম্ভাষণ জানাইতে। জাহাজের ভিতরে একজন 'ষ্টুয়ার্ড' বাহিরের লোকদের নামিয়া যাইতে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। বিদায় চুম্বনে প্লাবন বহিল। মেয়েদের সকলের চোখই অশ্রুসিক্ত। নাকে রুমাল চাপা দিয়া একে একে সকলে নামিয়া গেলে জাহাজ ছাড়িয়া দিল।

মিঃ রয় ডেক্-এর উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইতে কেহই আসে নাই। অথচ, তিনি কত বন্ধু, কত বান্ধবীই না এ দেশে রাখিয়া গেলেন। বান্ধবীদের কেহ উপস্থিত থাকিলে আজ কত ঘটা করিয়াই না তাহারা বিদায়-সম্ভাষণ জানাইত।

ধীরে জাহাজ খোলা সমুদ্রে আসিয়া পড়িল। আকাশে কালো মেঘ জমা হইয়াছিল। এইবার মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। সঙ্গে সঙ্গে কণকণে ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়া।

ডেক্-এ যাহারা ছিল, তাহারা সকলেই নীচে যে যাহার ক্যাবিনের দিকে চলিয়াছে। মিঃ রয়ও নামিলেন। জাহাজের ভিতরটা যেন গোলকধাঁধাঁ। ক্যাবিন খুঁজিয়া না পাইয়া অনেকেই ঘুরিয়া মরিতেছে। passage গুলির ভিতর লোকের ভীড়। অনেকে আবার ক্যাবিনে গিয়া জিনিষ-পত্র সাজাইতে গুছাইতে ব্যস্ত। মিঃ রয়ও বার দুই ঘোরাঘুরি করিবার পর, নিজের ক্যাবিনে যাইবার ঠিক পথটি খুঁজিয়া পাইলেন। সেই পথেরই মোড়ের মাথায় দেখা হইল একটি তরুণীর সহিত। লাবণ্য-মাখা সুন্দর মুখখানি। বয়স ২২।২৩ বৎসর হইবে। পোষাকে রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। দেখিয়া ইংরাজ বলিয়া মনে হইল।

মিঃ রয় পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেলেন না। কারণ, নারী-জাতি তাঁহার কাছে সব চেয়ে বড় দৌর্বল্য। দেখা হইলে এবং সুযোগ বুঝিলে তাহাদের সহিত একটু আলাপ করিবার লোভ কোন প্রকারেই এড়াইতে পারেন না। তাই, কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং মিষ্টি হাসিয়া বললেন—pardon me, ক্যাবিন খুঁজে পাচ্ছ না, নিশ্চয়ই? Speak English, I hope?

যাত্রীদের ভিতর অল্পসংখ্যক কয়েকটি ভারতীয় এবং দুই একটি ইংরাজ ছাড়া আর সকলেই যে জার্মান ইহুদি, তাহা মিঃ রয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন। জার্মান হইতে বিতাড়িত হইয়া, ইহুদিরা সকলে চলিয়াছে কোন দূর অজানা দেশে। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই একবর্ণ ইংরেজি জানে না। তাই, মিঃ রয় ঐ প্রশ্ন করিলেন।

তরুণী জবাব দিল—I do. I am English সত্যিই ক্যাবিন খুঁজে পাচ্ছি না।...কেউ আবার ইংরিজি বোঝে না। আমার ক্যবিনের নম্বর ২৫০। কোন দিকে বলতে পারেন?

—২৫০?...সে ত আমার ক্যাবিনের কাছেই কোথাও হবে। চলো, খুঁজে দিই।

ধন্যবাদ জানাইয়া সে চলিল মিঃ রয়ের সহিত।

মিঃ রয়ের ক্যাবিনের একটু তফাতেই তাহার Double Berth এর ক্যাবিন খুঁজিয়া পাওয়া গেল। নীচের Berthএ একটি মহিলা শুইয়া এরি মধ্যে কপাল টিপিতেছিলেন। তরুণী তাহা দেখিয়া বলিল—আমাকেও দেখছি সোজা বিছানায় যেতে হবে। জাহাজ যেমন দুলছে sick হতে বেশি দেরি হবে না হয়ত। মাথাটা ধরেছে ভয়ানক and I am a very bad sailor...আসি তা হলে!...Thank you ever so much.

মিঃ রয় বলিলেন—তাহলে এখন ক্যাবিনে না ঢুকে একটু খোলা হাওয়ায় থাকলেই ত ভাল হত।... আমার কাছে Sickness এর ওষুধ আছে যদি তোমার আপত্তি না থাকে...

সে বাধা দিয়া বলিল—আর আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না। ওষুধ আমার কাছেও আছে। তাই খেয়ে একটু শুয়ে থাকি এখন। আরাম বোধ না করলে শেষে না হয় যাবো Sitting Roomএ।

বলিয়া, আর একবার ধন্যবাদ জানাইয়া সে ক্যাবিনে প্রবেশ করিল।

জাহাজের বসিবার ঘর। তাহার একপাশে "Bar"এ কয়েকটি লোক বসিয়া থাকে। পুরুষদের ভিতর অনেকেই 'ড্রিঙ্ক' করিতেছে। কেহ চিঠি লিখিতেছে। মেয়েরা অধিকাংশই যে-যাহার ক্যাবিনে অসুস্থ (Sea Sick) হইয়া পড়িয়া আছে। বসিবার ঘরে যাহারা ছিল, তাহাদের অবস্থাও ভাল নহে। সকলেরই মাথা ঘুরিতেছে; চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে।

মিঃ রয়ও 'ড্রিঙ্ক' লইয়া বসিয়াছিলেন। আশা ছিল সেই মেয়েটি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া হয়ত সেখানে আসিবে। কিন্তু তখনো তাহার দেখা নাই। শেষে চা'এর সময় হইল। খাইবার ঘরের 'ষ্টুয়ার্ড' জাহাজের সর্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া 'Gong' (ঘণ্টা) বাজাইয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—"ঠী টাইম,...ঠী টাইম (Tea time) কর্মচারীরা সকলেই ইতালীয়। তাহারাও ভাল ইংরাজি বলিতে পারে না।

কিন্তু খাইবার ঘরেও যখন সেই পূর্বপরিচিতার দেখা পাওয়া গেল না, তখন মিঃ রয় বুঝিলেন যে সে নিশ্চয়ই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। এই খানেই মিঃ রয়ের সহিত অন্যান্য অনেকের তফাৎ। ঐ সামান্য

পরিচয়ের পর, অন্য কেহ হয়ত, মেয়েটির কথা লইয়া অত মাথা ঘামাইত না। কিন্তু, মিঃ রয় তাহা পারেন না। ধৈর্য্যও তাঁহার অসীম।

২৫০ নম্বরের ক্যাবিনের দরজা খোলাই ছিল। দরজার পর্দা হাওয়ায় উড়িতেছিল। মিঃ রয় দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া দেখিতে পাইলেন, সত্যই সে শুইয়া আছে। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল—হ্যালো!

মিঃ রয় দরজার আর একটু কাছে আসিয়া বলিলেন—হ্যালো! Sick হয়ে পড়েছো, তা বুঝতে পারছি। How do you feel now?

—বিশ্রী। মাথা ফেটে যাচ্ছে যেন। খালি বমি করছি।

—ওষুধ খেয়েছিলে?

—খেয়েছি; কিন্তু, ফল হয়নি।

—আমার ওষুধটা খেয়ে দেখ, খুব ভাল ওষুধ।···দাঁড়াও নিয়ে আসি।

বলিয়াই মিঃ রয় ছুটিলেন নিজের ক্যাবিনের দিকে। ঔষধ লইয়া আবার ছুটিয়াই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুইটি ট্যাবলেট বাহির করিয়া কাঁচের জলাধার হইতে গেলাসে জল গড়াইয়া, যখন তরুণীর কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন, তখন সে তাঁহার দিকে চাহিয়া ছিল। সে দৃষ্টিতে ছিল কৃতজ্ঞতা আর বিস্ময়। হাত বাড়াইয়া ঔষধ এবং জলের গেলাস লইয়া বলিল—

—I don't know how to thank you; একজন অপরিচিত লোকের প্রতি এতখানি সহানুভূতি দেখে অবাক হয়ে গেছি। You are very kind, and cosiderate.

ঔষধ খাইয়া সে আবার শুইয়া পড়িল। দুইহাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া, অস্ফুট কাতরোক্তি করিয়া বলিল—Oh, my head! it's unbearable.···দেখি, এবার যদি একটু কমে।

সে আবার মুহূর্তকাল তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া, শেষে বলিল—আমাকে একবার ওপরের খোলা ডেক্‌-এ নিয়ে চলুন। ক্যাবিনের মধ্যে বড় Staffy; এ মাথাধরা ছাড়বে না।

—বেশ, চলো।

সে উঠিয়া দাঁড়াইলে, আবার বলিলেন—May I offer you my arm? জাহাজ যেমন দুলছে, তোমার শরীরও ভাল নেই—এ অবস্থায় পড়ে যাবে।

সে তৎক্ষণাৎ মিঃ রয়ের বাহু-সংলগ্ন হইল, এবং মিঃ রয় তাহাকে ডেক-এর উপর লইয়া গিয়া, নিরালা কোণে একটি ইজি চেয়ারে বসাইয়া দিলেন। নিজেও আর একটি চেয়ার টানিয়া লইলেন।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। আসন্ন সন্ধ্যা এবং মেঘের জন্য সমুদ্রও কালো রূপ ধারণ করিয়াছে। যতদূর দৃষ্টি যায়—শুধু জল আর জল। বড় বড় ঢেউগুলি উন্মত্ত সিংহের মত আসিয়া জাহাজের গায়ে আছড়াইয়া পড়িতেছে। শন্ শন্ করিতেছে দুরন্ত হাওয়া। তখনো খোলা ডেক-এর উপর খুব ঠাণ্ডা। লোকজন তাই খুব কম। মাত্র দু-তিন জোড়া যুবক-যুবতী ডেক-এর উপর পায়চারি করিতেছে।

ঠাণ্ডা হাওয়ায় মেয়েটি অনেকটা সুস্থ বোধ করিল।

এক সময়ে বলিল—আপনার নামটি কিন্তু, এখনো জানতে পেলাম না।

মিঃ রয় কি যেন ভাবিতেছিলেন। বলিলেন—আমার নাম, রয়; এন, কে, রয়।

সে ডানহাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল—আর আমি আইরীন···আইরীন বাট্লার।

মিঃ রয় 'করকম্পন' করিলেন। কিন্তু হাতটি যেন ছাড়িয়া দিতে ভুলিয়া গিয়া বলিলেন—মিষ্টি নামটি। তোমার উপযুক্ত নামই বটে।

সে একটু হাসিয়া, ধীরে হাত সরাইয়া লইল। বলিল—এখন থেকে আমরা দুজনে বন্ধু হলাম—কেমন? আপনার কাছে আমি সত্যিই Grateful.

মিঃ রয় চেয়ারটা আর একটু নিকটে সরাইয়া লইয়া বলিলেন—I am a lucky man—তোমার মত বান্ধবী পেয়ে Voyageটা আনন্দে কাটবে।

—আপনি নিশ্চয়ই বম্বে যাচ্ছেন, মিঃ রয়?

—হ্যাঁ, বম্বেই যাবো।

—তারপর? সেখান থেকে?

—সেখান থেকে আর কোথাও নয়। আমি বম্বেতেই কাজ করি।

আইরীন সোজা হইয়া বসিল। সাগ্রহে বলিল—Really? তাহলে, আপনি বম্বে সহর খুব ভাল ভাবেই জানেন, নিশ্চয়ই!

—হ্যাঁ, তা জানি।

—খুব বড়, আর সুন্দর সহর—না? Exactly like any of our English cities—isn't it?

—It is.

মিঃ রায় তখনো অন্যমনস্কভাবে জবাব দিতেছিলেন। মেয়েটি একেবারেই Flirt নহে। ভারি সরল প্রকৃতির। আজই বেশী অগ্রসর হইলে হয়ত উঠিয়া চলিয়া যাইবে। শেষে আর কথাই কহিবে না। একবার চাহিয়া দেখিলেন, তাহাকে ডলি পুতুলটির মতই মিষ্ট দেখাইতেছে।

বলিল—India ও Indian দের আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। আপনাদের ভদ্রতা ও সৌজন্যের কাছে আমার মাথা নুয়ে আসে।

মিঃ রয় বলিলেন—অর্থাৎ, কোন ভারতীয়ের সঙ্গে নিশ্চয়ই পূর্বে তোমার আলাপ ছিল।

আইরীনের চোখের দৃষ্টি উদাস হইয়া উঠিল। জবাব দিল—হ্যাঁ, ভারতীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাইত তাদের আমি জেনেছি।

মিঃ রয়ের হাতখানা তাহাকে একটু নিবিড় ভাবে আকর্ষণ করিল। আইরীন ছোট খুকির মত হাসিয়া উঠিয়া বলিল—ও কি হচ্ছে? Don't you know, people will think we are lovers or something?

মিঃ রয় হাসিয়া জবাব দিলেন—ভাবুক না, কি দোষ হবে তাতে?—

—দোষ হবে না?···We are not lovers. Sit like a good boy, please. ও রকম করে বসতে আমার ভারি লজ্জা বোধ হয়।

সত্যই বড় লাজুক, বড় সরল প্রকৃতির মেয়ে। এখনি অতটা অগ্রসর না হওয়াই ভাল ছিল।

এখনো ত অনেক দিন পড়িয়া আছে। হাত সরাইয়া লইয়া বলিলেন—You are a shy girl. ...যাক No offence, please. আমার মনে কোন কু...

সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল—ও কথা বলছেন কেন? You are old enough to be my father, and you are very kind, ক্ষমা ত আমার চাওয়া উচিত। কিছু মনে করবেন না...আমার সত্যি বড় লজ্জা বোধ হয়...কেমন, রাগ করেননি ত?

—না, না, রাগ করব কেন?...থাক ওসব।...তুমি কোথায় চলেছ, তা জানতে পারি?

আইরীন জবাব দিল—যাচ্ছি তোমাদেরি দেশে—the golden East, Romantic East দেখতে।

—Indiaয় কোথায় যাবে?

—আমিও বম্বে যাব।

—সত্যি? এই কি প্রথম যাচ্ছ সেখানে? বম্বেতে তোমার কে আছেন?

এতগুলি প্রশ্ন করিয়াই মিঃ রয় যেন একটু লজ্জিত হইয়া পড়িলেন।

বলিলেন—I hope you don't mind my asking...

আইরীনের চোখে উদাস দৃষ্টি ফিরিয়া আসিল। বলিল—আমার একজন পরম বন্ধু আছেন সেখানে—তাঁর কাছেই যাচ্ছি।

একটু থামিয়াই আবার বলিল—জানি না, সে কিভাবে আমাকে গ্রহণ করবে। ভারতবর্ষে এই আমার প্রথম যাত্রা। কিছুই চিনি না, জানি না।

...তা'ছাড়া, তার আজকালকার ঠিকানাও আমার জানা নেই।

মিঃ রয় কৌতূহলী হইয়া বলিলেন—সে কি? ঠিকানা জান না—তাহলে তাকে জানালে কি করে যে Start করেছ?

—তাও জানাই নি। কতকটা, Surprise visit হবে আর কি।

তারপর জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, বম্বেতে লোকে ইংরিজি কথা বুঝবে? কোথায় গিয়ে উঠব—সেই এক ভাবনা হয়েছে।

আশ্চর্য্য কথা। অতদূরে, সম্পূর্ণ ভিন্ন, অচেনা, অজানা দেশে একা চলিয়াছে। একটু পূর্বে বলিয়াছে, তাহার এক পরম বন্ধুর কাছে যাইতেছে। অথচ, তাহার ঠিকানাও জানে না। ব্যাপারটি অত্যন্ত রহস্যজনক।

বলিলেন—হ্যাঁ, ইংরিজি অনেকেই কিছু কিছু জানে।...But, you do puzzle me! ঠিকানা জান না...অতদূর দেশ থেকে চলেছ Surprise visit দিতে? তোমাকে ভারি অসুবিধায় পড়তে হবে যে! তাকে খুঁজে বার করবে কি করে?

আইরীন জবাব দিল—তা আমি পারবই। My friend is a well-known man there.

মিঃ রয় বলিলেন—সেখানে গিয়ে উঠবার জায়গার জন্যে অবশ্য তোমার ভাবনা করতে হবে না। আমি তোমাকে কোন Decent Hotel এ নিয়ে যেতে পারি।

তারপর, আর কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া বলিলেন—আর...আর, আমার এই অতি

অনাবশ্যক কৌতূহল ক্ষমা করে যদি তোমার বন্ধুর নামটি বলতে পার, তাহলে হয়ত তাঁকেও খুঁজে দিতে পারি। Well-known man যখন বলছ, তখন আমার পক্ষে তাঁকে খুঁজে বার করা সহজই হবে।

আইরীন দুই হাতে মিঃ রয়ের একটা হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল—Could you be so wonderful, Mr. Roy? সত্যিই আমার জন্যে এতটা কষ্ট…

মিঃ রয় বাধা দিয়া বলিলেন—I will do it gladly, Miss Butler…সম্বোধনটা ঠিক হল ত?

—ঠিকই হয়েছে। আমি এখনো Miss. কিন্তু, শীগ্‌গীরই Mrs. হব। সোণার ভারতবর্ষে আমার বিয়ে হবে।

—তোমার সেই বন্ধুটির সঙ্গেই বোধ হয়?

—হ্যাঁ।

—অথচ, সে তোমাকে Receive করতেও আসবে না—সে কোথায় থাকে, তাও তুমি জান না। এ যে ভীষণ হেঁয়ালি, মিস্ বাট্‌লার!

আইরীন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। শেষে বলিল—তুমি যখন এত করে জিজ্ঞেস করছ, তখন তোমাকে সব বলতে বাধা নেই। তোমার মত বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের কথা। বলব?

—বল। আমার কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠেছে।

আইরীন—বলিল—প্রথমেই বলি, যার কাছে যাচ্ছি, সে তোমাদেরই দেশের লোক। এডিনবরায় সে গেছল F. R. C. S. পড়তে। সেইখানেই তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তার মত ভদ্র, উদার আর মহৎ লোক আমি দুটি দেখিনি—তাকে যত দেখেছি, ততই ভালোবেসেছি।…আমার মত এক অতি সাধারণ মেয়ের ভিতর সে যে কী পেল জানি না—সেও ভালোবাসলে। অমন ভালোবাসতে বুঝি শুধু তোমাদের দেশের লোকেরাই পারে।

…এইভাবে অনেকদিন কাটল। সবাই বুঝলে, আমাদের বিয়ে হবে। কিন্তু তার তখন বিয়ে করবার মত অবস্থা নয়; সে তখনো dependent. তাই গোপনে আমরা engaged হলুম।

…তারপর, F. R. C. S. পাশ করবার পর সে দেশে ফেরবার ব্যবস্থা করতে লাগল; আর আমি সেইদিন থেকে শুধু কেঁদে কেঁদে তাকে বিব্রত করে তুলতে লাগলুম। সে আমায় সান্ত্বনা দিত—'কেঁদো না আইরীন, তোমার-আমায় ছাড়াছাড়ি যে হতেই পারে না। বম্বেতে গিয়ে আমার Practiceএর একটা ব্যবস্থা করে, কিছুদিন বাদেই আবার আমি ফিরে আসব। তারপর, তোমায় নিয়ে যাব আমাদের দেশে। তুমি হবে আমার স্ত্রী My own, dearest wife.

আইরীনের দৃষ্টি ছুটিয়া গেল সেই অসীমের দিকে। চোখ দুটি সজল হইয়া উঠিল।

বলিল—সে যেন দুই হাতে আমার Heartটি উপড়ে নিয়ে চলে গেল।…শেষে প্রতি Mail-এই তার চিঠি পেয়েছি। একবার লিখলে—সবে Practiceএ বসেছে, এখন আবার দু-তিন মাস অনুপস্থিত থাকলে বড় ক্ষতি হবে। তাই সে আমাকেই চলে আসতে অনুরোধ করলে। সে ওদিকে বিয়ের সব ব্যবস্থা করে রাখবে—যাতে আমি গিয়ে পৌঁছলেই আর দেরি করতে না হয়।

…তারপর হঠাৎ তার চিঠি আসা বন্ধ হল। সপ্তাহে দুখানা করে চিঠি লিখেও যখন জবাব পেলুম

না, তখন মনে বড় ভয় হল, হয়ত তার অসুখ-বিসুখ কিছু করেছে। এ ভাবনা আমাকে আর স্থির থাকতে দিলে না। তাই বেরিয়ে পড়েছি। সে ত আমাকে আসতে লিখেছিলই।...এখন ঈশ্বর করুন সে যেন ভাল থাকে।

মিঃ রয় অখণ্ড মনোযোগ সহকারে সব কথা শুনিতেছিলেন। বলিলেন—How very interesting! তোমার এ সাহস এবং ভালবাসাকে আমি নমস্কার করি। তাঁর নাম কি?...ভারতীয় যখন, আর বম্বেতেই থাকেন, তখন হয়ত আমার চেনা লোকও হতে পারেন।

আইরীন বলিল—ঠিক কথা। তার নামও ত রয়—ডাঃ সুধীরকুমার রয়। তার বাবা বম্বেতে নাম করা ডাঃ ছিলেন—ডাঃ অমরনাথ রয়। তার বড় ভাইও খুব বড় চাকরে।

...সুধীরের ফটো দেখবেন? দেখুন হয়ত চিনতেও পারেন।

বলিয়া আইরীন তাহার হ্যাণ্ডব্যাগ ঘাঁটিতে লাগিল। কিন্তু মিঃ রয় বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিলেন। তাঁহার বুকের ভিতরটা যেন তোলপাড় করিয়া উঠিল। সর্বনাশ! বিধাতার এ কী কঠোর নির্মম পরিহাস।...সুধীর? এডিনবরা হইতে F. R. C. S. পাস করিয়া মাস চারেক হইল দেশে ফিরিয়াছিল। দেশে ফিরিবার পরই তাহার বিবাহ দিবার কত চেষ্টাই না করা হইয়াছে। কিন্তু সে কোন কথায়ই কান দেয় নাই। মেম বিবাহ করিবার ইচ্ছাও সে কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই। অথচ ভিতরে ভিতরে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে!

আইরীন ফটো বাহির করিয়া বলিল—এই যে পেয়েছি। Look, isn't he handsome?

দেখিবার প্রয়োজন ছিল না। তবু মিঃ রয় এইবার নিঃসন্দেহ হইলেন। সুধীরই বটে। আইরীন মিঃ রয়ের ভাবান্তর লক্ষ্য করিল। বলিল—সুধীরকে আপনি যেন চেনেন বলে মনে হচ্ছে?

মিঃ রয় যেন বাক্‌শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। কোন প্রকারে জবাব দিলেন—হ্যাঁ, He is my brother.

এ কথা শুনিবামাত্র আইরীন বিষম চমকাইয়া সোজা হইয়া বসিল। চোখে তাহার ভয় এবং অবিশ্বাসের দৃষ্টি। মুখখানি পাংশুবর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। বলিল—ওঃ, তাই নাকি? What a coincidence! আপনার সঙ্গেই এমন করে দেখা হয়ে গেল, আর আপনাকেই সব কথা জানিয়ে দিলুম!

—তাতে কি হয়েছে?

—আপনাকেই যে তার সব চেয়ে বেশী ভয়! সব সময়েই বলেছে, আপনি কিছুতেই এ বিবাহে মত দেবেন না।

তারপরই মিনতিকাতর কণ্ঠে বলিল—কিন্তু কেন সম্মতি দেবেন না, মিঃ রয়? আপনাদের দেশে ত এমন বহু লোক আছে, যারা European Lady বিয়ে করেছে।...সত্যি বলছি, আমি কাছে না থাকলে, সে কিছু করতে পারে না। He loves me, and, I love him.…He will be a ruined man!

মিঃ রয় চুপ করিয়া রহিলেন।

আইরীন তেমনি কাতর কণ্ঠে বলিল—তার ঘরে আমি ঠিক Indian Ladyর মত থাকব, মিঃ রয়। ঠিক হয়েছে, হিন্দুমতে আমাদের বিয়ে হবে। আমার নাম রাখবে, অরুণা...আইরীন থেকে, অরুণা... অরুণা রয়...মিসেস সুধীর রয়!

বলিতে বলিতে মিঃ রয়ের একটা হাত ধরিয়া ফেলিয়া আবার বলিল—আপনার ভয়েই সুধীর অস্থির কিন্তু আপনি ত দেখছি অতিশয় ভাল মানুষ। You can never be cruel to your brother—can you?

মিঃ রয় জবাব দিলেন—I can't. সে আমাকে ভুল বুঝেছিল।

আইরীন যেন এক বোঝা ফুলের মত ঝুপ করিয়া আসিয়া মিঃ রয়ের বুকের উপর পড়িল। দুই হাতে তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল—You are wonderful, Mr. Roy···you are a darling! ···তাইত বলি, নিজের ভাই কি এত অকরুণ হতে পারে?···ভগবানের কত দয়া দেখুন। কেমন অদ্ভুত ভাবে এমন করে আগে থেকেই আপনার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিলেন। কত সহজে আমাদের দুজনের মনের সবচেয়ে বড় ভাবনাটা কেটে গেল।···কিন্তু সুধীরের এটা কী অন্যায় দেখুন। এমন মানুষকেও এমন করে ভুল বোঝে?···এ জন্যেও তার সঙ্গে আমার ঝগড়া করতে হবে।

মিঃ রয় নীরবে আইরীনের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহার বুকের ভিতর যে কী তুমুল ঝড়ের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। কী মধুময়ী মেয়ে! বুকের ভিতর তাহার কী গভীর ভালোবাসার ফল্গুধারা! সেই ভালোবাসার জোরেই হাজার হাজার মাইল সমুদ্র পার হইয়া সে চলিয়াছে এক অজানা দেশে তাহার প্রিয়তমের খোঁজ করিতে। ইহা শুধু রূপকথার বইএর পাতায়ই সম্ভব হয় বলিয়া তিনি মনে করিতেন।

ইহা ছাড়া, য়ুরোপের মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁহার চিরদিনই একটা বিশ্রী এবং অন্যায় ধারণা ছিল। হৃদয় বলিয়া কোন জিনিষ তাহাদের নাই; ভালোবাসার ধার তাহারা ধারে না। তাহাদের তিনি অন্য দিক দিয়াই চিনিয়া রাখিয়াছিলেন—এবং নিজেও সেই অনুযায়ী ব্যবহার করিতেন। কিন্তু আজ তাঁহার স্বীকার করিতে হইল যে তিনি ভুল বুঝিতেন।

তাঁহার চোখ দিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু মাটিতে ঝরিয়া পড়িল।

আইরীন তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়াই বলিল—আর আমার কোন ভাবনাই রইল না। I will leave myself entirely in your hands. আমার জন্যে আপনাদের কোন হাঙ্গাম হবে না। আমাকে আপনাদের ভালোবাসতেই হবে।

তারপর জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা জাহাজ থেকে নেমে আপনার বাড়ীতেই যদি উঠি, তাহলে কি অসুবিধা হবে?

মিঃ রয় আইরীনের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ধরা গলায় বলিলেন—কিছু অসুবিধা হবে না, অরুণা। বরং তুমি এলে ঘর আমার আলো হয়ে উঠবে।

* * * * * *

ইহার পরের ঘটনা সংক্ষেপেই বলি। যাত্রার বাকি কটা দিন আইরীন যেন ছায়ার মত মিঃ রয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়াছে। কিন্তু মিঃ রয় অন্য মানুষ হইয়াছেন। সর্বদাই যেন চিন্তিত। লোকজনের সান্নিধ্য আর পছন্দ করেন না। আইরীনকে নিজের কন্যার মতই স্নেহ করিতে সুরু করিয়াছেন। কিন্তু পারিলে সেই আইরীনকেও তিনি এড়াইয়া চলেন।

শেষে যাত্রা শেষ হইল। বম্বেতে জাহাজ হইতে নামিয়া আইরীনকে লইয়া তিনি সোজা নিজের বাড়ীতে

আসিয়া উঠিলেন। তাঁহার পুরা দস্তুর সাহেবী ধরণের বাড়ী—কোনই অসুবিধা হইল না। মিঃ রয়ের স্ত্রী আইরীনকে সাদরে আহ্বান করিলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া ঘন ঘন অঞ্চলে চোখ মুছিতে লাগিলেন।

আইরীনের আনন্দের সীমা নাই। এ দেশের সবই তাহার কাছে নূতন এবং অদ্ভুত। সব জানিবার এবং দেখিবার কী সে দুর্জয় আগ্রহ। বাড়ীতে আসিয়া একটু বাদেই বলিল—কিন্তু সুধীরকে দেখছি না যে? সে ত আপনাকে Receive করতেও এলো না!

মিঃ রয় জবাব দিলেন—শুনছি সে কলকাতায় গেছে। দুই-একদিনের ভিতরেই···বলিতে বলিতে তিনি কথাটা শেষ না করিয়াই সরিয়া পড়িলেন।

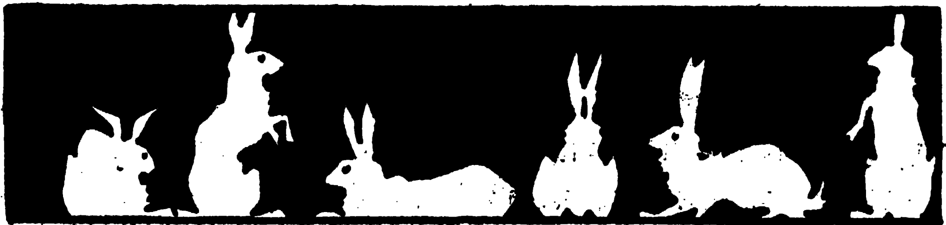
দুই দিন কাটিয়া গেল। এ দুই দিন আইরীন শাড়ী পরিয়া, মিসেস রয়ের সহিত সারাবাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। রান্নাঘরে গিয়া মাংস রান্না করা শিখিয়া লইয়াছে। সবার সহিত তাহার ভাব। সকলেই বলে, অদ্ভুত মেয়ে—বড় ভাল মেয়ে।

দুইদিন কাটিয়া গেল, অথচ সুধীর আসিল না দেখিয়া আইরীন মিঃ রয়কে বলিল—তাকে আসতে না হয় একখানা টেলিগ্রামই করে দিন।···আমার কথা কিচ্ছু জানাবেন না কিন্তু। তাহলে তাকে আর Surprise করা হবে না।···সে এসে দেখবে, এই সোফাটার উপরে বসে মাঝখানে আমি, আমার বাঁ পাশে আপনি আর ডান পাশে মিসেস রয়···আর আমার পরণে সাড়ী ব্লাউজ···দেখে সে কী আশ্চর্য্যই না হবে।··· আপনি আজই টেলিগ্রাম করে দিন। আর যেন ধৈর্য্য রাখতে পারছি না।

মিঃ রয় একবার মিসেস রয়ের দিকে চাহিলেন। মিসেস রয় সহসা চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বলিলেন—ওগো, কেন আর মেয়েটাকে বৃথা আশা দিয়ে রাখছ। এযে আমি আর সইতে পারি না।

মিঃ রয়ও রুমালে নাক ঝাড়িলেন। একটু দ্বিধা করিয়া বলিলেন—শোন, অরুণা, তোমাকে আর লুকিয়ে রাখা চলে না। আজ তিনমাস হল, আমাদের সুধীর যে দেশে চলে গেছে, সেখানে কোন টেলিগ্রামই পৌছুতে পারে না।···টাইফয়েড হয়েছিল।···আগে তোমাকে একথা জানিয়ে কোন লাভ হত না···তাই, ভেবেছিলাম, তুমি এখানে এসে একটু সুস্থ হলে—

কিন্তু, আইরীন মিঃ রয়ের শেষের কথাগুলি শুনিতে পাইল কিনা জানি না, সহসা এক অস্ফুট কাতর আর্তনাদ করিয়া ঢলিয়া পড়িল, মিসেস রয়ের কোলের উপর।



দেশকাল ও সাহিত্য

শ্রী বিনয় দত্ত

প্রচলিত রসবিচারের মূল কথা—রস নিত্যকালের। কালিদাসের কাব্য, সেক্সপীয়রের নাটক যে রস সৃষ্টি করে তা নিরবধি গৌড়জনকে আনন্দ দেয়। নিরবধি কাল যা অমলিন তা সত্য।

সত্যই কি সাহিত্য নিত্যকালের? কথাটা বিচার করা যাক।

আদি যুগে লেখকের সংখ্যা ছিল বিরল। যা লোকের ভাল লাগ্‌ত না তাকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখা ছিল অসম্ভব। মুখে মুখে কেবল ভাল কাব্যেরই 'এডিসন' হত তাও প্রতি 'এডিসনে' তার কলেবর বদলাত। পুঁথির এডিসন পরের কথা, তারও স্থায়িত্ব বিশেষ ছিল না। পুঁথি পুঁজি করা হত বটে, কিন্তু নিয়ত রাজত্বে যুদ্ধ বিগ্রহের গণ্ডগোলে সে সব প্রায়ই পুড়ে যেত নয়ত তাদের সোনারাঁধান মলাট দেখে যে যা পারত লুট করত। সে যুগে কবির সংখ্যা কম হলেও কাব্যকে বাঁচিয়ে রাখার সমস্যা ছিল প্রবল। কিন্তু একটা বড় সুবিধা ছিল। সে যুগের অবসর ছিল প্রচুর। তাই সামান্য কখানা কাব্য উলটে পালটে পাঁজি পড়ার মত পড়াই ছিল বিদগ্ধ জনের রীতি। ফলে কাব্যের আদর্শ সম্বন্ধে এই সব সহৃদয় পাঠকচিত্তে একটা স্পষ্ট ছাপ ওঠা স্বাভাবিক। বহু শতাব্দী ধরে পাঠক ও কবির মনের খোরাক প্রায় একই ছিল তাই কাল-প্রবাহে রসানুভূতির তারতম্য বিশেষ হয়নি।

ইউরোপে ছাপাখানা এসে কাব্যের বহুল প্রচার ও তাকে বাঁচাবার উপায় করলে। অন্য কোন গণ্ডগোল হয়নি। এক ভাষা যা সকলে পড়তে পারে তা ছিল ল্যাটিন—দেশী ভাষা নয়। সংস্কৃতের মত ল্যাটিনেই ইউরোপীয় ছত্রিশ জাতির পণ্ডিতরা কথাবার্তা লেখালেখি চালাতেন। সাধারণ লোক তখন বই-এর ধার ধারতো না। স্বদেশী ভাষার প্রাধান্যের আগে প্রাচীন ইতিহ ছিল প্রবল। কাব্যাদর্শের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়নি।

পরিবর্ত্তন সুরু হল ডিমোক্রাসী পাকা হলে। ডিমোক্রাসীর মূলকথা লোকশিক্ষা। সেখানে ল্যাটিন নয় দেশী ভাষার আদর কারণ দেশাত্মবোধ তার মধ্যে জড়িয়ে থাকে। যে জাতি যত শক্তিমান তার স্বদেশী ভাষা তত দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল রাজত্ব বিস্তার, বাণিজ্য আর মিশনারীদের কল্যাণে। হয়ত ল্যাটিনের মত আর একটা ভাষা উঠতো রোমক-গৌরব-প্রচারের জন্য নয়—ভাষাশ্রিত সাম্রাজ্যবাদীদের গৌরব-প্রচারে। আর ভাষার পরিবর্ত্তনে মনের পরিবর্ত্তন হত—তা সামান্য। কিন্তু এ সময় ঘটনার পর ঘটনা এসে সভ্যতার আমূল পরিবর্ত্তনের ইঙ্গিত দিলে।

প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে যা তফাৎ দেখা গেল তা বড় বেশী ও ব্যাপক। ঘটনা গুলোর কথা বলি। একদেশ থেকে অন্যদেশে যাতায়াতের বাধা দূর হল,—খরচ কম, পথে বিঘ্ন নেই। গাঁয়ের ভিটে মাটি ছেড়ে মানুষ সহর বাসী হল—ফ্যাক্টরীর চার পাশে বস্তিতে নূতন জীবন যাত্রার আরম্ভ হল। এই ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজ্‌ম্। রাজা, রাজ-পুরুষ, পাদ্রী ও জমিদারের হাত থেকে রাজ্য শাসনের ভার ক্রমশ ব্যাবসাদার আর হলমজুরের হাতে পড়ল। অবশ্য এখন ব্যবসাদাররাই দলে ভারী—মজুররা সবে মাথা তুলেছে। আর হল বিজ্ঞানের জন্ম ও আশ্চর্য্য বিস্তার। এমনি ঘটনার আঘাতে আদি যুগের ভিৎ নড়ে উঠ্‌ল। আবহমান কাল থেকে সভ্যতা চল্‌ছিল মন্থর গতিতে এখন হতে ক্রমশঃ 'মমেণ্টাম্' বাড়তে সুরু করলো। তার ব্যাপ্তি ও গতি দুইই বাড়্‌ছে। ফল অবশ্যম্ভাবী বিপ্লব—বিশেষ মনের বিপ্লব।

যে মন নিশ্চিন্তে মহাকাব্য পড়তো সে মন নেই—মরেছে, তিলে তিলে নয়, গ্যালপিং থাইসিসে। আগের জীবন-যাত্রার যতগুলি সুদৃঢ় ভিত্তি প্রায় সবই আজ নড়্‌নড়ে। ভগবানে বিশ্বাস জন্মগত হতে পারে কিন্তু তা জীবনযাত্রায় আজ অবান্তর। পিতার প্রতি

দেবতাজ্ঞানে ভক্তি শ্রদ্ধার কথা ওঠেনা 'প্রোটিয়া প্রোটেস্‌টাম্' এর দিন একেবারে চলে যাচ্ছে। মা বোন, স্ত্রী এরা চ্যাটেল এমন প্রশ্ন মনে আসে না। এমন কি সতীত্ব পরমরত্ন একথা প্রমাণ প্রতিষ্ঠা এখন অর্থশূন্য। গৃহ বলে যা সংস্কার ছিল তাও মরছে। মানুষের প্রেম তাও বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণ আলোয় কুয়াসার মত মিলিয়ে যাচ্ছে—যেমন খাই তেমনি প্রেম করি—বাকিটুকু স্বপ্ন। সমাজের যে কঠোর বাস্তব সত্তা এতদিন মানুষকে দাবিয়ে রেখেছিল—যার জন্য এক যুগ আগে লোকে 'ইণ্ডিভি-জুয়ালিজম্' বলে তার স্বরে চিৎকার করেছে তাও আজ প্রাণহীন।

অর্থাৎ কাব্যের উপাদানগুলি আজ আমাদের জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক বিবর্জ্জিত। পূর্ব্ব যুগ ও যুগের তফাৎ বড় গুরুতর আর তফাৎটা বাড়বে—তাড়াতাড়ি বাড়বে তারই সম্ভাবনা দেখচি বেশী। এতে কাব্যের ভিৎ মনের পরি-বর্ত্তন হচ্ছে আরও হবে। তাহলে আনন্দের বিষয়বস্তুর পরিবর্ত্তন কেন হবে না?

ডারউইনের আত্মচরিতে দেখা যায় ভদ্রলোক ইভলিউসন নিয়ে মাতবার আগে আমাদের মত কবিতা পড়ে আনন্দ পেতেন। অনেকদিন পরে হঠাৎ দেখ্‌লেন কবিতা পড়ে বুঝতে পারছেন না তাতে কি আনন্দের বিষয় আছে। মোটেই আর কবিতা ভাল লাগে না এক লাইনও না। উইলিয়ম্ জেমস্ বলেছেন—প্রত্যহ দশ মিনিট করে কাব্যচর্চ্চা অভ্যাস রাখলে এমন হ'ত না। আনন্দানুভূতি সজীব রাখা অভ্যাসসাপেক্ষ।

তাহলে সাহিত্য পড়ে আনন্দ পেতে হলে অভ্যাস চাই। কিন্তু আগেকার মত অবসর কোথা কাব্যচর্চ্চার! মানুষের মনের গতি আগে ছিল মন্থর তখন বিদগ্ধজন মাত্রেই ক্লাসিক পড়ে মনকে সজাগ রাখতেন। তা সম্ভব ছিল কারণ পড়ার মত বই কম। গ্রীক্, ল্যাটিন, দুচার খানা বিদেশী আর খান কয়েক স্বদেশী বই পড়লেই সাহিত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ হত। প্রতিদিন এমন সকলেই বই লিখতো না—ভবিষ্যতে অমরত্ব লাভ করতে পারে এমন বইও (সমালোচকদের মতে) এমন প্রচুর ছিল না। সাহিত্যের ট্রাডিসনের বিস্তার বড় বেড়েছে—অপর্য্যাপ্ত অবসর না থাকলে এ ট্রাডিসনের সঙ্গে তাল রেখে চলা দুরূহ। আগেকার মত এক ট্রাডিসন গড়ে ওঠার সম্ভাবনা কম। ক্রমশঃ কমন ট্রাডিসনে ভাঙ্গন ধরবে। হয়ত ডারউইনের মত ক্রমশঃ একদল লোক সাহিত্য-ক্ষেত্রে দেখা দেবে যারা মহাকাব্য পড়ে বিস্ময়ে ভাববে এতে কি আছে যা এত দিন লোককে আনন্দ দিয়েছে।

আশ্চর্য্য নয়। এক আধুনিক সমালোচক বলেছেন—এই যে কবিতা—My heart leaps up···etc এতে কি আছে? আমার হৃদয় কখন Rainbow দেখে Words-worth এর মত লাফায় না। বল্‌তে কি আমি লণ্ডনেই থাকি রেন্‌বো দেখেচি বলে মনে হয় না। এ কবিতা আমার কাছে নিরর্থক।

এমনি অর্থ খুঁজলে অনেক কাব্যই নিরর্থক। দোষ কবির নয়, পাঠকের। অনেকে বলেন—এমন পাঠকের কবিতা না পড়ে জুতোর দোকান খোলা উচিত। কিন্তু অর্থ খুঁজবে না কেন? পাঠকমন যে আনন্দানুভূতিতে চঞ্চল তা অভ্যাসসাপেক্ষ নয় একথা কি করে বলা যায়। দিনের পর দিন কাব্য পড়ে,—এই সব লোক ভাল কবি—এ সব কাব্য অমর এমনি স্তুতিবাদের মধ্যে মানুষ হয়ে এই শ্রেণীর পাঠক যাকে কাব্যের নিত্যবস্তু বলে মনে করেন, যা থাক্‌লে রচনা কাব্য—সেই রস কতটা নিজস্ব অনুভূতি-সাপেক্ষ, কতটা প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসের মত পরোক্ষ বলা খুব কঠিন।

চাঁদিনী রাত, মলয় পবন, পুষ্প গন্ধ—এমনি সব বিষয় ঘুরে ফিরে কবিতায় আসে। আর পড়লেও সাধারণতঃ আমাদের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে চাঞ্চল্য ব্যক্তিগত জীবনের কথা না অভ্যাসগত? অভ্যাসগত হয় এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

আর একটু স্পষ্ট করে বলি। নাইটরা বর্ম্ম পরে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করছে তার বর্ণনা কাব্যে আছে। পড়েও ভাল লাগে। এ কালের যুদ্ধ বর্ণনা এখন কাব্যের বিষয় হয়নি। আগের তুলনায় এখনকার যুদ্ধ বর্ণনা নিষ্প্রভ। এখনকার খেলাধুলা নিয়ে কবিতা হয় না। কুমারের থ্রু পাস, ধ্যোয়ানচাঁদের হিট প্লে, নাইডুর ওকার বাউণ্ডারী দেখি, জয়ধ্বনি তুলি—কিন্তু তা এখনও কবির খোরাক হল কৈ। আমাদের প্রত্যহের মনকে যা

বিপুলভাবে নাড়া দেয় তা ত এখনও সাহিত্যপদবাচ্য হয়নি।

কেন? তাতে নিত্যকালের খোরাক নেই এই কি? না এ কেবল কবিমনের obsession. তাঁদের time lag. কবিরা পেছটানে পড়ে বর্ত্তমান মনকে ধরতে পারছে না। ছন্দের বন্ধন ও পদলালিত্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে কাব্যবস্তু তার সঙ্গে এই মনের কোন যোগ নেই।

কাব্যের পিছটান উপন্যাসে কম। কারণ বোধ হয় তার জন্ম অনেক পরে তাই ভাঙ্গাগড়া সহজ। কথা-সরিৎসাগর, আরব্য উপন্যাস, ডেকামেরণের জন্ম অনেকদিন হলেও কবিতার ঢের পরে। আর বাস্তবিক নভেল বলতে যা বুঝি তার জন্ম আরও পরে। উপন্যাসে প্রথমে গল্প বলা রীতি ছিল। ক্রমশঃ সমস্যার অবতারণা হল, কারণ জীবনে সমস্যা হু-হু করে বাড়ছিল। আরও দিন গেলে গল্পটা হল গৌণ উদ্দেশ্য—প্রচারই হল মুখ্য। তখন প্রচার করাটাই হয়েছে সভ্যতার প্রধান কাজ। এখন নভেল হয়েছে কাল উপযোগী। যা খুসী লেখ পড়তে ভাল লাগলেই হল।

মানুষ এমনি করে তার গতির সঙ্গে সাহিত্যকে চালিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। রস বড় কথা নয়। বড় কথা মনের গতি—প্রতিদিনের মনের গতি।

আগেকার দিনে মনের গতি ছিল সামান্য—তাতে গভীরতা ছিল কিন্তু ব্যাপকতা কি পরিবর্ত্তন কম। সেদিনের সাহিত্যে তাই কথায় কথায় অমৃত মাখান। এক লাইন পড়ো—বসে ভাবো কি ধ্বনি, কি মাধুর্য্য কি ভাব।

এখন অন্য। সময় বড় কম। চারিদিক থেকে এই সামান্য অবসরে টান পড়েছে। অসংখ্য আকর্ষণ রয়েছে চারিধারে, তারা কাজ ফুরুলেই টানবে; ট্যাক্সের পয়সার জন্য চারিদিকে দফতর বসিয়েছে সাধ্য কি লোকে নিরালায় ঘরে বসে বিনিয়ে বিনিয়ে কাব্য পড়বে, কি মসগুল হয়ে নভেল পড়বে।

পাঠকচিত্তের এ অবস্থা সাহিত্যের জন্ম মৃত্যুর সমস্যা। প্রাচীন ঐতিহ্যবাদী সাহিত্যিকরা চাইছেন—সাহিত্যে গণ্ডী তুলতে। সাহিত্য হবে কেবল রসিকদের সাধনা। এ সাধনার ফল হাটে বেচবার জন্য নয়। ইলিয়ট প্রভৃতি কবিরা এই গণ্ডীর পক্ষপাতী অধিকারী বিদগ্ধজন ছাড়া No Admission.

গণ্ডীর বড় প্রয়োজন। যে কম পড়তে শিখেছে সেই সাহিত্য সৃষ্টি করবে। সেই আদি কালের অপৌরুষেয় সাহিত্য—হোমর, বাল্মীকি, সেক্সপিয়র, কালিদাস সবাই মূর্খ। সহজাত প্রতিভাই তাঁদের কাব্যে পাণ্ডিত্যের চেয়ে বড় অবয়ব হ'তে পৃথক লাবণ্য দিয়েছে। অর্থাৎ ট্রাডিসন বলে সাহিত্য সৃষ্টির জন্য বিদ্যা প্রয়োজনীয় নয়। তাই যত মূর্খ এসে ভীড় করেছে তাদের রামায়ণী সাহিত্য নিয়ে—কার সাধ্য তাদের ঠেকায়।

বিজ্ঞানও এমনি একদিন উজবুকের দলে ভর্ত্তি ছিল। দু' একজন ফ্যারাডে এসে ভগীরথের মত পাতাল থেকে গঙ্গা আনেন কিন্তু তার পরই বৈজ্ঞানিকরা No Admission কার্ড ঝুলিয়ে দিয়েছে। অবৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞান চর্চ্চার অধিকার নেই—কেউ শোনে না তাদের কথা।

সত্যি গণ্ডী না তুললে হয়ত সাহিত্য বলে কিছু থাকবে না। ডিমোক্রাসীর চাপে তাল গোল পাকিয়ে জার্ণালিজম্ ও বেষ্ট সেলার নিয়েই সাহিত্যকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। প্রাইম্ মিনিষ্টার এড্গার ওয়ালেসের ভক্ত। জজ, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কিং—সকলে প্রকাশ্যে না হয় লুকিয়ে ডিটেক্টিভ নভেল পড়েন—টি, এস্ ইলিয়ট কি জেমস্ জইস্ নয়। পাঠক কোথায়? অপমৃত্যু থেকে সহিত্যকে বাঁচাতে হলে বিজ্ঞানের মত গণ্ডী তুলে সাহিত্যকারের রসজ্ঞ পাঠকদের ও সাহিত্যিকদের আলাদা করা প্রয়োজন। পপুলার সায়েন্স—পপুলার বিজ্ঞান নয়। তেমনি বেষ্ট সেলার সাহিত্য নয় এ কথা প্রচার করা দরকার।

আরও সমস্যা সমালোচকদের নিয়ে। এরা লোক শিক্ষায় ভয়াবহ সৃষ্টি। এরা বলে সাহিত্য যখন সকলকার জন্য তখন সকলকার অধিকার আছে সমালোচনার। বিজ্ঞানের সারবন্দী ইন্টিগ্রালের চিহ্ন রেখে অবৈজ্ঞানিকেরা অয়ে পেছিয়ে যায়। বিজ্ঞানের প্রতি একটা অহেতুক ভক্তিও আসে। সাধারণের ধারণা সাহিত্যক্ষেত্রে এমন কোন বাধা নেই—সকলেরই সমান অধিকার। এমন

কি বিষয়-বস্তুর ধারণার জন্যেও কোন পরিশ্রম দরকার হয় না। সেজন্য সকলে নিজেকে অধিকারী বলে মনে করে, এবং ড্রয়িং রুমে, সভাসমিতিতে নিজেদের অদ্ভুত মতবাদ নির্ব্বিঘ্নে প্রচার করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা কারুর নেই। বাড়িতে দু'একখানা বই ওলটালেই যে-কেউ সর্ব্বকালের সাহিত্যের উপর লম্বা লেকচার দিতে অধিকারী। কলেজের প্রফেসরদের কথা আলাদা—তাঁরা ব্যাঙ্কের লোক—কারেন্সী প্রবলেম তাঁদেরই একচেটে।

সাহিত্যিকদের ইচ্ছা এইসব অনারারীদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করা। কিন্তু বাধা অনেক—অসম্ভব বলা চলে। প্রথম কথা বিজ্ঞানকে জনসাধারণের মর্জ্জির উপর চলতে হলে এখনও বৈজ্ঞানিকদের সোণা করা—আর অমৃত তৈরী করা নিয়েই থাকতে হত। সাহিত্যের কি উপায়। জনসাধারণই তার একমাত্র পেট্রন। এ অবস্থায় হাইব্রাউ হয়ে কদিন চলবে? বিশেষ দিন দিন যখন মনের পরিবর্ত্তন হচ্ছে আর লোকশিক্ষা বাড়ছে। সাহিত্য তা'হলে দাঁড়ায় কোটারীর তার ব্যাপকতার শেষ হয়। আরও কথা। এতদিন ধরে বলা হয়েছে সাহিত্যের মানব মনের সেই নিত্যবস্তু নিয়ে কারবার যা মানুষ মাত্রেরই পরম ধন। সকলেই সত্যিকারের সাহিত্য পড়ে আকৃষ্ট হবে, সকল মনেই সাহিত্য অখণ্ড আনন্দের সঞ্চার করবে। কাজেই এখন সাধারণে রস গ্রহণ করতে না পারলে লজ্জা পায় না, বুক ফুলিয়ে বলে রাবিশ—একে বল সাহিত্য! এখন যদি বলা হয় বিদগ্ধজনই রস নিবেদনের পাত্র—অরসিক সে রস নেবে কেমন করে—তাহলেও গণ্ডগোল। একজন রসিক সমালোচক বলেন—এইই সাহিত্য; অন্যজনে তেমনি জোর গলায় বলেন—এইই যদি সাহিত্য হয় তবে এ সাহিত্যের মরণ হোক। এই মতভেদের সুযোগ পেয়ে সাধারণে জাঁকিয়ে বসে। তাদের কথা—সাহিত্য কি কালই বলতে পারে—বিজ্ঞ সমালোচকরা নয়। এই বইই সাহিত্য, নিত্যকালের বস্তু একথা বলা সমালোচকদের শোভা পায় না। রসিকদের ভ্রুভঙ্গি দেখে এতদিনের অধিকার ত্যাগ—তা কেমন করে সম্ভব! হতেই পারে না। সমালোচনার মাপকাটি ঠিক হোক—মেপে দেখান হোক—৬ ইঞ্চি মানে ৬ ইঞ্চি কখন ১২ ইঞ্চি বা কখন শূন্য ইঞ্চি নয়। তারপর কথা। সমালোচনার মাপকাটি বোগাস্ না হলেও আন্-সায়েন্টিফিক্। এর দাপটে অধিকার ছাড়া কথা ওঠে না। ভুঁইফোঁড় সমালোচকদের মুখ বন্ধ করা অসম্ভব। তাছাড়া জার্ণালিজম্ এর কল্যাণে সাহিত্যিকদের কোনপ্রকার 'এটিচিউড' নেওয়া প্রায় অসম্ভব।

এই মোটামুটি অবস্থা। এ অবস্থায় সাহিত্যের সংজ্ঞা পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। হয় ইলিয়ট সংজ্ঞা যাতে সাহিত্য হবে মুখ্যত মুষ্টিমেয় বিদগ্ধজনের সম্পত্তি কিন্তু নিত্য-কালের। না হয় জার্ণালিজিম্এর সংজ্ঞা যাতে সাহিত্য হবে সকলের—তাদের প্রতিদিনের মনের খোরাক—নিত্যকালের নয়।

দ্বিতীয় সংজ্ঞাই কালোপযোগী।

পূর্ব্বযুগের সাহিত্য প্রাচীন কালের মানব-মনের ঐশ্বর্য্যের সুদৃঢ় ভিতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। মানুষ উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রায় একভাবে চলেছে। পরিবর্ত্তন যা কিছু হয়েছে—বাড়ি চুণকামের মত, একটু এদিক ওদিক ভাঙা গড়া হলেও বাড়ি ভেঙ্গে নূতন ভিতে গাঁথার কথা হয়নি। তাই মনের বিকাশ সাহিত্যেরও বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়নি। রসজ্ঞ পাঠকচিত্ত বদলায়নি, লেখক মনও ঘটনার আঘাতে চূর্ণ হয়নি কাজেই প্রাচীন সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হবার কোন উপলক্ষ্য হয়নি। বিংশ শতাব্দী এই যোগসূত্র ছিন্ন করছে মনের আমূল পরিবর্ত্তন করার চেষ্টায়।

রাষ্ট্র, সমাজ ও বিজ্ঞানে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সঙ্গে আমূল পরিবর্ত্তন দেখা যাচ্ছে সাহিত্যেও এই পরিবর্ত্তন আসছে। গণ্ডী দিয়ে মনকে দু দশ মিনিট ক্লাসিক পড়ে তাজা রেখে যাঁরা এ পরিবর্ত্তন অগ্রাহ্য করবেন ভাবছেন, তাদের দিনও যেন ঘনিয়ে এলো।

এখনকার সাহিত্যের বিষয়—মন হবে নাগরিকের মন—নিত্যচঞ্চল। তাতে শাশ্বত সত্য অনুসন্ধান কেউ করবে না। ও সব প্রাচীন রীতি। এ সাহিত্য সিনেমার ছবির মত ক্ষণিক মাধুর্য্য সৃষ্টি করে মিলিয়ে যাবে। মনকে গভীর ভাবে নাড়া দেবে না। 'ক্যাথারসিস্' নেই, আছে গতি। নিত্যতা নেই—'ক্রিটিসিজম্ অব লাইফ' নেই, আছে চঞ্চলতা যা জীবনের লক্ষণ।

আমাদের পরিচিত অতি প্রিয় সাহিত্যের মৃত্যু হয়েছে। ক্ষোভের কিছু নেই। এ শতাব্দীতে সভ্যতা ধ্বংস হবে কিনা এমন প্রশ্ন উঠছে। আগেও অবশ্য উঠেছিল। কিন্তু তখন এমন সম্যক জ্ঞান হয়নি,—'ডেটা' এত প্রচুর ছিল না। মন অজ্ঞানতায় 'জাতির' বিপদে সভ্যতার বিলোপ কল্পনা করতো। এখন অন্য। মোট কথা, ধ্বংস না হলেও সভ্যতার আমূল পরিবর্ত্তন হওয়া খুব স্বাভাবিক। আগের সভ্যতার থামগুলো এখনও অনেক মনে অভ্রস্পর্শী। তার চার পাশে আজও তাই কাব্যলক্ষ্মীর নিত্য কূজন। অন্য পক্ষে ভাবী সভ্যতার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কিসের বদলে কি আসবে ঠিক করার কোন উপায় নেই। বর্ত্তমান মন যেমন দানা পাকায়নি বর্ত্তমান সাহিত্যও তেমনি চঞ্চলতা ছাড়া কোন লক্ষণাক্রান্ত হয়নি। যা এখন লক্ষণ বলে মনে হচ্ছে সে সব একদিকে ডাই হার্ড ইলিয়ট সাহিত্যের শেষ চেষ্টা অন্যদিকে ভাবী কালের জন্য সোভিয়েট অনুমোদিত পাব্লিসিটি প্যাম্প্লেট।

একটা কথার আলোচনা বাকি। দেশের সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ। নিত্যকালের সাহিত্যে দেশ সামান্য লক্ষণ সেখানে মানবাত্মাই বড়, তার ক্ষুদ্র বৈশিষ্ট্য দেশজ বিকাশ আবর্জ্জনা না হলেও নগণ্য। সেক্সপিয়র ভাল, ইংরাজ-মনের পরিচয় আছে বলে নয়; কালিদাসে হিন্দু-মনের বিকাশ অবান্তর। সেখানে সাহিত্যিক রস সৃষ্টি করেন তাঁর দেশজ সত্তাকে অতিক্রম করে। কাজেই প্রাচীন সাহিত্যে ও তাহার অনুকূল বর্ত্তমান সাহিত্যে দেশজ সত্তা বড় কথা নয়।

এযুগে দেশাত্মবোধ বড় কথা। মনে "ন্যাসনালিজম্" ভিৎ গাড়ছে। প্রতিদিন চলা ফেরায় আমরা 'ন্যাসনালিষ্টে'র মত ব্যবহার করি। এ অবস্থায় সাহিত্যেও এ সত্তার প্রসার দেখা যাবে। সাহিত্য তাই ক্রমশঃ হচ্ছে দেশজ। বর্ত্তমান কালে সাহিত্যে যে অদেশজ সত্তা দেখছি তা সুপ্রাচীন নিত্যকালের মানব-মনের কথা নয়। এ যুগের মানুষের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সম্পত্তি ও সমাজ বন্ধনের বিরুদ্ধে অভিযোগ সব লিপিবদ্ধ হচ্ছে সাহিত্যেই। সেটা জাতিগত নয়।

এ পর্য্যন্ত আলোচনায় বাংলাদেশের কথা ওঠেনি। ব্যাপকভাবে সাহিত্য ও দেশ কালের আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এই দেশকালের সংঘাত একটু ভিন্ন। এখানে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন মধ্যবিত্তরা। এঁরা বিলিতি উনবিংশ শতাব্দীর ছাত্র। এঁদের কাছে পৃথিবীটা ছিল খুব solid—কি সত্য, কি মিথ্যা, কি ঠিক, কি ভুল, খুব সহজেই এরা জেনেছিলেন। সাহিত্য তাই ভরে উঠেছিল নানা সঠিক মতবাদে। দেশাত্মবোধ, ইনডিভিজুয়ালিটি প্রত্যক্ষ সত্যের মত সামনে দাঁড়িয়ে ছিল—তাই সাহিত্যিকরা গাইলেন তার জয়গান। বহু শতাব্দীর পর সংস্কৃত পরিপুষ্ট বাঙ্গালী মনের সঙ্গে পাশ্চাত্য ভাবধারার মিলন—সে এক মাহেন্দ্রক্ষণ। এ সেই magic casements opening. সেদিনের সাহিত্য বড় উজ্জ্বল। তাঁদের প্রতিনিধি যাঁরা এখনও আমাদের মধ্যে আছেন তাঁদেরও দেখি বেশীর ভাগ অগ্নিগর্ভ। নতুন অর্ডার স্থাপনায় এখনও কি জলন্ত উৎসাহ।

সবই ভাল হত যদি বিংশ শতাব্দী না এসে উনবিংশ শতাব্দীর বিরাট প্রাসাদ ভেঙ্গে তচনচ না করতো। আরও, এই ভাঙ্গার বিবরণ পাচ্ছি প্রতিদিন বিদেশী সাহিত্যের বহুল প্রচারের কল্যাণ। যেন চোখের সামনেই ভাঙ্গা হচ্ছে। শুধু কি তাই, আমরাও (এই মধ্যবিত্ত সমাজ) ক্রমশঃ ওদেশী জীবনযাত্রার রীতি নীতি মেনে নিয়েছি। সুপ্রাচীন আর্য্য সভ্যতা পরিপুষ্ট মনের যেন কিছু নেই। উনবিংশ শতাব্দীর 'নিশ্চয়তা' বিংশ শতাব্দীতে সব ভেঙ্গে যাচ্ছে। আমাদের বিংশ শতাব্দী পরিপুষ্ট মনেও তাই কোন নিশ্চয়তার খুঁটি খুঁজে পাচ্ছি না। এখন বিদেশের মত এদেশের মধ্যবিত্ত ইণ্টালেক্চুয়ালদের ক্রাইসিস্ এসেছে। চিন্তার জগতে solid কিছু খুঁজে পাওয়া আজ দুরূহ—ধর্ম্মে নেই, রাষ্ট্রে নেই, সমাজে নেই, ব্যক্তিগত জীবনেও নেই,—সবই টগবগ করে ফুটছে।

অবস্থা অস্বাভাবিক। উনবিংশ শতাব্দীর 'নিউ অর্ডার' এ মনের কাছে নিরর্থক, আনার চেষ্টা করাও সম্ভব নয়। ইঞ্জিন মাঝ পথে অচল হয়েছে, রেল পাতা নেই। এই হল উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের ট্রাজেডি। তার নেতা, উপনেতারা যে প্রচেষ্টায় নিজেদের আত্ম-নিয়োগ করে প্রায় সফলকাম হয়েছিলেন, হঠাৎ কালের

পরিবর্ত্তনে সবই বালির উপর জলের আল্পনার মত বুঝিবা মিলিয়ে যায়।

এখনকার নবীন সাহিত্যিকরা এই চিন্তার ঘূর্ণিপাকের পরোক্ষ আকর্ষণে মৃতকল্প। জীবনের কোন সহজ প্রেরণা সাহিত্যে নেই। কোন কিছু সত্য বলে বিশ্বাস করার ক্ষমতা কারুর নেই। ফল নিষ্প্রভ সৃষ্টি। যেটুকু উনবিংশ শতাব্দীর অনুকূল সেটুকু ধারকরা ঔজ্জ্বল্যে দীপ্যমান। যা নতুন তা চিত্তাকর্ষক হলেও মাছি-মারা কপির মত লক্ষণ বিবর্জিত।

কারণ আমরা চিন্তার রাজ্যে যতই ইউরোপীয় হইনা কেন, জাতিগতবৈশিষ্ট্য—রেস্ স্পিরিট প্রত্যক্ষভাবে আমাদের ব্যবহারিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। এখন মধ্যযুগ ও তার অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের নিত্য সঙ্গী। একপুরুষ দুপুরুষে জীবনে বিজ্ঞান কোন স্থায়ী ভিৎ গাড়তে পারেনা। এদেশী বৈজ্ঞানিকদের তান্ত্রিক সন্ন্যাসী হওয়া বিচিত্র নয় বরং স্বাভাবিক ঘটনা। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী তখনকার বিজ্ঞানের Solid সূত্রগুলোর আশ্রয়ে সাবেকী ধারণাগুলো ভাঙতে সুরু করছিল মাত্র। আজ সে সূত্র সব ফ্লুইড্। এখন আবার চার পাশে সন্ধ্যা আহ্নিকের ধুমে আসর আবার গমগম।

ওদেশী লোক বিজ্ঞানকে নাড়ীর সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে। তাই বিজ্ঞানের রূঢ় আঘাতে তাদের জীবন চঞ্চল হলেও তারা মরেনি। সেই চাঞ্চল্য নিত্য বলে ওদের সাহিত্যে তার ইঙ্গিত দেখি। আমাদের জীবনে ত এ চাঞ্চল্য সত্য নয়। তাই তার বুদ্ধিগত অনুকরণে চমক দেয়, কিন্তু তা বিবর্ণ।

নূতন সাহিত্যিকের সৃষ্টি কি এই ভাবে নিষ্ফল হবে—তার বিদেশী মনের প্রলয় ঘূর্ণী আর স্বদেশী-মনের নিষ্ক্রিয়তা তাকে সর্ব্বাংশে পঙ্গু করবে। সাহিত্যিকরা পশ্চিমপন্থী হয়ে কখন ইলিয়টী, কখন নাজী, কখন সোভিয়েটী রীতির লক্ষণ বিবর্জ্জিত বুদ্ধিগত অনুকরণে সৃষ্টি করবেন? না অন্য পথ আছে।

কথা হচ্ছে, মধ্যবিত্ত সমাজ এখনও মরেনি। মরলে কমিউনিষ্ট মতে মরবেনা। তার ভিৎ পাকা হয়নি, সবে গড়া সুরু হয়েছিল মাত্র। তাই মৃত্যুর সম্ভাবনা। এই মধ্যবিত্তরা এখন কেউ 'ক্যাপিটালিষ্ট', কেউ ফ্যাসিষ্ট কেউ কমিউনিষ্ট এট্রিচিউড নিয়ে বসেছেন। এসব নিছক পোজ্। এখানে ক্যাপিট্যালিজ্ম্ এখন ভিৎগাড়েনি, ফ্যাসিজ্ম্ ও কমিউনিজ্ম্ এর কথাই ওঠেনা। তাছাড়া ফ্যাসিষ্ট, কমিউনিষ্ট মনোবৃত্তি সন্দেশ রসগোল্লা নয়। হলাম বলেই ফ্যাসিষ্ট কি কমিউনিষ্ট হওয়া যায় না। অভিনয় আর জীবনে তফাৎ কার্য্যের ফলাফলে। আজকার কবি যেমন অহল্যার দুঃখে আমাদের মনে শিহরণ আনেন তেমনি কমিউনিষ্ট রীতিসঙ্গত ক্যাপিটালিষ্ট সমাজকে গালি-গালাজ ক'রেও মনকে নাড়া দিতে পারেন। এটা কবির ক্ষমতা ভাষা, ছন্দ, প্রয়োগের কৌশল। কিন্তু এতে চিত্ত আকৃষ্ট হলেও জীবনের সঙ্গে এর সংযোগ নেই।

প্রতিদিনের মন এখন ক্যাপিটালিষ্ট ত নয়, সোসালিষ্ট বা কমিউনিষ্টের কথা ত ওঠেই না। অধিকাংশ বাঙ্গালী জীবনের ভিৎ মধ্যযুগের গাঢ় অন্ধকারে। মধ্যবিত্তদের কথা বলছিনা—তাদের পিছটান খুব থাকলেও একপা নিশ্চয় বর্ত্তমান যুগে আছে।

লোকশিক্ষা আরও বাড়লে এদেশে যে যুগ আসবে তাতে Atavism-এর সম্ভাবনা খুব বেশী। সারাটা উনবিংশ শতাব্দীর সাধনা ডুবে যাবে এই মধ্যবিত্তের লোপের সঙ্গে। দেবার কিছু থাকবে কিনা বলা কঠিন—বড় নড়নড়ে ভিৎ।

তাই মনে হয় আমাদের সাহিত্যিকরা পথভ্রষ্ট। বিদেশীর উজ্জ্বল আলোকে দৃষ্টি বিভ্রম হয়েছে। চারি-দিকের ছায়া নজরে পড়ছেনা। জঙ্গলের মধ্যে বাগান—কদিন তার পরমায়ু।

সাহিত্যের সংজ্ঞা হতে নিত্যকালের রসসৃষ্টির কথা বাদ দিলে থাকে প্রতিদিনের মনের খোরাক যোগান। জার্ণালিজমের প্রসারে ওটাই এখন বড় কথা। Galsworthyর বই বার হলে যারা পড়তো, তাদের সংখ্যা প্রচুর। বিদেশেও তাঁর খাতির ছিল সবচেয়ে বেশী। অথচ মৃত্যুর পর প্রায় ক্রিটিক ও বন্ধুরাও বলেছেন তিনি সেকেণ্ড রেট। মনের উপর প্রভাব কেবল ক্লাসিকই করবে এমন দিন নেই। প্রতি বছর

Best Sellerরা মনকে আচ্ছন্ন করে। তাকে অস্বীকারের কি আছে? যখন মনের কাছে যা প্রিয়, তখন তার দাম। মন তাকে আদরে আশ্রয় দেয়। তাতে তার রংও কিছুক্ষণের জন্য বদলায়—হয়ত সামান্য একটু ফিকেও হয়ে যায়। সাহিত্যিক ও সমালোচকরা এতদিন এই ঘটনাকে অস্বীকার করে চলার চেষ্টায় নানা অসম্ভব মাপকাঠি তৈরী করে বসেছিলেন। ঘটনা দিন দিন এত রূঢ় সত্যের আকার নিচ্ছে যে অস্বীকার করার উপায় নেই।

স্বীকার করলে সাহিত্যিকরা লিখ্‌বেন এই মনের পরিচয়। অর্থাৎ নিজেদের মনের কথা। সেত আগেও তাঁরা লিখেচেন, তফাৎটা কি? তফাৎ, আগে আদর্শের ভূত ঘাড়ে চেপে ছিল, রসসৃষ্টির ও অমরতার স্বপ্ন সহজদৃষ্টিকে দাবিয়ে রেখেছিল। লেখক লিখ্‌তেন আদর্শ অনুযায়ী—Old Masters সামনে।

এখন কথা, এলেখা চিরন্তন কালের নয়—আজকার দিনের মত; এখনকার মত এটা বড় সত্য হয়ে ফুটুক। তারপর কিছু নেই। সেটা অবান্তর প্রসঙ্গ। আর সমালোচকদের কাজ—কালের স্পর্শে এই রসসৃষ্টি মলিন হবে না উজ্জ্বল হবে এ প্রশ্ন নয়। আজকার দিনে এর কি মূল্য—কেন মূল্য এ মূল্য দিয়ে আমরা ভাবী সভ্যতার অন্ধকারে রহস্য কি কিছু চিন্‌তে পারছি। অর্থাৎ সমালোচক হবেন বৈজ্ঞানিক —লেখক ও পাঠক মনের কখন Vertical কখন Horizontal cross-section আমাদের মাইক্রোস্‌কোপ দিয়ে দেখে বল্‌বেন। Vertical section জানাবে মনের ইতিহাস, Horizontal section জানাবে বর্ত্তমান মনের পরিচয়।

এমন করলে বুঝ্‌বো কোথায় যাচ্ছি মৃত্যুর দিকে না নূতন সৃষ্টির সন্ধানে। জাতি যুগসন্ধিক্ষণে আবার পিছন পথে ফিরবার চেষ্টা করবে। তার লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। এখন পাশ্চাত্য সভ্যতা যদি কিছু দিয়ে থাকে তবে আর তার উচ্ছিষ্ট ভোজনে বিরত হয়ে, যা পেয়েছি তা রক্ষা করার চেষ্টা, যা আসছে আমাদের জ্ঞানের আলোকে তাকে Canalism করার চেষ্টাই একমাত্র কর্ত্তব্য।

সাহিত্যের সঙ্গে সভ্যতারও জীবনের যে অঙ্গাঙ্গী যোগ তার জন্যই এত কথা ওঠে। মৃতের সাহিত্য নেই। তার যেটুকু জীবিত মনের লক্ষণাক্রান্ত তাই বেঁচে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিক বাঙ্গালী মরছে। সাহিত্যকে অপমৃত্যু থেকে বাঁচাবার চেষ্টা অপ্রয়োজনীয় বা নিরর্থক একথা আজ গ্রাহ্য নয়।

সাহিত্যিকের মন ঐতিহাসিক কারণে পশ্চিমপন্থী। তার প্রধান কথা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এখন এই দৃষ্টিভঙ্গী দেশজ কালজ ঘটনার বিশ্লেষণ ও প্রকাশে নিয়োজিত করাই পন্থা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলে এ আলোচনার ইতি করি। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেছিলেন সেকালে গলায় ফুলের মালা দিলে ফুলগুলো ছিঁড়ে তার সূতোর সন্ধান করতেন। এইই সৃষ্টিশীল রোমান্টিসিজম্‌। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর মূলকথা। আমাদের পথ ও পাথেয়।

পাশ্চাত্য মরতে বসেছে। আমরা মরিনি। মাত্র নবজীবনের শুভ সূত্রপাত দেখা দিয়েছে। এখন এই সৃষ্টিশীল রোমান্টিসিজম্‌ই বড় কথা। পাশ্চাত্যের দুঃখবাদ, সকল বিশ্বাসের পরিসমাপ্তি, সম্পত্তিবাদের ধ্বংস, এসব আমাদের মনের সামান্য অংশ অধিকার করে আছে তাও দু দশ মিনিট করে এসব চর্চ্চার দরুণ। আসল যুদ্ধ আরম্ভ হবে—মধ্যযুগকে তাড়াবার জন্য। এজন্য বাঙ্গালী সাহিত্যিকই একমাত্র কর্ণধার—সারথি ও যোদ্ধা সবই একাধারে। কারণ ইঁহারাই অনেকাংশে বর্ত্তমান যুগের মানুষ। অন্যকে মানুষ করার ভার তাই তাঁদের উপর।

মেঘদূত-উৎসব

শ্রীমতী সুষমা দেবী

কবিতার জন্ম হয় দুঃখে। অতি দূর অতীতে তমসা-তীরে কোন এক অজানা ব্যাধ অকস্মাৎ তীর ছুঁড়ে নিরীহ ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে বধ করেছিল। তা' দেখে কবিগুরুর প্রাণে যে ব্যথা লেগেছিল, তাই থেকে তাঁর মুখ দিয়ে জগতের প্রথম শ্লোক বেরিয়েছিল—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

কাব্যের সেই সহজাত ধর্ম্ম আজও তা'র সাথী হয়ে রয়েছে। পৃথিবীতে নানা বিষয়ে কবিতা রচিত হয়েছে ও হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত কাব্যরসের আস্বাদ আমরা পাই কেবল সেইগুলির মধ্যে যা'দের উদ্ভব হয়েছে গভীর দুঃখে।

নিজ নিজ মনের অবস্থা অনুসারে আমরা সময়ে সময়ে বীর, রৌদ্র, শান্ত ইত্যাদি নানা রস আস্বাদন করে আনন্দ পাই সত্য। কিন্তু তা'রা যেন আমাদের অন্তরের গভীরতম স্থানগুলি স্পর্শ করতে পারে না; যদিই বা কদাচ স্পর্শ করে তা'হলেও তারা আমাদের সম্পূর্ণ অভিভূত করতে পারে না। এ ক্ষমতা আছে কেবল করুণরসের। রবীন্দ্রনাথের "মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন" প'ড়ে আমরা নিশ্চয়ই আনন্দ পাই, মনে গর্ব্ব হয় যে আমরা তাঁর স্বজাতীয়। কিন্তু যখন তাঁরই "তবে আমি যাই গো তবে যাই" কিম্বা "বেলা যে প'ড়ে এল জলকে চল্" পড়ি, তখন আমরা যেন অন্য সব কথা ভুলে যাই। আমরা বাঙ্গালী কি মাদ্রাজী, স্ত্রী কি পুরুষ সে কথাও মনে থাকে না। আমরা তখন শুধু মানুষ হ'য়ে যাই। মানুষের যুগ যুগান্তরের কত পুঞ্জীভূত বেদনা যেন একসঙ্গে বুকের মধ্যে ঠেলে উঠে আমাদের একেবারে অভিভূত করে দেয়। আমরা স্থান কাল প্রভৃতির সীমা ভুলে যাই।

কবিগুরু কালিদাসের মেঘদূতের এইটিই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। ভাবে ভাষায় অলঙ্কারে এর তুল্য অন্য কাব্য অনেক থাকতে পারে। কিন্তু তারা মেঘদূতের মত আমাদের অন্তর স্পর্শ করতে পারে না, কারণ মেঘদূতেই কবির বিরহী চিত্ত মানুষের সামনে নিজেকে ধরা দিয়েছে। মেঘদূত যেন তাঁর বিরহের পবিত্র অশ্রুজলে গাঁথা একখানি মালা।

যক্ষ গুরু অপরাধ করেছিল। তার শাস্তি তাকে ভোগ করতে হয়েছিল। নির্ব্বাসন সকলের পক্ষেই গুরুদণ্ড। হতভাগ্য যক্ষের পক্ষে তা' প্রাণদণ্ডের চেয়েও কঠিন। তা'র অভাগিনী প্রিয়ার কথাই সে দিনরাত ভাবছে। দিন যেন তার কাটতে চাইছে না। এমন সময়ে তার বিরহী প্রাণকে আরও যেন আকুল করবার জন্যেই নবমেঘসম্ভার নিয়ে আষাঢ় এসে দেখা দিল। দক্ষিণ সমুদ্র থেকে এসে মেঘ যক্ষের স্বপ্ন-স্বর্গ অলকাপুরীর দিকেই যাচ্ছে। যক্ষ তখন বাহ্যজ্ঞানরহিত। মেঘ যে অচেতন জলীয় বাষ্প-সমষ্টি মাত্র, সে কথা তার মনে নেই। সে আকুল হয়ে সেই অচেতন বাষ্পসমষ্টিকেই "ভাই" বলে ডাকছে, তার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করে তা'কে নানা প্রলোভন দেখিয়ে তা'র হাত দিয়ে অলকাপুরীতে যক্ষবধূর কাছে তা'র বিরহী চিত্তের ব্যাকুলতার বার্ত্তা পাঠাতে চাইছে। আর তা'র প্রাণের সেই আকুলতা বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয় এক শোক-কাব্যের সৃষ্টি করেছে।

মেঘদূত পড়তে পড়তে আমরা কালিদাসকে ভুলে যাই, কুবেরের শাপ ভুলে যাই—এমন কি যক্ষের কথাও ভুলে যাই—মনে থাকে কেবল তা'র বিরহ-বৈতরণী—যার এপারে দাঁড়িয়ে আছে এক হতভাগ্য বিরহী আর ওপারে তার বিরহিণী প্রিয়া। এত কাছে তবু এতদূরে। কত যুগ, কত শতাব্দী কেটে গেছে—কিন্তু আজও তা'রা তেমনি সেই বিরহ-বৈতরণীর বিভিন্ন তীরে বন্দী হ'য়ে রয়েছে।

আপাতদৃষ্টিতে মেঘদূতকে আদিরসাশ্রিত মনে হয়

ব'লে অনেকে ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করেন, তাঁরা ভুলে যান যে বিরহ ও প্রেম কেবল স্বামী স্ত্রী বা তথাকথিত প্রেমিক প্রেমিকারই নিজস্ব সম্পত্তি নয়। শ্রীরাধার সাত্ত্বিক বিরহ, সুফীর পরম প্রেম থেকে আরম্ভ ক'রে আমাদের ঘর সংসারের মিলন বিরহ মূলত একই বস্তু। যাকে প্রাণ দিয়ে চাই, কিন্তু পাই না—সে প্রিয় হোক, প্রিয়া হোক বা সন্তান হোক, ভাই হোক, সখা হোক বা সখী হোক, তার অভাবই বিরহ। স্বামীগৃহগতা কন্যার জন্য মাতার বিরহ, সংসারত্যাগী নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের জন্য পিতার বিরহ, প্রবাসী সুহৃদের জন্য সুহৃদের বিরহ—আর যা'রা কোনও দিনই ফিরবে না—তা'দের জন্য আশালেশহীন হতভাগ্য আত্মীয়স্বজনের বিরহ—সবই আসলে এক, কেবল সম্বন্ধের প্রভেদ। এ বিরহ বড় কঠোর, বড় মর্ম্মান্তিক—কিন্তু এই কঠোরতার ভিতরেও প্রচুর মাধুর্য্য আছে, যা বোধ হয় মিলনেও নেই। বিরহীর সমস্ত অন্তর তার বাঞ্ছিতের মোহনস্পর্শে ভ'রে আছে। চোখ বুজলেই তা'কে দেখতে পাচ্ছে—এমন কি মনে হয় চোখ চেয়ে থাকলেও পাচ্ছে। তার কণ্ঠস্বর শুনছে—বাহ্য ইন্দ্রিয় দিয়ে নয়—প্রাণ দিয়ে। নিজের পৃথক সত্তা ভুলে গিয়ে বাঞ্ছিতের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। এ আনন্দ যে মিলনেও নেই। সেই জন্যই বিরহ এত মধুর, এত মর্ম্মস্পর্শী। এ যেন মধুবিষ। বিষের জ্বালায় কণ্ঠ জ্বলে যাচ্ছে তবু আকণ্ঠ পান করতে ইচ্ছা হয়। সাধারণ পার্থিব সুখের সঙ্গে এইখানেই বিরহানন্দের পার্থক্য। মিলনে যে পূর্ণ তৃপ্তি মানবের পক্ষে সম্ভব নয় তা' বহু কবি বহু প্রেমিক বলেছেন

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল,—
লাখ লাখ যুগ হিয়া হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল ॥"

প্রকৃত মিলন হ'ল অন্তরের জিনিষ। বাঞ্ছিতকে, প্রিয়কে যখন কেউ ধ্যানজ্ঞান করে, তারই মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দেয়, নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলে যায়, প্রকৃত মিলন তখনই সম্ভব হয়। তাই বিরহের মধ্য দিয়েই শ্রীরাধা তাঁর প্রাণবল্লভকে পেয়েছিলেন, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছিলেন।

সতীর জন্য মহাদেবের বিরহ, রামচন্দ্রের জন্য দশরথের বিরহ, জানকীর জন্য রামচন্দ্রের বিরহ থেকে আরম্ভ ক'রে—এই বিরহ নিয়ে বহু কাব্য মহাকাব্য রচিত হ'য়েছে। কিন্তু বিরহ কাব্য হিসাবে মেঘদূত যে স্থান অধিকার করে আছে, তা, অন্য কোনও কাব্য নিতে পারেনি। তার কারণ এই যে যদিও রচনার জন্যে কবিকে স্থান কাল পাত্র ব্যবহার করতে হয়েছে, তা হ'লেও তাঁর কবি-প্রাণ এ সমস্ত সীমা ও বাধা অতিক্রম ক'রে মানব-হৃদয়ের এক অপরূপ আলেখ্য অঙ্কিত ক'রেছে—যা' সনাতন যা' চিরস্থায়ী। জগতে মানব জাতির অস্তিত্ব যতদিন থাকবে ততদিনই মেঘদূত সমাদৃত হ'বে।

আমাদের কবিদের মতে বিরহের সঙ্গে প্রাবৃট্ কালের বড় নিকট সম্বন্ধ আছে। নীলগগনে সজল ঘন দেখে কবির মনে প'ড়ে যায় কার "সজল কাজল আঁখি।" অপর কোনও কবি ভাবেন যে কালো মেঘ বুঝি তাঁর প্রিয়ার চোখের কাজল চুরি ক'রেই কালো হয়ে গেছে। আবার বিদ্যাপতির শ্রীরাধা বলছেন যে—ভরা বরষায় শূন্য মন্দিরে তিনি একা থাকতে পাচ্ছেন না। ঝঞ্ঝার ঘন গর্জ্জন, অবিশ্রাম বারিপাত হচ্ছে, তা'র মধ্যে অথির বিজুরির পাঁতি থেকে থেকে দেখা দিচ্ছে। ডাহুক ডাকছে, দাদুরী উন্মত্তের মত কলরব করছে আর ময়ূর ময়ূরী পরম আনন্দে নৃত্য করছে। কেবল বিরহিণী শ্রীরাধার অন্তর ফেটে যাচ্ছে। ভরা বাদরে হরি বিনা তাঁর দিন রাত আর কাটছে না।

হরিপ্রেমে উন্মাদিনী মীরাও তাঁর গিরিধর গোপালকে বর্ষার দিনে প্রায় এই ভাবেই বলেছিলেন—বাদলের দিনে মেঘ গর্জ্জন কচ্ছে, থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, দাদুর, ময়ূর, পাপিয়া সকলে মহানন্দে তান ধ'রেছে। পূবে' হাওয়া বইছে—কিন্তু মীরার প্রাণ তাতে শীতল হওয়া দূরে থাক, আরও যেন জ্বলে যাচ্ছে। তিনি কাতরস্বরে গিরিধরকে বলছেন—প্রভু, এ বিরহ আর সহ্য হয় না—প্রাণ সম্পূর্ণ যাবার আগে একটি বার দেখা দাও—তোমার ওই শ্রীচরণেই আমার প্রাণ রেখে আমি চলে যাই।

আজ আষাঢ়ের প্রথম দিনে আমরা সমবেত হয়েছি বর্ষাবন্দনা করতে। সঙ্গীতে আবৃত্তিতে কবিতাতে অনেকেই এই পূজার বোধন করেছেন। আমাকেই কেবল নীরস গদ্যে এর উদ্‌যাপন করতে হচ্ছে। আমরা হতভাগ্য পুরবাসী। আমাদের না আছে কদম্ব না আছে কেতকী! ময়ূর ময়ূরীর আনন্দ নৃত্য আমাদের পটেতেই দেখতে হয়। কিন্তু তবুও সহরের কোলাহল ও বৈদ্যুতিক আলো ছাড়িয়ে আমরা মেঘডম্বরুর নিনাদ শুনতে পাই, চপলার উজ্জ্বল হাসি দেখতে পাই। দাদুর দাদুরীর অমধুর সঙ্গীত অবশ্য আমরা সর্ব্বত্রই শুনতে পাই। আর তার সঙ্গে যখন সুর মিলিয়ে অবিরাম বারিধারা নামে তখন আমরা ক্ষণকালের জন্য ভুলে যাই যে আমরা বিংশ শতাব্দীর নাগরিক। আমরা কালিদাসের, মালিনীর যুগের মানুষ হ'য়ে মহানন্দে বর্ষাবন্দন আরম্ভ করে দিই, গেয়ে উঠি—

'এবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে' *

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মেঘদূত-উৎসব উপলক্ষে সভানেত্রীর অভিভাষণ।

সময়

শ্রী নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাবিয়াছিলাম ছুটীর কয়টা দিন এই আসানসোলেই কাটাইয়া দিব। বিশেষ করিয়া সন্ধ্যার আগে পাহাড়ে ঘেরা কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের এই নির্জন স্থানটা আমাকে রোজ আকর্ষণ করে যেন। বেলা পড়িয়া আসিলেই বেড়াইতে বেড়াইতে এই দিকে আসি। মন্দিরের পশ্চিম দিকে একটা ছোট ঝরণা আছে—খুব পরিষ্কার টলটলে জল। কবি হইলে কাকচক্ষু প্রভৃতির সহিত তুলনা দিয়া বসিতাম হয়তো! ঝির ঝির করিয়া ঝরণাটা বহিতে থাকে তাহারই ধারে আসিয়া বসি। তারপর কখন যে সন্ধ্যা নামিয়া আসে বুঝিতে পারি না, হঠাৎ এক সময়ে চাহিয়া দেখি অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি টর্চটা জ্বালাইয়া মাসিমার বাড়ীর দিকে হাঁটিতে থাকি—অল্প খরচে এমন সুন্দর বায়ু-পরিবর্ত্তন করিবার মতো সুযোগ আমার আর আসে নাই।

সে দিনও বসিয়াছিলাম। মন্দিরের যাত্রীর ভীড় নাই। রাস্তার ধারে একটা মোটর দাঁড়াইয়া আছে শুধু কেহ হয়তো আজ বেড়াইতে আসিয়াছেন। বৈকালের দিকে জায়গাটা বেড়াইবার মতোই বটে।

একটা কথা ভাবিতেছিলাম। বড় সাহেব নাকি রেঙ্গুণে আমাকে বদলী করিয়া দিবেন—মন্দ হইবে না। কলিকাতা আর ভালো লাগে না—তবু একটা নূতন জায়গা দেখিবার আশা রহিল। জীবনে কোনো দিন রেঙ্গুণ দেখিতে পাইতাম কিনা সন্দেহ! অবশ্য আর একটা দিকও ভাবিয়া দেখিয়াছি ইহার মধ্যে। সম্পূর্ণ নূতন জায়গা হয়তো কতো অসুবিধার মধ্যেই পড়িতে হইবে সেখানে—স্যোয়েড্যাগন প্যাগোডা এবং ইরাবতী নদীর মোহ আর কদিনই বা থাকিতে পারে আমাদের জীবনে?

"আরে নৃপেন বাবু যে—"

একেবারে রীতিমত চমকাইয়া উঠিলাম। এই নির্জন পাহাড়ে ঘেরা অখ্যাত স্থানে আজ কে আমায় চিনিল হঠাৎ? ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিয়াও ঠিক ধরিতে পারিলাম না, তবুও তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া আন্দাজে বলিলাম, "এই যে আসুন—"

"কি! চিনতে পারছেন তো মশাই!" ভদ্রলোক আমার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিলেন, আবার তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলাম, তাহার পরে হঠাৎ একসময়ে যেন চীৎকার করিয়া উঠিলাম, "সন্তোষ বাবু!"

সন্তোষ বাবু ততক্ষণে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছেন, "ওঃ! কতদিন পরে দেখা বলুন তো, প্রায় দশ বছর কি বলেন?"

আমি মাথাটা নাড়িলাম শুধু—দশ বছর কেন, দশ বছরের অনেক বেশীই হইয়া গিয়াছে—সেই যেবার কলিকাতায় দাঙ্গা বাধে, সেই সময়ে আমরা দুইজনে গিলেণ্ডার ব্রাদার্সে ঢুকিয়াছিলাম এক সঙ্গে। এক ডিপার্টমেন্টেই কাজ করিতাম, সেইখানেই আমাদের পরিচয় হইয়াছিল প্রথমে। তাহার পরে হয়তো বাহিরের সে পরিচয়কে অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বন্ধুত্বের গভীর ভিতরেই আসিয়া পড়িতাম

একদিন, কিন্তু সেই বছরের শেষে রিডাক্‌শন্ আমাদের দুইজনেরই ভিতরে প্রাচীর তুলিয়া বসিল হঠাৎ— দুইজনে ছিটকাইয়া পড়িলাম দুই দিকে—তাহার পরে আর দেখা হয় নাই।

বলিলাম, "বাস্তবিক্—অনেক দিন পরে দেখা হোল—আমি তো আপনাকে চিন্‌তেই পারিনি প্রথমে; তারপর, ভালো আছেন তো?"

"এই চল্‌ছে ভাই—" সন্তোষ বাবু আমার পাশে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন, "আমি কিন্তু ঠিক ধ'রে ফেলেছি আপনাকে, সেই রকম রোগাই আছেন—খালি একটু যা' লম্বা হ'য়েছেন আর কি! সত্যি, ওঃ কতোদিন পরে যে দেখা হোল—" সন্তোষ বাবু ভালো করিয়া পাশের পাথরটার উপরে বসিলেন।

দেখিলাম সন্তোষ বাবুর বক্তৃতা করিবার শক্তিটা সেই রকমই আছে। দেখিতে দেখিতে সেই সব পুরাণো কথা আরম্ভ হইয়া গেল। অতীত দিনের বিস্মৃতি-ভরা কাহিনীর পুনরাবৃত্তির ভিতরে ধীরে ধীরে একেবারে ডুবিয়া গেলাম।

আফিস ছাড়িয়া কি করিয়া তিনি রেলে ঢুকিয়াছিলেন এবং নানাস্থানে বদ্‌লী হইয়া অবশেষে কাশী হইতে সম্প্রতি এখানে আসিতে পারিয়াছেন, চুপ করিয়া বসিয়া তাহারই ইতিহাস শুনিতে লাগিলাম। কতক্ষণ যে এইভাবে গল্প করিয়াছিলাম মনে নাই, হঠাৎ এক সময়ে চাহিয়া দেখি আমাদের ঘিরিয়া সন্ধ্যার স্তিমিত অন্ধকার ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়াছে। যাঁহারা বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মোটরটাও চলিয়া গিয়াছে কখন।

সন্তোষ বাবুর গল্প কিন্তু তখনও থামে নাই: কি ভাবে চক্রান্ত করিয়া কাশী ষ্টেশনের হেড তার বাবু তাঁহাকে এখানে বদ্‌লী করিয়া দিয়াছেন তাহাই বুঝাইতেছিলেন আমাকে; বলিলেন, "শেষ পর্যন্ত ব্যাটা এই আসানসোলেই ঠেলে দিলে ভাই—সব ব্যাটার কারসাজি; আমি কি আর বুঝি না—যাই হোক্ জায়গাটা মন্দ নয়, কি বলুন?"

বলিলাম, "আমার তো বেশ ভালই লাগে, দূরে দূরে এই সব ধূধূ করা মাঠ—উঁচু নীচু পীচ ঢালা রাস্তা; জিনিষ পত্তরও বেশ—"একটু থামিয়া বলিলাম, "বৌদিকেও এনেছেন তো এখানে?"

"আরে হ্যাঁ, সে কথা আর বোলো না ভাই" কথার ভিতরে সামান্য আত্মীয়তার স্বাদ পাইয়া সন্তোষ বাবু যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন; 'আপনি' হইতে কখন যে 'তুমি' তে তিনি নামিয়া আসিয়াছেন, তাহা হয়তো নিজে এখনো বুঝিতে পারেন নাই। দেখিলাম সহজ আনন্দের স্রোতে অতি সহজে ভাসিবার ক্ষমতাটা আজো ফুরায় নাই তাঁহার, "সে এক কাণ্ড—আরে তোমাদের গ্রামেরই তো মেয়ে হে?"

বলিলাম, "এ্যাঁ—তাই নাকি?"

"হ্যাঁ হে—শিবনাথ বাবুকে চেন?—চক্রবর্তি? তাঁরই মেয়ে—"

"কে, লীলা ও?" আমার নিজের গলার স্বরটাই কেমন যেন অস্বাভাবিক শুনাইল খুব, পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম, খুব জোরেই নামটা উচ্চারণ করিয়াছি। ভারী অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম।

"চেনো নাকি ওকে তুমি?" সন্তোষবাবু ততক্ষণে হো হো করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। "তাতো হবেই—তাতো হবেই—একগ্রামে বাড়ী যখন—"

কি যে বলিব ঠিক করিতে পারিলাম না। যাহার সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কোনো খোঁজই নাই

নাই; ইচ্ছাকৃত অথবা পারিপার্শ্বিক যে কোনো কারণেই হউক, যাহার খোঁজ লইবার সুন্দর সুযোগ-গুলিকে নির্বিবাদেই অবহেলা করিয়াছি, সেই লীলার কথা একদিন যে এইভাবে শুনিতে হইবে, এ সংবাদে মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিবার কথা মোটেই নয়—তবু'ও সে বোকামী আমি শেষ-পর্যন্ত করিয়া বসিলাম। সেই ভাবেই মুখের দিকে চাহিয়া আবার বলিলাম—"তাই নাকি ?"

"হ্যাঁ হে,"—আবার হিহি করিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন, "চলো না আজ আমাদের ওখানে, দেখা হ'য়ে যাবে এখন পুরোণো বন্ধুর সংগে !

বলিলাম—"থাক, রাত্তির হ'য়ে গেছে, কালই যাওয়া যাবে বরং—কি বলেন ?"

"কা—ল ?" সন্তোষ বাবু একটু নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন যেন "আ—চ্ছা,—কিন্তু মনে থাকে যেন ভাই,—ভুলোনা শেষ কালে—"

বলিলাম, "না—না ভুলবো কেন ?"

অন্ধকারের মধ্যে টর্চটা টিপিয়া দুইজনে ধীরে ধীরে পথের উপরে নামিয়া আসিলাম। আসিবার পথে সন্তোষবাবু তাঁহার বাড়ীটা দেখাইয়া দিলেন, বলিলেন, "আসা চাই কিন্তু—বিকেলের দিকে একটু রোদ পড়লে বেরি'ও—বেলা পাঁচটার সময়েও যেন আগুন ছুটতে থাকে এখানে।"

বলিলাম, "আচ্ছা—"।

মাঝে মাঝে অতি সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া আমার মাথায় ভূত চাপিয়া বসে আজকাল কোনো কাজই করিতে পারি না—কেবলই ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই কথা গুলির পুনরাবৃত্তি চলিতে থাকে যেন। অনেকক্ষণ হইতেই ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম। ওধারের দালানের ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া দশটা বাজিয়া গেল, লণ্ঠনটা নিভাইয়া দিলাম, চোখও বুজিলাম,—কিন্তু না! ঘুম আর আমার আসিবেনা আজ !

কয়েকটা ঘটনা পর পর ছবির মতো যেন ভাসিয়া ওঠে—বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাই ছবি-গুলিকে। সেই সন্ধ্যার দৃশ্যটা আজো ভুলিতে পারি নাই! বর্ষাকাল। বাড়ীর সকলে সরকার বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়াছেন সেদিন ও বাড়ী আগ্‌লাইবার ভার ছিল আমার উপরে। সবে ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছি, খুব নভেল পড়িতেছি তখন। হঠাৎ দরজায় শব্দ হইল, চাহিয়া দেখি লীলা—একেবারে ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া ঘরে ঢুকিয়াছে, বলিলাম, "এ কী—একেবারে ভিজে গেছো যে লীলা ?" লীলা হাসিল একটু, বলিল, "খানিকটা উল ফেলে গিয়েছিলাম এখানে, নিতে এলাম—তারপর বাড়ী পাহারা দেওয়া হ'চ্ছে বুঝি ?"

"দেখ্‌তেই পাচ্ছো—"

"হুঁ" উল-টা লইয়া সে দরজার দিকে পা বাড়াইল, "চল্‌লাম নিপুদা—"

বলিলাম, "শোনো লীলা—"

"কি ?"—দরজার উপরে দাঁড়াইয়াই লীলা প্রশ্ন করিল।

"কাছে এসো আগে—"

"না, বলোনা ওইখান থেকে" লীলার মুখে দুষ্টামি ভরা হাসি।

বইটা মুড়িয়া একেবারে তাহার হাতটা ধরিয়া খাটের কাছে লইয়া আসিলাম, "ভারী দুষ্টু তুমি—ডাক্‌ছি এতো কোরে—"

লীলা হাতটা ছাড়াইয়া লইবার জন্য তখন রীতিমত চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছে, বলিল, "আঃ—ছাড়োনা হাতটা, লাগ্‌ছে যে—" হাতটা ছাড়িয়া দিলাম, "এই ভিজে কাপড়ে যাবে তো বাড়ী?"

"যাবোই তো—?"

"তারপর, ধরো যদি তোমার অসুখ হয় এই জলে ভিজে?"

"ওরে বাপ্‌রে—লীলা কয়েক পা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল, "আমার অসুখের জন্যে তোমার এত ভাবনা নিপুদা?—ঘুম হয় না বুঝি রাত্তিরে?" বলিয়াই সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল—থাকিয়া থাকিয়া হাসি যেন আর থামিতে চায় না তাহার!

কোনো কথাই বলিতে পারি নাই সেদিন—চুপ করিয়া তাহার চোখের দিকে চাহিয়াছিলাম শুধু। তারপর, হঠাৎ এক সময়ে সে আমার আরও কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—কাণের কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া বলিল, "ভয় নেই, তোমাকে ছেড়ে আমি কি কখনো মরতে পারি নিপুদা?"—বলিয়াই সেই বৃষ্টির মধ্যে লীলা ছুটিয়া পলাইয়াছিল। জানালা দিয়া চাহিয়া তাহার অপসৃয়মান মূর্তিটিই দেখিয়াছিলাম শুধু!

আর একদিনের ছবি বেশ স্পষ্ট চোখের উপরে ভাসিয়া উঠে—আমি যে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া নির্বিবাদে ঘরে বসিয়া আছি, বাবা তখন সে কথাটা প্রায়ই স্মরণ করাইয়া দিতেন। চাকুরীর প্রয়োজন,—কলিকাতায় চেষ্টা চরিত্র করিয়া দেখা উচিত অন্ততঃ, এমন কোনো বড় মানুষের সংসারে জন্মাই নাই যে বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া সাহিত্য চর্চা করিলেই দিন কাটিবে, ইত্যাদি।

কথার উত্তর দিই নাই। ভাবিয়া চিন্তিয়া কলিকাতাতেই যাইব ঠিক করিলাম, সত্যই তো মিছামিছি বসিয়া থাকিলে দিন চলিবে না আমার!

কয়েকদিন পরের কথা। তখনও ভালো করিয়া ভোর হয় নাই, বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম, ঝাঁপ ঠেলিয়া বাহির হইতে গিয়া দেখি ওদিকে আমগাছের আড়ালে লীলা দাঁড়াইয়া।

বলিলাম, "এ কি—এখানে লীলা?"

দেখিলাম লীলা অনেকক্ষণ কাঁদিয়াছে।

"আজই যাচ্ছো তুমি?"

"হ্যাঁ—কি হ'য়েছে তোমার?" লীলা কোনো উত্তর দিল না; শুধু এক টুকরা কাগজ আমার হাতে দিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

ডাকিলাম—"শোনো লীলা!" লীলা ফিরিল না। কাগজটা খুলিয়া দেখি ছোট একখানি চিঠি, লীলাই লিখিয়াছে:

"বাবা সেই দুর্গাপুরের দ্বিতীয় পক্ষেই আমার বিবাহ দিবেন ঠিক করিয়াছেন, তুমি চলিলে, আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিও হয়তো আর এ জন্মে দেখা হইবে না—আমি মরিব।

—লীলা।"

রীতিমত শিহরিয়া উঠিলাম, ছুটিতে ছুটিতে গিয়া আমি পিছন হইতে লীলাকে ধরিয়া ফেলিলাম, বলিলাম, "এ সব কি পাগ্‌লামি ক'রছো বলোতো?"

ঝর ঝর করিয়া লীলা এইবারে কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, "না না, ছেড়ে দাও নিপুদা,—আমি মরবোই।"

ভোরের তরল অন্ধকার তখন ক্রমশঃ ফিকা হইয়া আসিতেছে, দুই একজন লোকও জাগিয়াছে, বলিলাম, "ছি—এ সব কোর না—আমি তো আস্‌ছিই দু'এক মাসের মধ্যে—"

লীলা কথার উত্তর দিল না—যেমন আসিয়াছিল সেইভাবেই ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

পরে অবশ্য আমার সে কথা থাকে নাই। দৈনন্দিন কর্মস্রোতের ভিতরেই নিরন্তর পাক খাইয়া চলিয়াছি এ পর্যন্ত। দীর্ঘদিনের মধ্যেও দেশে ফিরিবার সুযোগ আমার আর আসিল না।

এই রকমই হইয়া থাকে নাকি। প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া আমরা কেহই বাঁচিতে পারি নাই কোনো কালে—পারিবও না। আজ অবশ্য অনেক কথাই বুঝিয়াছি। বুঝিয়াছি দারিদ্র্যের পেষণে না খাইয়া মরিবার অভিশাপ কি নির্মম! তাহারই ভিতরে সেই ভোরের কুয়াশালিপ্ত ধূসর স্বীকৃতির মূল্য কতটুকুই বা দিতে পারি আমরা?

আমার এক বন্ধু প্রেমকে স্বীকার করিতেন না—বলিতেন দুর্বল মনোবৃত্তি। যদি তাহাই হয়—তবুও মাঝে মাঝে তাহাকে রাজ-সিংহাসন পাতিয়া দিয়া অভ্যর্থনা করিতে ইচ্ছা হইয়াছে কতোদিন! কিন্তু উপায় নাই—এ কর্মমুখর জীবনে সে অবসর কোথায়?—অবকাশ কোথায়? প্রয়োজনের চাকা ঘুরিয়া চলিয়াছে—দরজা বন্ধ করিয়া মুখের উপরেই বলিয়া দিতে হইয়াছে—ফিরিয়া যাও, হে প্রেম, তোমাকে লইয়া বিলাস করিবার সময় আমার আজো আসে নাই, যেদিন আসিবে, সেদিন মহাসমারোহ করিয়াই আসিও।

ঠং ঠং করিয়া ওধারের ওয়াল ক্লকে বারোটা বাজিয়া গেল—আর নয়, পাশ ফিরিয়া শুইলাম।

জানালা দিয়াই সন্তোষ বাবু আমাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, একেবারে সোজা বারান্দার উপরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, "এই যে—এইদিকে ভাই—ওগো শুন্‌ছো, নৃপেন বাবু এসে গেছেন যে, ওগো—"

দরজা পার হইয়া উঠানের উপরে আসিয়া দাঁড়াইলাম, সন্তোষ বাবু আমাকে বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন, "আমি অনেকক্ষণ থেকেই ব'সেছিলুম, যাক্—সত্যিই এলে ভাই?"

বলিলাম—"কি যে বলেন আপনি, এইখান থেকে তো এইখানে, আস্‌বোনা কেন?"

"ব'সো ভাই ব'সো, চা,—চা খাবে তুমি?" দেখিলাম সন্তোষ বাবু রীতিমত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, বলিলাম, "থাক না—বৌদিই আগে আসুন, তারপরে দেখা যাবে, কই আপনার ছেলেটি কোথায়?"

"এই যে ভাই, নিয়ে আসছি" সন্তোষবাবু আবার ভিতরে চলিয়া গেলেন।

বসিয়া রহিলাম। দেয়ালের উপরে আঁশের কাজ-করা ফ্রেমে বাঁধানো ফুল, ফুলের গাছ, ময়ূর, কুকুর, [illegible] উটপাখী ঝুলিতেছে। লীলাই করিয়াছে সব। ওধারে কয়েকটা উলের কাজ-করা [illegible] কাচের ভিতরে বাঁধানো।

"ভালো আছো নিপুদা—" দেয়াল হইতে তাড়াতাড়ি চোখ নামাইয়া লইলাম, লীলা আসিয়া ততক্ষণে আমাকে প্রণাম করিয়াছে। মুহূর্ত মধ্যে কেমন যেন সব এলোমেলো হইয়া গেল, ঠিক হইয়া বসিতে চেষ্টা করিলাম। বলিলাম, "হ্যাঁ, ভালোই আছি।" লীলার চোখের দিকে চাহিলাম, এভাবে পরিচয়

না ঘটিলে হঠাৎ লীলাকে হয়তো চিনিতেই পারিতাম না, ওর চেহারার যে এমন আমূল পরিবর্তন আসিবে এ কথা কোনোদিনই ভালো করিয়া ভাবিতে পারি নাই—সেই কৃশ, তন্বী তরুণীর দেহ ঘেরিয়া এই নিদারুণ স্থূলত্বের আবরণকে যেন বিশ্বাস করা যায় না।

• বলিলাম, "বোসো লীলা—"

লীলা একধারের একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল। সন্তোষবাবু তখন ছেলেটিকে ধরিয়া আনিবার জন্য বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। আবার লীলার দিকে চাহিলাম। এরকম দ্বিধার ভিতরে আমি জীবনে বোধ হয় আর পড়ি নাই। কি বলিয়া যে কথা আরম্ভ করি। কিন্তু লীলাই বাঁচাইল, বলিল "এখানে বেড়াতে এসেছিলে বুঝি নিপুদা?" গলার স্বরটা যেন আজো বদলায় নাই, কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়াই যেন সেই পুরাণো লীলাকে আবার ছুঁইতে পারিলাম।

বলিলাম, "হুঁ, বেড়াতেই এসেছিলাম—" বলিয়াই চুপ করিয়া গেলাম, আর যে কী কথা বলিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না। অথচ সেই লীলাই তো এ।

"অনেকদিন পরে দেখা হোল যাহোক তোমার সংগে"—লীলা বলিল।

বলিলাম, "হ্যাঁ, অনেক দিন পরেই—" একটু থামিয়া বলিলাম, "এ ভাবে যে দেখা হবে একথা ভাবিনি কোনোদিন।"

"সত্যি! আমিও ভাবিনি, তোমার দাদার যে কাজ! আজ এখানে আছো তো কাল সাতশো মাইল দূরে, কিচ্ছু ঠিক নেই! তারপর?" সুনিপুণা গৃহিণীর গাম্ভীর্যে লীলা টলমল করিয়া উঠিল, "তারপর কি কোরছো আজকাল?"

চুপ করিয়া রহিলাম, কি যে বলিব ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না, লীলা আমার যেন পরম অভিভাবিকা, আমি যে কি করিতেছি, না করিতেছি তাহা তাহার জানিতেই হইবে। না জানিলে তাহারই ক্ষতি হইবে বেশী! "বউকে এখানে নিয়ে এসেছো নাকি? বিয়ে—বিয়ে করেছো তো?" লীলা চেয়ারের উপরে সোজা হইয়া বসিল।

বলিলাম, "না, সে সৌভাগ্য হয়নি এখনো।"

"এ্যাঁ!"—লীলা সাপ দেখিতে পাইয়াছে যেন, "এখনো বিয়ে করোনি তুমি? আর এইভাবে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছো, তোমাদের—ছি ছি পুরুষ জাতটা—" লীলা কি একটা শক্ত কথা বলিতে গিয়া চুপ করিয়া গেল।

স্তব্ধ হইয়া আমি সেই ভাবেই বসিয়া রহিলাম। তাহার পরে, একবার ভালো করিয়া লীলার দিকে চাহিলাম শুধু। অনেকটা সময় কাটিয়া গেল। তাহার পরে ইচ্ছা করিয়াই কথাটা ঘুরাইয়া লইলাম, বলিলাম, "তোমার ছেলের কি নাম রেখেছো লীলা?"

লীলা এবার হাসিল একটু, বলিল, "সনৎকুমার, ওঁর এই নামটা খুব পছন্দ, কি মনে হয় তোমার?"

আবার মাথা নাড়িলাম, বলিলাম "বেশ ভালো নাম।"

"আমরা ওকে কিন্তু 'সোনা' ব'লেই ডাকি, ভারী দুষ্টু হয়েছে নিপুদা।"

সন্তোষবাবু ততক্ষণে ছেলেটিকে লইয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াছেন। ছেলেটি একেবারে দৌড়াইয়া

মার কোলের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। "ওরে সোনা, এই দেখ কে এসেছে! তোর মামা, পেন্নাম কর শীগ্‌গির বোকা ছেলে।" লীলা আমার পা দুটি দেখাইয়া দিল।

বলিলাম, "থাক্ থাক্ ওই হয়েছে, ছেলেমানুষ!" সনৎকুমার অবাক হইয়া আমার মোটা চশমাটার দিকে চাহিয়াছিলো তখনো, বলিলাম "এসো খোকা, নেবে লেবেনচুষ?" পকেট হইতে সত্যক্রীত লজেঞ্জুস বাহির করিলাম।

লীলা একেবারে লাফাইয়া উঠিল যেন, "আরে ও মিষ্টি ফিষ্টি দিওনা নিপুদা। কিরমির জ্বালায় আর পারি না, রাত্তিরে সে কি দাঁত কড়মড় করে রোজ। মিষ্টি খেলেই আবার পেটের ব্যথাটা জেগে উঠবে।"

তাড়াতাড়ি হাতটা গুটাইয়া লইলাম, যেন একটা গুরুতর দোষ করিয়া ফেলিয়াছি, বলিলাম, "একটা দিই, আহা বেচারী আশা ক'রে হাত পেতেছিলো।"

"ওই ঠিক গোনা একটা দিও, জানোনাতো, কি জ্বালাটাই যে জ্বলতে হয় ওকে নিয়ে।"

সন্তোষবাবু আমার পাশে আসিয়া বসিলেন।

"জানো নিপুদা, ছেলেটা কিন্তু এদিকে ভারী চালাক হবে, আমাদের ওই টিয়াটাকে কি বলে জানো? বলে 'মিট্‌ঠু' যত সব হিন্দী কথা শিখেছে আর কি! আর চড়াই পাখী দেখলে রক্ষে নেই, সে ছুট্‌তে ছুট্‌তে গিয়ে তাদের ধরা চাই-ই!"

"হ্যাঁগো, চা দিয়েছো নৃপেনবাবুকে? নিজের মনে খুব গল্পই তো ক'রে চলেছো।" সন্তোষবাবু লীলাকে কথাটা মনে করাইয়া দিলেন হঠাৎ!

তাড়াতাড়ি লীলা উঠিয়া দাঁড়াইল। "ওমা, আমার তো খেয়ালই ছিলো না, ভাগ্যে মনে ক'রে দিলে তুমি, দাঁড়াও নিপুদা, আমি আসছি এক্ষুণি।" বলিয়া লীলা উঠিয়া চলিয়া গেল।

চা খাইতে খাইতে সন্তোষবাবুর সঙ্গে অনেক গল্পই করিলাম। বর্তমান ইউরোপের সমস্যা, হিটলারের দাম্ভিকতা, জাপানীদের দানবীয়তা, কাশীর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, রবীন্দ্রনাথের কালিম্‌পঙ্ যাত্রার কথা, কিছু বাদ নাই, কোথা দিয়া যে কয়েকটা ঘণ্টা কাটিয়া গেল বুঝিতে পারিলাম না।

অবশেষে উঠিলাম। বলিলাম, "আসি, এবার, অনেক রাত হ'য়ে গেলো।"

লীলাও উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল "কাল আবার এসো নিপুদা, এই সময়টা যা একটু কথা টথা বলতে পারি, এ-সংসারে কি একটুও সময় পাওয়ার যো আছে আমার, এখুনি সোনার বিছানাটা করতে হবে—দুধও খাওয়ানো হয়নি ওকে।"

বলিলাম, "কাল?—কালতো কাশী চ'লে যাচ্ছি আমি" হঠাৎই কথাটা বলিয়া বসিলাম, বলিবার আমার কোনো প্রয়োজনই ছিলনা—কোনো কারণই নাই।

"ওমা সে কি গো—এই সময়ে কাশী যাবে তুমি? লীলা সামান্য একটু বিস্ময়ে দুলিয়া উঠিল যেন, "এই দাঙ্গা হাঙ্গামার ভেতরে কেউ ওসব দিকে যায় নাকি?"

বলিলাম, "খুব দরকার কি না?"

"আ—চ্ছা" লীলা আমার দিকে চাহিল একবার। "আসার সময়ে আসানসোলে নেমে যেয়ো কিন্তু, আর হ্যাঁ, এভাবে আর চোলোনা নীপুদা—এবার একটি বিয়ে টিয়ে করো, যদি বলো তো আমি খুব ভালো একটি মেয়ের খবর তোমায় দিতে পারি—দেখ্‌বো?"

বলিলাম, "নিশ্চয়ই, বিয়ে না করলে কি চলে? বেশ তো, তুমিই দেখোনা লীলা,—বেশ রাঙা একটি ছোট টুকটুকে বউ" বলিয়াই হাসিয়া ফেলিলাম, "আচ্ছা, চলি আজ।"

ধীরে ধীরে দরজা দিয়া বাহিরের রাস্তার উপরে আসিয়া দাঁড়াইলাম, সন্তোষ বাবু আমার পিছনে পিছনে একটি লণ্ঠন হাতে করিয়া আসিয়াছেন, বলিলেন "আলোটা নিন্, বড্ড অন্ধকার রাস্তা।" বলিলাম, "না, ধন্যবাদ—টর্চই আছে আমার কাছে—আপনি আসুন।"

চলিতে আরম্ভ করিলাম। পিছনের দিকে একবার ফিরিয়া তাকাইতে ভারী ইচ্ছা হইল। কিন্তু ততক্ষণে অবাধ্য মনকে সংগে সংগেই প্রায় শাসন করিয়া বসিয়াছি—পাগল? লীলা এখন সোনার বিছানা করিতেছে,—এখনি দুধ খাওয়াইতে হইবে তাহাকে—কত কাজ, হিসাব আছে নাকি কিছু তাহার?

ভাবিলাম, কত সাধনায় সে আজ এই সুন্দর পরিস্থিতি টুকুকে গড়িয়াছে—তাহার এই শান্ত সমাহিত জীবন, তাহার এই স্বচ্ছ সুশুভ্র আলোকোদ্ভাসিত দিন—পাগল? বারান্দার উপরে দাঁড়াইয়া আমাকে যতটুকু দেখা যায় ততটুকু দেখিবার সময় আছে নাকি তাহার আর?

চলিতে লাগিলাম। অন্ধকারের ভিতরে কতোগুলি ঝিঁ-ঝিঁ পোকা অবিরাম ডাকিয়া চলিয়াছে। কয়েকটা জোনাকী জ্বলিতেছে ওদিকে। চলিতে চলিতে হঠাৎ যেন একটা বর্ষা রাত্রির কথা মনে পড়িয়া গেল। দেখিতে পাইলাম : রিমঝিম্ বর্ষার অতল অন্ধকারের ভিতরে বসিয়া কে যেন কাঁদিতেছে আমার জন্যই; সারা জীবন ধরিয়া সে এ কান্নাকে সহ্য করিবেনা যেন, আত্মহত্যার পাপ তাহাকে টলাইতে পারিবেনা কোনো দিন!

আঁকা বাঁকা বন্ধুর আর অসরল পথ—ঘন অন্ধকারের ভিতরে টর্চটা টিপিয়া তাড়াতাড়ি হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম।



সাহিত্যিকের অভিনন্দন

শ্রী অজিতকৃষ্ণ বসু

গত দুই মাসের ভাড়া বাকী পড়িয়াছে। বাড়ীওয়ালা একটু আগেই যাহা করিয়া গিয়াছে তাহাকে অপমান বলিলেও চলে। যে সব তীক্ষ্ণ কথার খোঁচায় বিঁধিয়া গিয়াছে, ভবভূতি মুখোপাধ্যায়ের মনে হইল তাহার চাইতে লোকটা যদি দুটি কান মলিয়া দিয়া যাইত তো তাহাই যেন ভাল হইত। জ্বলন্ত কথাগুলি কানের ভিতর দিয়া যে ভাবে মরমে পশিয়াছে কানমলা হয় তো তেমন পৌঁছিত না। অন্ততঃ একমাসের ভাড়াটা দিয়া দিতে পারিলেও বাড়ীওয়ালা একটু শান্ত নিশ্চয়ই হইত, কিন্তু তাহাও দিবার মত পকেটের অবস্থা ভবভূতির ছিল না।

মুদী দোকানেও বাকী কম পড়ে নাই। রাধাশ্যাম মুদী নেহাৎ ভাল মানুষ বলিয়াই এখনো তেমন কিছু বলে নাই ; কিন্তু এমন ধারের ব্যাপার চলিতে থাকিলে আর কটি দিন সে ভাল মানুষ থাকিবে বলা যায় না।

শীতও নেহাৎ মন্দ পড়ে নাই। ছেলে মেয়েগুলির জন্য কিছু গরম জামা না কিনিলে নয়। কিন্তু জামা-কাপড় ধারে কেনা যায় যেখানে এমন কোন দোকান ভবভূতির জানা নাই।

এমন মুস্কিল, এই সময়টাতে স্ত্রী বিশ্রী রকম শরীর খারাপ করিয়া ফেলিয়াছেন। পাড়ার মাসী, পিসী প্রভৃতি অনেকে আসিয়া অযাচিত উপদেশ দিয়া গিয়াছেন মনোরমার জন্য একটা ভালো টনিক এবং তৎসহ পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে, কিন্তু ব্যবস্থার সহিত অবস্থার সম্বন্ধটা যে কত নিকট তাহা কেহ খেয়াল করেন নাই।

রবিবারের ভোরবেলা সাহিত্যিক ভবভূতি ভাবিয়া আকুল হইতেছিল। এত খরচ সে কি করিয়া সামলাইবে ? বিশেষ করিয়া যখন গেল বছর মৃত্যুর হাত হইতে মনোরমাকে বাঁচাইবার জন্য যে ঋণ বাধ্য হইয়া করিতে হইয়াছিল তাহা মাসিক কিস্তিতে এখনো শুধিতে হইতেছে।

সরু গলির মোড়ে একটা মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, এবং তাহার পিছনে তিনজন তরুণ নামিয়া পড়িতেই জানালা হইতে ভবভূতির মনে হইল তাহারা তাহার কাছেই যেন আসিবে। আন্দাজটা ঠিকই হইল। সানুচর প্রৌঢ় ভদ্রলোক আসিয়া বাড়ীর নম্বরের দিকে একবার তাকাইয়া দেখিয়া নিলেন যে, বাড়ীর ঠিকানা তিনি নিয়া আসিয়াছিলেন এ বাড়ী সেই বাড়ী কিনা। তারপর ভবভূতিকে প্রশ্ন করিলেন "মশাই, এটাই সাহিত্যিক ভবভূতি বাবুর বাড়ী কি ? ভবভূতি মুখোপাধ্যায় ?"

হঠাৎ ভবভূতি কি উত্তর দিবে যেন ভাবিয়া পাইল না। প্রৌঢ় ভদ্রলোকের একজন তরুণ অনুচর কি ভাবিয়া যেন আন্দাজেই একটি তীর নিক্ষেপ করিল। কহিল "আপনিই বোধ হয় ভবভূতি বাবু ?"

এইবার ভবভূতি বাবু মাথা নাড়িয়া জানাইল তাহারি নাম ভবভূতি মুখোপাধ্যায়।

তরুণ কহিল "এই দেখুন বিনোদ বাবু ঠিক আন্দাজ করেছিলুম।"

ভবভূতির হঠাৎ মনে হইল বড় অভদ্রতা হইতেছে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিয়া অতিথিগণকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইল।

বিনোদ বাবু কহিলেন "না না, মাপ করবেন ভবভূতি বাবু। এখখুনি আবার গাড়ী নিয়ে ছুটতে হবে। একটা ইয়ে অর্গ্যানাইজ্ করা তো আর চাট্টিখানি ব্যাপার নয়।…তা—কেন এসেছি শুনুন। আস্‌ছি তরুণ সংসদের তরফ থেকে। এই রবিবার সংসদের পঞ্চম-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আপনাকে একটা অভিনন্দন দেওয়া হবে। মানে—public reception আর কি!"

বিস্মিত হইয়া ভবভূতি প্রশ্ন করিল "অভিনন্দন! আমাকে? সে কি?"

"আপনাকে মানেই আপনার সাহিত্যিক প্রতিভাকে। সাহিত্যিককে সম্মান দিতে আমরা শিখেছি এই কথাটা আমরা প্রমাণ কর্‌বো। আপনি যে বাংলার কথাসাহিত্যে একটা অপূর্ব্ব নতুন ধারা এনেছেন সে কথা তো কেউ আর অস্বীকার কর্‌তে পারবে না।…"

আগামী রবিবার বেলা চার ঘটিকায় টাউন হলে ভবভূতির—সাহিত্যিক ভবভূতির—সম্বর্দ্ধনা উৎসব সুরু হইবে, এ কথাটুকু নানাভাবে জানাইয়া তরুণ সংসদের সদস্যবৃন্দ বিদায় নিলেন। টাউন হলের বিরাট অভ্যন্তরে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যে একটা বিরাট সমারোহ হইবে তাহা ভাবিয়া ভবভূতির মন একটু খুশী যে হইল না তাহা নহে, কিন্তু বাড়ীওয়ালা এবং রাধাশ্যাম মুদীর চেহারা দুটি তাহার কল্পনার চোখে ভাসিয়া তাহাকে বড় দুঃখ দিতে লাগিল। সাহিত্যিক ভবভূতি ঠিক মত বাড়ী ভাড়া দিতে পারে না, মুদীর দেনা শুধিতে পারে না এবং আরো অনেক কিছুই পারে না যাহা পারা একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু সাহিত্যিক ভবভূতির সম্মান দিতে দেশ শিখিতেছে। আগামী রবিবার টাউন হলে হইবে তাহার সম্বর্দ্ধনা। বহু দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়া ভবভূতি তাহার "চলার পথে" এবং "জীবন-প্রদীপ" উপন্যাস দুখানা শেষ করিয়াছিল। সে দুঃখ কষ্ট একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। সেই দুঃখের স্মৃতি আজ তাহার কাছে গৌরবময় হইয়া দেখা দিল।…

রবিবার বেলা সাড়ে চারটায় ভবভূতির বাড়ীর গলির মাথায় একখানা দামী গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। ভবভূতি তৈরী হইয়াই ছিল গাড়ীতে উঠিয়া সে টাউন হল অভিমুখে রওনা হইয়া গেল।

হলের ভিতরে ঢুকিয়া ভবভূতির নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে বেগ পাইতে হইল। তাহার সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে এত লোক একত্র জড় হইয়াছে! বাংলা দেশ সাহিত্যিককে এতটা ভালবাসিতে শিখিয়াছে? ভবভূতি তাহার সামান্য আয়ের কথা ভুলিল, বাড়ী ভাড়া ও মুদীর দেনার কথা ভুলিল, ভুলিয়া গেল রুগ্না পত্নীর কথা যাহার জন্য একটা ঝি রাখিয়া দিবার মত স্বচ্ছলতা তাহার এ পর্য্যন্ত হইল না। নিজের সাহিত্যিকত্বের জন্য সে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। সাহিত্যিক বলিয়াই তো আজ এই গৌরব। মর্ম্মান্তিক উদ্বোধন সঙ্গীতের পর তরুণ সংসদের সেক্রেটারী প্রৌঢ় বিনোদ বাবু বক্তৃতা সুরু করিলেন। প্রথমে উদ্বোধন বক্তা হিসাবে তিনি যে কত নগণ্য তাহা নানাভাবে বুঝাইয়া তারপর আইন ব্যবসায়ের ধাক্কায় তিনি কিরূপে সাহিত্যের প্রতি ঐকান্তিক আকর্ষণ থাকিতেও সাহিত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন তাহার এক বিস্তৃত বিবরণ দিলেন। পরে যে "ভবভূতিবাবুর পরিচয়ের কোন প্রয়োজন নাই" তাহারই পরিচয় দিবার জন্য লম্বা এক বক্তৃতা দিলেন। ভবভূতির উপন্যাস সম্বন্ধে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এত কথা তিনি বলিলেন যে ভবভূতির লেখা বই তিনি একটিও যে ভাল করিয়া পড়েন নাই এ বিষয়ে ভবভূতি নিঃসন্দেহ হইল।

আরেক ভদ্রলোক ভবভূতির সাহিত্যের বিশ্লেষণ করিয়া আনিয়াছিলেন বেশ মোটা এক তাড়া কাগজ। বিনোদ বাবুর বলা শেষ হইলেই ভদ্রলোকের পড়া সুরু হইল। ভবভূতি ভাল লেখে এ কথা ভবভূতির জানা ছিল। কিন্তু এইবার এই ভদ্রলোকের মুখে নিজের স্বরূপ জানিয়া সে রীতিমত বিস্মিত হইয়া উঠিল। নিজের নামের সঙ্গে ফ্রয়েড, টলষ্টয়, রমাঁ রলাঁ, মেটার লিঙ্ক, যোহান্ বোয়ার প্রভৃতি বহু বিদেশীর নাম যুক্ত হওয়ায় যে একটু যে চিন্তিত হইল না তাহাও নয়। নিজের লেখা উপন্যাসের ভিতরে যে সাগরতলে মুক্তার মতন এত কিছু লুকাইয়া ছিল তাহা সে জীবনে এই প্রথম জানিল। তথায় নিজের সৃষ্টির স্বরূপ সে কিনা নিজেই এতদিন বুঝিতে পারে নাই। আশ্চর্য্য! নিজেকে বোঝা এত শক্ত!

তারপর কয়েকখানা ফ্রেমে বাঁধানো বাংলা ও সংস্কৃত অভিনন্দন পাঠ করিয়া ভবভূতিকে উপহার দেওয়া হইল। সংস্কৃত ভবভূতি ভাল জানিত না, কিন্তু বাংলায় লেখা অভিনন্দনের ভাষাসৌন্দর্য্যে তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। দেশবাসীর হৃদয় এমন করিয়া যদি জয় করা যায় তাহা হইলে কঠোরতম দারিদ্র্যও সহ্য করা এমন কি কঠিন?

অভিনন্দন পাঠের শেষে গলায় মোটা ফুলের মালা পরিয়া ভবভূতির মন আবেগে এমন ভরিয়া উঠিল যে তাহার নিজের তরফ হইতে যত কিছু সে বলিবে বলিয়া কয়েকদিন ধরিয়া চিন্তা করিয়া রাখিয়াছিল, বলিতে পারিল না। পাছে আবেগের বশে কোনপ্রকারে নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া ফেলে এই ভয়ে সে বক্তব্য অতি সংক্ষেপে সারিয়া এবং মামুলী ভাষায় ধন্যবাদ জানাইয়া বসিয়া পড়িল।

আমোদ প্রমোদের প্রোগ্রামের জন্য উপস্থিত সবাই উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে একথাটা চতুর সভাপতি মহাশয়ের বুঝিতে দেরী হইল না। যে সত্য কথাগুলি তাহার মনে উদিত হইয়াছিল তাহা গোপন রাখিয়া তিনি মোলায়েম মিথ্যা কথায় উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে প্রশংসনীয় সাহিত্যানুরাগের জন্য ধন্যবাদ জানাইলেন; যে জাতি সাহিত্যিককে এমন আন্তরিকভাবে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য দিতে শিখিয়াছে সে জাতি কিছুতেই যে আর বেশীদিন পরাধীন থাকিতে পারে না একথা তারস্বরে ঘোষণা করিয়া বিপুল হাততালি পাইলেন; এবং অবশেষে আমোদ-প্রমোদের প্রোগ্রাম এইবারে তারিণী ঘোষালের হাস্যকৌতুক দিয়া সুরু হইবে জানাইয়া পাইলেন আরো প্রবল হাততালি। ভবভূতি তখন মোটামুটি হিসাব করিয়া দেখিতেছে সমবেত ভদ্রলোকদের মধ্যে শতকরা পঁচিশ জনও যদি তাহার উপন্যাস কিনিত তাহা হইলে সেই লাভের টাকায় তাহার মুদীর দেনা শোধ হইত কিনা।

তারিণী ঘোষালের কৌতুকাভিনয় সুরু হইতেই মনে হইল হলের জনতা এতক্ষণ যে জিনিষের জন্য আকুল হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল সেই জিনিষ আনিয়াছেন তারিণী ঘোষাল। সবাই যেন এতক্ষণে তাহাদের মনের মানুষ পাইয়াছে। তারপর আবৃত্তি, গান, নৃত্য, ম্যাজিক, কসরৎ প্রভৃতি হলের ভিতর আমোদ প্রমোদের বন্যা বহাইয়া দিল। ভবভূতির মনে হইতে লাগিল আজিকার অধিবেশনে এই ব্যাপারগুলিই যেন লক্ষ্য, সে উপলক্ষ্য মাত্র। ফুলের মালাটা বড় ভারী মনে হইতে লাগিল। দম যেন মালার চাপে আটকাইয়া আসিতে চায়।

ভোর হইতেই ভবভূতির শরীরটা তেমন ভালো ছিল না। তবু না আসিয়া যে থাকিতে পারে নাই। এখন মনে হইতে লাগিল না আসিলেই যেন ভাল হইত। অসুস্থ শরীর লইয়া কি দরকার ছিল এইরূপ ছেলেখেলা করিতে আসিবার?

অবশেষে বিখ্যাত কীর্ত্তন-গায়ক যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কীর্ত্তনের পর সভাভঙ্গ হইল। বাংলার জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ কৌতুকাভিনয়, কসরৎ, ম্যাজিক্ প্রভৃতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে করিতে হল হইতে বাহির হইতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিলেন 'ফাংশন্' (function) ভারী 'সাক্সেস্ফুল' (successful) হয়েছে কিন্তু। চমৎকার ভ্যারাইটি প্রোগ্রাম।" ভবভূতির মনে হইল "তাই তো। তা নইলে এত লোক আস্‌বে কেন ?"

তারপর পাশের ঘরে ভোজের ব্যাপার। এত আয়োজন ভবভূতি অল্পই চোখে দেখিয়াছে, এবং অল্প যে কয়েকবার দেখিয়াছে তাহার মধ্যে একবারও যোগদান করিবার সৌভাগ্য তাহার হয় নাই।

সাহিত্যিক ভবভূতি কিন্তু কিছুই খাইতে পারিল না। তাহার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। একে শরীর অসুস্থ তাহার উপর বার বার তাহার এই কথাটাই মনে হইতেছিল এই বিরাট আয়োজন তাহার মত দরিদ্র সাহিত্যিকের অভিনন্দন নহে, এ যেন তাহার দারিদ্র্যের প্রতি একটা নির্ম্মম পরিহাস মাত্র।

রাত প্রায় এগারোটা মনোরমা জাগিয়া জাগিয়া কি ভাবিতেছে। হয় তো বা তাহার স্বামি-সৌভাগ্যের কথা। কল্পনার চোখে সে হয় তো দেখিতেছে টাউন হলের জনসমুদ্রের কূলে অভিনন্দনের মালা গলায় পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহার স্বামী—সাহিত্যিক ভবভূতি মুখোপাধ্যায়।

ছেলেমেয়েগুলি এতক্ষণে নিশ্চয়ই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

ভবভূতির সম্মুখে বড় থালায় নানা লোভনীয় পদার্থ সাজানো রহিয়াছে। সেদিকে তাকাইয়া ছেলেমেয়েদের কথা ভাবিয়া ভবভূতির মন অশ্রুতে ভিজিয়া উঠিল। পাশের ছোট ঘরের ভিতর হইতে প্লেটের পর প্লেট আসিতেছে। ভবভূতি ভাবিতে লাগিল আজিকার এই ভোজের টাকায় তাহার মাস কয়েকের সংসার খরচ অনায়াসেই চলিতে পারিত। সেইরূপই ব্যবস্থা না করিয়া অনর্থক নিঃস্ব সাহিত্যিককে এমন রাজসিক সম্বর্দ্ধনার কি প্রয়োজন ছিল ? এ যেন তাহার দারিদ্র্যকেই আরো স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেওয়া। যে সাহিত্যিক স্ত্রী পুত্রের মোটা ভাত কাপড় যোগাইতে গলদ্‌ঘর্ম্ম; আজ শুধু একদিনের জন্য নানারূপ লোভনীয় চর্ব্বচোষ্য থালায় সাজাইয়া তাহার সম্মুখে ধরা কেন ? স্ত্রী পুত্র যাহার গরম কাপড়ের অভাবে বাধ্য হইয়া শীতে কাঁপে তাহার গলায় দামী ফুলের মালা পরাইয়া সম্মান দেখানো কেন ?……

রাত্রি প্রায় বারোটায় তরুণ সংসদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ব্যারিষ্টার টি, এন্, রায়ের পন্‌টিয়্যাক্ গাড়ীতে চড়িয়া ভবভূতি বাড়ী ফিরিল। এতক্ষণ যেন নিজেকে জলের বাহিরে মাছের মত মনে হইতেছিল ; এইবার নিজের জায়গায় ফিরিয়া সে যেন একটু স্বস্তি পাইল।

সুন্দর দামী ফ্রেমে বাঁধানো অভিনন্দন পত্রগুলি দেখিতে মনোরমার মুখ গর্ব্বে ও আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিল "তোমায় মান-পত্র দিয়েছে বুঝি ?"

ভবভূতি কহিল "না মনু। গরীব সাহিত্যিককে ওরা পরিহাস করেছে মাত্র।"

"যাও। তুমি ঠাট্টা করছ।"

"ঠাট্টা আমি করছি না মনু, ওরাই করেছে।"

"খেয়াল করে বা ইচ্ছে করে হয় তো করেনি, কিন্তু এই অভিনন্দনকে ঠাট্টা ছাড়া আর কি বল্‌ব? ভালো করে খেতে পরতে যে পায় না তার গলায় অভিনন্দনের মালা কি মানায় মন্টু?"......

"জীবন-প্রদীপ" উপন্যাসখানা বাংলার কথাসাহিত্যে নাকি নূতন ধারা আনিয়াছে; কিন্তু সাহিত্যিক ভবভূতির পকেটে একটি পয়সাও আনে নাই। কারণ যত বই বাজারে কাটিয়াছে, সযত্নে নেপথলিন ব্যবহার না করিলে তাহার চেয়ে ঢের বেশী বই পোকায় কাটিত। এই কথাটা আজ রাতে ভবভূতির কাছে বড় হইয়া দেখা দিল।

কাল ভোরেই হয় তো রাধাশ্যাম মুদী হিসাবের খাতা লইয়া আসিবে। বাড়ীওয়ালা হয় তো আরো একদফা কড়া কথা শুনাইবে। অভিনন্দনের মালা হয় তো তখনো শুকাইবে না। ঘুমাইয়া পড়িবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সাহিত্যিক ভবভূতি এই কথাই ভাবিতে লাগিল।



আবর্ত্তন

শ্রীশৈলজারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

সুভদ্রার বিয়ে হয়ে গেল মুরারীর সঙ্গে। অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ঘরে প'ড়ে তার ভাত কাপড়ের অভাব রইল না, আর দশজনের মত সেও সংসারের খুঁটিনাটি নিয়েই ব্যস্ত রইল। মুরারীর পছন্দ হয়েছিল সুভদ্রাকে। সংসারে তার কেউই ছিল না। বছর দুই আগে বিধবা মা'য়ের মরার পর মুরারী একেবারে এক্‌লা পড়্‌ল। পাড়ার দশজন লোক মুরারীকে বিয়ে কর্ত্তে উপদেশ দিলে। মন্দ কি?—মুরারী ভাবলে। তার ফলে মুরারীর একলা ঘরে সুভদ্রা এল। তার যা জমিজমা ছিল, একজন গৃহস্থের তাতে বেশ স্বচ্ছল ভাবেই চ'লে যায়। কিন্তু নিজের পাওনা গণ্ডা বুঝে নেবার অবসর ছিল না। টো টো করে ঘুরে বেড়িয়ে আড্ডা দেওয়ার আস্বাদ সে অনেকদিনই পেয়েছে, শৃঙ্খলার বাঁধনে আসা তার পোষায়নি। চাষীরা বাড়ী ব'য়ে যেটুকু দিয়ে যেত, তাতেই যখন পেট চলে যায়, তখন সে আর তার ন্যায্য পাওনার দাবী নিয়ে অনুসন্ধান কর্‌বার প্রয়োজনই বোধ করে নি। মুরারীর সঙ্গীরা তার সৌভাগ্যের হিংসা ক'রে তাকে বল্‌ত—ভাগ্যটা দেখ্‌ছি তোর চিরকালই ভাল রে মুরারী; সে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ত, কিন্তু যা নিয়ে তার অহঙ্কার, তার প্রতি যে মুরারীর বিশেষ কোনও কর্ত্তব্য আছে সে চিন্তা বা ইচ্ছা মুরারীর মনকে কোনও দিন স্পর্শ কর্‌তে পারেনি।

মাঝে একদিন মুরারী বল্‌ছিল—সত্যি, কি ছন্নছাড়াই না ছিলাম, ঘরবাড়ীর ছিরিই বা কি ছিল; এমন টুক্‌টুকে বউ না হলে কি আর বাড়ী মানায়? সুভদ্রা নিঃশব্দে শুনে গেল, কিছু বলবার রুচি তার হ'লনা। নেশাখোরের এ ক্ষণিকের খেয়াল, এটা সে আজ বুঝতে পারে। মুরারীও নিরুত্তর সুভদ্রার দিকে চেয়ে দমে যায়।

কানাই এল মেয়েকে দেখ্‌তে। অনেকদিন দেখেনি, এতদিন যে আসে নি এটাই আশ্চর্য্য মনে হয়। সুভদ্রা বাপ্‌কে বসালে, দু'একটা অনুযোগ করলে শরীরের অসুস্থতার জন্য। ক্ষীণদৃষ্টি কানাইও বুঝ্‌ল, মেয়ে ভালই আছে। সুভদ্রা চায়না তার বাপের দুঃখের বোঝা আরও ভারী করে দিতে, নিজের দুঃখ আমরণ সে নিজেই ভোগ কর্‌বে। কানাই তবু একবার মুরারীর খোঁজ করলে, সে জানালে কাজে বেরিয়েছে। কানাই এবার সন্তুষ্ট হ'য়ে জানিয়ে দিলে যে এখন সে আজন্ম মা-হারা সুভদ্রাকে সুখী দেখে, নিশ্চিন্ত মনে মর্‌তে পার্‌বে। নিজের মনে সুভদ্রা খুব খানিকটা হেসে নিলে, জীবনটা বেশ মজার মনে হোল তার কাছে; সুখ না পাওয়া গেলেও সময় সময় উপভোগ করবার জিনিষ পাওয়া যায়। তার ছদ্মবেশ তার বাপকে কি প্রকাণ্ড সান্ত্বনা দিলে, অথচ তার অন্তরালে লুকিয়ে রইল দৈন্ত। কানাই চলে গেল।

সুভদ্রার দিন চলে যায় এক একটি করে; প্রত্যেক দিনটি তার কাছে অত্যন্ত ফাঁকা মনে হয়। আজ চলে যায় আবার কাল আসে, কিন্তু আগামী দিনের আকর্ষণহীন আগমন তার কাছে নিতান্তই অর্থশূন্য ও অস্বস্তিকর মনে হয়। প্রতিদিনই মনে হয়—কি নিয়ে বাঁচবে সে? দিনের পর দিন এই অবলম্বনহীন জীবন তার মনে ক্লান্তির ছাপ মেরে যায় গভীর হ'তে গভীরতরভাবে। মুরারীর চোখ পড়ে সুভদ্রার ওপর; আগের চেয়েও অনেক রোগা হ'য়ে গেছে আর শরীরে ফ্যাকাশে ভাব দেখা দিচ্ছে।

—কি হয়েছে তোমার?—দিন দিন শরীর এরকম হ'য়ে যাচ্ছে কেন? মুরারী হঠাৎ একদিন প্রশ্ন করে বস্‌ল।

—কিছুই নয়—খুব শান্তভাবে ব'লে সুভদ্রা চলে যায় অন্য কাজে।

অদ্ভুত! মুরারী হাল ছেড়ে দিলে। সমস্তই সুভদ্রা লুকিয়ে ফেল্‌তে চায় অথচ ওর জীবনের কোথায় যেন মস্ত ফাঁক রয়ে গেছে; জীবনের সমস্ত শক্তি ওর হু-হু করে সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। মুরারী বুঝতে পারে না সুভদ্রার জীবনের কোনখানে সেটা। তাকে ভাল কথা-ছাড়া মন্দ কথা মুরারী কখনও বলে নি অথচ সে ওকে সবরকমে এড়িয়ে চল্‌ছে আর দিন দিন হয়ে উঠ্‌ছে দুর্বোধ্য। মুরারী শেষে হাল ছেড়ে দিল; ওসব নিয়ে বেশী মাথা ঘামাবার সময় তা'র নেই।

ওদের বিয়ের পর দু'বছর কেটে গেছে। মুরারী আজকাল কোনওদিন রাতে বাড়ী ফেরে কোনও দিন ফেরে না। সুভদ্রা হাঁ, না কিছুই বলে না। আজকাল তার সাক্ষ্য জুটে গেছে একটি টিয়া, মুরারী কিনে এনে দিয়েছে ওকে মাওয়ান, খাওয়ান, পড়তে শেখানো এইসব নিয়ে সুভদ্রার সময় বেশ কেটে যায়। নিজের ও পাখীর অবস্থা তুলনা করে দেখে—তারা দুজনেই ধরা পড়ে গেছে এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে।

মুরারী ক'দিন হোলো কোন্ মেলায় গেছে। সুভদ্রা একা। ঝর্‌ঝর্ করে সে রাত্রে প্রথম বৃষ্টি নাম্‌ল। বড় বড় ফোঁটা চড়্‌বড় করে পড়ে শুক্‌নো মাটী ভিজিয়ে তোলে আর ভেজা বাতাসে ভেসে আসে মাটীর সোঁদা গন্ধ। ও প্রাণপণ জোরে নিশ্বাস টানে, সমস্ত গন্ধটাই ও উপভোগ করতে চায়, একলা। আজ পর্য্যন্ত সে নিজের ব'লে কিছুই পায়নি। মা তাকে জন্ম দিয়েই নিজে নিল মৃত্যু; কিন্তু সংক্রামক রোগের মত তা'র বীজ সুভদ্রার জীবনে প্রবেশ করেছিল—কতবার তা সুভদ্রাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে—জীবনে কোনও আকর্ষণ নেই। এতদিন যা লুকিয়ে ছিল আজ যেন তা আত্মপ্রকাশ করে তার কাণে কাণে শুনিয়ে দিচ্ছে চুপি চুপি—আমি তোমার ভুলে যাই নি, তুমি আমার, একান্ত আমার।

মাঝরাতে বৃষ্টি থেমে গেল; এতক্ষণ সে চুপচাপ বসে ভাবছিল নিজের কথা—এলোমেলো অসম্পূর্ণ কথা, হাজার জোড়াতালি দিয়েও যা সম্পূর্ণ হয় না। এতক্ষণ বৃষ্টির শব্দে সে বেশ ছিল। তার মনে ভয় ঢুক্‌ল, বৃষ্টি থামার সঙ্গে সঙ্গে। তার জীবনের বিরাট শূন্যতার মাঝখানে সে একলা

পায়, কে যেন চুপে—অতি চুপে, তাকে ধরতে আসছে। সমস্ত শরীর তার ভয়ে ছম্‌ছম্‌ করে ওঠে, গলা শুকিয়ে যায়, নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত নিতে ভরসা হয় না। সুভদ্রা ঘেমে ওঠে, তার কল্পিত শিকারীর ভয়ে; কখন লুকিয়ে এসে পিছন থেকে আক্রমণ করে বসবে, কে জানে। ওযে একেবারে অবলম্বনহীন, অসহায়। কোথায় গিয়ে লুকুবে, এই চিন্তায় ও হাঁপিয়ে উঠ্‌ল। কাপড় জামা যেখানে যা ছিল সমস্ত নিজের ওপর জড় করে, তার তলায় কুঁক্‌ড়ে শুয়ে রইল। তবু আওয়াজ থামে না; সেই চুপি চুপি অবিশ্রান্ত পায়ে চলার শব্দ ওর মনকে ভয়ে আচ্ছন্ন করে রাখে। সহসা ওর মনে হয় তার অজানা শিকারী এতক্ষণ হয়ত তারি ওপর ঝুঁকে পড়ে তাকে দেখতে চেষ্টা করছে। স্তূপাকার কাপড়জামার তলায় আছে জান্‌তে পারলেই সে তা'কে দুহাতে চেপে ধরবে। আতঙ্কে ও চীৎকার করতে চেষ্টা করে; আওয়াজ বেরোয় না। ওকি পাগল হয়ে যাবে? হঠাৎ ও সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল, যে শত্রু ওর পিছু নিয়েছে আজ ওকে না ধরে ছাড়বে না। ঘর ছেড়ে সে বারান্দায় আসে; ক্ষীণালোকে দেয়ালের গায়ে ওর ছায়া পড়ে। আতঙ্কে আকুল হয়ে ও দরজা খুলে বেরিয়ে যায়। ও পালাবে, বহুদূরে পালিয়ে যাবে, একেবারে তার শত্রুর নাগালের বাইরে। অন্ধকারে ও চলতে লাগ্‌ল,—তবু যে পেছনে আসে—ছুট—ছুট—ছুট...।

আবার রাস্তার একপাশে সেই পুরাণো ইতিহাসের পুনরাবর্ত্তন। সকলে দুজনের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। মৃত্যুর পরিচয় গভীরভাবে লেখা রয়েছে একপাশে, আর একপাশে স্পন্দিত হচ্ছে—কচি-বুকে নূতন জীবন।



শেষ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

হে অজানা বন্ধু আমার
তোমার লাগি কাঁদে হিয়া,
নও গো তুমি আমার ধন
নও গো তুমি আমার প্রিয়া।
নয়ন জলে গড়া তুমি,
হৃদয় পটে আঁকা,
তোমায় বিনে এই বুকেরি
সকল খানি ফাঁকা।
সেই ফাঁকাতে বাজাও তুমি
গহন তোমার সুর,
জীবন মাঝে পাই যে তবু
রও যে কত দূর।
তোমার মাঝে বিলিয়ে দিনু
এই জীবনের আমি,
তাই তো তোমার স্বপ্নে রহি
সকল দিবসযামী।

ফুলের সনে গন্ধ যেমন
বর্ণ আলোর সাথে,
তোমার সাথে তেমনি আমি
সবুজ ঘাসের পাতে।
আমায় আমি বইতে নারি
তাইত আসি পাশে,
প্রাণ যে আমার আমায় ছেড়ে
ছোটে তোমার আশে।
সুরের সাথে ছন্দ যেমন
সাগর লহর সাথে,
তোমায় আমায় তেমনি গাঁথা
আলোক যেমন প্রাতে।
তোমায় যখন হারাই আমি
হইযে তখন হারা,
সিন্ধুনীরে রয়না পৃথক
ঝরা নদীর ধারা।
তোমায় আমায় নেই যে প্রভু
ভেদের কোন লেশ,
নও গো প্রিয়, নও গো প্রিয়া
তোমায় আমার শেষ।

উন্নতির পথে জাপান

শ্রী ফণিভূষণ রায়

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে জাপান সাম্রাজ্যের ষষ্ঠবিংশতিতম শতবার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। বিরাট জাপান সাম্রাজ্যের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস সত্যই বিস্ময়কর।

এই ষষ্ঠবিংশতি বৎসর ব্যাপিয়া জাপান তিলে তিলে তাহার বর্ত্তমান সভ্যতাসৌধ গড়িয়া তুলিয়াছে। এইরূপে আধুনিক জগতের যন্ত্রসভ্যতার ইতিহাসে জাপান স্থায়ী ও মহাগৌরবের আসন অধিকার করিয়াছে। জগতের অন্য কোনও জাতির পক্ষে ঠিক জাপানের মত পারিপার্শ্বিক অবস্থায় এইরূপ মহা বিস্ময়কর ইতিহাস সৃষ্টি সম্ভব হইত বলিয়া মনে হয় না। জাপানীদের তীব্র জাতীয়তাবোধ ও সর্ব্বগ্রাসী দেশপ্রেমের জন্য সর্ব্বাঙ্গীন আত্মোৎসর্গেই জাপান এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতে পারিয়াছে। জাপানের এই জাতীয়তার মূলে রহিয়াছে জাপদের উগ্র আত্মসম্মান-বোধ। অল্প বিস্তর প্রত্যেক জাপানী মনে করে যে সে ঈশ্বরের প্রতিনিধি। সমরাঙ্গনে যে সমস্ত বীর যোদ্ধা হাসিতে হাসিতে প্রাণ দেয় তাহার মনে স্বতই এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে মৃত্যুর পর তাহার পূর্ণ ঈশ্বরত্ব লাভ হইবে—এবং পরলোকে সহস্র সহস্র অমরমণ্ডলীর মধ্যে তাহারও স্থান হইবে। জাপানের সম্রাটও স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার বলিয়া ভক্তি পাইয়া থাকেন। এইজন্য সম্রাটের আজ্ঞায় দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করায় জাপানীরা আত্মপ্রসাদ ও গৌরব অনুভব করিয়া থাকে। সাত কোটি জাপানবাসী সম্রাটের ছত্রচ্ছায়াতলে একতাবদ্ধ হইয়া বাস করে, এবং তাঁহার আজ্ঞায় দেশমাতৃকার জন্য হাসিতে হাসিতে মৃত্যুবরণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ব্যক্তি-গত স্বার্থের সংঘাতে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ কখনই ক্ষুণ্ণ হয় না; সমগ্র জাপান একটি বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারের ন্যায়, পৃথক পৃথক ভাবে সকলের অস্তিত্বই সমান ভাবে পরিবারের সমষ্টিগত কল্যাণে উৎসৃষ্ট হয়।



জাপানের দৃশ্যসৌন্দর্য্য

বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে জাপান আজ সর্ব্বত্রই প্রথম শ্রেণীর শক্তিমান জাতি বলিয়া স্বীকৃত ও অভিনন্দিত হইয়াছে। জাপানের সৈন্যসংখ্যা সম্ভবতঃ কোন দেশের সৈন্যসংখ্যা হইতে ন্যূন নহে। আধুনিক সমরোপকরণে সুসজ্জিত শক্তিশালী বিমান ও নৌবাহিনী জাপানের মর্য্যাদা বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে জাপান চীনাদের পরাজিত করিয়া সমগ্র জগৎকে অবাক করিয়া দিল। এই চীনকেই সকলে 'প্রাচ্যের নিদ্রিত সিংহ' নামে অভিহিত করিয়া ভয় ও ভক্তির চোখে দেখিত। কিন্তু

জাপানের শ্রেষ্ঠত্বের চরম নিদর্শন মিলিল ১৯০২ খৃষ্টাব্দে যখন জার-শাসিত বলশালী রাশিয়াকে পরাজিত করিয়া জাপান জগৎবাসীকে একেবারে স্তম্ভিত করিয়া দিল। ইহার পর পৃথিবীর রাষ্ট্রমণ্ডলী জাপানকে সুদূর প্রাচ্যের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করিল। গত ১৯১৪—১৮ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে জাপানের অংশ অন্যান্য মিত্রশক্তির তুলনায় কমই ছিল বলিতে হইবে। কিন্তু এই যুদ্ধের নীতি নির্দ্ধারণে যে তাহার কার্য্যকরী প্রভাব বিদ্যমান ছিল তাহা জাপানকে ভের্সাই সন্ধি স্বাক্ষরকারী "বিগ ফাইভ" বা "শ্রেষ্ঠ পঞ্চ শক্তি"র অন্যতম দেখিয়াই আমরা বুঝিতে পারি।

জাপানের বিরাট বিরাট শিল্প-কারখানা গত কয়েক বৎসরের মধ্যে অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিয়া শিল্প-ব্যবসাতে উন্নতিকল্পে প্রভূত সহযোগিতা করিয়াছে। গত মহাযুদ্ধের ফলে জাপানের সম্মুখে বাণিজ্যবিস্তারের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য জাতিসমূহ কর্ত্তৃক প্রস্তুত শিল্পসামগ্রীর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া কম মূল্যে ভাল মাল সরবরাহ করিবার প্রয়োজনে জাপানে অতি দ্রুত উন্নত ধরণের শক্তিশালী কল কারখানার প্রসার হইল। ইহার ফলস্বরূপ ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে দেখা গেল জাপানে ১০৬,০০৫ গুলি কারখানা অক্লান্তভাবে শিল্পসামগ্রী সৃষ্টি করিতে নিয়োজিত রহিয়াছে। এইরূপ ব্যাপক-ভাবে বিরাট দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া ব্যবসা করিতে হইলে। সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন প্রচুর মূলধনের। জাপানে মূলতঃ এই কারণেই পাশ্চাত্য অর্থনীতি তথা মূলধন ব্যবহারনীতি চালু হইল। ইহার প্রভাব অনতিবিলম্বে দেশের সর্ব্বত্র অনুভূত হইতে লাগিল।



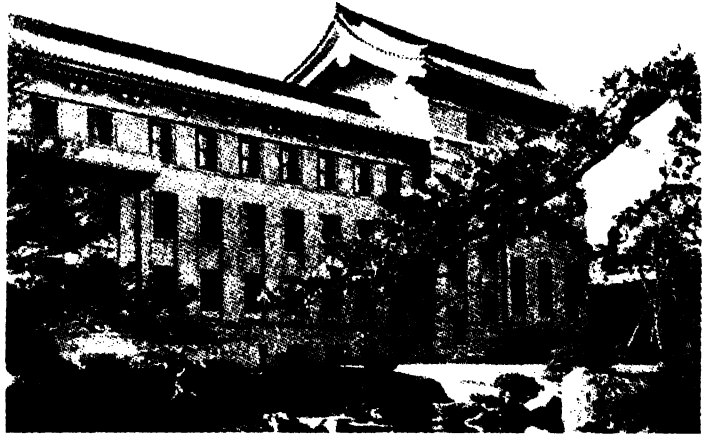
অভিষেকের পরিচ্ছদে জাপান-সম্রাট হিরোহিতো

জাপানের যানবাহনের অতিদ্রুত প্রসার এইরূপ যন্ত্রসভ্যতার কল্যাণেই সম্ভব হইয়াছে। জাপানের রেলগাড়ীসমূহ সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। শৈত্য (বায়ু)-নিয়ন্ত্রিত (air conditioned) অতিশয় দ্রুতগামী "এশিয়া" নামক জাপানীদের যে এক্সপ্রেস্ রেলগাড়ীখানি হরবিন (Harbin) এবং দইরেন (Dairen) অঞ্চলের মধ্যে যাতায়াত করে, উহা জগতের মধ্যে একখানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনোরম, আরামপ্রদ ও দ্রুতগামী রেলগাড়ী বলিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। যাতায়াতের সুবিধার জন্য জাপানে ট্রাম, বাস, দ্রুতগামী ভূগর্ভস্থ রেলপথ ইত্যাদি প্রচলিত হইয়াছে। টোকিও ও ওসাকার ভূগর্ভস্থ রেলপথগুলিই পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। যদিও পাশ্চাত্য জাতিদের অনেক পরে জাপান বিমানের ব্যবহারে দক্ষতা লাভ করে, তবু একথা অবশ্যই মানিতে হইবে যে বর্ত্তমানে লোকচলাচল, ডাকসরবরাহ বা যুদ্ধে ব্যবহারোপযোগী বহু বহু শ্রেষ্ঠ বিমানে জাপান সমৃদ্ধ। জাপানীরা বিমানবিদ্যাতে যে কোনও শ্রেষ্ঠ জাতির সমতুল্য একথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে না। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে আশাহী

সিম্বুন (Asahi Sin bun) পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট ইনুমা (Iinuma) এবং তুকাগোসি (Tukagosi) 'কামিকেজে' (Kamikeze) নামক একখানি দ্রুতগামী জাপানী আকাশযানে মাত্র একশত ঘণ্টার মধ্যে টোকিও হইতে লণ্ডন শহরে উড়িয়া গেলেন। আজপর্য্যন্ত ইহা অপেক্ষা অল্প সময়ে কেহ এই দুইটি রাজধানীর মধ্যে বিমানযোগে উড়িয়া যাইতে সক্ষম হন নাই।

যদিও যন্ত্রসভ্যতায় জাপান পৃথিবীর অপরাপর জাতিসমূহ হইতে পশ্চাতে পড়িয়া নাই, তবু একথা অনেকাংশে সত্য যে জাপান প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান দেশ। জাপানের প্রকৃত মঙ্গল বহুলাংশে নির্ভর করে কৃষকদের উপর, এইজন্য কৃষকের কল্যাণ সাধনে জাপানী সরকার অত্যন্ত তৎপর থাকেন। জাপানে পাঁচ লক্ষ নব্বুই হাজারেরও (৫,৯০,০০০) বেশি গোলাবাড়ী আছে। এই সংখ্যা সমগ্র জাপানের গৃহসংখ্যার শতকরা প্রায় বিয়াল্লিশ।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে জাপান বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করে। ইহাতে প্রাথমিক শিক্ষা সকলের পক্ষেই আবশ্যিক করা হইয়াছে। ছয় বৎসর বয়সেই প্রত্যেক জাপানী শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতেই হইবে এবং সেখানে অন্ততঃ ছয় বৎসর অধ্যয়ন করিতে হইবে। জাপানে সর্ব্বসমেত ২৫,৭০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে এবং এই বিদ্যালয়সমূহে ১১,১৫০,৮২৪ ছাত্র উপস্থিত থাকে। ইহাদের মধ্যে বালিকার সংখ্যা ৫,৪৭৪,১০৯। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক আধুনিক উপকরণে যথোপযুক্ত পরিমাণে সজ্জিত। মাধ্যমিক শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে বালকদের জন্য নির্দ্দিষ্ট মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গুলিতে, বালিকাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে এবং বিভিন্ন শিল্পবিদ্যালয়গুলিতে। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩৯০,০০০ বালিকাসহ ৯২০টি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ছিল। ব্যবসাদার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মারফৎ উচ্চশিক্ষা দান করা হইয়া থাকে। জাপানে প্রায় ২৫০টি এইরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। দেশের ভবিষ্যৎ নেতাগণ এখানেই তাঁহাদের নেতৃত্বের শিক্ষা পাইয়া থাকেন।



টোকিওর য়ুনোতে রাজকীয় যাদুঘরের প্রাসাদ—প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য ভাস্কর্য্যের চমৎকার সমন্বয়

জাপানে সংস্কৃতি ও সভ্যতার যেরূপ বিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়, এমনটি বোধ হয় জগতে অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। জাপানের আধুনিকতার উপকরণগুলি সমস্তই বিদেশ হইতে আমদানী বা ধার করা নহে, পরন্তু এগুলির বিকাশ জাপানীরা নিজেরাই করিয়াছে! সোজাসুজি অনুকরণ মূর্খেই করিয়া থাকে—কিন্তু কোনও একটা আদর্শ অনুসরণ করিয়া তাহাকে দেশকালপাত্রোচিত করিয়া পরিবর্ত্তনের মধ্যে নূতন সৃষ্টি করার উপরেই সভ্যতার সত্যকার বিকাশ ও প্রসার নির্ভর করে। অপরের নিকট হইতে পাওয়া কোন বস্তু বা ভাবকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়া তাহার উপর স্বকীয়তার ছাপ মারিয়া দেওয়া জাপানীদের

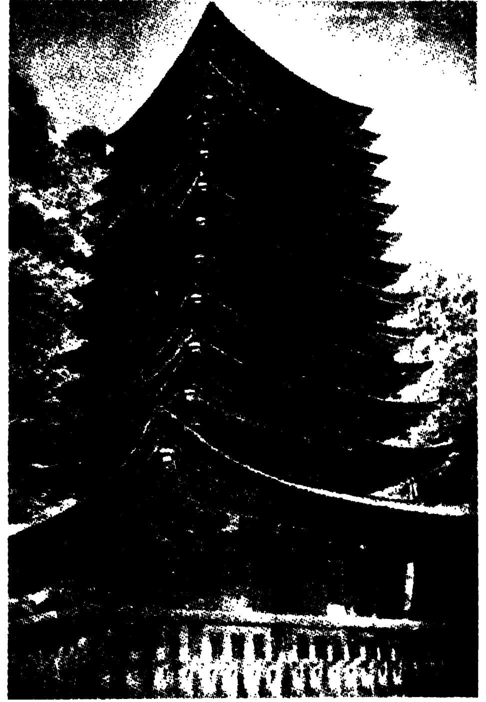
প্রতিভায় যত শীঘ্র ও অনায়াস-সুন্দর পদ্ধতিতে সম্ভব এমন আর পৃথিবীর কোনও জাতির পক্ষে সম্ভব নয়—একথা বোধ হয় একটু জোর করিয়াই বলা যায়। নিপুণ যাদুকর যেমন দর্শককে তাহার কৌশলে স্তম্ভিত করিয়া দেয়, তেমনি আমেরিকা বা ইউরোপের রীতিনীতি শিক্ষা শিল্প প্রভৃতি জাপানীরা এরূপ কৌশলে আত্মসাৎ করিয়া নিজস্ব করিয়া ফেলিয়াছে যে আজ এই নবতর সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া তাহারা অবাক্ বিস্ময়ে অভিভূত না হইয়া পারিতেছে না। জাপানের ভবিষ্যৎ এইভাবেই অন্যান্য জাতির শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুপ্রেরণাকে নিজস্ব করিয়া লইয়া জাপানীরাই রচিত করিবে। প্রত্যেকেই জাপানী পোষাক 'কিমোনো'র (Kimono) সৌন্দর্য্য ও পারিপাট্যে মুগ্ধ হইতে বাধ্য হয়। ইংলণ্ডের রাজ্য-পরিত্যাগকারী রাজা অষ্টম এডোয়ার্ড বর্ত্তমানে উইণ্ডসরের ডিউক অতীতে ওয়েলস্‌য়ের যুবরাজরূপে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে জাপান ভ্রমণে যাইয়া জাপ রমণীর অতুলনীয় পোষাক 'কিমোনো'র সৌন্দর্য্যে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি ভাবাবেগে বলিয়াছিলেন যে কিমোনো চিরদিনের জন্য মানব সভ্যতায় প্রচলিত থাকিবে।



বালিকা মোটর বাসে টিকিট চেক্ করিতেছে

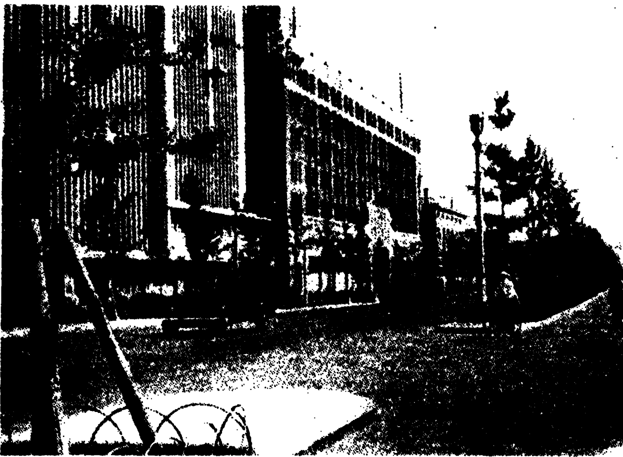
জাপানের বিবাহ সাধারণতঃ কোনও মন্দিরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পূরাদস্তুর পাশ্চাত্য প্রথায় বরকনে পাশ্চাত্য পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া থাকে। কিন্তু জাপানীদের পরিবারে নারীর স্থান গৃহে। জাপ রমণীর সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য তাঁহার স্বামী ও পুত্র কন্যা পরিবারকে অবলম্বন করিয়া নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। তাঁহার ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার অবসর বা অধিকার তাঁহার জীবনে খুব বেশি স্বীকৃত হয় না। গৃহস্বামীর জন্য খাদ্যদ্রব্য তাঁহার পত্নীকেই প্রস্তুত করিতে হয়, যেখানে বিশেষ কোনও কারণে পত্নীর পক্ষে খাদ্য নিজহস্তে প্রস্তুত করা সম্ভব হয় না, সেরূপক্ষেত্রে তাহাকে এ বিষয়ে সতর্কদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া তত্ত্বাবধান কার্য্য করিতে হয়। একা—বিশেষতঃ স্বামীকে বাড়ীতে একা ফেলিয়া রাখিয়া—বাহিরে সিনেমা দেখার জন্য বা অন্য কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য যাওয়ার কথা জাপ রমণী চিন্তা করিতেও পারে না। জাপানে নারীর অর্থনৈতিক অধীনতা এই মনোবৃত্তি ও ব্যবস্থার কারণ নহে, প্রথম হইতে জাপানের নারী তাহার জীবনের সার্থকতার জন্য 'গৃহ'কেই আপনার নিজস্ব স্থান বলিয়া জানে; তাহাকে শৈশব হইতে এই শিক্ষাই অনুপ্রেরণা দেয়। ফলে ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া পরিবারকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করাই তাঁহার নারী-জীবনের আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হয়। নারী যে কখনও কোনও ক্ষেত্রে পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে গৃহের বাহিরে কর্ম্মক্ষেত্রে পা দেয় না, তাহা নহে কিন্তু নারী জীবনের আদর্শ তাঁহার স্বামী-পুত্র-সম্বলিত তাঁহার সংসারখানি ঘিরিয়াই মূর্ত্ত হইয়া উঠে। পরিবারে জাপ রমণীর রাণীর আসন।

সাহিত্য, ভাস্কর্য্য বা চিত্রবিদ্যার ক্ষেত্রেও জাপানের গর্ব্ব করিবার অনেক কিছু আছে। মেজী (১৮৬৫) যুগকে জাপানী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলিয়া আখ্যাত করা যাইতে পারে। সুকুমার কলার ক্ষেত্রে জাপানী চিত্রশিল্পের নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়ার কোনই সার্থকতা থাকিতে পারে না। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে টোকিওর আর্ট গ্যালারিতে বাছাই করা প্রায় দুইশত বিখ্যাত ছবির একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি সরকার হইতে "জাতীয় সম্পদ্" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হয়। এই চিত্র প্রদর্শনী সমগ্র পৃথিবীর শ্রদ্ধা ও প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। জাপানের মন্দির এবং অন্যান্য স্থাপত্যের নিদর্শন জাপানের গৌরব ধারণ করিয়া আছে।



ডাঙ্গন মন্দিরের তের তলা প্যাগোডা

নিউইয়র্কের ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্বমেলায় (World's Fair of 1939) জাপানের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির প্রসার এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিবৃত করা হইয়াছিল। জাপরীতিতে প্রস্তুত একটি উদ্যানের সংলগ্ন হইয়া জাপানী রীতিতে রচিত বিরাট মণ্ডপ (Pavallion) দর্শকের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সগৌরবে দণ্ডায়মান ছিল। স্থপতি বিদ্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই মণ্ডপের সর্ব্বত্র একটা উদার গম্ভীর শান্তি বিরাজিত ছিল। ইহার চারিদিকে নানাপ্রকার প্রাকৃতিক দৃশ্য ও জাপানের জীবন-যাত্রা-প্রণালীর অঙ্কিত চিত্র শোভা পাইতে ছিল। সেদিন এই মণ্ডপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জগৎবাসী এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছিল যে জাপান কেবল রাষ্ট্রক্ষেত্রেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিসমূহের অন্যতম নহে, জগতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসেও তাহার দান প্রচুর ও প্রশংসনীয়।

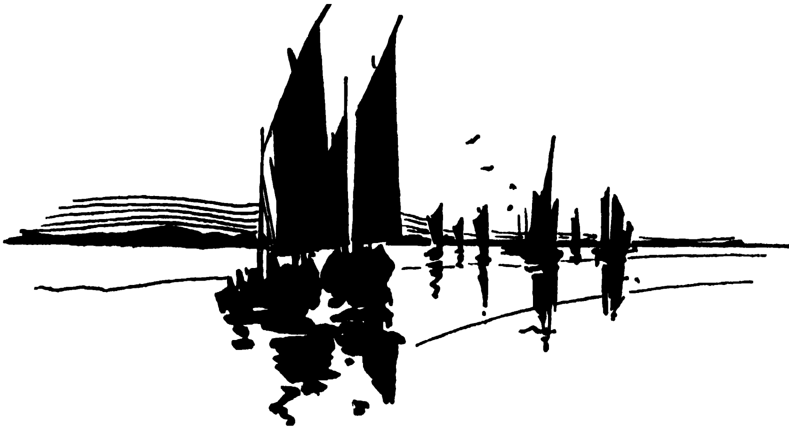


ওসাকার একটি বিখ্যাত রাজপথের দৃশ্য

জাপানের ধর্ম্মব্যবস্থাসম্পর্কে সামান্য দুই চারিটি কথা বলিয়াই আমি এ প্রবন্ধ শেষ করিব। ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানেন যে বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানে ভারত সম্রাট মহারাজ অশোকের প্রেরিত ভিক্ষুগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত ও প্রচলিত

হইয়াছিল। তৎকালে জাপানের ইতিহাসে অন্ধকার যুগ চলিতেছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম এই অন্ধকারে যেন আলোকবর্ত্তিকা হস্তে প্রবেশ করিল। জাপান যে শুধু ধর্ম্ম বিষয়েই প্রাচীন ভারতের নিকট ঋণী তাহা নহে, জাপানের সভ্যতার কাঠামোও মূলতঃ ভারতীয়। যদিও অতি অধুনা জাপানে খ্রীষ্টধর্ম্ম মাথা তুলিতেছে তবু এখনও জাপানে বৌদ্ধধর্ম্মেরই অপ্রতিহত প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। বৌদ্ধগণ যখন কিছুতেই জাপানের পুরাতন "শিন্‌টো"-ধর্ম্মের বিলোপ সাধন করিতে সমর্থ হইল না তখন তাহারা বৌদ্ধ ও শিন্‌টো এই দুই ধর্ম্মের একটা আপোষ-মূলক সমন্বয় সাধন করিয়া লইল। শিন্‌টো মন্দিরে উপাসনা জাপানের ধর্ম্মজীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

আমরা দেখিলাম বিগত ২৬ শত বৎসর ধরিয়া জাপান ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অবাধগতিতে অগ্রসর হইয়াছে তাহার সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস সুন্দর ও সহনীয় করিয়া জগতের শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছে। ইহা অপেক্ষা জাপানের অন্য কোনও পরিচয়ের আজ আর প্রয়োজন নাই।



দ্বিতীয় মহাসমর

নাৎসী প্যারাস্যুট বাহিনী

শ্রী—

ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধ বর্ত্তমানে চরম ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। ফরাসী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছে এবং নব নেপোলিয়ন সমগ্র মধ্য ইয়োরোপের উপর কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছে। হিটলার এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ প্রভূত সাফল্য অর্জ্জন করিয়া সমস্ত জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। কেবল পশ্চিম রণাঙ্গনেই যে কামানের গর্জ্জন শান্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহা নহে, প্রায় সমগ্র ইয়োরোপে স্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। ইংরাজ জাতি আজ স্বভাবতই তাহাদের দেশরক্ষার জন্য মরণপণ করিয়া অস্ত্রধারণ করিয়াছে। পৃথিবীর



নাৎসী প্যারাস্যুটশিক্ষার্থী যুবকেরা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া গড়াগড়ি দেওয়া অভ্যাস করিতেছে। কার্য্যকালে বিমান হইতে এইভাবেই অবতরণ করা প্রয়োজন

ইতিহাসের বৃহত্তম যুদ্ধ যে কোনও মুহূর্ত্তেই সশব্দে আরম্ভ হইতে পারে। সম্প্রতি 'রাইখষ্ট্যাগে' একটি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে হের হিটলার বৃটেনের উদ্দেশ্যে দুইটি চূড়ান্ত সর্ত্ত উচ্চারণ করিয়াছেন—হয় বৃটেনকে দন্তে তৃণ করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে হইবে নতুবা তাহাকে সর্ব্বাঙ্গীন ধ্বংসের সম্মুখীন হইতে হইবে। গর্ব্বোদ্ধত মিথ্যা গৌরবের অধিকারী হিসাবে নাৎসী স্বৈর নায়ক ইংরাজ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিলকে ভয় দেখাইয়াছেন—তাহার কথামত যদি চার্চ্চিল সন্ধি তথা আত্মসমর্পণ না করিতে স্বীকার করেন, তাহা হইলে ইহার উত্তরস্বরূপ অচিরেই জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ইংলণ্ডকে ভীষণভাবে আক্রমণ করা হইবে। সুতরাং মানব-ইতিহাসের বৃহত্তম যুদ্ধের আরম্ভ প্রায় আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। হিটলার রাইখষ্ট্যাগের বক্তৃতায় বৃটেনকে শাসাইয়াই বৃটেনের উপর বিমান আক্রমণ আরম্ভ



শিক্ষাদানের জন্য ব্যবহৃত নকল প্যারাস্যুটে লম্বিত শিক্ষার্থীকে শূন্যে দোলাইয়া দেওয়া হইতেছে

করিয়া দিয়াছেন। প্রধানতঃ বৃটেনের উপকূলভাগ ও নৌবহরই এ পর্য্যন্ত নাৎসী-বোমার লক্ষ্যবস্তু হইয়াছে। কর্ণেল লিণ্ডেনবার্গ জার্ম্মান বিমানবাহিনীকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইংলণ্ডে জার্ম্মান বিমান আক্রমণের ফলাফল কিরূপ হইতেছে তাহার বিবরণ আমরা প্রত্যহই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পড়িতেছি। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয় নহে—আমি এই প্রবন্ধে জার্ম্মান বিমান বাহিনীর একটি অঙ্গ জার্ম্মান প্যারাস্যুট বাহিনী সম্পর্কে কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ করিব।



শিক্ষার্থী প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে লাফ দেওয়া অভ্যাস করিতেছে। প্যারাস্যুটবাহী প্লেনের দরজার অনুকরণে এই প্ল্যাটফর্ম্ম নির্ম্মিত

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে Garnerin নামক একজন ফরাসী দেশীয় অভিজাত সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করিলেন যে জানালা হইতে প্যারাস্যুট সাহায্যে লাফাইয়া পড়িয়া নীচে নামা যায়। Garnerin অত্যন্ত বিলাসী ফুলবাবু প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং তিনি প্যারাস্যুট জীবনরক্ষার উপাদান স্বরূপ ব্যবহার করার কল্পনা করিয়াছিলেন মাত্র। ইহাকে যে যুদ্ধে ব্যবহার করা যায় এ চিন্তা বোধ হয় কোনও অসতর্ক মুহূর্ত্তেও তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। যাহা হউক ইহার পর প্যারাস্যুট ব্যবহার সম্পর্কে বিজ্ঞানী মহলে নানাপ্রকার গবেষণা আরম্ভ হইল এবং এই বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে—মাত্র সেদিন সোভিয়েট রাশিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে কয়েকটি প্যারাস্যুট বাহিনী নামাইয়া দিতে সক্ষম হইল। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের সঠিক ব্যবহারোপযোগী করিয়া সোভিয়েট রাশিয়া প্যারাস্যুট প্রস্তুত করিতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হয় নাই।



সৈন্যবাহী প্লেন হইতে নিরাপদে মাটিতে নামিয়া একদল জার্ম্মাণ প্যারাস্যুট সৈন্য একটি মেশিনগানের কলকজা ঠিক করিতেছে

সোভিয়েট রাশিয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দেই জার্ম্মানী প্যারাস্যুট বাহিনীর শিক্ষা আরম্ভ করিয়া দেয়। হিটলারের অভ্যুদয়ের দুই বৎসর পরে—এই ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দেই "সেনাপতি গোয়েরিং বাহিনী" আখ্যায় জার্ম্মানীতে প্রথমে শিক্ষিত প্যারাস্যুট বাহিনী গঠিত হয়। ইহারা নূতন নূতন কৌশল উদ্ভাবনে সচেষ্ট ও সফলকাম হয়। প্যারাস্যুট বাহিনীর মূল নীতিই হইল বিশিষ্ট কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক

তীক্ষ্ণ সাধারণবুদ্ধির ব্যবহারে খুব দ্রুত ভীতিবিহ্বল চমক উৎপাদিত করা। প্যারাস্যুট বিলম্বিত আরোহীকে অপরিহার্য্য রূপে আঘাত বাঁচাইয়া মাটীতে নামিবার কৌশল শিক্ষা করিতে হয়—বিশেষতঃ যখন সে সমরোপকরণ লইয়া প্যারাস্যুটে নামিতে থাকে তখন তাহার পক্ষে এই বিষয়ে অবহিত হওয়া অধিকতর প্রয়োজন। শত্রুরাজ্যে অবতরণ করিবার পর তাহার কর্ত্তব্য হইল রেলপথগুলি নষ্ট করিবার ব্যবস্থা করা। যদি তাহাদের প্রধান সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতিতে বাধাদানকারী কোনও ব্যবস্থা থাকে তাহাও যাহাতে ধ্বংস হয় সেদিকেও তাহাকে সচেষ্ট থাকিতে হয়। এই কার্য্য করিবার জন্য যাহারা বিশেষ রূপে আদিষ্ট হয় তাহারা বিস্ফোরক সহ নামে। ইহাদের সহিত যে সমস্ত অস্ত্র, পোষাক, পরিচ্ছদ ও অন্যান্য সমর সম্ভার থাকে তাহা যতদূর সম্ভব হাল্কা করিয়া প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ একটি অটোমেটিক রাইফেল,



যাহাতে সঙ্গী প্যারাস্যুটসৈন্যের সহিত ধাক্কা না লাগে, সেইজন্য
বিপজ্জনকভাবে প্যারাস্যুট হইতে অবতরণ। ঠিকমত মাটিতে
না নামিলে হাড় ভাঙিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা

ভাঁজ করা যায় এমন একটি সাইকেল (folding cycle) একটি বেতারযন্ত্রপাতি, একটি দূরবীণ, বেশ কিছুটা খাদ্যসামগ্রী এবং শত্রুরাজ্যের অধিবাসীরা যেরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করে, সেইরূপ একপ্রস্থ পরিচ্ছদ সহ প্যারাস্যুট হইতে অবতরণ করা হয়। এইরূপ সৈন্যের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কৌশল হইল একান্ত স্বাভাবিক ভাবে এমন করিয়া শত্রুপক্ষীয় দেশবাসীর সহিত মিশিয়া যাওয়া যাহাতে সে যে শত্রুপক্ষের তাহা যেন ঘুণাক্ষরেও কেহ সন্দেহ করিতে না পারে। ইংলণ্ডের স্বরাষ্ট্র বিভাগের দেশরক্ষা সচিবের বক্তৃতায় এই নাৎসী দুঃসাহসিক সৈন্যদল—যাহাদিগকে "পঞ্চম বাহিনী" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে—যাহাতে সাধারণকে বিভ্রান্ত করিয়া কোনও প্রকার অনর্থ সৃষ্টি করিতে না পারে সে বিষয়ে দেশবাসীকে পূর্ব্বাহ্নেই সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে সমস্ত চিত্র সন্নিবেশিত হইল তাহা হইতে এই দুর্দ্ধর্ষ নাৎসী প্যারাস্যুট বাহিনী, তাহাদের অবতরণ-কৌশল, সমর-নৈপুণ্য এবং তাহাদের একান্ত দুঃসাহসিকতা সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা জন্মিবে।



চলন্তিকা

'সম্বুদ্ধ'

যুদ্ধের ব্যাপারটা বড় গোলমেলে হইয়া দাঁড়াইতেছে।

হিট্‌লার বলিয়াছেন ১৫ই আগস্টের মধ্যে তিনি যুদ্ধ শেষ করিবেন। চার্চহিল বলিতেছেন যুদ্ধ আরও দুই তিন বৎসর চালাইবেন। সংবাদ যতদূর পাই, জার্মানি ইংলণ্ডের দিকে ছোট খাট অভিযান চালাইতেছে। ইংল্যাণ্ড তাহাকে বাধা দিয়াই ক্ষান্ত হইতেছে।

কিন্তু জল গড়াইতেছে কোন দিকে? জার্মানি ১৬ই আগস্ট অস্ত্রত্যাগ করিবে। ইংল্যাণ্ড তাহার পর আক্রমণ করিবে, এবং দুই বৎসর বা until victory যুদ্ধ করিবে। মধ্যের এই ক'টা দিন ঠুকঠাক করিয়া চালাইয়া দিতে পারিলেই জয় সুনিশ্চিত। সেই সুযোগের জন্য ইংল্যাণ্ড দিন গণিতেছে।

* * * * *

আমাদের পক্ষ হইতে কিন্তু যুদ্ধ চলাই ভাল। যুদ্ধে আমরা লাভবান হইতেছি।

কিছুদিন আগের কথা, দিল্লী ব্রডকাষ্ট্‌ সেণ্টার হইতে Adarkar সাহেব একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তব্য ছিল, যুদ্ধের বাজারে মাল বেচিয়া সকলেই বড়লোক হয়, এবারেও হইতেছে। জাপান ও রুশিয়া লাল হইয়া গেল, আমেরিকাও টক্‌টকে হইয়া উঠিতেছে। আমরাই বা পিছনে পড়িয়া থাকি কেন? যুদ্ধরত জাতিকে আমাদের মাল সরবরাহ করিতে হইবে, তাহা হইলেই war profits খাইয়া আমরা ফাঁপিয়া উঠিতে পারিব।

কথাটা তখন বিশ্বাস করি নাই। ভাবিয়াছি, কিই বা ছাই আমাদের আছে যে বেচিয়া বড়লোক হইব? থাকার মধ্যে ছিল ভরি-কয়েক সোনারূপা, তাহাও তো বহুদিন বেচিয়া খাইয়াছি।

কিন্তু এখন দেখিতেছি আমারই ভুল। সকলে আমার মত মূর্খ নয়, ব্যবসা যাহাদের করিবার তাহারা ঠিক করিয়া গিয়াছে, war profitsএর ধমকে সকলেরই পকেট inflated হইয়া গিয়াছে। বাজারে আনি দু'আনি সিকি প্রভৃতি ছোটলোক-মুদ্রা দূরে থাক, টাকারও ব্যবহার কমিয়া গিয়াছে। দশটাকার নোটের নিচে আমরা কারবার করি না, নেহাৎ যাহারা গরীব ভিক্ষুক তাহারা পাঁচটাকার নোট ভাঙাইতে চায়।

* * * *

চিরকাল যাহারা পয়সার কাঙাল, যে দেশে শ্রেষ্ঠ পুণ্যকর্ম ব্রাহ্মণ-ভোজনের দক্ষিণা এক আনা, সর্বোচ্চ মুদ্রার দাম চৌষট্টি পয়সা, দরিদ্র-বিদায়ের পুণ্য বিকায় প্রতি ইউনিট্‌ এক পাই দরে, যে দেশের মানুষ ত্রিশ টাকার চাকুরির জন্য প্রাণপাত করে এবং চার আনা পয়সা ধার পাইলে মনে করে মান বাঁচিল,

সেইখানে অকস্মাৎ মানুষের পকেটে ভারী ভারী নোট ছাড়া পয়সার দেখা পাওয়া যাইতেছে না, আধ পয়সার পান বা এক পয়সার কচুশাক কিনিয়া আমরা হেলাভরে একটা দশ টাকার নোট্ বাহির করিয়া দিতেছি— ইহার পরেও আর চাহিবার কী থাকিতে পারে!

আমরা বড়লোক হইয়াছি। কথায় কথায়, খুচ্‌রা পয়সা পকেটে নাই বলিয়া আস্ত একটা দশটাকার নোট বাহির করিয়া দেওয়া—ইহার মধ্যে একটা বিরাট্ আভিজাত্যের আনন্দ আছে। কণ্ডাক্টর যদি ভাঙানি নাই বলিয়া ট্রাম হইতে নামাইয়াও দেয়, তাহাতেও সে আনন্দ ক্ষুণ্ণ হওয়ার কোন কারণ নাই।

*　　*　　*　　*　　*

যাঁহারা জন্ম অভিজাত নন তাঁহাদের কথাটা বুঝাইয়া দিতেছি।

মনে করুন ট্রামে চড়িয়া কলেজ স্ট্রীটে চলিয়াছেন। সম্মুখের সীটে একটি বেশ ফিট্‌ফাট্ তরুণী- তরুণী চেহারার মেয়ে বসিয়া আছে। তাহার চোখে চশমা এবং হাতে বই আছে, সঙ্গে দাদা বা সিঁথিতে সিঁদূর নাই।

কণ্ডাক্টর ভাড়া লইতে আসিল। তখন দেখা গেল মেয়েটি তাহার পার্স টি ভুলে ফেলিয়া আসিয়াছে। সে করুণ দৃষ্টিতে আপনার দিকে তাকাইল। আপনি নিজেও সাগ্রহ দৃষ্টিতে তাহার দিকে এবং কণ্ডাক্টরের দিকে তাকাইলেন। আপনার পকেটে পয়সা আছে। এবং সে পয়সা কণ্ডাক্টরকে দিতেও আপনার ইচ্ছা করিতেছে।

আপনি একটা আনি কণ্ডাক্টরকে দিতে পারেন। দুপুরবেলা হইলে তিনটা পয়সা দিলেও হয়। কিন্তু মাত্র একটা আনি কাণ্ডাক্টরের হাতে দিতে আপনার লজ্জা করিবে। তাহার চেয়ে যদি একটা আস্ত টাকা বাহির করিয়া দিতে পারেন, এবং ফেরৎ সওয়া পনেরো আনা পয়সা না-গণিয়াই ঝনাৎ করিয়া মনিব্যাগে ঢালিয়া ফেলিতে পারেন, আপনার মনটা একটু খুসি খুসি লাগিবে।

কিংবা ধরুন, যদি আপনার কপাল খুব ভাল হয়, মেয়েটি মুখ ফুটিয়াই আপনার কাছে পয়সা ধার চাহিল। দু'আনা বা চার আনা পয়সা তাহাকে দিলেই কাজ চলিয়া যায়। কিন্তু গণিয়া গণিয়া ষোলটা পয়সা তাহার হাতে দিতে কেমন কেমন লাগে। আস্ত একটা টাকা দিতে পারিলে আনন্দ অনেক বেশি। টাকাটা অনাবশ্যক হইলেও। মেয়েটিও যদি অভিজাত হয়, কখনও চার আনা পয়সা ধার চাহিবে না। বলিবে, একটা টাকা আমাকে দিতে পারেন?

এখন সেই সন্ধিক্ষণে যদি দেখেন, আপনার মনিব্যাগে তিন টাকার সিকি দু'আনি এবং দেড় টাকার তামার পয়সা আছে, আস্ত টাকা একটিও নাই, আপনার মনটা খিঁচ্‌ড়াইয়া যায় না কি? ইহারই নাম আভিজাত্য।

এই আভিজাত্য ট্রামে ও রাস্তায়, বাড়িতে ও সিনেমায়, সর্ব্বত্রই জাগিয়া থাকে। ট্রামে বাসে যখন পাশের সীটে তিনটি তরুণী কলেজে চলিয়াছে, ব্যাগে পয়সা থাকিলেও কণ্ডাক্টরকে টাকা বাহির করিয়া দিতে ইচ্ছা করে, ব্যাগে তিনটা টাকা থাকিলে বাছিয়া চক্‌চকে পঞ্চম-জর্জ্জ-মার্কা টাকাটা বাহির করিয়া দিতে ইচ্ছা করে। জানি, সে টাকার চাক্‌চিক্য মেয়েরা চাহিয়া দেখিবে না, তাহার মধুর ঠুঙ্কার কান পাতিয়া শুনিবে না। তবুও দিই। কণ্ডাক্টরের কাছে হয়তো রেজকি নাই—ওভারক্যারেড্ হইয়া দূরে নামিয়া হাঁটিয়া গন্তব্যস্থানে ফিরি, তবুও মানসিক হীনতা স্বীকার করিয়া তিনটা তামার পয়সা বা একটা কালো রাণীমার্কা টাকা বাহির করিয়া দিই না। ইহারই নাম আভিজাত্য।

*　　*　　*　　*

ইহাতে খরচ নাই ; আনির বদলে টাকা বাহির করিয়া দিলে ট্রামের ভাড়া অধিক লাগে না। কিন্তু হতভাগ্য দরিদ্র জাতি আমরা—এটুকু মানসিক বিলাসের সুযোগও আমরা পাই না। মিড্-ডে ফেয়ার হিসাব করিয়া চৌদ্দটি পয়সা পকেটে লইয়া যেখানে কলেজে যাত্রা করিতে হয়, সেখানে সহযাত্রিণীকে দেখাইয়া টাকা বাহির করিবার অবসর কোথায় ?

তবুও উহারই মধ্যে যতদূর সাধ্য আমরা করি, খুচরা পয়সা ছ'টি পকেটে রাখিয়া দু'আনিটিই প্রথম যাত্রায় বাহির করিয়া দিই। আভিজাত্যের এই প্রকাশ যেমন ক্ষীণ, তেমনই মর্মান্তিক করুণ।

* * * *

হউক দু'দিনের জন্য, যুদ্ধের কল্যাণে সেই দুঃখ আমাদের ঘুচিয়াছে। আমরা আর খুচরা পয়সা তো পয়সা, রূপার টাকাও লোকের সামনে বাহির করিতেছি না। পয়সা দিতে গেলেই আমরা নোট বাহির করিয়া দিই, এ সংবাদ মোড়ের পানওয়ালীটাও জানিয়া গিয়াছে।

অগর্ ফির্দৌস্ বরুয়েঁ জমীনস্ত্,
ওয়া হমীনস্ত্, ওয়া হমীনস্ত্, ওয়া হমীনস্ত্ ॥

* * * *

গৌরব-ভোগের এহেন মাহেন্দ্রক্ষণে পাছে কেহ খুচ্রা টাকাকড়ির মালিক বলিয়া পরিচয় দিয়া জাতির সম্ভ্রম-চেতনাকে আহত করে, এই ভয়ে গবর্নমেণ্ট পর্যন্ত সতর্ক হইয়া উঠিয়াছেন। শত সমৃদ্ধির মধ্যেও মানুষের অভ্যাসগত হীনমতি বাঁচিয়া থাকে, তাহাকে দূর করিবার জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। কেহ যদি আবশ্যকের অতিরিক্ত রূপার টাকা জমাইতে চায়, সেই অ-সভ্যোচিত মনোবৃত্তির জন্য পুলিশ তাহাকে ধরিয়া জেলে পুরিবে এইরূপ ব্যবস্থাও হইয়া গিয়াছে।

* * * *

তবুও স্বভাব যায় না। এই দিনেও মূর্খ হীনপ্রকৃতি মানুষের দল নোট ভাঙাইয়া খুচরা টাকা লইবার জন্য কারেন্সি অফিসের দুয়ারে ধর্না দিতেছে, ইহার চেয়ে গ্লানিকর সংবাদ আর কিছু হইতে পারিত না। ভগবান তাহাদের বড়লোক করিয়া দিয়াছেন, সে সৌভাগ্য তাহাদের পেটে সহিতেছে না, পোলাওকে জল ঢালিয়া পান্তভাত করিয়া খাইতে না পারিলে এই স্বভাব-কাঙালীরা তৃপ্ত হয় না। চক্ষে দেখি নাই, শুনিতেছি সার্জেণ্ট্রা গুঁতাইয়াও তাহাদের ভিড় ভাঙিতে পারে না, এমনই নাকি তাহাদের অন্ধ সত্যাগ্রহ। গবর্নমেণ্ট্ ঠিকই করিতেছেন—যে শিশু দুধের স্বাদ বোঝে না তাহাকে ঝিনুক ঠাসিয়াই খাওয়াইতে হয়! কিন্তু আমার মনে হইতেছে, সার্জেণ্টের কর্ম নয়। সার্জেণ্টের গুঁতায়ও আভিজাত্য আছে, সেটা সাহেবের গুঁতা। তাহা খাইয়া ইহারা লজ্জিত হইবে না, খালি খবরের কাগজে নাম ও ফটো ছাপাইয়া বিখ্যাত হইবার ফিকির দেখিবে, গবর্নমেণ্টরও বদনাম করিবে। কাণ্ডজ্ঞানহীন ও দূরদৃষ্টিরহিত খবরের কাগজওয়ালারা ইহাদের সেই রিঅ্যাক্শনারি কাণ্ডকারখানাকে সাহায্য করিবে। ইতিমধ্যেই করিতেছে মনে হয়, না হইলে সংবাদ আমার কান পর্যন্ত পৌঁছাইত না। জাতির প্রগতির পথে এই তাম্র-মুদ্রালোভীরা প্রচণ্ড বাধা। সার্জেণ্টের বদলে ইহাদের মধ্যে ষাঁড় ছাড়িয়া দেওয়া উচিত, তাহার গুঁতা খাইলে তবে যদি ইহাদের বুদ্ধি ঘটে আসে।

* * * *

এই পর্যন্ত লিখিয়াছিলাম ; ইচ্ছা ছিল প্রস্তাবটা গবর্নমেণ্টের কাছে পাঠাইয়া দিব।

কিন্তু বিধি বাদ সাধিলেন। আচম্বিতে সংবাদ রটিয়া গেল, গবর্নমেণ্ট ইহাদের ক্রন্দনে বিচলিত হইয়াছেন। এক টাকার নোট বাজারে বাহির হইয়াছে।

* * * *

বাহির যখন হইয়াছে, তাহাকে ঠেকাইতে পারিব না। বর্জন করিয়া চলিব এরূপ সংকল্পও করিয়া লাভ নাই—মূর্খের মেলায় বাস করিলে বাধ্য হইয়াই তাহাদের মতে চলিতে হয়। এক টাকার নোট legal tender লইতে আপত্তি করিয়া পার পাইব না। এবং অপরের কাছে সে নোট যদি গ্রহণ করি, তাহা আবার মানুষকে দিতেও আপত্তি করিতে পারিব না—করিলে নিজেরই ইতরতা প্রমাণ পায়।

* * *

তবুও এই নোট সম্বন্ধে শঙ্কিত হইতেছি।

কাগজে লিখিয়াছিল, "গত মহাযুদ্ধের সময় যে আকারে এক টাকার নোট বাহির করা হইয়াছিল, বর্ত্তমান নোটের আকার তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইবে।" মহাযুদ্ধের সময়ের নোটের মাপ ছিল, যতদূর মনে পড়ে, ৪ ইঞ্চি × ২$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি। এই মাপ যদি ঠিক হয় তবে তাহার মোট আয়তন ছিল ৯ বর্গ ইঞ্চি। নূতন নোটের আকার হইয়াছে ৩$\frac{৪}{৫}$ ইঞ্চি × ২$\frac{১}{৬}$ ইঞ্চি। মোট আয়তন ৮$\frac{৭}{৩০}$ বর্গ ইঞ্চি। তাহা হইলে মহাযুদ্ধের নোটের তুলনায় ইহার আয়তন $\frac{২৩}{৩০}$ বর্গ ইঞ্চি কম হইল। মহাযুদ্ধের সময় নোটে টাকায় এক আনা পর্যন্ত বাটা হইয়াছিল। বাটাতে নোটের উপরে মানুষের আস্থার অভাব বুঝায়। এবারের নোট ছোট ; সেই অনুপাতে যদি মানুষের আস্থাও টাকা প্রতি $\frac{২৩}{৩০}$ বর্গ ইঞ্চি করিয়া কম হইয়া পড়ে, বিস্মিত হইবার কিছুই থাকিবে না।

* * * *

একমাত্র ভরসা, সেই পত্রিকাই আশ্বাস দিয়াছে, "পরে সুবিধামত নোটের আকার বড় করা হইবে।" আমি বলি, সেটা 'পরে সুবিধামত' না হইয়া এখনই করা উচিত। 'সুবিধা' অপেক্ষা প্রয়োজনের তাগিদ বড়। রূপার টাকার বদলে কাগজের টাকা দেখিলেই মূর্খের দেশের মূর্খেরা ঘাব্‌ড়াইয়া যায়—তাহার উপরে যদি আবার 'গবর্নমেণ্টের বুঝি কাগজও ফুরাইয়া গিয়াছে' এই রকম একটা ধারণা তাহাদের মনে হয়, পরে সামলানো কঠিন হইবে। মহম্মদ বিন্ তুঘলককে এই মূর্খেরাই ডুবাইয়াছিল।

* * * *

একশো টাকার নোট বড় করার ফলে লোকের মন কিছুটা শান্ত হইয়াছে ; একটাকার নোট আরও দরিদ্র এবং সংখ্যাধিক শ্রেণীর হাতে ফিরিবে, অতএব একটাকার নোট আরও বড় করিয়া ছাপা উচিত। ডিমাই বা ডবলক্রাউন ফুলপেজী করিয়া ছাপিলেও দোষ নাই। অন্ধ বিশ্বাস লইয়া যেখানে কারবার, সেখানে আয়োজন যত বড় করা যায়, বিশ্বাস-উদ্রেকের ভরসাও ততই বাড়িয়া যায়।

* * * *

আর একটি কথা। কথাটি বলিতে সঙ্কুচিত হইতেছি, তবুও বলিতে হইতেছে—হিতাকাঙ্ক্ষীই যদি হই, প্রিয়ভাষী হইবার চেষ্টায় মৌনী হইব না।

কথাটি হইতেছে, নূতন করিয়া যদি নোট ছাপানোই হয়, তাহাতে যেন বর্ত্তমান রাজার মুখ অঙ্কিত থাকে। কেন একথা বলিলাম, তাহার কারণ বলি।

টাকার উপরে রাজার মুখ আঁকা হয়, অনেক কারণে। যে রাজার আদেশে টাকা চলিত হইল তাঁহার মুখই টাকায় আঁকিয়া দেওয়া হয়, যেন লোকে বুঝিতে পারে এই টাকা চলিতেছে কাহার কথায়। ইহাতে তাহারা টাকার উপরে আস্থা পায়, রাজারও বিজ্ঞাপন হয়, দেশের লোকে তাঁহাকে চিনিতে শিখে।

পঞ্চম জর্জ অতি ভাল রাজা ছিলেন। কিন্তু ষষ্ঠ জর্জও তো মন্দ রাজা নন। তবে তাঁহার মুখ ছাপিতে আপত্তি বা সঙ্কোচ কিসের? বরং এই যুদ্ধের মধ্যে তাঁহার মুখই তো বেশি করিয়া তুলিয়া ধরা দরকার দেশের লোকের সম্মুখে। তাহা না ধরিলে লোকেও নিন্দা করে, শত্রুরাও ছিদ্র আবিষ্কারের সুযোগ পায়।

*   *   *   *

বলিলে যদি অপরাধ না হয় তবে বলিব, ইতি মধ্যেই ভারত সরকারের কারেন্সি বিভাগ একটি মারাত্মক ভুল করিয়াছেন। সম্রাট্ ষষ্ঠ জর্জের মুখ ও নাম লইয়া পয়সা বাহির হইয়াছে, আনি দু'আনি সিকি ও আধুলি বাহির হইয়াছে। টাকা বাহির হয় নাই। অথচ টাকাই এদেশের সরকারি ও সর্ব্বোচ্চ মুদ্রা। টাকাই legal tender। তাহার উপরে যদি তাঁহার নাম না থাকে, তবে দেশের legal tender বলিয়া সেটা চলে কোন্ সুবাদে? রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অবশ্য নোটের উপরে তাঁহার ছবি দিয়াছেন। কিন্তু সে নোট legal tender নয়—representative money মাত্র।

*   *   *   *

জার্ম্মেনিতে যদি এমন কাণ্ড হইত, বলিতাম হিট্‌লারের inferiority complex হইয়াছে; রেজকিতে নাম ছাপিলেও গোটা-টাকায় নাম ছাপিতে তাঁহার সাহস হইতেছে না। এ ক্ষেত্রে সেরূপ কথা বলিতে পারি না, বলিতে চাহিও না। আমরা জানি টাকায় আমাদের রাজার নাম ছাপিলে আমরা আশ্চর্য হইব না, খুসিই হইব। কিন্তু অপরকে যে কথা আমরা বলিতে পারিতাম, সে কথা আমাদের রাজাকে অপরে বলিতে পারে এমন ছিদ্র কারেন্সি কর্ত্তৃপক্ষ নির্ম্মাণ করিতেছেন কেন?

*   *   *   *

যুদ্ধের বাজারে রূপার টাকা তৈরি করিয়া বাজারের প্রয়োজন মিটানো সহজ নয় এবং সে চেষ্টা করাও সঙ্গত নয়। গত মহাযুদ্ধে তাহার বিপদ আমরা দেখিয়াছি। নোটই ছাপানো হউক, কিন্তু তাহাতে যেন বর্ত্তমান রাজার ছবি থাকে। সমর-মত্ত জাতির মনে উৎসাহ সঞ্চার করিতে হয়; যাহার জন্য সে প্রাণ দিতে যাইতেছে তাঁহার মূর্ত্তি তাহার চক্ষের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে হয়। সে জিনিষের moral effect অনেক।

*   *   *   *

শেষ কথা, যুদ্ধের কল্যাণে পকেটের টাকা আমাদের বাড়িয়াছে; এবং ক্রমে আরও বাড়িবে। কিন্তু সেই অর্থবৃদ্ধির গর্ব্বে স্ফীত যেন আমরা না হই। মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মানিতে তাহাই হইয়াছিল—হঠাৎ অজস্র কাঁচা টাকা হাতে পাইয়া জার্ম্মানদের মুণ্ড ঘুরিয়া গেল—এক মার্কের জিনিষ যেটা ছিল সেইটা কিনিতে তাহারা একমুঠা একশো মার্কের নোট বাহির করিয়া দিতে লাগিল। এই উড়নচণ্ডী অভ্যাসের চাহিদা মিটাইতে গিয়াই দেশ নিঃস্ব হইয়া গেল, শেষ পর্য্যন্ত বিপ্লব ঘটিল, কাইজার পলাইয়া আত্মরক্ষা করিলেন।

ভারতেও নোট ছাপা হইবে, কিন্তু সে নোট যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত হইয়া আমাদের মস্তিষ্ককে উষ্ণ না করে, এক টাকার জিনিষ বাবুগিরি দেখাইয়া দশ টাকায় কিনিবার দুর্ম্মতি আমাদের না দেয়।



সম্পাদকীয়

দ্বিতীয় মহাসমর

দ্বিতীয় মহাসমরের বর্ত্তমান অধ্যায়ে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার মতন কিছু ঘটে নাই। ফ্লাণ্ডাসে'র যুদ্ধ ও ফ্রান্সের পরাজয় এখন পুরাতন সংবাদ। যাহাদের ইচ্ছা ছিল যে ঐ জাতীয় রোমাঞ্চকর ব্যাপার অনবরত ঘটিতে থাকুক, যাহাতে বেশ তর্ক আলোচনা ইত্যাদি করিয়া সময়টা সুখে কাটাইতে পারা যায়, তাহাদের সহিত বিধাতা চাতুরী করিয়াছেন। মনোমত সংবাদের অভাবে তাহারা যথেষ্ট নিরুৎসাহ ও ভগ্নোদ্যম।

তবে শুনিতেছি যে আগামী ১৫ই আগষ্ট নাগাদ বড় গোছের কিছু একটা ব্যাপার ঘটিতে পারে। অবশ্য কি যে ঘটিবে এবং তাহার ফলাফল কিরূপ তাহা জানা নাই তবে দিনটি আসিতে আর বেশী বিলম্ব নাই। সুতরাং ১৫ই আগষ্ট শীঘ্র শীঘ্র আসিয়া সকলের উৎকণ্ঠার অবসান করিলে ভাল হয়।

জাপান গভর্ণমেণ্টের পদত্যাগ ঃ এসিয়াতে গোলমালের সুত্রপাত

পশ্চিমে যুদ্ধের খবর এখন বিশেষ না থাকিলেও এসিয়াতে উপদ্রবের পূর্ব্বলক্ষণ দেখা দিয়াছে। জাপানে প্রধান মন্ত্রী আরিটার মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিয়াছেন এবং সেই স্থলে প্রিন্স্ কোনোয়ে নুতন মন্ত্রীসভা গঠিত করিয়াছেন। পুরাতন মন্ত্রীরা যুদ্ধ ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দেখান নাই; উপস্থিত এই বিষয়ে আরও মনোযোগ দিয়া যাহাতে জাপান এই অবকাশে নিজেদের কিছু সুবিধা করিয়া লইতে পারে, তাহাই সম্ভবতঃ এই পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য।

জাপানী মাথায় ছোট হইলেও, বুদ্ধিতে ছোট নয়। নিজেদের সুবিধা করিয়া লইবার এত বড় একটা সুযোগ আবার কবে মিলিবে কে জানে? সুতরাং তাহারা এখন গোলমাল বাধাইবার নানাপ্রকার অজুহাত অন্বেষণে ব্যস্ত। ইংরেজের সহিত ছোটখাট দুই একটা বিরোধ, সম্ভবতঃ জাপান গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছানুসারেই, ঘটিয়া গেছে। এখন কতটা অবধি ক্ষতি ইংরাজ সহ্য করিতে বাধ্য হইবে, তাহাই বোধ হয় জাপান গভর্ণমেণ্ট পরীক্ষা করিতে ব্যস্ত।

মহাত্মা গান্ধী ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট

সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধী বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত যে আলাপ আলোচনা করিতেছিলেন তাহার বড় করুণ পরিণতি দাঁড়াইয়া গেছে। তিনি ইংরাজকে রণে ক্ষান্ত হইবার জন্ত একটি আবেদন জানান, কারণ

তাঁহার বিশ্বাস যে অহিংসনীতি পালন করিয়া ইংরাজ সৈন্য অস্ত্র ত্যাগ করিলেই শত্রুপক্ষ ভীষণ লজ্জা পাইবে এবং অনুতপ্ত হইয়া যুদ্ধ স্থগিত করিবে। ফলে এই জটিল ব্যাপারটির একটি সুন্দর ও সহজ মীমাংসা হইয়া যাইবে।

ইংরাজ জাতির রসবোধ আছে বলিয়া যে কিংবদন্তী আছে তাহার প্রমাণ পাইলাম। তাঁহারা যথোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত মহাত্মা গান্ধীকে জানাইয়াছেন যে প্রস্তাবটি অতি যত্ন সহকারে ভাবিয়া দেখা হইয়াছে ; ইহা সুপ্রস্তাব সন্দেহ নাই, কিন্তু সামান্য একটু অসুবিধা থাকিয়া যাওয়াতে তাঁহারা ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। সে জন্য তাঁহারা দুঃখিত।

দুঃখিত যে শুধু ইংরাজ তাহাই নয়, আমরাও দুঃখিত। কারণ প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিলে তামাসা দেখিবার যে সুযোগ মিলিত তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত হইলাম।

কংগ্রেস ও অহিংসনীতি

বহু আলাপ আলোচনা ও তর্ক বিতর্কের পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির রায় বাহির হইয়াছে। রামগড়ে কংগ্রেস যাহা বলিয়াছেন দিল্লীতে ঠিক তাহাই বলা হইল কি না এবং দিল্লীতে যাহা বলিলেন পুণাতে আবার তাহা বলা হইল কি না, এই সিদ্ধান্ত করিতে করিতে অনেক সময় লাগিয়া গেল। সুদীর্ঘ প্রস্তাবগুলির সংক্ষেপে যে সরল অর্থ দাঁড়ায় তাহার মধ্যে একটি বিষয় 'সোনার পাথর বাটি'র মতন বোধ হইল। বিষয়টি কংগ্রেসের অহিংস নীতি লইয়া।

ওয়ার্কিং কমিটি স্থির করিয়াছেন যে কংগ্রেস কখনো কখনো অহিংস নীতি পালন করিবেন এবং কখনো কখনো তাহা করিবেন না। অর্থাৎ সাধারণতঃ অহিংস থাকিলেও কোনও কোনও বিষয়ে—যথা শত্রু ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে—আর কংগ্রেস অহিংস থাকিতে পারিবেন না। ভাগাভাগির এমন সুন্দর ব্যবস্থা আর কখনো দেখি নাই—বিশেষ যাহাদের পক্ষে হিংস ও অহিংস থাকা একই কথা!

ইস্‌লামিয়া কলেজ : ছাত্রদের সহিত বিরোধ

ইস্‌লামিয়া কলেজ প্রাঙ্গণে ছাত্রদের সহিত পুলিশের সংঘর্ষের ফলে কয়েকটি হিন্দু ও মুসলমান ছাত্র আহত হইয়াছে। এই ব্যাপারে বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী অনেক প্রকারে দুঃখ ও অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছেন—অবশ্য সরকারী বিবৃতি পড়িলে মনে হয় যে এই শোক প্রকাশ ইস্‌লামিয়া কলেজের মুসলমান ছাত্র আহত হইয়াছে বলিয়াই, অন্য কাহারও জন্য নহে।

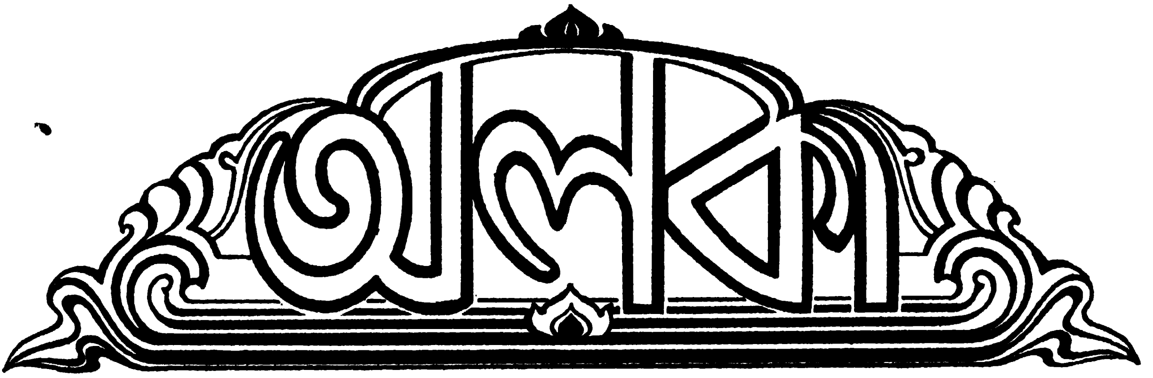
যাহা হউক্ উহা আমাদের আলোচনার বিষয় নহে। আমরা দেখিয়াছি যে বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী বড় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। অদূরে ছেলেকে ধরিয়া প্রহার করিলে পিতার যে দুরবস্থা হয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের তাহাই হইয়াছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সরকার কর্ত্তৃক সম্পাদিত
শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৫৯নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীপ্রমথনাথ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও ৩৬৷১ এল্‌গিন রোড হইতে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



ক্ষণিক বসন্ত

শিল্পী– শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়



দ্বিতীয় বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৪৭ | ১২শ সংখ্যা

প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ

অধ্যাপক প্রমথনাথ সরকার

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে নারীজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির যে পরিচয় পাওয়া যায়, বিশ্ব-সভ্যতার ইতিহাসে সত্যই তাহা অতুলনীয়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা বর্ত্তমান যুগেও অনেক কম, পূর্ব্বকালে অবশ্য আরও কম ছিল। কিন্তু বিদ্যাচর্চ্চায় ও সাহিত্য রচনায় বৈদিক ও ঐতিহাসিক যুগের বিদুষীগণ দেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও কবি-সমাজে মর্য্যাদার আসন লাভ করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ, গৌতম, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিদের রচিত বেদমন্ত্রের মধ্যে বাক্, অপালা, বিশ্ববারা প্রভৃতি মনস্বিনী মহিলাগণের রচিত গাথা ও প্রাচীনতম বেদসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে বালিকাদেরও উপনয়নের রীতি ছিল,—ঋষি বালকদের ন্যায় তাহারাও উপবীত ধারণ করিয়া বিদ্যাভ্যাস ও ব্রহ্মচর্য্য পালন করিত। তন্মধ্যে কয়েকজন কালক্রমে শাস্ত্রচর্চ্চায় খ্যাতিলাভ করিয়া অধ্যাপনা ব্রতাবলম্বন করিতেন, তাঁহাদের নাম হইত—আচার্য্যা বা উপাধ্যায়া। তিন চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতের আশ্রমে তপোবনে মধ্যে মধ্যে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা যাইত; তৎকালে বা তৎপরে—বর্ত্তমান শতাব্দীর পূর্ব্বে বিশ্ব-জগতের আর কোথাও এইরূপ কল্পনাও কেহ করে নাই। পরবর্ত্তী কালে ভারতেও স্ত্রীশিক্ষার এই উচ্চাদর্শ বিলুপ্ত হইয়াছিল, বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের কোথাও ইহার উল্লেখমাত্র নাই। বৈদিক যুগ অবশ্য মান্ধাতারও পূর্ব্ববর্ত্তী,—সে যুগের স্মৃতি ও কল্পনা সংস্কৃত সাহিত্যে একান্তই দুর্ল্ভ। আধুনিক কালে নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব বিদ্যার নবীন আলোকে প্রাচীন কালের যে সকল বিস্মৃত কাহিনী আবিষ্কৃত হইতেছে, সাহিত্যের উপাদানরূপে তাহার মূল্য যথেষ্ট। কিন্তু এ পর্য্যন্ত অতি অল্প লেখকই এদিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন।

প্রাচীন ভারতের মহিলা কবি ও বিদুষীগণের কীর্ত্তিকথা বহুদিন হইতেই বঙ্গভাষায় প্রচারিত হইতেছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'ভারত মহিলা', মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভারতীয় বিদুষী',

হরিদেব শাস্ত্রীর 'প্রাচীন ভারতের শিক্ষিতা মহিলা' যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'ভারত মহিলা' ও ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর 'সংস্কৃত সাহিত্যে মহিলা কবি' এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গের উপেক্ষিত কবি স্বর্গীয় শশাঙ্কমোহন সেন তাঁহার 'সাবিত্রী' নাটকে বৈদিক তপোবনের একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। গৌতমের তপোবনে সত্যবান্ সুব্রত প্রভৃতি মহর্ষির শিষ্য ছিলেন, তা'র ছিলেন সাবিত্রীর সখী আচার্য্যা পার্ব্বতী ব্রতচারিণী তপস্বিনীরূপে তিনি বালক বালিকাগণকে বিদ্যাদান করিতেন। সাবিত্রীর সহিত কথোপকথনেই আচার্য্যা পার্ব্বতীর পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে—

(সাবিত্রী, প্রথম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য)

সাবিত্রী। দেবি, ভাবিতেছি আমি কর্ম্ম-মুখরিত
বিস্তৃত সংসার মাঝে, এই তোমাদের
জীর্ণ পর্ণশালাগুলি কোথা পায় স্থান!
হৃদয় নিভৃতানন্দ এই তপোবন!
সংসার মরুভূ-বক্ষে অমৃত-নির্ঝর!
হেথা হতে অনুদিন শিরার প্রবাহে
বহিছে জ্ঞানের স্রোত সমস্ত ভারতে!
তোমরা জগদ্‌গুরু—ঊর্দ্ধে দেবতার
রয়েছে গুরুর স্থান—গোপনে গোপনে
বিস্তারি অযুত হস্ত, ফণীন্দ্র মতন
ধরিয়াছ ধরণীরে অধঃপাত হ'তে!
নিশিদিন প্রতি কার্য্যে তোমাদেরি পানে
চেয়ে আছে সমস্ত ভারত; চলিতেছে
অঙ্গুলি-সঙ্কেত-বশে, কলের মতন
একটি বিশাল জাতি! যেন একাধারে
হৃদয় মস্তিষ্ক দুই স্থিত ভারতের!

পার্ব্বতী। অপূর্ব্ব এ কথা শুভে, নৃপকন্যামুখে।

সাবিত্রী। দেবি! ক্ষম প্রগলভ্‌তা, জানি আমি,
দাসী হতে বড় তুমি প্রবয়সী নহ।
এইভাবে কাটাইবে কাল? আসিবে না
সংসারের পথে?

পার্ব্বতী। রাজপুত্রি, দূর-গত তাহা।
কহি শুন পূর্ব্বকথা মম।
জনক ছিলেন মম সাগ্নিক ব্রাহ্মণ।
এই স্থানে দেহ ভস্ম করি' হোমানলে
পেয়েছেন মোক্ষ। চিতা-আরোহণ-কালে

কহিলেন পিতা মোরে—"মাগো, এ জগতে
একমাত্র ধর্ম্ম আছে, তাহা লোকহিত।
আমি পারি নাই যাহা, সাধিবি মা তুই।"
বহুদিন ভাবিলাম, কি করিতে পারি
একাকী অবলা আমি! পিতার আদেশ
জ্বলিতে লাগিল বুকে চিতাবহ্নি মত!
বহু বিচিন্তিয়া, শেষে লইয়াছি এই
অধ্যাপন-ব্রত; বসি' সংসারের প্রান্তে
এরূপে কাটাব বলি, স্বল্প এ জীবন
স্ব-ইচ্ছায় করিয়াছি স্থির।

সাবিত্রী। (সাবেগে)—নাহি জানি
ইহা হতে শ্রেষ্ঠ পথ কি আছে সংসারে!
দেবী, আমি সন্ন্যাসের সমর্থিনী নহি।
ঋষিরা সন্ন্যাসী নহে। নিরখি যখন,
এই ছায়াশিশিরিত তরুপুরী তলে,
হবির্গন্ধপূত বায়ে, পুত্র দারা লয়ে,
স্বল্প সুখে স্বল্পাহারে, নিত্য গ্লানিহীন
মানব জীবন কিসে বিকশি' উঠিছে
অধ্যয়নে অধ্যাপনে! নিরখি যখন
এই স্থানে আসি দেবি, এই পুঞ্জীভূত
অনন্ত গ্রন্থের রাশি—বিলাস-বিরাগী
শত লক্ষ জীবনের জীবন্ত প্রতিভা,
অক্ষুণ্ণ সত্বের ঝরী, মধু অশরীরী!
হৃদয়-শোণিত-ক্ষয়ে নিভৃত নিলীন
অন্বেষণ গবেষণা! তখন নিজেরে
কত ক্ষুদ্র, হেয় বলি' করি অনুভব!
মনে হয়, সুখ নহে, সুখের ছলনা
রাজ্য ধন। এই ছায়া-নিভৃত কাননে,
বিশ্ব বীণাস্বরসঙ্গে সঙ্গতি সাধনে,
এরূপে বহে না কেন মানব জীবন!

মনের মানুষ

শ্রীরামেন্দু দত্ত

তরুণ কিশোর স্বপন দেখিল,—মানস-প্রতিমা তা'র
নব-বধুটির মুরতি ধরিয়া পরাইল ফুলহার!
মধুর আশার মুরতি তাহার সুধার ভাণ্ড কাঁখে
কল্পলোকের দুয়ার ধরিয়া হাতছানি দিয়া ডাকে!

* * * *

তারপর তা'র আসিল সুদিন, এই ত সেদিন হায়!
টোপরে চেলীতে আলো-নহবতে বিজলী ঝলক প্রায়!
যা'রে একান্তে লভিবে বলিয়া আশা অনন্ত ল'য়ে
কবি ও কিশোর দ্বন্দ্বে বিভোর ছিল বিচ্ছেদ স'য়ে।
তা'র আগমনে যৌবন-বনে বিহগ কূজিতে গিয়া
কি কারণে যেন ফিরে এল হেন রুদ্ধ কণ্ঠ নিয়া?
আকাশ-কুসুম মিলালো আকাশে, বাতাসে মিলালো আশা—
কল্পলোকের দুয়ারে পড়িল আগল সর্ব্বনাশা!
বনিতা তাহার, মানসীর ছবি প্রেমের কবিতা নহে
মানবীর মত পৃথিবীর কথা গল্প করিয়া কহে!
ছোট সুখ-দুখে ওঠে হেসে-কেঁদে, হিংসা করিতে জানে—
পয়সা-কড়ির হিসাব করিয়া অঙ্ক মিলায়ে আনে!
চাঁদের আলোয় মাতাল হ'বার কারণ পায় না খুঁজে—
"চয়নিকা" হ'তে মিঠা লাগে তা'র নিদ্রাটি চোখ বুজে!
পুরী তা'র কাছে নোংরা সহর, উড়ে-মেড়াদের দেশ
দার্জ্জিলিঙের পথে ঘোরা সুধু যাচিয়া বরণ ক্লেশ!

* * * *

স্বপন-বিভোর তরুণ কিশোর সরিয়া যাইতে চায়
নগরে নগরে দুয়ারে দুয়ারে ঘোরে বাউলের প্রায়!
মনের মিতার খোঁজ করে, তা'র দুখে ভেঙ্গে পড়ে বুক
খোঁজে একখানি ফুলের মতন হাসিভরা কচি মুখ!
চোখে যা'র র'বে বিজলী ঝলক, পুলকোচ্ছল মন
রাসে ও ঝুলনে হোলীর মিলনে রচিবে বৃন্দাবন!

স্বচ্ছসলিলা সরোবর-তীরে ফুটিলে কমল-দল
বিভোল কবিরে মুগ্ধ করিবে সঙ্গীতে অবিরল!
শারদ নিশায় ধরণী যখন যাবে জ্যোৎস্নায় ভেসে
বাউল কবির একতারাটির নিকটে রহিবে ঘেঁসে!
মন ত'ার যবে উন্মন র'বে স্বপন-লোকের পারে
স্বপনপুরীর রাজকুমারীর মতন দেখাবে তা'রে!
সেই রূপসীর, সেই মানসীর, সেই খুশীভরা ছবি
কবিতার চর পাঠায়ে পাঠায়ে খোঁজ ক'রে ফেরে কবি!



সহযাত্রিণী

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রাত বারটা বেজে গেছে।

বাংলার শস্যশ্যামল স্নিগ্ধ অবারিত মাঠ ছাড়িয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে ছোটনাগপুরের রক্তবর্ণ রুক্ষ তরঙ্গায়িত প্রান্তর দিয়ে। কোথাও গিরিসঙ্কুল সর্পিল পথ, কোথাও শাল বনের ঘন অন্ধকার, কোথাও গভীর খাদের তলে গিরি-নির্ঝরিণীর রজত ধারা তমিস্রপুঞ্জে বিদ্যুল্লতার মত।

তারা ভরা আকাশ ঝলমল করছে, যেন ঘননীল শাড়ি ভরে হীরার চুমকি। চারিদিকে অপূর্ব্ব স্তব্ধতা, তন্দ্রাহারা নিশীথিনী বাক্যহারা বসে; এ গভীর নৈঃশব্দ্যে ট্রেনের একটানা শব্দ একঘেয়ে কর্কশ সুরের মত লাগছে।

সবিস্ময়ে শিপ্রা উঠে বসল। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল আলোছায়া খচিত রাত্রির দিকে।

আসান্‌সোল পার হতে শ্রান্তিতে শিপ্রা একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন হঠাৎ ঘুম ভাঙল, দেখে, শূন্য প্রান্তরের মধ্যে ট্রেণ দাঁড়িয়ে আছে, অদূরে বনের গভীর অন্ধকার, অতিকায় দাবানলের মত কালো ছোট পাহাড়গুলি গুম্ হয়ে বসে, যেন রূপকথার দৈত্যপুরী, স্তব্ধ রাত্রির জ্যোৎস্না থম্‌থম্ করছে।

তার ভয় করতে লাগল। এ কোন অজানা জায়গায় সে একা!

গাড়ী অন্ধকার। চাঁদের ম্লান আলোয় সব অস্ফুট রহস্যময়।

লম্বা কেবিন ট্রাঙ্কের ওপর ঘুমন্ত গণেশের মুখে চাঁদের আলোর আভা। গণেশের মদ্যপানরক্তিম শ্রান্ত মুখ তার বড় ভাল লাগল। আশ্বস্ত হয়ে সে উঠে বসল। পথে মোটরকারে দুর্ঘটনা, চলন্ত টেণে লাফিয়ে ওঠা, তার সব মনে পড়ল।

গাড়ীটি সে ভাল করে দেখলে।

আসানসোলে গ্রেগরি অন্য গাড়ীতে চলে যাওয়াতে সে গ্রেগরির রিজার্ভ করা বার্থটি দখল করেছে। তার ওপরের বার্থে বিরিঞ্চির নাসিকাধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সামনের বেঞ্চে সন্ন্যাসী এককোণে অচঞ্চল বসে, তিনি ঘুমোচ্ছেন না ধ্যান করছেন বোঝা যাচ্ছে না। তাঁর ওপরের বার্থে রাধাকান্ত কোটপ্যাণ্ট পরেই শুয়ে পড়েছে। পাশের লম্বা বেঞ্চের এক কোণে কল্যাণ বসে ঝিমোচ্ছে; আর এক কোণে দেবপ্রিয় অর্দ্ধশায়িত ভাবে, ঘুমোচ্ছে কি ভাবছে, বোঝা যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে, ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইছে; তাদের ওপরে কনক মদ্যপানঘন নিদ্রায় স্থির।

ধীরে গাড়ী চলতে লাগল। শিপ্রার চোখে আর ঘুম এল না। আর ঘুমোতে ইচ্ছা করল না। এ স্তব্ধ রাত্রি, এ রহস্যময় গিরিভূমি, এ গতিবেগ, এ অন্ধকার গাড়ীতে ঘুমন্ত অজানা যাত্রীদলের আবছায়া, তার বড় ভাল লাগল। মুগ্ধনেত্রে সে বাহিরে চেয়ে রইল; অন্তরে সে এক অপূর্ব্ব শান্তি অনুভব করল। তবে চঞ্চল আশ্রয়হীন কামনাতপ্ত অনিশ্চিত জীবনে সে কখনও ওরূপ শান্তি অনুভব করেনি।

গণেশের ঘুম-ভরা শান্ত মুখের দিকে সে একবার চাইলে। চাঁদের আলো সে মুখ থেকে সরে গেছে। কিন্তু সে আলো তার চোখে একি মায়ার অঞ্জন লাগিয়ে দিল। ধীরে উঠে সে গণেশের মাথার বালিশটা ঠিক করে দিল। ইচ্ছা করলে, গণেশকে চুম্বন করে।

মৃদু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শিপ্রা আবার বসল। বড় স্নিগ্ধ চাঁদের আলো, যেন আর্দ্রজলসিক্ত।

শিপ্রার মন ভারী হয়ে এল।

অন্ধকার গিরিবর্ত্ম দিয়ে ট্রেন সশব্দে উঠে চলেছে। গাড়ী অন্ধকার হয়ে এল। জানলা ফেলে সে শুয়ে পড়ল। তার আবার কেমন ভয় করছে।

সিঁদুরের মত রাঙা লালমাটি ছোট কালো পাহাড়ের সারি, শালবন, এ সব দেখলে তার মায়ের কথা মনে পড়ে

যায়। ছোটনাগপুরের একটি ছোট জায়গায় তার মায়ের জীবনের শেষের দিনগুলিতে সে প্রাণপণে মায়ের সেবা করেছিল। কিন্তু বাঁচাতে পারেনি।

মা যে বাঁচেনি তাতে সে দুঃখিত হয় নি। তাঁর দুঃখের জীবন যে শীঘ্র শেষ হয়েছে, সে তার ভাগ্য। যে সুন্দরী তরুণী প্রেমের মোহে খঞ্জ স্বামীর গৃহ ত্যাগ করে বাহির হয়েছিল, জীবনে সে শুধু প্রতারণা, লাঞ্ছনা, সুখ-মরীচিকার সন্ধানে ঘুরে সংসার মরুভূমির তাপে ক্লিষ্ট দগ্ধ হয়ে গেল মৃত্যু ত তাহার বন্ধু।

মায়ের কথা ভাবলে, মায়ের উপর তার যেমন রাগ হয়, ঘৃণাও হয়, তেম্নি করুণাও হয়।

তার জীবন যেন মায়ের জীবনের পুনরাবৃত্তি না হয়। সে অনেক জিনিষ ঠেকে শিখেছে। এ জীবন-যুদ্ধে সে একা। পুরুষ তাকে করুণা করবে না, ভালও বাসবে না, তার যোগ্যতা দেখে পুরস্কার দেবে। এ নারী বনাম পুরুষ যুদ্ধে প্রেমের কথা ভাব্‌বে না, জীবনে প্রেমের স্থান নেই।

তবু, ভালবাসতে ইচ্ছে করে, ভালবাসা পেতে ইচ্ছা করে। ভালবাসার অভিনয় অনেক দেখেছে, অনেক করেছে। সত্যি ভালবাসা কি জানতে ইচ্ছে করে।

শিপ্রা আবার উঠে বসল। জানলার কাচ ফেলে দিলে।

বাহিরে রাত্রি বড় নির্জ্জন, বড় শূন্য

বহুদিন পরে দুঃখিনী মায়ের কথা মনে হল কেন?

মায়ের কথা ভাবতে ইচ্ছে করে না। স্বপ্নজাল বুনতে ইচ্ছে করে।

গণেশ যদি তাকে বিবাহের প্রস্তাব করে, তার আপত্তি নেই। অভিনেত্রী-জীবন সে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করবে না। গণেশ হয়ত রাজী হবে।

কিন্তু গণেশ তাকে বিবাহ করবে কেন? সে গণেশের নিকট ক্ষণিকের সখ, হয়ত ক্ষণিকের মোহ।

এ সব চিন্তা তার মনেও কখনও হয় নি। সে কি গণেশকে ভাল বেসেছে? বোধ হয় এই প্রেমের আরম্ভ। এ দুর্ব্বলতা জয় করতে হবে।

তুমি, কাঁদছো কেন মা?

সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বরে শিপ্রা চমকে উঠল।

—আমি কাঁদছি? না?

—তবে, চোখে জল কেন?

চোখে আঙ্গুল দিয়ে শিপ্রা দেখলে, চোখ দিয়ে জল ঝরেছে। কি একটা ব্যথা বুক ঠেলে উঠে বাহির হতে চায়।

ক্রুদ্ধ হয়ে সে সন্ন্যাসীর দিকে চাইল। লোকটা কি এতক্ষণ জেগে তার দিকে চেয়ে বসেছিল নাকি! গণেশকে যে সে আদর করেছে, তা বোধ হয় দেখেছে

—আমি ভেবেছিলুম, আপনি ঘুমোচ্ছেন।

—সবাই যখন ঘুমোয়, তুমি কি তখন কাঁদো?

—দেখুন, আপনি সন্ন্যাসী, আমাদের কান্নার কি বুঝবেন, কি জানবেন?

—কান্নার সাগর পার না হলে, অমৃতের সন্ধান পাওয়া যায় না—আমাদেরও কি কম কাঁদতে হয়?

—দেখুন, ও সব বড় বড় কথা বুঝি না।

—তুমি ত একজন প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী, অনেক বড় বড় বই অভিনয় করেছ।

—সে মুখস্থ করে

—না বুঝে?

—লোকে কি বই দেখতে আসে না বই বুঝতে আসে? দেখতে আসে আমাদের ছলাকলা।

শিপ্রা রেগে উঠেছে। শিপ্রার ক্ষুব্ধ দীপ্ত স্বর শুনে প্রেমদাস দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেন। অবাক হয়ে চাইলেন। যেন, পূর্ব্বজন্ম হতে এক কিশোরীর কণ্ঠস্বর তাঁর কানে ভেসে এল।

—দেখুন, কাঁদলেই যদি অমৃতের স্বাদ পাওয়া যেত, তাহলে মায়ের জীবনে অমৃত উথ্‌লে পড়ত।

—তোমার মা, কে তিনি?

—আপনার জানবার কিছু দরকার নেই; তিনি বেঁচেও নেই।

শিপ্রা চুপ করে বসল। মায়ের কথা না তুল্লেই হত।

প্রেমদাস তার নিকটে এগিয়ে এসেছেন; তাঁর মুখ কঠিন রুক্ষ হয়ে উঠেছে, চোখে অস্বাভাবিক তীব্র দীপ্তি।

ভয়ে শিপ্রা সরে বসল। বুঝি সে চিৎকার করে ওঠে।

এ ত প্রেমদাস সন্ন্যাসীর কল্যাণময় স্নিগ্ধ দৃষ্টি নয়, এ

কোন কাপালিকের প্রলয়ঙ্কর অগ্নিগর্ভ দৃষ্টি, চক্ষুতারকা হতে সম্মোহনী তীব্র জ্যোতি বিচ্ছুরিত।

ভীতা হরিণীর মত শিপ্রা চাইলে। হাতের সোনার চুড়িগুলি কঙ্কণের সঙ্গে আঘাত করে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে বেজে উঠল।

আত্মসম্বরণ করে সন্ন্যাসী নিজের বেঞ্চে এসে বসলেন। তাঁর মুখ কালো হয়ে এল শ্রাবণের মেঘ-ভরা আকাশের মত; চোখে জ্বালাময় দৃষ্টি।

বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ কৃষ্ণ মেঘপুঞ্জ হতে জলধারার মত দুই চোখ দিয়ে অশ্রু নিঃশব্দে ঝরে পড়তে লাগল।

ভীত বিস্মিত ভাবে শিপ্রা সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে রইল।

বাহিরের স্তব্ধ তারাভরা রাত্রির চেয়ে এ সন্ন্যাসী আশ্চর্য্যকর।

মন্ত্রচালিতের মত শিপ্রা উঠে প্রেমদাসের পাশে বসল।

—আপনি কাঁদছেন কেন?

—সন্ন্যাসী কেন কাঁদে বুঝতে পারবে কি?

—কখনও কোন সন্ন্যাসীকে কাঁদতে দেখিনি। সংসারের দুঃখ কান্না এড়াবার জন্যই ত লোকে সন্ন্যাসী হয়।

—ভগবান তাঁর নিজের ভার যাকে দিতে চান তাঁকে তিনি করেন সন্ন্যাসী। তার মত দুঃখী কে?

—আপনি দুঃখী?

—তোমার মায়ের কথা ভেবে তোমারও যেমন দুঃখ হচ্ছে, আমারও তার চেয়ে কম দুঃখ হচ্ছে না।

—আমার মাকে আপনি জানতেন?

—জানতুম বৈ কি। তখন তোমার মায়ের নাম মৃণালিনী ছিল না, তখন ছিল 'উষারাণী'। সে আমাদের গ্রামের মেয়ে। পাশের গ্রামেই বিয়ে হয়েছিল। মনে পড়ে, বিয়ে হবার কয়েকদিন পরেই সে একা চলে এসেছিল। বলেছিলুম, স্বামী খোঁড়া তা কি হয়েছে। বলেছিল নিজে এক খোঁড়া কালা মেয়েকে বিয়ে করুন তারপর বলবেন। তোমার মায়ের সে জীবনের কথা তুমি কিছু জানো।

—জানবার ইচ্ছেও নেই। আচ্ছা আপনি কি বরাহনগরে কখনও এসেছেন?

—দু' তিনবার গেছি বোধ হয়।

—অস্পষ্ট মনে পড়ে, একজন সন্ন্যাসী আসতেন, তাঁকে দেখে বড় ভয় করত,—আগুন জ্বালিয়ে তিনি কি সব করতেন।

—তখন আমি তান্ত্রিক ছিলুম।

—আপনিই কি তাহলে আমার বাবাকে—

প্রেমদাস উত্তেজিত ভাবে বাধা দিয়ে বল্লেন, তোমার বাবাকে লোকে যত খারাপ বলে, তিনি তত খারাপ ছিলেন না। শোন তাহলে—

শোবার জায়গা থাকলেও কল্যাণ শোয়নি। বেঞ্চের কোণে বালিশে ঠেসান দিয়ে অর্দ্ধশায়িতভাবে সে ঝিমোচ্ছিল। ট্রেনে তার ভাল ঘুম হয় না। তাছাড়া, প্রতি ষ্টেশনে সরোজিনীর একবার খোঁজ করা দরকার।

বহুদিন পর অত্যধিক মদ খেয়ে তার মাথা ঝিম ঝিম করছিল। ট্রেনের গতির সঙ্গে দুলতে দুলতে তন্দ্রার ঘোরে বিচিত্র স্বপ্ন দেখতে দেখতে যেতে তার বড় ভাল লাগছিল। অনুপমা তার স্বপ্নলতায় অপরূপ পুষ্প ফুটিয়ে তুলছে।

কস্তা-পেড়ে ডুরে শাড়ীর আঁচল কোমরে জড়ান, অর্দ্ধেক বিনানো চুল পিঠে দুলছে, দুষ্টুমি-ভরা চোখ নাচছে ভ্রমরের মত, আমবাগানে ছুটোছুটি, ঢিল ছোঁড়া, লুকোচুরি চলেছে, চঞ্চলা বালিকার মুখ কামরাঙ্গার মত রাঙা।

ভাদ্রের নদী কানায় কানায় ভরা, আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা। ভাঙা ঘাটের পাথরে কিশোরী বসেছে নদী জলে পা ডুবিয়ে, অনুভব করতে চায় খরস্রোতের টান। সবুজ রঙের শাড়ীর প্রান্ত গৈরিক জলে পড়েছে, যেন একটা কচি কলাপাতা জলে ভাসছে। নয়নে বিদ্যুদ্দামলীলা নেই, স্থির তারকায় স্বপ্ন-কজ্জল মাখান; সাদা পাল-তোলা নৌকার মত মন ভেসে চলেছে কোন অজানা দেশে।

ঘরের সামনে ছোট ছাদ। কয়েকটি ছোট ফুলের টবে বাগান করবার সখ মেটানো। পথের প্রান্তে

কৃষ্ণচূড়া গাছে আগুন লেগেছে, সপ্তমীর স্নিগ্ধ চাঁদ উঠেছে মিত্তিরদের বাড়ীর ছাদের আড়ালে। তলায় অন্ধকারময় আঁকা বাঁকা সরু গলি নির্জ্জন, দুর্গ-প্রাকারের খাদের মত। ছোট ছাদে তরুণী একা পায়চারি করছে, আপন মনে গুণ্ গুণ করে গান করছে, এলোচুল মেলে দিয়েছে চাঁদের আলোয়। মায়াময় কৃষ্ণতারকায় কিসের প্রতীক্ষা! অন্ধকার গলি আলো করে কোন্ রাজপুত্র আসবে?

এ কে এল? এ ত সোনার ঘোড়ায় চড়ে স্বপ্নের রাজপুত্র নয়। মাথায় মণি-জ্বালা সর্পের মত সূচালো বনেট-ওয়ালা মোটরকারে এল যন্ত্ররাজের দানব অনুচর; সে তার বৃহৎ পুরীতে বন্দিনী করে রাখল।

দূরে নদীজলে সূর্য্যের আলো ঝক্ মক্ করে, চাঁদের আলো মায়াজাল রচনা করে। বৃহৎ বাগানের মধ্যে প্রাচীন প্রাসাদ, জনবিরল, স্তব্ধ। রঙীন শাড়ী পরে একাকিনী নারী ঘুরে বেড়ায়, বিছানা হতে বারান্দায়, বারান্দা হতে ছাদে, ছাদ হতে সিঁড়িতে; সিঁড়ির ধাপে শ্রান্ত হয়ে বসে পড়ে। বাহিরে পূর্ণিমা রাতি থম্ থম্ করে, বায়ু-কম্পিত আম্রবনের ছায়া কালো চক্ষের সম্মুখে দোলে, গজদন্ত-শুভ্র আনন শুষ্ক চামেলি পুষ্পের মত। জ্যোৎস্না-বিহ্বলা নিস্তব্ধা নিশীথিনীর কানে কানে কোন অন্ধকার কোণে বসে সে নারী চুপে চুপে বলে, আমি যে কি বন্দিনী তুমি জান না!

অন্ধকার রাতে তারার আলোয় সে নারী এলোচুলে একা ছাদে দাঁড়ায় সপ্তর্ষিমণ্ডলের দিকে চেয়ে; হীরার দুল জল্ জল্ করে জমাট অশ্রুবিন্দুর মত। সে অনুভব করে, সে বন্দিনী নয়, সে যাত্রিণী; অসীম অন্তরীক্ষ ভরে আলোর পথিকেরা ছুটে চলেছে, জগৎ-জোড়া প্রাণধারার সঙ্গে সে-ও চলতে চায়, হৃদয়ের পেয়ালা ভরে পান করতে চায় প্রাণের সুধা, দেহ মন দিয়ে অনুভব করতে চায় অসীম প্রাণের ছন্দ, উল্লাস। এমন সুন্দর দেহ কেন রোগ-জীবাণু-ক্লিষ্ট হয়?

কেন এমন হয়?

দুঃস্বপ্নপীড়িত নিদ্রিতের মত আর্ত্তনাদ করে কল্যাণ জেগে উঠল। বুকে যেন কে চেপে বসেছে, চোখ চাইতে পারছে না। চিন্তার অসংলগ্ন সূত্রগুলি জোট বেধে যাচ্ছে।

ঝক্—ঝক্—ঝক্—ঝক্—কেন এমন হয়—কি বন্দিনী তুমি জান না—ঝক্—ঝক্—ঝক্—ঝক্—

জোর করে কল্যাণ উঠে দাঁড়াল। বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারল না, ট্রেন যেন বড় জোরে দুলে চলেছে। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, দূরে পর্ব্বত শ্রেণীর মসীরেখা ধূসর অম্বরে। ক্ষুধিত চক্ষে সে চেয়ে রইল।

বহুদিন পরে অনুপমাকে দেখে কল্যাণের হৃদয়ে যে চঞ্চলতা জেগেছিল, সে তৃষিত তপ্ত চাঞ্চল্য সে শান্ত করতে চেয়েছিল, অবিশ্রাম কথা কয়ে, অত্যধিক পান করে, আপনাকে ভুলিয়ে।

কিন্তু মধ্যরাত্রে যখন সুপ্তির বাঁধ ভেঙে চিন্তার বেড়া ভাসিয়ে বন্যাধারার মত সে বেদনাময় চাঞ্চল্য দেহমনে উদ্বেল হয়ে উঠল, কোনরূপ বাধা দিতে কল্যাণের ইচ্ছা বা শক্তি রইল না।

তবু সে ভাবতে লাগল; অনুপমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে, জীবনে আপোষ করে চলা দরকার; যতই অনুযোগ করবে ততই অশান্তি। এখন যদি সে কিছুক্ষণ অনুপমার সঙ্গে কথা কইতে পারত; শুধু কথা কওয়া; কিছুক্ষণ নয়, সারারাত ধরে কথা কওয়া, মাঝে মাঝে চুপ করে পাশাপাশি বসে থাকা, আবার কথা কওয়া। তাহলে তার মন শান্ত হত।

অনুপমাকে সে সত্যি কোনদিন ভালবাসে নি। একথা অনুপমা জানে। অনুপমাকে সত্যি যদি ভালবাসত, তাকে এমন করে ফেলে বিলেত চলে যেতে পারত না।

অনুপমার রূপ লাবণ্য তাকে মুগ্ধ করেছে। তার সুঠাম তনুর ভঙ্গী, বর্ণের অপূর্ব্ব শুভ্রতা, কৃষ্ণ নয়নের অদ্ভুত জ্যোতি, এ যেন কোন অপূর্ব্ব প্রাণের রহস্য নিকেতন। গভীর অন্ধকার রাতে হঠাৎ চাঁদ উঠল যেমন চারিদিক আলোকময় অপরূপ হয়, তেমি অনুপমা যেখানে আসে, চারিদিক আলো হয়ে ওঠে। জগদীশও এই রূপে মুগ্ধ নারী সৌন্দর্য্যের আভায় অন্ধ হয়েছে। এ রূপের মায়া অবগুণ্ঠন খুলে সত্যিকার অনুপমাকে কল্যাণ জানতে চায়। তার অন্তরের কামনা, প্রাণের রহস্যকে বুঝতে চায়।

কল্যাণ দাঁড়িয়ে উঠল। চলন্ত গাড়ীতে সে পায়চারি করলে। আবার চুপ করে বসলে।

একটি তরুণীর মুখচ্ছবির অস্পষ্ট রেখা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। রেখাগুলি অস্পষ্ট, রঙ হাল্কা বলেই কল্পনায় নানা রঙে ছবিটি ভরে দিতে পারা যায়। তরুণী যাত্রিণী কি একা বসে চেয়ে আছে দিগন্তের দিকে। সাহসিকার অন্তরে যে শঙ্কা, চক্ষে প্রতীক্ষা!

সে তরুণী মূর্ত্তি সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ করে না, অজানা পথে আহ্বান করে। বলে, এসো, চলো আমার সাথে। তার কালো চোখের দীপ্ত দৃষ্টি প্রদীপশিখার মত আলো করে নিয়ে যাবে পথ।

মুগ্ধতার মধ্যে শান্তি, তৃপ্তি আছে, কিন্তু এ বাসনা বেদনাময় বুকের রক্ত দুলে ওঠে।

আর ঘুম হবে না। রাত্রির আলো-অন্ধকারের দিকে কল্যাণ চেয়ে ভাবতে লাগল।

মালতীর গাড়ীতে আসানসোলেও কেউ উঠলে না।

সমর বল্লে, এবার শোবার ব্যবস্থা করা যাক্। সারাদিন বড় ঘুরেছি। আর গাড়ীতে কোন পুলিশ নেই দেখলুম।

মালতী বল্লে, তুমি ওই বেঞ্চিতে শুয়ে পড়, এই চাদর আর বালিশ নাও।

—তুমিও ঘুমিয়ে নাও। অকারণে রাত জাগা অন্যায়। আর যদি কবিত্ব করতে চাও, আলো নিভিয়ে দাও, চাঁদের আলোর দিকে চেয়ে বসে থাক।

—অকারণে রাত জাগ্‌ছিনা। ঘুম আস্‌ছে না বলেই জাগ্‌ছি।

গাড়ীর আলো নিভিয়ে দিতেই চাঁদের মৃদু আলো গাড়ীর বেঞ্চে এসে পড়ল।

সমর শুয়ে পড়ল না। জানলার কাছে এসে বসল।

—দেখ, কি সুন্দর রাত!

—আচ্ছা, তোমার প্ল্যান কি? সত্যই ইয়োরোপে যাবে?

—নিশ্চয়ই যাব। যদিও পাসপোর্ট নেই, টাকাও নেই।

—আচ্ছা কত টাকা লাগে যেতে। চার পাঁচ শ টাকায় হবে।

—খুব।

—তাহলে আমি ঠিক করে ফেল্লুম—

কি? কি ঠিক করলে?

—কথাটা শুনে তুমি হাসবে।

—না, কমরেড বলো, আমি হাসব না। তবে চাঁদের আলোর দিকে চেয়ে যা ঠিক করা যায়, দিনের আলোয় তা সব সময়ে ঠিক থাকে না—চাঁদের আলোর একটা মোহিনী শক্তি আছে।

—না, চাঁদের আলোর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। আমি ঠিক করেছিলুম, যদি আসানসোলে কেউ আমাদের গাড়ীতে ওঠে, তাহলে হবে না, তোমায় বলব না; আর যদি আসানসোলে কেউ না ওঠে, তাহলে তোমায় বলব।

—তাহলে দেরী না করে বলে ফেল।

—আমার প্রস্তাবটা হচ্ছে—

মালতী হঠাৎ চুপ করলে। দূরে কোন কয়লার খনিতে আগুন জ্বলছে, সেই দিকে চেয়ে রইল।

—দ্বিধা না করে প্রস্তাবটা করে ফেলো। বিবাহের প্রস্তাব ছাড়া যে কোন শুনতে রাজী আছি।

—দেখ, তুমি সব বিষয়ে পরিহাস কোরো না। আর আমি বিবাহ করব না, তুমি জান।

—কি করে জানব! আজ ত তোমার কাছে শুনলুম।

—তুমি সিরিয়াসলি শুনবে কি না?

—নিশ্চয় শুনব, আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।

—আমি তোমার সঙ্গে ইয়োরোপে যেতে চাই। আমার সঙ্গে যা গয়না আছে, তা বেচলে পাঁচ শ' টাকা হবে; আর ইয়োরোপ গিয়ে পড়লে দাদা নিশ্চয় টাকা পাঠাবেন—

—প্রস্তাবটা খুবই ভাল।

—ভাল মানে? তুমি আমায় সাহায্য করবে কি না?

—অর্থাৎ আমার সঙ্গে যেতে চাও। কিন্তু যদি পাসপোর্ট জোগাড় করতে না পারি, আমাকে হয়ত কোন বিদেশী জাহাজে খালাসী সেজে বা লুকিয়ে যেতে হবে।

—পাসপোর্ট জোগাড় করা কি শক্ত।

—পুলিশ ত আমায় দেবে না; আর চাইতে গেলে

ধরা পড়তে পারি। সুতরাং অন্য কোন লোকের পাসপোর্ট চুরি করতে হবে।

—চুরি!

— শুধু চুরি নয়, তার ফটোর মত সাজও করতে হবে। সুতরাং আমার সঙ্গে যেতে হলে, দরকার হলে তোমাকে অন্য সাজ পরতে হবে।

—অর্থাৎ পুরুষ সাজতে হবে। তুমি আমায় ভয় দেখাচ্ছ।

—আমি সত্যি কথা বলছি।

—আচ্ছা, সমর, তুমি কি সত্যই কম্যুনিষ্ট।

—এ প্রশ্ন কেন কমরেড? এ সব আলোচনা থাক। তার চেয়ে, চেয়ে দেখ কি সুন্দর রাত। একটা গান গাও শুনি।

—সত্যি বলছি, ইয়োরোপ দেখতে আমার বড় ইচ্ছে।

স্বাধীন দেশ দেখ্‌তে, স্বাধীন জাতের নরনারীরা কি ভাবে থাকে, সেখানে রাষ্ট্র, সমাজব্যবস্থা নিয়ে কত পরীক্ষা পরিকল্পনা চলেছে—দেখতে ইচ্ছে করে।

—কিন্তু তাদের দেখতে চোখের দেখা নয়; প্রাণ দিয়ে তাদের দেখতে হয়, রক্তপাত করে তাদের শিখতে হয়—সত্যি তুমি যাবে?

—দেখ, সাহস করে ত বেরিয়ে পড়েছি।

—তোমার সাহসের প্রশংসা করি। বোম্বেতে গিয়ে ঠিক করা যাবে।

—কেন?

—বোম্বেতে যদি কোন সৎপাত্র না মেলে বিলেতে গিয়ে তার সন্ধান হবে।

— তোমায় বার বার বল্লুম না—

—তুমি শতবার বলতে পার, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তুমি বিয়ে করবে—প্রকৃতি তোমাকে গড়েছেন সৃষ্টিপালিনী মাতা রূপে—

—প্রকৃতি তোমার কানে কানে এসে বলে গেছেন—সবই খুব বোঝ, নয়, "ক্যাপিটলে" এ সব কথা লেখা নেই।

—চটো কেন। রাগ কোরো না। এ পথে যে যায় সে সঙ্গী খোঁজে না, এ প্রলয়ের পথ একা-চলার পথ। নব সৃষ্টির অরুণোদয় দেখা তাদের ভাগ্যে নেই জানে, তারি স্বপ্নে মাতোয়ারা হয়ে মৃত্যু তুচ্ছ করে ছুটে চলে।

মালতী কোন উত্তর করলে না।

দুজনে নিস্তব্ধ ভাবে বসে রইল।

জানলা দিয়ে পাণ্ডুর দিগন্তদৃশ্য ঝাপ্‌সা ছবির স্রোতের মত চোখের সামনে প্রবাহিত হয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)



একখানি ট্র্যাস নভেল

শ্রীবীরেন দাশ

চোখে মুখে সকাল বেলার এক ঝলক রোদ ঝিকমিক করে উঠতেই অপূর্ব্বর ঘুম ভেঙ্গে গেল। রুম-মেট ততক্ষণে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়া সুরু করেছে। ক্যালেণ্ডারের উপর চোখ পড়তেই, অপূর্ব্ব পাশ ফিরে আবার চোখ বুজলে। আজ রবিবার।

অপূর্ব্বর চোখে তন্দ্রা জড়িয়ে এলো অপূর্ব্ব ভাবতে সুরু কল্লে—হপ্তায় তবু একটা রবিবার আছে। তা না হলে বেঁচে থাকার কি যে মানে হত অপূর্ব্ব ভেবে কূল পায় না। একটিমাত্র দিন। প্রতি ছ'দিনের পর যখন মল্লিকার দেখা পাওয়া যায়,—সত্যি, মল্লিকা ছাড়া অপূর্ব্বর বেঁচে থাকার যেন কোনো মানে হয় না। বিস্ময় লাগে অপূর্ব্বর। এ কেমন করে হল। কেমন করে এ সম্ভব হল ?

পাশের বারান্দায় ক্রিং ক্রিং করে উঠল ফোন্। অপূর্ব্বর ঘুম টুটে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসল অপূর্ব্ব। প্রতি রবিবারে, আটটা বাজতে না বাজতেই মল্লিকা তাকে ডাকে। রুমমেট পড়া বন্ধ করে আধ মিনিট যেন একটু মুচকে' হাসলে। অপূর্ব্ব জানে এ হাসি ঈর্ষ্যার।

এ ক্ষেত্রে অবশ্য ঈর্ষ্যা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অপূর্ব্ব রুমমেটকে ক্ষমা করেছে। বেচারা রুমমেট। তার জীবনে হয়ত কোন নারীর পদার্পণ ঘটেনি।

ফোন্ আবার বেজে উঠল। অপূর্ব্ব তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল ফোন ধরতে। এখুনি মল্লিকার কণ্ঠস্বর সে শুনতে পাবে।

হ্যালো ?

অপূর্ব্ব…

মল্লিকা…

তুমি কি এই ঘুম থেকে উঠছ ?

হ্যাঁ, রবিবার কিনা। তাই একটু দেরী করে…

জানো এখন ক'টা বেজেছে ? আটটা। তুমি একটি কুম্ভকর্ণ। নিশাচরের মত সারারাত ঘুরে বেড়াও না কি ?

তোমার কি মনে হয় ?

আমার সন্দেহ হয়, তুমি লোক মোটেই ভাল না।

এতদিনে তবু বুঝতে পারলে। অপূর্ব্ব গম্ভীর গলায় বললে।

এইরে, রাগ হল বুঝি ? মল্লিকা বললে, শোনো, পনের মিনিট সময় দিচ্ছি। এখন আটটা পাঁচ। আটটা কুড়িতে আমার এখানে পৌছান চাইই।…কি চুপ করে আছ যে ? কাজ রয়েছে, অন্য কোথাও যাবে ?

না, সেসব শুনতে চাইনা।

অপূর্ব্ব শিথিল ভঙ্গিতে বিছানার উপর বসে পড়ল। সকালের রোদটা কি মিষ্টি।

রুমমেট বললে : তা হলে চললে এক্ষুনি ?

কোথায় ?

রুমমেট ঠোঁটের কাঁকে একটু হাসলে। বললে, হলি-ডে মেকিংএ।

অপূর্ব্ব খুসীতে উচ্ছলিত হয়ে উঠল সহসা ; হ্যাঁ ভাই, সপ্তাহে ঐ একটি দিনই আমার ছুটি আছে।

রুমমেট্ বললে : সপ্তাহে সাতটা দিনই আপনি পরিপূর্ণ করে উপভোগ করুন—কানায় কানায়, যাকে বলে full to the brim.

অপূর্ব্ব বললে, তুমি কি বলছ, আমি বুঝতে পারছি না। তিরিশটাকার কেরাণীগিরি করে—

রুমমেট্ বাধা দিয়ে বলে ; পৃথিবীতে সবই সম্ভব দাদা। আজ যে তিরিশ টাকার কেরাণী, কাল সে ক্রাইস্লার গাড়ী হাঁকায়।

অপূর্ব্ব বুঝতে পেরেছে। ক্রাইস্লার গাড়ী হাঁকিয়ে একদিন মল্লিকা এসেছিল তাদের হোটেলে। এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেছল, পাশে বসিয়ে !···

মল্লিকা কেন এসেছিলো ? অপূর্ব্বর রীতিমত রাগ হয় মল্লিকার উপর। এই সব ক্ষুধার্ত্ত চোখের সামনে না এলে কি চলত না মল্লিকার !

চোখে মুখে জল দিতে দিতে অপূর্ব্ব ভাবলে ; না, মল্লিকার কিছু দোষ নেই। অপূর্ব্বর সঙ্গে ফোনে তার ঝগড়া হয়ে গেছল। তাই ত মল্লিকা ছুটে এসেছিল পরক্ষণেই। মল্লিকা যে সত্যিই তাকে ভালবাসে। আচ্ছা, মল্লিকা কেন তাকে ভালবাসে ? অপূর্ব্ব কিছু ভেবে পায় না। সে কেরাণী, তিরিশটাকার কেরাণী। এই ত তার আর্থিক যোগ্যতা। কিন্তু মল্লিকা সত্যিই তাকে ভালবাসে। মল্লিকা ছাড়া অন্য কোনও মেয়ের কথা ভাবতে পারে না অপূর্ব্ব।

* * * *

দেবদারু গাছের নীচে দুপুর ঘন হয়ে এসেছে। হাওয়া অচঞ্চল। দূরে পথের উপর চলমান মেঘের ছায়া পড়েছে।

অপূর্ব্ব আস্তে আস্তে মল্লিকার একখানি হাত আপন হাতে টেনে নিলে।

মল্লিকা উত্তর দিলে না, চোখ তুলে তাকালে অপূর্ব্বর চোখে। তারপর চুপ করে বসে রইল।

অপূর্ব্ব বলে, "কেন—কেন ? কেন তুমি আমায় ভালবাসলে মল্লিকা ? রূপ, ঐশ্বর্য্য, প্রতিপত্তি কিছুই ত আমার নেই।"

নেই ? মল্লিকা প্রতিধ্বনি করলে। না থাকুগে, আমার দরকার নেই।

কিছুক্ষণ চুপ-চাপ। তারা চেয়ে আছে দূর আকাশের পানে। দেবদারু গাছে হাওয়া ছুটেছে। অপূর্ব্বর মনে হয়, কারা যেন নিশ্বাস ফেলছে অত্যাচারিত উৎপীড়িতের দল দীর্ঘশ্বাসে আকাশ-বাতাস মথিত করে তুলছে। মুক্তি, মুক্তি চাই।

এতক্ষণে মল্লিকা কথা কইলে : চুপ করে কি ভাবছ অপূর্ব্ব ?

অপূর্ব্ব বললে, ভাবছিলাম অনেক কথা।

"অপূর্ব্ব···" মল্লিকা রুদ্ধস্বরে বললে, "সবই তোমার ভাবনায় স্থান পেল, কিন্তু আমিই রইলাম পিছনে পড়ে, সেই ভাল আমার—"

বাধা দিয়ে অপূর্ব্ব বললে, কেন—কেন ও-কথা বলছ মল্লিকা। তুমি ত জান, তুমি আমার সব—

মল্লিকা সজল চক্ষে অপূর্ব্বর বুকে মাথা রাখলে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো।—

রাত দশটায় হোটেলে ফিরে অপূর্ব্ব তক্তপোষের উপর সটান লম্বা হয়ে পড়ল। না, মল্লিকা সত্যিই ছেলেমানুষ। বেচারা মল্লিকা! শুয়ে শুয়ে অপূর্ব্ব ভাবতে লাগল। ওর মন বড় সুকুমার। অপূর্ব্ব নিজের মত করে গড়ে নেবে মল্লিকাকে। তার পর?

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলে অপূর্ব্ব। সে যেন স্বদেশীদের দলে যোগ দিয়েছে। দেখলে, মল্লিকা তার পাশে বসে কাঁদছে। কেঁদে কেঁদে বলছে, বাইরে পুলিশ দাঁড়িয়ে। তোমায় ওরা ধরে নিয়ে যাবে। ধরে নিয়ে গিয়ে, জেলে পূরে রাখবে। কত বছর কে জানে! ততদিন আমি কি করে বেঁচে থাকব। বলো, ততদিন আমার কেমন করে কাটবে।···

তারপর কোথায় যেন কি একটা গণ্ডগোল হয়ে গেল। অপূর্ব্ব ঠিক বুঝতে পারল না। একদিন সকালবেলা সানাইএর করুণ সুরে ঘুম ভেঙ্গে গেল অপূর্ব্বর। কোথায় যেন বিয়ে।

ডাকপিয়ন এসে লাল খামের চিঠি দিয়ে গেল। আনমনে চিঠির উপর চোখ বুলাতে বুলাতে, চমকে উঠল অপূর্ব্ব। মল্লিকার বিয়ে। তাদের অফিসের বড়বাবুর ছেলের সঙ্গে। ছেলেটা দিন কয়েক হল বিলেত থেকে ফিরেছে। ছেলেটি বড় ভাল। যেমন দেখতে শুনতে, তেমনি কথাবার্ত্তায়। মিষ্টি তার ব্যবহার। মল্লিকা সুখী হবে নিশ্চয়ই। মল্লিকা সুখী হয়েছে শুনে অপূর্ব্ব কারা-প্রাচীরের অন্তরালে থেকেও মল্লিকার সুখে সুখী হবে। মল্লিকাকে যে সে বড় ভালবাসে।

* * * * *

চাকরের ডাকাডাকিতে অপূর্ব্বর ঘুম ভেঙ্গে গেল। এ কি! বেলা সাড়ে দশটা! রুমমেটের স্নানাহার হয়ে গেছে কখন। অপূর্ব্ব উঠে বসল আস্তে আস্তে ঘুমের জড়তা কাটিয়ে। এতক্ষণ কি ছাইপাঁশ আবোল তাবোল সে ভাবছিলো?

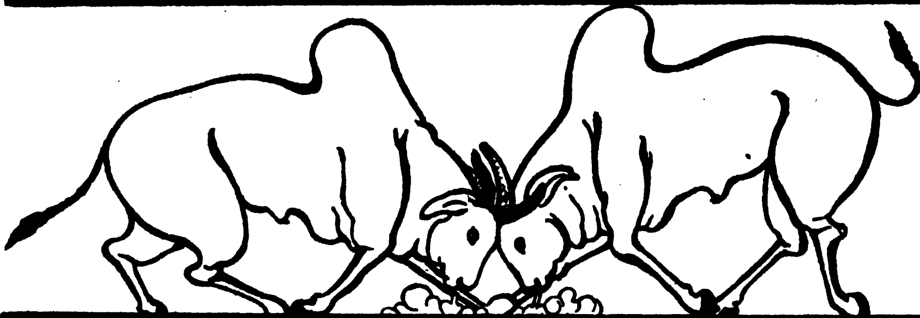


সমর্পণ

শ্রীঅরুণা সিংহ

তোমার দ্বারে আসি যখন একা
কোন ছলেতেই পাইনে তোমার দেখা।
বুঝতে আমি পারি না তাই তোমায় চিনি কিনা
আমার মনের মৌন গোপন বীণা
যে সুর বাজায় নীরব ভাষায়—ঝঙ্কারিয়া তারে
বলতে নাহি পারে
কী যেন চায় তাহার বলিবার
খোঁজ মেলানো ভার—
তবুও আসি অরুণরাঙা প্রাতে
কখন আসি ধূসর সন্ধ্যা রাতে।
অনেক ফুলে ভরিয়ে আনি ডালি
নেত্র ভরি প্রতীক্ষা দীপ জ্বালি।
তবুও হেরি তোমার মুখের হাসি
তেমনি অটুট অমনি স'রে আসি—
নিঃশ্বসিয়া—একলা ব'সে ভাবি
কী আছে তোর কিসের এত দাবী?
ওরে আমার মন
আনতে পারো বিপুল কোন ধন
পাষাণ যেথা পরশমণি ছুঁয়ে
ধরার পরে নামবে আঁখি ধুয়ে—
বারেক আমার ক্লান্ত ললাট 'পরে
রাখবে পরশ মুগ্ধ দ্বিধার ভরে—
বলবে মোরে বিস্ময়েরই সুরে—
"আনলে কিসে—কোন মহাদেশ ঘুরে
অতুল এমন পরশমণিখানি
কিসের লাগি' আমায় দিলে আনি?"
আমি তারে বলবনাতো কিছু—
চকিতে মোর নয়ন হবে নীচু—
অশ্রু-সাগর শেষের খেয়া কূলে
হৃদয় তরী উঠবে সুখে দুলে

স্তব্ধ হ'য়ে রইবে সারা প্রাণ
মূক ভাষাতেই বলবে "তোমায় দান
করব ভেবেই সাত সাগরের পারে—
এমন ক'রে খুঁজেছিলাম তারে
নিয়ে আমায় করলে তুমি ধনী
গভীর মনোব্যথার পরশমণি!"
এই কথাটি ব'লে
একটি প্রণাম পড়বে ঝরে তোমার পায়ের তলে
ভাবব ব'সে ঘুমহারানো চোখে
বিজন রাতে—প্রাণের সুরলোকে
গানটি আমার ঠিক সুরেতেই আজি
প্রকাশ পেয়ে উঠলো বুঝি বাজি'।



রূপকথা

সমুদ্ধ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য

বুধবার রাত্রি। বসিবার ঘর।

রাত্রি গভীর। থিয়েটার হইতে সকলে ফিরিবার সময় হইয়াছে। যবনিকা যখন উঠিল, ঘরে কেহ নাই। আলোগুলা নিভানো, ঘর প্রায় অন্ধকার। শুধু টেবিলে একটি মাত্র টেব্‌ল ল্যাম্প জ্বলিতেছে।

[হেমজার প্রবেশ]

মিনিটখানেক কাটে, তারপর হেমজা ঘরে আসে। তাহার হাতে ছোট ট্রেতে কয়েক গ্লাস লেমোনেড্‌—থিয়েটার হইতে ফিরিয়া যদি কাহারও দরকার হয় তাহার আগাম ব্যবস্থা। ট্রেটা টেবিলে রাখিয়া সে একবার ঘরের চারদিক লক্ষ্য করিয়া দেখে, তারপর প্রয়োজন না থাকিলেও ঘরের সাজসজ্জা এখানে সেখানে একটু ঝাড়ে গোছায়—এটা নিছক এই গৃহগুলির প্রতি তাহার মায়ার নিদর্শন। এইরূপে মিনিট দুই কাটিবার পর হঠাৎ বাহিরের দরজায় ঘণ্টা বাজিয়া উঠে—ঝন্‌ঝন্‌ ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া সেটা ক্রমাগত বাজিতেই থাকে।

হেমজা। (শব্দটা লক্ষ্য করে, আপনমনে বলে) এ ঠিক বুলি। (তারপর তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যায়—দ্বারের বাহির হইতে তাহার কণ্ঠ শোনা যায়) যাচ্ছি, যাচ্ছি বাবা, একটু সবুর করো।

[হেমজার প্রস্থান

তারপর বাহিরের দরজা খুলিবার শব্দ আসে, সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা থামিয়া যায়। ঘরের বাহির হইতে হেমজা ও বুলির কথা শোনা যায়, কথা বলিতে বলিতে তাহারা এই ঘরের দিকেই আসিতেছে।

হেমজা। (দূরে) ঘণ্টা শুনেই বুঝেছি তুমি ছাড়া আর কেউ নয়। আর সবাই কোথা গেল ?

বুলি। (দূরে) সিঁড়িতে। লিফ্‌ট্‌ আবার খারাপ হ'য়ে গেল। সবাই মিলে হেঁইয়ো-জোয়ান্‌ করে দিদিমাকে টেনে তুল্‌ছে।

[হেমজা ও বুলির প্রবেশ]

হেমজা। (প্রবেশ করিতে করিতে) নাঃ এ লিফ্‌ট্‌ও যা হয়েছে। বছরে একটি দিন বেচারী একটু বাড়ির বার হয়েছেন, আর আজই ঠিক সময় বুঝে সে বিগড়ে বস্‌ল। (সুইচ টিপিয়া সে ঘরের সকল আলো জ্বালিয়া দেয়, তারপর যাইয়া টেবিল ল্যাম্পটা নিভাইয়া দেয়)

তাহার পিছন পিছন বুলি প্রবেশ করে। তাহার পোষাকি ফ্রক ও তাহার উপরে গরম ক্লোক পরা, তাহাকে এই পরিচ্ছদে চমৎকার দেখাইতেছে। ঘরে ঢুকিয়া সে ক্লোক খুলিয়া ফেলে, তখন দেখা যায় তাহার হাতে প্রকাণ্ড এক বাক্‌স চকোলেট।

বুলি। (চকোলেটের বাকস দেখাইয়া) এই ছাখো।

হেমজা। বাবা, কতবড় এক বাক্‌স! মা কিনে দিলে বুঝি ?

বুলি। (সে ইতিমধ্যে বাক্‌স খুলিতে লাগিয়া গিয়েছে) না, মিঃ চৌধুরী। (বাক্‌স খুলিয়া) তুমি খাবে ?

হেমজা। হ্যাঁ, আমি এখন রাত দুপুরে চকোলেট খেতে বসি। (বুলি কাছে আসে) বাঃ, সুন্দর চকোলেট্‌ তো।

বুলি। (উদারভাবে) এই দিককার সবগুলো তুমি নাও। এগুলো আমার ভালো লাগে না।

হেমজা। থাক থাক, তুমি খেলেই আমার হবে। (চেয়ারে বসে) তারপর কি কি হ'ল বলো শুনি। কি খেলে ?

বুলি। (চকোলেট মুখে পুরিয়া) ওঃ কত জিনিব। অত সব নামও জানিনে।

চকোলেটের বাক্স কোলে করিয়া বুলি গিয়া চেয়ারে বসে। চকোলেট দু একটা করিয়া খাইতে খাইতে গল্প করে—

হেমজা। তবু শুনি।

বুলি। (খাইতে খাইতে) মাছ খেলাম চার রকমের। একটা বিলিতি স্যামন—টিনে ভরা হয়ে আসে।

হেমজা। এ ম্যা—সেই শুট্‌কি মাছ খেয়ে এলে নাকি তোমরা।

বুলি। আমি তো খেলাম। বেশ কেমন বেলে বেলে লাগ্‌ল খেতে। আরেকটা কি-যেন মাছ, তার ভেতরে চমৎকার কতকগুলো পুর দিয়ে ভাজা।

হেমজা। বুঝেছি। তারপর?

বুলি। তারপর মাটন চপ, গ্র্যামফেড। সেটা তেমন কিছু নয়—সেটা এম্‌নি খেয়ে গেলাম। তারপরে বালিহাঁস রোষ্ট—কী চমৎকার খেতে। জানো, আমাদের পাশের টেবিলের লোকরা ব্যাং খাচ্ছিল। আমি ভাবলাম আমিও একটু খেয়ে দেখব, তা দিদিটা এমন এক চিম্‌টি কেটে দিলে! (বাহুতে হাত বুলায়)।

হেমজা। হ্যাঁ, ব্যাং না খেলে হবে কেন। ভদ্রলোকের সামনে আবার কোন হ্যাংলামি করো নি তো?

বুলি। মোটেই না।

হেমজা। তবু ভাল। থিয়েটার কেমন দেখ্‌লে?

বুলি। (টেক্কা তুরুপ করে)—হুঁহুঁ আমরা বক্‌সে ব'সে দেখ্‌লাম।

হেমজা। (মুগ্ধ) সত্যি! সব ভাল ক'রে দেখ্‌তে পেয়েছিলে? লোকে যে বলে বক্‌সে থেকে একটা দিক চোখে পড়েনা?

বুলি। দিদি আর আমি আর দিদিমা সমস্ত দেখ্‌তে পেয়েছি। খালি একটুখানি ঝুঁকে বস্‌তে হয়। মা আর মিঃ চৌধুরী তো পেছনে ব'সে ব'সে গল্পই কর্‌ল সারাক্ষণ।

বাহির হইতে লোকজনের যাতায়াতের শব্দ আসে—সকলে ঘরের পাশ দিয়া ফ্ল্যাটের ভিতর-বাড়িতে চলিয়া গেল—বেশ বোঝা যায়। হেমজা গল্পের মধ্যেও কান খাড়া করিয়া রাখিয়াছিল, সে ইহাদের আগমন জানিয়া সতর্ক হইয়া উঠে তারপর তাহারা ভিতরে চলিয়া গিয়াছে বুঝিয়া, ধীরে সুস্থে আরেকটু কথা বলিয়া প্রস্থান করে—

হেমজা। (কান পাতিয়া) ঐ যে সব এসে গেল।...আর দ্যাখো তো কাণ্ড—এই রাতে তিনতলা সিঁড়ি ভেঙে ওঠা। ভদ্রলোকই বা কি মনে করছেন। তাঁর হ'ল বড়লোকের মত থাকা অভ্যেস।

বুলি। আমরা এর চাইতে একটা ঢের ভাল বাড়িতে থাক্‌তাম তো বেশ হ'ত।

হেমজা। ও কথা বোলো না। বাড়ি এটাই বা খারাপ হ'ল কিসে। ফি মাসে কতগুলো ক'রে টাকা তোমার মা গুণে দেয় এর জন্যে তা জানো?

বুলি। (বলিয়া চলে) ছাই। একটা খুব ভাল লিফ্‌ট আর একটা গুর্খা দরোয়ানওলা বাড়ি—ঠিক মণি মল্লিকদের মত।

হেমজা। তা কে জানে একদিন অম্‌নি বাড়ি তোমাদেরও হ'তে পারে। হয়তো তার বেশিদিন দেরিও নেই।

বুলি। কি ক'রে হবে শুনি। এক যদি আমার বা দিদির একটা খুব মস্ত বড়লোকের সঙ্গে বিয়ে হয়। সে এখনও অনেক বচ্ছর বাকি।

হেমজা। (গূঢ় রহস্যের আঁচ দিয়া) তোমরা দু'জন ছাড়া আর কারু দরুনও হ'তে পারে।

বুলি। (ব্যগ্র হইয়া উঠে) কি ক'রে জান্‌লে? ও, তুমি আবার গুণে দেখ্‌ছিলে বুঝি তাস দিয়ে দিয়ে?

হেমজা। ভাল মনে করেছ। (উঠিয়া) যাই দেখি গে দিদিমার দশা কি হ'ল। বুড়ো মানুষ তায় খোঁড়া পা নিয়ে—নাকালের একশেষ। (বলিতে বলিতে বাহির হইয়া যায়)

[হেমজার প্রস্থান

দ্বারের বাহির হইতে কথাবার্তার শব্দ আসে, হেমজার সহিত রেণুর দেখা হইয়াছে। বুলি আরেকটা চকোলেট মুখে পুরিয়া ফ্রকের স্কার্টে আঙুল মোছে, স্বভাব বশে। তারপর তাহার চৈতন্য হয়, এটা নিত্যব্যবহৃত শাদা ফ্রক নয়। তাড়াতাড়ি ফ্রকের পকেট হইতে ছোট্ট

রুমাল বাহির করিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া দাগ তুলিতে থাকে। এই বৃহৎ কাণ্ডটা শেষ হইতে হইতে রেণু ঘরে আসে।

[রেণুর প্রবেশ]

রেণু। (তাহাকে দেখিয়া) এ কি, এখনও ঘুমোস্ নি যে?

বুলি। ঘুম পাচ্ছে না।

রেণু। পথে তো সারাক্ষণ ঝিমুচ্ছিলি ব'সে ব'সে। (চেয়ারে বসে)

বুলি। এখন সেরে গেছে।

রেণু। এখন না শুলে ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্‌বে নাকি। কাল থেকে সকালে ইস্কুল, মনে নেই? (বুলি লুব্ধদৃষ্টিতে চকোলেটের বাক্‌সের দিকে তাকায়) আর এখন খাস্‌নে চকোলেট্। অসুখ করবে।

বুলি। আর এই একটা মোটে। (চকোলেট মুখে পুরিয়া খুব করুণ মুখে বাক্স বন্ধ করে) তারপর মস্ত এক গ্লাস জল খেয়ে ফেল্‌লেই হবে। (একটু থামিয়া) ওঁকে আমার ভারি ভাল লেগেছে কিন্তু। তোর লাগে নি?

রেণু। কাকে?

বুলি। আহা জানেন না যেন। মিঃ চৌধুরীকে।

রেণু। (সোৎসাহে) হ্যাঁ, ভারি চমৎকার লোক।

বুলি। আর কী মজা করতে পারে, না? হাস্‌লে এমন সুন্দর দেখায়—একটুও বুড়োমানুষের মত নয়।

রেণু। বুড়োমানুষ নাকি।

বুলি। বা, কানের কাছে পাকা চুল দেখ্‌লাম যে।

[জ্যোতির প্রবেশ]

কথা শেষ না হইতেই হঠাৎ দরজা খুলিয়া জ্যোতি প্রবেশ করে। একটা সুন্দর শাড়ি পরনে, তাহাকে চমৎকার দেখাইতেছে।

জ্যোতি। (হাসিমুখে) কি হচ্ছে ব'সে ব'সে। (ঘরের মধ্যে আসে) কেমন লাগ্‌ল সব? (সেটিতে গিয়া বসে)

বুলি। ভীষণ ভীষণ চমৎকার।

রেণু। (মার কাছে যায়, দু'জনের শুধু দেহের নয়, মনেরও সান্নিধ্য ঘটে) আজকের মত চমৎকার রাত আমার জীবনে আর কখনও হয়নি।

জ্যোতি। (প্রীত হইয়া; তাহার চুল গুছাইয়া দেয়) এম্‌নি রাত তোর জীবনে একশোবার ঘুরে ঘুরে আসুক।

বুলি। মিঃ চৌধুরী চলে গেছে, মা?

জ্যোতি। ছি, গেছে নয়, গেছেন বল্‌তে হয়। না, যান নি।

বুলি। তবে? বাথরুমে গেছেন?

জ্যোতি। হ্যাঁ।

বুলি। ভারি সুন্দর মানুষ, না? এমন মজার লোক আমার জন্মে আমি আর একজনও দেখি নি।

রেণু ও জ্যোতি তাহার এই গম্ভীর উক্তি শুনিয়া চোখ টেপাটেপি করিয়া নিঃশব্দে তাহার অলক্ষ্যে একটু হাসিয়া নেয়।

জ্যোতি। তোদের ওঁকে ভালো লেগেছে তাহলে?

রেণু। ওরকম লোককে কার না ভালো লাগে। (মার গায়ের মধ্যে ঘেঁষিয়া) বা সুন্দর গন্ধ তো। কি সেণ্ট মেখেছ?

জ্যোতি। 'কোটী'। (বুলি প্রকাণ্ড একটা হাই তোলে) এই, মা শুতে চলে গেছে। তুইও যা এবার ঘুমো গে। কাল আবার সকালে ইস্কুল না?

বুলি। (পরম অনিচ্ছাভরে, উঠিয়া) যাচ্ছি।

জ্যোতি। (আসিয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া) যাও, গুড্‌নাইট্।

বুলি। গুড্‌নাইট্। দিদি আয়।

রেণু। যা, আমি আস্‌ছি এখুনি।

বুলি। (দ্বারের দিকে অগ্রসর হয়, ঘুমে তাহার সর্বাঙ্গ ভাঙিয়া আসিতেছে) উনি আমাদের বাড়িতে খুব বেশি বেশি ক'রে এলে ভারি মজা হয় কিন্তু। (হাই তুলিতে তুলিতে চলিয়া যায়।)

[বুলির প্রস্থান]

জ্যোতি। (ফিরিয়া আসিয়া বসে। বুলির কথাটায় সে না হাসিয়াও পারে না, কিন্তু পরের কথাটা সত্য করিয়াই বলে—) বুলিটাকে একটা কড়া দেখে বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দিতে হবে। তোমরা সবাই ওকে বড্ড বেশি আদর দিচ্ছ।

রেণু। বা, আর তুমি নিজে ওকে কম আদর দাও বুঝি?

জ্যোতি। আমার পক্ষে কড়া হ'য়ে তোদের শাসন করা একটু শক্ত। এমনিই তো তোদের কাছে প্রায় থাকতেই পাইনে।

রেণু। (মায়ের দিকে একদৃষ্টে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া) তোমাকে আজ ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।

জ্যোতি। কি রকম?

রেণু। হ্যাঁ। দেখে একটুও 'মা' ব'লে মনে হয় না।

জ্যোতি। (মৃদু হাসিয়া) কেন, 'মা'দের দেখ্‌তে কেমন হয়?

রেণু। কেমন যেন ভারিক্কি আর গম্ভীর—গিন্নী-গিন্নী মতন।

জ্যোতি। সেটা তারা 'মা' ব'লেই নয়। ওটা হয় ভাতকাপড়ের চিন্তায়।

রেণু। (দরদের সুরে) তা জানি। ভাল কথা, তোমাকে আমার একটা কথা বল্‌বার আছে। যখন আমরা দু'জনে একলা থাক্‌ব, কেমন?

জ্যোতি। এখন বল্‌লেই হয়।

রেণু। না, আজ নয়। কাল। যখন সত্যিসত্যি মন খুলে ব'সে কথা বলা যাবে, তখন।

জ্যোতি। একটু Serious রকম ম'নে হচ্ছে। কথাটা কি? কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা কর্‌ছিস্ না তো?

রেণু। না, দুশ্চিন্তা আর কি নিয়ে থাক্‌বে, তুমি তো এখন সেরেই গেছ। (মাকে হিংস্রভাবে জড়াইয়া ধরিয়া) আর কখনও তোমাকে অসুখে পড়্‌তে দেব না আমি—না, কক্ষনো না।

জ্যোতি। (মেয়ের এই আত্মপ্রকাশে তাহার কণ্ঠে অশ্রু জমিয়া উঠে, চেষ্টা করিয়া হাল্‌কা সুরে বলে) এবার গিন্নীগিন্নী কে হচ্ছে, শুঁহ্‌?

রেণু। বা রে, এখনও হব না কি। আমি কি আজও কচি খুকি আছি?

জ্যোতি। তাড়াতাড়ি ক'রে বুড়ো হ'য়ে যাবার চেষ্টা করিস্ নে। আমি চাই যেন তোরা আরও অনেকদিন ধ'রে এমনি কচিই থাক্‌তে পারি।

রেণু। কিন্তু তোমার দিকেও চাইবার লোক একটা থাকা দরকার তো।

জ্যোতি। (একমুহূর্ত স্তব্ধ থাকে, তারপর কথার মোড় ঘুরাইয়া নিতে চায়, একটু হাসিয়া) জন্মদিন ভাল কাট্‌ল তো আজ? বেশ enjoy কর্‌লি?

রেণু। হ্যাঁ, তুমি আস্‌বার পর থেকে। তার আগে পর্যন্ত আমার এমন ভাবনা হচ্ছিল। অবশ্য তাই ব'লেই পরে আবার বেশি ভাল লেগেছে। যে ভাল জিনিষটা আচম্‌কা এসে পড়ে সেটা কি রকম অনেক বেশি মিষ্টি লাগে, তাই না?

জ্যোতি। ওটা দুদিকেই সত্যি। যে খারাপ জিনিষটা আচম্‌কা এসে পড়ে সেটাও আবার অনেক বেশি বিশ্রী লাগে।

রেণু। আমার সারাদিন ধ'রে এমন লাগছিল। পাঁচদিন ধ'রে একটা চিঠি নেই—আমার কেবলই মনে হচ্ছিল—(শিহরিয়া উঠে) যা সব ছাইভস্ম মনে হচ্ছিল সে এখন ভাব্‌তেও ভয় করে। তারপর হঠাৎ তুমি এসে পড়্‌লে। আর এত সুন্দর চেহারা নিয়ে—এমন সুন্দর আর সুস্থ তোমাকে আমি আর কখনও দেখিনি।

জ্যোতি। আমারও মনে হচ্ছে এমন সুস্থ আমি যেন কত কত কাল থাকিনি। রীতিমত খানিক ছোটাছুটি লাফালাফি ক'রে বেড়াতে ইচ্ছে কর্‌ছে—তোর বয়সে যেমন করতাম। (হঠাৎ মনে পড়িয়া) ও, ভাল কথা, আমার বাক্‌স টাক্‌স সব এসে গেছে। তোর প্রেজেন্ট আছে তোর বিছনার ওপর—দেখবি গিয়ে।

রেণু। (উৎফুল্ল) আচ্ছা।

জ্যোতি। কি প্রেজেন্ট জানিস তো?

রেণু। না। কি?

জ্যোতি। যা আস্‌ছে বছর কিনে দেব ব'লে টাকা জমাচ্ছিলাম।

রেণু। (এতবড় সুসংবাদ তাহার প্রায় বিশ্বাস হয় না) ফার্‌ কোট্‌?

জ্যোতি। ঠিক তাই, ফার্‌ কোট্‌।

রেণু। (তাহার চক্ষু উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে) কিন্তু এই সময় অত টাকা তুমি......

জ্যোতি। আঃ, সে তোকে ভাবতে হবে না তো।

রেণু। এই কোটটাকে আমি যদ্দিন বাঁচব কক্ষনো কাছছাড়া করব না। আজকের দিনটাকে মনে করিয়ে দেবে, ব'লে এটাকে সমস্ত সময় আমি সঙ্গে সঙ্গে করে রাখব।

জ্যোতি। কোট কি চিরকাল টিকে থাকবে নাকি।

রেণু। খুব থাকবে। প্রথমে লং-কোট ক'রে পরব—লং-কোট ত ?

জ্যোতি। হ্যাঁ।

রেণু। তারপরে ছেঁটে শর্ট কোট ক'রে পরব। তারপরে যখন আরও পুরোনো হ'য়ে যাবে তখন কেটে ছোটো জামা তৈরি করব। আর কাটাকুটি টুক্‌রোগুলো দিয়ে গলাবন্ধ আর দস্তানা ক'রব। তাইতেই আমার আশিবচ্ছর বয়স অবধি কেটে যাবে।

জ্যোতি। কিন্তু আমি-যে বল্‌লাম তোকে, একশো-বচ্ছর বেঁচে থাক্‌বি ?

রেণু। তাহলে তখন কাপড়গুলোকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে জামা কাপড়ের সঙ্গে সেঁটে নোব। সেগুলো তো আর কক্ষনো ছিঁড়্‌বে না। (মাকে জড়াইয়া ধরিয়া) আঃ, আমার এমন মজা লাগ্‌ছে ভাব্‌তে।

[জয়ন্তর প্রবেশ]

জয়ন্ত প্রবেশ করিয়া, ইঁহাদের দেখিয়া একটু থামিয়া দাঁড়ান।

জ্যোতি। (রেণুকে একহাতে জড়াইয়া রাখিয়াই, তাহার বাহুপাশ কিছুটা মুক্ত করিয়া) আসুন।

জয়ন্ত। (আগাইয়া আসেন) মিসেস সরকারের অবস্থা কি ? স্বর্গের সিঁড়ি ভেঙে একটু কাবু হ'য়েছেন তো ? (চেয়ারে বসেন)

জ্যোতি। হিমু তাঁকে সেঁক দিয়ে দিচ্ছে।

রেণু। ব্যথা হয় তো কাল হবে।

জয়ন্ত। বারোমাস ত্রিশদিন এমনি ক'রে কষ্ট পাওয়া—কী বিশ্রী ব্যাপার! এর চিকিৎসা কিছু নেই ?

জ্যোতি। কি জানি। করতে তো কম করা হয়নি আজ পর্যন্ত, কিছু ফল হ'ল না।

জয়ন্ত। আপনাদের ডাক্তার লোক কেমন ? বেশ পাকা expert ত ?

জ্যোতি। হ্যাঁ, ডাক্তার ভালই। আমার অসুখেও তিনিই দেখেছিলেন।

জয়ন্ত। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা হয় না ? ওঁর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতাম।

রেণু। আমাদের এখানে যদি বেশি আসেন তো তাঁর সঙ্গে দেখা হবেই।

জয়ন্ত। (তাঁহার চক্ষু তৎক্ষণাৎ জ্যোতির উপর গিয়া পড়ে) খুব আসেন নাকি এখানে ?

জ্যোতি। (তাঁহার চমক লক্ষ্য করিয়া, ঈষৎ হাসে) তিনি আমাদের অনেক দিনকার ডাক্তার, একজন বড় বন্ধুও। এদের দু'জনকেও পৃথিবীতে তিনিই এনেছেন।

রেণু। দিদিমার বন্ধু। তাঁর নাম ক'রে আমরা দিদিমাকে ক্ষেপাই।

জয়ন্ত। (আশ্বস্ত হইয়া) দিদিমাকে ?

জ্যোতি। দু'জনে একেবারে একবয়সী কিনা।

রেণু। দু'জনে ব'সে ব'সে গল্প করেন, পঞ্চাশ বচ্ছর আগেকার কথা নিয়ে।

জয়ন্ত। কিন্তু আপনাদের একজন আপ-টু-ডেট্‌ ডাক্তার রাখা উচিত। ইনি হয়তো লোক ভাল হ'তে পারেন, কিন্তু—

জ্যোতি। না, সে ভয় নেই। ডক্টর সেন বুড়ো-মানুষ হ'লেও 'সেকেলে' মোটেই নন্‌।

রেণু। আমি যাই এবারে, মা ?

জ্যোতি। ঘুম পাচ্ছে ?

রেণু। তার জন্যে নয়। আমি গিয়ে, সেইটে দেখিগে ? (ইঙ্গিতে ফার কোট্‌টা বুঝায়)

জ্যোতি। মিঃ চৌধুরী সেকথা জানেন।

রেণু। (তাহার মুখে চকিতে একটু হাসি ফুটিয়া উঠে—এই হাসি দিয়া সে জয়ন্তকে তাহার অন্তরঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়া নেয়) জানেন ?

জ্যোতি। (জয়ন্তকে) ফার কোট্‌টা। (রেণুকে) সেটা উনিই পছন্দ ক'রে কিনেছেন।

রেণু। (কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে) থ্যাঙ্ক ইউ। আমার জন্যে আবার কষ্ট করলেন কেন!

জয়ন্ত। উহুঁ, থ্যাঙ্ক দেবার পালাটা আমার।

তোমার জামা কিনে দিতে পেয়ে আমি ভারি খুসি হয়েছি। এখন সেটা তোমার পছন্দ হ'লে আরও খুসি হব।

রেণু। পছন্দ নিশ্চয়ই হবে।

জয়ন্ত। (হাসিয়া) না দেখেই?

রেণু। হ্যাঁ। আজকের দিনটা আমার এমন ভাল কাট্‌ল, ভাল লাগবে না এমন কিছু আজ হ'তেই পারে না। আমার। একটু আগে মাকেও আমি তাই বল্‌ছিলাম। আজকের মত চমৎকার দিন আমার জীবনে আর হয়নি। এই দিনটা আমার চিরকাল মনে থাক্‌বে।

জয়ন্ত। এম্‌নি দিন তোমার বার বার ক'রে ফিরে আসুক।

রেণু। (হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া এই আশীর্বাদ মানিয়া নেয়) আপনি আজ আমাদের জন্যে যত কষ্ট কর্‌লেন তাও আমরা কখনও ভুলব না।

জয়ন্ত। আজকের কথা আমিও শিগগির ভুল্‌তে পার্‌ব ব'লে মনে হচ্ছে না। এ রকম কষ্ট কর্‌বার সুযোগ আমি খুব বেশি পাইনে। আচ্ছা, যাও ছাখো গে এবার কোট পছন্দ হ'ল কিনা। কেমন হ'ল আমাদের এসে ব'লে যাবে তো?

রেণু। হ্যাঁ। (জ্যোতিকে) গুড্‌নাইট্, মা।

জ্যোতি। (তাহার মাথাটা দুই হাতের মধ্যে লইয়া ললাটে ওষ্ঠ স্পর্শ করে) গুড্‌নাইট্।

রেণু। (শিশুর লাজুক সুন্দর হাসির ভিতর দিয়া, জয়ন্তকে) গুড্‌নাইট্।

জয়ন্ত। গুড্‌নাইট্।

জয়ন্ত উঠিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া ধরেন, রেণু বাহির হইয়া যাইতে যাইতে দুজনে পরস্পরের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বিদায় জানায়।

রেণু। (দরজা হইতে) মাকে আর বেশিক্ষণ জাগিয়ে রাখবেন না কিন্তু।

জয়ন্ত। না না।

জ্যোতি। আজ একটু জাগ্‌লেও কিছু হবে না। কাল সকালে তো আর কাজে যাব না আমি। আরও একটা দিন ভদ্রলোক হ'য়ে থাক্‌ব ভেবেছি।

রেণু। আচ্ছা।

[রেণুর প্রস্থান

জয়ন্ত একমুহূর্ত অপেক্ষা করেন, তারপর দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসেন, চেয়ারে বসেন। হঠাৎ দু'জনের মধ্যে একটু যেন nervous tension-এর ছায়া ঘনাইয়া আসে।

জয়ন্ত। চমৎকার বাচ্ছা।

জ্যোতি। বাচ্ছা আর কই, দেখ্‌তে দেখ্‌তে বড় হ'য়ে উঠ্‌ল। সেও আমার এক ভাবনা।

জয়ন্ত। আপনার ওপরে এর ভয়ানক টান আছে।

জ্যোতি। হ্যাঁ। এক এক সময় এমন করে যেন ওই আমার মা।

জয়ন্ত। সে তো ভাল কথা। আজকালকার যা দশা—ছেলেমেয়েরা বাপমার থেকে অনেক দূরে দূরেই থেকে যায়।

জ্যোতি। পরিবার হিসেবে আমরা বোধ হয় অনেকের চাইতেই বেশি ঘনিষ্ঠ হ'য়ে থেকে এসেছি। ওরা তো বোর্ডিং'এ গিয়েও থাকেনি কখনও—বাড়ি থেকেই ইস্কুল করে। খুব সাদাসিধে চালচলন ছাড়া আমাদের চল্‌বার কথা নয়, বুঝতেই পারেন।

জয়ন্ত। কিন্তু সাদাসিধে হ'লেও ওদের চালচলনে কোন ত্রুটি নেই। আজ সারাক্ষণ ধ'রে তো দেখ্‌লাম, দেখে আমি ভারি খুসি হয়েছি।

জ্যোতি। পয়সা ঢালবার সঙ্গতি আমার নেই, কিন্তু তবু ওদের সুশিক্ষা দিতে আমার নিজের সাধ্যে যতদূর কুলোয় আমি ত্রুটি করিনি। হয়তো আমার সেদিক থেকে বাড়াবাড়িই করা হয়েছে—সবরকম excitement থেকে ওদেরকে আমি দূরে সরিয়ে রাখ্‌তে চেয়েছি। এখন মনে হচ্ছে অতটা কড়াকড়ি না কর্‌লেই ভাল হ'ত। বুলিটা হয়তো সেইজন্যেই একটু হ্যাংলা হ'য়ে উঠ্‌ছে।

জয়ন্ত। না না, হ্যাংলা কোথায়। ও বয়সের বাচ্ছা, একটু ছট্‌ফটে হবে না? একটুখানি অমনি ধারা না হলেই বরং দেখ্‌তে অস্বাভাবিক বুড়োবুড়ো লাগে। কিছুক্ষণ দুইজনেই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকেন। ঘরের

মধ্যে শুধু ঘড়ির একটানা টিকটিক শব্দ শোনা যায়। খানিক পরে জয়ন্ত হঠাৎ নিচু গলায় ডাকেন—

জয়ন্ত। মিসেস দত্ত।

জ্যোতি (এই মুহূর্তটির জন্য তাহার মনে আশঙ্কা ছিল) কি।

জয়ন্ত। আপনার আজকে জবাব দেবার কথা ছিল। মনে আছে?

জ্যোতি। হ্যাঁ।

জয়ন্ত। তবে? (জ্যোতির উত্তরের জন্য অপেক্ষা করেন, সে নীরব নিস্তব্ধ) আমি তার জন্যে আজ সারাদিন ধ'রে অপেক্ষা করছি।

জ্যোতি। (ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া, শান্তস্বরে) কিন্তু সে হয় না।

জয়ন্ত। (স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখে চাহিয়া) হয় না? কেন?

জ্যোতি। আপনি বুঝবেন না।

জয়ন্ত। বুঝ্‌ব না? কাল রাতে যত কথা আমাদের হয়েছে, তার পরেও বললেন এ কথা?

জ্যোতি। কাল আমরা পুরীতে ছিলাম।

জয়ন্ত। তাতে কি হ'ল?

জ্যোতি। সবই হ'ল। (জোর করিয়া গলা হাল্‌কা করিতে চায়) কাল তখন ছিলাম সমুদ্রের ধারে, চাঁদের আলোয়। ওপরে ছিল নীল আকাশ, সাম্‌নে ছিল নীল জল, আর চোখে ছিল সেই আলোর ঘোর।

জয়ন্ত। আপনাকে অত খুসি ক'রে তুলেছিল কাল, শুধু সেই আলো?

জ্যোতি। আজ আমরা আছি কল্‌কাতায়—আবার বাস্তব জীবনের মধ্যে। আকাশে বাদ্‌লা আর ধোঁওয়া, চোখে কড়া ইলেকট্রিকের আলো।

জয়ন্ত। (তখনও তাহার মুখেই চাহিয়া আছেন) বাদ্‌লা আর ধোঁওয়া? আমি তো দেখতে পাচ্ছিনে।

জ্যোতি। চোখ খুলে চান।

জয়ন্ত। আর আপনিও আপনার কথা রাখুন।

জ্যোতি। আমার কথা? (একটু স্তব্ধ থাকিয়া) আমার কাছে আপনি কতখানি চাইছেন তা জানেন?

জয়ন্ত। জানি।

জ্যোতি। আপনি সত্যি সত্যি চান যে আমি আপনাকে বিয়ে করি?

জয়ন্ত। চাই।

জ্যোতি। (ম্লান হাসে) আমার পরিবারকে তো দেখ্‌লেন।

জয়ন্ত। চমৎকার পরিবার।

জ্যোতি। হ্যাঁ, কিন্তু এদের ভার নিতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। এদের ছেড়ে যেতে আমি পারিনে। সেই জন্যেই বলছিলাম আপনি যা বলছেন তা হয় না।

জয়ন্ত। কিন্তু এদের ছেড়ে যাবার কথা তো আমি বলিনি।

জ্যোতি। তার মানে?

জয়ন্ত। মানে আমি এদেরকে শুদ্ধ নিয়ে নিতে চাই। (জ্যোতি সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকে) আগে আমি এদের চিনতাম না। কিন্তু এখন বুঝেছি এরা ছাড়া আপনি অসম্পূর্ণ। আর এমন চমৎকার একটা পরিবারকে নিজের ক'রে নেবার লোভ আমি সাম্‌লাতে পারব না।

জ্যোতি। (একটু পরে) আমি যদি ইতরের মত আপনার এই কথাটাকে সত্যি ব'লে মনে ক'রে নিই তবে কি করবেন?

জয়ন্ত। (অতি সহজ আন্তরিক স্বরে) "যে ঈশ্বর মনুষ্যত্বকে সকল করুণা করেন" তাঁকে ধন্যবাদ দেব।

জ্যোতি। (তাঁহার আন্তরিকতা তাহাকে স্পর্শ করে, কিন্তু তবুও সে প্রতিবাদ করে) আপনি বুঝছেন না। এখনও আপনার মনে নেশার ঘোর রয়েছে—কালকের সমুদ্রের নেশা, আজকের মেঘের রাজ্যের রামধনুর নেশা।

জয়ন্ত। কিন্তু কাল সন্ধ্যায় আপনিও নিজেকে সুখী মনে করেছিলেন। সত্যি বলুন, কাল ছিলেন আপনি সুখী?

জ্যোতি। হ্যাঁ, ছিলাম।

জয়ন্ত। শুধু চাঁদের আলো আর নীল আকাশ নীল জলের মায়ায়?

জ্যোতি। সম্ভব। (জয়ন্তর মুখে ম্লানতা দেখিয়া) আরেকটু ছিলো, সেই আলোকে জলকে মন ভ'রে দেখতে কাল একজন সঙ্গী পেয়েছিলাম।

জয়ন্ত। শুধু তাই ব'লেই? সঙ্গী তো মানুষের দুর্লভ বস্তু নয়।

জ্যোতি। সে কথা ভুল। মেয়েদের পক্ষে মন খুলে মিশবার মত সঙ্গী মেলা সহজ নয়। মেয়ে বন্ধু যা এক আধজন থাকে তাদের কাছে সব কথা বলা যায় না, কারণ মেয়েরা বুদ্ধি দিয়ে লোককে বুঝতে চায় না।

জয়ন্ত। আত্মনিন্দা। কিন্তু মেয়ে বন্ধু যদি না-ই থাকে, পুরুষ বন্ধুও কি হতে পারে না?

জ্যোতি। না। আমাদের বয়সের পুরুষ যারা আছে তারা সাধারণত বিবাহিত হয়। আর তারা যখন আর কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আসে, তার গোড়ায় প্রায়ই থাকে তাদের নিজেদের পরিবারকে, স্ত্রীকে, ঠকানো।

জয়ন্ত। যদিই-বা তাই হয়, আপনার কি ক্ষতি?

জ্যোতি। আমি পারিনে। আমি সেই স্ত্রী হয়ে দেখেছি।

জয়ন্ত। (অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া) আপনি? কিন্তু আমি তো জানতাম আপনার বিবাহিত জীবন খুবই সুখের ছিল—একেবারে রোম্যান্সে ভরা।

জ্যোতি। কোথায় জানলেন?

জয়ন্ত। পুরীতেই, আমাদের hostessএর কাছে।

জ্যোতি। তার মানে, আপনি হেনার সঙ্গে আমার কথা নিয়ে আলোচনা করতেন?

জয়ন্ত। 'আলোচনা' করা বলতে যা বোঝায় তা ঠিক নয়। মানে হেনা আমার মনের ভাবটা আন্দাজ করেছিলেন।...রাগ করলেন?

জ্যোতি। না।

একটুক্ষণ দু'জনে স্তব্ধ হইয়া থাকে। তারপর—

জয়ন্ত। কিন্তু আমি ভারি দুঃখ পেলাম।

জ্যোতি। কেন?

জয়ন্ত। আপনার সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে এই একমাস ধ'রে আমি আপনার নানান বয়সের নানান অবস্থার ছবি মনে মনে এঁকে দেখেছি—কখনও শুনে কখনও কল্পনায়। জীবনের অন্তত ক'টা বছরও আপনার খুব সুখে কেটেছে, মনে করতে আমার বড় ভাল লাগত। সেইটে আপনার কথায় ভেঙে গেল।

জ্যোতি। চুপ করুন। আমার চোখে জল দেখলেই কি আপনার ভাল লাগবে?

জয়ন্ত। (শান্ত স্বরে) বেশ তো, চোখের জলই ফেলুন না একটু।

জ্যোতি। (ঈষৎ হাসে) সাহস তো কম নয় আপনার। এই আমাকে বলছিলেন আপনাকে বিয়ে করতে, এর মধ্যেই আবার কাঁদতেও বলছেন? বড্ড তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি?

জয়ন্ত। সে ঝুঁকি না হয় মেনেই নোব। কিন্তু হেনার কথা যদি ঠিক না হয়, আপনার জীবনের সত্যিকার ইতিহাস শুনতে চাইলে কি খুব বেশি অন্যায় করব? অবশ্য যদি বলতে বাধা না থাকে।

জ্যোতি। কিন্তু শুনে কি লাভ।

জয়ন্ত। না, শুনতেই চাই আমি। বলুন।

একটুক্ষণ নিস্তব্ধতা। জয়ন্ত প্রতীক্ষা করেন। অনেকক্ষণ পরে জ্যোতি ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া বলিতে আরম্ভ করে। বলে সে থামিয়া থামিয়া, যেন স্মৃতির গহন গুহা হইতে এই হিংস্রকায় সত্যগুলিকে সে বহুক্লেশে টানিয়া বাহির করিয়া লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রকাশ করিতেছে। জয়ন্ত একমনে শুনিতে শুনিতে মাঝে মাঝে কথা বলিয়া তাহাকে সচেতন করিয়া দেন।

জ্যোতি। বলছি। এসব কথা আমরা সাধারণত কাউকে বলিনে। আমার মেয়েদের আমি এ জানাতে চাইনি, তারা জানে আমাদের জীবন ছিল অবিচ্ছিন্ন সুখের। হেনার কাছে তাই আপনি ওকথা শুনেছেন।

জয়ন্ত। আমার কাছ থেকেও আর কেউ জানবে না বিশ্বেস করুন।

জ্যোতি। তা জানি। শুনুন। বিবাহিত জীবন আমার সুখের হয়নি। অবশ্য একেবারেই সুখ আমি পাইনি বললে মিথ্যে বলা হবে। প্রথম দিকে আমাদের মধ্যে রোম্যান্সও ছিল কম নয়। কিন্তু কোর্টিনে যুদ্ধ বাধতে আমার স্বামী সৈন্য হ'য়ে ফ্রান্সে চ'লে গেলেন। পরে না হ'য়ে সেই যুদ্ধে যদি তিনি মারা যেতেন, বোধ হয় আমার পক্ষে ভাল হ'ত। তাঁর স্মৃতি নিয়ে আমি বেঁচে থাকতে পারতাম।

যুদ্ধের সময় রোজ না খেয়ে দেয়ে কাগজ পড়েছি, আর পড়েছি তাঁর চিঠিগুলো। পড়্‌তে পড়্‌তে ভাব্‌তাম, যুদ্ধে তাঁর যদি চোট লাগে, বা অসুখ ক'রে বাড়ি ফিরে আসেন, আমি ভারি খুসি হব—সেবা যত্ন ক'রে তাঁকে সেরে তুলে দেখিয়ে দেব কি করে ভালোবাস্‌তে হয়। হ্যাঁ, এটা ছেলেমানুষি; কিন্তু তখন আমি তাই ভাব্‌তাম।

যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেল, তিনি ফিরে এলেন। আমাদের তখন অবস্থা ভয়ানক হ'য়ে উঠেছে। শ্বশুর মারা গেছেন, দেখবার লোকের অভাবে আমাদের কারবার ফেল হ'য়ে আমরা সর্বস্বান্ত হ'য়ে গেছি। তিনি ওখানে ব'সে চিন্তা কর্‌বেন ব'লে স্বামীকে আমি জানাইনি। আর তখন আমার বয়সই বা কি ছিল। ভাবতাম তিনি ফিরে এলেই আবার সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

জয়ন্ত। তারপর?

জ্যোতি। তারপর ফিরে এসে সুরু হ'ল লড়াই কারবার দেনার দায়ে শেষ হ'য়ে গেল। তখন সম্বল চাকরি করা, কিন্তু মন্দার বাজারে ভাল কাজ কে তাঁকে দেয়। সুপারিস কর্‌বার মুরুব্বিও কেউ নেই, তায় হিঁদুর দেশে ক্রিশ্চানরা এমনিই একটু জাতে ঠেলা। শেষে অনেক কষ্টে একটা সামান্য মাইনের চাকরি জুট্‌ল। পুরোনো বাড়ি ছেড়ে দিয়ে বেনেপুকুরের এক ছোট্ট ঘিঞ্জি ভাড়াটে বাড়িতে গিয়ে উঠ্‌লাম। আলো নেই, হাওয়া নেই, হাত পা মেলে থাকবার জায়গা পর্যন্ত নেই। সেইখানে রেণু হ'ল। (স্তব্ধ হইয়া যায়)।

জয়ন্ত। বলুন।

জ্যোতি। প্রথম থেকে কাকে তিনি বেশি ঘৃণা কর্‌তে সুরু কর্‌লেন জানিনে—ওই একরত্তি মাংসের ডেলাটাকে না আমাকে। আমি তখন একেবারে শয্যাশায়ী, কঙ্কাল হ'য়ে গেছি—তাঁকে টেনে সারাক্ষণ নিজের ক'রে রাখ্‌বার মত শক্তি তখন আমার ছিল না। তাঁকে আমি দোষ দিইনে, অমন ক'রে নির্জীব জীবন কাটাতে তিনি কোনদিনই পার্‌তেন না। আর তাঁকে টেনে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবার মত সুন্দর সুন্দর মেয়েরও অভাব হয়না কলকাতা শহরে। আমি তাদের নাম জানতাম না, কিন্তু তাদের কথা আন্দাজ ক'রে নিতে পার্‌তাম—মেয়ের মনে এ ঈর্ষা জন্ম থেকেই থাকে। আমাদের ঝগড়া হ'তে লাগ্‌ল। প্রথমে সামান্য খিটিমিটি, তারপর ক্রমেই বেশি খোলাখুলি ক'রে। আমি বুঝতাম এতে ক'রে তাঁকে আরও দূরেই ঠেলে দিচ্ছি, তবু আমার মনের সন্দেহ যেতে চাইত না—'তিনি কোথায় যাচ্ছেন' 'কোথায় ছিলেন' এ প্রশ্ন মনে উঠ্‌তই। তিনি আমাকে মিছে কৈফিয়ৎ দিতেন সেটাও ধরা পড়্‌তে লাগ্‌ল। আমাদের ঝগড়া আরও বাড়্‌ল। সে সময়টা আমার শুধু চোখের জলেই কেটেছে। তাই আপনাকে বল্‌ছিলাম বড্ড তাড়াতাড়ি সবগুলোই ক'রে ফেল্‌তে চাইছেন।

জয়ন্ত। Sorry, আমি জান্‌তাম না। তারপর?

জ্যোতি। ক্রমে আমি সেরে উঠ্‌লাম। স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাগ্যও ফির্‌ল, আমি আবার তাঁর ভালবাসা পেলাম। তখন মনে হ'ত আমার জীবনের দুঃস্বপ্ন কেটে গেছে। তাঁর মাইনেও কিছু বাড়্‌ল। আবার কিছুদিন একটু ভাল কাটল। (থামে)

তারপর বুলি আমার পেটে এল। প্রথমটা স্বামীকে আমি ভয়ে বল্‌লাম না। শেষে যখন বল্‌লাম, তখন আবার সেই দুঃখের সুরু হ'ল। তিনি চাইলেন আমি ডাক্তার ডেকে একে নষ্ট ক'রে শেষ ক'রে দিই। আমি রাজি হ'লাম না—ওকে বাঁচাবার জন্যে আমি তখন মানুষ খুন কর্‌তে পার্‌তাম। আবার তিনি আমার কাছ থেকে দূরে স'রে গেলেন। যুদ্ধে গিয়ে তিনি মদ খেতে শিখেছিলেন, তার মাত্রা আরও বেড়ে গেল। বুলি হবার ক'দিন মাত্র পরে তিনি মারা গেলেন।

জয়ন্ত। কি অসুখে?

জ্যোতি। মোটর অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে। তাঁর ক'জন বন্ধুর সঙ্গে একটা পার্টি থেকে ফির্‌ছিলেন, সবাই কম-বেশি মাতাল হ'য়ে। করোনার তাঁর রায়ে বল্‌লেন, এই সব লোকরা সমাজের আবর্জনা—এরা ম'রে যাওয়া সমাজের পক্ষে নিষ্কৃতি। কিন্তু আমি জানি আমার স্বামী আবর্জনা ছিলেন না, তাঁর বন্ধুরাও না। তাঁরা ছিলেন শুধু দুর্বল, সংসারের চাকার চাপ তাঁরা সইতে

পারেন নি।……(ভাঙা গলায়) আমার স্বামীকে অমানুষ ক'রে তুলেছিল দারিদ্র্য, আর তাঁর যুদ্ধক্ষেত্রের জীবন। তাঁকে চিনতাম আমি, করোনার চিনতেন না। কিন্তু সে কথা এখন ব'লে কি লাভ! (হঠাৎ, যে চেষ্টাকৃত স্থিরতা লইয়া সে কথা বলিতেছিল তাহা ভাঙিয়া পড়ে, দু'হাতে সে মুখ ঢাকে।)

জয়ন্ত। (তাহাকে স্থির হইবার অবসর দিয়া অপেক্ষা করেন, তারপর) তারপর?

জ্যোতি। (নিজেকে সংবরণ করিয়া) তারপর আর কি। সামান্য যা পুঁজি ছিল তাই ভেঙে জিনিষপত্র বেচে কিছুদিন চল্‌ল। তারপর চাকরি।

জয়ন্ত। (একটু নীরব থাকিয়া) সেই থেকেই এদের সমস্ত ভার আপনি একা ব'য়ে এসেছেন?

জ্যোতি। আর কে বইবে?

জয়ন্ত। কিন্তু এই স্বাস্থ্য নিয়ে খেটে টাকা আয় আপনি করেন কি ক'রে?

জ্যোতি। (হাসে) না খাট্‌লে টাকা কে দেবে আমাকে বলুন।

জয়ন্ত। কিন্তু দোকানে কাজ ক'রে আর কত টাকা মাইনে পান আপনি।

জ্যোতি। মাইনে ছাড়াও কমিশন আছে, সেটা নির্ভর করে বিক্রীর ওপর। অবশ্য তাতেও ভাল ক'রে কুলিয়ে উঠ্‌তে পারিনে সব সময়। কিন্তু কি করব। মেয়েদের লেখাপড়া তো শেখাতে হবে। আর এই বয়সেই দারিদ্র্যের বোঝা ওদের ওপর এসে যাতে না পড়ে, সেইটে দেখ্‌বার জন্যেও আমাকে প্রাণপাত কর্‌তে হয়। দারিদ্র্য মানুষকে কী পশু ক'রে তোলে আমি দেখেছি। তার পরিচয় ওরা যে-ক'টা দিন না পেয়ে পারে তাই ভাল। কষ্ট যা, আমি যদ্দিন বেঁচে আছি আমার ওপর দিয়েই যাক।

জয়ন্ত। কিন্তু আমি তো ভেবে পাইনে এই আয়ে আপনি কি ক'রে কুলিয়ে ওঠেন।

জ্যোতি। কি ক'রে কুলোই সে আমিই জানি। শহরের বাইরে কোথাও গিয়ে বাড়ি কর্‌লে হয়ত খরচা কিছু কম পড়্‌ত। কিন্তু বাইরে ওদের জন্যে ভাল ইস্কুল পাব না। আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে তবু যতটুকু পারি ওদের কাছে রাখ্‌তেই চাই আমি। ওদের দূরে সরিয়ে রেখে আমি বাঁচ্‌ব না।

জয়ন্ত। একসঙ্গে বাপ আর মা দুই হওয়া—এ কি একজনে পারে!

জ্যোতি। শরীর ভালো থাকলে আমার এখন আর কষ্ট হয় না।

জয়ন্ত। কিন্তু ধরুন যদি হঠাৎ আপনার চাকরি যায়?

জ্যোতি। আর কোথাও চাকরির চেষ্টা করব।

জয়ন্ত। কিন্তু খুঁজলেই কি চাকরি মেলে—এই বাজারে।

জ্যোতি। (শিহরিয়া) সে আর মনে করিয়ে দেবেন না। ঘুমিয়ে স্বপ্নে সে দেখ্‌লে আমি চম্‌কে জেগে উঠি।

জয়ন্ত। আর কেউ নেই, যে আপনাদের সাহায্য কর্‌তে পারে? কোন আত্মীয়?

জ্যোতি। না। আমার আত্মীয় বিশেষ কেউ নেই। আমার স্বামীর আত্মীয় যাঁরা আছেন তাঁরা আমাদের নিয়ে মাথা ঘামান না। আর আত্মীয়দের কাছে সাহায্য চাইতে আমিও যাব না। আমার মেয়েদের মনের ওপর তার ফল খারাপ হবে।

জ্যোতির উজ্জ্বল ও মার্জিত ব্যক্তিত্ব জয়ন্তকে পূর্বেই মুগ্ধ করিয়াছিল; তাহার এই সহজ উক্তির মধ্যে তাহার আন্তরিক আভিজাত্য ও তেজস্বিতা তাঁহাকে একেবারে বিস্মিত ও অভিভূত করিয়া দেয়, ইহাকে জীবন-সঙ্গিনীরূপে পাইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার বহুগুণ বাড়িয়া যায়। তিনি লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ, কোথায় ইহার দুর্বলতা সে তত্ত্ব তাঁহার আর অজানা নাই। তাই সেইখানেই এবার তিনি আঘাত করেন—

জয়ন্ত। (একটু থামিয়া) সবই বুঝ্‌তে পার্‌ছি। দেখুন, আমি নিজেও ঠিক বড়লোক নই, কিন্তু—

জ্যোতি। কিন্তু আজ সারাদিন তো আপনি খুবই বড়লোকের মত টাকা ছড়ালেন।

জয়ন্ত। (বলিয়া চলেন)—কিন্তু বোকা মানুষরা যতক্ষণ যে-ঝগড়াটা বাড়িতে ব'সেই মিটিয়ে ফেল্‌তে পার্‌ত সেইটে নিয়ে কোর্টে দৌড়োবে, ততদিন আমিও

সাধারণ ভদ্রলোকের খেয়ে প'রে থাকবার জন্তে যা দরকার তার চেয়ে কিছু বেশিই আয় করতে পারব। বিশেষত সংসারে বোকা মানুষদের সংখ্যা শিগ্‌গির কম্‌বার যখন কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

জ্যোতি। কিন্তু আপনার গরীব আত্মীয়স্বজনরা তো আছেন, যাদের আপনি সাহায্য করতে পারেন?

জয়ন্ত। একেবারে না—একটাও না। থাকার মধ্যে ত্রিসংসারে আছে একটা বোন, তার টাকার অভাব নেই। তার ছেলেরা এমনিতে যা টাকা ভাগে পাবে তাদের উচ্ছন্নে যাবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। (থামিয়া) তবে?

জ্যোতি। তবে কি?

জয়ন্ত। আপনার জবাব দিন। এ শুধু চাঁদের আলো আর নীল জলের কথা নয়। আপনাকে প্রথম যেদিন আমি দেখি, তখন থেকেই আমি—

জ্যোতি। প্রথম দিন? ট্রেণ থেকে যখন গিয়ে নাম্‌লাম?

জয়ন্ত। হ্যাঁ।

জ্যোতি। আমার তখন যা চেহারা ছিল তাই দেখেও?

জয়ন্ত। হ্যাঁ, তাই দেখেই। আপনাকে দেখেই আমার মনে হল যেন আপনি একেবারে ভেঙে পড়্‌ছেন, নিজের বোঝা ব'য়ে বেড়াবার শক্তি আর আপনার নেই। আর সে শুধু অসুখের বোঝা নয়—মনের বোঝা, দুশ্চিন্তা আর অভাবের বোঝা।

জ্যোতি। হ্যাঁ, দুশ্চিন্তা তখন আমার ছিলই। আমি হঠাৎ ম'রে গেলে আমার পরিবারের কি হবে, সেই কথাটা আমার সারাক্ষণ মনে জেগে থাকৃত।

জয়ন্ত। (তৎক্ষণাৎ) সেকথা আপনি সত্যি ভাবেন?

জ্যোতি। (বিস্মিত) ভাবি নে?

জয়ন্ত। না। ভাব্‌লে আপনার সাহায্য কর্‌বার সুযোগ আমাকে দিতে আপনি আপত্তি করৃতেন না। আপনি নিজেও জানেন এ আর বেশিদিন এমন ক'রে ব'য়ে চলা আপনার সাধ্য নয়। আর আমিও তো তাইই চাই—আপনার ঘাড় থেকে এদের বোঝা তুলে নিয়ে আপনাকে একটু স্বস্তি দিতে।

জ্যোতি নীরব। জয়ন্ত প্রতি কথায় জোর দিয়া দিয়া বলিয়া চলেন, তাঁহার প্রতিটি কথা গিয়া জ্যোতির হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে আঘাত করিতে থাকে—

আপনার মেয়েরা বড় হয়ে উঠ্‌ছে, আপনার মা অসুখে কষ্ট পাচ্ছেন, আপনার নিজের শরীর ভেঙ্গে পড়ছে। সাধাসিধে জীবনই ভাল, আপনাদের কোন অভাব নেই, একথা ব'লে নিজেকে আর কতদিন ভুলিয়ে রাখতে পারৃবেন? টাকা নেই ব'লে রেণুকে আপনি কলেজে পড়াতে পারৃবেন না, আপনার মার চিকিৎসা করাতে পারৃবেন না। তবু এই দারিদ্র্যের আভিজাত্যকে আঁকড়ে ধ'রে থাকবার কোন মানে আছে?

জ্যোতি। (মুখ তুলিয়া, ক্ষীণস্বরে) কি করৃব?

জয়ন্ত। আমাকে আপনাদের ভার নিতে দিন। সংসারে আমি একেবারে একা—অবসরের মুহূর্ত্তে আপনার ব'লে কাছে টেনে নেবার আমার কেউ নেই। আপনার মেয়েদের মত সুন্দর দুটি মেয়ে পেলে তাদের জন্তে আমি সব ক'রতে পারি। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে চল্‌বার নেশা আপনার আছে; কিন্তু শুধু সেই নেশার মাথায় মেয়েদের জীবনকে অভাবের মধ্যে রেখে পঙ্গু ক'রে তুল্‌বার অধিকার আপনার নেই। অন্ততঃ ওদের মুখ চেয়েও আপনাদের ভার নেবার অধিকার আমাকে দিন—আপনার মেয়েদের ভার, আপনার মায়ের ভার, আপনার নিজের ভার। বলুন, দিলেন?

জ্যোতি। (বহুক্ষণ পরে—ক্ষীণস্বরে শেষ প্রতিবাদ জানাইতে চায়) কিন্তু ওদের বাবাকে আমি যা দিয়েছি তা আমি আর কাউকে কি ক'রে দেব!

জয়ন্ত। আমিও তোমার কাছে তা চাইনে। যেটুকুন তোমার এখনও বাকি আছে তাই শুধু আমাকে দাও জ্যোতি, সেই আমার যথেষ্ট। বলো, দিলে?

জ্যোতি অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে, তারপর তাহার মুখে ধীরে ধীরে সম্মতির ক্ষীণ কম্পিত দৃষ্টি ফুটিয়া উঠে। হঠাৎ তাহার কি মনে হয়, ধীরে ধীরে উঠিয়া এই ক্রিশ্চান মেয়ে জয়ন্তের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া একেবারে খাঁটি হিন্দু ধরণে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসে। জয়ন্ত দুই বাহু বাড়াইয়া তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া তাহার মাথায় চুম্বন করেন।

তারপর তাহার ওষ্ঠে নিজের ওষ্ঠ স্পর্শ করেন, জ্যোতিও এই চুম্বনে সাড়া দেয়।

[রেণুর প্রবেশ]

দুজনে যখন নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ, ঠিক তখনই পিছন হইতে নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া রেণু প্রবেশ করে। তাহার নূতন কোট পরিয়া সে মাকে দেখাইতে আসিয়াছে। দিদিমার দেওয়া নূতন শাড়ির উপরে নূতন ফার কোট, কোটটাকে সযত্নে সস্নেহে গায়ে জড়াইয়া পরম উৎফুল্ল চিত্তে সে আসে; ইহাদের দিকে অগ্রসর হইয়া কি বলিতে উদ্যত হইয়া—হঠাৎ থামিয়া যায়। মুখের হাসি ও চক্ষের দীপ্তি নিমেষে মিলাইয়া গিয়া সে জড় স্থাণুর মত একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে; তারপর সহসা সচেতন হইয়া উঠিয়া নিজেরই মুখের একটা প্রায় অচেতন আর্তনাদকে সে প্রাণপণ বলে রোধ করে। তারপর নিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃত নিঃশব্দ পদক্ষেপে যখন ফিরিয়া চলে তখন এই এক নিমেষের মধ্যেই তাহার শুষ্ক চক্ষে, মুখে ও সর্বাঙ্গে একটা প্রকাণ্ড আঘাতের বেদনা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বাহির হইয়া যাইতে যাইতে একহাতে সে দরজাটাকে নিঃশব্দে টানিয়া ভেজাইয়া দিয়া যায়—যেন এই অসহ্য বেদনার মূল দৃশ্যটাকে সে শুধু এই দ্বারের ওপাশে রাখিয়াই নিজের স্মৃতির ও জীবনের বাহিরে ঠেলিয়া রাখিতে চাহিতেছে।

[রেণুর প্রস্থান]

তাহার আগমন ও প্রস্থান জয়ন্ত ও জ্যোতি জানিতে পায় না; আলিঙ্গন-মুক্ত হইয়া তাহারা পরস্পরের চক্ষে চাহিয়া গভীর স্নিগ্ধ হাসি হাসে।

ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িয়া যায়।

—ক্রমশঃ



গঙ্গাস্নান

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

গোসহস্রী গঙ্গাস্নানে সহস্র গোদান তুল্য ফল। মনটা নাচিয়া উঠিল। গ্রামের গঙ্গায় বহুদিন হইল অবগাহন স্নানের পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারি নাই। কারণ, অত্যন্ত সময়াভাব। শহরে প্রবাস জীবন যাপন করি। গঙ্গা সেখানে আছেন, কিন্তু তাঁহার মহিমাকে অনুভব করিবার সময় চাকুরি-জীবনে অতি অল্প। এবং কর্দ্দমতুল্য জলে ফরসা কাপড় নষ্ট হইবার ভয়ে পাঁজির পাতায় পুণ্যের তালিকাগুলি সযত্নেই পরিহার করি।

কিন্তু দেশের গঙ্গা—কাচতুল্য স্বচ্ছ যাহার জল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিবিভঙ্গে কাণে কাণে কত হারানো দিনের কথা আবৃত্তি করিয়া অবোধ অশান্ত মনকে অতীত অভিমুখী করিয়া শান্তির স্নিগ্ধরসে অভিষিক্ত করিয়া তুলে, শীত ও গ্রীষ্মে সমান স্বচ্ছ—তাঁহার কোলে দেহকে কয়েক দণ্ডের জন্য সঁপিয়া দিবার আগ্রহ তাই প্রবল হইয়াই উঠিল।

রবিবারের ঘণ্টা দুই সময়—চা সেবনে, বন্ধুবান্ধব লইয়া খোস গল্পে এবং প্রয়োজন হইলে সংসারের কোন অভাব মোচনে, অন্যথায় শুইয়া শুইয়া আলস্য চর্চ্চায় অতিবাহিত না করিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া কিছু পুণ্য সঞ্চয় করিয়াই আসা যাক না কেন?

যেমন সঙ্কল্প, অমনি কাজ। নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্বেই গাত্রোত্থান করিলাম এবং ঊষার ধূসর প্রকাশ দেখিয়া পুলকিত হইলাম। প্রভাতের এই সন্ধিক্ষণে পথে পা বাড়াইবার সঙ্গে পুরাতন ক্লান্ত মন গৃহসীমায় পড়িয়া থাকে, নূতন পরিবেশে—নূতন আনন্দময় মনের প্রকাশ সর্ব্বদেহকে স্বাস্থ্যের বিদ্যুতে ভরিয়া দেয়। আধসুপ্ত পল্লী, আকাশে পরম প্রকাশের ইঙ্গিত; যে মৃদু বাতাস পরিশ্রান্ত ঊষার বিদায়-ব্যজনীতে বহিতে থাকে তাহার স্নিগ্ধতার তুলনা নাই।

এত ভোরেও স্নানার্থীর অভাব নাই।

আমার পুরোভাগে একদল বালক স্নানার্থী কলরব করিতে করিতে চলিয়াছে।

ইচ্ছা করিয়াই পায়ের গতি শ্লথ করিয়া দিলাম। প্রকৃতি এবং প্রকৃতির শিশু দুয়েরই কলহাস্য উপভোগ করিবার বস্তু। অথবা নিজের বহুদিনপরিত্যক্ত শিশুকালের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মনোনিবেশের কৌতূহলই আমার চলার গতি শ্লথ করিয়া দিল।

উদার বিস্তৃত মাঠ, বালকের মনও উদার; অকুণ্ঠ আলাপে প্রকৃতিকে বাঙ্‌ময়ী করিয়া তাহারা পথ অতিবাহন করিতেছিল।

—'এই রমেন, তোদের ক্লাসে কাল কি হ'য়েছিল রে?'

—'সে ভারি মজা। সেকেণ্ড মাষ্টার বোর্ডে অঙ্ক দিয়েই রোজ ঘুমোন। সে ত এমন ঘুম নয়। এক একদিন ঘণ্টা বেজে গেলে তবে ঘুম ভাঙ্গে। কাল বঙ্কুটা মতলব করালে কি—'

আর একটি ছেলে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—'যেমন উনি ঘুমোবেন, অমনি একটি রসসুড়ি এনে ওঁর মুখে ফেলে দেওয়া হবে।'

আর একজন বলিল, 'সার যে হাঁ করে ঘুমোন।'

হো হো করিয়া ছেলের দল হাসিয়া উঠিল।

—'তারপর ?'

—'তারপর যেমন মতলব—তেমনি কাজ। বন্ধুটা জানিস ত যে বিচ্ছু ছেলে—দিলে রসমুণ্ডি সারের মুখে ফেলে।' আবার হাসি।

—'সার কি করলেন ?'

—'কি আর করবেন—একগ্লাস জল খেয়ে উঠে গেলেন।'

—'হেড মাষ্টারের কাছে রিপোর্ট করলেন না ?'

—'দূর তাহ'লে যে নিজেই ধরা পড়তেন। ছেলে পড়াতে এসে ক্লাসে ঘুম—জানিস না বুঝি হেড পণ্ডিতের টিকি কাটার ব্যাপার ?'

—'হাঁ, হাঁ, রিপোর্ট করে নিজেই বকুনি খেয়েছিলেন।'

হাসির পর —আলোচনা প্রসঙ্গান্তরে আসিল।

—'এই অশোক, তোদের স্কুলের টিম এবার কেমন রে ?'

—'পরশু ম্যাচ খেললেই টের পাবি এখন। একটি ডজন খেতে হবে।'

—'ইস! মহিমের মত ব্যাক আছে তোদের ? হীরুর মত গোলকিপার ?'

—'আরে, রেখে দে মহিম, হীরু। সুবোধ যা এক একটি কিক্ করে আর বল এ্যাইসা রসগোল্লা হয়ে যায়।'

'ও, ক্লাস টেন থেকে প্লেয়ার ধার করছিস ?'

'ধার মানে ? আমাদের স্কুল থেকেই ত নেওয়া হচ্ছে। তোদের স্কুলেরও কি ভাল ভাল প্লেয়ার নিবিনে নাকি ?'

—'উঁহু, আমরা স্রেফ্ আমাদের ক্লাস থেকেই নেব।'

—'তাহ'লে অন্য ক্লাসে ভাল প্লেয়ার নেই বল্!' সকলেই হাসিয়া উঠিল।

—'এবার কোয়ার্টার্লিতে মন্টুর রেজাল্ট দেখেছিস ত! ও নিশ্চয়ই ফার্ষ্ট ষ্ট্যাণ্ড করবে।'

—'ও রকম থার্ড মাষ্টারকে প্রাইভেট টিউটর রাখলে আমরাও টেনে বেরিয়ে যেতাম!'

—'কেন, মাষ্টার মশায় কি কোশ্চেন আউট করে দেন ?'

—'না, তা দেন না। কিন্তু ইম্প'র্টান্ট যে গুলি দাগ দিয়ে পড়ান, সেই গুলিই ত লেগে যায়।'

—'আমি ভাই সংস্কৃতটা যুত করতে পারি না, ওসব লঙ্ লিটের ব্যাপার মাথায় ঢোকে না।'

—'অ্যাডিশনাল সংস্কৃতের বদলে ম্যাথামেটিক্স নে না। খাটুনি কম, নম্বর বেশি।'

—'এবার সামারভেকেশনে কোথায় বেড়াতে যাবি বল দেখি ?'

—'আমাদের স্কাউট মাষ্টার বলেছেন মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাবেন। নবাবের বাড়ি বাগান দেখা হবে।'

—'ইস, স্কুলের ফাণ্ডে আর অত টাকা নেই, বড় জোর কেষ্টনগরের রাজবাড়ি দেখে আসবি। আমি কিন্তু ভাই দার্জিলিং যাব!'

একটু পা চালাইয়া ইহাদের অতিক্রম করিলাম। জানি ইহাদের খেয়ালের শেষ নাই, স্বপ্নেরও

পরিণতি নাই। বৈশাখী বাতাসে গঙ্গায় যেমন অসংখ্য ঢেউ উঠিয়া ভাঙ্গিয়া যায়, আকাশের নক্ষত্র জ্যোতি সহসা সেই ভাঙ্গা ঢেউয়ের মাথায় চিক্ চিক্ করিয়া উঠে, বাতাস কখনও দমকা কখনও বা মৃদু বহিয়া বালুতটে বৃত্ত রচনা করিয়া ঘন ঝাউয়ের শন্‌শনানিতে সুর সংযোগ করে, তেমনই একটি স্বল্পায়ু গ্রীষ্ম সন্ধ্যাকালের মত ইহাদের বিচ্ছিন্ন আলাপ বিচিত্র আনন্দ ও সঙ্গতিহীন মন্ত্রণা এই পথের ধূলায় ছড়াইয়া দিয়া ইহারা পথ চলিতেছে। পথের ধূলায় যাহা মিশিতেছে, গৃহের প্রাচীর পারে তাহাকে আর সযত্নে কেহ তুলিয়া ধরিবে না। বালকদের অতিক্রম করিতে না করিতে একদল কিশোর সম্মুখে পড়িল।

—'এবার লোক্যাল টিম দেখে মনে হয় মোহনবাগানের লীগ্ নেবার চান্স্ আছে, কি বলিস প্রতুল ?'

—'তা আর বলতে! উনিশ শো এগারো আর উনিশ শো তেত্রিশ। লীগ তো নেবেই, শীল্ডও দেখিস—'

—'আরে রেখে দে তোর মোহনবাগান। কোন কালে ঘি দিয়ে ভাত খেয়েছিল—এখনও হাতে গন্ধ।'

—'কিন্তু, সুনীতি, ডিবেটিং ক্লাবে তোমার প্রবন্ধটা আমার তত ভাল লাগেনি। হেডমাষ্টার সুখ্যাতি করলেন বটে—'

—'বাঃ রে, তখন ত ঘাড় নেড়ে আর মাথা নেড়ে দিব্যি সুখ্যাতি করলে। তা কোন খানটা ভাল লাগেনি ?'

—'তুমি ভাই রবিবাবুর উপেক্ষিতা থেকে স্রেফ্ টুক্লিফাই করেছ।'

—'কোন খানটা বলত দেখি ?'

—'তা আমি ঠিক বলতে পারব না। আমিও বঙ্কিম বাবুর ভাষা নিয়ে একটা গল্প খাড়া করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এমন বেয়াড়া ভাষা যে কিছুতেই কায়দা করতে পারলাম না।'

—'ওঃ, তাইবল। তা বঙ্কিম বাবুকে না ধরে আর একটু এগিয়ে এলেই ত পারতে। বঙ্কিম বাবু ত আজকাল বাতিল।'

—'বাতিল! কে বললে ?'

—'কেন, আমাদের এ্যাডিশনাল টিচার কমলবাবুর লেকচার শুনিস নি! তিনি বলেন, ওই অলঙ্কারবহুল সংস্কৃত ঘেঁষা ভাষা এ যুগে আর চলবে না।'

—'তবে কি চলবে ?'

—'এই কথ্য ভাষা। তুমি আমি যেমন ভাষায় কথা কইছি—তেমন ভাষায় লিখতে হবে।'

—'সত্যি ? বাঃ, তাহলে ত ভারি মজাই হয়। এ্যাইসা গল্প এবার লিখবো।'

একটি কর্কশ কণ্ঠ তাহাকে ধমক দিল, 'আরে রাখ তোর লেখা, দেবিকারাণীর জীবন-প্রভাত দেখেছিস ? এবার লক্ষ্মী টকিতে এসেছে।'

'না ভাই, জল খাবারের যে পয়সা পাই—তাতে সিনেমা দেখা পোষায় না। তুই একদিন দেখা না ?'

'আমার কিন্তু ভাই দেবিকারাণীর চেয়ে কাননবালার পার্ট ভাল লাগে। বিদ্যাপতি দেখেছিস ?'

'—তা যদি বলিস, গার্ব্বোর কাছে কেউ নয়। মার্লিনই বল, আর জিঞ্জার রজার্স'ই বল।'

—'গার্ব্বো কবার ডিভোর্স করেছে জানিস?'

কিশোর বয়সের কৌতূহলকে পিছনে রাখিয়া আর একটু অগ্রসর হইলাম। কাছে আসিতেই চিনিলাম, ইহারা বিভিন্ন পল্লীর উৎসাহী যুবক। গ্রামের উৎসবে ও বিপদে বুক দিয়া পড়ে, রোগ হইলে ডাক্তার ডাকে, পথ্য সংগ্রহ করিয়া দেয়, বিবাহে বরযাত্রী হইয়া গলার মালা ও চাদর ঝুলায়, শ্মশানে শবদেহ বহিবার জন্য কোমরে গামছা বাঁধে, বারোয়ারী পূজায় বাঁশ কাটা হইতে আরম্ভ করিয়া যাত্রার আসরে পাল টাঙাইয়া ও বেয়ারা বিদায় পর্য্যন্ত চেঁচামেচি ও মারামারি করিয়া আসর সরগরম রাখে। ক্লাবে ঢোল পিটাইয়া থিয়েটারের মহলা দেয়, ব্রিজের আসরে গলা ফাটাইয়া প্রতিপক্ষকে চুপ করাইবার প্রয়াসে প্রাণপণ করে। গ্রামের উৎসাহী যুবক ইহারা।

আমাকে দেখিয়া অনন্ত বলিল, 'আরে, কালি যে! কি ভাগ্যি মা গঙ্গায় তুমি এসেছ নাইতে?'

অমূল্য বলিল, 'তোমাকে আর দেখতে পাই না যে ক্লাবে? শুনেছ, আমরা রঘুবীর বই ধরেছি?'

—'কবে প্লে হবে?'

—'তৈরী হলেই হবে। উঃ, দেখে এলাম পাব্লিকে। কি পার্টই কর্‌লে ভাদুড়ী, মাইরি!'

—'তোরা পারবি ত?'

—'কেন পারব না। এবার পূজোর সময় এলে না। এলে দেখতে আমাদের সুবোধ কি চমৎকার ঠাকুর না তৈরী করেছিল। কোথায় লাগে তোমার ঘূর্ণীর কারিকর।'

—'বটে!'

'—আর কলকাতার মত আমরাও সার্ব্বজনীন পূজো করেছিলাম। ভট্‌চাজ মশায় কি বলেন জানিস্? বলেন, 'ওরে বাবু, তোদের সর্ব্বজননী পূজোর দক্ষিণে কিন্তু ডবল পড়বে। সকলকার মা কি না।' বলিয়া হাসিল।

—'সে যাই বল, সার্ব্বজনীন পূজো করে আরাম আছে। চাঁদা যেখানে খুসি—যার তার কাছে চাও—কেউ 'না' বলবে না। ছাপানো একখানা রসিদ নিয়ে অনায়াসে দু চার আনা বার করে দেয়। আর পাড়ার পূজো হ'লেই বিপদ! এ বলে আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু। শেষকালে খাতায় নাম সই করা টাকা আর পকেটে ওঠে না!'

—'আরে দূর কর তোমার সার্ব্বজনীন পূজো। নন্দীদের মধ্যে যে রকম দলাদলি বেধেছে, তাতে গ্রামের সব প্রতিষ্ঠানই বুঝি নষ্ট হয়।'

—'কি রকম?'

—'বড় নন্দীর ছোট ছেলে অমল বিলেত না আমেরিকা কোথায় গেছল, জানিস ত? তাই নিয়ে সমাজে দুটো দল হ'য়েছে।'

—'তারপর?'

—'তারপর, আমাদের গাঁ ছাড়িয়ে কলকাতা—শুধু কলকাতা কেন—যেখানে যত আত্মীয় কুটুম্ব আছে সকলের মধ্যেই দলাদলির ঢেউ লেগেছে। একখানা কাগজও নাকি বেরুচ্ছে কলকাতা থেকে এই দলাদলির ব্যাপারে।'

'আশ্চর্য্য করলে ভাই! আজকালকার দিনে সবাই ত সখ করে বিলেত ঘুরে আসে, তা নিয়ে এত হৈ চৈ কেন?'

—'আরে উচ্চ শিক্ষিতদের কথা বাদ দে—'

• —'তা নয়, আসল কথা—ঘরের ঝগড়া একটা উপলক্ষ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। অমলদের টাকা আছে, ইচ্ছে করলে দশটা সমাজ ওরা গড়তে পারে। ওদের বাদ দিয়ে সমাজ তৈরী করা কি ভাল হবে!'

—'সমাজের গেরো ক'সে রাখছে, ভাই! যাদের আজ খেতে কাল নেই, খাতা পেন্সিলে কোন দিন আঁচড় কাটলে না, এই গাঁয়ের কূয়ো থেকে বেরিয়ে শহরের নদী কখনো দেখলে না—তাদেরই যত আটু পাটু। কাল্ নন্দীদের নামে একটা ছড়া বেরিয়েছিল। বাজারের ইঁদারার গায়ে কারা সেটা সেঁটে দিয়ে গিয়েছিল।'

'কি—কি ছড়া?'

—'সব কি আমার মনে আছে? আরম্ভটা বোধ হয় এই রকম :—

ওরে নন্দী আর কেন লোকালয়ে চল
কৈলাসে ডাকে যে তোরে প্রমথের দল।
গাঁজা, গুলি, সিদ্ধি বাটি হাতে যার কড়া
লেখনী বদলে সেথা শোভা পায় দড়া!

'আর মনে নেই।'

'মজা চলছে ভাল।'

—'এই হীরে, ওদিকে চাইছিস যে? তোর জন্যে, মাইরি, পথে মান সম্ভ্রম থাকে না।'

—'য্যাঃ—য্যাঃ, তোর মান সম্ভ্রম! মান সম্ভ্রম যদি এত' ত বউটাকে ধরে ধরে পিটিস কেন?'

'চোপরাও, মুখ সামলে কথা বলবি। এটা তোর বাজার নয়।'

—'আঃ, তোরা করছিস কি? সকাল হ'য়ে আসছে, ভদ্র লোকের মেয়ে ছেলে সব নাইতে আসছেন, আর ইতরের মত ওকি?'

—'ও কেন আমায় যাতা বললে? আমি মদ খাই বটে, কিন্তু বেলেল্লাগিরি দেখেছিস কখনো? ঘরের বউঝির দিকে কোন দিন চেয়েছি? যা করি—'

—'থাম, আর বীরত্ব ফলাতে হবে না। আরে, কালি,—চললি যে—'

—'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে—আর দাদা, দেখেছ ব্যাপার খানা? গ্রামের বউঝির আর লজ্জা সরম রইলো না, গঙ্গা নাইতে আসে চটি জুতো পরে?'

—'যেমন কাল, তার তেমনি আচরণ। আশু, তোমাদের আশু গো, চাকরি করে রেল আফিসে—মাহিনে ত পঞ্চাশ টাকা। এদিকে ঘরের চালে খড় নেই; বউয়ের পরণে মেঘদূত শাড়ী, পায়ে জরির জুতো। দেখনি সার্ব্বজনীন পূজোর দিন?

'হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। কচি কচি মেয়েগুলোর মদ্দা মদ্দা চুল ছাঁটা—মুখে আগুন।'

—'ময়রার দোকানে এক পয়সার রসগোল্লা কিনে খেতে দেখিনে, বলে, রস লাগবে—আর কই কই করে লজেঞ্জুলো চিবুচ্ছে!'

—'দেশ উচ্ছয়ে গেল।'

—'এদের এই পাপেই ত গঙ্গা দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছেন। উঃ,—মাজাটা খচ্ করে উঠলো, দাদা। আমরা ছেলেবেলায় যেখানে চান করেছি—তার থেকে পোয়াটেক্ রাস্তা বেশী হাঁটতে হয়। হরে কৃষ্ণ—হরে কৃষ্ণ—'

—'পাপ ত বটেই, নইলে ভাল মত ধান হয় না কেন? যে ঋতুর যা তাই খেতে পাচ্ছ কি?'

—'এবার দেখছ ত, আমের দফা গয়া। তাছাড়া চোত মাসে কম কুয়াশাটা হ'লো? কথায় বলে :—

চৈত্রে কুয়ো ভাদ্রে বান
নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান।

দেখবে এবার মজাটা। রাম রাম হরে হরে।'

বৃদ্ধ দলকে দ্রুত অতিক্রম করিয়া গঙ্গার বিস্তীর্ণ বালুচরে আসিয়া পৌঁছিলাম। সম্মুখে আর দল নাই, অন্ধকার ক্রমশঃ তরল হইয়া আসিতেছে—পূর্ব্ব আকাশের কোণে রক্তের ছোপ ধরিতে আরম্ভ হইয়াছে। সু-উচ্চ শিমুল গাছের পরেই গুটিকয়েক ছোট ছোট বাবলার চারা, তার পরেই বৈঁচির ঝোপ। বৈঁচি ঝোপের পরে বিশেষ গুল্মের সাক্ষাৎ মেলে না। কোথাও কর্ষিত মাঠ মাটির ঢেলায় রুক্ষ হইয়া আছে, কোথাও কুমড়া বা উচ্ছের লতা লতাইয়া চলিয়াছে; বালু ভূমিতে সারি সারি পটোলের চারা ফুলে ও ফলে শোভাময় এবং অদূরে গঙ্গা বহিতেছেন। গুণ টানা বড় নৌকাগুলির উঁচু মাস্তুল গঙ্গার উচ্চ পাড় ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, ছোট নৌকার শুভ্র পালে ভোরের বাতাস লুকোচুরি খেলিতেছে। পশ্চিমা মাঝির দুর্ব্বোধ্য গানের শব্দ কাণে আসিতেছে। গান দুর্ব্বোধ্য, কিন্তু সুরে মিষ্টত্ব আছে।

পায়ে পায়ে চলিয়া গঙ্গার তীরে আসিয়া বসিলাম। এখানে আর একদল স্নানার্থী তৈল মর্দ্দন করিতেছেন। ও-দলে বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই আছেন। ইঁহারা যোগ উপলক্ষ্যে পুণ্য সঞ্চয় করিতে আসেন নাই, প্রত্যহই আসিয়া থাকেন।

—'কালি যে, ভাল ত? তোমাদের কলকাতার খবর কি—যুদ্ধ টুদ্ধ বাধবে?'

—'শশীদার কেবল যুদ্ধের খবর! এবার পাঁচশো মণ চাল বেঁধে রেখেছেন কিনা!'

—'গেলবার ত লোকসান দিলাম শতাবধি টাকা। এবার পাঁজিতে দেখলাম, চাউল ও রবি শস্যের মূল্য বৃদ্ধি। জার্ম্মেণী ও ফ্রান্সের মনান্তর। তাই ভাবলাম, মরুকগে, যদি লোকসানটা উঠে আসে—'

'যাই বল দাদা,—চাল যতদিন শস্তা থাকে আমাদেরই ভাল, তবু দু মুঠো খেয়ে বাঁচি।'

—'তোমার ত ভারি ভাবনা ভট্‌চাজ! চাল নেই চুলো ঢেঁকি নেই কুলো! বিয়ে করনি, সংসার নেই, ঘণ্টা নেড়ে যা উপায় কর তাতে একটা লোকের অঢেল।'

—'পরের ধন আর নিজের পরমায়ু কেউ ত কম দেখে না, ভায়া!'

—'হাঁ কালি, তোমাদের পোষ্ট অফিসে আমাদের হরেনের যদি একটা লাগিয়ে দিতে পার।'

—'হরেন গেলবার ম্যাট্রিক দিয়েছে বুঝি?' জিজ্ঞাসা করিলাম।

—'কোথায়। স্বদেশী করে—হৈ-হৈ করে পড়া দিলে ছেড়ে। ওই পেল্লাদমার্কা ছেলেগুলোর সঙ্গে ফুটবল পিটে আর বায়স্কোপ দেখে বেড়ায়। আমাদের ছেলেবেলায় ওসব উৎপাত ত ছিল না।

মেয়েগুলোকে মাসে একদিন ঘুরিয়ে না আনলে মুখভার করে। টকি! টকি করেছিস যদি ত টাকা উপায়ের ব্যবস্থা কর।'

—'টাকা উপায়ের ব্যবস্থার জন্যই ত ওরা টকি খুলেছে।'

—'তা কালি, চুপ করে রইলে যে? তোমাদের পোষ্টাফিসে হয় না একটা?

বৃদ্ধ শশীদাকে চাকুরির মহার্ঘ্যতা সম্বন্ধে কিছু বুঝাইলাম। তিনি কতদূর বুঝিলেন জানি না, মুখভার করিয়া হরিনাম করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে কপালে রক্তচন্দনের ছাপ, গলায় রুদ্রাক্ষ মালা, ও হাতে কমণ্ডলু লইয়া ভবতারণ দেখা দিলেন। কাঁধের গামছা, কাপড় ও হাতের কমণ্ডলু বালু তীরে রাখিয়া শশীদার পাশে বসিয়া বলিলেন, 'তোমরা বল আমারই দোষ, কাল শুনলে ত ব্যাপারটা। বিধবা ভাজ বলে বহুদিন কিছু বলিনি, কিন্তু মানুষের সহ্যের একটা সীমা ত আছে? দিন নেই, রাত নেই ও রকম মুখ ছুটুলে মরা মানুষের রাগ হয়—তা আমি!' শশীদার গম্ভীর মুখ পূর্ব্বাশার মতই দ্যুতিময় হইয়া উঠিল, কহিলেন, 'তা বটে! এবার বাড়িটা ভাগ করে নাও, ভায়া। কথায় বলে, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।'

ভবতারণ বলিলেন, 'ওই মাগীই ত টাল বায়না করে ভাগ করতে দিচ্ছে না, বলে, বিধবা মানুষ খাব কি?'

—'তা বটে, ওর একটা বিলি ব্যবস্থা—'

ভবতারণ আরক্ত মুখে বলিলেন, 'দিইনি করে বিলি ব্যবস্থা? পাচ্ছিল না দু'মুঠো খেতে, না পরণে জুটছিল না দশি একখানা? মুখ কেমন? বলে, স্বামীর ধন খাচ্ছি। কুটোটি ভেঙ্গে দুখানা করে না।'

—'কিন্তু ভবতারণ, ঘরের বউ—'

—'রোজ রোজ কেলেঙ্কারী ভাল লাগে না। সত্যি বলছি, দাদা, এই গঙ্গাতীরে—ওকে যদি আলাদা না করে দিই ত আমার নাম কুকুরের গলায় ঝুলিয়ে দিয়ো।'

শশীদাদা খুসী হইয়া বলিলেন, 'এতই যখন আগ্রহ, তখন পাঁচজন সালিশ নিয়ে কাজ করতে হবে বৈকি। ওহে তিমির তুমিও থাকবে, অনাথকেও ডেকো, কালই—হরে রাম হরে রাম—রাম রাম—হরে হরে।'

ততক্ষণে আর একদল আসিয়া ও পাশে বসিয়া কলরব জুড়িয়া দিল।

—'তোর গরুর না কিছু করেছে! নিজের হাতে বেড়া দিয়ে একক্ষেত নটে বুনলাম—বউটা জল ঢেলে ঢেলে সারা—লাফিয়ে সেই বেড়া ভেঙ্গে শাকের একটি রাখলে না।'

'যাই বল, নলিন, গরুটাকে মেরেছ আবার পাউণ্ডেও দিয়েছ—হাজার হোক বামুনের গরু ত।'

—'হঃ, ভারি বামুন! গরু পুষেছিস ত এক আটি বিচিলি কিনিস নে কেন? পরের ক্ষেত খামারে খাইয়ে নিখরচায় ঘরে তুলতে চাস্। তোর বামুনের না কিছু করেছে!'

—'এবার খন্দ কুটো কেমন হ'লো, নিতাই?

'কোন রকমে চাষের দামটা উঠবে, দাঠাকুর। দেখছো না আকাশের আবস্থা—বোশেখ যায় এক ফোঁটা বর্ষাচ্ছে না। আশ ধানের দফা গয়া।'

—'হুঁ, মানুষের পাপেই এই অবস্থা। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।'

—'হাঁরে মদন, কাল সন্ধ্যে বেলায় তোদের পাড়ায় অত হৈ হৈ হচ্ছিল কেন? চোর এসেছিল বুঝি?' মদন একগাল হাসিয়া বলিল, 'চোরই বটে! মনচোর।'

—'কি, কি, ব্যাপার কি?' সকলেই তৈল মর্দ্দন বন্ধ করিয়া মদনের পানে চাহিলেন।

'ব্যাপার আর কি, ও-পাড়ায় সুভির ঘরে—'

'ওঃ'! চটাপট শব্দে পুনরায় তৈল মর্দ্দন চলিতে লাগিল।

—'তা এই দুশ্চরিত্রা মেয়েটাকে গাঁ থেকে বের করে দেওয়া হোক না।'

'কে দেবে? সমাজ ও মানে না, ক্ষমতাও ওর পেছনে কিছু আছে। আমাদের হৈ-চৈয়ে ওরা কাণ দেয় নাকি?'

সর্ব্বতাপহারিণী গঙ্গার কোলে নামিয়া ততক্ষণে স্নান আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। এক এক বার ডুব দিই আর শরীর মন শীতল হইয়া যায়। বালুতীরে বসিয়া গ্রামকে টানিয়া আনিতে সত্যই কি ভাল লাগে এত? হাতে অফুরন্ত সময় এবং কাজে অগাধ আলস্য থাকিলে হয়ত ভালই লাগে।

কোন গিরি-গহ্বর হইতে বাহির হইয়া—কত দেশকে তীর্থ করিয়া বাণিজ্য প্রধান শহর গড়িয়া—কত মাঠ প্রান্তর অতিক্রম করিয়া গঙ্গা এই গ্রামের কোলে আসিয়াছেন এবং একদিকে ঢালু বালুতীর ও অন্যদিকে পাহাড় সমান উঁচু পাড় রচনা করিয়া সাগর অভিমুখী হইয়াছেন। গঙ্গা-স্পর্শ করিয়া সেই সংখ্যাতীত গ্রাম, শহর ও তীর্থক্ষেত্র স্বাস্থ্যে, সমৃদ্ধিতে ও পুণ্যে 'নামী' হইয়া উঠিয়াছে সে খবর রাখিবার অবসর আমাদের কোথায়? এই গ্রামের সঙ্কীর্ণ অঞ্চলে বাঁধিয়া গঙ্গাকে নিত্য আমরা গ্রামের গ্লানিগুলিই উপহার দিয়া থাকি। ভাগ্যে তিনি পতিতোদ্ধারিণী এবং স্রোতস্বিনী, তাই কলুষ-বাষ্পে দুটি তীর তাঁহার ভাঁটার সময়ের কর্দ্দমের মতই কুশ্রী হইয়া উঠে না।

ফিরিতেছিলাম। তখন সূর্য্য আকাশের অনেকখানি উপরে উঠিয়াছেন। ভিজা গামছা ভাল করিয়া নিঙড়াইয়া ভিজা কাপড় খানি তাহাতে বাঁধিয়া অলাবুকৃতি পুঁটুলি হাতে ঝুলাইয়া ফিরিতেছিলাম। ফিরিবার পথে পুণ্যার্থিনী নারীর সংখ্যাই চোখে পড়িল বেশী। প্রভাতের পাটঝাঁট সারিয়া—গৃহকে কথঞ্চিৎ সুশৃঙ্খলিত করিয়া—ইঁহারা দলে দলে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। কাহারও হাতে হরিনামের ঝুলি, কাহারও কাঁকে পিতল বা মাটির কলসী, কেহ বা কমণ্ডলুও হাতে লইয়াছেন। বাঁহাতে তেলের বাটি, গামছা ও শুকনা কাপড়, অন্য হাতে বায়ু-আন্দোলিত ঘোমটাটিকে স্বস্থানে রাখিবার জন্য মস্তকাগ্রভাগে সংস্থাপিত। টুকরা টুকরা গল্পাংশ যে কাণে আসিতেছিল না, এমন নহে।

শাশুড়ীর দৌরাত্ম্য, বধূর বেহায়াপণা, ছেলের বধূপ্রীতি, খোকার দুষ্টুমি, প্রতিবেশীর হিংসা, অলঙ্কারের দোষগুণ কীর্ত্তন, জমিজমার আয়ের কথা, চাকুরীর সুখ-সুবিধা, রোগ, শোক বা রন্ধনের ইতিহাস, বকাটে যুবকের শিস্ দেওয়া, বড়মানুষী গালগল্প ইত্যাদি সবিস্তারে চলিতেছে। মোট কথা, ইঁহারাও সযত্নে সংসারকে বহন করিয়া স্নানে চলিয়াছেন।

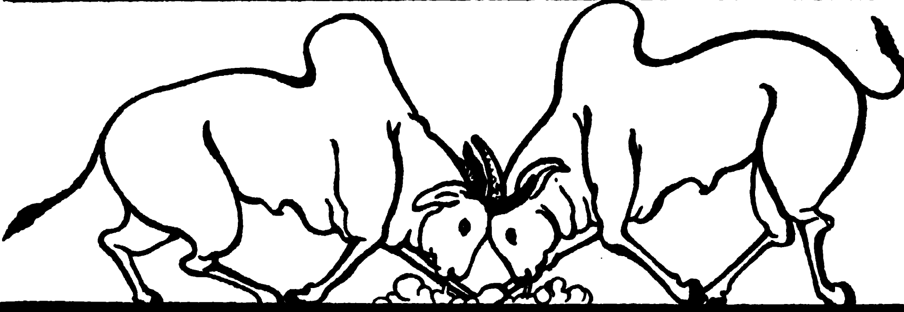
সূর্য্য উঠাতে ছায়া আমাদের দীর্ঘতরই হইয়াছিল, অন্যমনস্কের মত পথ চলিতেছিলাম। সহসা একটি স্ত্রীলোক সর্পদষ্টার মত মুখে চীৎকার করিয়া লাফাইয়া আমার ছায়ার বিপরীত দিকে সরিয়া আসিল। আমিও ভীষণভাবে চমকিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম।

স্ত্রীলোকটি আর কেহ নহে, মাতু গয়লানী। মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া সে আমার সম্মুখে মাথা ঠুকিতেছে আর বলিতেছে, 'দোহাই বাবাঠাকুর, অপরাধ নিও না। না জেনে তোমার ছেঁয়া মাড়িয়ে মহাপাতক করেছি—' গলায় আমার যজ্ঞোপবীত জ্বল জ্বল করিতেছে;—কালই বোধ হয় কোথায় নিমন্ত্রণ ছিল, ভাল করিয়া সাবান দিয়া মাজিয়াছিলাম।

ব্রাহ্মণের ছায়া মাড়াইয়া শূদ্রাণী মাতু দেখিতেছি মহাপাপ করিয়া ফেলিল!

শুনিয়াছিলাম দক্ষিণদেশে শূদ্রের ছায়া মাড়াইলে মহাপাতক সঞ্চার হয়, বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের ছায়া মাড়াইয়া ব্রাহ্মণেতর জাতির যে মহাপাতক হইতে পারে এ-কথা ত এতদিন জানিতাম না।

মহাত্মার 'হরিজন' পত্রিকায় এ-সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিলে নূতন আলোকপাত কি করিতে পারিব না?



সুন্দর তুমি—সুন্দর আমি—

শ্রীসুনীলরঞ্জন ঘোষ

আজি তব সস্নেহ সুন্দর আঁখিপাতে
আমি চির-সুন্দর-চুম্বন আঁকি রাতে।
তব যৌবন আজি সৌরভে সুরভিত,
এস নন্দনে মোর শত-শশী-নিন্দিত!
এই অশ্রু-উপল ব্যথিত নয়ন-জলে
হের এ-মহা প্রেমের রক্ত-পদ্ম জ্বলে।
আজ সুন্দর তুমি—সুন্দর আমি—সুন্দর মধুরাতি!

আজ বসন্ত মোর মনে আসে দ্বার খুলি'
চোখে রঙীন স্বপন উড়ালো সোনার ধূলি।
তব বিব্রত দেহে দক্ষিণ বায়ু হাসে,
মোর মালঞ্চে তার ক্ষীণ রোমাঞ্চ ভাসে।
এই স্নিগ্ধ নিশার কোরক-বৃন্ত টুটি'
মোরা বসন্ত বায় হঠাৎ উঠেছি ফুটি';—
আজ সুন্দর তুমি—সুন্দর আমি—সুন্দর মধুরাতি!

তব নীলাভ নয়নে দূরের নীলিমা ভরা
রাঙা হৃদয়ে সুধার রক্ত-মাধুরী-ঝরা।
আমি গৌরবে, তুমি সৌরভে দ্যুতিময়,
তব বাহু-বন্ধন—বন্ধন সে ত নয়।
তাই মিলনে মোদের আকাশ আলোতে আলো।
ওগো সার্থক আমি,—জীবন লেগেছে ভালো!
আজ সুন্দর তুমি—সুন্দর আমি—সুন্দর মধুরাতি!

———

চলমল সাধুর গান

শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

সাধুর বাণিজ্য বিষয়ে অনেক গান অনেকদিন হইতে আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বাংলার পল্লীগীতিকায় সে সবের বিশিষ্ট স্থান আছে। পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার বাণিজ্য বিষয়ক গানগুলি ভাবের অনন্তখনি বিশেষ—সেগুলিতে পল্লীকবির ভাবপ্রবণ মনের সন্ধান পাওয়া যায়। 'চণ্ডীমঙ্গল' ও 'মনসামঙ্গল' কাব্যগুলি তো বাণিজ্যের বিষয়ে ভরপুর—সাধারণ মেয়েলি ব্রত ছড়ায় বাণিজ্যের কথার অন্ত নাই। পূর্ব্বেকার কবিরা নায়ককে বাণিজ্যে পাঠাইয়া অনেক কাব্যি করাইয়া লইতেন, নায়িকার বিরহ-দুঃখে প্রকৃতিকে মুহ্যমান করাইয়া ছাড়িতেন। নদীমাতৃক বাংলাদেশে "দিশি দিশি হইতে তরণী" আসিয়া ভিড় জমাইত, বাঙ্গালী পণ্য বোঝাই নৌকা লইয়া ভিন্ন দেশে বাণিজ্য করিতে যাইত। এজন্যই, বোধ করি, বাংলার পল্লীগীতিগুলি বাণিজ্য বিষয়ক গানে ভরপুর।

উত্তরবঙ্গে সাধুর বাণিজ্য বিষয়ক একটি পল্লীগীতির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে—তাহার নাম চলমল সাধুর গান। রঙ্গপুর জেলা হইতে উহা সংগৃহীত হইয়াছে।* "অলকা" পত্রিকার কোন সংখ্যায় ইহার বিষয়বস্তু ও বন্দনা গান লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। বন্দনা-প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্য নির্দ্ধারের চেষ্টা করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে আমরা ইহার বিষয়বস্তুর বিশদ আলোচনা-প্রসঙ্গে কবিত্বপূর্ণ অংশগুলি উদ্ধার করিতে প্রয়াস পাইব।

চল্‌মল সাধুর বাড়ী[১]। চান্‌দামা সহরে—তিনি লক্ষ্মীমাতার একমাত্র পুত্র[২]। পাটগ্রামের শাঁখ-রাজার কন্যা ডুবুলার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করিতে ধনসম্ভার নিঃশেষিত হওয়াতে লক্ষ্মীমাতা পুত্র চলমল সাধুকে বাণিজ্যে গমন করিতে আদেশ করিলেন। মায়ের আদেশক্রমে চলমল বাণিজ্যে যাইতে বদ্ধপরিকর হইলেন। বালিকা বধূ ডুবুলা সুন্দরী তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইল। চলমল বাণিজ্যে গেলে তাহাকে দেখিবার তেমন কেউ থাকিবে না। তাহার রূপ-যৌবনের উদ্গম হইতেছে। এ-হেন যৌবন নিয়া সে কি করিবে তাহাই তাহার একমাত্র চিন্তা। এ রূপ কি সে কাহাকেও দেখাইবে না!

পতিরে ধন, বামরূপ কাকো না দেখাব।
এহেন অঙ্গের যৈবন কোন গাউয়ারুক দিব!!

স্বামী বাণিজ্যে গমন করিলে তাহার দুর্দ্দশার অন্ত থাকিবে না। তাহার জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়া পড়িবে। তবে, স্বামী যদি একান্তই তাহাকে ছাড়িয়া যায়, তাহার চিহ্নস্বরূপ কিছু সে পাইতে চায়। তাই সে তাহার ঘাড়ের গামছাখানি মাগিয়া লইতেছে, তাহাকে-ই সে বুকের সম্বল করিবে।

পতিরে ধন,
তোমরা যায়ছেন[৩] দুরন্তাশ
হামার[৪] নাগ্‌ছে[৫] ধাঁধা।
তোমার ঘাড়ের শ্যামলাই[৬] গাম্‌ছা
রাখিয়া যান বোল বাঁধা॥
তোমার ঘাড়ের শ্যামলাই গাম্‌ছা
মুই খাব না বিলাব।
যখন আমার পড়্‌বে মনে
হিদ্দে[৭] তুলে নিব।

* 'অলকা' পত্রিকা—আষাঢ় সংখ্যা, ১৩৪৬ সাল।

১। চান্‌দামা সহর—বর্ত্তমানে এই সহরের কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। তবে, Hunter's Imperial Gazettee-এ চান্দনিয়া গ্রামের উল্লেখ আছে। এখানে নাকি চাঁদ সদাগরের বাড়ী ছিল, Imperial Gazettee, Page 394.

২। পাটগ্রাম—জলপাইগুড়ী জেলায় অবস্থিত। এ গ্রাম এখনো বিশেষ সমৃদ্ধ।

৩। যায়ছেন—যাইতেছেন।

৪। হামার—আমার।

৫। নাগ্‌ছে—লাগিতেছে।

৬। শ্যামলাই—শ্যামবর্ণ।

৭। হিদ্দে—হৃদয়ে।

পুরুষের সহিত নারীর সম্বন্ধ অত্যন্ত মধুর। পুরুষ ভিন্ন নারী থাকিতে পারে না। নারী পুরুষের শোভা বিশেষ—নারীকে না হইলে পুরুষের চলে না। তাহার জীবনের সম্পূর্ণতা সাধন হয় না।

খুলৃতির[৮] শোভা গাছ গাছালি,
আস্তার শোভা গাড়ী।
বাড়ীর শোভা ময়না পাখী,
পুরুষের শোভা নারী॥

স্বামীবিহীন জীবন নারীর নিকট চন্দ্রহীন গগনের তুল্য। স্বামী কাছে থাকিলে তাহার সুখ। স্বামী কাছে না থাকিলে তাহার দুঃখভাবনার অন্ত থাকে না।

পতিরে ধন,
সগ্গতে নাইরে চন্দ্র কি করিবে তারা।
যে নারীর সোয়ামি নাই দিনে[৯] অন্দিহারা॥
যে নারীর সোয়ামি আছে, আন্দে[১০] বাড়ে খায়।
যে নারীর সোয়ামি নাই ভাবিতে জনম যায়॥
চৌকিতে নাইরে মৈচ্ছ[১১] বক বা কি করে।
যে নারীর সোয়ামি না মন বা কেমন করে॥

দুবুলার কাতর মিনতি চলমলকে বাণিজ্য যাইতে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। দুবুলা তখন স্বামীকে পথ চলিবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিল। পুরুষের মন কখন কি হয় বলা যায় না। পুরুষ সহরে বন্দরে নষ্ট হইতে পারে।

না-ও নষ্ট খেওয়ার ঘাটে
নারী নষ্ট বাপ মা-ওর দেশে
পুরুষ নষ্ট সহরে বন্দরে॥

নৌকা পথে চলিবার সময় দুবুলা স্বামীকে কতকগুলি বিষয় মনে রাখিতে বলিল। বাতাসের গতি দেখিয়া সাধু যেন নৌকা চালনা করেন। নৌকা ও মাঝির প্রতি যেন দৃষ্টি রাখেন।

ও প্রাণ সাধুরে,
পুড়িয়া[১২] পাছিয়া বাও,
খোপা চাআ বান্দেন নাও,
ডারি মাঝি আখো সাবধানে॥

সাধু যেন পথে সকলের সহিত সদ্ব্যবহার করেন। সকলকে যেন মধুর বচনে আপন করিয়া নেন। কে জানে বিদেশে বিপদ হইতে কতক্ষণ!

ডারি মাঝি ষোল জন,
না বলেন সাধু দুর্ব্বচন
মুখের পেমে নিগান[১৩] নৌকা বয়ারে॥
যেইখানে সাউধের মেলা,
সেইখানে চান্দেন গোলা,
বুঝি-সুজি করেন বেচা-কিনারে॥

চলমল নানারূপ প্রবোধ প্রদানে দুবুলাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিলেন। দুবুলা কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর কোলে নিদ্রামগ্ন হইল। এই সুযোগে চলমল দুলাই মাঝিকে ডাকিয়া নৌকা সাজিয়া বাণিজ্যে গমন করিলেন। ঘুম হইতে উঠিয়া দুবুলা দেখে, তাহার স্বামী কাছে নাই। তখন সে স্বামীর জন্য কত কাঁদিল, তাহার বাহু ধন লোভকে ধিক্কার দিল।

ধন কাঙ্গালী রাজার ছাইলা ধনক লাগি মরে।
ঘরে থুইয়া কাঞ্চা সোনা বৈদেশ ঘুরি' মরে॥

প্রকৃতির সর্ব্বত্র উৎসব লাগিয়া আছে। কতজন কত কি সামগ্রী বানাইয়া প্রিয়জনকে উপহার দিতেছে। দুবুলার ঘরে স্বামী নাই; সে আজ সর্ব্বসুখ হইতে বঞ্চিত। মাসের পর মাস চলিয়া যাইতেছে, প্রতিমাসে প্রিয়-জনের জন্য অনেকে কত আয়োজন করিতেছে। কিন্তু দুবুলা দিনের পর দিন দুঃখের ভার বহন করিয়াই চলিয়াছে।

এহি ত আগোণ মাস নয়া হেউতি ধান।
কেউ কাটে কেউ মাড়ে, কেউ করে নবান্॥

৮। খুলৃতি—আঙ্গিনা, বাগিচা।

৯। অন্দিহারা—দিশেহারা, অন্ধকার।

১০। আন্দে—রন্ধন করে।

১১ মৈচ্ছ—মৎস।

১২। পুড়িয়া…বাও—ফাল্গুন, চৈত্র মাসের পশ্চিমের বাতাস বিশেষ উত্তপ্ত। এ সময়ের বাতাস বিশেষ মারাত্মক। অনেক ঘরে আগুন লাগে। রংপুর জেলায় এখনো চোরকে পুড়িয়া পাছিয়ায় খাজনা দিতে হয়, নহিলে ঘরে আগুন লাগিবার ভয় থাকে।

১৩। নিগান—লইয়া যান।

কেউ করে আলো আলোপ কেউ নয়া গাভীর দুধ।
মোর ঘরে সোয়ামি নাই নবানের নাই সুখ ॥
এহ মাস গেল হুবুলার না পূরিল আশ।
নব ডগুহিত (?) নৈয়া পৈল পৌষ মাস ॥
এহি ত পৌষমাস পস্থ-নাম ধারি।
আগুণের ছলে কন্যা বেড়ায় বাড়ী বাড়ী ॥
কেউ ভাজে, কেউ পোড়ে—কেউ বসি' খায়,
মোর ঘরে সোয়ামি নাই, পস্থুনা বৈয়া যায় ॥
এহ মাস গেল হুবুলার না পূরিল আশ্।
নব ডগুহিত (?) নৈয়া পইল মাঘ মাস ॥
এহি ত মাঘ মাস কুরুলায় জড়ায় ভাসা।
জড়াউক জড়াউক ভাসা পাড়ে মারিস তার ছাও।
এ জগতে না শুনিম আর কুরুল্লার আও ॥

কোকিলের ডাক তাহার নিকট বিকট বলিয়া মনে হয়। তাই সে কোকিলের বাসা ভাঙ্গিতে চায়—জীবনে সে আর কুরুলা বা কোকিলের ডাক শুনিবে না।

এইরূপে ভাবিতে কাঁদিতে পথ দেখিতে হুবুলার দিন চলিয়া যায়। তাহার প্রাণপতির ফিরিয়া আসিবার কোনই লক্ষণ সে দেখিতে পায় না। প্রতিদিন সে ফুলবাড়ীর ঘাটে বসিয়া কাঁদে। রাজার কোটাল তাহা লক্ষ্য করে। সে হুবুলাকে ভুলাইয়া আপন বশে লইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার স্বামী নাকি বিদেশে গিয়া অন্য নারীর প্রেমে মজিয়া আছেন। তাহার প্রমাণস্বরূপ কোটাল চলমলের একখানি পত্র দেখাইল। তাহাতে নাকি লেখা আছে যে, চলমল তাহার জননী লক্ষ্মী মাতাকে দেখিবার জন্য শীঘ্র দেশে আসিবেন এবং হুবুলার সহিত সাক্ষাৎ—আলাপ না করিয়াই ফিরিয়া যাইবেন। হুবুলা প্রথমে তাহা বিশ্বাস করে নাই,—কিন্তু কোটালের চক্রান্তে সে প্রতারিত হইয়া বিদেশপ্রত্যাগত স্বামীর বধের আয়োজন করিতে লাগিল। তাহা করিলে নাকি কোটাল তাহার সুখের উপায় বলিয়া দিবে। এই রূপেই পুরুষ কর্ত্তৃক সরলা নারী প্রতারিত হইয়া থাকে।

সৎকথাতে সতীর মন ভোলে—
মধুমাখা কথায় নারীর মন চুরি করে।
পুরুষজাতি নানা যাদু জানে
লাগাইয়া প্রেমের চুরি আস্তে আস্তে টানে ॥

হুবুলা স্বামীকে বধের জন্য ছুরী বানাইয়া আনিয়া রাখিয়া দিল। এদিকে, চলমল দেশে ফিরিয়া যাইতে মন করিলেন। তিনি নৌকা বোঝাই করিয়া ধনসম্পদ লইয়া বাড়ী আসিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। মাঝিগণ তালে-মানে গান জুড়িয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল।

টলমল সাধুর হুমুক জারি
ভাইটাও ডিঙ্গা ত্বরা করি।
ডিঙ্গায় বসিছে টলমল মাথা চান্দিয়া,
টোপের উপর কাছারি দেখি লোক গিছে ভরিয়া ॥

তাল বাগান, খয়ের বাগান, লিচু বাগান, কলা বাগান প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া ক্রমে নৌকা ফুলবাড়ী ঘাটে উপস্থিত হইল। সেখানে হুবুলা কলসীতে জল ভরিতেছিল। চলমল দূর-হইতে তাহাকে দেখিয়া না চিনিয়া-ই যেন তাহার উদ্দেশ্যে গান জুড়িলেন।

জলভর সুন্দর—কইনা,
জলে দিয়া ঢেউ।
একেলা ঘাটে এইসাছ কন্যা
সঙ্গে নাই তোর কেউ ॥

হুবুলা ও তাহার সঙ্গে কথা কাটাকাটি আরম্ভ করিয়া দিল। এই গানটি পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকায় পাওয়া যায়। বাঙ্গালার রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পল্লীগীতিতে ইহার সন্ধান মিলে। হুবুলা ও চলমলসাধু পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল—

—তুমি ত রাজার ছাইলা বিভাও করতে পার।
পরার রমণীকে দেখি কেন অইলা মর ॥
—আমি ত রাজার ছাইলা বিভাও করতে পারি।
তোমার মত উপের কন্যা মিলাইতে না পারি ॥
—আমার মত উপের কন্যা যদি মিলাইতে চাও।
গলায় কলসী বেন্দে জলে ঝম্প দেও ॥
—কোথায় পাব কলস কন্যা কোথায় পাব দড়ি।
তোমরা হইলেন জোয় যমুনা আমরা ডুবে মরি ॥

ইহার পর আর বলিবার কিছু নাই। সাধু একেবারে নিরুদ্দেশ [illegible]। হুবুলা সাধুকে চিনিতে পারিল, সে তখন 'পাগলীর' মত ছুটিয়া পলাইল।

তখন নাই বান্দে কন্থা ধুতি, নাই বান্দে চুলি।
দৌড়ি দিয়া পলাইছে যেন কুমুতি পাগলী॥

চলমল মায়ের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া রাত্রে ছবুলার ঘরে প্রবেশ করিলেন। ছবুলা স্বামীর ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছিল—কোটালের পরামর্শের কথা তাহার মনে কাজ করিতেছিল। ছবুলা স্বামীর জন্য রন্ধন করিয়াছিল। তাঁহাকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইল। সারাদিনের পরিশ্রমের ফলে, চলমল শয্যায় ঢলিয়া পড়িল। ছবুলার সহিত কোনরূপ আলাপ হইল না। ইহাতে সে দোষ পাইয়া "পানির তেজের ছুরি" দিয়া স্বামীর জীবন নাশ করিল।

স্বামীকে বধ করিয়া ছবুলা কোটালের নিকট গমন করিল। কোটাল তাহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইল। মনের দুঃখে সে ঘরে ফিরিল এবং "নীল নদীর" মধ্যে স্বামীর মৃত দেহ ভাসাইয়া দিল।

পরদিন সকালে লক্ষ্মী মাতা পুত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ছবুলার নিকট প্রশ্ন করাতে সে পাকচক্রে তাহা এড়াইতে প্রয়াস পাইল। লক্ষ্মীমাতা নীল নদীর জলে পুত্রের ভাসমান মৃতদেহ উদ্ধার করিলেন এবং মৃতদেহ লইয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিলেন। তাঁহার আকুল ক্রন্দনে মহাদেব বিচলিত হইলেন এবং নারদের নিকট সংবাদ লইয়া জানিলেন যে লক্ষ্মীমাতা পুত্রের জন্য কাঁদিতেছেন। তখন তিনি মন্ত্র-প্রয়োগে চলমলের জীবন দান করিলেন।

এদিকে ছবুলা বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইল। তাহার ফাঁসীর আজ্ঞা হইল। ফাঁসীর দড়ি ছিঁড়িয়া যাওয়াতে সে পরিত্রাণ পাইল। ছবুলা তখন মনের দুঃখে কোন ময়দান আশ্রয় করিল। সেখানে সে স্বামীর নামে একটি কাঙ্গালখানা খুলিয়া বসিল। লক্ষ্মীমাতা পুত্র চলমল সাধুকে সঙ্গে লইয়া ঘটনাক্রমে সে স্থানে উপস্থিত হইলেন। ছবুলা বিশেষ পরিতোষসহকারে তাহাদের অতিথি সৎকার করিল। শেষে নিজের দোষ স্বীকার করিয়া স্বামীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

পরার বুদ্ধিতে কাটিছু পতিধন,
ফুল বিছানার মাজে।
দোষ গুণা মোর মাফ করিস্
পাওঁ ধরি কওঁ তোরে॥

চলমল ছবুলাকে লইয়া দেশে ফিরিলেন। ছবুলার পরামর্শমতে চণ্ডী পূজার আয়োজন করা হইল। অন্যান্য অভ্যাগতের ন্যায় কোটাল সেখানে উপস্থিত হইল ছবুলা তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল—সে তখন "পানির তেজের ছুরি" লইয়া চণ্ডীমন্দিরে উপনীত হইল। কোটাল চণ্ডীকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে সে তাহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিল।

ইহাই হইল গানের বিষয় বস্তু। সম্ভব অসম্ভব অনেক কিছু মিশাইয়া গানটিকে রূপ দেওয়া হইয়াছে। তথাপি এই গানে যে শিক্ষণীয় বিষয় আছে, তাহা উপেক্ষার নয়।



বিভীষিকা

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মৈত্র

মাঠের উপর জরিপের কাজ চলিতেছিল,...টেন্ট্ খাটাইয়া কাজ চলিতেছে, দু'জন ক্লার্ক এবং আর সব কুলি-মজুরের দল। যে ছেলেটি এইমাত্র কার্য্যে ইস্তফা দিয়া চলিয়া গেল, তাহাকে দেখিয়া কুলিমজুর বলিয়া মনে করিতে সহসা বিশ্বাস হয় না। ফর্সা গায়ের রং, পরণের কাপড়খানা বাগাইয়া মালকোঁচা করিয়া পরা। দুপুরের রোদে পাঞ্জাবীদের সঙ্গে মিশিয়া অজস্র গালাগালি খাইয়া কাজ হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরে। পাঞ্জাবীরা যতখানি কষ্টসহিষ্ণু হয়, বাঙ্গালীর ছেলে অতখানি সাধারণত হয় না। তাই লইয়াই এই বিবাদ। ছেলেটিকে বলা হইয়াছিল, প্রকাণ্ড একটা পিলার বহিয়া লইয়া যাইতে, কিন্তু সে তাহা পারে নাই। ইহাই তাহার মস্ত অপরাধ,—সঙ্গে সঙ্গে গালিবর্ষণ। বাঙ্গালীর ছেলে; পাঞ্জাবীর গালি তাহার সহ্য হয় নাই। মুখের উপর কড়া করিয়া শুনাইতে সেও কসুর করিল না। প্রত্যহ এরূপ গালি, আর সহ্য হয় না। সারাদিন রোদে কাজ করিয়া, কাহার শরীর ও মন ঠিক থাকে?—

কথাটা শুনিলাম। কাজকর্ম্মে যাবতীয় রিপোর্ট, আমাকেই শুনিতে হয়...কাজেই তাহারটাও শুনিতে বাদ পড়িল না। ছেলেটিকে মাঠে গিয়া প্রায়ই দেখি, ভাল করিয়া কোন দিন দেখি নাই। শুধু মনে ছিল, ছিপ্ছিপে একটি ফর্সা চেহারা, পাঞ্জাবী দলের সহিত মিশিয়া, সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া দিনশেষে গৃহে ফিরিয়া যায় এবং সেই পরিশ্রমের মূল্য স্বরূপ মাস শেষে পায় পঁচিশ টাকা। তাহাতেই তার কি আনন্দ! মনের মধ্যে সে কি দুরন্ত উল্লাস। আজ তাহারই ডাক পড়িল আমার কক্ষে। সসঙ্কোচে আসিয়া দাঁড়াইল; সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার ধারে; সঙ্গে সঙ্গে ঢুকিল রামতারণ সিং লম্বা, চওড়া জোয়ান পাঞ্জাবীটা। কৃত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তের দিন আজ।

"কি নাম তোমার?"—

"বিশ্বরূপ রায়—"

'রায়! মনটা দমিয়া গেল, ভদ্রলোকের ছেলে কি এমন পিতৃমাতৃদায় পড়িয়াছে, যাহার জন্য এই উঞ্ছকাজে তাহাকে নামিতে হইয়াছে। বিশ্বরূপ ভদ্রসন্তান, অনুমান আমার ভুল হয় নাই।

"কতদিন হোল কাজ করছ এখানে—"

"আজ তা দু'মাস হয়ে গেল—"

"তোমার Salary—"

"Daily wage এ কাজ করি। ঠিকাদার আমরা—"

"ওদলে তোমরা কজন আছ?—"

"আরও তিনজন Chinaman আছে—"

"তাহলে সবশুদ্ধ চারজন? সেদিন মাঠে কি গোলমাল করেছিলে? তোমার নামে Report করেছে।"—

"আজ্ঞে হ্যাঁ, একটু গোলমাল হয়েছিল।"—

"কি জন্যে Contradict করতে গেলে ?"—

"বিশেষ কিছু নয়। পাঞ্জাবী মিস্ত্রী আমায় খাড়া করে পিলার বইতে বলেছিলো, কিন্তু আমি পারিনি। সেইজন্য আমায় গালগাল করেছিলো—"

"পয়েলে হাম্ কুছ্ নেই বোলাথা"—রামতারণ রুখিয়া প্রতিবাদ করিল। তাহাকে থামাইয়া দিলাম! বিশ্বরূপকে কহিলাম—"বলো"—

বিশ্বরূপ সমস্তই বলিয়া গেল।—রিপোর্ট পাঠাইয়া দিলাম, পিটার সায়েবের কাছে। কয়েকদিন পরে শুনিলাম বিশ্বরূপকে, কাজ হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। ক্ষণেকের জন্য বিশ্বরূপের কৃশ মুখখানা চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল।

তাহার পর মাসকয়েক কাটিয়া গিয়াছে। বৎসরও প্রায় ঘুরিয়া যাইতে চলিল। কোম্পানীর কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কনট্রাক্ট্ এর কাজ। এবার যাইতে হইবে অনেকদূর। বাকী মাত্র কয়েকমাস যেন কতগুলা মুহূর্ত্ত। কাজ শেষ করিয়া ফিরিতেছি, বাড়ীর দিকেই, সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে; হঠাৎ কাহার কণ্ঠস্বরে পিছন ফিরিয়া চাহিলাম, চিনিতে বিলম্ব হইল না—বিশ্বরূপ। কহিলাম—"কিছু বলবে ?"—ছেলেটি একটু যেন বিচলিত হইল, পরে কহিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ—বড় ক্ষিদে পেয়েছে, দু'টো পয়সা দেবেন ?"—বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হইয়া প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকাইয়া দিলাম, কহিলাম—"কি করছো এখন ?"—বিশ্বরূপ মুখ নীচু করিয়া কহিল,—"কিছুই করছি না; কে কাজ দেবে বলুন ?"—তাহার সুন্দর মুখখানা অনাহারক্লিষ্ট, তাহাকে বড় ক্ষুধাতুর দেখাইতেছিল। কয়েক আনা পয়সা তাহার হাতে দিলাম। বিশ্বরূপ আমারই মধ্যে কয়েকহাত ব্যবধান রাখিয়া, পার্শ্বে চলিতে চলিতে কহিল—"আমার একটা যাহোক উপায় করে দিন—।" উপায় কিই বা করিবার আছে! তবু সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে কহিলাম—"আচ্ছা কাল সকালে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।" কৃতজ্ঞতার একটু হাসি হাসিয়া ও ছোট একটুখানি নমস্কার করিয়া সে চলিয়া গেল।

অনুজের বছর আষ্টেকের মেয়েটার জন্য প্রাইভেট টিউটরের দরকার ছিলো; বিশ্বরূপকে নিযুক্ত করিলাম তাহাতেই। সে আমারই বাড়ীর একখানা ঘর লইয়া রহিল।

২

মাসখানেক কাটিয়া গেল, বিশ্বরূপ পূর্ব্বের মতই রহিয়া গেল। মাঝে মাঝে তাহার নামে অভিযোগ শুনিতাম যে রাত্রে ঘুমাইতে ঘুমাইতে সে নাকি চীৎকার করিয়া ওঠে; কেহ বলিল, পাগল, কেহ বলিল, মাথা খারাপ; কথাটা বিশ্বাস করিলাম, কেন না ঘুমের ঘোরে অনেকেই চীৎকার করিয়া ওঠে। কয়েকদিন শুনিয়া সত্যই একদিন বিশ্বরূপের নিকট কথাটা পাড়িয়া বসিলাম। সে মুখ নীচু করিয়া সামান্য একটু হাসিল মাত্র, ম্লান হাসি···।

"কথা কইছো না যে—?"

"কি জানি হয়ত চেঁচিয়ে উঠেছিলাম; কিন্তু—"

"তোমার বুঝি বিশ্বাস হচ্ছেনা—?"

"বিশ্বাস হবে না কেন ?"—

"ভয় টয় পেয়ো না যেন !"

"না ভয় সহজে পাই নে।"—বলিয়া সে একটু হাসিয়া পাশ কাটাইল। এক ঝলক বাতাস আসিয়া তাহার রুক্ষ চুলগুলা কপালের উপর ছড়াইয়া দিয়া গেল। বিশ্বরূপ ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম, বাস্তবিক, দুঃখ হয়। ঠিকাদারী কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। বিশ্বরূপকে ছাড়িয়া যাইতে মন সরিল না। তাহার উপর কেমন একটা মায়া পড়িয়া গিয়াছে। কেহই যার নাই তাহাকে অনিশ্চিতের মধ্যে ফেলিয়া যাইতে কেমন একটু বাধিল। মনে পড়িল মৃণালের কথা। আজকাল কোন্ কলিয়ারির ম্যানেজার সে...তাহাকে বলিয়া বিশ্বরূপের কোন উপায় যদি করিতে পারি! কথাটা বিশ্বরূপকে জানাইতে হইবে।

জানাইতে আর হইল না। পরদিন সে সসঙ্কোচে আসিয়া করবী গাছটার কাছে দাঁড়াইল। শীতের সকাল সামান্য একটু রৌদ্র আসিয়া গাছটার গোড়ায় পড়িয়াছে সেইখানেই বসিয়াছিলাম, বড় ভাল লাগে, এই করবীগাছ শীতের সকালের সাথী।

"পারবে, কাজ করতে, কয়লার খনিতে কুলি মজুরদের মত খাটতে"—বিশ্বরূপের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, আশার আলোকে। মুখে ঈষৎ হাসি টানিয়া সে কহিল "কেন পারবো না ?"—

"এখনও ভেবে দেখো—"

'এতে ভাববার আর কি আছে ? কত লোকেই ত কাজ করছে।"—

—একটু থামিয়া সে আবার সুরু করিল—"আপনার কথা, চিরদিন মনে থাকবে। আপনার মত লোক আর নেই। কিন্তু যেমন করেই হোক আমার একটা ব্যবস্থা আপনাকে করে দিতেই হবে। ছোট ভাইয়ের সামনে পরীক্ষা, এবছর আই, এ দেবে। সেই টাকা কোথা থেকে জোগাড় করি, এই হয়েছে মস্ত ভাবনা। আমি ছাড়া তাকে দেখবার আর কেউ নেই। দেশে মা আছেন ; ধান বিক্রী করে তিনি কিছু টাকা জোগাড় করেছেন। এখনও অনেক টাকার দরকার। ভয়ানক ভাবনা হয়েছে, এত টাকা পাবো কোথায় ? রাতে ঘুমোই না, সেই জন্যেই বোধ হয় চেঁচিয়ে উঠি, যেমন করেই হোক এ উপকারটুকু আমার করে দিন ! আর বলবার আমার কিছুই নেই। বিশ্বরূপের স্বর অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

"থাক, আর শুনতে চাইনে—", সত্যই মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল, এইটুকু ছেলে, দিবারাত্র বুকের মধ্যে কি বিশাল ঘুমন্ত আগ্নেয় গিরি বহন করিয়া চলিয়াছে, বাহির হইতে দেখিয়া তাহা কে অনুমান করিতে পারিবে ? এত দিনে জানিলাম, তাহার যাতনা কতখানি এবং কোথায় ? কহিলাম—মুখুজ্জেকে লিখে দেবো তা নিয়ে কাল যেও।—

মুখুজ্জে আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু, বড় ভাল লোক। বিশ্বরূপ একটুখানি কৃতজ্ঞতার হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল। ভ্রাতার পরীক্ষার জন্য যাহার এতখানি আগ্রহ, এতখানি চিন্তা, এতখানি আশা, সে যে কেমন করিয়া বিদেশে আসিয়া আয়াসে দিন কাটাইতেছে ও টাকার বিভীষিকা দেখিতেছে ইহাই আশ্চর্য্য। বাঙ্গলার একখানি শান্তিপূর্ণ সুখের নীড়, ছায়ায় ঘেরা নির্জ্জন একখানি ঘর চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। বিশ্বরূপ সত্যই পাগল। মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু বৃথা, বারে বারে তাহার মুখখানা চোখের উপর ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু সেই বিশ্বরূপের আর দেখা পাওয়া গেল না। শুনিলাম কোলিয়ারির কোন এক বস্তিতে থাকিয়া সে দিনপাত করিতেছে।

দু' নম্বর পিট্‌এ ভীষণ ধর্ম্মঘট, হল্লা গোলমাল, মারামারি। মুখুজ্জের নিকট হইতে খবর পাইয়াছিলাম, বিশ্বরূপ কাজ করিতেছে ভাল, আজ কয়েকদিন হইল, কেবলই তাহার কথাটা মনে হইতেছে। মাত্র দুদিন বাকি, দুদিন পরেই সকলকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে সুদূর পাঞ্জাব।

সকালের দিকে আসিয়া বসিয়াছি, সেই পুরাতন করবী গাছটার তলায়, শীত তখনও যেন একটু আছে, ছাড়ি ছাড়ি করিয়াও যাইতে পারে নাই। এমনি আর এক সকালবেলার কথা মনে ভাসিয়া উঠিল।

"দু" নম্বর পিট্‌এ কাল রাতে সাবসাইড হয়ে গেছে, শুনেছ?—চমকাইয়া উঠিলাম মুখুজ্জের কণ্ঠস্বরে "সা-ব-সা-ই-ড্‌" !

হুঁ, কাল রাতে—প্রায় আড়াইটের সময়। নাইট্‌ সিফ্‌টের একজনও বাঁচে নি। কে যে কোথায় চাপা পড়ে গুঁড়িয়ে গেছে, এখনও তার কোন খবরই পাওয়া যায় নি! উঃ কি টেরিবল্‌ ডেথ্‌ বলোত—?

দু নম্বর পিট্‌এ সাবসাইড্‌?—কথাটা যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। "কেমন করে হোল? বিশ্বরূপের খবর কি?"

"সেও সম্ভবতঃ পাথরের তলায় চাপা পড়ে গেছে"—

"তার মানে শেষ হয়ে গেছে? তুমি বলছ কি? সে মারা গেছে?"—

"হুঁ এক্‌স্‌ট্রিম্‌ থেকে পিলার কাটিং হচ্ছিল, হঠাৎ এক্‌সিডেন্ট্‌টা কেমন হয়ে গেছে তা অমন করছ কেন? কলিয়ারিতে এক্‌সিডেন্ট হবে না, তো হবে কোথায়?"—

"তুমি আমাকে অপরাধী করে গেলে মুখুজ্জে, আমিই তাকে একাজে পাঠিয়েছিলাম, তাকে জোর করে কয়লার খাদে নামিয়েছিলাম। তার টাকার দরকার ছিলো বড় বেশী"...

"সে তো ইচ্ছে করেই কাজ নিয়েছিলো।"—

"না, না ইচ্ছে করে নয়, তুমি জানো না, সে ওখানে কাজ নিতে বাধ্য হয়েছিলো।—উঠিয়া আসিলাম। বিশ্বরূপ, বিশ্বরূপ—কথাগুলো যেন জিহ্বায় জড়াইয়া যায়, তালু শুকাইয়া গিয়াছে, কলিয়ারির ধূমায়মান শিখা, ঐ দূরের দামোদরের চর, ঐ বস্তি, সবই আছে। মাথাটা যেন ধরিয়া উঠিয়াছে, তপ্ত বহ্নিশিখা, শরীরের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ছোটাছুটি করিতেছে; কি দেখিতেছি কে জানে। চাকররা আসবাব পত্র গুছাইয়া তৈয়ারী হইয়া,—এখনি গাড়ী আসিবে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। হয়ত আর কোন দিন এ পায়ের চিহ্ন এদেশে পড়িবে না, তবুও মরণের মুখে যাহাকে ঠেলিয়া দিয়াছি, তাহাকে হয়ত কোন দিনই ভুলিতে পারিব না। অবসন্ন দেহমন লইয়া বাহিরে আসিয়া ভাল করিয়া একবার চারিদিক দেখিয়া লইলাম।

পিছনে ডাক শুনা গেল,—"সায়েব বাবু"—ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিলাম, ডাক পিয়ন। প্রত্যহই তাহাকে দেখি, চেনা আছে, কহিলাম—"কি আছে?"—"মনি অর্ডার একনলেজমেণ্ট" (Acknowledgement)।

"কার নামে?"—

"বিশ্বরূপ রায়!"—

বুকখানা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। তাহা চাপিয়া কহিলাম "দাও"—পিয়ন ছোট কাগজের টুকরাখানি দিয়া চলিয়া গেল। বিশেষ কিছুই নয়। বিশ্বরূপের ভ্রাতা টাকা পাইয়া সই করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

পৌষনিশির স্বপ্ন

শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার

শূন্য শয়নে ঢুলি লঘু তন্দ্রায় ;
কোমল গলায়,
মনে হ'লো, কহিল কে, 'সময় যে নাই !'
দ্রুত পায়ে দ্বার খুলে' দূর পানে চাই,
কাঁপে প্রাণ আশা-নিরাশায়।

সাঁ সাঁ করে চারিধার ; নীরব নিশীথ ;
পৌষের শীত ;
স্খলিত চরণে নেমে চলি নদী তীর,
ডিঙি খুলে' বেয়ে' যাই ; দ্রুত ক্ষেপণীর
তালে তালে ওঠে কলগীত।

স্পষ্ট দেখিনু, দূরে কালো নৌকায়
রমণী কে যায়।
কুহেলিমলিন চাঁদ ; হাড়ে বেঁধে হিম
তরণীর ছায়াতলে স্তিমিত পিদিম
বিম্বিত শীর্ণ রেখায়।

একাকী সে কোথা যায় ? রাত দু'পহর ;
মনে জাগে ডর।
কী যে হ'লো, তীর বেগে পিছে পিছে যাই ;
তরী ধায়, তবু তা'য় কাতরে শুধাই,
'কোথা যাস্ ? কোথা তোর ঘর ?'

'কোথা যাস্ ? সমুখে যে অসীম আঁধার,
অকূল পাথার !
শোনে না সে ; চোখে তা'র পড়ে না নিমেষ ;
বিরস অধরে ক্ষীণ কম্পন-রেশ ;
দ্রুত শ্বাসে কাঁপে দেহভার।

মনে হ'লো চিনি ওরে, তবু মনে হয়
নাহি পরিচয়।
অনায়াসে এ আঁধারে কোথা চলে' যায়,
তূর্ণ তরণী 'পরে কোন্ অজানায় !
চেয়ে রই শূন্য হৃদয়।

তরণীতে কা'রা ঐ ছায়াদেহ প্রায়
দাঁড় ফেলে' যায় !
হাল ধরে' কোন্ জন ? ও-কি রে আঁধার ?
রমণী কি চেয়ে রয় মুখ পানে তা'র
নির্ব্বাক্ হতচেতনায় ?

মেশে তরী কুয়াশায় কাণে আসে তা'র
ছপ্ ছপ্ দাঁড় ;
ধূসর কুহেলিজালে গুণ্ঠিতকায়
ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর শব্দ মিলায়
দক্ষিণ দিগন্তপার।

হীরা ও কিরণময়ী

শ্রীহরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

বঙ্গসাহিত্যে যে দুইটি উজ্জ্বল নারী-চরিত্র সাধারণ দৃষ্টিতে পরস্পর ভিন্নগোত্রীয় বলিয়া মনে হয়—মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া তাহাদের প্রকৃতিগত অদ্ভুত সাদৃশ্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই দুই নারীই বঙ্গীয় পাঠকসমাজে সুপরিচিতা ; একজন বঙ্কিমচন্দ্রের 'হীরা' ও অপরজন শরৎচন্দ্রের 'কিরণময়ী'।

বিষবৃক্ষে যে পটভূমিতে হীরা দণ্ডায়মানা, আভিজাত্য বা বংশমর্য্যাদার দিক্ দিয়া তাহা নিতান্তই মলিন—সে দাসী। সমাজে তাহার প্রতিষ্ঠা নাই, মূল্য নাই ; সে আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে না। ক্ষেত্রবিশেষে সে হয়ত' আমাদের অনুকম্পা উদ্রেক করিতে পারে, কিন্তু আত্মীয়তার দাবী জানাইবার অধিকার তাহার নাই। আমাদের সামাজিক মন তাহার স্পর্শভয়ে সঙ্কুচিত, পাশ কাটাইয়া দূর দিয়া তাহাকে চলিতে হয়। তাহার গুণপণায় মুগ্ধ হইয়া আমরা তাহাকে ভাল বলিতে পারি, কিন্তু ভালবাসিতে পারি না।

হীরা অশিক্ষিতা পল্লীনারী, তাহার বেশভূষায়, কথাবার্ত্তায়, চালচলনে, মার্জ্জিত রুচির পরিচয় মিলে না। দৈহিক সৌন্দর্য্যেও সে আমাদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে না—সে রূপবতী নহে। সে প্রখরা, সে প্রগল্ভা, হয়ত' বেশ একটু বুদ্ধিমতীও।

আর কিরণময়ী!—উচ্চবংশসম্ভূতা, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘরের বঙ্গবধূ। অসামান্য তাহার রূপ,—আমাদের মুগ্ধ করিয়া তুলে। আলোকশিখার মত প্রদীপ্ত বুদ্ধির জ্যোতিতে সে উজ্জ্বল। সে তার্কিকা, কুশাগ্রবুদ্ধি তাহার যুক্তির নিকট আমাদের পরাভব স্বীকার করিতে হয়। তাহার বাক্যে মোহিনী আছে, সে মার্জ্জিত রুচিসম্পন্না, স্বতঃই সে আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। বংশগরিমায়, সৌন্দর্য্যে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে সমাজের বিশিষ্ট স্থানে তাহার আসন।

উভয়ের এত বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও অপূর্ব্ব সৃষ্টি এই দুই নারী অভিন্ন। সেখানে কুলবধূ ও দাসী, রূপসী ও রূপহীনা, বিদুষী ও অশিক্ষিতা পাশাপাশি সমস্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অপরিতৃপ্ত ভোগবাসনায় এই দুই নারীর জীবনে, সংস্কার ও সমাজ-শাসনের উপরে দেহধর্ম্ম জয়ী হইয়া দেখা দিয়াছে। কিন্তু তাহারা উচ্ছৃঙ্খল হয় নাই, লক্ষ্য তাহাদের স্থির ছিল—সেখানে তাহাদের নিষ্ঠা লক্ষ্য করিবার বস্তু।

হীরার জীবন বাল্য-বৈধব্যহত, অবরুদ্ধ ভোগবাসনা তাহার অন্তরে নিহিত ছিল। জমিদার নগেন্দ্র দত্তের গৃহে দাসীবৃত্তিরতা এই নারীর বিক্ষোভহীন অচঞ্চলতার মধ্য দিয়াই নিঃশব্দে দিন অতিবাহিত হইতেছিল। তাহার পর জমিদার গৃহে গায়িকা হরিদাসী বৈষ্ণবীর আবির্ভাব ও তাহার আকার-ইঙ্গিতের মধ্য দিয়া কুন্দ-সান্নিধ্যের লোভ, সূর্য্যমুখীর মনে সন্দেহের ছায়াপাত করায় চতুরা হীরাকেই সূর্য্যমুখী বৈষ্ণবীর প্রকৃত-পরিচয় সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করিল। সূর্য্যমুখীর এই সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্তই হরিদাসী বৈষ্ণবীর সন্ধান করিতে গিয়া, দেবেন্দ্র-দর্শনে হীরার সুপ্ত প্রণয় আন্দোলিত হইয়া উঠিল ও সেইদিন হইতেই সে মনে মনে তাহার সর্ব্বস্ব, অকপট হৃদয়ে দেবেন্দ্রে সমর্পণ করিয়া বসিল।

কিরণময়ী প্রথম যৌবনে স্বামীকে পাইলেও একপ্রকার বৈধব্য-জীবনই সে যাপন করিয়াছে। স্বামীর সহিত সম্বন্ধ ছিল তাহার শিক্ষক ও ছাত্রীর। রুগ্ন, গম্ভীর ও কর্কশ প্রকৃতি স্বামীর নিকট যে নির্য্যাতিতা হইয়াছে, জ্ঞানলাভ করিয়াছে, স্নেহ পাইয়াছে, কিন্তু ভালবাসা পায় নাই। শ্বশ্রূ অঘোরময়ীও বধূকে কম নির্য্যাতন করেন নাই। জ্ঞান-পিপাসোন্মত্ত হারাণ, দুঃসহ অন্তর্দ্দাহে অবলুণ্ঠিতা এই ছিন্ন-লতিকার প্রতি মুহূর্ত্তের জন্যও ফিরিয়া তাকায় নাই।

কিরণময়ীর নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ বৎসরগুলি যখন

তাহার সকল সৌন্দর্য্য ও সকল মাধুর্য্য লইয়াও এমনি করিয়াই উপেক্ষিত হইতেছিল, দিনের পর দিন তিলে তিলে উপবাস-ক্লিষ্ট তাহার যৌবন যখন এমনি করিয়াই শীর্ণতর হইয়া আসিতেছিল, তখন তাহার জীবনের পথে অযাচিতভাবে অনঙ্গ ডাক্তার আসিয়া দাঁড়াইল। তাই তাহার রূপের অনলে আকৃষ্ট অনঙ্গ ডাক্তারকে অবলম্বন করিয়া কিরণময়ী বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু হীনপ্রকৃতি অনঙ্গ ডাক্তার কিরণময়ীর হৃদয়ে ছায়াপাত করিতে সমর্থ হয় নাই। তাই যেদিন হারাণের রোগশয্যাপার্শ্বে উপেন্দ্র তাহার অভ্রভেদী মহান্ চরিত্র লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল, তখন কিরণময়ী প্রথম-দর্শনে প্রেম সঞ্চারের আকর্ষণে আপনাকে পরিপূর্ণ বিশ্বাসভরে উপেন্দ্রেরই উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া বসিল, এবং অনঙ্গ ডাক্তারের কবল হইতে নিস্কৃতি পাইবার নিমিত্ত রমণীর প্রাণপ্রিয় যে অলঙ্কাররাজি, তাহা অনায়াসে নিঃশেষে তাহার পদতলে উজাড় করিয়া ধরিয়া দিল।

হীরা ও কিরণময়ী উভয়েরই প্রেম-নিবেদন প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের কেহই নিষ্ঠা হইতে বিচ্যুত হয় নাই। যদিও উভয়ের প্রণয়াসক্তির মধ্য দিয়াই সমাজ-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হইয়াছিল, তথাপি এই ভালবাসা ব্যর্থতার মধ্যেও, তাহাদের সমগ্র জীবনকে অপূর্ব্ব সংযমে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাই এই দুই নারীর প্রণয় শুদ্ধমাত্র যৌন আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সমাপ্তিলাভ করিতে চাহে নাই। অবিচলিত অনুরক্তির মধ্য দিয়া তাহাদের জীবনে দেহধর্ম্মের ঊর্দ্ধে হৃদয়ধর্ম্মের বিজয়-বার্ত্তাই ঘোষিত হইয়াছে।

দেবেন্দ্র দত্তকে হীরা অকপটে ভালবাসিয়াছিল, কায়-মনোবাক্যে সে তাহার প্রণয় প্রার্থনা করিয়াছে, কিন্তু যখন সে বুঝিতে পারিল দেবেন্দ্রের নিকট হৃদয়ধর্ম্মের কোনই মূল্য নাই এবং তাহার অন্তরে হীরার জন্য বিন্দুমাত্র প্রেমও সঞ্চিত নাই, তখন সে নিজেকে পুনরায় দাসীবৃত্তির মধ্যে নিমগ্ন রাখিয়া আপন ব্যর্থ-প্রণয়ের বেদনা ভুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু ছলনাপটু দেবেন্দ্র হীরাকে পুনরায় লুব্ধ করিয়া তুলিল। তাহার পর হীরা যখন দত্তের নিকট আত্মনিবেদন করিল, এবং পরিবর্ত্তে সেই দেবেন্দ্র নিতান্ত অবহেলায় পদাঘাতে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল, তখন—দলিতা ফণিনীর মতই সে নিরপরাধা কুন্দের অকালে জীবনাবসান ঘটাইয়া যে নিষ্ঠুর প্রতিহিংসার পরিচয় দিল—তাহাতে শিহরিয়া উঠিতে হয়। এই বিষাদঘন মরণ সমগ্র আখ্যায়িকার উপর যে যবনিকা টানিয়া দিল, তাহাই বিষবৃক্ষের 'ট্র্যাজেডি'।

নগেন্দ্র কুন্দকে বিবাহ করিবার পরেই সূর্য্যমুখী গৃহ হইতে নিরুদ্দেশ হইলে, আত্মগ্লানি ও ক্ষোভে ধৈর্য্যচ্যুত নগেন্দ্রের মনে হইতে লাগিল কুন্দই ইহার একমাত্র কারণ। তাই একপ্রকার অজ্ঞাতসারেই নিরপরাধা কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের অমনোযোগিতা ও অনাদর আত্মপ্রকাশ করিল।

এই নিঃসহায় নিরবলম্ব বালিকার দিনগুলি যখন এমনি নির্ম্মম অবহেলা ও অনাদরের মধ্য দিয়াই উদ্‌যাপিত হইতেছিল, তখন সহসা সূর্য্যমুখীর অপ্রত্যাশিত গৃহাগমনে নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে লইয়া যখন আত্মহারা, এহেন সময় ক্রন্দনরতা কুন্দের নির্জ্জন কক্ষে চতুরা হীরা আসিয়া দেখা দিল। দেবেন্দ্র-দংষ্ট্রাক্ষত হীরা আপন প্রতিহিংসা-সাধনের এই সুবর্ণ সুযোগকে বৃথা যাইতে দিল না। সে জানিত দেবেন্দ্রের নিকট সর্ব্বস্বের বিনিময়েও কুন্দই এখন একমাত্র প্রার্থনীয় এবং সেই কুন্দকেই তাহার এই বিশেষ মানসিক অবস্থায় আপন আয়ত্তের মধ্যে পাইয়া এই নারী, কৌশলে কুন্দের জীবন নাশের দ্বারাই আপন প্রতিহিংসা সাধনে উদ্যত হইয়া উঠিল। তাই কুন্দকে সান্ত্বনাদানের মিথ্যা অভিনয়ে সে কেমন করিয়া গোপনে বিষ সংগ্রহ করিয়াছে, তাহার ইতিহাস বলিতে বলিতে পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে একটি বাক্স আনিয়া সেই বিষের মোড়ক বাহির করিয়া কুন্দকে দেখাইল। তাহার পর তাহার সেই প্রেম ও প্রেমাস্পদকে কেন্দ্র করিয়া আপন ব্যর্থ-প্রণয়ের কাহিনী সুকৌশলে কুন্দের নিকট সে বলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তাহা শুনিবার জন্য কুন্দের কোনও মনোযোগ ছিল না; সেই বিষ মোড়কটির প্রতি কুন্দের এক অদ্ভুত লুব্ধ দৃষ্টি দেখিয়া চতুরা হীরা আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির আশায় কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

তাহার পর সেই বিষে সমগ্র আখ্যায়িকায় যে 'ট্রাজেডি' ঘনাইয়া উঠিল, তাহার তুলনা বিরল; অপরিপূর্ণ যৌবনে অতুল্য 'কুন্দ-কুসুম' সংসার উদ্যান হইতে অকালে ঝরিয়া পড়িল।

উপেন্দ্রের নিকট কিরণময়ীর প্রেম-নিবেদন যেদিন ব্যর্থ হইল সেদিনও এই অসাধারণ রমণী আপন সহিষ্ণুতা হারায় নাই। মুমূর্ষু স্বামীর সেবার মধ্যে, সংসারের কর্ম্মের মধ্যে, নিজেকে ডুবাইয়া রাখিয়া অসাধারণ সংযম বলে দিনের পর দিন দুর্ব্বহ জীবনভার সে বহন করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু যেদিন অঘোরময়ীর অভিযোগের মধ্য দিয়া কিরণময়ী ও দিবাকরের অবৈধ প্রণয়ের কুৎসিত ইঙ্গিত উপেন্দ্রের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল এবং এই মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে কিরণময়ীর প্রতিবাদে, উপেন্দ্র বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস না করিয়া, ঘৃণায় ও ক্রোধে তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল, তখন তাহার দুই চোখে যে প্রজ্জ্বলিত বহ্নিশিখা দেখা দিয়াছিল, তাহারই অসহ্য দাহে একটি নিরপরাধ নিরীহ জীবন কেন্দ্রচ্যুত হইয়া সুদূর আরাকানে দিনের পর দিন দগ্ধ হইতে লাগিল।

যে উপেন্দ্র চরিত্রবলে সংসারে সকলের বড় হইয়াছিলেন, সেই উপেন্দ্রের উন্নত মস্তককেই ধূলায় নামাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যে কিরণময়ী উপেন্দ্রেরই পরম স্নেহ ও বিশ্বাসের পাত্র দিবাকরকে মিথ্যা প্রেমাভিনয়ে মুগ্ধ করিয়া আরাকান-যাত্রী জাহাজে আনিয়া তুলিল। এবং পরে যখন অনুশোচনায় ও আত্মগ্লানিতে দিবাকর দগ্ধ তখন মিথ্যা সান্ত্বনার অভিনয়ে কিরণময়ীর প্রতিহিংসার যে মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই তাহাতেই উপেন্দ্রের বিরুদ্ধে কিরণময়ীর এই অভিযানের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে।

ইহার পর সেই সুদূর আরাকানে কিরণময়ী ও দিবাকরের জীবনযাত্রার এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। যে মিথ্যা প্রলোভনে হতভাগ্য দিবাকরকে আবদ্ধ রাখিয়া উপেন্দ্রের প্রতি কিরণময়ী আপন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছিল—তাহাই তাহার গলার ফাঁসি হইয়া দেখা দিল। আলোক-শিখা-লোলুপ পতঙ্গের মত কিরণময়ীকে প্রদক্ষিণ করিয়া ক্রমাগত ঘুরিতে ঘুরিতে, বুভুক্ষিত দিবাকরের বাসনা এমনই উদ্দাম হইয়া আত্মপ্রকাশ করিল যে, তাহার আক্রমণে কিরণময়ী বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিল।

কে বলিবে এ সেই দিবাকর!—লাজনম্র, নিরীহ, ধর্ম্মভীরু! উপীনদার স্নেহ-লালিত, চিরানুগত সেই শান্ত ও বিনয়ী দিবাকর তাহার ভবিষ্যতের সকল সার্থকতায় জলাঞ্জলি দিয়া বন্ধু বান্ধব আত্মীয়-স্বজন ও সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, আজ যে মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান—তাহা বোধ করি কিছুদিন পূর্ব্বেও তাহার অন্তর্য্যামী পর্য্যন্ত কল্পনা করিতে পারিতেন না। কিরণময়ীর নিষ্ঠুর খেলায় দিবাকরের এই দ্রুত শোচনীয় নৈতিক অপমৃত্যু তাহার সমগ্র জীবনকে নিষ্ফল করিয়া দিয়া, ললাটে তাহার যে কলঙ্ক-তিলক আঁকিয়া দিল—তাহা মৃত্যু অপেক্ষাও ভীষণ।

প্রেম-প্রত্যাখ্যাতা হইয়া এই দুই নারী তাহাদের প্রণয়াস্পদের উপর প্রতিহিংসায় দুইটি নিরীহ জীবনকে লইয়া যে নিষ্ঠুর খেলা খেলিল—তাহার নিদারুণ প্রতিক্রিয়ার হাত হইতে কেহই নিষ্কৃতি পাইল না। প্রিয়তমের অনিষ্ট সাধন করিতে গিয়া উভয় নারীই নিজেদের জীবনের উপর দিয়া যে প্রচণ্ড ঝড় বহাইয়া আনিয়াছিল, তাহাতেই তাহারা সংসার ও সমাজ হইতে বহুদূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। এই উভয় নারীরই প্রতিক্রিয়ার মধ্যে অদ্ভুত সাম্য আমরা দেখিতে পাই, কারণ, এই দুঃসহ উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া তাহাদের কাহারও সহ্য হয় নাই। সেখানে রূপহীনা অশিক্ষিতা হীরা ও রূপবতী বিদুষী কিরণময়ী, উভয়েই—একই স্থানে আসিয়া নামিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই দেবেন্দ্র দত্তের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে হীরাকে ও উপেন্দ্রের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে কিরণময়ীকে আমরা দেখিলাম উন্মাদিনী বেশে।

দেবেন্দ্রের জীবন-নাট্যের সমাপ্তিকালে মলিনবেশ আলুলায়িতকেশা উন্মাদিনী হীরার আবির্ভাব, আমাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করে। দেবেন্দ্রের আসন্ন মৃত্যু-সংবাদে হীরার অট্টহাসির প্রতিধ্বনি যেন এখনও আমাদের কানে আসিয়া বাজিতেছে।

উপেন্দ্র যখন অবিচলিত নিঃশঙ্কতার সহিত আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিল তখন তাহার শয্যাপার্শ্বে শতছিন্ন মলিন বসনপরিহিতা যে উন্মাদিনী নারী

আসিয়া দাঁড়াইল—সে কিরণময়ী। তাহার বাক্যে, তাহার চোখের দৃষ্টিতে, তাহার সর্ব্বাবয়বে এমনই একটা বিষাদ ও করুণ ভাব মূর্ত্ত হইয়া বিরাজ করিতেছিল যে, তাহা আমাদের সমগ্র অন্তরকে ব্যথিত করিয়া তুলে। এমন কি, যে কিরণময়ীর প্রতি উপেন্দ্রের ঘৃণার অন্ত ছিল না—মৃত্যুশয্যাশায়ী সেই উপেন্দ্রের নয়নও আজ সজল হইয়া উঠিল।

দেবেন্দ্রের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে উন্মাদিনী হীরার নির্ম্মম প্রতিহিংসার যে মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে—উপেন্দ্রের মৃত্যুকালে উন্মাদিনী কিরণময়ীর শান্ত প্রতিচ্ছবিতে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাবই আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। হীরা দেবেন্দ্রের মৃত্যু কামনা করিয়াছে—কিরণময়ী প্রার্থনা করিয়াছে উপেন্দ্রের জীবন। এই দুই নারী তাহাদের প্রণয়াস্পদের আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে বিরুদ্ধ মনোভাবের পরিচয় দিয়াছে তাহাতে উভয়ের হৃদয়ে তাহাদের প্রেমাস্পদের চরিত্রগত পার্থক্যের প্রভাব, অদ্ভুত ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে দেখিতে পাই।

হীরা ও কিরণময়ী উভয়েরই প্রেম-নিবেদন প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, কিন্তু হীরা শুদ্ধমাত্র প্রত্যাখ্যাতাই হয় নাই, দেবেন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক সে প্রতারিতা হইয়াছে। হীরাকে মিথ্যা প্রলোভনে লুব্ধ করিয়া, দেবেন্দ্র কুন্দকে করায়ত্ত করিবার ক্রীড়নকরূপে তাহাকে ব্যবহার করিয়াছে। এমন কি তাহার অসতর্ক দুর্ব্বলতার সুযোগে, তাহার সমগ্র জীবনকে নিষ্ফল করিয়া তাহাকে পদাহত করিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, এবং শুধু তাহাই নহে—যখন সে বুঝিল, দেবেন্দ্র তাহারই সাহায্যে, সংসারে নারীর যাহা চরম ঈর্ষ্যার—অপর একটি নারীকে করতলগত করিবার জন্য এতদিন মিথ্যা প্রেমাভিনয়ে তাহাকে ছলনা করিয়াছে, তখন তাহার মনে প্রতিহিংসার যে বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহা দেবেন্দ্রের মৃত্যু কামনা করিয়াও ক্ষান্ত হইতে পারে নাই, মৃত্যুর পর তাহা অপেক্ষা আরও ভীষণ, আরও কঠোর দণ্ড যদি কিছু থাকে কায়মনোবাক্যে তাহাই সে প্রার্থনা করিয়াছে।

কিরণময়ীরও প্রেম-নিবেদন উপেন্দ্র কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে কিন্তু হীরার মত সে প্রতারিতা হয় নাই। এই প্রত্যাখ্যানের আঘাত তাহার দিক্‌চিহ্নহীন শুষ্ক বালুকাময় জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু এই প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়া আজন্ম-শুদ্ধ অকপট উপেন্দ্রের বলিষ্ঠ চরিত্রের স্বাভাবিক যে মহনীয়তা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা অজ্ঞাতসারে কিরণময়ীর অন্তরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাই, সতীশ-সাবিত্রী-সরোজিনী-দিবাকর পরিবৃত উপেন্দ্রের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে যে উন্মাদিনী নারী চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া দেখা দিল—তাহার মুখে চোখে সর্ব্বত্র উপেন্দ্রের মৃত্যুশঙ্কায় উদ্বেগের গাঢ় ছায়া আমরা লক্ষ্য করিলাম। হীরার কাছে দেবেন্দ্র যেরূপ আপনাকে হীন করিয়াছিল, উপেন্দ্র কিরণময়ীর কাছে সেরূপ করে নাই। এমন কি প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়াও উপেন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও চরিত্রের বিরাটতা কিরণময়ী সর্ব্বদা অনুভব করিয়াছে, এবং প্রতিহিংসাবশে উপেন্দ্রের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্তা হইলেও সে মনে মনে আপনার পরাভবের স্মৃতি কোন কালেই মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। তাই উপেন্দ্রের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে কিরণময়ীর আবির্ভাব চোরের মতন, সেখানে তাহার কৃত-অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের ছায়া স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে!

এই দুই উন্মাদিনী নারীর যে বিরুদ্ধ মনোভাব আমরা লক্ষ্য করিলাম, তাহা মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাইব—এই স্বাভাবিক অভিব্যক্তিতে তাহাদের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। হীরাকে যদি আমরা আদর্শ-চরিত্র উপেন্দ্রের প্রণয়-প্রার্থিনীরূপে দেখিতে পাইতাম, অথবা কিরণময়ীকে হীনচেতা দেবেন্দ্রের প্রণয়িণী হিসাবে পাইতাম, তাহা হইলে হীরার প্রার্থনা কিরণময়ীর নিকট হইতে এবং কিরণময়ীর প্রার্থনা হীরার নিকট হইতে যে শুনিতে পাইতাম, তাহাতে বোধ হয় সন্দেহ নাই। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে উভয় চরিত্রই অস্বাভাবিকতাদোষে দুষ্ট হইত।

পরিশেষে বক্তব্য এই—সুবিস্তৃত পটভূমির উপর অভিনব ঘটনা-সংঘাত ও মানসিক দ্বন্দ্বের বিচিত্রতার মধ্য দিয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের অপূর্ব্বতায়—অপরিসীম বুদ্ধিমতী, অতুলনীয় রূপবতী, অসামান্য বিদুষী, অদ্ভুত কিরণময়ী বঙ্গসাহিত্যে অদ্বিতীয় সৃষ্টি সন্দেহ নাই,

কিন্তু সমাজ-সংস্থানে নিজ স্থান ও আবেষ্টনীর মধ্যে সহজ সচ্ছন্দ অনাড়ম্বর চরিত্রবিকাশের স্বাভাবিকতায়, রূপহীনা দাসী হীরা অধিক 'রূপবান্' * অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি, আচরণ প্রভৃতি সব দিক দিয়াই কিরণময়ী আমাদের মুগ্ধ ও অভিভূত করিয়াছে; অপর পক্ষে বাস্তবতার দিক্ হইতে তাহার এই অসাধারণত্বের জন্যই তাহাকে আমাদের গৃহে ও সমাজে দেখিতে না পাইয়া, আমাদের অন্তর পীড়িত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা সত্য যে, সর্ব্বক্ষেত্রে বাস্তবতার মাপকাঠিতে সাহিত্যগত চরিত্রের মূল্য নিরূপণ রস-বিচারের আদর্শ নহে; কারণ তাহা যদি হইত, তবে রামগিরি আশ্রমে নির্ব্বাসিত অলকার অধিবাসী বিরহী যক্ষের বেদনা অচেতন মেঘকে অবলম্বন করিয়া যে অবাস্তব কল্পনাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা শত শত বর্ষ ধরিয়া আমাদের আনন্দ দিতে সমর্থ হইত না। কিন্তু কিরণময়ী অলকাধিবাসিনী নহে, সে মর্ত্ত্যবাসিনী নারী। সে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ঘরের কুলবধূ—আমাদের আত্মীয়া; তাই এখানে বাস্তবতার প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। আমাদের অন্তঃপুরিকাগণের মাঝে তাহাকে দেখিতে না পাইয়া অন্তর পীড়িত হইয়া উঠে। কিরণময়ী আমাদের গৃহে বা সমাজে একেবারে অপ্রাপ্য না হইলেও, তাহাকে অনেক খুঁজিয়া আবিষ্কার করিতে হয়। তাহার জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপ মনস্তত্বের দিক্ দিয়া নির্ভুল হইলেও তাহা এতই বিচিত্র ও জটিল যে তাহাকে বুঝিবার জন্য আমাদের সর্ব্বদাই জাগ্রত ও সচেষ্ট থাকিতে হয়।

হীরা সকল দিক্ দিয়াই অতি সাধারণ। তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় না—সে দাসী, আমাদের প্রতিবেশিনী। তাহার আচরণের মধ্য দিয়া দাসী-চরিত্র কোথাও বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাহার কার্য্যকলাপে জটিলতার চিহ্নমাত্র নাই—সহজ দৃপ্ত অসঙ্কোচ তাহার প্রতিটি পদক্ষেপ। তাহাকে বুঝিবার জন্য আমাদের চিত্তবৃত্তিকে প্রস্তুত রাখিতে হয় না—কোষ-নির্ম্মুক্ত উদ্যত শাণিত তরবারির মতই সে

* "বিষবৃক্ষে হীরা রূপবান্—সে আমাদের ঘুমোতে দেয় না।"
—রবীন্দ্রনাথ



আকাশ

মহ্‌বুবুর রহমান খাঁ

অনারম্ভ, হে অনন্ত উন্মুক্ত আকাশ,
আদি মধ্য অন্তহীন মহা অবকাশ
তব অবয়বে নিল রূপ
অপরূপ।
তোমার বিরাট বক্ষে—রূপহীন অরূপ অতলে
সব রূপ এক হ'য়ে জ্বলে!
রবি, শশী, গ্রহ আদি শতকোটি নক্ষত্র নিচয়,
শত বর্ণ, শত প্রভা, বিশ্বের বিস্ময়,
যেন তুমি পরিয়াছ মাল্য করি'
রজতের, সুবর্ণের, হীরকের শতনরী,
মণি-মুকুতার মালা—জ্যোতিরাভরণ
অগণন।
হে মহান্
মহাশক্তিমান,
ইচ্ছা মাত্র তব
অভিনব
বসন্তের মলয়-হিল্লোলে
বনশ্রী জাগিয়া উঠে উৎসবের পুষ্পদোলে—
দ্রাক্ষারসে পূর্ণ করি' রভসের পানপাত্রখানি
স্বপ্নসাকী হেসে ধরে আনি'
প্রণয়ীর তৃষার্ত্ত অধরে।
পুষ্পিত শাখার 'পরে
ডাকে পিক পাপিয়া সুস্বরে
গুঞ্জরিয়া আসে অলি, মৌমাছি ঝঙ্কারে,
পাখা মেলি' প্রজাপতি আসে সারে সারে,
ফুলবাণ হানে ফুলবাণ
লক্ষ্য করি' ধরণীর নর-নারী-প্রাণ।—
জাগে সবে প্রণয়ের রাগে
ফাল্গুনের ফাগে···

কিন্তু—কিন্তু সুকঠোর তব বজ্রনাদ
অচিরাৎ
ভেঙ্গে দেয় সুখের স্বপন—
ব্যথাহত মন
ভয়ে কাঁপে থরথর,···
গর্জ্জে দেয়া, বাজে ঝড়···
মাতো তুমি প্রলয়-মাতনে
রুদ্রের নর্ত্তনে।
কালবৈশাখীর জটা বাঁধি', ভয়ঙ্কর জ্যৈষ্ঠ-দ্বিপ্রহরে
বহ্নিবৃষ্টি কর ক্ষিপ্র করে।
দগ্ধ এই ধরণীর তল
তৃষ্ণায় ফাটিয়া পড়ে—"কোথা জল
হায় কোথা জল!"
মনে মনে তুমি হাস,—প্রাবৃট-প্লাবনে
ভেসে চল' ভাসাইয়া ধরণীর বনে,
কলাপী কলাপ মেলে, খেলে' চলে বিদ্যুতের শিখা,
নূপুর বাজায়ে চলে অন্ধকারে কল্পাভিসারিকা!
শান্তোজ্জ্বল রূপ দেখি শরৎপ্রভাতে।···
কোজাগরী রাতে
কৌমুদী-জোয়ারে ওঠে দিক্‌সীমা ছু'লে,—
আনন্দ-সায়র ওঠে ভরি' কূলে কূলে!
হে অসীম, তোমারি জীবনধারা
লোকে লোকে বহে সীমাহারা,
যত কিছু, যাহা কিছু সব তুমি,—সকলি তোমারি;
কিন্তু তবু হে দুর্ব্বোধ্য, বুঝিতে না পারি
কেন তুমি রাখিয়াছ ব্যবধান
স্বর্গ, মর্ত্ত্য?—ভ্রাম্যমান
দুঃখ-সুখে কে কোথায় ঘোরে
জীবনের পথ হ'তে মরণের দোরে?
আমি কবি—কল্পনায় ভাবি আজি হায়,
রহস্য অতীত করি' কোনদিন মুখোমুখি পাব না তোমায়?

শেষ রক্ষা

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

দূরে চটকলের পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিয়া গেল। সরলার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতেই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। এ কি! সে যে মেঝেয় আঁচল পাতিয়া এতক্ষণ অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল! সম্মুখে স্বামীর জন্য ঢাকা দেওয়া খাবারের দিকে তাকাইয়া দেখিল সেই রাত ১০টায় সে স্বামীর খাবার যেমনি ঢাকা দিয়া রাখিয়াছিল তেমনি ঢাকা দেওয়াই আছে—খাটের উপরে তাকাইয়া দেখিল সে বিছানা তেমনি শূন্যই পড়িয়া আছে। এখনও ফিরিয়া আসিল না—এই রাত দুটা পর্য্যন্ত কোথায় কি করিতেছে ভাবিয়া সরলা কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

কোন বিপদ হয় নাই তো? কলের কাজ—সদা সর্ব্বদা কত রকমের বিপদ চারিদিক হইতে হাঁ করিয়া আছে—তাহার হিসাব কে রাখে? এই তো সেদিন একজন মিস্ত্রি—কলের কোথায় যেন তেল ঢালিতেছিল—হঠাৎ তাহার গায়ের জামা কলে আটকাইয়া সে একেবারে কলের ভিতরে গিয়া পড়িয়াছিল—তারপর তাহাকে আর আস্ত বাহির করা যায় নাই—মুহূর্ত্তমধ্যে নাকি তাহার দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। ভাবিতেই সরলার সারা দেহ ভয়ে একেবারে হিম হইয়া গেল। রাত ৮টায় স্বামীর ডিউটী শেষ হয়। বাসায় ফিরিতে বড় জোর আধ ঘণ্টা সময় লাগিতে পারে। পথে না হয় দু একজন বন্ধু বান্ধবের সহিত গল্প গাছা করিতে আরও আধ ঘণ্টা গেল—কিন্তু এত রাত্রি অবধি কি করিতেছে বাপু?

সমস্ত পাড়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—সারা বস্তিটার মাঝে একটা মানুষেরও কথা শুনা যাইতেছে না। রাত ৮টার পরে ডিউটী শেষ করিয়া সকলেই তো বাসায় ফিরিয়াছে—আহার করিয়াছে—ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাহার স্বামী—সরলা একেবারে অস্থির হইয়া পড়িল, ভেজান দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। আবছা জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভাল করিয়া নজর হইতেছে না। স্বামীর ফিরিবার পথে যতদুর সাধ্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সরলা দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে ও পাশের দেবদারু গাছটার পাশ দিয়া যেন একটা অস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখা গেল—সরলা আগাইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল ওখানে কে দাঁড়িয়ে? অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত যেন একটি লোক আগাইয়া আসিয়া সরলার সম্মুখে দাঁড়াইল। সরলা চিনিতে পারিল এ বঙ্কু। দূরসম্পর্কের 'ঠাকুরপো' বলিয়া ডাকে। বঙ্কু ডাকিয়া বলিল, কি ডাক্‌ছো কেন? উপীন দা বুঝি ঘরে ফেরেনি এখনও?

—সরলা উৎকণ্ঠা দমন করিতে পারিতেছিল না, বলিল—না—কোথায় বলতে পারো?

বঙ্কু একটু কাশিয়া বলিল—বল্‌তে? হাঁ তা জানি সে যেখানে আছে। কিন্তু শুনলে তুমি ব্যথা পাবে মনে।

সরলা এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল—না না কি হ'ল, বল না।

—লোকটা বরাবরই ভাল নয় তুমি তো জান না—সেবার এমনি একটা কথাই তোমাকে বলতে এসেছিলাম—তুমি তো বিশ্বাসই করলে না, উল্টে উপীনদাকে দিলে বলে—সে এলো তেড়ে আমাকে মারতে।

আজ ক দিন একটা নূতন উপসর্গ জুটেছে—ওরা জন তিনেক একেবারে উঠেছে মেতে—সেখানেই আড্ডা জমাচ্ছে।

বঙ্কু আরও যেন কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু সরলা আর সেখানে দাঁড়াইল না। ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া একেবারে বিছানায় শুইয়া পড়িল।

বঙ্কু কিছুক্ষণ সরলার পথের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া শিস্ দিতে দিতে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

তাহার স্বামী, যাহাকে সে এতদিন ভালবাসিয়া আসিয়াছে—দেবতার অধিক ভক্তি করিয়াছে—শেষে সেই কিনা ইহাই করিল? বিবাহের দিনে দিদিমা তাহাকে বলিয়াছিলেন স্ত্রীলোকের পতি পরম গুরু—তাহার চেয়ে বড় দেবতা আর কেহ নাই। সরলা তো এতদিন ধরিয়া তাহা অক্ষরে অক্ষরেই পালন করিয়া আসিয়াছে—এক দিনের জন্যও স্বামীর অবাধ্য হয় নাই—আর স্বামী? সেও তো তাহাকে হয়ত ভালই বাসিত, তাহার ভিতরে যে এমনি ফাঁকি কোথাও লুকাইয়াছিল তাহা সে একদিনের জন্যও কল্পনা করিতে পারে নাই। বঙ্কু লোক ভাল নয়—তাহার কথা মিথ্যা নয় তো? সেবারও তো যে তাহার স্বামীর নামে এমনি একটা মিথ্যা অপবাদ দিয়াছিল। সারা-রাতটুকু সরলার ভাবনায় কাটিয়া গেল। সকালবেলা উপেন বাসায় ফিরিয়া আসিল। বঙ্কুর কথা একেবারে মিথ্যা বলিয়া সরলার মনে হইল না।

২

পরের দিন রবিবার—কল বন্ধ। উপেন সারাটা দিন অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত কাটাইল—মুখ তুলিয়া সরলার সহিত একটা কথাও কহিতে সাহস পায় নাই। সরলাও সাধিয়া একটি কথাও কহে নাই। বিকালের দিকে উপেন বলিল—আর অমন মুখ ভার করে থাকিসনে, যা হবার হয়েছে—এই তোকে ছুঁয়ে বল্‌ছি আর কখনও এমনটি হবে না। এবারটি মাপ চাইচি। সরলা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—অমনি বল্লে হবে না—এই আমার মাথায় হাত দিয়ে শপথ কর আর—কখনও এমন করবে না—দাও হাত।

অগত্যা উপেন তাহাই করিল। তারপর সরলা উঠিয়া গিয়া তাহার বাক্সের কোণ হইতে শাল পাতায় মোড়া খানিকটা আফিং বাহির করিয়া—দেখাইয়া বলিল—এই দেখছো আফিং এনে রেখেছি—আবার যেদিন এমনি করবে সেদিন আর বাসায় এসে আমাকে জ্যান্ত দেখতে পাবে না ঠিক থাকে যেন। বলিয়া আফিংটুকু পুনরায় বাক্সে রাখিয়া সরলা বাক্সে চাবি দিল।

দিন দশেক নির্ব্বিঘ্নে কাটিবার পর হঠাৎ আবার একদিন রাত্রে আর উপেনের দেখা নাই। রাত ১০টা বাজিয়া গেল। তারপর ১১টা, ১২টা—সেদিনের মত আজও আবার সারা বস্তি তেমনি নিশ্চুপ হইয়া গেল কিন্তু উপেন ফিরিল না। সরলা ঘরে খিল দিয়া রাস্তার দিকে কান পাতিয়া রহিল। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বঙ্কু খবর দিয়া গেল, উপীনদা আজও বাসায় ফিরবে না। সেই গিয়েছে আবার মরতে। এমন সময় সহসা উপেনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—ওখানে কে রে বঙ্কু না? এত রাত্রে এখানে তোর কি দরকার, রে হতভাগা? উপেনের স্বর জড়াইয়া আসিতেছিল—বঙ্কু ভয়ে

অন্ধকারে একদৌড়ে অন্তর্হিত হইয়া গেল। উপেন ততক্ষণ ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়াছে তাহার চোখ জবাফুলের মতো লাল; সে বিনা বাক্যব্যয়ে বিছানায় শুইয়া পড়িল—সারা রাত্রের মধ্যে আর কথাটি কহিল না।

পাপের প্রথম সঙ্কোচ কাটিয়া গেলে মানুষ বেপরোয়া হইয়া উঠে। উপেনেরও তাহাই হইল। এখন হইতে প্রত্যহ যে কোন দিন রাত ১২টায় কোন দিন ১টায় কোন দিন বা সকালে বাসায় ফিরিতে লাগিল। বাসায় ফিরিয়া কোন দিন হয়ত খাবারের কাছে গিয়া বসিত—কোন দিন হয়ত না খাইয়াই শুইয়া পড়িত। সরলা প্রথম প্রথম কয়েকদিন কাঁদিয়াছে—রাগারাগি করিয়াছে কিন্তু কোন ফলই হয় নাই। সেদিন সে ঠিক করিল এত অপমানের চেয়ে সে আত্মহত্যা করিবে। বাক্স খুলিয়া আফিং বাহির করিয়া ভাবিল—কেন? সে মরিতে যাইবে কিসের লজ্জায়? কাহাকেও যদি আজ আত্মহত্যা করিতে হয় তবে সে তাহার স্বামীর। নিজের অন্তরের কাছে যে অপরাধী মরা তো তাহারই উচিত। এত যে দুঃখ কষ্ট তাহার মাঝেও সে তাহার ধর্ম্মকে কখনও ক্ষুণ্ণ হইতে দেয় নাই, সে মরিবে কিসের দুঃখে? বরং আফিংয়ের ঢেলা তাহার স্বামীর জন্যই রাখিয়া দেওয়া উচিত। সরলা শালপাতায় মোড়া আফিংটুকু দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

আজ সপ্তাহের শেষ, কিন্তু চাল, ডাল কোন কিছুই আসিল না—সেদিন সারা রাত্রি গেল, পরের সারাটা দিন ও রাত্রি গেল উপেন বাসায় ফিরিল না। বঙ্কু সন্ধ্যাবেলা দাঁত বাহির করিয়া বলিয়া গিয়াছে—উপেন আজ দুই দিন ধরিয়া সেখানেই পড়িয়া আছে।

আজ ঘরে এক দানাও চাউল নাই—যাহা ছিল সমস্তই কাল শেষ হইয়া গিয়াছে। ওবেলায় কিছু জলখাবার খাইয়া ছিল তারপর আজ সারাটা দিনই সরলার উপবাস যাইতেছে। রাত্রে বঙ্কুর মাসী আসিয়া খবর লইয়া গেল—সরলা না খাইয়া আছে।

বঙ্কু রোজ সন্ধানে থাকে কখন উপেন বাসায় ফিরিবে। ঠিক সময় বুঝিয়া সে উপেনের বাসার সম্মুখে হাজির হয় তারপর উপেনের সহিত দেখা হইলেই সরিয়া পড়ে—তাহার উদ্দেশ্য উপেন তাহার স্ত্রীকে সন্দেহ করিতে থাকুক।

৩

সেদিন রাত্রি গোটা এগারর সময় বঙ্কু আসিয়া বাড়ীর সামনে ঘোরাঘুরি সুরু করিয়া দিল। সরলা রুখিয়া বলিল তুমি যাও—যাও এখান থেকে— না গেলে আমি চেঁচিয়ে পাড়ার লোক জড় করবো। চেঁচামেচিতে বঙ্কু দৌড়াইয়া বাহির হইয়া গেল ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল উপেন। তাহার পা টলিতেছে—ঘরের ভিতরে সরলাকে কটু উদ্দেশ্য করিয়া জোরে ঠেলিয়া দিল। সরলার মাথায় লাগিয়া ঝর ঝর করিয়া খানিকটা রক্ত তাহার কপাল বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল। তারপর উপেন যে পথে আসিয়াছিল সেই পথেই পুনরায় টলিতে টলিতে চলিয়া গেল। সরলার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

সরলা এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলিল না একটুও ধৈর্য্য হারাইল না—আঙ্গুল দিয়া যে রক্ত কপাল বাহিয়া পড়িতেছিল তাহা মুছিয়া ফেলিল—যেন তাহার কিছুই হয় নাই এমনি ভাব।

যে স্বামীকে আজ পাঁচ বৎসর ধরিয়া প্রাণপাত করিয়া সে আপন করিতে পারিল না—সেই স্বামীকে এই মদের নেশা দুইদিনে ভুলাইয়া লইল। তাহার একাগ্র পতিভক্তির চেয়েও বারবিলাসিনীর আকর্ষণই হইল শ্রেষ্ঠ ?

ক্রোধে ও অপমানে তাহার সমস্ত শরীর এক অপূর্ব্ব উত্তেজনায় ভরিয়া আসিল, মাথার ভিতরে ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল।

খোলা দরজার ভিতর দিয়া কিছুদূরে একটা মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইল—সরলা বুঝিতে পারিল আর কেহ নহে বঙ্কু।

সে হাত তুলিয়া তাহাকে ডাকিল—বঙ্কু ঠাকুরপো—এইদিকে এসো !

বঙ্কু আগাইয়া আসিল। সে আজ এতটুকু লজ্জা বা সঙ্কোচ করিল না। তাহার দিকে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কি চাও আমার কাছে বলতো ?

বঙ্কু তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া কোনই ভরসা পাইল না—সে যেন জলন্ত অগ্নিশিখা ! বঙ্কু ভয়ে ভয়ে বলিল আমি কি চাই তুমি কি জান না।

—না জানি না, বল ! বঙ্কু আমতা আমতা করিয়া বলিল, আমি তোমাকেই চাই !

—বেশ কিন্তু আমি তো আর এখানে থাক্‌বো না।

—কোথায় যেতে চাও—বেশ তো চল না আমরা কল্‌কাতায় পালিয়ে যাই।

সরলার অত কথা কাণে গেল না ; সে বলিল—বেশ চল—কিন্তু আজই—রাত্রে আর দেরী নয়।

—বেশ তাই তবে—রাত ৩ টের গাড়ীতে যেতে হবে—তুমি ঠিক থেকো আমি এসে ডেকে নিয়ে যাব খুব সাবধানে পালিয়ে যেতে হবে কিন্তু। বঙ্কু বাহির হইয়া গেল। সরলা টলিতে টলিতে বিছানায় গিয়া পড়িল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে বঙ্কু তাহাকে ডাকিয়া লইল। শূন্য হাতে তেমনি আলুলায়িত কেশে সরলা তাহার পিছনে পিছনে চলিল। বঙ্কু একটা কথাও কহিতে সাহস পাইল না। বঙ্কু টিকেট করিয়া মেয়েদের গাড়ীতে তাহাকে উঠাইয়া দিয়া পাশের গাড়ীতে গিয়া বসিল।

গার্ড বাঁশী বাজাইল—গাড়ী হুইসিল দিয়া ছাড়িয়া দিল—এতক্ষণে সরলার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল এ সে কি করিতেছে—কোথায় যাইতেছে ? কাল সকালে একেবারে সব জানাজানি হইয়া যাইবে—সমস্ত বস্তির লোক সমস্ত কলের লোক তাহাকে লইয়া হাসাহাসি করিবে—বস্তিতে বস্তিতে চলিবে জটলা। ও পাশের বাসার হতভাগা মেয়ে সেই বিমলীটাও হয়ত ক্ষ্যান্ত মাসীকে ডাকিয়া হাত উল্টাইয়া বলিবে—"শুনছো মাসি সরলা বঙ্কুর সাথে বেরিয়ে গেছে—ওর পেটে যে এত বিদ্যে তা বরাবরই আমি জানতাম—তোমরাই শুধু আমার কথা বিশ্বাস করতে না।" তারপর ভাবিল এখান হইতে সে কলিকাতায় কোথায় গিয়া উঠিবে—বঙ্কু যেমন বদ্‌লোক সে হয়ত তাহাকে কোন খারাপ পল্লীতে লইয়া যাইবে—সেখানে কত রকমের যাহাদের নাম শুনিলে সে ঘৃণায় মুখ ফিরাইত—লোক—তাহাদের ভিতরে গিয়াই হয়ত তাহাকে পড়িতে হইবে। ভাবিতেই সে একেবারে পাগল হইয়া উঠিল। গাড়ী ততক্ষণ প্লাটফরম ছাড়াইয়া গিয়াছে

—ওগো আমি কোথাও যাবো না আমি বাসায় ফিরে যাব—চীৎকার করিয়া সরলা দরজার কাছে ছুটিয়া গেল—এক মুহূর্ত্তে দরজা খুলিয়া একেবারে গাড়ীর বাহিরে লাফাইয়া পড়িল।

দেখিতে দেখিতে গাড়ী গেল থামিয়া—গার্ড আসিল—সকলে ধরাধরি করিয়া সংজ্ঞাহীনা সরলাকে পুনরায় গাড়ীতে উঠাইয়া গাড়ী পিছন ঠেলিয়া ষ্টেশনের দিকে লইয়া চলিল। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য বন্ধুও গাড়ী হইতে নামিয়াছিল—সমস্ত বুঝিয়া সে লাইনের পাশ দিয়া আস্তে আস্তে অন্ধকারে গা ঢাকা দিল।

পরের দিন সরলা সকালে চোখ মেলিয়া দেখে তাহার স্বামী সজল নয়নে মলিন মুখে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। হাঁসপাতালের ডাক্তার আসিয়া বলিয়া গেলেন আঘাত সামান্য লাগিয়াছে আর কোন ভয়ের কারণ নেই।

উপেন সরলার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল—আর একবার আমায় মাপ কর বউ এবার থেকে আমি ঠিকই ভাল হব। আর এদেশে নয় কালই চল দেশে চলে যাই সেখানে জমি জমা চাষ করবো তাতেই আমাদের দুটো পেট চলে যাবে। এখানে থাকলে আমি ভাল হতে পারবো না—এখানে বস্তীর আবহাওয়ায় মানুষ ভাল থাকতে পারে না।

সরলার দুই চোখ ভরিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল, কিন্তু আজ যে তাহার উঁচু মাথা হেঁট হইয়া গিয়াছে—বন্ধুর সঙ্গে সে যে চলিয়া যাইতেছিল তাহাতো স্বামী জানে না—কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে ভগবান তাহাকে সুবুদ্ধি দিয়াছিল তাই না রক্ষা?





চলন্তিকা

সম্বুদ্ধ

রেল কোম্পানির মাছের থালা উপর্য্যুপরি চুরি যাইতেছে, শুনিয়া ভারি কৌতুক অনুভব করিতেছিলাম। এই থালা কে কিভাবে চুরি করিতে পারে, তাহা লইয়া খানিকটা উচ্চাঙ্গের রসিকতাও করিবার ইচ্ছা ছিল। মাছের থালা যখন, তখন পুরুষে লয় নাই, সধবা নারী বা অহিন্দু নারীও লয় নাই, সুতরাং কাছাকাছি অঞ্চলে সদ্যোবিধবা হিন্দু যাহারা আছে…ইত্যাদি প্রভৃতি বহু বহু শিষ্ট ও অশিষ্ট যুক্তিতর্ক মনে মনে সাজাইয়া তুলিতেছিলাম।

কিন্তু শিয়ালদহে সারি সারি বিগলিত শবদেহের মর্মান্তিক শোভাযাত্রা দেখিয়া আসিয়া, আর সে রসিকতার কণামাত্রও মনের কোণে বাঁচিয়া রহিল না। এখন কেবলই মনে হইতেছে, এতবড় দুঃসহ ঘটনা লইয়া যদি লঘু রসিকতা করিতে যাই, আর কেহ করুক বা না করুক, অসংখ্য হতাহত মানুষের আরও অসংখ্য দুঃখভারপীড়িত আত্মীয় পরিজন সে রসিকতা কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিবেন না। মহাকালের তাণ্ডবে যেখানে ডমরুর উদ্‌ভ্রান্ত আরাবে গগন পবন মুখরিত হইয়া উঠিতেছে, চাপল্যের লঘু হাসির সেখানে স্থান নাই।

*　　　*　　　*　　　*

মহাকাল নাচিতেছেন। তাঁহার দক্ষিণ চরণের আঘাতে পৃথিবী সৃষ্টি-গৌরবে মহীয়সী হইয়া উঠে, বাম চরণের ঘায়ে সে সৃষ্টির অভ্রভেদী চূড়া পলকে ধূলায় লুটাইয়া পড়ে। এক পদে জন্ম, এক পদে মৃত্যু বিতরণ করিয়াই তাঁহার নৃত্য।

ইতিমধ্যে বৎসর কয়েক নৃত্যচ্ছন্দে তাঁহার দক্ষিণ চরণে তাল অধিক পড়িতেছিল। জনবাহুল্যের আতঙ্কে আমরা বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছিলাম। সম্প্রতি কিছুদিন তাল বাম চরণে পড়িতেছে। ইউরোপের ধ্বংসলীলা, জাপানের ভূমিকম্প, ভারতের রেল-কলিশন, ইহারই প্রকাশ মাত্র। পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে ইহাদের অর্থ সম্যক্ বুঝা যাইবে না; সকলগুলিকে একত্রে, একই বিরাট্ ব্যাপারের অঙ্গ বলিয়া দেখিতে হইবে।

*　　　*　　　*　　　*

তথাপি, ইউরোপের যুদ্ধ ও জাপানের ভূমিকম্প দূরের বস্তু; ঢাকা মেলের দুর্ঘটনা আমাদের বাড়ির ধারের জিনিব। একটার ক্ষীণ সংবাদ মাত্র আসিয়া আমাদের কাণে পৌঁছায়, সকালবেলা খবরের কাগজ

খুলিয়া চায়ে চুমুক দিতে দিতে আমরা তাহার বিবরণ পড়ি, এবং পেয়ালা শেষ হইতে হইতেই আবার তাহার কথা ভুলিয়া যাই। অন্যটার আঘাত সরাসরি আমাদের বুকে আসিয়া লাগে; তৎক্ষণাৎ ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া দেখিতে যাই, আমাদেরই কাহারও আত্মীয়বন্ধু কেহ মরিল নাকি; রাশি রাশি মৃত ও মুমূর্ষু মাংসপিণ্ডের উপরে ব্যগ্র চক্ষু বুলাইয়া যখন বাড়ি ফিরিয়া আসি, তখন সেই অপরিচিত অপরিচয়েদেরও প্রতি করুণায় মুখের অন্নগ্রাস কেবলই স্খলিত হইয়া পড়িতে থাকে।

হয়তো ইহা সংকীর্ণতার পরিচয়—কিন্তু তবুও ইহাই স্বাভাবিক। মানুষের দৃষ্টির সীমা ক্ষুদ্র, তাহার মনের পৃথিবীও ক্ষুদ্র। একান্ত যাহারা আপনার জন তাহাদের দিকেও সর্ব্বক্ষণ সজাগ দৃষ্টি রাখিবার অবসর আমাদের নাই—তাহাকে অতিক্রম করিয়া দূরের জনের কথা যদি আগে না ভাবিতে পারিয়া থাকি, যে ঈশ্বর আমাদের দৃষ্টিকে ক্ষীণ ও হ্রস্ব করিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

* * * *

ঢাকা মেল দুর্ঘটনায় যাঁহারা মরিলেন, তাঁহাদের জন্য বৃথা শোকপ্রকাশের আড়ম্বর আমি করিব না। আমি জানি সে শোকপ্রকাশ অর্থহীন। ইহার পূর্ব্বে যাঁহারা অনুরূপ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাইয়াছেন এবং ইহার পরেও যাঁহারা অনুরূপ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাইবেন, তাঁহাদের জন্যও দুঃখ করিব না। যে মরিল তাহার তো সমস্ত জীবন, সমস্ত কামনা, সমস্ত প্রার্থনা শেষই হইয়া গেল—আমি সেই মৃত্যুর সুযোগ গ্রহণ করিয়া একটা কবিতা প্রকাশ করিয়া যদিই ফেলি, একটা দীর্ঘচ্ছন্দে বিনায়িত বক্তৃতা ছাপিয়া ও অচিরাৎ 'ইহার তদন্ত দাবি' করিয়া খবরের কাগজে নিজের নামটা যদিই জাহির করি—তাহাতে সেই হতভাগ্য কিছুমাত্র উপকৃত হইবে না; তাহার শোকার্ত্ত আত্মীয় পরিজনের বেদনার তাহাতে কিছুমাত্র লাঘব হইবে না। অপরের দুঃখে যদি সত্যই কোনদিন কাতর হইতে পারি, চক্ষের জল সেদিন আপনিই ঝরিয়া পড়িবে—সে ধারা লোকে চাহিয়া দেখিল কি না দেখিল তাহা লইয়া মাথা ঘামাইব না। আর সত্য সত্য যদি জল চক্ষে না আসে, অপরের দুঃখকে উপলক্ষ্য করিয়া কুম্ভীরাশ্রু প্রদর্শন করিবার শকুনীবৃত্তি হইতে ভগবান আমাকে রক্ষা করুন।

* * * *

তবুও তাহার কথা বলিতে হয়, কারণ ইহাই রীতি। এই দুর্ঘটনা কেন কাহার দোষে ঘটে, এবং ইহার জন্য রেল কোম্পানি, ভারতের পরাধীনতা ও অশ্লেষা মঘা নক্ষত্র কে কতখানি দায়ী, তাহার আলোচনা সাময়িক পত্রিকায় প্রয়োজনের অতিরিক্তও হইয়া গিয়াছে—তাহার পুনরুক্তি করিব না। কিন্তু এই সম্বন্ধে বাজারে মাঠে ঘাটে কতগুলি উৎকট উক্তি শুনিতেছি, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা না করিলে চলিতেছে না।

* * * *

১৯২৯ সনে ই, আই, আর্-এর বিখ্যাত দুর্ঘটনার পরে ফরওয়ার্ড পত্রিকায় একখানি 'প্রত্যক্ষদর্শীর পত্র' প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পত্রের বক্তব্য ছিল, 'প্রত্যক্ষদর্শী' স্বয়ং দেখিয়াছেন, দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে যাহারা আহত হইয়া পড়িয়াছিল তাহাদের অনেককে সেইস্থলে মারিয়া ফেলা হইয়াছিল, এবং তাহাদের দেহ সরাইয়া ফেলা হইয়াছিল। এই পত্র লইয়া বিরাট্ মানহানির মোকদ্দমা চলে এবং তাহার ফলে ফরওয়ার্ড পত্রিকাটিরই মৃত্যু ঘটে—সে সংবাদ সকলেরই জানা।

কিন্তু তাহার পর হইতেই, প্রত্যেক দুর্ঘটনার পরে অনুরূপ একটা রব বাজারে ছড়াইয়া পড়িতেছে। দুইদিন আগেও লোককে বলিতে শুনিয়াছি—আরে মশায়, চল্লিশ জন তো কাগজে কলমে; আসলে কতজন আরও মরিয়াছে, কতজনকে সরাইয়া ফেলিয়াছে তাহার কোন হিসাব আছে?

*   *   *   *

সত্যই কোনস্থানে কোনদিন এইরূপে আহত মানুষ মারিয়া ফেলা ও মৃতদেহ সরাইয়া ফেলা হইয়াছে কিনা আমি জানি না। কিন্তু ইহা যদি কেহ সত্যই কোথাও করিয়া থাকে, সে মূর্খ। সর্বত্র ইহার অনুষ্ঠান হওয়া তো একেবারেই অসম্ভব।

এই গুজব যাহারা রটায় তাহাদের উদ্দেশ্য কি, তাহা বুঝা কঠিন। একমাত্র ব্যাখ্যা ইহার হইতে পারে sadism—মেয়েমহলে বসিয়া এই প্রকারের ভয়াবহ গল্প বলিয়া, তাহাদের বিহ্বলতা দেখিয়া আনন্দ লাভ করা। মেয়েমহলেই ইহাদের এই প্রকার গল্প বলিবার প্রবৃত্তি বাড়িয়া উঠে, আমি লক্ষ্য করিয়াছি।

*   *   *   *

না হইলে, সত্যই এরূপ ঘটা কতদূর সম্ভব? ব্যাপারটাকে একটু বুদ্ধি দিয়া বিচার করিয়া দেখুন। ধরুন শিয়ালদহ বা হাওড়া হইতে একটা ট্রেণ ছাড়িতেছে। কবে কোন্‌খানে একটা কলিশন হইবে বা গাড়ি লাইন হইতে পড়িয়া যাইবে, তাহা নিশ্চয়ই আগে হইতে জানা থাকে না। রেল কোম্পানিও আগে হইতে প্ল্যান করিয়া নিশ্চয়ই দুর্ঘটনা ঘটায় না।

ইহারা কি বলিতে চায়, প্রত্যেকখানা গাড়ি ছাড়িবার সময় তাহাতে গণিয়া গণিয়া শ'খানেক করিয়া ভাড়াটে গুণ্ডা রেল কোম্পানি তুলিয়া দেয়, যেন দুর্ঘটনা হইলে ইহারা হতাহত মানুষ সরাইয়া ফেলিতে পারে? আর তাহা যদি না হয়, তবে অকস্মাৎ মাঠের মধ্যে যেখানে সেখানে যেই দুর্ঘটনা হইল, তৎক্ষণাৎ এই কাণ্ড করিবার মানুষ রেল কোম্পানি আনিয়া ফেলে কোন আকাশ ফুঁড়িয়া?

*   *   *   *

ই, আই, আর এর দুর্ঘটনায়, চিঠিতে উক্ত ব্যাপার সত্যই ঘটিয়াছিল কিনা প্রমাণ হয় নাই। যদি সেখানে সত্যই কিছু ঘটিয়াও থাকে, তবু একটা কথা মনে রাখিতে হইবে—সে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল লিলুয়ার কাছে। সেটা মিল-অঞ্চল; অর্থাৎ সেখানে অসংখ্য কুলির বাস। ইহাদের মধ্যে দৈন্য-ক্লিষ্ট বেকার লোকের সংখ্যা অনেক, গুণ্ডারও সংখ্যা কম নয়। দুর্ঘটনার পরে এই গুণ্ডারা গিয়া জুটিয়াছে এবং তাড়াহুড়া করিয়া যাহা পারে হাতাইয়া লইয়াছে; হয়তো কার্য সহজ করিবার জন্য কিছু কিছু আহত মানুষকে খুনও করিয়াছে, এমন হওয়া অসম্ভব নয়। দুষ্প্রবৃত্তি সকল মানুষেরই মধ্যে থাকে—আপনি বা আমিই যদি এইরূপ একটা দুর্ঘটনায় পড়ি, এবং নিজে অক্ষত থাকিয়া সহসা আবিষ্কার করিয়া ফেলি যে পাশের মৃতদেহটার জামার পকেট হইতে একটা অতিবড় নোটের তাড়া উঁকি মারিতেছে, কেহ যেখানে দেখিতে পাইতেছে না, বিশৃঙ্খলার সেই পরম সহজ মুহূর্তে অল্প একটু হাত বাড়াইয়া নিজের আর্থিক অনটনকে দূর করিবার প্রলোভন আমরা কয়জনে জয় করিয়া চলিয়া আসিব?

দুর্ঘটনায় অনেক মানুষ মরে। অনেক মানুষ নিরুদ্দিষ্টও হইয়া যায়। যাওয়াই স্বাভাবিক। যে দেহ শতখণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইয়া, সনাক্তের অযোগ্য হইয়া গেল, বা যে দেহ আগুনে পুড়িয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল,

তাহার কথা ভুলিলে চলিবে না এবং সে মানুষেরও কোনদিন নিঃসংশয়ে সন্ধান মিলিবে না। কিন্তু তাহার জন্য ব্যক্তিবিশেষকে অহেতুক দায়ী করিয়া লাভ কি ?

* * * *

আর একটা কথা সেদিন শুনিতেছিলাম। ঢাকা মেলের কোন একজন যাত্রী অনুযোগ করিয়াছেন, রিলিফ ট্রেণ অত্যন্ত দেরি করিয়া পাঠানো হইয়াছে। অথচ, ঠিক কখন কোন্‌টা ঘটিয়াছে তাহার সময় আমার চেয়ে তিনিই ভাল জানেন। তাঁহার বিবৃতিতেই প্রকাশ, রাত আড়াইটা আন্দাজ দুর্ঘটনা হইয়াছে ; তাহার পরেই তিনি নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনে গিয়া কলিকাতায় টেলিগ্রাম করিয়াছেন ; অথচ রিলিফ ট্রেণ গিয়া পৌঁছিয়াছে ভোর পাঁচটার পরে। সময়টা হিসাব করিয়া দেখা যাক। দুর্ঘটনা ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চয় তিনি টেলিগ্রাম করিতে ছুটেন নাই। মতি স্থির করিতে সময় লাগিয়াছে। ষ্টেশন তিন মাইল দূর—অন্ধকার রাত্রে দৌড়াইয়াও তিন মাইল যাইতে অন্তত আধঘণ্টা লাগে। কলিকাতা হইতে ঘটনাস্থল আশি মাইল দূর—পথে কোথাও না থামিয়া একটানা ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে চলিলে ট্রেণ দুই ঘণ্টায় পৌঁছিতে পারে। ইহার মধ্যে সময় নষ্ট হইল কখন ? ইঁহার প্রদত্ত সময় যদি ঠিক হয়, তবে শিয়ালদহ হইতে সংবাদ পাইয়া রিলিফ ট্রেণ প্রস্তুত করিয়া ছাড়িতে হয়তো পনেরো কুড়ি মিনিটের বেশি লাগে নাই।

* * * *

তবু ইঁহার কথা বুঝিতে পারি। আঘাতে ও আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া যখন মানুষ অপেক্ষা করে, চারি পার্শ্বে আহত মানুষের মৃত্যু-আর্ত্তনাদ যখন মনকে কেবলই পীড়িত করিয়া তুলিতে থাকে, সাহায্যের অভাবে চক্ষের উপরে যখন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মানুষ মরিতে থাকে, তখন অপরের এক মুহূর্ত্ত বিলম্বকেই অতি দীর্ঘ বলিয়া মনে হয়। হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু কলিকাতায় ড্রইং রুমের ফ্যানের তলায় বসিয়া যাহারা ইহার পুনরুক্তি করিতেছে, তাহাদের তো মনে সে আতঙ্ক নাই! তবে কেন তাহারাও ইহার অন্ধ আবৃত্তি করিয়া অপরের রোমাঞ্চ জন্মাইতে চেষ্টা করিতেছে ?

* * * *

আমি বলিব, ইহারও ব্যাখ্যা একই—Sadism, পৌরুষধর্ম যাহাদের অল্প, তাহারা মেয়েদের সম্মুখে অশ্লীল কথা বলিয়া আনন্দ পায়—ইহা একপ্রকার বিকৃত আত্মতর্পণ। এই বীভৎস-বার্ত্তা প্রচারও তাহারই অনুরূপ, বিকৃত, অসুস্থ বুদ্ধির পরিচয়।

* * * *

এত কথা ইহা লইয়া বলিতাম না। কিন্তু জীবনই যেখানে মালিন্য-জর্জর, সেখানে চেষ্টা করিয়া মনকেও ক্লিন্ন ক্লিষ্ট করিয়া তুলিবার সার্থকতা কোথায় ? বীভৎসতার মূর্চ্ছাকর আবেষ্টন হইতে মানুষের মনকে দূরে সরাইয়া বাঁচাইয়া রাখাই তো স্বাভাবিক সহজ বুদ্ধির কাজ। সংকল্প করিয়া সেই বীভৎসতার ক্লেদরসে নিজের ও অপরের মনকে অভিষিক্ত করিয়া যদি কেহ তুলিতে চায়, আমি বলিব সে সমাজের, শান্তির শত্রু। তাহার সে প্রবৃত্তি সুস্থ মানুষের প্রবৃত্তি নয় ; অসুস্থ, অস্বাভাবিক পাশব প্রবৃত্তি।

বস্তুত আগষ্ট মাসটাই আমাদের পক্ষে একটা দুর্ঘটনার মাস গেল। চারিদিক হইতে খালি লোকসানের খবরই আসিতেছে।

পূর্ববারে আমাদের অর্থস্বচ্ছলতা লইয়া গর্ব করিয়াছিলাম ; গ্রেশাম্‌স্ ল' কান মলিয়া তাহার শোধ তুলিয়া লইতেছে। আজই সকালে হিসাব করিয়া দেখিয়াছি গত সতেরো দিনের মধ্যে একটাও রূপার টাকা বা দশ টাকার নোট হাতে পড়ে নাই—সমস্ত এক টাকার নোট্—তাহাও বহু হস্তের পীড়নে মলিন। যুদ্ধের বাজারের বায়বীয় সমৃদ্ধি, দুধের বলকের মতই চকিতে দেখা দিয়া আবার চকিতে মিলাইয়া গেল! এই একটা মাসের মধ্যে একটা এত বড় ট্রেণ দুর্ঘটনা হইয়াছে, আরও একাধিক দুর্ঘটনা হইতে হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে ; ভূমিকম্প হইয়াছে ; এবং নিউ থিয়েটার্সের বহু ছবি অগ্নিদাহে নষ্ট হইয়াছে। দুঃসংবাদ হিসাবে শেষেরটাই সর্বাপেক্ষা মর্মন্তুদ—ভাঙা রেলগাড়ি ও স্থানচ্যুত ফিশপ্লেট আবার মেরামত হইবে ; যাহারা মরিয়াছে তাহাদের পুনর্জন্ম হইবে ; কিন্তু আগুনে যে ফিল্ম নষ্ট হইল তাহা আর আমরা দেখিতে পাইব না।

* * * * *

নিকটের বার্তা বলিয়া এবার দূরের বার্তা বলি—সত্যই শর্ট-সাইট্ হয় নাই সেটা প্রমাণ করা দরকার। যুদ্ধ চলিতেছে। তাহার খবর যেটুকু কাগজে বাহির হয় তাহা আপনারাও পড়েন আমিও পড়ি—বরং সম্ভবতঃ আমার চেয়ে আপনারাই বেশি খুঁটাইয়া পড়েন, কারণ আমি হেড্‌লাইন ছাড়া আর কিছু পড়ি না। তাহার পুনরুক্তি কাজেই করিব না।

কিন্তু একটি ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া শঙ্কিত হইতেছি। আসলে এটিও দুর্ঘটনার সংবাদ। গত কয়েক দিন যাবৎ প্রত্যহ বহু সংখ্যক জার্মান রণবিমান ব্রিটিশ গোলার আঘাতে ভাঙিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে। এই সংবাদ সত্য হইলে আশঙ্কার কারণ আছে।

কথাটা বুঝাইয়া বলি।

জার্মান বিমান এত সহজে এবং এত বেশি সংখ্যায় মারা পড়িতেছে কেন? বৃটিশ বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, জার্মান বিমানের গঠন ও ব্যবহৃত তেল নিকৃষ্ট স্তরের, সেই জন্যই তাহারা এত সহজে মারা পড়ে। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া নিকৃষ্ট বিমান্ পাঠানো হইতেছে কেন?

আমার মনে হয় এটা হিট্‌লারের একটা কূট চাল। আপনাদের মনে থাকিতে পারে, যুদ্ধের আরম্ভে হিট্‌লার বলিয়াছিলেন, কাইজার যে ভুল করিয়াছিলেন সে ভুল আমি করিব না। করেনও নাই। হিটলার কাইজারের পথে চলেন নাই—যদি কাহারও অনুসরণ তিনি করিয়া থাকেন, করিয়াছেন নেপোলিয়নের।

* * * * *

নেপোলিয়নের সম্বন্ধে একটি বিখ্যাত গল্প আছে। দুর্গ আক্রমণ করিতে যাইতেছেন, সম্মুখে পরিখা, পার হইবার উপায় নাই। নেপোলিয়ন আদেশ দিলেন, ফরওয়ার্ড। সম্মুখের সৈন্য পরিখায় ঝাঁপ দিল, তাহাদের দেহে পরিখা ভরিয়া গেল, পিছনের সৈন্য সেই সেতু পার হইয়া দুর্গ অধিকার করিল।

হিটলারেরও মতলব তাহাই নয় তো? ফ্রান্স পর্য্যন্ত হিট্‌লার সহজে জয় করিয়াছিলেন, তাঁহার দুর্দম ট্যাঙ্ক বাহিনীর সম্মুখে কোন বাধাই দাঁড়াইতে পারে নাই। ইংলিশ চ্যানেলের পারে গিয়া ট্যাঙ্ক থমকাইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ মেকানাইজ্‌ড্ আর্মি যতদিন না এই ব্যবধানটুকু পার হইতে পারিতেছে, ততদিন ইংল্যাণ্ড্ জয়ের আশা বৃথা।

সম্ভবত সেই জন্যই হিট্‌লার এত অধিক সংখ্যক ভঙ্গুর বিমান পাঠাইতেছেন। ইংলিশ চ্যানেল মাত্র ত্রিশ মাইল চওড়া, এবং আধমাইলটাক গভীর। যে পরিমাণ জার্মান বিমান প্রত্যহ তাহার মধ্যে পড়িতেছে,

তাহাতে সে চ্যানেল ভরিয়া উঠিতে সময় লাগিবে না। বিমানে পুরিয়া মাটি ও ছোলার ডাল লইয়া যাওয়া হইতেছে কিনা তাহাও বলা যায় না। চ্যানেল ভরিয়া গেলেই ট্যাঙ্ক-বাহিনী অবহেলে চ্যানেল পার হইবে—চ্যানেলের এ পারেই তাহারা সাজিয়া বসিয়া আছে।

* * * * *

এই অনুমান যদি সত্য হয়, তবে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের সাবধান হইতে হইবে। চ্যানেলের উপরে আগাগোড়া জাল ছড়াইয়া রাখিলে জার্মান বিমান আর তলাইয়া যাইতে পারিবে না, জালে আট্‌কাইয়া থাকিবে। তারপর চুম্বকের সাহায্যে সেগুলাকে টানিয়া ওপারে লইয়া গেলেই তাহার লোহালক্কড়গুলাও কাজে লাগানো যাইবে।

কিন্তু তাহার চেয়েও ভাল পন্থা, মোটে সমুদ্রেই এগুলাকে পড়িতে না দেওয়া। ইংল্যাণ্ডের ডাঙ্গায় এগুলা পড়ুক ক্ষতি নাই; অথবা ইংল্যাণ্ডের বিমান পিছনে তাড়া করিয়া ফ্রান্সের উপর পর্যন্ত যাইয়া তারপর এগুলাকে ভাঙিয়া মাটিতে ফেলুক। চ্যানেল মুক্ত রাখিতে হইলে সেটুকু শ্রম ও পেট্রল খরচ স্বীকার করিতেই হইবে।

আর একটি কথা, যে বিমানগুলি এইরূপে ফ্রান্সে যাইবে, তাহাদের যেন আগাগোড়া বোমা ও মাইনে ঠাসিয়া দেওয়া হয়—দৈবাৎ ভাঙিয়া পড়িলে যেন ইহারা 'কুরুকুল চাপিয়াই পড়িতে পারে। আমার মনে হয়, সুধু এই জন্যই কিছু বিমান পাঠাইলে ক্ষতি নাই। বরং যা দেখিতেছি, বৃটেনের কিছু বেশি বিমান—তা হউক সে টিনের বিমান—ভাঙা দরকার; না হইলে পরে জার্মান বলিবে উহাদের বিমান কম পড়িয়াছে; আমাদের এত বিমান ভাঙে, আর উহাদের ভাঙিবার মত বিমানও নাই।

বৃটিশ সমর পরিষদ কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন কি?



ফ্লোরেন্‌স্‌

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

• ইটালীর মধ্যে ফ্লোরেন্‌স্‌ একটি পুরাতন সহর। ফিনিস্‌ সমুদ্রের মধ্যে ফুলের মত ভাস্‌ছে, তাই তার এত খ্যাতি। ইতিহাসেও তার নাম উঠেছে, কিন্তু সেইটে তার সব চেয়ে বড় পরিচয় নয়। ইটালীর সর্বত্র যে প্রাচীন গৌরববাহিনী সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, ফ্লোরেন্‌স্‌ এবং রোম তার দুইটি কেন্দ্রস্থল। এ দুইটি সহরের পরিচয় দিতে গেলে ইটালীর একখানি বড় রকমের ইতিহাস লিখ্‌তে হয়। আমি কেবল দুই চারিটি কথায় আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয়ই বলবো।

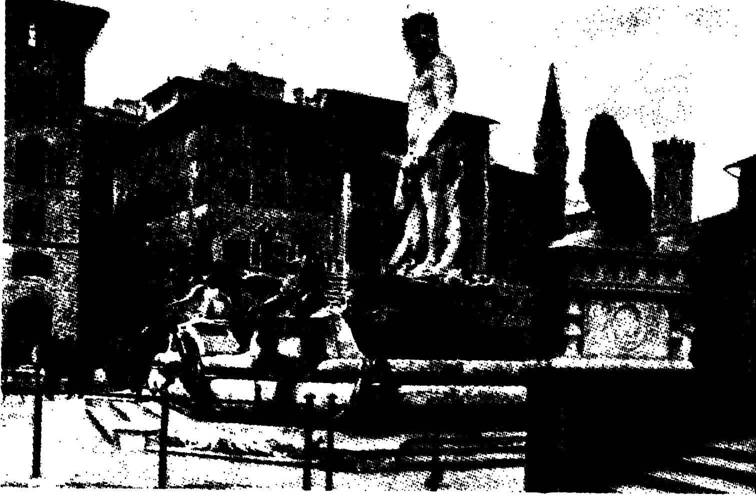
১১ই আগষ্ট অপরাহ্নে ফ্লোরেন্‌সে পৌঁছানো গেল। ষ্টেষণটি খুব বড় নয়। বলোনিয়া (Bologna) আমাদের পথে পড়েছিল। সে ষ্টেষণটি খুব বড় বলে মনে হলো। বলোনিয়া ছাড়িয়ে আমরা একটা টানেল পার হলাম, সেটা অনেকটা লম্বা। ফ্লোরেন্‌স্‌ সহরের প্রাচীন ইটালীয় নাম ফ্লোরেন্টিনা। এখন সংক্ষেপে



মাইকেল এঞ্জেলো উদ্যান

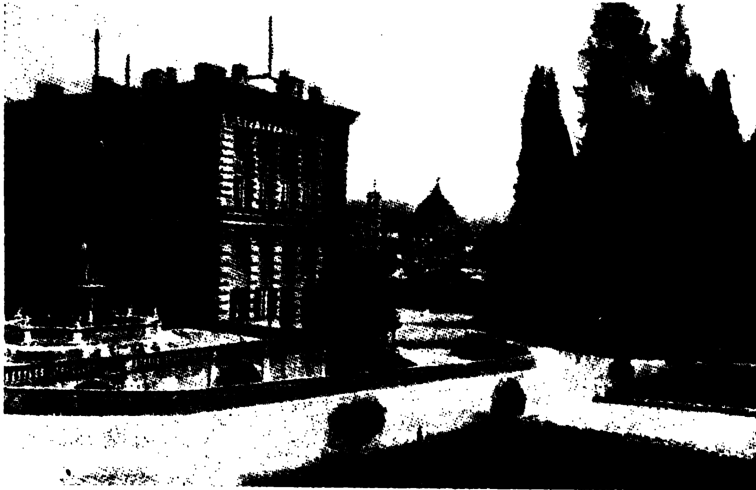
ফিরেনজি। হোটেল ম্যাজেষ্টিক্‌ ওখানকার একটি বড় হোটেল। তাদের গাড়ীতেই হোটেলে এলাম এবং চার তলায় একটি কক্ষ আমার অবস্থিতির জন্য নির্দিষ্ট হলো। ফ্লোরেন্‌স্‌ বেশ গরম বোধ হলো। পোষাক যথাসম্ভব হাল্‌কা করে বেরিয়ে পড়া গেল। আমাদের হোটেলের কাছে আর একটি আরও বড় হোটেলে দাঁড়িয়ে এক জাপানী যুবকের কুশল প্রশ্ন করা গেল। যুবকটি একটি নব বিবাহিতা পত্নীকে নিয়ে মধুচন্দ্রমা যাপন করতে ইয়ুরোপে এসেছেন। আমরা একই ট্রেণে ভিনিস থেকে এসেছিলাম। গাড়ীতে তাঁদের দেখে ভাল লেগেছিল। তরুণ তরুণীর ভাব দেখে বোধ হয়েছিল যে তাদের পরাণে লেগেছে বসন্তের ফাগ, হাল্‌কা হাওয়ায় ভেসে চলেছে যেন, ছোট দুখানি তরণী। আগন্তুক দেখলেই দুজনের মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ছে ক্ষণে ক্ষণে। আর্থিক অবস্থা যে দু'জনেরই ভাল তা তাদের সুন্দর, চিন্তাশূন্য প্রফুল্ল মুখ দেখলেই বেশ বুঝা যায়। তাঁরা প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন।

ফ্লোরেন্সের রাস্তাগুলি প্রাচীন সহরের মত সরু। তার এক পাশ দিয়ে আবার ট্রাম চলেছে। বাড়ীর গায়ে বাড়ী উঠেছে ঠেসাঠেসি করে'। কাজেই সহরে লোকের ভীড়, বাড়ির ভীড় এবং গাড়ীর ভীড় আছেই। কতকগুলি রাস্তার মোড়ে মোড়ে ধর্ম্মবিষয়ক ছবি আছে—তার সামনে বাতি জ্বেলে দেওয়া হয়



নেপ্‌চুনের ফোয়ারা

সেজন্য দীপাধার রয়েছে। সেকালে লোক রাস্তার মোড়ে মোড়ে নাকি উপাসনা করতো! আমাদের দেশেও তেমাথা চৌমাথা রাস্তা বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য প্রশস্ত বলে' এখনও গণ্য হয়।



পিত্তি প্রাসাদ চিত্রশালা

খানিকটা বেড়িয়ে আমরা—সঙ্গে দু'জন মহিলা ছিলেন—হোটেলে ফিরে এলাম এবং রাত্রির খাওয়া শেষ করে'ই হোটেল থেকে একটি গাইড্ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম একখানা ফীটন গাড়ীতে। ফ্লোরেন্সের নীচে ছোট একটি নদী আছে, তার নাম আর্ণো। আর্ণো পার হয়ে পুরাণো প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়ে আমরা গেলাম পিয়াট্‌সা (Piazza) মিকেল এঞ্জেলোতে। ঐ উদ্যানটি একটি ছোট্ট পাহাড়ের উপর

এবং সেখান থেকে ফ্লোরেন্‌স্ নগরী অতি সুন্দর দেখায়। ফ্লোরেন্‌সের সহস্র আলোকমালা—সেই পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে মনে হয় যেন পাতালপুরীতে কোনও দৈত্য রাজার রাজ সভা বসেছে। ইটালীর গৌরব মাইকেল এঞ্জেলোর বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি সেই উদ্যানের মাঝখানে রয়েছে। আমাদের সঙ্গে যে মার্কিন রমণী ছিলেন তিনি বল্‌লেন যে একজন পর্যটক এই শোভাময়ী নগরীকে পৃথিবীর মধ্যে অতুলনীয়া বলেছেন। আমারও মনে হয় যে এর তুলনা বিরল। সিমলা শৈলের আলোকমালা ঘনীভূত সন্ধ্যায় 'প্রস্পেক্‌ট হিল' থেকে দেখেছি সেও অতি সুন্দর। কিন্তু এ যেন তার চেয়েও সুন্দর। 'মাইকেল' এঞ্জেলো উদ্যানে সঙ্গীতের ব্যবস্থা ছিল খানিকক্ষণ তাই শোনা গেল। গন্ধরাজ ফুলের ছোট ছোট তোড়া বেঁধে ছোট ছোট মেয়েরা কিছু পয়সা আদায় করে' নিলে। আমাদের দেশের গন্ধরাজ ওদেশে গিয়ে জুটলো কি করে তাই ভাবতে লাগলাম। তোড়া এমন কিছু না, কতকগুলি পাতার সঙ্গে একটি কি দুইটি ফুল। একে দেশের ফুল দেখে ভাল লাগলো খুব, তার পরে কচি কচি পাতারই মত মেয়েগুলির কচি কচি মুখ যেন সমস্ত প্রাকৃতিক শোভার সঙ্গে বেশ মানিয়েছিল। আমরা 'লজা'র (Loggia) বাইরে বসে একটু কফিও খেয়ে নিলাম।



টিপিয়ানের চিত্র—ফুলবালা
(উফিটুজি চিত্রশালা)

ফিরে এসে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করলাম যখন, তখন বোধহয় বারটা হবে। ফ্লোরেন্‌সের নৈসর্গিক শোভার সঙ্গে সেই অসামান্য প্রতিভাশালী চিত্রকরের মূর্ত্তি, আর সেই গন্ধরাজের সৌরভ অনেকক্ষণ মনের মধ্যে জেগে রইল। অতীতে ইতিহাসের আলো আঁধারের মধ্যেও সে কতবার উঁকি দেবার চেষ্টা করলো। দান্তে (Dante) এখানেই জন্মগ্রহণ করে-ছিলেন (১২৬৫)। কবির উপযুক্ত জন্মভূমি বটে। এই সহরেই বিয়াত্রিচের সৃষ্টি—তাই মনে করে' ভিতরে ভিতরে আনন্দ অনুভব করলাম। এখনও যেন দান্তের কবিতার সুর পরীর বেশে গভীর রাত্রে এই নগরীর বুকে হাওয়ার সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে' উঠ্‌ছে!

এই রকম কত কি ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই।

পরদিন সকালে দেখতে গেলাম Church of the Holy Cross. গির্জাটি সহরের মাঝখানেই। পাশ দিয়ে ট্রামলাইন গেছে। আমাদের হোটেল থেকে বেশী দূরে নয়, কাজেই আমরা হেঁটেই গিয়েছিলাম। আমাদের হোটেলটা ছিল একটা Square-এর মত স্থানে, তার নাম পিয়াটসা সাঁ মেরিয়া (Piazza St Maria) এর খুব কাছেই একটা গির্জা—তার নাম St Maria Novella, কিন্তু এই হোলি ক্রসের গির্জাটি তার চেয়ে বড়। এখানকার সব চেয়ে লক্ষ্য করবার জিনিষ এর প্রকাণ্ড দরজা। এই দরজায় বাইবেলের অনেক ঘটনা উৎকীর্ণ হয়েছে—ব্রোঞ্জে। স্বর্গের প্রবেশদ্বারের পরিকল্পনা নিয়ে একজন শিল্পী এই সুন্দর দরজা জোড়া বহু বৎসর পরিশ্রম করে' তৈরী করেছিলেন।

তাঁর আবক্ষমূর্ত্তিও ঐ দরজায় ক্ষোদিত আছে। কেহ কেহ বলেন মাইকেল এঞ্জেলোরই পরিকল্পনা থেকে এই দরজা নির্মিত হয়েছিল। যা হোক, দেখবার মত বটে।

গির্জার অভ্যন্তরে মাইকেল এঞ্জেলো ও দান্তের সমাধি রয়েছে। গ্যালিলিও এবং মেকিয়াভেলির সমাধিও আছে। আর্ণোর তীরে এই পবিত্র গির্জাটিকে তৈরী করে' ইটালী তার সরস্বতীর বরপুত্ররূপ দুইজন প্রতিভাবান সন্তানের সমাধি একত্র স্থাপন করে' কৃতকৃতার্থ হয়েছে। আমরা যেতে যেতে দান্তের গৃহ ও মেকিয়াভেলির প্রাসাদ দেখলাম। Capelle Medici অর্থাৎ মেদিচিদের চ্যাপেল বা গির্জাও একটা দেখবার মত স্থান। এখনও তার অভ্যন্তরে কাজ চলছে। দেয়ালের গায়ে অনেক চিত্র ও ভাস্কর্যের সমাবেশ করে' মেডিচিদের ঐশ্বর্যের পরিচয় দেওয়া হয়েচে।



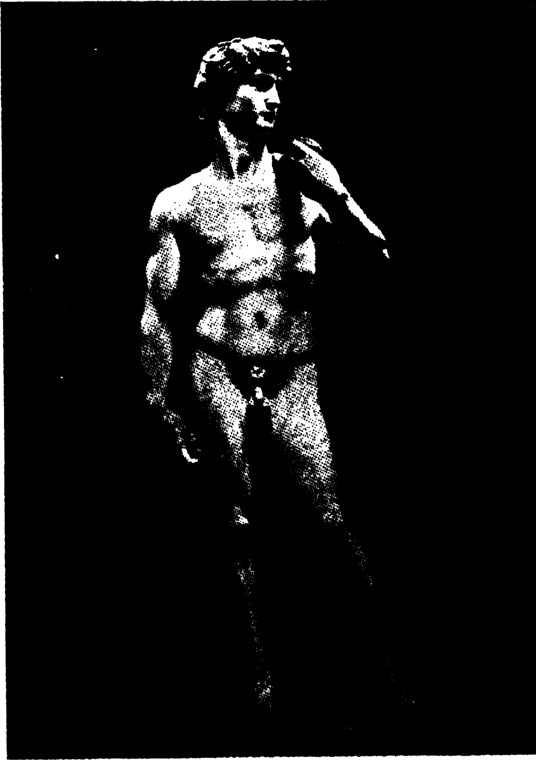
রাফায়েলের চিত্র—ম্যাডোনা
(উফিট্‌জি চিত্রশালা)

তারপরে দেখতে গেলাম ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত চিত্রশালা। ইতালীয়েরা চিত্রবিদ্যা ও ভাস্কর্যে যেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, এমন আর কোনও জাতি নয়। এদের প্রসিদ্ধ চিত্রশালাগুলি বহুদিন ধরে, দেখলে' তবে তা সম্যক উপভোগ করা যায়। উফিট্‌জি (Ufizzi) গ্যালারি আর্ণো নদীর এ পারে—অর্থাৎ আমাদের হোটেল যে পারে। এই চিত্র-শালা যে স্কোয়ারে অবস্থিত, তার নাম Plazza Signora অর্থাৎ ভদ্রলোকদের উদ্যান। এখানে নেপ্‌চুনের ঝর্ণা আছে—মূর্ত্তিটি প্রস্তর নির্মিত ও বৃহৎ। এখানে আরও কতকগুলি প্রতিমূর্ত্তি আছে যথা Rape of Persepolis, Rape of Sabines ইত্যাদি। এগুলি দেখবার মত। মূর্ত্তিগুলি বীরত্ব ও শক্তিব্যঞ্জক। উফিট্‌জি চিত্রশালায় ভেকিওর আঁকা ছবি আছে। বিখ্যাত লেনার্ডো ডা ভিঞ্চি এবং পেরুজিনো ইহাঁর শিষ্য ছিলেন। পেরুজিনো আবার রাফায়েলের শিক্ষাগুরু। এঁদের অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি এই চিত্রশালায় আছে। এ ছাড়া মাইকেল এঞ্জেলো, রিউবেন্‌স্‌, করেগিও, পাওলো ভেরোনিজ, টিশিয়ানো প্রভৃতির অঙ্কিত ছবিও আছে। মাইকেল এঞ্জেলোর প্রতিদ্বন্দ্বী Bandinallyর নির্মিত প্রতিমূর্ত্তিও দেখলাম। তাঁরও ক্ষমতা অসাধারণ ছিল বলে' মনে হলো।

বিকালে পিটি চিত্রশালা দেখতে গেলাম—Plazza Pittiতে এই প্রাসাদটি অবস্থিত। এর পশ্চাতে রাজকীয় উদ্যান (Boboli Gardens)—বিশেষ যত্নের সঙ্গে রক্ষিত হচ্চে। সপ্তাহে দু'দিন ফ্লোরেন্টাইনদের জন্যে খুলে দেওয়া হয়। বহুলোক এই প্রমোদ উদ্যান দেখ্‌তে আসে। এই চিত্রশালায় পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কয়েকখানি চিত্র আছে'—ঘুমন্ত শিশুকোলে মায়ের মূর্ত্তিটি চমৎকার। রাফায়েলের অঙ্কিত সোনালি দোয়েলের ম্যাডোনাও (Madonna of the Gold finch) অতি

সুন্দর। এ ছাড়া স্পেনের জগদ্‌বিখ্যাত শিল্পী ভেলাস্কের (Velasquez) এবং মিউরিলো, নেদারল্যাণ্ডসের শিল্পী ভ্যান ডাইকের (Van Dyck) অঙ্কিত ছবি আছে। টিশিয়ানের অর্দ্ধশয়ানা নারীমূর্ত্তিও অতুলনীয়া। শোনা যায় যে তিনি তাঁর প্রণয়িনীর ছবি এঁকেছিলেন—কিন্তু এত সুন্দরী রমণী হয় না কি? আমার মনে পড়লো বৈষ্ণব কবির পদ:

আধ আচর খসি আধ বদনে হসি
আধহি নয়ান তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি
তবধরি দগধে অনঙ্গ।


মাইকেল এঞ্জেলোর মূর্ত্তি—ফ্লোরেন্‌স্‌

পিটি গ্যালারি দেখে আমরা গেলাম ফিয়েসোল নামক একটি রমণীয় যায়গায়। ফিয়েসোল ফ্লোরেন্‌স্‌ থেকে ৭।৮ মাইল দূরে একটি উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। উচ্চতা বোধ হয় দেড়-হাজার ফিট হবে। কারণ ফ্লোরেন্‌স্‌ থেকে এই স্থানটি বেশ ঠাণ্ডা মনে হলো। যাবার পথে আমরা এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং-এর সমাধি দেখে গিয়েছিলাম। ইনি ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত কবি এবং সুবিখ্যাত কবি রবার্ট ব্রাউনিং এর পত্নী। ফিয়েসোল (Fiesol) প্রাচীনকালে (খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে) একটি বিখ্যাত convent বা আশ্রম ছিল। অনেক ফ্রান্সিস্কান সন্ন্যাসী এখানে বাস করতেন; তাঁদের প্রত্যেকের জন্য যে কক্ষ বা Cell নির্দ্দিষ্ট ছিল, তার কতকগুলি এখনও আছে। দোতলার উপর সরু সরু ঘর, একটি দীপাধার, একটি জলের কুঁজো এবং একটি মাদুর—এই পর্যন্ত আসবাব। এখানে থেকে সন্ন্যাসীরা বহুবর্ষ সাধনার দ্বারা নানাশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করতেন। এখনও ৫০ জন সন্ন্যাসী এখানে থাকেন। পাহাড়ের উপরে এই আশ্রম, অত্যন্ত নির্জন এবং সাধন ভজনের উত্তম স্থান বটে। এখানে বেতের ও দড়ির হ্যাণ্ড-ব্যাগ তৈরী হয়। পর্য্যটকেরা সেগুলি কিনে নিয়ে আসেন—বিশেষতঃ রমণীরা।

আসবার সময় আমরা সেকালের রোম্যান Amphitheatreএর ভগ্নাবশেষ দেখতে পেলাম। কত আমোদ প্রমোদ, কত ষাঁড়ের লড়াই, কত শার্দ্দুলের লড়াই কত নরশার্দুলের (Gladiator) মরণপণ যুদ্ধ এখানে সংঘটিত হতো আর অসংখ্য নরনারী দর্শন করতো।

এখন আর সন্ন্যাসীদের এমন আশ্রম (monasteries) আর হবার যো নেই—আইনে বন্ধ করে' দিয়েছে। আগে পাশ্চাত্য দেশে এমন বহু আশ্রম হয়েছিল এবং তার কোনও কোনওটিতে অগাধ টাকা কড়ি থাকতো। অষ্টম হেনরী ইংলণ্ডে এই সকল আশ্রম বাজেয়াপ্ত করে বহু টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। ইতালীতে এখন আর প্রকাশ্যভাবে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীর দল গঠন করা যায় না। কিন্তু গোপনে গোপনে প্রথাটি এখনও চলছে। যাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় বা যারা ভিক্ষা করতে কুণ্ঠিত, তাদের জন্য সাহায্য প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েচে, অনাথদের জন্যও আশ্রম হয়েচে। কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেমেয়েদের যেখানে মানুষ করা হয় এবং এমন কোনও কাজ বা বৃত্তি শিখিয়ে দেওয়া হয়, যাতে পরিণামে তারা খেটে খেতে পারে।

এই সকল দয়ার প্রবৃত্তি ফ্লোরেন্টাইনদের মধ্যে খুব প্রবল। ওরা এদিকে খুব যে সাহসী বা কষ্ট সহিষ্ণু, তা নয়; প্রায় বাঙ্গালীদেরই মত। কিন্তু ওদের মন খুব কোমল এবং সৌন্দর্যবোধ ওদের মধ্যে খুব তীক্ষ্ণ। তাই ওদের সারা সহরটি যেন চিত্রবিদ্যা ও ভাস্কর্যের নানা নমুনা দিয়ে সাজানো। আর্ণোর উপরে যে সেতু আছে, তার মধ্যে তারা দুই একটি মূর্ত্তি তৈরী করে সাজিয়ে রেখেচে—যেমন সাঁ ত্রিনিতা সেতু (St. Trinita)।

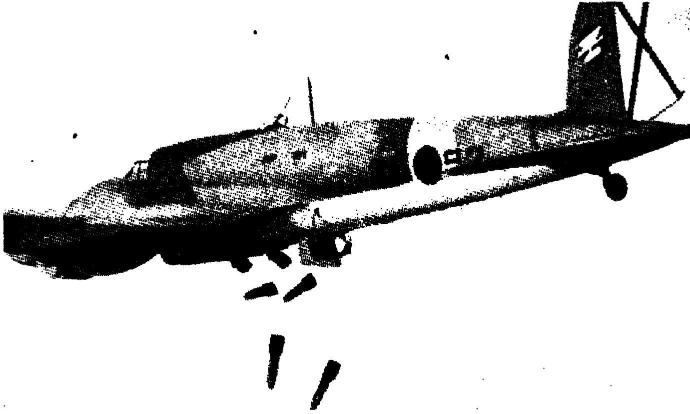


দ্বিতীয় মহাসমর

বিমানযুদ্ধ

শ্রীফণিভূষণ রায়

মহাসমরের বর্ত্তমান অবস্থায় অন্তঃরীক্ষই প্রধানতঃ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হওয়ায় যুদ্ধের আমূল গতিপ্রকৃতি ও ফলাফল বহুদূরপ্রসারী হইয়া পড়িয়াছে। অতীতে শত্রুর অকস্মাৎ আক্রমণ হইতে বৃটীশদ্বীপপুঞ্জকে রক্ষা করার পক্ষে সমুদ্র বা জলপথের উপযোগিতা অত্যন্ত বেশি ছিল। হঠাৎ সমুদ্র ডিঙ্গাইয়া কেহ সৈন্যসামন্ত লইয়া ইংলণ্ড অভিযান করিতে সমর্থ হইত না। কিন্তু যেদিন ইয়োরোপের যুদ্ধে নানাপ্রকারের বিমানের ব্যবহার আরম্ভ হইল সেদিন হইতে যুদ্ধরত দেশসমূহের সম্মুখে একটি ভয়াবহ সমস্যা নূতন আকারে দেখা দিল। বর্ত্তমান সময়ে তাই সমুদ্রের উপযোগিতা কতকাংশে মূল্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু ও জঙ্গীবিমান তাই এখন সমুদ্রের উপর দিয়া উড়িয়া শত্রুরাজ্যে সৈন্যঘাঁটির কিংবা দেশবাসীর উপর আক্রমণ চালাইতে পারে। বৃটেনের শক্তিশালী নৌবহর সমুদ্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকায় অতীতে অকস্মাৎ বৃটেন অভিযান অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। এখন এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাই শক্তিশালী নৌবাহিনী থাকা সত্ত্বেও বৃটেনকে বিমান আক্রমণের বিরুদ্ধেও উপযুক্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। নৌবাহিনী দ্বারা দেশরক্ষা ও বিমানবিধ্বংসী কামান বা অনুরূপ বিধি ব্যবস্থায় বিমান আক্রমণের প্রতিরোধ করার মধ্যেও ফলাফলের অনেকটা তারতম্য হয়। বিমান আক্রমণে দেশের সাধারণ অসামরিক অধিবাসীদের বিপদের অবসর ও আশঙ্কা অনেক বেশি থাকে। এই কারণে বিমান আক্রমণের সময়ে অনেকটা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রশ্ন উঠে। অধ্যাপক এ. এম. লো (A. M. Low) সাহেব বলেন "দেশের মধ্যে এমন বহু অধিবাসীই পাওয়া যাইবে যাঁহারা বিমান আক্রমণের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাকে কেবলমাত্র স্ব স্ব আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, এবং এই জন্যই নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধের সময় সমুদ্রের আধিপত্য রক্ষার উপর যতখানি ভাগ্য নির্ভর করে বলিয়া সকলে মনে করিত, এখন বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থাকে দেশবাসী ঠিক ততখানি গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া নিজেদের ভাগ্যের সহিত জড়াইয়া দেখিতে অভ্যস্ত হয় নাই।" গত মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময়

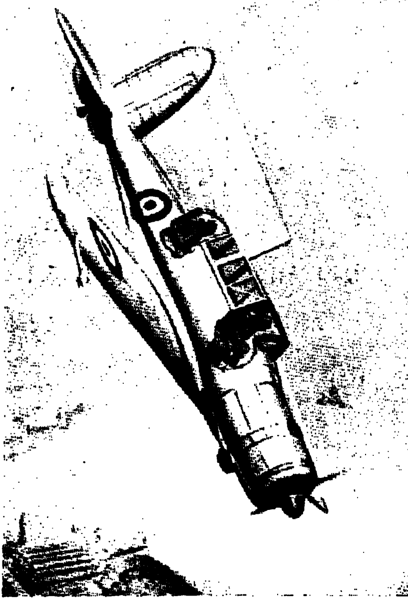


জার্ম্মানীর অতি ভয়ঙ্কর হেন্‌কেল (Heinkel) জাতীয় বোমারু বিমান। চিত্রে দেখা যাইতেছে যে এই অতিকায় বীভৎস মারনযন্ত্রটী প্রতিবারে ২টী ২টী করিয়া বোমা নিক্ষেপ করতঃ নীচে ধ্বংসলীলার অভিনয় করিতেছে।

বৃটেনের মাত্র দুইশতখানি বিমান ছিল। বৈমানিকের নিকট থাকিত হয় একটি রিভলভর নয়তো



এই বিশাল হেন্‌কেল বিমানটী বোমা নিক্ষেপ করার কিছুক্ষণ পরেই আগুন ধরিয়া ভূতলে পতিত হইতেছে। এই ঘটনা প্যারিস নগরীর একপ্রান্তে ঘটিয়াছিল।



বৃটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীর (Dive bomber) 'ডাইভ' বিমান 'ব্লেকবার্ণ স্কোয়া'। নৌবাহিনীর সাহায্যের জন্য ইহাই সর্ব্বপ্রথম নির্ম্মিত হয় এবং সমুদ্রের উপর উড়িবার নিমিত্ত ইহার সকল প্রকার কলকাঠিই আছে। বহু উর্দ্ধ হইতে নিমেষে ছোঁ মারিয়া ইহা নীচে লক্ষ্য বস্তুকে ঘায়েল করিতে পারে।

বড় জোর একটি রাইফেল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বিমান ব্যবস্থার এরূপ পরিবর্ত্তন করা হইল যে এই সমস্ত বিমানের সাহায্যেই শত্রুর অগ্রগতি প্রতিহত হইতে লাগিল।

সত্যসত্যই যুদ্ধের শক্তিশালী অস্ত্র হিসাবে বিমান ব্যবহারের উপযোগিতা আজ আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পাইলট্ বা বিমানচালকই একখানি বোমারু বিমানের ক্যাপ্টেন বা অধিনায়ক। তিনিই বেতারের সংবাদসমূহ ধরেন এবং সন্ধানীরা তাঁহার নিকটেই সমস্ত বলেন। অবশ্য বিমানচালক এবং বিমানের অন্যান্য সৈন্য মিলিয়া মিশিয়া এক যোগে কাজ করিয়া থাকে। বিমানচালকই বোমার খাপ খুলিবার আদেশ দেন, এবং বোমাগুলি ঠিক করেন, আর ইতিমধ্যে পর্য্যবেক্ষণকারী ঠিক ঠিক সুইচগুলি বাহির করেন এবং সবটা একবার পরীক্ষা করিয়া লন। তখন পাইলটের কর্ত্তব্য হইল বিমানটিকে অতিশয় সাবধানে সমান্তরাল করিয়া রাখা, তারপর তিনি আদেশ দেন "বোমাবর্ষণ করিয়া যাও"; তখন সুইচ টিপিয়া একটির পর একটি বোমা ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং নীচে ধ্বংসলীলা আরম্ভ হয়। বোমাবর্ষণের অনেক পূর্ব্বেই বৈমানিকগণ একত্রিত হইয়া পরামর্শক্রমে ঠিক করিয়া লন যে কতখানি উঁচু হইতে, কোথায়

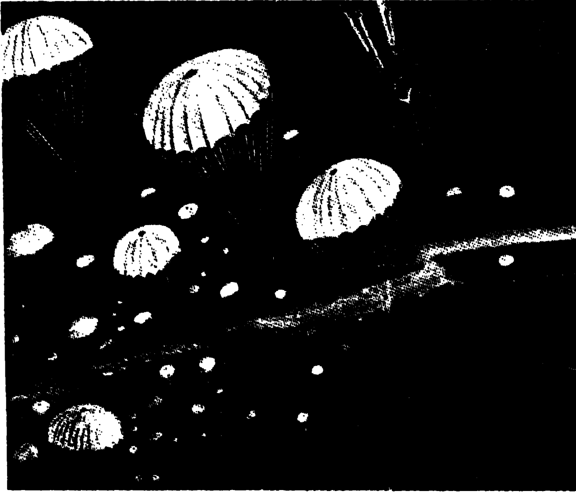
কিরূপ কৌশলে বোমাবর্ষণ করা হইবে। লক্ষ্যবস্তু (Target) হইতে কতখানি দূরে বোমা ফেলা হইবে তাহা নির্ভর করে বোমাটি কতখানি বেগে নিক্ষেপ করা হইল তাহার উপর। যতখানি উঁচু হইতে বোমাবর্ষণ করা হইবে সেই অনুপাতে প্রত্যেক স্কোয়ার ফুটের এক চতুর্থাংশই হইবে বোমাপতনের উপযোগি কাল। বৈমানিকগণের মধ্যে যিনি সন্ধানকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাকে বলা হয় দ্বিতীয় পাইলট্। তাঁহার বহুমুখীন ক্ষমতা থাকে। তাঁহাকে অনেক সময়েই বিমান হইতে 'ফটো' লইতে হয়। আমরা সচরাচর যে সমস্ত বিস্ময়কর যুদ্ধের চিত্র দেখিয়া থাকি তাহার মধ্যে অনেকগুলিই ঊর্দ্ধ আকাশে বিমানের মধ্য হইতে ক্যামেরা-দ্বারা লওয়া।



বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্ম্মানদের আক্রমণকৌশল ও ক্ষিপ্রকারিতার ইহা একখানি চমকপ্রদ ছবি। গত জুন মাসে জার্ম্মানী কর্ত্তৃক হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম আক্রান্ত হইবার পর জার্ম্মান সৈন্যবাহিনী অপ্রত্যাশিতভাবে জার্ম্মানী ও বেলজিয়ামের সীমান্তে অবস্থিত মাস্ নদীর ধারে আসিয়া পৌছিল। চিত্রে দেখা যাইতেছে যে জার্ম্মানরা সৈন্যবাহী বিমান সমূহ হইতে অবতরণ করিয়া 'রবার বোটের' (রবার নির্ম্মিত নৌকা) সাহায্যে নদী পার হইয়া বেলজিয়ামের ভূমিতে অবতরণ করিতেছে।

বর্ত্তমানে জার্ম্মানরা ইংলণ্ডের শহরগুলিতে ব্যাপকভাবে বিমান হইতে বোমাবর্ষণ করিতেছে। সংবাদপত্রে আমরা প্রায় প্রত্যহই জার্ম্মাণ বিমান আক্রমণ, বৃটিশ জঙ্গীবিমান দ্বারা তাহাদের বাধাদান এবং তৎসংক্রান্ত ফলাফল সম্বন্ধে বেশ চাঞ্চল্যকর সংবাদ পড়িতেছি। হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম হইতে সমর নায়কগণ এই শিক্ষালাভ করিয়াছেন যে বিমানবাহিনীর সহিত সংশ্লিষ্ট প্যারাসুটধারী সৈন্যশ্রেণী অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ এবং নির্ম্মম। ইহারা অত্যন্ত আকস্মিকভাবে প্রচুর সংখ্যায় নামিয়া দেশবাসীর মনে আচম্কা একটা ত্রাসের সঞ্চার করিতে সমর্থ হয়। গত একপক্ষ কালের বিমানযুদ্ধে জগতবাসী স্থির বুঝিতে পারিয়াছে যে, যেমন বিরাট শক্তিমান বৃটিশ নৌবাহিনী এড়াইয়া হিটলার ইংলণ্ড আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য পাঠাইতে সক্ষম

হওয়ার দুরাশা ত্যাগ করিতেই বাধ্য, সেইরূপ যাহাতে বিমান বোঝাই করিয়া আকাশ হইতে প্যারাসুট অবলম্বন করিয়া নাজী সৈন্যশ্রেণী বৃটেনের ভূমিতে নামিয়া কোনরূপ বিপর্য্যয় ঘটাইতে না পারে সেজন্যও বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী সম্যক সচেতন এবং ইহার পূর্ণ প্রতিরোধকল্পে যথোচিত কঠোর ব্যবস্থাই অবলম্বিত হইয়াছে। যদি হিট্‌লার মনে করিয়া থাকেন যে কেবল বিমান আক্রমণের দ্বারাই তিনি ইংলণ্ড ধ্বংস করিবেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অবশ্যই অতিশয় কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। সারি সারি বিমানধ্বংসী কামান, বেলুনের বেড়াজাল প্রভৃতিতে বিমান আক্রমণ প্রতিহত করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হইয়াছে। প্রচুর সংখ্যায় সার্চ্চলাইট্ সর্ব্বদার জন্য কার্য্যকরী করিয়া রাখা হইয়াছে। রাত্রিতে সার্চ্চ লাইটের আলোতে কৌশলী রাজকীয় বিমানবহরের জঙ্গীবিমানসমূহ নাজী বোমারুর বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করে। এই সমস্ত রাজকীয় বিমানের নির্ম্মাণ কৌশল এমনই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং বৈমানিকগণ এমনই শিক্ষিত যে বহুদূর হইতেই তাহারা বুঝিতে পারে যে হিটলারের বোমারু উড়িয়া আসিতেছে। ইহার পর তাহারা পুর্ণোদ্যমে ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে।



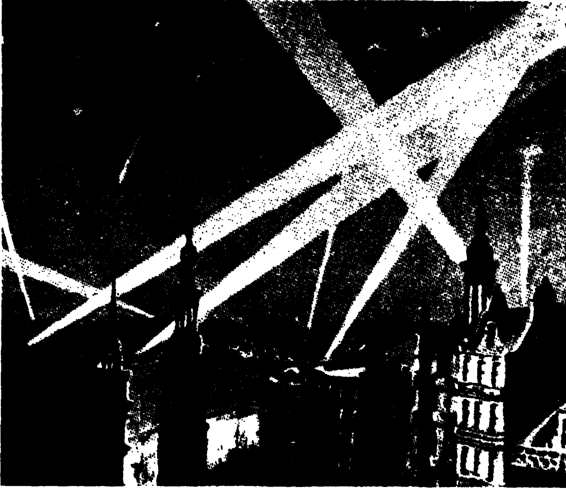
প্যারাসুট সাহায্যে শত শত নাৎসী সৈন্য চাষী, ধর্ম্মযাজক কিংবা মিত্রপক্ষের সৈন্যের ছদ্মবেশে হল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ নগর 'রোটারডমে' অবতরণ করিতেছে।

অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে জার্ম্মানীর বিমানবাহিনী এখনও পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী। হল্যাণ্ডে অস্বাভাবিক দুঃসাহসিকতার সহিত জার্ম্মান্‌রা বিমান আক্রমণ চালাইয়াছিল এবং রাজকীয় বিমানবাহিনীর হুম্‌কি অগ্রাহ্য করিয়াই চতুর্দ্দিক হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব সৌডানে অবস্থিত সৈন্যবাহিনীর উপর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করিয়াছিল। ডানকার্ক একটি বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে এবং জার্ম্মান বিমানের প্রচণ্ড আক্রমণে রোটারদামে হতাহতের সংখ্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত দুর্দ্ধর্ষ বোমাবর্ষণের ফল যতই নির্ম্মম ও শোচনীয় হউক না কেন, বিমান আক্রমণ বর্ত্তমান যুদ্ধে যতই কার্য্যকরী ও মৃত্যুবর্ষী হউক না কেন, বর্ত্তমান নিবন্ধে আমি ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাই যে কেবলমাত্র বিমান হইতে বোমা ফেলিয়া চূড়ান্তভাবে যুদ্ধ জয় অসম্ভব।

প্রকৃতপক্ষে যদি দেশরক্ষা ব্যবস্থায় একটা অনৈক্য আনিয়া দেওয়া না যায়, এবং নিকট হইতে পদাতিক সৈন্যদ্বারা অভিযান না চালান হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র বিমান হইতে শহরের উপর বোমা ফেলিয়া শেষ পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। মধ্য ইউরোপে উল্লিখিত দুইটি উপায়েই জার্ম্মনারা জয়লাভে সমর্থ হইয়াছিল। সোজাসুজি বোমাবর্ষণ করিয়া তাহারা এইসব রণাঙ্গণে জয়ী হইতে পারে নাই।

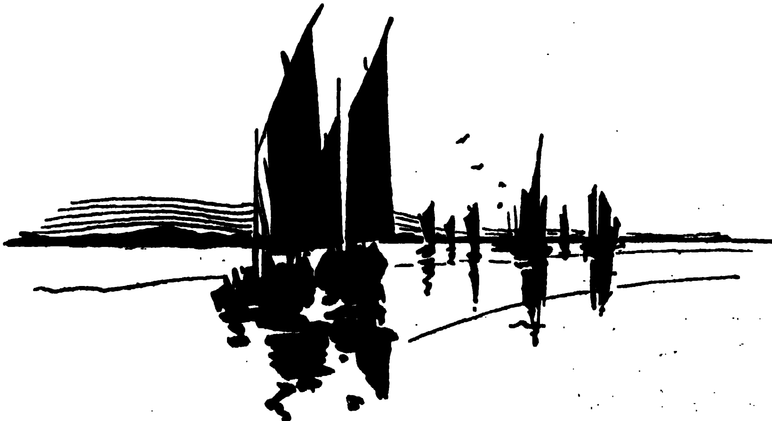
এই প্রসঙ্গে স্পেন যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করা যাইতে পারে। জার্ম্মানরা "ব্লিট্‌জক্রীগ্"

(তড়িৎ-আক্রমণ) চালাইবার সাফল্য সম্বন্ধে স্পেনের যুদ্ধ হইতে কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করিয়াছিল। বিমান আক্রমণ প্রসঙ্গে স্বতই বার্সেলোনার কথা মনে হয়। পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত এমন নির্ম্মম ও নৃশংসভাবে বোধ হয় কোন স্থানেই বোমাবর্ষণ করা হয় নাই। গৃহযুদ্ধের সময় বার্সেলোনায় ২৫০ বার বোমাবর্ষণ করা হয়। এই সমস্ত আক্রমণে প্রায় ৪৩৬৭ অধিবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিষয়টি সত্যই ভয়াবহ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ২৫০ বার বোমাবর্ষণ করিতে যে সময় ব্যয় করা হইয়াছিল সেই সময়ের মধ্যে বার্সেলোনার রাস্তার উপরে দুর্ঘটনায় তাহাপেক্ষা পঞ্চাশ গুণ বেশী প্রাণহানি হয়।



উপরোক্ত চিত্রে দেখা যাইতেছে যে জার্ম্মাণ বোমারু বিমান বাহিনী (Amsterdam) আমস্তারদম্ নগরীর উপর বেপরোয়া আক্রমণ চালাইয়াছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শত শত বিমানধ্বংসী কামান গর্জ্জিয়া উঠিল এবং 'ফ্লাস লাইটের' আলোকে গভীর রজনীর অন্ধকার দূরীভূত হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। জার্ম্মাণ বোমারু বিমান অসংখ্য বোমা বর্ষণ করিল ; ফলে বহু অসামরিক অধিবাসীর মৃত্যু ঘটিল।

উপসংহারে আমি বলিতে চাই যে, জার্ম্মান বোমারু বিমান সমূহ ইংলণ্ডে হয়ত কিছুটা ধ্বংসলীলার অভিনয় করিতে সক্ষম হইতেও পারে, কিংবা কোন কোন অঞ্চলে অধিবাসীর মধ্যেও ত্রাসের সঞ্চার হওয়া এমন বিচিত্র নাও হইতে পারে, কিন্তু একথা সত্য যে যদি হিটলার ইংলণ্ড অভিযানের জন্য অগণিত সৈন্য ইংলণ্ডের উপকূলে উপস্থিত করিতে না পারে তাহা হইলে তাহার পক্ষে ইংলণ্ড জয়ের আশা দুরাশা মাত্র। এবং যতদিন রাজকীয় বৃটিশ নৌবাহিনী সমুদ্রে আধিপত্য বিস্তার করিয়া সগর্ব্বে অক্ষুণ্ণ আছে ততদিন ইংলণ্ড অভিযানে অতীতে নেপোলিয়ানের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, বর্ত্তমানে এই কার্য্যে ইউরোপের নব নেপোলিয়ান হিটলারও তাহার আস্বাদ পাইবেন।





পুস্তক পরিচয়

"সমসাময়িক" (ত্রৈমাসিক পত্রিকা)—শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সম্পাদনায় ৬বি বকুলবাগান রো ভবানীপুর, কলিকাতা হইতে "সমসাময়িক" নামক একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয় কলিকাতার সাহিত্যিক মহলে বিশেষ পরিচিত—বিখ্যাত বলা যাইতে পারে। ইঁহারই পরিচালনায় একদা "নতন পত্রিকা" সাপ্তাহিক পত্রিকার এক উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। পাণ্ডিত্য, চিন্তাশীল সংগঠনশক্তি, বিচারপ্রবণতা এবং সর্ব্বোপরি আদর্শের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা প্রভৃতি যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য একখানি সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনে অপরিহার্য্য তাহা নীরদবাবুর মধ্যে আমরা লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত হইয়াছি এবং অকুণ্ঠিতচিত্তে আমরা 'সমসাময়িক'কে অভিনন্দিত করিতেছি।

বর্ত্তমান সংখ্যায় যে সমস্ত রচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে পত্রিকাখানি সুস্থ ও সাবলীল চিন্তাশক্তি সম্পন্ন শিক্ষিত বাঙ্গালীর জন্য। এই জন্য আমরা প্রথমেই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া রাখি যে ব্যবসায়ের দিক হইতে ইহা কতদূর সাফল্য অর্জ্জন করিবে সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহের প্রচুর অবকাশ রহিল।

"সম্পাদকীয় আলোচনায়" পরিচালন নীতি সম্বন্ধে "আমাদের জাতীয় জীবন ও কর্ম্মে স্থির বুদ্ধি ও শান্ত ধ্যানের একান্ত অভাব ঘটিতেছে বলিয়া বুদ্ধির পুনঃপ্রতিষ্ঠার" যে "চেষ্টা" করার দাবী করা হইয়াছে তাহা রক্ষিত হইলে "সমসাময়িক" সমগ্র বাঙ্গালী জাতির অভিনন্দন ও সমর্থন পাইবে। আজ এ সম্পর্কে ইহার অধিক কিছু বলিতে চাহি না। উদ্দেশ্য সাধু—ব্যক্তিগত ও দল উপদলগত স্বার্থসংঘাতের বাহিরে ইহার প্রকৃতি কতখানি সুষমামণ্ডিত হইবে তাহা একখানি সংখ্যা দেখিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না।

বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের দুইটি কবিতার সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার "শেষ অভিসার" কবিতায় পুনরায় কবির "বলাকা-মহুয়া-পূরবী" যুগের স্পন্দন অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ব্যতীত শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের "আমার মরণ হবে"—কবিতাটি আমাদের অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছে। সুষ্ঠু কল্পনার বৃন্তে প্রস্ফুটিত এই কবিতাটির পল্লবে পল্লবে একটা শান্ত-গাম্ভীর্য্যের সুকুমার সৌন্দর্য্য তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছে। আজকাল বাঙ্গালা-দেশে সচরাচর এমন একটি কবিতা আমাদের ভাগ্যে দুর্ল্লভ হইয়া পড়িয়াছে।

প্রবন্ধগুলির মধ্যে নীরদবাবুর "যুদ্ধের নূতন টেক্‌নিক" আমাদের নিকট অনেক নূতন তথ্য পরিবেশন করিয়াছে। আধুনিক সমরশাস্ত্র ও যুদ্ধনীতি সম্পর্কে নীরদবাবুর পাণ্ডিত্যের পরিচয় ইহাতে মিলিবে। শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার ও শ্রীযুক্ত ত্রিদিব চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ের 'বাংলার আধুনিক পলিটিক্‌সের নিষ্ফলতা ও মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় ভারতবর্ষের রাজনীতি" শীর্ষক প্রবন্ধ দুইটিতে স্পষ্ট অন্তর্দৃষ্টি ও নিরপেক্ষ উচ্ছ্বাসবিহীন বিচারপ্রবণতা লক্ষণীয়। বঙ্গদেশের "পলিটিক্‌স" প্রসঙ্গে যাঁহারা অযথা "কাদা ছোঁড়াছুড়ি" করেন এবং মহাযুদ্ধের সহিত ভারতবর্ষকে জড়াইয়া তাল পাকাইয়া যাঁহারা নানারূপ কৌতুককর আলোচনা ও আত্ম-প্রতারণা করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে এই প্রবন্ধ দুইটি পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। মহারাজা শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহশর্ম্মা কর্ত্তৃক লিখিত "হাতী শিকারে অভিজ্ঞতা" রচনারীতির ও ভাষার সরল মাধুর্য্যে সমৃদ্ধ। "একেলা" নামক ছদ্মবেশীর "ইউরোপীয় সঙ্গীতের সন্ধানে" শীর্ষক ব্যক্তিগত বিশেষ একটি রুচির বিকাশমূলক হাল্কা প্রবন্ধটিতে আমরা একটু উৎকট পাণ্ডিত্য দেখাইবার প্রয়াস লক্ষ্য করিয়াছি, কিন্তু প্রকাশভঙ্গিমা অতিশয় সরস ও বর্ণনাচাতুর্য্য ততোধিক মনোহারী হওয়ায় এই "Pedantic," চৌহ্যাচ্‌টি পাঠককে উত্যক্ত করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে প্রচুর আনন্দই দিয়াছে। শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য লিখিত "তত্ত্ববিচার" প্রবন্ধটি আমরা যে শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া উঠিতে পারি নাই তাহা অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিতেছি। যতই গভীর পাণ্ডিত্যমূলক হউক না কেন এরূপ প্রবন্ধকে অতটা স্থান গ্রাস করিয়া এমন নির্ব্বিকার ঔদাসীন্যে বিরাজ করিতে না দেওয়াই সাময়িক পত্রিকার পক্ষে মঙ্গলজনক। শ্রীযুক্ত দিলীপ সান্যাল মহাশয়ের 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিচার' প্রবন্ধটি অত্যন্ত

...ভাগ্য হইয়াছে। ইহাতে সরস পাণ্ডিত্যের ও শুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির ...চয় মিলিবে। অনুবাদের জন্য ক্লাইভ বেলের "Civilization" ...ক্ষা ভাল গ্রন্থ নির্ব্বাচিত করা উচিত ছিল।

পুস্তক সমালোচনা দুইটি অবিসম্বাদিতরূপে "সমসাময়িকে"র গৌরব ...ক্ষুণ্ণ করিয়া রাখিয়াছে। সম্পাদকীয় আলোচনার একটি অংশে সম্পাদক বলিয়াছেন "আজ পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই বুদ্ধিবৃত্তি একটু কোণ ঠাসা হইয়া রহিয়াছে, উহার স্থান অধিকার করিয়াছে বিচারহীন আবেগ বা ততোধিক বিচারহীন গতানুগতিকতা"। ইহারই ফলে 'গুরুবাদে' আমরা একান্ত অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। নিরপেক্ষ যুক্তি নির্ব্বাসিতপ্রায়। আমাদের চিন্তানায়কগণ হয় দেবতা—সর্ব্ববেত্তা—ঋষি, না হয় মূর্খ—নিরক্ষর পশুরূপে আমাদের উচ্ছ্বাসপ্রবণতার দুইদিকে লম্বমান থাকেন। তাঁহাদের যখন বিচার করার কথা হয় তখন হয় তাঁহাদের দিকে চাহিয়া ভাবাবেগে কাঁদিয়া তাঁহাদের পদতলে লুটাইয়া পড়ি, না হয় রক্তরোষে কষায়িত লোচন হইয়া অশ্লীল ভাষায় দুর্ব্বিনীত ঔদ্ধত্যে তাঁহাদের গালিগালাজ করিয়া থাকি। আমরা তাই মানীর সম্ভ্রম রাখি না, অক্ষমতার ও প্রতিরোধ করি না। ইহার মূলে রহিয়াছে ব্যক্তিগত স্বার্থানুসন্ধানের অযোগ্য প্ররোচনা। বাঙ্গালার সাহিত্য সমালোচনাতেও বাঙ্গালীর এই চিরগুন প্রকৃতি সাধারণতঃ বিড়ম্বিত হয় না। সমসাময়িকের 'পুস্তক সমালোচনা' বিভাগ এই জন্যই আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। ব্যক্তিকে অযথা আক্রমণ না করিয়াও, মানীর মান সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও, প্রতিভার মর্য্যাদায় উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াও যে তাঁহার রচনার দোষগুণ বিচার করা যায় এই সত্য ও সুন্দর আদর্শই সমালোচনাকারীর চেতনা সমৃদ্ধ রাখিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের "বাংলা ভাষা পরিচয়" ও শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" গ্রন্থদ্বয়ের সমালোচক শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত করালীকান্ত বিশ্বাস সমসাময়িক পত্রিকাকে—"বিচারহীন আবেগ বা ততোধিক বিচারহীন গতানুগতিকা"র উর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছেন।

সমসাময়িকের বাঙ্গালা ভাষা সম্পর্কে আমাদের একটু বক্তব্য আছে। তত্ত্ববিচারের ভাষা যেমন সংস্কৃত ভাষারীতি অত্যন্ত অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালীত্ব প্রায় হারাইতে বসিয়াছে সেইরূপ অন্যত্রও "ইঙ্গস্কৃত" বাঙ্গালার সংক্রামকতা লক্ষ্য করিয়াছি।

'প্যারিস, কি পড়ে গেছে' বাঙ্গালা নয় সত্য, "কিন্তু প্যারিস মহানগরীর পতন" শুদ্ধ এবং রীতিসম্মত বাঙ্গালা। বাঙ্গালা ভাষার 'Semasiology' বা "শব্দার্থতত্ত্বের" বিরোধী এই প্রয়োগ নয়। পতন বলিলেই "উঁচু হইতে ঢুপ করিয়া পড়া" বুঝায় না, যদিও অর্থবিশ্লেষণে মূলতঃ এই তাৎপর্য্যেই পৌঁছান যায়। ["অধঃপতন" শব্দটির অর্থ বিবর্ত্তন তুলনীয়।]

রতনদীঘির জমিদার-বধূ—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত নূতন উপন্যাস। প্রকাশক—শ্রীরমেশচন্দ্র পাল বি-এ। গুরুচরণ পাবলিশিং হাউস্ ২৯।১।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

রামপদবাবু বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে গল্প লিখিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা সরস। আলোচ্য উপন্যাসখানিতে মহামায়া, রেণু, অনীতা, মাণিক প্রভৃতি চরিত্রগুলি বেশ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। উপন্যাসখানি সামাজিক অর্থাৎ ডিটেক্‌টিভ্ জাতীয় নহে। সামাজিক উপন্যাসে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত যতদূর সম্ভব দিয়া তিনি কাহিনীকে শেষ পর্য্যন্ত সরস করিয়া তুলিয়াছেন। রেণু চরিত্রটি করুণ বলিয়া তাহা পাঠকগণের মনে থাকিবে। মোটের উপর উপন্যাসখানি ভালোই হইয়াছে বলিতে হইবে। আশা করি বাংলা দেশে রামপদবাবুর এই উপন্যাস সমাদৃত হইবে।

বাংলায় ভ্রমণ—ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের প্রচারক বিভাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৯৪০। মূল্য প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

বাংলা দেশের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান এবং ইতিহাস-বিখ্যাত প্রাচীন নগর ও গ্রামগুলির নাতিদীর্ঘ চিত্তাকর্ষক বিবরণ, তৎসঙ্গে সেই সেই স্থানের সুন্দর সুন্দর আলোকচিত্র এই বইখানিতে আছে। ছাত্র, ভ্রমণকারী এবং প্রাচীন ইতিবৃত্তে আগ্রহশীল ব্যক্তিগণের এই বই নিত্য সঙ্গী হওয়া প্রয়োজন। অন্তত বসিয়া বসিয়া বইখানির ছবিগুলি দেখিলেও অনেক জ্ঞান লাভ হয়। ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া সাধারণের যে মহদুপকার করিয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পুস্তকখানি দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রকাশক দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বলিয়াছেন : "বাংলায় ভ্রমণ" নাম যাহাতে সার্থক হয় সেজন্য প্রথম সংস্করণের ভূমিকায়, অন্যান্য রেলপথের সহিত একযোগে সমগ্র বাংলার বিবরণসহ একখানি পুস্তক প্রণয়নের ইচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছিল। সুখের বিষয়, পূর্ব্ব ভারত, বাংলা নাগপুর ও আসাম বাংলা রেলপথের সহযোগিতা লাভ করিতে পারায় বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণে সমগ্র বাংলার বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত হইল। পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশগুলির যে যে অংশে বহু বঙ্গ ভাষাভাষীর বাস আছে এবং বাংলার সহিত যাহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে, বাঙালী ভ্রমণকারীর সুবিধার জন্য এই পুস্তকে তাহাদেরও স্থান দেওয়া হইয়াছে। রেলপথের নিকটবর্ত্তী স্থান ব্যতীত রেল ষ্টেশন হইতে মোটরবাস, ষ্টীমার বা নৌকাযোগে যে সকল প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন স্থানে যাওয়া যায় তাহাদের বিবরণও ইহাতে দেওয়া হইল।"

যদিও প্রকাশক ভূমিকায় বলিয়াছেন, "ইহা একখানি সামান্য প্রদর্শিকা বা ভ্রমণ পুস্তিকা মাত্র, আংশিক ভাবেও ইতিহাসের স্থানাভিষিক্ত নহে", তথাপি আমাদের মনে হয় ইহা একাধারে ভ্রমণ পুস্তিকা এবং ইতিহাসের সার-সংগ্রহ। প্রত্যেক বাঙালীর এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করা উচিত।



সম্পাদকীয়

হতভাগ্য বাংলাদেশে সম্প্রতি যে কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেছে আমরা প্রথমে তাহারই আলোচনা করিব। জাতীয় দুর্ঘটনার কথা বলিতে গেলে—অন্ততঃ আমাদের দিক হইতে বলিতে গেলে—সর্ব্বপ্রথমে মাধ্যমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত বিলেরই উল্লেখ করিতে হয়। এই বিলটির উদ্দেশ্য মাধ্যমিক—অর্থাৎ. প্রাথমিক শিক্ষা ও ম্যাট্রিকুলেশনের পরবর্ত্তী উচ্চশিক্ষা বাদে আর সব শিক্ষাই নিয়ন্ত্রিত করা। উপস্থিত এই শিক্ষার কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই, সুতরাং বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী দেশের দুঃখ দূর করিবার জন্য এই বিলটি পরিষদে আনিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধু!

কিন্তু ইহাই সব নয়—যাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত হইতে শিক্ষা পরিচালনার সব ভার কাড়িয়া লইয়া মুসলমান মন্ত্রীমণ্ডলীর সাহায্যে হিন্দুদের শিক্ষাব্যাপারে যথেষ্ট ব্যাঘাত ও বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারা যায় তাহারও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কারণ, যে বোর্ডটির সদস্যগণ শিক্ষা পরিচালন করিবেন তাহাদের সংখ্যা পঞ্চাশ এবং ইহার মধ্যে মাত্র দশজন হিন্দু; এবং আত্মসম্ভ্রম জ্ঞান আছে এমন কোন হিন্দু এই বোর্ডে যোগ দিবেন বলিয়া আমরা আশা করি না; সুতরাং হিন্দুর স্বার্থ কতটা রক্ষিত হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। অবশ্য মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যাপারে উন্নতির প্রয়োজন আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় ত্রুটি থাকিলে তাহার প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন; কিন্তু সেই অজুহাতে বাংলা সরকার এবং মুসলমান মন্ত্রীমণ্ডলীর হাতে শিক্ষার ভার তুলিয়া দিবার কোনই সার্থকতা নাই। ইহা স্যাড্‌লার রিপোর্টের বিরোধী। মাধ্যমিক শিক্ষার যতটুকু প্রচারই হইয়া থাকুক তাহা বাংলা সরকারের বিনা সাহায্যেই হইয়াছে এবং দেশের শিক্ষার্থী বহুল পরিমাণেই হিন্দু, একথা ভুলিলে চলিবে না। যদি মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষার উন্নতিবিধানই উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে স্বতন্ত্র মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা সহজেই করা যাইতে পারিত। তাহার জন্য অগণিত হিন্দু ছাত্রকে অহিন্দু ভাবাপন্ন, ভ্রমাত্মক ও মিথ্যা সংবাদে পরিপূর্ণ মুসলমান রচিত পুঁথি পড়াইবার কোনই প্রয়োজন নাই।

তবে, এই বিল বন্ধ করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে আবেদন জানান এবং অরণ্যে রোদন একই কথা; সুতরাং যাহা কিছু প্রতিকার আমাদের নিজেদেরই করিতে হইবে, এবং ইহার বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়িতে

...বে। কারণ, ইহা মাত্র কয়েকটি মুসলমানকে সরকারী দপ্তরে চাকুরি দেওয়া নহে; পরবর্ত্তী যুগের সমস্ত ...ন্দুজাতির শিক্ষা ও উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিবার ব্যবস্থা এই বিলে করা হইয়াছে।

*　　*　　*　　*

দুর্ঘটনা কখনও একাকী আসে না—তাহার প্রমাণ পাইলাম আই, এফ, এ শীল্ড ফাইনালে মোহন ...গান পরাজিত হওয়াতে। প্রায় সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পরে ভাগ্যলক্ষ্মী তাহাদের সহিত আবার পরিহাস করিলেন। মোহনবাগানের কাছে এরিয়ান্‌স্‌দের পরাজয় যাঁহারা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন আজ শোকে ও দুঃখে তাঁহারা অবসন্ন; বোধ করি নিজেদের সংসারে কোনও দুর্ঘটনা ঘটিলেও তাঁহারা এতদিন বিচলিত হইতেন না।

কিন্তু ইহাই সব নয়; শোকে মুহ্যমান হইয়া ঘরে বসিয়া থাকিলে অবশ্য কিছু বলিবার ছিল না, কিন্তু ঐ দিন খেলার পর মোহন বাগান ক্লাব ঘরের সম্মুখে ক্ষুব্ধ জনতা যেরূপ অভদ্র আচরণ করিয়াছে তাহাতে নির্বাক হইয়া গিয়াছি। আরও আশ্চর্য্য হইয়াছি এই দেখিয়া যে শতকরা নব্বইজন বলিতে চেষ্টা করিতেছেন যে মোহনবাগান মনে করিলেই জিতিতে পারিত, কিন্তু কোনও "বিশেষ কারণে" আর তাহা ঘটিয়া উঠিল না! এরিয়ান্‌স্‌ শীল্ড জিতিয়া তাহাদের যে মর্ম্মপীড়া দিয়াছে ঐ ধারণাই বোধকরি তাহার একমাত্র সান্ত্বনা! মোহনবাগান জিতিলে সুখী হইতাম, কিন্তু খেলার ফলাফল সহজভাবে স্বীকার করিয়া লইবার ক্ষমতা আমাদের কবে হইবে।

*　　*　　*　　*

বহু প্রতীক্ষার পর ভাওয়াল মামলার রায় সুরু হইয়াছে। কয়েক দিনের মধ্যেই ফলাফল সম্পূর্ণ ভাবে জানিতে পারা যাইবে। বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস তাঁহার রায় পড়িতে সুরু করিয়াছেন—ইহার পর বিচারপতি লজ্‌ তাঁহার রায় দিবেন এবং শেষে বিচারপতি কষ্টেলোর রায়, তাঁহার অনুপস্থিতিতে, আদালতে পঠিত হইবে। উপস্থিত আবহাওয়া সন্ন্যাসীর পক্ষে আশাপ্রদ—কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী চঞ্চলা। সুতরাং আমরা প্রতীক্ষায় রহিলাম।

আদার ব্যাপারীদের জাহাজের খবরে প্রয়োজন নাই, তবে কলিকাতায় ফাট্‌কা বাজার আবার সরগরম হইয়া উঠিয়াছে তাহা দেখিতেছি। যে সব মাড়োয়ারীর দল গত যুদ্ধের আশানুরূপ war profit করিতে না পাইয়া নিরুৎসাহ ছিল, প্রকাশ, তাহারা নাকি এই মামলার রায়ের উপর 'দো চার রূপিয়া' বাজি ধরিয়া লোকসান মিটাইবার জন্য সচেষ্ট!

*　　*　　*　　*

ইস্‌লামিয়া কলেজে পুলিশ ছাত্রদের ধরিয়া প্রহার করিবার ফলে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়, তাহার জের এখনো মিটে নাই। তবে এই সম্পর্কে বিচারপতি আমির আলীর সভাপতিত্বে যে তদন্ত কমিটি গঠিত হইয়াছিল তাহার কাজ শেষ হইয়াছে। তদন্তে বহু ছাত্র, অধ্যাপক ও বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে শীঘ্রই রিপোর্ট বাহির হইবে।

রিপোর্ট যাহাই হউক, আদুরে ছেলেকে ধরিয়া প্রহার করিবার যে সুখ তাহা বাঙ্গলা সরকার বোধ করি ভাল করিয়াই এখন উপভোগ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় ইস্‌লামিয়া কলেজের দলে ভিড়িয়া যাইতে পারিলে ভবিষ্যতে অন্য ছাত্রদেরও কিছু সুবিধা হইতে পারে।

*　　*　　*　　*

সম্প্রতি দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। প্রথম, বিখ্যাত রুশ-বলশেভিজিমের ভূতপূর্ব্ব নেতা ট্রট্স্কি; ট্রট্স্কি একষট্টি বৎসর বয়সে আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছেন। তাঁহার নিজস্ব মতামত যাহাই হউক, ইহার জন্য তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে এবং পারিবারিক জীবনে বিপক্ষ দলের অনেক লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি যে অক্লান্তভাবে এবং অসীম সাহসের সহিত সমস্ত জীবন ধরিয়া এই সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিলেন, তাহাতে তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র।

অপরজন বিখ্যাত ইংরাজ বৈজ্ঞানিক স্যার অলিভার লজ্। তিনি উননব্বই বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। স্যার অলিভার বর্ত্তমান জগতের একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। শুধু তাহাই নয়, তিনি বিজ্ঞানের সহায়তায় ধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে ভাল করিয়া বুঝিবার প্রয়াস করিয়া এই দুই বিভিন্ন শাস্ত্রের সমন্বয় ঘটাইয়াছেন। ইহা কম কৃতিত্বের কথা নয়। স্যার অলিভার পরলোক এবং অশরীরী আত্মার কার্য্যকলাপে বিশ্বাস করিতেন এবং এ সম্বন্ধে গ্রন্থাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন। বারান্তরে ইঁহাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

* * * *

ঢাকা-মেল দুর্ঘটনার সংবাদ সকলেই অবগত আছেন। আজকাল দুর্ঘটনার মাত্রা কিছু বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার ফলে বহুলোকের প্রাণনাশ হইয়াছে এবং হইতেছে। অবশ্য কি কারণে ইহা ঘটিতেছে, সে বিচার আমাদের নহে; তাহা রেল কর্ত্তৃপক্ষ ও সাধারণে ভাবিয়া দেখিবেন। তবে এ বিষয়ে আরও সাবধানতা অবলম্বন করিবার কিছু থাকিলে তাহা অবিলম্বে করা কর্ত্তব্য; আশা করি রেল কর্ত্তৃপক্ষ ও জনসাধারণ কাহার দোষে দুর্ঘটনা ঘটিতেছে সেই বিষয়ে তর্ক না করিয়া, কি করিলে ইহার প্রতিকার হয়, সেই বিষয়ে পরস্পরে সহযোগিতা করিবেন।

* * * *

এই ভাদ্র মাসে 'অলকা'র দুই বৎসর পূর্ণ হইল। আগামী আশ্বিন মাসে 'অলকা' তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিবে এবং ঐ সংখ্যা 'অলকা'র বিশিষ্ট পূজা সংখ্যারূপে বাহির হইবে। যাঁহারা এই দুই বৎসর কাল গ্রাহক, পাঠক অথবা হিতৈষীরূপে 'অলকা'র সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি; আশা করি 'অলকা'র সহিত সম্পর্ক অব্যাহত রাখিয়া তাঁহারা আমাদিগকে ভবিষ্যতে উৎসাহিত করিতে থাকিবেন।

সুচারু, সুষ্ঠু ও সারগর্ভ মাসিক পত্রিকা হিসাবে 'অলকা' কতদূর অগ্রসর হইয়াছে সে বিচার আমরা নিজে না করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে পাঠকদিগের হাতে দিলাম। আমাদের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া 'অলকা'র উত্তরোত্তর উন্নতিসাধনে চেষ্টিত থাকিব মাত্র এইটুকু আমাদের বলিবার ছিল।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সরকার কর্ত্তৃক সম্পাদিত
শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৫৯নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীপ্রমথনাথ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও ৩৬।১ এল্‌গিন রোড হইতে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

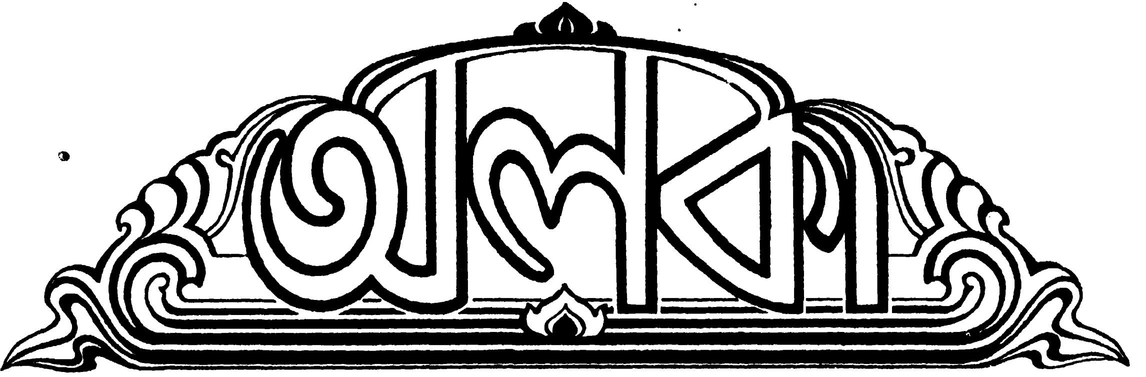


বীণাবাদিনী

শ্রীনন্দলাল বসু

ইণ্ডিয়ান স্কুল অব অরিয়েন্টাল আর্টস-এর সৌজন্যে

Engraved & Printed by
BHARAT PHOTOTYPE STUDIO



প্রথম বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৪৫ | প্রথম সংখ্যা

যুগধর্ম্ম ও সাহিত্য

সার্ শ্রীযদুনাথ সরকার, এম. এ., ডি. লিট.

আজকাল কোন বড় কাব্য, গদ্যেই হউক আর পদ্যেই হউক, কোন অমর মৌলিক গ্রন্থ কেন রচিত হইতেছে না ? বাঙ্গলা দেশে যাঁহারা একটু ভাবেন তাঁহারাই এই কথা মনে মনে আলোচনা করেন। বাগ্দেবীর এই অভিসম্পাত শুধু বঙ্গদেশেই নহে, ভারতের অন্য প্রদেশের এবং সমস্ত জগতের উপর। এই দীর্ঘশ্বাস আজ বিশ্বব্যাপী। তবে কি কাব্য-সৃজন-শক্তির এই বন্ধ্যতাকে আধুনিক সভ্যজীবনের অনিবার্য্য ফল বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে ? সকলেই বলেন যে, বর্ত্তমান জগৎ বড়ই হুটপাট করিয়া চলে, নানা দিক্ হইতে গোলমাল আসিয়া মনকে ঝালাপালা করিয়া দেয়, লোকের বসিয়া ভাবিবার, নীরবে দীর্ঘকাল প্রকৃতির শোভা দেখিবার সময় ও সুযোগ নাই ; সর্ব্বত্রই মোটরের পেচকধ্বনি, রাজনৈতিক বক্তার হ্রেষারব, বিজ্ঞাপনের ভেরীনাদ—আর কলিকাতা হইতে মফস্বল পর্য্যন্ত রেডিওর "গ্রাহকে"র সঙ্গে "উগ্রকণ্ঠ" (লাউড্ স্পীকার) লাগান,—ইহাতে বুড়া "জীর্ণ পীত বৈষয়িক" লোকদেরও বিরহী যক্ষের মত বিনিদ্র রজনী কাটাইতে হইতেছে। শেলী ও মিণ্টন রাত্রি জাগিয়াই অমর কবিতা লিখিতেন, কিন্তু আজ যদি তাঁহারা জীবিত থাকিতেন, তবে কানে তূলা না গুঁজিলে এই কাজটি সম্ভব হইত না। বর্ত্তমান সভ্যজগতে জীবনের সদা-জ্বর অকাল-জরা আনিয়া দিতেছে ; ব্লড্ প্রেশার্ ও হার্টফেল্ আর নভেলে আবদ্ধ নহে, ঘরে ঘরে ঘটিতেছে। আহা! সেকালে জীবন কত সরল, কত শান্ত ছিল ; লোকে কাব্য রচনা করিবার, কাব্য উপভোগ করিবার কত সময় পাইত। এখন হোটেলে খাইয়া যেমন গৃহিণীর রন্ধন-বিদ্যা লোপ পাইয়াছে, তেমনি ক্লাবে সন্ধ্যাটা কাটাইয়া (নচেৎ ভদ্রলোক হওয়া যায় না) এবং টকি শুনিয়া কাব্য কল্পনা করিবার, উপভোগ করিবার শক্তিও অন্তর্দ্ধান করিয়াছে।

সত্তর বৎসর আগে মার্কিন ভাবুক অলিভর ওয়েণ্ডেল হোমস্ তাঁহার নিজ মহাদেশে কেন উচ্চ সাহিত্য সৃষ্ট হইতেছে না এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, মার্কিনবাসী সাহেবদের স্থায়ী বাড়ি নাই; আজ এ গ্রামে, কাল ও শহরে এইরূপ বৎসর বৎসর স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হয়, এরূপ যাযাবর সভ্য জাতি কাব্য রচনা করিতে পারে না। তাঁহারই উপমা, "যে গাছটিকে মাসে মাসে টাঁনিয়া তুলিয়া এক একটি ভিন্ন স্থানে পোঁতা হয়, তাহাতে ফুল ফুটিতে পারে না।" বাঙ্গালী ঠিক ততটা যাযাবর হয় নাই, তবে আমাদেরও গ্রামের সঙ্গে দীর্ঘ সম্বন্ধ এবং জীবনে শান্তি ঘুচিয়াছে। এইটিই বিপদের কারণ।

কারণ, কবির মস্তিষ্কে যে পরিমাণে ও যে শ্রেণীর চিন্তা, তাঁহার হৃদয়ে যে পরিমাণে ও যে শ্রেণীর ভাব স্থান পায়, তাঁহার কাব্যের পরিমাণ ও শ্রেণী তাহারই অনুযায়ী হয়। যেমন কৃষক জমিতে যে পরিমাণে এবং যেরূপ গুণশালী সার দেয়, ঠিক সেই পরিমাণে এবং সেই উচ্চ বা নীচ দরের ফসল তাহা হইতে লাভ করে; মানুষ জমিতে যে রাসায়নিক পদার্থ ঢালিয়া দেয়, তাহাই উদ্ভিদ আকারে ফিরাইয়া পায়,—তাহার বেশী নহে। অতএব সমাজে যে-সব চিন্তা চলিতেছে, বাহিরের বাতাস হইতে যে-সব ভাবপ্রবাহ আসিয়া সকলের হৃদয় অধিকার করিতেছে, সেই যুগের কাব্যে তাহারই ছবি দেখিতে পাওয়া যাইবে। দুই একজন ক্ষণজন্মা মনীষী মাত্র ইহার ব্যতিক্রম; তাঁহারা প্রকৃতই বিদ্রোহী, অর্থাৎ পিতা-পিতামহদের চলিত পথ হইতে, সর্ব্বজনসম্মত বিশ্বাস হইতে নিজ প্রতিভার জোরে লোককে টানিয়া লইয়া নূতন পথের পথিক করেন; অনেক স্থলে তাঁহারা জীবনে নির্যাতিত, বিফল হন, এবং পরবর্ত্তী যুগেই তাঁহাদের বাণী বিজয়ী হয়, জগৎকে জাগাইয়া দেয়। কিন্তু এরূপ কবি মানব-ইতিহাসে চার পাঁচটি মাত্র জন্মিয়াছেন, যেমন যুগপ্রবর্ত্তক ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা চার পাঁচ জন মাত্র আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের কথা আজ বলিব না।

দেশময়, জগৎময়, বাহিরের বাতাসে যখন প্রবল বিদ্যুৎ খেলিতে থাকে, তাহারই প্রতিঘাত প্রথমে হয় কবির হৃদয়ে। এই জন্য ঐতিহাসিক প্রত্যেক মহা হৃদয়াবেগের যুগে, ভাবের প্রবল ঝড়ের যুগে এক একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত অনেক আছে।

পারসিক শাহানশাহের অক্ষৌহিণী সেনাকে পরাজয় করিবার, নূতন প্রজাতন্ত্র শাসন-পদ্ধতি চালাইবার ফলে এথেনীয় জনমণ্ডলীর মধ্যে যে ভাবের উচ্ছ্বাস হইল, তাহার ফলেই পেরিক্লীয় যুগের গ্রীক সাহিত্য গ্রীক কলা প্রভৃতি অপূর্ব্ব সামগ্রীর সৃষ্টি হয়। উত্তর-ভারতে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র ছায়ায় সমস্ত দেশ এক হইল, হিন্দুধর্ম্ম নব জাগরণ পাইল, নব কলেবর ধারণ করিতে আরম্ভ করিল, শান্তি ও অর্থ বাড়িতে লাগিল, ইহার ফলে কালিদাসের কাব্য ও "গুপ্ত-আর্ট" ফুটিয়া উঠিল। মধ্য-যুগের অবসাদ ও অন্ধকার হঠাৎ ঘুচিয়া গিয়া গ্রীক সাহিত্য পুনরাবিষ্কৃত হইল, ইউরোপে আলোক ঢুকিল, প্রাচীন চিরন্তন প্রণালীর উপর আঘাত পড়িল, ইহাই হইল ইউরোপের নব-জন্ম, রেনেসাঁ। ইহার ফল সাহিত্য ও শিল্পকলায় অমর হইয়া রহিয়াছে। ইংলণ্ড রাবণ-সদৃশ স্পেনের নৌবাহিনীকে ধ্বংস করিয়া, পোপের বন্ধন হইতে দেশের ধর্ম্মকে মুক্ত করিয়া, নব-জগৎ-আবিষ্কারে অংশীদার হইয়া হৃদয়ে যে নব শক্তি পাইল তাহার ফলই এলিজাবেথীয় সাহিত্য। তেমনি ফরাসী দেশে চতুর্দ্দশ

লুইএর রাজত্বকালে দেশময় একতালাভের ফলে, ইউরোপ-বিজয়ের ফলে, দেশপ্রাণ জাগিয়া উঠিল, সাহিত্যে "সুবর্ণ যুগ" আরম্ভ হইল, ফ্রান্স সমস্ত সভ্য ইউরোপের শিক্ষক ও দৃষ্টান্তস্থল হইয়া উঠিল। আর ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ও ততোধিক বেগে ফরাসী প্রতিভা জাগিয়া উঠিল, কারণ ফরাসী জাতির হৃদয়তন্ত্রী নবীন সুরে প্রবল বেগে কাঁপিতে লাগিল। তাহার কথাই কবি সত্য বর্ণনা করিয়াছেন :—

Bliss it was in that dawn to be alive,
But to be young was very heaven.

বঙ্গদেশ সেইরূপ নবজীবন পায়, জাগ্রত হইয়া উঠে, মাইকেলের যুগে ইংরাজী শিক্ষার সংস্পর্শে। তাহার কথা সকলেই জানেন। আবার বাঙ্গলা জাগে বঙ্গ-ভঙ্গের সময়, কিন্তু এটি বড় বেশী শোকের, বড় বেশী নির্য্যাতনের সময়, কাজেই সেই কণ্টকময় মরুক্ষেত্রে তত বেশী ও বড় কাব্যফুল ফুটিতে পারে নাই, দু-একটি অমর পদ্য মাত্র জন্মিয়াছিল।

ফলতঃ হৃদয়ের পূর্ণ আবেগে, ভাবের প্রবাহে দীর্ঘকাল ধরিয়া মানবচিত্ত তোলপাড় না হইলে, মহাকাব্য সৃষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু যেমন বরফের প্রকাণ্ড চাপে জীবনী-শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, প্রাণীমাত্রই আড়ষ্ট হইয়া পড়ে, সেইমত মহা দুঃখ, মহা দৈন্যও হৃদয়-প্রবাহকে স্তব্ধ গতিহীন করিতে পারে, সৃজন-শক্তিকে পিষিয়া মারিয়া ফেলিতে পারে। তাহা জাতীয় জীবনের উপর এমন একটা অবসাদ আনিয়া দেয় যে, মানুষ নিশ্চেষ্টতার গভীর অন্ধকার-হিমে ডুবিয়া যায়, অথবা অন্ন-চেষ্টায় এবং তুচ্ছ হীন সুখভোগের খোঁজে সব সময় কাটায়। ফ্রাঙ্কো-জর্ম্মান যুদ্ধের পর (১৮৭১) ফ্রান্স এইরূপ মোহমায়ায় অভিভূত হইয়া পড়ে, গত মহাযুদ্ধের পর (১৯১৯) ইংলণ্ড এবং সমস্ত ইউরোপের উপর এইরূপ একটি গভীর ছায়া ও বিষাক্ত ঝড় আসিয়া পড়িয়াছে। সে সময় সমস্ত দেশময় আন্দোলন হইল, জাতীয় জীবনে এত বেশী ও গভীর পরিবর্ত্তন হইল, কিন্তু ইহার ঘাত-প্রতিঘাতে সাহিত্য সৃষ্ট হইল কই ?

বাঙ্গলার পক্ষে এই বন্ধ্যাতার কারণ অর্থাভাব। আর, অর্থাভাবের কারণ জীবনে সরলতার অভাব। সমাজের নীচে হইতে উপর পর্য্যন্ত চাল বাড়িয়াছে, এখন আর আগেকার মত মোটা ভাত-কাপড়ে বাঁচিয়া থাকা যায় না, সাদাসিধাভাবে জীবন কাটানো সকলের পক্ষেই অসম্ভব। কাজেই সব আবশ্যক জিনিসের দাম অসম্ভব বাড়িয়াছে, এবং আবশ্যক জিনিসের তালিকাও সেকাল অপেক্ষা চারি গুণ লম্বা হইয়াছে। এরূপ জগতে গরিব লোকের স্থান নাই, অর্থাৎ সে সংসার করিতে পারে না, চিরকুমার থাকিয়া ভিখারী বা সন্ন্যাসী রূপে বাঁচিতে পারে, কিন্তু অন্য কোন সামাজিক শ্রেণীর জীব হইলে তাহাকে অকালমৃত্যু বরণ করিতে হইবে।

প্রাচ্য হিন্দু-সমাজে বিবাহ একটি অবশ্যকর্ত্তব্য সংস্কার ; মুসলমানদের ধর্ম্মেও তাহাই সত্য, There is no monachism in Islam (আরবীর অনুবাদ)। অতএব আমাদের হইলে-ও-হইতে পারিতেন কবিকে টাকার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। কিন্তু যে পক্ষীটি প্রত্যূষে উঠিয়া সমস্ত দিন এই ছাইপাঁশের গাদায়, ঐ বিষ্ঠাস্তূপে ঠোকর মারিতেছে, সে কুহু কুহু সুরে গাহিতে পারে না। যে পাখী কুহু কুহু গায়, সে বাচ্চা-প্রতিপালনের ভার পর্য্যন্ত প্রতিবাসীর উপর ফেলিয়া দিয়া খালাস

হইয়াছে,—লোকটা বেশ স্বাধীন, অনাসক্ত, বাবু। যে-সমাজে মস্তিষ্কবান্ প্রতিভাশালী শিক্ষিত ব্যক্তিকেও মহাপুরুষের পায়ে তেল দিবার সৌভাগ্য লাভ করিবার জন্য তাঁহার জনপূর্ণ দরবারে তীর্থের কাকের মত বসিয়া থাকিতে হয়, অথবা মহাপুরুষের জয়ঢাক বাজাইবার সুযোগ পাইবার জন্য দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের দরজায় ধর্ণা দিতে হয়, সে-সমাজে মহাকাব্য সৃষ্ট হওয়া প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ।

নিয়ত বিষয়াঃ হ্যেতে, ন যান্তি বিপর্য্যয়ং।

কাঁটা-খুড়োর গাছে কাল্‌নার ডাঁটা জন্মে না।

জন্মে শুধু চুটকি লেখা আর সখের কবিতা, বড়লোকের মজলিসের সৌখিন রচনা যাহা ড্রয়িংরুমে হাসির তরঙ্গ ফুটায়, বাহিরে যাইতে পারে না, এবং দু-এক দিনের বেশী বাঁচে না। মাসিক-পত্রিকার মালিকগণের অনুগ্রহে—মালিক বলিলেই সত্য রক্ষা হইবে, কারণ সম্পাদক বেচারা বেতন-ভোগী পুত্তলিকা মাত্র—কবিতা এখনও ছাপা হয়, কিন্তু তাহা ইঞ্চির মাপে রচিত হওয়া আবশ্যক, অর্থাৎ গদ্য প্রবন্ধ—না, না, গল্পটি শেষ হইবার পর সেই পৃষ্ঠায় যতটুকু স্থান বাঁচিল তাহা পূরণ করিতে পারে, এতটুকু মাত্র মধুচক্র বিরচন করা চাই, গৌড়-বাসী (ততোধিক গৌড়বাসিনী) ইহার অধিক পান করিবেন না। রাড্‌ইয়ার্ড কিপ্‌লিং প্রথম বয়সে 'সিভিল মিলিটারি গেজেট' নামক দৈনিকের আফিসে কাজ করিতেন, পকেটে দুটা একটা পদ্য-রচনা থাকিত, অথবা দশ মিনিটে একটা ছোটখাট রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণগ্রাহী ছিল ঐ প্রেসের হেডম্যান (মুসলমান মিস্ত্রি) সে সহকারী সম্পাদকদের ঘরে ঢুকিয়া বলিত, "আজ কাগজ বাহির হইতে পারিতেছে না, চৌদ্দ ইঞ্চি কপি কম পড়িয়াছে।" কিপ্‌লিং অমনি একটি পদ্য তাহাকে দিতেন এবং সে বলিত, "এটা ভাল পদ্য নয়, এটা বিশ ইঞ্চি হইবে" অথবা "কি চমৎকার পদ্য, ঠিক চৌদ্দ ইঞ্চিতে ধরিবে।"

এই মহাকাব্যের তিরোধানের যুগে, সাহিত্যক্ষেত্রে বনস্পতি লোপ পাইবার ফলে, আগাছা মাত্র জন্মিতেছে এবং তাহাও প্রচুর পরিমাণে। অধিকাংশই "কামায়ন", অথচ সেগুলি রামায়ণের শতাংশ প্রতিভার দ্বারাও আলোকিত নহে; এগুলি শুধু ভোগ, শুধু বাসনা উত্তেজন, শুধু মানব ও পশুর মধ্যে পার্থক্য ঘুচাইয়া দিবার মন্ত্র প্রচার করে। ফরাসী দেশেও ফ্রাঙ্কো-জর্ম্মান যুদ্ধের যুগের অবসাদের ফলে এই শ্রেণীর সাহিত্য রাজত্ব করিয়াছিল।

কবিকে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয় তবে হয় ঘরে পৈত্রিক বিত্ত থাকা চাই, না হয় পাঠক চাই। পৈত্রিক বিত্তটা ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি রচনার পূর্ব্ববর্ত্তী আবশ্যক জোগাড়যন্ত্রের বেশ সাহায্য করে, কিন্তু কাব্যরচনায় অর্থ প্রায় সর্ব্বত্রই অনর্থ হয়। (আমি এখানে নিষ্পেষণকারী দৈন্যকে মাথায় তুলিতেছি না, সেটা কবির পক্ষেও মারাত্মক)। বর্ত্তমান সমাজে বিত্তের অবস্থা আগেই বলিয়াছি। আর পাঠক? পপুলার সাহিত্য রচনা না করিলে পাঠক পাইবেন না। যাহা ইংরাজীতে বলে—Board School mentality, তাহা এ দেশকেও ছাইয়া ফেলিয়াছে; যে লেখক mass suggestion না করিতে পারিবেন তিনি মুদ্রক ও কাগজবিক্রেতার নালিসে ছোট আদালতের বিচারে জেলে গিয়া অন্ন পাইবেন। বর্ত্তমান সম্রাট্ ষষ্ঠ জর্জের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডিউক অব কেণ্ট অল্পদিন হইল বলিয়াছেন—

"What impresses me is the very small proportion of the total output which is worth reading. I feel that every year literature as an art is faced with an increasing danger of being swamped by commercialism." (June 2.)

এ হেন দুঃসময়ে সমালোচক কি সাহায্য করিতে পারে না? St. Beuve এবং Matthew Arnold-এর মত ক্ষণজন্মা সমালোচকগণ কত কত ফুটন্ত অজ্ঞাত লাজুক কবির প্রতিভা বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহাদের জগতে পরিচিত করিয়া দিয়া উৎসাহ দিয়াছেন, জীবিকার উপায় করিয়াছেন। আর, আমাদের আজকালকার সমালোচকগণ? কবি নিজেই নিজগ্রন্থের সমালোচনা লেখাইয়া—অথবা লিখিয়া—পকেটে তাহা এবং হাতে এক ভাণ্ড তৈল লইয়া গিয়া পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয়ের দ্বারে উপস্থিত হন এবং তৈলভাণ্ডটি চরণকমলেষু (বহুবচনটা চতুষ্পদ অর্থে—আমার শত্রুরা যেন এমন ব্যাখ্যা না করেন) শেষ করিয়া ঐ সমালোচনাটি ছাপান!

"The standards have been destroyed and the values adulterated; freedom has perished and the republic of letters has been taken over by the dictatorships, commercial and ideological."

আমি অনেক বৎসর ধরিয়া আমাদের সাহিত্যের এই দৈন্যের কথা, এই যে ছাপাখানার কল হইতে দিন দিন বর্দ্ধিত সংখ্যায় গ্রন্থরাশি বাহির হইতেছে, খবরের কাগজে তাহাদের নামে প্রচণ্ড ঢক্কানাদ হইতেছে, অথচ তাহাদের মধ্যে একখানিও সারবান্ বা স্থায়ী হইবার উপযুক্ত দেখ যাইতেছে না, সরস্বতীর এই কঠোর পরিহাসের কথা ভাবিয়াছি, বয়স-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই প্রবন্ধ লিখিবার পর, ঠিক গত সপ্তাহে আগত 'টাইম্‌স' (লিটেরারি সাপ্লিমেণ্ট) পত্রিকায় দেখি যে বিলাতে এবং ফ্রান্সেও জ্ঞানীরা এই প্রশ্ন লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন, আমাদের দেশের মত তাঁহাদেরও মনে জাতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভয় ও হতাশা জন্মিয়াছে। উহা হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"It is a great pity that this increased mechanical efficiency should so seldom be put at the service of mature thought and continuous reflection. It has been used instead to pour forth flood upon flood of "popular" periodicals, all conducted on the same principle which rules the cinemas and...the theatres—the principle [namely] that what is "popular" is what will please the idlest and feeblest minds among the people.

There has always been as much trash as the public could absorb; and the vastly increased appetite of a vastly increased public that can read is fed everyday by "masterpieces" in scores, every one of them too "masterly" to be announced in anything narrower than a couple of columns and anything smaller than very large capitals. That is sad; and silly.

If all this commercial mass-production of ephemeral books—"masterpieces" one week, dead rubbish the next,—does indeed prevent the makers of literature from saying their say and lovers of literature from reading and pondering, then indeed the spiritual life of the whole lump is in danger...from the powers of darkness and untruth."

স্মৃতি

শ্রীসজনীকান্ত দাস

তিমিররাত্রি প্রভাত হইল শ্রাবণের শর্ব্বরী,
জাগিয়া বসিনু ব্যাকুল প্রতীক্ষায়—
ঝড়-বৃষ্টির আঘাতে ছিন্ন আমার ফুলের বনে
ফুটেছে কখন রজনীগন্ধা একটি শুভ্রশুচি।
আমার মনের গোপন বাসনা নিশীথ অন্ধকারে
ঝঞ্ঝা-আঘাত-ক্লিষ্ট কঠোর নিদারুণ সাধনায়
ধীরে ধীরে ত্যজি বিকারের বিভীষিকা,
তপস্যাশেষে কখন লভিল দেবতার কৃপাকণা—
উঠিল ফুটিয়া একটি কুসুম রূপে।
বিস্ময়ে জাগি তিমিররাত্রি শেষে
ফুলের গরবে নিজেরে ধন্য মানি।

প্রভাত তখনো স্বর্ণবরণ, নভে বালারুণ রবি
মেদুর মেঘের আড়ালে কিরণ হানে ;
কাননে আমার কামনার ফুল দোলে বায়ু-হিল্লোলে—
মুগ্ধ ছিলাম শিশু-চপলতা হেরি।

সহসা কখন আকাশ ব্যাপিয়া ঘনাল প্রাবৃট্-মেঘ,
অকালসন্ধ্যা নামিল আমার বনে।
ঝড় ছুটে এল অন্ধ আবেগে উড়াইয়া এলোচুল,
বিদ্যুৎ-ফণা বিস্তারি চৌদিকে।
কোরক-কুসুম মম
বজ্র আঘাতে ছিন্নভিন্ন খসিয়া পড়িল ভূমে ;
মূর্চ্ছাভঙ্গে নয়ন মেলিয়া শান্ত দ্বিপ্রহরে
অনুভব হ'ল আপনি দেবতা নামি ফুলবনে মম।
আপনি চয়ন করিয়া গেছেন আপন পূজার ফুল।

আমার ক্ষুদ্র কুসুমের বনে আরো ফুটিয়াছে ফুল,
বায়ু-তরঙ্গে দুলিছে বৃন্ত 'পরে ;
শারদ আকাশে মেঘ ভেসে ভেসে যায়,
নীলের অগাধে ঘুরে ঘুরে উড়ে নামহীন কত পাখী,
অলস-শয়নে নয়ন মেলিয়া দূরে পাঠাইয়া আঁখি
মন শুধু চায় তুলিয়া ধরিতে রহস্য-যবনিকা—

জীবনে ঢাকিয়া জীবনাতীতের ইঙ্গিতভরা নিবিড় সে আবরণ,
পরপারে তার লুকাইয়া আছে হাজারো যুগান্তের
পলাতকাদের যত কিছু সন্ধান।
নীল যবনিকা তুলেছে কি কেউ, প্রাণমৃত্যুর ছিঁড়িয়াছে ব্যবধান,
এপারে বসিয়া ওপারের ভাষা চকিতে কখনো নিজে করি অনুভব
আশ্বাসবাণী শুনায়েছে মানুষেরে ?

মনে পড়িতেছে, ঋষির তনয় বালক সে নচিকেতা
মৃত্যুর গৃহে আতিথ্য যাচি স্বয়ং যমের মুখে
লভিয়াছিলেন মৃত্যু-বিজয়ী অমৃতের পরিচয়—
প্রাচীন তত্ত্ব ; শ্লোকে শ্লোকে তার মহৎজনের সুবৃহৎ সান্ত্বনা !
আমার ক্ষুদ্র শোক খুঁজে মরে অজানা আঁধারে হারানো বুকের ধন,
ব্যাকুল হস্তে যদি বা চকিতে লাগে পরিচিত ছোঁওয়া,
পশে যদি কানে অস্ফুট আধ-ভাষা !
জানি শুনিব না, জানি জানি মোর ছিন্ন ফুলের স্মৃতি
বর্ত্তমানের ভবিষ্যতের অসংখ্য ফুল মাঝে
অক্ষয় হয়ে বাজিবে বক্ষে অলস দ্বিপ্রহরে।
সেই সান্ত্বনা, মর-জীবনের সুগভীর আশ্বাস—
কাঁটার ব্যথায় জাগ্রত রয় কুসুমের ইতিহাস।

বিরহব্যাকুল অশ্রুঅন্ধ ব্যথাতুর মানবেরা
যুগ যুগ ধরি সৃষ্টির সেই অনাদি প্রভাত হ'তে
স্বর্গে চাহিয়া চেয়েছে ভুলিতে মর্ত্ত্যের বিভীষিকা !
প্রিয়-প্রিয়তর-প্রিয়তমজনে পথের প্রান্তে ফেলি
সম্মুখপানে অবিরাম চলা মুছি নয়নের জল,
বক্ষে বহিয়া বেদনা-স্মৃতির অসহ কঠিন ভার !
ট্র্যাজেডি-কমেডি সমান এ অভিনয়ে
জীবন-নাট্যে যতদিন নাহি পড়িতেছে যবনিকা !
করতালি দেয় স্বর্গের দেবতারা,
শুনিতে না পাই, শুনিবার লোভে ঊর্দ্ধে চাহিয়া থাকি।

চেয়ে চেয়ে চেয়ে অসীম শূন্যে আঁখি পরাজয় মানে,
ফিরে ফিরে আসে মর্ত্ত্যের ধরণীতে—
যে মাটি মোদের একান্ত আশ্রয়।

গোপীপ্রেম

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বেদান্তরত্ন

বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন ঃ—

গোপী প্রেমকী ধুজা
জিন ঘনশ্যাম কিয়ে বশ
আপনে উর ধরি শ্যামভুজা !

'গোপী প্রেমের ধ্বজা—সাকার মূর্তি—নহিলে তার প্রেমে ঘনশ্যাম বশ হইবেন কেন ?' রাসপঞ্চাধ্যায়ে দেখি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে বলিতেছেন—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥—ভাগবত, ১০।৩২।২২

'সখিগণ ! তোমাদের ঋণ আমি কোন দিনও শোধ দিতে পারিব না—ব্রহ্মার আয়ু পাইলেও নয়। কেন না, তোমরা আমার অনুরাগে লোকধর্ম-বেদধর্ম-আত্মীয়স্বজন সমস্ত উপেক্ষা করিয়া আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছ।' অর্থাৎ, গোপীরা 'ত্যক্ত-লোক-বেদ-স্বা' (ভাগবত) ; তাঁহারা 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মাম্ একং শরণং ব্রজ' (গীতা) ; তাঁহারা—

যা দুস্ত্যজং স্বজনম্ আর্যপথং চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দ-পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥—ভাগবত, ১০।৪৭।৬১

'দুস্ত্যজ নিজজন ও আর্যপথ ত্যাগ করিয়া—সমস্ত শ্রুতি যাঁর অন্বেষণ করে—সেই শ্রীকৃষ্ণপদবী ভজনা করিয়াছিলেন।'

তাই কবি বলিয়াছেন—

নির্মৎসর যে সন্ত—তিন্‌হি চূড়ামণি গোপী
নিরমল প্রেম-প্রবাহ সকল-মর্যাদা-লোপী।

শ্রীকৃষ্ণ গোপীপ্রেমের মর্যাদা বুঝিতেন। তাই দেখিতে পাই, কংস-বধের পর তিনি মথুরাবাসী হইলে তাঁহার পরম ভক্ত উদ্ধবকে গোপীদিগের তত্ত্ব লইবার জন্য বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। 'হে উদ্ধব !

গোপীনাং মদ্‌বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈর্বিমোচয়।'

উদ্ধব হয়তো গোপীদের নামমাত্র শ্রুত ছিলেন—তাঁহাদের স্বভাব জানিতেন না। সে জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া দিলেন—

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্ত-দৈহিকাঃ।
যে ত্যক্ত-লোক-ধর্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্যহম্ ॥

'তাহারা দেহ গেহ বিসর্জন দিয়া, লোকধর্ম-বেদধর্ম উপেক্ষা করিয়া আমাতে প্রাণ মন সমর্পণ করতঃ 'মদাত্মিকা' হইয়াছে। আজ তাহাদিগের প্রিয়তম, 'প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ' আমি দূরগত হইয়াছি—সুতরাং বিরহের উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হইয়া তাহারা আমাকেই স্মরণ করিয়া বিমোহিত হইয়াছে—

ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ।
স্মরন্ত্যোঽঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহোৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ॥

ইহা হইতে দৃষ্ট হইবে যে, ভক্তপ্রবর দেবর্ষি নারদ ভক্তির যে লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন—যে ভক্তি (তাঁহার মতে) 'তস্মিন্ পরম প্রেমরূপা'—সেই প্রেমভক্তি গোপীতে পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে ভক্তি কি?

"তদর্পিতাখিলাচারিতা, তদ্‌বিস্মরণে পরমব্যাকুলতা"—নারদ-ভক্তিসূত্র, ১৯

অর্থাৎ, তাঁহাতে সমস্ত আচার সমর্পণ এবং পরম ব্যাকুলতার সহিত তাঁহাকে স্মরণ। গোপীরা কিরূপে আত্মীয়স্বজন বিস্মৃত হইয়া, আর্যপথ পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত লোকধর্ম বেদধর্ম তাঁহাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন—তাহা আমরা জানিয়াছি। আমরা আরও জানিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ব্যাকুল হইয়া তাঁহারা কিরূপে 'কিবা স্বপ্ন জাগরণে' তাঁহারই ধ্যানে নিমগ্না থাকিতেন—এবং 'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর' এই গীতা-বাক্যের সার্থকতা করিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে ভাগবত বলিতেছেন—

যা দোহনেঽবহননে মথনোপলেপ-
প্রেঙ্খেঙ্খনার্ভরুদিতোক্ষণমার্জনাদৌ।
গায়ন্তি চৈনম্ অনুরক্তধিয়োঽশ্রুকণ্ঠ্যো
ধন্যা ব্রজস্ত্রিয় উরুক্রমচিত্ত-যানাঃ॥—১০।৪৪।১৫
(প্রেঙ্খেঙ্খনং = দোলাদোলনং; উক্ষণম্ = সেচনম্)

অর্থাৎ, ব্রজগোপীরা দোহন, কুট্টন, মন্থন, লেপন, সেচন, মার্জন, শিশুর দোলা-দোলন ও রোদন-বারণ প্রভৃতি সমস্ত গৃহকার্যের মধ্যে অনুরক্ত চিত্তে অশ্রুকণ্ঠী হইয়া সর্বদা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম গান করিতেন। তাঁহারা 'উরুক্রম-চিত্তযানা'—তাঁহাদের ধন্যবাদ!

সেই জন্য ভক্ত কবি সুরদাস গোপীর মুখ দিয়া বলিয়াছেন—

নাহিন রহো হিয় মহঁ ঠৌর।
নন্দনন্দন অছত কৈসে আনিয়ে উর ঔর॥

'নন্দনন্দন হৃদয়ের সমস্তটা জুড়িয়া আছেন—একটুকু স্থান নাই—অন্য কিছু কোথায় ধরিবে?'

শ্যাম-গাত সরোজ-আনন, ললিত গতি মৃদু হাস।
'সুর' ঐসে রূপ কারণ মরত লোচন প্যাস॥

'যিনি শ্যামবপু, সরোজ-আনন, যাঁহার ললিত গতি, মৃদুল হাস—সেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ-কারণে আমাদের চক্ষু চিরপিপাসিত—আমরা কি করিতে পারি?'

চলত, চিতবত, দিবস জাগত, সুপন শোবত রাত।
হৃদয়তে উহ শ্যাম মুরতি ছিন ন ইত-উত যাত॥

'দিবসে জাগ্রতে চলনে বলনে, রাত্রিতে শয্যায় শয়নে স্বপনে—সদাসর্বদা হৃদয়ে সেই শ্যাম-মূরতি—একক্ষণও মন ইতি-উতি যায় না—আমরা নিরুপায়। লোকে লোকলাজ আর কত না কি বলে কিন্তু

করিব কি ? আমাদের তনমন সেই শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণ—সিন্ধু আসিয়া ঘটে প্রবেশ করিয়াছে—ঘট তাহাকে সামলাইবে কিরূপে ?'

কহত কথা অনেক উধো। লোকলাজ দিখাত
কহা করোঁ তন প্রেম-পূরণ, ঘট না সিন্ধু সমাত। *

কবি জ্ঞানদাসও গোপীর মুখ দিয়া বলিয়াছেন—

শ্যাম-রূপ দেখি আকুল হইয়া,
দুকুল ঠেলিনু হাতে।
ভুবন ভরিয়া অযশ ঘোষণা
নিছিয়া লইনু মাথে॥
সজনি ! কি আর লোকের ভয় !
ও চাঁদ বয়ানে, নয়ান ভুলল,
আন মনে নাহি লয়॥

ইহাই গোপীপ্রেমের বৈশিষ্ট্য—তদর্পিতাখিলাচারিতা তদ্-বিস্মরণে পরম ব্যাকুলতা। প্রেম ভক্তির এই লক্ষণ নির্দেশ করিয়া দেবর্ষি নারদ বলিতেছেন—ঐরূপ ভক্তি একটা রূপকাদর্শ (Ideal) মাত্র নহে—'অস্ত্যেব এবম্'—ইহার দৃষ্টান্ত আছে। কোথায় ? ব্রজগোপীতে—

যথা ব্রজগোপিকানাম্—২১ সূত্র

গোপীদিগের ভগবানে সেই অনুত্তমা ভক্তি, সেই অহৈতুকী রতি—যাহা 'মুনীনাম্ অপি দুর্লভা'—

ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভবতীভিরনুত্তমা।
ভক্তিঃ প্রবর্তিতা দিষ্ট্যা মুনীনাম্ অপি দুর্লভা॥—ভাগবত, ১০।৪৭।২৫

কেন ?

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বঃ
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি বদ্ধভাবাঃ।

গোপাদিগেরই দেহধারণ সার্থক—কারণ, ইহারা সেই অখিলাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে 'বদ্ধভাবা', সেই উরুক্রমে 'চিত্তযানা' অর্থাৎ (গীতার ভাষায়) 'ময্যর্পিত মনোবুদ্ধিঃ'।

শ্রীরাধা 'গোপী-বর্য্যা' প্রধানা গোপী—তাঁহার প্রেম পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত—তিনি কেবল 'বদ্ধ-ভাবা' নন—'মহা ভাবময়ী'। তথাপি তাঁহার কথা এখানে বিশেষ করিয়া কিছু বলিব না—কারণ, গোপীদিগের মধ্যে রাধার নাম মহাভারত, হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে নাই।

কিন্তু সে কথা যাক। আসুন আমরা ভক্তবর উদ্ধবের অনুসরণ করিয়া তাঁহার সহিত বৃন্দাবনে গোপীদিগের অনুসন্ধানে যাই।

উদ্ধব রথারোহণে গোকুলে উপস্থিত হইলেন—তখন সূর্য প্রায় অস্তোন্মুখ—

আদায় রথম্ আরুহ্য প্রযযৌ নন্দগোকুলম্।
প্রাপ্তো নন্দব্রজং শ্রীমান্ নিম্লোচতি বিভাবসৌ॥

---

* এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত হিন্দী কবিতা ও কোন কোন কথা "কল্যাণকল্পতরু" (৫ম বর্ষ ৫ম সংখ্যায়) প্রকাশিত 'The Philosophy of Love' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

উদ্ধব প্রথমেই নন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নন্দ প্রেমবিহ্বল হইয়া সাশ্রুকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—

অপি স্মরতি নঃ কৃষ্ণো মাতরং সুহৃদঃ সখীন্।
গোপান্ ব্রজং চাত্মনাথং গাবো বৃন্দাবনং গিরিম্॥

উদ্ধব নন্দযশোদাকে কোন মতে সান্ত্বনা করিয়া প্রত্যূষে গোপীদিগের সহিত মিলিত হইলেন। গোপীরা তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন—ওঃ, জেনেছি আপনি যদুপতির পার্ষদ—পিতা মাতার তত্ত্ব লইতে এসেছেন। তবু ভাল! আমাদের অবশ্য তাহার মনে নাই—না থাকিবারই কথা—

পুংভিঃ স্ত্রীষু কৃতা যদ্বৎ সুমনঃস্বিব ষট্‌পদৈঃ

—রমণী তো ফুল—পুরুষভ্রমর মধুপান শেষ হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে—ইহাই তো সনাতন বিধি!' এই বলিয়া গোপীরা লজ্জা ত্যাগ করিয়া কাঁদিতে লাগিল ও শ্রীকৃষ্ণের পূর্বলীলা গান করিতে লাগিল। উদ্ধব মহা বিপন্ন হইলেন—নানাভাবে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের পরাভক্তির প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—আপনারা ধন্য! পুত্র-পতি, দেহ-গেহ, আত্মীয়-স্বজন সমস্ত বর্জন করিয়া সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে বরণ করিয়াছেন—

দিষ্ট্যা পুত্রান্ পতীন্ দেহান্ স্বজনান্ ভবনানি চ।
হিত্বাঽবৃণীত যূয়ং যৎ কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরম্॥—শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৪৭।২৬

ইহার পর উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের যে বার্ত্তা তিনি বহন করিয়া বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন, তাহা গোপীদিগকে শুনাইলেন। উহার মধ্যে সংযম, যম, নিয়ম, সাংখ্য যোগ প্রভৃতির উপদেশ ছিল।

এতদন্তঃ সমাম্নায়ো যোগঃ সাংখ্যং মনীষিণাম্।
ত্যাগস্তপো দমঃ সত্যং সমুদ্রান্তা ইবাপগাঃ॥—ভাগবত, ১০।৪৭।৩৩

এই বিষয় লইয়া ভক্ত সুরদাস বেশ একটু মধুর বিদ্রূপ করিয়াছেন। তিনি বলেন উদ্ধবের পাণ্ডিত্য-কণ্টকিত বক্তৃতার উত্তরে গোপীরা বলিলেন—

উধো! যোগ জাগ হম নাহী
অবলা জ্ঞানসার কহা জানে কৈসে ধ্যান ধরাহী।

'উদ্ধবজী! আমরা অবলা জ্ঞানহীনা নারী—যোগ-যাগের আমরা কি বুঝিব—কিরূপেই বা ধ্যান করিব?'

তে যে মূঁদন নইন কহত হো হরি মূরতি জিন মাহী
ঐসী কথা কপট কী মধুকর! হম তে শুনী না জাহী।

'আপনি আমাদিগকে চক্ষু মুদ্রিত করিতে বলিলেন—সেই চক্ষু যাহাতে শ্রীহরির মূর্ত্তি অনুদিন বিরাজিত আছে! হে মধুভাষী দূত! তোমার ও কপট কথা শ্রবণের যোগ্য নয়।'

শ্রবণ চীর অরু জটা বাঁধাবহু, যে দুখ কোন সমাহী
চন্দন ত্যজি অঙ্গ ভসম বাতাবত, বিরহ অনল অতি দাহী।

'আপনি কর্ণ বেধ করিয়া আমাদিগকে জটাধারণ করিতে উপদেশ দিলেন, কিন্তু ও দুঃখ আমরা সহিব কেন? আপনার উপদেশ চন্দন ত্যজিয়া অঙ্গে ভস্ম বিলেপন। আপনি কি জানেন না আমরা অনুক্ষণ বিরহানলে জ্বলিতেছি?'

যোগী ভ্রমত জেহি লগি ভূলে সো তা হৈ হম পাহী
সুরদাস সো ন্যারো ন পল-ছিন, যে ঘটতে পরছায়ী।

'যাঁহার অন্বেষণে যোগী দেশে দেশে ভ্রমণ করে তিনি তো সর্ব্বদা আমাদের নিকটে রহিয়াছেন, এক পল-ক্ষণও তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ নাই—যেমন বৃক্ষ ও তাহার ছায়া।'

গোপীর কথা শুনিয়া জ্ঞানী ভক্ত উদ্ধবের ভ্রম বিদূরিত হইল। তিনি

সুনি গোপীকে বৈন নেম উধোকে ভূলে।
গাবত গুণ গোপাল ফিরত কুঞ্জনমেঁ ফূলে॥
খিন গোপিনকে পগ পরৈ, ধন্য সাই হৈ নেম।
ধাই ধাই দ্রুম ভেঁটহীঁ উধো ছাকে প্রেম॥

অর্থাৎ গোপীর বচন শুনিয়া উদ্ধব 'নেম' (decorum) ভুলিয়া গেলেন এবং আনন্দে নিমগ্ন হইয়া গোবিন্দের গুণগান করতঃ কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরিতে লাগিলেন। কখনও গোপীপ্রেমের স্তুতি করিয়া তাহাদের পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন—কখনও বা প্রেমোন্মত্ত ভাবে ধাইয়া ধাইয়া বনতরুকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এ সম্পর্কে শুকদেব উদ্ধবের মুখ দিয়া বলিয়াছেন—

আসাম্ অহো চরণরেণুজুষাম্ অহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।—ভাগবত, ১০।৪৭।৬১

'এই বৃন্দাবনে তরুগুল্মাদি গোপীদিগের যে চরণরেণু ধারণ করিতেছে, সেই রেণু শিরে ধারণ করিবার আমার যেন সৌভাগ্য হয়!' উদ্ধব আরও বলিলেন—

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুম্ অভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথাগীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥—১০।৪৭।৬৩

'আমি সেই ব্রজগোপীর পাদরেণু অনুদিন বন্দনা করি—যাঁহাদের হরিকথা-সঙ্গীত এই ত্রিভুবনকে পবিত্র করিয়াছে।'

উদ্ধবের এ উক্তি অত্যুক্তি নহে। তাঁহার সাক্ষ্য বেশ প্রামাণ্য বলিয়া গ্রাহ্য হওয়া উচিত। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের মুখে আমরা শুনিয়াছি যে, উদ্ধব শিব-বিরিঞ্চির অপেক্ষাও তাঁহার প্রিয়তম।

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥

সেই জন্য কবি বলিয়াছেন—(গোপীর)

গণত গুণগণ মতি হোতি পঙ্গী (পঙ্গু)

অর্থাৎ, গোপীদিগের গুণগণ গণনা করিতে বুদ্ধি পঙ্গু (crippled) হইয়া যায়।

ইহা খুব উচ্চ প্রশংসা। অতএব অত্যুক্তি মনে হইতে পারে। কিন্তু মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের মুখেও আমরা অনুরূপ প্রশংসা শুনিয়াছি। তাঁহার মুখে সর্ব্বদা গোপীদিগের সম্বন্ধে ভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোকটি শ্রুত হইত।

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্য-সারম্ অসমোর্দ্ধম্ অনন্যসিদ্ধম্।

দৃগ্ ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপম্
একান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥—১০।৪৪।১৪

চরিতামৃতকার এই শ্লোকের শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া এইরূপ ভাবানুবাদ করিয়াছেন—

সখি হে ! কোন তপঃ কৈল গোপীগণ ?
কৃষ্ণরূপ সুমাধুরী
পিবি পিবি নেত্রভরি
শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মন ॥
যে মাধুরীর ঊর্দ্ধ আন
নাহি যার সমান,
পর ব্যোম স্বরূপের গণে
যিঁহো সব অবতারী
পর ব্যোমের অধিকারী,
এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে ॥
তাতে সাক্ষী সেই রমা,
নারায়ণের প্রিয়তমা,
পতিব্রতাগণের উপাস্যা ।
তিঁহো এ মাধুর্য্যলোভে
ছাড়ি সব কামভোগে
ব্রত করি করিল তপস্যা ॥

মহাপ্রভু বলিতেন, গোপীদিগের সৌভাগ্যের কি সীমা আছে ? নারায়ণের প্রিয়তমা লক্ষ্মী আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও যে প্রসাদ কোন দিন লাভ করিতে পারেন নাই, গোপবধূরা রাসোৎসবে সেই প্রসাদ অনায়াসে লাভ করিয়াছিলেন ।

নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ ।
রাসোৎসবেহস্য ভুজদণ্ড-গৃহীত-কণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥—ভাগবত, ১০।৪৭।৬০

লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম ।
গোপিকা-অনুগা হঞা না কৈল ভজন ॥
অন্য দেহে না পাইয়ে রাস-বিলাস ।
অতএব 'নায়ং' শ্লোকে কহে বেদব্যাস ॥—চরিতামৃত

উদ্ধৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ এই—'রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডদ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিত হইয়া গোপবধূরা যে প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, পদ্মগন্ধী সুরাঙ্গনাদিগের কথা দূরে থাক, ভগবানে একান্ত অনুরক্তা লক্ষ্মীও কোন দিন সেই আশিস্ লাভ করেন নাই ।'

এ প্রসঙ্গে রাসের কথা উঠে ।

অঙ্গনাম্ অঙ্গনাম্ অন্তরা মাধবঃ,
মাধবং মাধবং চান্তরেণাঙ্গনা।

অর্থাৎ,

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে সন্নিকটং স্ত্রিয়ঃ॥—ভাগবত, ১০।৩৩।৩

এই রাসই গোপীর শ্রেষ্ঠ সাধনা—এই সাধনা দ্বারাই তাঁহারা চরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

এই রাস সম্পর্কে সূক্ষ্মদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্রে' এইরূপ লিখিয়াছেন—

"প্রাচীন ভারতে স্ত্রীগণের জ্ঞানমার্গ নিষিদ্ধ—কেন না, বেদাদির অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। (অন্য রমণীর পক্ষে যাহা হউক, গোপীরা নিজেই বলিয়াছেন 'অবলা জ্ঞানসার কহা জানে?') স্ত্রীলোকের পক্ষে কর্ম্মমার্গ কষ্টসাধ্য, কিন্তু ভক্তিতে তাহাদের বিশেষ অধিকার। ভক্তি কথিত হইয়াছে—'পরানুরক্তিরীশ্বরে।' অনুরাগ নানা কারণে জন্মিতে পারে। কিন্তু সৌন্দর্যের মোহঘটিত যে অনুরাগ, তাহা মনুষ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। অতএব অনন্তসুন্দরের সৌন্দর্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনাই স্ত্রীজাতির জীবন সার্থকতার মুখ্য উপায়। এই তত্ত্বাত্মক রূপকই রাসলীলা। জড়প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য তাহাতে বর্ত্তমান। শরৎকালের পূর্ণচন্দ্র, শরৎপ্রবাহপরিপূর্ণা শ্যামসলিলা যমুনা, প্রস্ফুটিত কুসুম-সুবাসিত কুঞ্জ-বিহঙ্গম-কূজিত বৃন্দাবন বনস্থলী, এবং তন্মধ্যে অনন্ত সুন্দরের সশরীরে বিকাশ। তাহার সহায় বিশ্ববিমোহিনী কৃষ্ণগীতি। এইরূপ সর্ব্বপ্রকার চিত্তরঞ্জনের দ্বারা গোপীগণের ভক্তি উদ্রিক্তা হইলে, তাহারা কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়া আপনাদিগকেই কৃষ্ণ বলিয়া জানিতে লাগিল, কৃষ্ণের কথিতব্য কথা কহিতে লাগিল, এবং কেবল জগদীশ্বরের সৌন্দর্যের অনুরাগিণী হইয়া জীবাত্মা পরমাত্মায় যে অভেদ জ্ঞান—যাহা যোগীর যোগের এবং জ্ঞানীর জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য—তাহা প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে বিলীন হইল।"

'ধর্মতত্ত্বে'র সপ্তদশ অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই কথাই আর একটু সম্প্রসারিত করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ—

"আদৌ রাস ঈশ্বরোপাসনা মাত্র, অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্যের বিকাশ এবং উপাসনা মাত্র; চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির চরম অনুশীলন, চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা মাত্র। প্রাচীন ভারতে স্ত্রীগণের জ্ঞানমার্গ নিষিদ্ধ, কেন না, বেদাদির অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকের পক্ষে কর্ম্মমার্গ কষ্টসাধ্য, কিন্তু ভক্তিতে তাহাদের বিশেষ অধিকার। ভক্তি, বলিয়াছি, 'পরানুরক্তিরীশ্বরে'। অনুরাগ নানা কারণে জন্মিতে পারে, কিন্তু সৌন্দর্যের মোহঘটিত যে অনুরাগ, তাহা মনুষ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। অতএব অনন্তসুন্দরের সৌন্দর্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনাই—অপরের হউক বা না হউক—স্ত্রীজাতির জীবন-সার্থকতার মুখ্য উপায়। এই তত্ত্বাত্মক রূপকই রাসলীলা। জড়প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য তাহাতে বর্ত্তমান, শরৎকালের পূর্ণচন্দ্র, শরৎপ্রবাহপরিপূর্ণা শ্যামসলিলা যমুনা, প্রস্ফুটিত কুসুম-সুবাসিত, কুঞ্জবিহঙ্গমকূজিত বৃন্দাবন বনস্থলী, জড়প্রকৃতির মধ্যে অনন্ত সুন্দরের সশরীর বিকাশ।

তাহার সহায় বিশ্ববিমোহিনী বংশী। এইরূপ সর্ব্বপ্রকার চিত্তরঞ্জনের দ্বারা স্ত্রীজাতির ভক্তি উদ্দৃক্তা হইলে তাহারা কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়া কৃষ্ণে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইল। আপনাদিগকেই কৃষ্ণ বলিয়া জানিতে লাগিল।

কৃষ্ণে নিরুদ্ধহৃদয়া ইদমূচুঃ পরস্পরম্।
কৃষ্ণোঽহম্ এতল্ললিতং ব্রজাম্যালোক্যতাং গতিঃ।
অন্যা ব্রবীতি কৃষ্ণস্য মম গীতির্নিশাম্যতাম্।
দুষ্ট কালিয়! তিষ্ঠাত্র কৃষ্ণোঽহমিতি চাপরা।
বাহুমাস্ফোট্য কৃষ্ণস্য লীলা-সর্ব্বস্বম্ আদদে।
অন্যা ব্রবীতি ভো গোপা নিঃশঙ্কৈঃ স্থীয়তামিহ।
অলং বৃষ্টিভয়েনাত্র ধৃতো গোবর্দ্ধনো ময়া॥ ইত্যাদি

জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে অভেদজ্ঞান—জ্ঞানের তাহাই চিরোদ্দেশ্য। মহাজ্ঞানীও সমস্ত জীবন ইহার সন্ধানে ব্যয়িত করিয়াও ইহা পাইয়া উঠেন না। কিন্তু এই জ্ঞানহীনা গোপকন্যাগণ কেবল জগদীশ্বরের সৌন্দর্য্যের অনুরাগিণী হইয়া, (অর্থাৎ আমি যাহাকে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন বলিতেছি, তাহার সর্ব্বোচ্চ সোপান উঠিয়া) সেই অভেদজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে বিলীন হইল।"

এক কথায়, ব্রজগোপীর সাধনা প্রেমভক্তিযোগদ্বারা কৃষ্ণে একাত্মতা-প্রাপ্তি, এবং ঐ সাধনার সোপান কৃষ্ণের অনন্য সৌন্দর্য্যে মুগ্ধা হইয়া তাঁহার পাদমূলে সর্ব্বস্ব-সমর্পণ—সন্ত্যজ্য সর্ববিষয়ান্ তব পাদমূলম্ (ভাগবত)। ব্রজগোপী তো কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই চাহেন নাই—

ময্যর্পিতাত্মা নেচ্ছতি মদ্‌বিনান্যৎ

এবং তাহার ফলে পরানির্বৃতি, বিপুল সুখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—যে আনন্দ অন্যের সুদুর্লভ।

সংপশ্যে বিপুলং সুখং
তৎ নৈরপেক্ষং ন বিদুঃ সুখং মম—ভাগবত, ১১।১৪।১৭

আমরা দেখিলাম উদ্ধবের মত উচ্চ সাধকও গোপীদিগের চরণরেণু প্রার্থনা করিলেন—

আসাম্ অহো চরণরেণুজুষাম্ অহং স্যাম্।

ইহা বিচিত্র নয়—কারণ, শ্রীভগবানের মুখে আমরা শুনিয়াছি তিনি স্বয়ং ঐরূপ প্রেমিক ভক্তের অনুগমন করেন। কেন? 'পূয়েয় ইত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ' (in order to sanctify Himself with the dust of their feet.)

নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্বৈরং সমদর্শনম।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ॥—ভাগবত, ১১।১৪।১৫

তাই বলিতেছিলাম—ব্রজগোপী সুধন্য—'গোপী প্রেমকী ধ্বজা'।

রূপকথা

শ্রীকৃষ্ণধন দে, এম. এ.

তারকাবিহীন অন্ধ রাতের পঞ্জরে
পথহারা ঝড় কাঁদিছে কোথায়,—শুনতে পাও !
জমেছে আঁধার দিশাহারা ধূ ধূ প্রান্তরে,
কদম-কেয়ার বন একটিও নাই সেথাও ?
সাতটি সাগর, তেরোটি নদীর ওপারে পথ,
রাজার দুলাল আঁকিছে সে পথে ভবিষ্যৎ ;
—জ্যোৎস্না-হারানো মৌন নিশার পায়ের ধ্বনি
পূরব আকাশে এখনো যেখানে হয় নি শেষ,
···যাবে বধূ সেই দেশ ?

কোথা নিশি-পাওয়া যূথিকা-বনের নিশ্বাসে
চারিপাশে আজ চুপি চুপি কাঁদে অন্ধকার ;
কালো মেঘভরা কালো চোখে কার নিদ্ আসে,
কে যেন খুলেছে হারানো যুগের বন্ধ দ্বার।
তবু রূপকথা বলিতে হবে যে তাহারি কাছে,
—কোথা দূর পুরী আকাশের নীচে মিশিয়া আছে,
শিয়রে কাহার সোনার প্রদীপ নেভে নি আজো,
পূবের হাওয়ায় কে দিয়েছে মেলি কাজল কেশ ;
···যাবে বধূ সেই দেশ ?

গভীর রাত্রে রূপকথা বলে চাঁপার বন,
অতন্দ্র পথ সে কাহিনী তার নীরবে শোনে ;
তার সাথে আজ শুনি সে কাহিনী মোরা দু'জন,
—আর শোনে চাঁদ কালো আকাশের গোপন কোণে
পাষাণপুরীতে জেগে আছে কোথা রূপসী মেয়ে,
মালতীমালার গন্ধ কাঁদিছে অঙ্গ ছেয়ে,
—অভিমানে কার কুসুম-মেখলা গিয়েছে ছিঁড়ে,
শিথিল হয়েছে তন্দ্রা-অলস বাসকবেশ ;
···যাবে বধূ সেই দেশ ?

ঐ শোনো বধূ, কে কাঁদে কানন মর্ম্মরে;
　　হাজার যুগের রাজার দুলালী সুন্দরী ;
নিশীথ বাতাসে সোনার নূপুর গুঞ্জরে,
　　পথের চিহ্নে ফেলে যায় নীপমঞ্জরী।
　　　নয়ন-কাজলে এঁকে যায় লিপি পথের ধারে,
　　　যদি কোনদিন রাজার দুলাল চিনিতে পারে,
　　　যদি সে একেলা আসে অভিসারে শুক্লারাতে,
　　　　যদি কানে বাজে স্বপনমদির নূপুর-রেশ ;
　　　　　…যাবে বধূ সেই দেশ ?

পড়ে আছে পথ অতীত যুগের চেতনাহারা,
　　তুমি আর আমি চলেছি যাত্রী অসীমকাল ;
তোমারি নিবিড় কালো কুন্তলে জ্বলিছে তারা,
　　আঁকা আছে চোখে কত কাহিনীর ইন্দ্রজাল।
　　　পাতালপুরীর প্রবাল দুয়ার কে রাখে খুলে,
　　　ঘুমভরা চোখে কে জাগে প্রহর এলানো চুলে,
　　　অযুত নাগিনী ফুঁসিয়া ফুঁসিয়া আগলি রাখে,
　　　—নয়ন প্রহরী জানে না ক্ষণিক তন্দ্রালেশ ;
　　　　　…যাবে বধূ সেই দেশ ?

হিমপাণ্ডুর আকাশের নীচে কাঁপিছে রাত,
　　চাঁদ ডুবে গেছে দূরে দেবদারু সরল বনে ;
আমারে ঘিরিয়া কামনাতপ্ত ও দুটি হাত—
　　রহুক জাগিয়া নিবিড় মদির আলিঙ্গনে।
　　　রূপকথা আজি মুখর হয়েছে কাহার চোখে,
　　　কে যেন দাঁড়ায়ে মায়াবী নিশার স্বপ্নলোকে,
　　　বিদায়ের ক্ষণে উষাতারকার অস্তপথে
　　　　কে আছে চাহিয়া কুটির দুয়ারে নির্নিমেষ—
　　　　　…যাবে বধূ সেই দেশ ?

বিপিনের সংসার

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিপিন সকালে উঠিয়া কলাই-চটা পেয়ালাটায় সবে এক পেয়ালা চা লইয়া বসিয়াছে, এমন সময়ে দেখা গেল তেঁতুলতলার পথে লাঠি হাতে লম্বা চেহারার কে যেন হনহন করিয়া ওদের বাড়ির দিকেই চলিয়া আসিতেছে।

বিপিনের স্ত্রী মনোরমা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিল, দেখ তো কে একটা মিন্সে এদিকে আসছে? বিপিন বলিল, জমিদার-বাড়ির দরওয়ান গো—আমি বুঝতে পেরেছি—ডাকের ওপর ডাক, চিঠি দিয়ে ডাক, আবার লোক পাঠিয়ে ডাক।

মনোরমা বলিল, তা এসেছ তো ধর আজ দিন কুড়ি। ডাক দেওয়ার আর দোষ কি? বিপিনের বড় ভ্রাতৃবধূ এই সময় ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, পলাশপুর থেকে বোধ হয় লোক আসছে—এগিয়ে যাও তো ঠাকুরপো।

বিপিন বিরক্তমুখে চায়ের পেয়ালাটায় চুমুক দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া উঠানে গিয়া দাঁড়াইল এবং আগন্তুক লোকটির সঙ্গে দুই একটি কথা বলিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া একখানি চিঠি হাতে সোজা রান্নাঘরে গিয়া মাকে বলিল, এই দেখ মা, ওরা আবার চিঠি লিখেছে—দুদিন যে জিরোব তার উপায় নেই।

বিপিনের মা বলিলেন, তা তো এয়েছ বাপু, কুড়ি বাইশ দিন কি তার বেশি। তাদের কাজের সুবিধের জন্যেই তো তোমায় রেখেছে? এখানে তুমি ব'সে থাকলে তাদের চলে?

সকলের মুখেই ওই এক কথা। যেমনই মা, তেমনই স্ত্রী। কাহারও নিকটে একটু সহানুভূতি পাইবার উপায় নাই। কেবল 'যাও—যাও' শব্দ, টাকা রোজগার করিতে পার—সবাই খুশি। তোমার সুখ-দুঃখ কেহই দেখিবে না।

বিরক্তির মাথায় বিপিন স্ত্রীকে বলিল, আর একটু চা দাও দিকি!

মনোরমা বলিল, চা আর হবে কি দিয়ে? দুধ যা ছিল সবটুকু দিয়ে দিলাম।

বিপিন বলিল, র চা খাব। তাই ক'রে দাও।

—চিনিও তো নেই, র চা-ই বা কেমন ক'রে খাবে?

—মাকে বল, ওঁর গুড়ের নাগরি থেকে একটু গুড় বের ক'রে দিতে—তাই দিয়ে কর।

মনোরমা ঝাঁঝের সঙ্গে বলিল, মাকে তুমি বল গিয়ে। বুড়ো মানুষ, দশমী আছে, দোয়াদশী আছে—ঐ তো একখানা গুড়ের নাগরি, তাও চা খেয়ে খেয়ে আদ্ধেক খালি হয়ে গিয়েছে। এখনও তিন মাস চললে তবে নতুন গুড় উঠবে—ওঁর চলবে কিসে? এদিকে তো নতুন এক নাগরি আখের গুড় কিনে দেবার কড়ি জুটবে না সংসারে। মায়ের কাছ থেকে রোজ রোজ গুড় চাইতে লজ্জা করে না?

বিপিন আর কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া গেল। তাহার মনটা আজ কয়দিন হইতেই ভাল নয়। প্রথম তো সংসারে দারুণ অনটন, তার উপর স্ত্রীর যা মিষ্টি বুলি! বেশ সে পলাশপুরই যাইবে। আজই যাইবে আর বাড়ি থাকিয়া লাভ কি? বাড়ির কেহই তেমন পছন্দ করে না যে, সে বাড়ি থাকে।

এমন সময়ে বাহির হইতে গ্রামের কৃষ্ণলাল চক্রবর্ত্তী ডাকিয়া বলিলেন, বিপিন, বাড়ি আছ হে?

বিপিন পাশের ঘরের উদ্দেশে বলিল, কেষ্ট কাকা আসছেন, স'রে যাও। পরে অপেক্ষাকৃত স্বর চড়াইয়া বলিল, আসুন কাকা আসুন, এই ঘরেই আসুন।

কৃষ্ণলালের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, কিন্তু চুল বেশি পাকিয়া যাওয়ায় ও অর্দ্ধেক দাঁত পড়িয়া যাওয়ার দরুন, দেখায় যেন ষাট বছরের বৃদ্ধ। তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিলেন, ও কে এসেছিল হে, তোমার বাড়ি একজন খোট্টা মত?

—ও পলাশপুর থেকে এসেছিল। আমায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

—বেশ তো, যাও না। এখানে ব'সে মিছে কষ্ট পাওয়া—

—আহা, সে জন্যে না কেষ্টকাকা। পলাশপুরে বাবা যখন চাকরি করতেন, সে এক দিন গিয়েছে। এখন প্রজা ঠেঙিয়ে খাজনা আদায় করার দিন নেই। অথচ টাকা না আদায় করতে পারলে জমিদারদের মুখ ভার। আমি ধোপাখালির কাছারিতে থাকি; আর পলাশপুর থেকে ক্রমাগত লোক আসছে, ক্রমাগত লোক আসছে—ক্রমাগত টাকা পাঠাও, টাকা পাঠাও—এই বুলি। বলুন দিকি, আদায় না হ'লে আমি বাপের বিষয় বন্ধক দিয়ে এনে তোমাদের টাকা যোগাব মশায়?

কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী বলিলেন, তোমার বাবার আমলের সেই পুরোনো মনিবই আছে তো? তারা তো জানে তুমি বিনোদ চাটুজ্জের ছেলে—তোমার বাপের দাপটে—

—জানে ব'লেই তো আরও মুস্কিল। বাবা যে ভাবে খাজনা আদায় করতেন, এখনকার আমলে তা চলে না, কাকা,—অসম্ভব। দিনের হাওয়া বদলেছে, এখন চোখ কান ফুটেছে সবারই। সত্যি কথা বলছি, আমার ও কাজ ভাল লাগে না। প্রজা ঠেঙাবার জন্যেও না—তাতে আমার তত ইয়ে হয় না, কিন্তু জমিদার আর জমিদারগিন্নী ঘুন একেবারে। কেবল 'দাও দাও' বুলি। না দিলেই মুখ ভার।

—তা আর কি করবে বল! পরের চাকরি করার তো কোন দরকার ছিল না তোমার, বিনোদদাদা যা ক'রে রেখে গিয়েছিলেন—পায়ের ওপরে পা দিয়ে ব'সে খেতে পারতে—সবই যে উড়িয়ে দিলে! বিনোদদাদাও চোখ বুজলেন, তোমরাও ওড়াতে সুরু করলে! এখন আর হা-হুতাশ করলে কি হবে, বল?

এ সব কথা বিপিনের তেমন ভাল লাগিতেছিল না। স্পষ্ট কথা কাহারও ভাল লাগে না। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, সে যাক কাকা, আমায় একটা শসার চারা দিতে পারেন? আছে বাড়িতে?

এই সময় বিপিনের বিধবা বোন বীণা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, দাদা, মা ডাকছে, একবার রান্নাঘরের দিকে শুনে যাও।

ইহার অর্থ সে বোঝে। সংসারে হেন নাই, তেন নাই—লম্বা ফর্দ্দ শুনিতে হইবে—মা নয়, স্ত্রীর নিকট হইতে। কৃষ্ণলাল বসিয়া থাকার দরুন মায়ের নাম দিয়া ডাক আসিতেছে।

বিপিন বলিল, বসুন কাকা, আসছি।

কৃষ্ণলাল উঠিয়া পড়িলেন, সকালবেলা বসিয়া থাকিলে তাঁর চলিবে না, অনেক কাজ তাঁর।

মনোরমা দালানের দোরে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বলিল, কেষ্টকাকার সঙ্গে গল্প করলে চলবে তোমার?

—ঘুরিয়ে না ব'লে সোজা ভাবেই কথাটা বল না কেন? কি নেই?

—কিচ্ছু নেই। এক দানা চাল নেই, তেল নেই, ডাল নেই, একটি আলু নেই। হাঁড়ি চড়বে না এ বেলা।

বিপিন ঝাঁঝের সঙ্গে বলিল, না চড়ে না চড়ুক, রোজ রোজ পারি নে। এক বেলা উপোস ক'রে সব প'ড়ে থাক।

মনোরমা কড়াস্বরে জবাব দিল, লজ্জা করে না এ কথা বলতে? আমি আমার নিজের জন্যে বলি নি। মা কাল একাদশীর উপোস ক'রে রয়েছেন, উনিও কি আজও উপোস ক'রে প'ড়ে থাকবেন? সব কি আমার জন্যে সংসারে আসে? ওই বীণারও গিয়েছে কাল একাদশী—ও ছেলেমানুষ, কপালই না হয় পুড়েছে, খিদেতেষ্টা তো পালায় নি তা ব'লে?

মনোরমার যুক্তি নিষ্ঠুর বটে কিন্তু অকাট্য।

বিপিন বাড়ি হইতে বাহির হইয়া তেমাথার মোড়ের বড় তেঁতুলতলায় ছায়ায় একখানা যে কাঠের গুঁড়ি পড়িয়া আছে, তাহারই উপর আসিয়া বসিল।

চাল নাই, ডাল নাই, এ নাই, ও নাই—সে তো চুরি করিতে পারে না? একটি পয়সা নাই হাতে। বাজারের কোন দোকানে ধার দিবে না। বহু জায়গায় দেনা। উপায় কি এখন?

না, পলাশপুরেই যাওয়া স্থির। সেখানকার জীবন নরকযন্ত্রণার মত ঠেকে নানা কারণে, কিন্তু বাড়ির এ নরকযন্ত্রণার চেয়ে সে ভাল, তবুও তো দিন রাত মনোরমার মধুর বাক্যি আর কেবল 'নাই নাই' বুলি শুনিতে হইবে না? প্রজা ঠেঙানোর অনিচ্ছা ইত্যাদি বাজে ওজর, ও কিছু না, সে বিনোদ চাটুজ্জের ছেলে, প্রজা ঠেঙাইতে পিছপাও না; কিন্তু আর একটা কথাও আছে তাহার সেখানে যাইবার অনিচ্ছার মূলে।

ধোপাখালি কাছারির তহবিল হইতে সে জমিদারদের না জানাইয়া চল্লিশটি টাকা ধার করিয়াছিল, তাহা আর শোধ দেওয়া হয় নাই। বিপিনের ভয় আছে, হয়তো এই ব্যাপারটা ধরা পড়িয়া গিয়াছে, সেই জন্যই জমিদারের এত ঘন ঘন তাগাদা তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য।

বিপিনের ছোট ভাই বলাই আজ চার পাঁচ মাস অসুস্থ। তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্যই টাকা কয়টির নিতান্ত দরকার ছিল। বলাইকে রাণাঘাটে লইয়া গিয়া বড় ডাক্তারকে দেখানো

হইয়াছে এবং এখন আগের চেয়ে সে অনেকটা সারিয়া উঠিয়াছে বলিয়া ডাক্তার আশ্বাস দিয়াছেন। বলাই বর্ত্তমানে রাণাঘাটেই মিশনারি হাসপাতালে আছে।

পরদিন পলাশপুরে যাওয়ার পথে বিপিন রাণাঘাট হাসপাতালে গেল। স্টেশন থেকে হাসপাতাল প্রায় মাইল খানেক দূরে। বেশ ফাঁকা মাঠের মধ্যে। বলাই দাদাকে দেখিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

—দাদা, আমায় এখানে এরা না খেতে দিয়ে মেরে ফেললে, আমায় বাড়ি নিয়ে যাবে কবে? আমি তো সেরে গেছি, না খেয়ে মলাম; তোমার পায়ে পড়ি দাদা, বাড়ি কবে নিয়ে যাবে বল।

—খেতে দেয় না তোর অসুখ ব'লেই তো। আচ্ছা, আচ্ছা, পলাশপুর থেকে ফিরবার পথে তোকে নিয়ে যাব ঠিক। কি খেতে ইচ্ছে হয়?

—মাংস খাই নি কতদিন। মাংস খেতে ইচ্ছে হয়—বৌদিদির হাতে রান্না মাংস—

—আচ্ছা হবে হবে। এই মাসেই নিয়ে যাব।

বিপিন আড়ালে নার্সকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার ভাই মাংস খেতে চাইছে—একটু আধটু—

নার্স এদেশী খ্রীষ্টান, পূর্ব্বে কৈবর্ত্ত ছিল, গোলগাল, দোহারা, বেশি বয়েস নয়—ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, মাংস খেয়ে মরবে যে! নেফ্রাইটিসের রুগী, অত্যন্ত ধরপাকড়ের মধ্যে না রাখলে যা একটু সেরে আসছে, তাও যাবে। মাংস!

বৈকালের দিকে পাঁচ মাইল পথ হাঁটিয়া বিপিন পলাশপুরে পৌঁছিল।

বিপিনের বাবা ৺ বিনোদ চাটুজ্জে এখানে কাজ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং বিপিনের জমিদার বাড়ির সর্ব্বত্র অবাধগতি। সে অন্দরে ঢুকিতেই জমিদার-গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, আরে এস এস বিপিন, কখন এলে? তারপর তোমার ভাই এখনও সেই হাসপাতালেই রয়েছে? কেমন আছে আজকাল?

জমিদার অনাদি চৌধুরী বিপিনের গলার স্বর শুনিয়া দোতলা হইতে ডাক দিয়া বলিলেন, ও কে? বিপিন না? এলে এতদিন পরে? দশ দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়ে করলে দুমাস। এ রকম ক'রে কাজ চলবে? দাঁড়াও, আমি আসছি—

বিপিন জমিদার-গৃহিণীকে প্রণাম করিল। গৃহিণীর বয়স চল্লিশ ছাড়াইয়াছে, রং ফর্সা, মোটাসোটা চেহারা, পরনে চওড়া লাল পাড় শাড়ি, হাতে দুই গাছা সোনার বালা ছাড়া অন্য কোন গহনা নাই। তিনি বলিলেন, এস এস, বেঁচে থাক। তোমাকে ডাকার আরও বিশেষ দরকার, খুকীকে নিয়ে জামাই আসছেন বুধবারে। ঘরে একটা পয়সা সেই। ধোপাখালির কাছারি আজ দুমাস বন্ধ। তাগাদাপত্র না করলে জামাই এলে একেবারে মুস্কিলে প'ড়ে যেতে হবে। সেই জন্যে কর্ত্তা তোমার ওখানে কাল লোক পাঠিয়েছিলেন তোমায় নিয়ে আসতে।

অনাদি চৌধুরী ইতিমধ্যে নামিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁর বয়স ষাটের উপর, বর্ত্তমান গৃহিণী তাঁর দ্বিতীয় পক্ষ। বাতের রোগী বলিয়া খুব বেশি নড়াচড়া করিতে পারেন না, যদিও শরীর এখনও বেশ বলিষ্ঠ। এক সময়ে দুর্দ্দান্ত জমিদার বলিয়া ইহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

অনাদি চৌধুরী বলিলেন, খুকী আসছে বুধবারে। এদিকে ধোপাখালি কাছারি আজ দুমাস বন্ধ। একটি পয়সা আদায়-তশিল নেই। তোমার কাণ্ডজ্ঞানটা যে কি, তাও তো বুঝি নে! তোমার বাবার আমলে এই মহল থেকে তিনশো টাকা ফি মাসে আদায় ছিল আর এখন সেই জায়গায় পঞ্চাশ ষাট টাকা আদায় হয় না। তুমি কাল সকালেই চ'লে যাও কাছারিতে। মঙ্গলবার রাতের মধ্যে আমার চল্লিশটা টাকা চাইই, নইলে মান যাবে, জামাই আসছে এতকাল পরে, কি মনে করবে? আদর যত্ন করব কি দিয়ে?

জমিদার-গৃহিণী বলিলেন, আর আসবার সময় কিছু কুমড়ো, বেগুন, থোড় কিম্বা মোচা আর যদি পার ভাল মাছ একটা রঘুদের পুকুর থেকে, আর কিছু শাকশব্জি আনবে। ঘানি-ভাঙানো সর্ষে তেল এন আড়াই সের, আর এক ভাঁড় আখের গুড় যদি পাও—

বিপিন মনে মনে হাসিল। জমিদার-গৃহিণী যে এ সমস্ত আনিতে বলিতেছেন, সবই বিনামূল্যে প্রজা ঠেঙাইয়া। নতুবা পয়সা ফেলিলে জিনিসের অভাব কি? 'যদি পাও' কথার মানেই হইল 'যদি বিনামূল্যে পাও'—এমন ছোট নজর, আর এমন কৃপণ স্বভাব! পরের জিনিস এমনই যোগাইতে পার, খুব খুশি। দায় পড়িয়াছে বিপিনের পরের শাপমন্যি কুড়াইয়া তাঁহাদের জন্যে বেসাতি আনিবার, এমনই তো ছোট ভাইটা হাসপাতালে পড়িয়া শুষিতেছে! এই সব জন্যেই এখানকার চাকুরির অন্ন তাহার গলা দিয়া নামে না।

পলাশপুর হইতে ধোপাখালির কাছারি আট ক্রোশ। নায়েবের জন্য গাড়ি ব্যবস্থা করিবেন তেমন পাত্র নন অনাদি চৌধুরী—সুতরাং সারা পথ হাঁটিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিপিন কাছারি পৌঁছিল। কাছারি-ঘরে কানেস্ত্রা-কাটা টিনের দেওয়াল, চাল খড়ের। স্থানীয় জনৈক নাপিতের পুত্র মাসিক বারো আনা বেতনে কাছারিতে ঝাঁটপাটের কাজকর্ম্ম করে। বিপিন তাহাকে সংবাদ দিয়া আনাইল, সে ঘর খুলিয়া ঝাঁট দিয়া কাছারি-ঘরটাকে রাত্রিবাসের কতকটা উপযোগী করিয়া তুলিল বটে, কিন্তু বিপিনের ভয় হইতেছিল, মেঝেতে যে রকম বড় বড় চার পাঁচটা ইঁদুরের গর্ত্ত হইয়াছে রাত্রিবেলা সাপখোপ না বাহির হয়!

চাকর ছোকরা একটি কাচভাঙ্গা হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বালিয়া ঘরের মেঝেতে রাখিয়া বলিল, নায়েববাবু, রাত্রে কি খাবা?

—কিছু খাব না। তুই যা।

—সে কি বাবু! তা কখনও হ'তে পারে? খাবা না কিছু, রাত কাটাবা কেমন ক'রে? একটু দুধ দেখে আসি পাড়ার মধ্যে, আপনি বসেন বাবু।

এই ছোকরা চাকর যে যত্ন করে, দরদ দেখায় বিপিন অনেক আপনার লোকের কাছেও তেমন ব্যবহার পায় নাই, একথা তাহার মনে হইল।

অন্ধকার রাত্রি।

কাছারির সামনে একটু ফাঁকা মাঠ, অন্য সব দিকে ঘন বাঁশবন, এক কোণে একটা বড় বাদামগাছ। অনাদি চৌধুরীর বাবা ৺হরিনাথ চৌধুরী কাছারি-বাড়িতে এটি সখ করিয়া পুঁতিয়া-

ছিলেন, ফলের জন্য নয়, বাহার ও ছায়ার জন্য। বাঁশবনে অন্ধকার রাত্রে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি ঘুরিয়া ঘুরিয়া চক্রাকারে উড়িতেছে, ঝিঁঝিঁ ডাকিতেছে, মশা বিনবিন করিতেছে কানের কাছে—কাছারির কাছাকাছি লোকজনের বাস নাই—ভারী নির্জ্জন।

বিপিন একা বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল। কত কথাই মনে আসে! বাড়ি হইতে আসিয়া মন ভাল নয়, কাল হাসপাতালে ছোট ভাইটার রোগশীর্ণ মুখ মনে পড়িল। মনোরমার ঝাঁঝালো টক্ টক্ কথাবার্ত্তা। সংসারের ঘোর অনটন। বাজারে হেন দোকান নাই, যেখানে দেনা নাই। আজ শনিবার, সামনের বুধবারে মহল হইতে চল্লিশটা টাকা ও একগাদা ফল তরকারিপত্র, মাছ, দই জমিদার-বাড়ি লইয়া যাইতে হইবে জামাইয়ের অভ্যর্থনা যোগাড় করিতে। তিন দিনের মধ্যে এ গরীব গাঁয়ে চল্লিশ টাকা হওয়া দূরের কথা, দশটি টাকা হয় কিনা সন্দেহ—অথচ জমিদার বা জমিদার-গিন্নী তা বুঝিবেন না—দিতে না পারিলেই মুখ ভারী হইবে তাঁদের! কি বিষম মুস্কিলেই সে পড়িয়াছে। অথচ চিরকাল তাহাদের এমন অবস্থা ছিল না। বিপিনের বাবা এই কাছারিতে এক কলমে উনিশ বছর কাটাইয়া গিয়াছেন, এই জমিদারদের কাজে। যথেষ্ট অর্থ রোজগার করিতেন, বাড়িতে লাঙল রাখিয়া চাষবাস করাইতেন, গ্রামের মধ্যে যথেষ্ট নামডাক, প্রতিপত্তি ছিল।

বাবা চক্ষু বুজিবার সঙ্গে সঙ্গে সব গেল। কতক গেল দেনার দায়ে, কতক গেল তাহারই বদ্‌খেয়ালিতে। অল্প বয়সে কাঁচা টাকা হাতে পাইয়া কুসঙ্গীর দলে ভিড়িয়া স্ফূর্ত্তি করিতে গিয়া টাকা তো উড়িলই, ক্রমে জমিজমা বাঁধা পড়িতে লাগিল।

তারপর বিবাহ। সে এক মজার ব্যাপার।

তখনও পর্য্যন্ত যতটুকু নামডাক ছিল পৈতৃক আমলের, তাহারই ফলে এক অবস্থাপন্ন বড় গৃহস্থের ঘরের মেয়ের সহিত হইল বিবাহ। মেয়ের বাবা নাই, কাকা বড় চাকুরি করেন, শালাশালীরা সব কলেজে-পড়া, বিপিন ইংরেজীতে কোনও রকমে নাম সই করিতে পারে মাত্র। মনোরমা শ্বশুর-বাড়ি আসিয়াই বুঝিল বাহির হইতে যত নামডাকই থাকুক, এখানকার ভিতরের অবস্থা অন্তঃসারশূন্য। সে বড় বংশের মেয়ে, মন গেল তার সম্পূর্ণ বিরূপ হইয়া, স্বামীর সহিত সদ্ভাব জমিতে পাইল না যে, ইহাতে বিপিন মনে প্রাণে স্ত্রীকে অপরাধিনী করিতে পারে কই?

—এই যে নায়েববাবু, কখন এলেন? দণ্ডবৎ হই।

বিপিনের চমক ভাঙিল, আগন্তুক এই গ্রামেরই একজন বড় প্রজা, নরহরি দাশ জাতিতে মুচি, শুওরের ব্যবসা করিয়া হাতে দুপয়সা করিয়াছে।

বিপিন বলিল, এস নরহরি, বড় মুস্কিলে পড়েছি, বুধবারের মধ্যে চল্লিশটি টাকার যোগাড় কি ক'রে করি বল তো? বাবুর জামাই মেয়ে আসবেন, টাকার বড্ড দরকার। আমি তো এলাম দুমাস পরে। টাকা যোগাড় না করতে পারলে আমার তো মান থাকে না—কি করি, ভারী ভাবনায় পড়ে গেলাম যে।

নরহরি বলিল, এসব কথা এখন নয় বাবু। খাওয়া দাওয়া করুন, কাল বেলাবেলা আমি

আসপো কাছারিতে—তখন হবে। ইতিমধ্যে কাছারির ছোকরা চাকর একটা ঘটিতে কিছু দুধ ও কোঁচড়ে কিছু মুড়ি লইয়া ফিরিল।

নরহরি বলিল, আপনি সেবা করুন নায়েববাবু, আজ আসি। কাল কথাবার্ত্তা হবে। কাছারি-ঘরের দোরটা একটু ভাল ক'রে আগড় বন্ধ ক'রে শোবেন রাতে—বড্ড বাঘের ভয় হ'য়েছে আজ কডা দিন।

বিপিন সকালে উঠিয়া একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া বাঁচিল। তহবিলের টাকার ঘাটতি ইহারা টের পায় নাই। তবুও টাকাটা এবার তহবিলে শোধ করিয়া দিতে হইবে, জমিদার হিসাব তলব করিতে পারেন, এত দিন পরে যখন সে আসিয়াছে। তাহা হইলে অন্ততঃ আশি টাকার আপাততঃ দরকার, এই তিন দিনের মধ্যে।

সে ঘোর দুশ্চিন্তায় পড়িয়া গেল। তিনটি দিন বাকি মোটে। এখন কোন ফসলের সময় নয়, আশি টাকা আদায় হইবে কোথা হইতে? পাইক গিয়া প্রজাপত্র ডাকাইয়া আনিল, সকলের মুখেই এক বুলি, এখন টাকা তারা দেয় কি করিয়া?

নরহরি দাশ পনরটি টাকা দিল। ইহার বেশি তাহার গলা কাটিয়া ফেলিলেও হইবে না। বিপিন নিজে প্রজাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া আরও দশটি টাকা আদায় করিল দুইদিনে। ইহার বেশি হওয়া বর্ত্তমানে অসম্ভব।

বিপিন একবার কামিনী গোয়ালিনীকে ডাকাইল।

এ অঞ্চলে অনেকে জানে যে, বিপিনের বাবা বিনোদ চাটুজ্জের সঙ্গে কামিনীর নাকি বেশ একটু ঘনিষ্ঠতা ছিল। এখন কামিনীর বয়স পঞ্চান্ন ছাপান্ন, একহারা, শ্যামবর্ণ—হাতে মোটা সোনার অনন্ত। সে বিপিনকে স্নেহের চক্ষে দেখে, বিপিন যখন দশ বারো বছরের বালক, বাবার সঙ্গে কাছারিতে আসিত, তখন হইতেই সে বিপিনকে জানে। বিপিনও তাহাকে সমীহ করিয়া চলে।

কামিনী প্রথমে আসিয়াই বিপিনের ছোট ভাইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিল।

—বাবা, তারে তুমি কলকেতায় নিয়ে গিয়ে বড় একটা ডাক্তার টাক্তার দেখাও—ওখানে বাঁচবে না। রাণাঘাটের হাসপাতালে কি হবে? ছোঁড়াডাকে তোমরা সবাই মেলে মেরে ফেলবা দেখছি।

—করি কি মাসীমা, জান তো অবস্থা। বাবা মারা যাওয়ার পরে সংসারে আগের মত জুত নেই। বাবার দেনা শোধ দিয়ে—

কামিনী ঝাঁঝিয়া উঠিয়া বলিল, কর্ত্তার দেনার জন্যে যায় নি—গিয়েছে তোমার উড়ুঞ্চুড়ে স্বভাবের জন্যে—আমি জানি নে কিছু? কর্ত্তা যা রেখে গিয়েছিলেন ক'রে, তাতে তোমাদের দুই ভায়ের ভাতের ভাবনা হ'ত না। বিষয়-আশয়, গোলাপালা, তোমার পৈতের সময় হাজার লোক পাত পেড়ে ব'সে খেয়েছিল। কম বিষয়ডা ক'রে গিয়েছিলেন কর্ত্তা? তোমরা বাবা সব ঘুচুলে। তাঁর মত লোক তোমরা হ'লে তো!

বিপিন দেখিল সে ভুল করিয়াছে। বাবার কোন ক্রুটীর উল্লেখ ইহার সামনে করা উচিত

হয় নাই—সে বরাবর দেখিয়া আসিয়াছে কামিনী মাসী তাহা সহ্য করিতে পারে না। ইহার কাছে কিছু টাকা আদায় করিতে হইবে, রাগাইয়া লাভ নাই। সুর বেশ মোলায়েম করিয়া বলিল, ও কথা যাক মাসীমা, কিছু টাকা দিতে পার, এই গোটা চল্লিশ টাকা। কিস্তির সময় আদায় ক'রে আবার দেব।

কামিনী পূর্ব্ববৎ ঝাঁঝের সঙ্গেই বলিল, টাকা, টাকা! টাকার গাছ দেখেছ কিনা আমার? সেবার এক কাঁড়ি টাকা যে নিলে আর উপুড় হাত করলে না; আর একবার দিলাম কুড়ি টাকা পুজোর সময়; তোমার কেবল টাকার দরকার হ'লেই—মাসী মাসী। বাতে যে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলাম কুড়ি পঁচিশ দিন—খোঁজ করেছিলে মাসীমা ব'লে?

বিপিন কামিনী মাসীকে কি করিয়া চালাইতে হয় জানে। তরুণ তরুণীদের কাছে প্রৌঢ় বা প্রৌঢ়াদের দুর্ব্বলতা ধরা পড়িতে বেশিক্ষণ লাগে না। তাহারা জানে উহাদের কি করিয়া হাতে রাখিতে হয়। সুতরাং বিপিন হাসিয়া বলিল, খোকার ভাতের সময় তোমায় নিয়ে যাব ব'লে সব ঠিক মাসী, এমন সময় বলাইটা অসুখে পড়ল; তোমার টাকা কড়িও সব তো এতদিন শোধ হয়ে যেত, ওর অসুখটা যদি না হ'ত! [ক্রমশ]

শারদীয়

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, এম.এ.

কল্পনা-সমুদ্রে মোর বাড়ব-অনল
জ্বালিয়াছে বহ্নির বিলাস!
দিক-বলয়িত এই সুনীল দর্পণ
স্বপ্নে-মেলা আঁখি চেয়ে করিছে দর্শন
খাণ্ডবের নব সর্ব্বনাশ।

কল্পনার স্পর্শমণি অন্তিম উল্লাসে
যেথা সেথা ফিরি পরশিয়া;
মৃত্তিকার কালোরূপে কৃষ্ণা যেন হাসে,
ঘাসের শিশির-কণা মুক্তার আভাসে
মুহূর্ত্তেকে উঠে সুবর্ণিয়া।

আশ্বিনের ধান্যক্ষেত্রে যে মন্ত্র উচ্চারি
সোনা করে শরৎ চঞ্চল,
সে মন্ত্র কে দিল আজ আমাতে সঞ্চারি—
অকস্মাৎ হ'ল কেন নীলকান্ত বারি
হিরণ্ময় বহ্নির ফসল।



সমসাময়িক সাহিত্য

শ্রীগোপাল হালদার, এম.এ., বি.এল.

সমসাময়িক সাহিত্যের গোড়ার কথাই আজ সাহিত্য-সঙ্কট। যে সময়ে মানুষের ইতিহাসই এক কঠিন সঙ্কটের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে সে সময়ের সাহিত্যেও যে তাহার ছাপ পড়িবে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। কারণ, সাহিত্য আকাশ-কুসুম নয়—মানুষের জীবন-বোধেরই এক পরিচয়। সে জীবনই যখন নানা প্রশ্ন, নানা চিন্তা ও চিন্তাহীনতার কোলাহলে ভরিয়া উঠিয়াছে তখন সাহিত্যেও তাহার প্রতিধ্বনি উঠিবেই।

কিন্তু কথাটা এইখানেই শেষ হয় না—শত কোলাহল সত্ত্বেও জীবন কোলাহল মাত্র নয়, সে এক সন্ধান, এক অন্তহীন জিজ্ঞাসা। জীবন-বোধও তাই শুধু কোলাহলকেই চূড়ান্ত বা একান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না—সমগ্র জীবনকে একটি সমগ্রদৃষ্টিতে গ্রথিত করিয়া লইতে চায়—সাদা কথায়, একটা মানে খুঁজিয়া লয়। সাধারণ মানুষ যাহা দেখিয়াও দেখিতে পায় না,—জানে না, বুঝে না,—সাহিত্যিক সেই মানেই তাহার সম্মুখে ধরে; চকিতের মত জীবনের সঙ্গে এইভাবে মানুষের পরিচয় ঘটে—যে জীবনের ঘূর্ণাবর্তে সে পাক খাইয়াও তাহার রূপটি চিনিতে পারে নাই, এইবার তাহার রূপ ও রহস্য তাহার অন্তরের অনুভূতি-লোকে আসিয়া দেখা দেয়। সাহিত্য যেখানে সত্য হয়, সেখানে এমনই একটি স্পর্শ সে পাঠকের মনে দিতে পারে—দেয়ও;—পাঠকের মন তাহাতে একটি নূতন প্রসারতা ও নূতন গভীরতা লাভ করে—কারণ, জীবনকে সে দেখিতে পায়, দেখিবার মত একটি দৃষ্টিভঙ্গি তাহার আয়ত্ত হয়। এই হিসাবেই সাহিত্যকে বলা হয় নিত্যকালের জিনিস, সৃষ্টি;—জীবন-চিত্রের শুধু প্রতিচ্ছায়া নয়, জীবন-রহস্যের এক রূপময় প্রকাশ—আবিষ্কার ও উদ্‌ঘাটন।

এ সাহিত্য অবশ্য প্রতিদিন জন্মায় না, আর ইহাও অবশ্য সমসাময়িককালের আলো-জল-বাতাস হইতেই নিজের জীবনোপাদান সংগ্রহ করিয়া লয়, তবু এতদিন পর্য্যন্ত মানুষ ইহাকেই সাহিত্যের আদর্শ, ইহার মানদণ্ডকেই সাহিত্যের খাঁটি মানদণ্ড বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। প্রতি চিত্তের বিচিত্র অনুভূতির মধ্য দিয়া জীবন যে অফুরন্ত রূপ ও গভীর রহস্যের ছায়াপাত করিয়া যায়—সাহিত্যিকের সৃষ্টি তাহারই এক-একটি দিকের সন্ধান বহন করিয়া আনে, একমাত্র তাহারই মনে আছে সেই দৃষ্টির ও সৃষ্টির শক্তি,—এই ছিল এতদিনকার জানা কথা। এই হিসাবেই সাহিত্যের দাবি ছিল কালাতীত ও দেশাতীত; সাহিত্যিকের দায়িত্ব ছিল একমাত্র সৃষ্টির দায়িত্ব, তাহার ধর্ম্ম ছিল তাহার নিজস্ব—অর্থাৎ সৃষ্টির ধর্ম্ম। সমসাময়িক জীবনের উচ্ছল অশান্ত স্রোত হইতে সে দূরে থাকিতে পারিত, দূরে থাকিতও—চিরকালের জীবন-পারাবারের উদাত্ত সঙ্গীত শুনিবার জন্য, আপনার কণ্ঠে সেই সুর ধ্বনিয়া তুলিবার জন্য।

কিন্তু এ যুগের সাহিত্যে আর সেই আদর্শ নাই, সেই মানদণ্ডই বর্জ্জিত হইতে চলিয়াছে, সেই দাবি ও দায়িত্ব, দুইই এই যুগের সাহিত্যিক সমাজ অস্বীকার করিতে বসিয়াছেন। সাহিত্যিকের নিজস্ব তেমন কোনও ধর্ম্ম আছে কিনা তাহাই তাঁহারা সন্দেহ করেন। এই সন্দেহ, এই অস্বীকৃতি,—শুধু থিওরি হিসাবে নয়,—এই যুগের সৃষ্টি-প্রয়াসের মধ্য দিয়াই এমনই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে,

আজ অনেক সাহিত্যিকেরই সাহিত্যাদর্শ সম্বন্ধে দুর্ভাবনা মনে উঠিয়াছে, এই সাহিত্য-সঙ্কটের শেষ কোথায়, অনেকেই তাহা ভাবিতে সুরু করিয়াছেন। স্টর্ম জেমিসন 'বর্ত্তমান ইংরেজী উপন্যাসের গলদ কোথায়' তাহা বিচার করিতেছেন; কিন্তু সমস্ত সাহিত্যাদর্শ ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুর্ভাবনা পরিস্ফুট হইয়াছে সুন্দররূপে মিসেস ভার্জিনিয়া উল্‌ফের 'থ্রী গিনিজ্', হার্বার্ট রীডের 'পোয়েট্রি অ্যাণ্ড এনার্কিজ্‌ম্', জর্জ দুহামেলের 'ইন ডিফেন্স অব লেটার্স' এবং লীগ অব নেশান্সের ইণ্টার্ন্যাশনাল ইন্‌স্টিটিউট অব্ ইণ্টেলেক্‌চুয়াল কো-অপারেশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত, পল্ ভ্যালেরির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শিল্পী ও সাহিত্যিকদের একটি অধিবেশনের (২০-২৪এ জুলাই, ১৯৩৭) বক্তৃতা-প্রবন্ধাদির বিবরণ 'ল্য দেশর্তাঁ প্রোশেঁ দ্য লেতর্স' নামীয় গ্রন্থাদিতে। এই সব গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আবার 'টাইম্‌স্ লিটররি সাপ্‌লিমেণ্ট' ও অন্যান্য সাহিত্যিক পত্রে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক চিন্তাশীল লেখক নানা প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন। মোটের উপর, সাহিত্যে যে সঙ্কট উপস্থিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

২

মিসেস ভার্জিনিয়া উল্‌ফ তাঁহার পুস্তিকাখানা উদ্দেশ করিয়াছেন এক কল্পিত শান্তিবাদী সমিতির সম্পাদককে, যেন তাঁহারই পত্রোত্তর। উহাতে 'শান্তি' ছাড়া আর দুইটি বিষয়েও তাঁহাকে আলোচনা করিতে হয়—মেয়েদের উচ্চশিক্ষার কথা, ও মেয়েদের জীবিকার্জ্জনের কথা। এই তিন জিনিসকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি সমাজ ও সাহিত্যের অবস্থা পূর্ব্বাপর বিবেচনা করেন, তাঁহার অনবদ্য বর্ণনাভঙ্গিতে। তাঁহার মতে যুগটায় এক 'বুদ্ধির বেশ্যাবৃত্তি' (intellectual harlotry) দেখা দিয়াছে। বুদ্ধিজীবীর দল হয় ব্যবসায়বুদ্ধিতে সাধারণের মনস্তুষ্টি করিবার মত কৌশল খুঁজিতেছেন, নয় ভয়ে বা মূঢ় ভক্তিতে মার্কামারা 'ইডিয়লজি'র উপাসনা জুড়িয়া দিয়াছেন। দুহামেলও এই দুই জিনিস লক্ষ্য করিয়াছেন—"আশ্চর্য্য এই, যে সভ্যতা আমাদের স্নায়ুসমূহকে ক্ষয় করিয়া দিতেছে, আমাদের সমস্ত কাজকর্ম্মের জন্য ক্লেশকর প্রয়াস দাবি করিতেছে, তাহাই জনগণকে দিতেছে সকল প্রকার বুদ্ধি-প্রয়োগের হাত হইতে নিষ্কৃতি।" এবং "পলিটিক্স পেঁয়াজের মত, ওর ঝাঁঝ এত উগ্র যে না দিলে ভাল খাবারেও স্বাদ হয় না।" 'ল্য দেশর্তাঁ প্রোশেঁ দ্য লেতর্সে'র লেখক বহু—জাঁ রিশার ব্লক, জুল রোমে, দুহামেল আছেন ফ্রান্সের, সিঞর মাদারিয়েগা স্পেনের, গিল্‌বার্ট মারে, ই. এম. ফরস্টার প্রভৃতি ছাড়াও চার্লস মর্গ্যান ও হের ফ্রানৎস ভেরফেল প্রভৃতির লেখা বাহির হইয়াছে—ভ্যালেরির পৌরোহিত্যে। ভ্যালেরি বলিতেছেন—"স্থির ও ভাব-গম্ভীর নিবন্ধ লোপ পাইতে বসিয়াছে। মোটরে, সিনেমায়, দৈনিকপত্রের খবরের তাড়নায় মানুষের চিত্তে এমনই এক অস্থিরতা আনিয়া দিয়াছে যে, তাহাতে রূপসৃষ্টি বা রূপবিচার আর সম্ভব নয়। কোন কিছুই আজ গভীর দৃষ্টিতে না দেখাই হইয়াছে নিয়ম।"

এই সমস্ত জিনিসের মধ্য দিয়া দুইটি লক্ষণই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে—এক, পাঠকসমাজ আজ মানসিক প্রয়াসে বিমুখ, দুই, শিল্পীর ব্যক্তিত্ব আজ বন্দী। লক্ষ্য করিবার মত এই যে, এই লেখকসম্প্রদায় নীতিহীনতার কথা বলেন নাই। আমাদের দেশে আধুনিক সাহিত্য বা অতি-আধুনিক সাহিত্য বলিলে যে আপত্তি উঠে, তাহা অনেকাংশেই নৈতিক। কিন্তু সুনীতি বা দুর্নীতি সাহিত্যের পক্ষে আজ একেবারে অবান্তর কথা—এই লেখক-লেখিকাদের আলোচনায় তাহার উল্লেখও প্রায় নাই। লেখক মাত্রই জানেন সাহিত্যের বিচারে উহা নিতান্তই গৌণ বরং গৌণ না হইলেই বিপদ। 'আর্য্য সুনীতি' ও সমাজতান্ত্রিক গণনীতির দাবি মিটাইতে হয় বলিয়াই তো জার্ম্মানি ও রুশিয়ার সাহিত্যের মধ্যে আজ প্রাণবান জিনিস দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। এই সব সাহিত্যিকরা বরং বলিতে চাহেন—সাহিত্যের একটি মাত্র নীতি আছে—সে সৃষ্টি-নীতি; আর যে সাহিত্য গভীরভাবে আমাদের স্পর্শ করে, তাহাতে একটি মাত্র বৃহত্তর ধর্ম্মের সন্ধান পাই—সে প্রাণধর্ম্ম—উহার সহিত সমাজের বিধি-নিয়মের বিরোধিতাই থাকিতে পারে বেশি।

অবশ্য সমাজধর্ম্মও প্রাণধর্ম্মকে না মানিয়া চলিতে পারে না, পারে না বলিয়াই সমাজ বারে বারে বদলায়,

আপনার নীতির আদর্শও সঙ্গে সঙ্গে বদলাইয়া লয়। আমাদের সমাজে সেই পরিবর্ত্তনের ধারাটি অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রায় বন্ধ হইয়া ছিল, মধ্যযুগের বিধিব্যবস্থা ছাড়াইয়া বর্ত্তমানের মধ্যে তাই প্রবেশ করিতে পারে নাই, তাই আমাদের নীতি-নিয়মও খুব দৃঢ়মূল হইয়া আছে। আজ হঠাৎ বাহিরের ধাক্কায় আমাদের সমাজের সেই মধ্যযুগীয় ভিত্তি পর্য্যন্ত নড়িয়া উঠিয়াছে, কাজেই নীতির সেই সনাতন সৌধ-চূড়া যে ভাঙিয়া পড়িবে তাহাতে আর সন্দেহ কি! কিন্তু ব্যাপারটা সহজ নয়— অনেক দিনের অনেক ধারণা চূরমার হইতে চলিয়াছে, আপত্তি উঠিবে, কলহ উঠিবেই, নিতান্ত অহিংস জাত না হইলে রক্তপাতও হইতে পারিত। ইহা সহজ কথা, কিন্তু আমাদের দেশে এই পরিবর্ত্তনের স্রোতটি ঘোলাইয়া উঠিয়াছে কতকগুলি অনন্যসাধারণ কারণে। পশ্চিমের সংস্পর্শেই আমরা বাঁচিয়াছি। কিন্তু আমাদের জীবন উহার তাড়নায় এত রূপান্তরিত হয় নাই যে, পশ্চিমের প্রবর্দ্ধিত সভ্যতার উদ্দাম সমস্যাগুলি আমাদের আধা-সেকেলে আধা-একেলে সমাজে তেমন ভাবে এখনই দেখা দিবে। তাই, পশ্চিমী চিন্তা ও মানসিকতাও ঠিক তেমন ভাবে আমাদের এই আবেষ্টনীতে অঙ্কুরিত হইবার কথা নয়। অথচ, আমরা পশ্চিমেরই দাস, আমাদের সাহিত্য পশ্চিমের মানসপুত্র, পশ্চিমা কলমের চারা। তাই, পশ্চিমের-পূর্ব্বের দুই মানসিক আবহাওয়া মিলাইয়া এক অদ্ভুত জগতে আমাদের সাহিত্যিকরা নিজেদের বাস রচনা করেন। স্থানটি ত্রিশঙ্কুর উপযুক্ত, আমাদের দেশীয় আধুনিক সাহিত্যেরও এই ত্রিশঙ্কুর দশা। উহা নীতিহীন নয়—স্থিতিহীন। অর্থাৎ আমাদের সাহিত্যে সঙ্কট আছে, কারণ আমরা পৃথিবীর বাহিরে নই; কিন্তু উহার খানিকটা নকল সঙ্কট—subjective, objective নয়। যেটুকু জয়েসের পাউণ্ডের ইলিয়টের বই পড়িয়া আমরা আমাদের বলিয়া চালাইতে চাই। প্রেরণাটা বইয়ের—জীবনের নয়।

৩

'লিটারারি সাপ্লিমেণ্টে'র লেখক পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের অতৃপ্তি এই বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন—"মাপকাঠি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, মূল্যে ভেজাল চলিয়াছে; স্বাধীনতা বিনষ্ট হইয়াছে, সাহিত্যে সাধারণতন্ত্রের উপর পণ্যের ও রাষ্ট্রদর্শনের একনায়কত্ব চাপিয়া বসিয়াছে; লেখকের ব্যবসায়ে আজ যখন এত আর্থিক পুরস্কার জুটিতেছে যে, পূর্ব্বযুগের পক্ষে তাহা কল্পনাও করা চলিত না, লেখার পরিমাণও তখন কেবলই বাড়িয়া চলিয়াছে; কিন্তু লেখার আর্ট পুষ্টির অভাবে, শ্রদ্ধার অভাবে, প্রীতির অভাবে দিনে দিনে ধ্বংস হইতে আরম্ভ করিয়াছে।"

এই সব উক্তির মধ্য দিয়া বর্ত্তমান সাহিত্যের বিভ্রান্তির কতকগুলি কারণ দেখিতে পাই, তাহা সংক্ষেপে এই—পণ্যের অপরিমিত প্রসারে পৃথিবীব্যাপী একটা ব্যবসায়িক বুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছে ও দিনে দিনেই ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাই, সাহিত্যও 'বিজ্‌নেস' হইয়া উঠিয়াছে, উহা আর্ট না থাকিয়া ক্রাফ্‌ট বা ইন্‌ডাষ্ট্রিতে পরিণত হইতেছে, এই জিনিসটিকেই ডাক্তার গ্রেন্‌ভিল বার্কার তাহার 'ইংলিশ অ্যাসোসিয়েশানে'র বক্তৃতায় বলিয়াছেন "পালিশ করা বর্ব্বরতা" (veneered barbarism)। দ্বিতীয়ত, সাহিত্যে স্বরাজ্য নাই, স্বাধীনতা নাই—নানারূপ রাষ্ট্রমতের জবরদস্তিতে লেখকের মনের আকাশ ঢাকা পড়িতেছে। মিস্টার হার্ব্বার্ট রীড এই প্রভুত্বপরায়ণতা বা ইডিয়লজিকে, ফাশিস্ত বা কম্যুনিস্ট দাবিকেই সাহিত্যের অবনতির বড় কারণ বলিয়া মনে করিয়াছেন। মুখ্যত এই কারণগুলি হইতেই আরও কয়েকটি কারণ উদ্ভূত হইয়াছে বা উহাদের সঙ্গে জড়াইয়া আছে—যেমন বর্ত্তমান সময়ে রাষ্ট্রিক আথিক ও বৈজ্ঞানিক পরিবর্ত্তন এত দ্রুত সাধিত হইতেছে যে, উহাতে খাঁটি সাহিত্যের অপেক্ষা অন্যরূপ উত্তেজক বা আমোদদায়ক জিনিসের চাহিদা বাড়িয়াছে—সিনেমা, বেতারবার্ত্তা এই ভাবেই সাহিত্যকে হটাইয়া মানুষের মন দখল করিতেছে। আর তাই, সাধারণের মধ্যে লেখা-পড়া যেরূপ ছড়াইয়াছে তাহাদের রুচির তেমন উন্নতি ঘটে নাই। অথচ, ইহারাই এখন সাহিত্যিকের অন্নদাতা। আগেকার দিনে সাহিত্যের সহায়ক ছিলেন দুই চারিজন রাজা-রাজড়া; তারপর দশ বিশজন অভিজাত মুরুব্বি; তারও পরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পাঠকসমাজ। তাঁহাদের রুচি ছিল; কিন্তু এখনকার দিনে সাহিত্যিক একদিকে যেমন কাহারও পারিষদ নন, কৃপার প্রার্থী নন, তেমনই রুচির

কদরও আর পাইবার আশা করেন না। এই যুগে কি আর ড্রাইডেনের প্রবন্ধাবলী, ডাক্তার জন্‌সনের আলাপ-আলোচনা কিম্বা কোলরিজের বক্তৃতাদি শুনিবার মত তেমন রুচিবান্‌ আগ্রহশীল শ্রোতৃমণ্ডলী লাভ করা যাইত? সাহিত্য,—রস-সাহিত্য ও রসবিচার—এযুগের লেখক বলিতে পারেন, 'শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ'।

এই লক্ষণটিই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লক্ষণ—মানুষের অক্ষরজ্ঞান বাড়িতেছে, কিন্তু রুচিবোধ পরিচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা নাই। রুচি-পরিমার্জ্জনা শ্রমসাধ্য ব্যাপার। শ্রম কমানোই এই যুগের বিশেষ সাধনা—মানসিক শ্রমই বা কমাইবে না কেন? ব্যবসায়ী বুদ্ধি সেই প্রয়াস-পরিশ্রমটুকুও ফাঁকি দিবার মত যন্ত্র মানুষের জন্য বাহির করিয়া দিয়াছে।—অবসর-বিনোদন এখানে বিনা আয়াসেই করা যায়—সিনেমা, রেডিয়ো-ই তাই। আমোদ পাইবার জন্য সেখানে দর্শক বা শ্রোতার বিন্দুমাত্রও যত্ন করিতে হয় না—ল-সা-গু করা রুচির জন্যই ঐসব আয়োজন। কিন্তু সাহিত্য চায় গরিষ্ঠ রুচি, সাহিত্য চায় পাঠকের পক্ষেও মনঃসংযোগ, আত্মিক যোগস্থাপনা। এ যুগ চিত্তবিনোদনের যুগ, অথচ সাহিত্যের লক্ষ্য চিত্তের আনন্দ।

তাই, বামপন্থী গ্রন্থকারসমাজ বেশ সদর্পেই বলিয়াছেন—"সাহিত্য মরিয়াছে, জনসমাজ আর সাহিত্যে আগ্রহ (interest) বোধ করে না, করিবেও না।" কিন্তু যাহাতে জনসমাজের আগ্রহ নাই, তাহা কি বাঁচিবারও অযোগ্য? দক্ষিণপন্থী লেখকের দল নিশ্চয়ই উহাতে গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিবেন—না কিছুতেই না। বরং জনসমাজেরই বাঁচিতে হইবে মুষ্টিমেয় তাহার নায়কের ইঙ্গিতে, অবশ্য লেখকসমাজকেও মানিতে হইবে সেই সর্ব্বনিয়ন্তারই নির্দ্দেশ। এককালে লেখকসমাজ ফ্রেডারিক দি গ্রেট কি ক্যাথারিন দি গ্রেটের মুখাপেক্ষী ছিলেন বটে, কিন্তু সেখানেও এত আত্মবিক্রয় করিতে হইত না। তাহা ছাড়া—এ যুগের সর্ব্বনিয়ন্তাদের রসবোধ বা রুচি কি দরের তাহা বলা বিপজ্জনক, তবে বলা নিষ্প্রয়োজনও।

৪

বুদ্ধি যে আজ রূপোপজীবিনী, তাহার কারণ আমরা প্রথমেই দেখিয়াছি, আজিকার সভ্যতা পণ্যোপজীবিনী। এই পণ্য-সমৃদ্ধ সভ্যতার ভিতরে ভিতরে যে পচন ধরিয়াছে তাহা জীবনে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে, তাহাই আবার জীবনের রসরূপেও প্রতিফলিত হইয়াছে—তাই, সাহিত্যিক সমাজে এত বিরোধ ও বিকৃতি, এত আত্মাবমাননা ও আত্মাস্বীকৃতি, এত দুর্ভাবনা ও নৈরাশ্য। স্টর্ম জেমিসন ইহারই লক্ষণ দেখিয়াছেন স্বয়ং ভার্জিনিয়া উল্‌ফের শেষ উপন্যাস 'দি ইয়ার্স'-এ। একটা প্রাণহীনতা, একটা অসত্যতা ইহার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে, মিসেস উল্‌ফের লেখা উপন্যাসেরও এই দশা! কিন্তু ইহার কারণ—এই উপন্যাসের চরিত্র-উপাদান নিষ্প্রাণ, সত্তাহীন, অন্তঃসার-শূন্য। জেম্‌স্‌ জয়েসের 'ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস' নামে যে উপন্যাস লেখা এখনও চলিতেছে, তাহাতে যে কথা ও শব্দের নূতন প্যাটার্ন বোনাই আসল কথা; বিষয়বস্তুর মহত্ব নয়, রূপসৃষ্টিও নয়, শুধু কৌশলই বড়—ইহাও এই অসার্থকতারই আর এক প্রমাণ। অল্‌ডাস হাক্‌সলি বুদ্ধির আতসবাজিতে বিমুগ্ধ হইয়া এখন তাহার বিমূঢ়তার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন—নূতন শান্তিবাদিতা প্রচার করিয়া, নিকোলাস বীভার কি নূতন ফাশিস্তবাদেরই আশ্রয় খুঁজিতেছেন?—এই তো সমসাময়িক ইংরেজী উপন্যাসের দিক্‌পালগণের হাল। অবশ্য, অপেক্ষাকৃত নূতন যুগের যাঁহারা আবির্ভূত হইতেছেন, ডে লুই কি স্টিফেন স্পেণ্ডার—তাঁহারা তো সদর্পেই নিজেদের মতবাদের ঝাণ্ডা উচ্চ করিয়া ধরিয়াছেন। অন্যান্য দেশে রাষ্ট্রীয় সর্ব্বাধ্যক্ষতা এতই প্রবল যে, সেখানকার সাহিত্যে কোন স্বাধীনতা বা ব্যক্তিসত্তার অকুণ্ঠপ্রকাশ দেখিবার আশা করাই বৃথা। সাহিত্য প্রায় প্রচারপত্র।

যে সভ্যতা বা যে সমাজ ছিন্নমূল পাদপের মত শুকাইয়া উঠিয়াছে, তাহার জীবনে আর সজীবতা আশা করা যায় না। তাই, এই সমসাময়িক সাহিত্যেও শুধুই কোলাহল বাড়িতেছে। কিন্তু সত্যকার কোন একটি বিশেষ বাণী ফুটিয়া উঠিতেছে না। মূল নাই বলিয়াই এই সাহিত্য মূল্যহীন।

এইবার নানা তত্ত্ব ও বাদ-বিশারদগণ অগ্রসর হইয়া বলিবেন—বাণী বলিতেছ কাহাকে? কাহাকে বলিতেছ জীবন ধর্ম্মের মূল? এমন কোন চিরন্তন মাপকাঠির অস্তিত্ব আছে কি না তাহাই সন্দেহ। মানুষের মন তো,

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, তাহার পরিবেশের চাপে প্রতি-নিয়ত নূতন হইয়া উঠিতেছে, নিজ পরিবেশকে ভাঙিয়া গড়িতে গড়িতে সে নিজেই লইতেছে নূতন রূপ, পাইতেছে নূতন গুণ ও বিস্তৃতির সন্ধান। মৌলিক তাহার কি? মূল তাহার কোথায়? কোন্ বিশেষ গুণাগুণকে আমরা **fundamentals of life** বলিয়া গ্রহণ করিব?

তর্কের শেষ যেখানে, সেখানে সাহিত্য বস্তু-সর্ব্বস্ব, কল্পনার কোন অস্তিত্ব নাই, শুধুই তাহা মনে গাঁথা বস্তু-প্রতিলিপি, আর আর্ট মানেই কোন বিশেষ পারিপার্শ্বিকের, বিশেষ শ্রেণীর ও শ্রেণীস্বার্থের প্রকাশ। অতএব—

কিন্তু অনেককাল পর্য্যন্ত আমরা শিল্প ও সাহিত্যের অন্য সূত্রই আওড়াইয়া আসিয়াছি, শিখিয়া আসিয়াছি, বিশ্বাসও করিয়া আসিয়াছি। সত্যকারের আর্টকে আমরা, শ্রেণী তো তুচ্ছ, দেশকালাতীত বলিয়াই জানি। খানিকটা অবশ্য আয়োজন আবশ্যক হয়—এ যুগের পাঠক তাহাই করিতে অস্বীকৃত—কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর সেক্স্পীয়র ও বিংশ শতাব্দীর প্রুস্ত আমরা সমভাবে পড়িয়া রসোপভোগ করি, হোমরের মহাকাব্য ও আরব্য উপন্যাসের কুটিল তীব্র রজনী—দুইই আমাদের নিকট সমাদর লাভ করে। শুধু বিশেষ শ্রেণীর বা বিশেষ পরিবেশেরই সৃষ্টি হইলে ইহার রস আজ আমাদের নিকট নীরস হইয়া উঠিত না কি? ইহার উত্তরে হয়তো বস্তুতান্ত্রিক বলিবেন—সবই শ্রেণী-বৈষম্য-পীড়িত সমাজ হইতে সমুদ্ভূত, তাই আজিকার শ্রেণী-ক্লিষ্ট পাঠকের বোধশক্তিতে হোমর বা কালিদাস দুর্গম নয়। কিন্তু যে দিন শ্রেণী থাকিবে না, সে দিন এ সাহিত্যও বিলুপ্ত হইবে। এখনকার সাহিত্য-সঙ্কট তাহারই পূর্ব্বাভাষ। সমাজ-সঙ্কটে দুনিয়া বিভ্রান্ত বলিয়াই সাহিত্যেও সঙ্কট—অরাজকতা।

সাহিত্যের রসবোধের উৎস কোথায়—হয়তো তাহা দুজ্ঞেয়। হয়তো ভাবীকালের বিজ্ঞান বিশেষ গ্রন্থিরস নিঃসরণের উপরই এই আশ্চর্য্য সৃষ্টিশক্তির দায়িত্ব আরোপ করিবে। কিন্তু সমসাময়িক সাহিত্যের দিকে তাকাইতে গিয়া যে কথাটি ভূমিকাতেই মনে হয় তাহা এই—বহুল উৎপাদনে, যান্ত্রিকতার প্রসারে আজ সাহিত্যেও সঙ্কট উপস্থিত।



পরিবর্ত্তন

"বনফুল"

১

খেজুরে গুড়ের সন্দেশ খাইয়া সমস্ত মুখটা তিক্ত হইয়া গেল। অথচ সন্দেশগুলা ভালই ছিল।

গোড়া হইতেই শুনুন তাহা হইলে।

*　　*　　*　　*

হরিমোহন বড়লোক ছিল। টাকার অভাব ছিল না। সুতরাং বেঘোরে বিনা চিকিৎসায় মারা যাইবে না, ইহা জানিতাম। অর্থদ্বারা যতটা চিকিৎসা ক্রয় করা সম্ভব তাহা ক্রয় করা হইবে, হইতেও ছিল। দুইজন কৃতবিদ্য নামকরা ডাক্তার প্রত্যহ দুইবার করিয়া আসিয়া হরিমোহনের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। দুইজন নার্স আসিয়া হয়তো তাহার শুশ্রূষার ভারও লইতেন, কিন্তু সরমা—হরিমোহনের স্ত্রী, তাহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি নিজেই সেবা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সেবা-নিপুণতা দেখিয়া ডাক্তার দুইজনও স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, সেবার কোন ত্রুটি হইতেছে না। বেতনভোগী নার্স এতটা করিত কিনা সন্দেহ।

রোগটি কিন্তু সংঘাতিক,—যক্ষ্মা। মুখ দিয়া রক্ত উঠিয়াছে, প্রত্যহ জ্বর হইতেছে। কফ পরীক্ষা করানো হইয়াছিল—যক্ষার জীবাণু পাওয়া গিয়াছে। তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ ছিল না। পয়সার জোরে সুচিকিৎসা হয়তো হইবে, কিন্তু সুফল ফলিবে বলিয়া মনে হয় নাই। বরং তাহার জীবননাট্যের যবনিকা-পতন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে, এই কথাই বারম্বার মনে হইতেছিল।

হরিমোহন আমার বাল্যবন্ধু। ক্লাসে উভয়ে পাশাপাশি বসিতাম এবং সেইসূত্রে যে ঘনিষ্ঠতাটুকু বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল, কেন জানি না, এখনও তাহা অটুট আছে। না থাকিবারই কথা। ধনী ও দরিদ্রের সখ্যতা বড় ভঙ্গুর। আমাদের কপালে কেন যে তাহা টিকিয়া গিয়াছিল, বলিতে পারি না। যাই হোক, রোজ তাহার খবরটা লইতে যাইতাম। আরও বিশেষ করিয়া যাইতে হইত, এই জন্য যে অর্থ এবং পত্নী ব্যতীত হরিমোহনের আপন বলিতে সংসারে আর কেহ ছিল না। গুড় থাকিলে অবশ্য পিপীলিকার অসদ্ভাব হয় না। উভয়লিঙ্গের বহু পিপীলিকা আনাগোনাও করিতেছিল, কিন্তু যেই ইহা নিঃসংশয়রূপে জানা গেল যে, হরিমোহনের ব্যাধিটি যক্ষ্মা, অমনই পিপীলিকার দল ক্রমশ অন্তর্দ্ধান করিলেন। সম্ভবত অন্য গুড়ের গুদামের সন্ধানে গেলেন। যাক সে কথা। মোটের উপর আমি একা পড়িলাম। সরমার সহিত বন্ধুপত্নী হিসাবে যে লৌকিক আলাপটুকু ছিল, এই সূত্রে তাহা গাঢ়তর হইতে লাগিল। এখন মনে হইতেছে, না হইলেই ভাল ছিল।

২

হরিমোহন বসিয়া কাসিতেছিল।

যক্ষ্মার বুক-কাটা কাসি।

কাসিটা থামিলে বলিল, থ্রোটটা বড্ড খারাপ হয়েছে। ওষুধ লাগিয়ে লাগিয়ে আর গার্গল ক'রে ক'রে তো হয়রান হয়ে উঠলাম। কাসিটা কিছুতে কমছে না কেন বল্ দেখি!

বলিলাম, কমবে কমবে—এত ঘাবড়াস কেন?

—ঘাবড়বার ছেলে আমি নই! তবে কি জানিস ক্রমাগত কাসাটা বিরক্তিকর।—দুইটা কথা বলিতে না বলিতেই আবার কাসিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপচাপ।

হরিমোহন বলিল, স্পিউটাম একজামিন ক'রে কিছুই পাওয়া যায় নি, শুনেছিস তো? যাবে না, তা আগেই জানতাম। একটা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার অ্যাটাক হয়েছে আর কি!

এক পেয়ালা দুধ হাতে করিয়া সরমা প্রবেশ করিল।

কাসি শেষ করিয়া হরিমোহন বলিল, ও কি আবার?

—দুধ।

—এখন আবার দুধ কেন?

—ডাক্তারেরা ব'লে গেছেন দুধ দিতে যে।

—কি মুস্কিল, একটু বিশ্রাম দাও আমাকে তোমরা। এই তো—। আবার কাসি সুরু হইল।

সামলাইয়া সে বলিতে লাগিল, এই তো কিছুক্ষণ আগে ওষুধ খেলাম, তারপর গার্গল, তারপর স্প্রে, তারপর ফলের রস—আবার এখুনই দুধ!

—ডাক্তাররা বলেছেন, ভাল ক'রে খাওয়া দাওয়া করলেই শিগগির সেরে উঠবে। বেশি দুধ তো আনি নি! নাও।—সরমা পেয়ালাটা সম্মুখে ধরিল।

দুই চুমুক খাইয়া হরিমোহন বলিল, আর না, দোহাই তোমার, জায়গা নেই আর পেটে—

—না না, খেয়ে নাও এটুকু। বলুন না আপনি একটু!

আমিও অনুরোধ করিলাম।

—আচ্ছা, আর এক চুমুক খাচ্ছি তোর অনুরোধে।

আধ পেয়ালার বেশি সে কিছুতেই খাইল না।

সরমা পেয়ালাটা লইয়া পাশের ঘরে ঢুকিল। আমিও উঠিয়া পড়িলাম। রাত হইয়াছিল। সরমাকে একটা কথা বলিয়া যাইতে হইবে। ডাক্তারেরা বলিয়াছেন, টেম্পারেচারের কথাটা হরিমোহনকে যেন জানানো না হয়। হরিমোহনকে বলিলাম, নটা বেজে গেছে। আজ উঠি ভাই। কাল আবার আসব।

—আচ্ছা।

হরিমোহন পাশ ফিরিয়া শুইল।

৩

পাশের ঘরে আসিয়া ঢুকিলাম। আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে চক্ষুস্থির হইয়া গেল। দেখিলাম, সরমা হরিমোহনের উচ্ছিষ্ট দুধটা পান করিতেছে। বলিলাম, এ কি করছেন আপনি?

ধরা পড়িয়া গিয়া সরমা একটু লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। আরক্ত মুখে বলিল, ও কিছু নয়।

তারপর সহসা আত্মসম্বরণ করিয়া স্থিরকণ্ঠে বলিল, দেখে যখন ফেলেছেন, উপায় নেই। কিন্তু বলবেন না কাউকে।

—তা না হয় বলব না। কিন্তু এঁটো দুধটা খাচ্ছেন কেন?

একটু হাসিয়া সরমা বলিল, স্বামীর এঁটো খেলে দোষ কি?

দোষ কি!

যক্ষ্মার সংক্রামকতা সম্বন্ধে আমার যতটুকু জ্ঞান ছিল বিতরণ করিলাম। সরমা আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিল, তাহার পর সহসা প্রদীপ্ত এক জোড়া চোখ আমার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া বলিল, সবই তো বুঝলাম। কিন্তু একটা কথা বুঝিয়ে দিতে পারেন আমাকে? উনি যদি না বাঁচেন আমার বেঁচে লাভ আছে কোনও? ছেলে-মেয়েও একটা যদি থাকত তা হ'লেও বা কথা ছিল! অনেক হিতকথা অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাকে বলিলাম। আনতমস্তকে হাসিমুখে নীরবে সে সমস্ত শুনিয়া গেল। প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিল না।

৪

হরিমোহনের অসুখ ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। তাহার যে যক্ষ্মা হইয়াছে, এ সংবাদ তাহার নিকট তো আর চাপা রহিল না। সে জানিতে পারিল এবং ব্যস্ত হইয়া উঠিল। যে দুই জন ডাক্তার দেখিতেছিলেন, তাঁহারাও ব্যস্ত হইলেন এবং আরও দুই জন ডাক্তারকে পরামর্শার্থে ডাকিলেন। চারি জনে মিলিয়া ঠিক হইল যে, কয়েকটি এক্সরে প্লেট লওয়া দরকার। তাহাও যথাসময়ে হইল। এক্সরে করিয়া দেখা গেল একটি ফুসফুসই আক্রান্ত হইয়াছে, অপরটি একেবারে নির্দ্দোষ আছে। স্যানাটোরিয়মে গিয়া অস্ত্র-চিকিৎসা করাইলে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা।

অর্থের অভাব ছিল না। সুতরাং অবিলম্বে হরিমোহন ধরমপুর চলিয়া গেল। সুরমাও সঙ্গে গেল।

৫

ইহার পর অনেক দিন হরিমোহনের খবর পাই নাই। কিছুদিন চিঠিপত্র লেখালেখি হইয়াছিল, তাহাও কালক্রমে থামিয়া গেল। হরিমোহন পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ভাল আছে, ইহাই শুনিয়াছিলাম। তাহার পর হরিমোহন সম্বন্ধে কৌতূহলও ক্রমশ কমিয়া গেল, হরিমোহনও বিশেষ খবর লইল না। হঠাৎ একদিন খবর পাইলাম হরিমোহন সুইট্জারল্যাণ্ড যাত্রা করিয়াছে। কেন, কি বৃত্তান্ত, কিছুই জানিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, টাকা আছে যাইবে না কেন।

নিয়মিতভাবে কেরানিগিরি করিতে লাগিলাম। আদার ব্যাপারী আমি, জাহাজের খবর লইবার অধিকার আমার নাই, সুযোগও ছিল না। হরিমোহন কোন ঠিকানা দিয়া যায় নাই।

৬

দশ বৎসর অতীত হইয়াছে।

হরিমোহনের কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি, এমন সময় হঠাৎ একদিন তাহার পত্র পাইলাম। দুইছত্র চিঠি।—

ভাই নরেশ,

আগামী মঙ্গলবার কলিকাতায় পেঁাছিব। পার তো দেখা করিও।

হরিমোহন

দেখিলাম চিঠিখানা লিখিয়াছে দেশের ঠিকানা হইতে। কবে দেশে আসিল সে! কিছুই তো জানি না।

* * * * *

মঙ্গলবার দিন সন্ধ্যার পর আপিস ফেরত তাহার বাসায় গেলাম। সে বাড়িতেই ছিল। খুব ঘটা করিয়া আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। হরিমোহনের চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। সুস্থ সবল লম্বা চওড়া চেহারা! কে বলিবে ইহার যক্ষ্মা হইয়াছিল!

বলিলাম, বেশ সেরে গেছিস তো ?

—হ্যাঁ, কমপ্লিট্‌লি!

যে যে ডাক্তারের চিকিৎসা-নৈপুণ্যে সে নিরাময় হইয়াছে, তাহাদের গল্প করিতে করিতে সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

—সুইট্‌জারল্যাণ্ড গেছলি না কি ?

—হ্যাঁ।

—কেমন লাগল ?

—অতি চমৎকার! কেতাবে যা পড়া যায় তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি সুন্দর। চল চল, ওপরে চল।

উপরে গেলাম। উপরে গিয়াই হরিমোহন চীৎকার জুড়িয়া দিল, সরমা কই, নরেশ এসেছে—চা জলখাবার আন—ব'স ব'স। দামী সোফাটার উপর একটু সন্তর্পণেই বসিলাম।

হরিমোহন বলিতে লাগিল, তারপর তোর খবর কি বল! তুই তো অনেক বদলে গেছিস দেখছি। কানের কাছের চুলগুলো যে বেবাক পেকে গেছে রে! এরই মধ্যে বুড়িয়ে গেলি! ওদেশে পঞ্চাশ বছরে যৌবন সুরু হয়—বুঝলি ?

'সুরু' কথাটার উপর সে জোর দিল।

আমার যে প্রত্যহ একটু একটু করিয়া জ্বর হইতেছে এবং ডাক্তারে আমারও টি. বি. সন্দেহ করিতেছে, সে কথা আর তাহাকে বলিলাম না, বলিয়া লাভ নাই। কেবল বলিলাম, ওদেশে

এদেশে ঢের তফাৎ রে ভাই! তা ছাড়া আর একটা কথা ভুলে যাস কেন? সেই বিশ বছর বয়স থেকে এক নাগাড়ে কেরানিগিরি ক'রে চলেছি—দম নেবার অবসর নেই।

—তাতে কি হয়েছে? খাটলে কি মানুষ রোগা হয়?—বলিয়া হরিমোহন হা হা হাসিয়া উঠিল। ঘর কাঁপানো হাসি হরিমোহনের বিশেষত্ব। হাসির জোর কিছুমাত্র কম হয় নাই, বরং বাড়িয়াছে। তাহার স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য ও মনের তারুণ্য দেখিয়া হিংসা হইতে লাগিল। পঁচিশ বছরের পর তাহার বয়স যেন আর বাড়ে নাই।

সরমা আসিয়া প্রবেশ করিল। হাতে জলখাবারের প্লেট।

সরমাকে দেখিয়া আরও বিস্মিত হইয়া গেলাম। দশ বৎসরে মানুষের এত পরিবর্ত্তন হইতে পারে!

আমার ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টি তাহার মুখের উপর নিবদ্ধ হওয়াতেই সম্ভবত সরমা একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

—চা-টা নিয়ে আসি!

জলখাবারের প্লেটটা সামনের তেপায়াটার উপর নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। কে এ!

হরিমোহনকে বলিলাম, সরমাকে ত একদম চেনা যায় না! এই দশ বৎসরে ভীষণ বদলে গেছে দেখছি।

হরিমোহন স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ আমার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, হ্যাঁ, বদলে গেছে। তুই যাকে দেখেছিলি এ সে নয়—এ আর এক সরমা। সে সরমা বহুকাল আগেই মারা গেছে। তারও টি. বি. হয়েছিল। দুটো লাংসেই! কিছুক্ষণ থামিয়া পুনরায় বলিল, শেষটা ইনটেস্‌টাইনও খারাপ হয়ে গেল। অনেক খরচপত্তর করলাম, কিছুতেই বাঁচল না।

উভয়েই কিছুক্ষণ চুপ চাপ। হরিমোহনই আবার কথা বলিল।

—থাকতে পারলাম না—দ্বিতীয় বার বিয়ে করতে হ'ল। খুঁজে খুঁজে সরমা নামেরই আর একজনকে বার করলাম শেষে। ও নামটা মুখস্থ হয়ে গেছে। যে লোক গেছে সে আর ফিরবে না জানি, তবু নামটার—

থামিয়া গেল। সরমা দ্বারপথে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিতেছে। হরিমোহনের দিকে নানারূপ খাদ্যপূর্ণ এক প্লেট খাবার আগাইয়া দিতেই হরিমোহন বলিল, অত আমি খাব না। কত দিয়েছ আমাকে!

শুনিলাম সরমা বলিতেছে, ডাক্তারে তোমাকে খেতে বলেছে ভাল ক'রে। আজকাল তুমি খাচ্ছ না মোটে। একটু ব'লে যান তো আপনার বন্ধুকে।

হরিমোহন বলিল, নরেশের জন্যে খেজুরে গুড়ের সন্দেশ আনিয়েছ তো? ভারি ভালবাসে ও খেজুরে গুড়ের সন্দেশ খেতে!

—হ্যাঁ, এই যে আনিয়েছি।

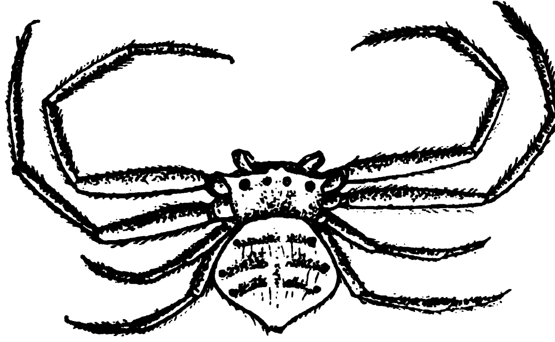
হাসিয়া এক প্লেট খেজুরে গুড়ের সন্দেশ সে আমার দিকে আগাইয়া দিল।

বাংলা দেশের মাকড়সা

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(বসু বিজ্ঞান মন্দির)

মাকড়সা জাতীয় জীবকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় 'অ্যারাক্‌নিডা' বলে। 'অ্যারাক্‌নিডা' শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে গ্রীক-পুরাণে একটি সুন্দর গল্প বর্ণিত আছে। গ্রীস দেশে অতি প্রাচীন কালে এক দরিদ্র গৃহস্থের দিব্যি ফুটফুটে একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটির নাম অ্যারাক্নি। সূচীশিল্পে অ্যারাক্নি এমনই দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিল যে, দেশ-বিদেশের পদস্থ লোকেরা তাহার শিল্পকার্য্য অতি উচ্চমূল্যে ক্রয় করিত। এত অল্প বয়সে বিপুল খ্যাতি লাভের ফলে অ্যারাক্নি বড়ই গর্ব্বিতা হইয়া উঠিল। সে গর্ব্বভরে সকলের নিকট বলিয়া বেড়াইত, আমি গরিবের ঘরের একটি তুচ্ছ মেয়ে হ'তে পারি, কিন্তু আমার কাজের কাছে স্বর্গের মিনার্ভা দেবীও এগুতে পারেন না। কথাটা মিনার্ভা দেবীর কানে উঠিল। তিনি এক বৃদ্ধা রমণীর বেশ ধারণ করিলেন এবং লাঠি ভর করিয়া অ্যারাক্নিদের বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। অ্যারাক্নি তখন সেলাই করিতে ব্যস্ত আর বহুলোক ঘিরিয়া বসিয়া তাহার কাজ দেখিতেছে। দেবতাদের বিরুদ্ধে এরূপ গর্ব্বিত উক্তি করিতে নিষেধ করিয়া বৃদ্ধা রমণী অ্যারাক্নিকে নানা প্রকারে উপদেশ দিলেন। কিন্তু অ্যারাক্নি কোন কথাই কানে তুলিল না। তখন বৃদ্ধারূপী মিনার্ভা দেবী তাহাকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করিলেন। মিনার্ভা দেবীই প্রথমে একখানা খালি তাঁতের কাছে দাঁড়াইয়া কাজ আরম্ভ করিলেন। কাপড়ের উপর তিনি বিবিধ চিত্র ফুটাইয়া তুলিলেন; তাহার বিষয়বস্তু ছিল—অদৃষ্টের পরিহাস, দেবতাদের সহিত মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলাফল। তারপর অ্যারাক্নি তাঁত ধরিল, সে আঁকিল মানুষের দক্ষতা বিষয়ক বিবিধ চিত্র। অ্যারাক্নির কাজই যে উৎকৃষ্টতর হইয়াছে এ কথা অবশেষে মিনার্ভা দেবীকে স্বীকার করিতে হইল। কিন্তু এই পরাজয়ে তাঁহার ক্রোধ উদ্রিক্ত হইয়া উঠিল এবং ক্রোধবশে মাকু দিয়া অ্যারাক্নির মাথায় তিনবার আঘাত করিলেন। এ অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া অ্যারাক্নি আত্মহত্যা করিবার মানসে, সম্মুখে লম্বিত এক-গাছি রজ্জুর প্রান্তভাগ গলায় জড়াইয়া ঝুলিয়া পড়িল। মিনার্ভা দেবী কিন্তু তাহাকে মরিতে দিলেন না—খপ করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন এবং অভিশাপ দিলেন যে, তুই যেমন দুষ্টু মেয়ে, দেবতাকে অপমান করিতে গিয়াছিলি, তার ফলে এখন মাকড়সা হইয়া ঝুলিয়া থাক। তোর বংশধরগণকেও আবহমান-কাল এই ভাবেই মাকড়সা হইয়া ঝুলিতে হইবে। দেখিতে দেখিতে অ্যারাক্নির রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল এবং সে মাকড়সার আকৃতি পরিগ্রহ করিল।



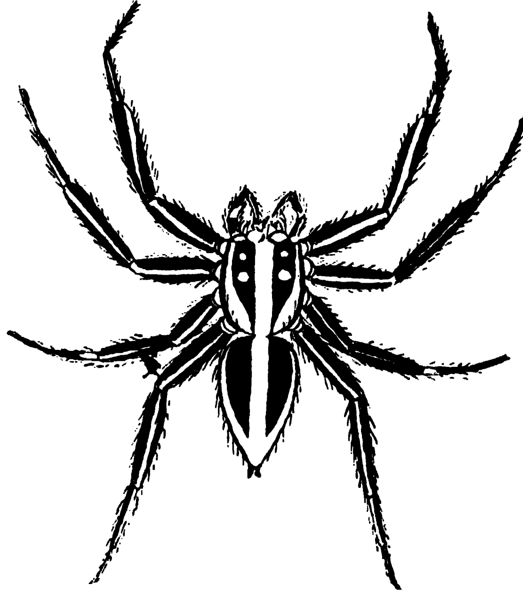
'মিচুসেনা ভাটিয়া' নামক কাঁকড়া-মাকড়সা। ইহারা শিকার ধরিবার জন্য ফুলের উপর নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকে

গল্পানুসারে অ্যারাক্নির বংশধরদের ঠিক অ্যারাক্নির মতই হইবার কথা; কিন্তু তাহাদের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত এত বৈচিত্র্য আত্মপ্রকাশ করিল কেমন করিয়া? অভিব্যক্তিবাদের আলোচনায় সে প্রশ্নের উত্তর মিলিতে পারে, কিন্তু এস্থলে তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে।

সমগ্র পৃথিবী তো দূরের কথা, ভারতবর্ষের কথা বাদ দিলেও একমাত্র বাংলা দেশেই যে কত বিভিন্ন জাতীয় বিচিত্র মাকড়সা দেখিতে পওয়া যায়, তাহার সঠিক হিসাব নিরূপণ করা দুষ্কর। এ পর্য্যন্ত যতদূর জানিতে

পারা গিয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটি বিভিন্ন জাতীয় মাকড়সার বিচিত্র আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রদান করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মাকড়সা সাধারণ কীটপতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত নহে। 'ইনসেক্ট' বা কীট বলিতে যাহাদিগকে বুঝি, তাহাদের শরীর মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত—মাথা, বুক ও পেট। তাহাদের বুকের সঙ্গে তিন জোড়া করিয়া পা সংলগ্ন থাকে। এতদ্ব্যতীত দুইটি করিয়া জটিল গঠনের চোখ ও একজোড়া শুঁড় থাকে। মাকড়সার কিন্তু মাথা ও বুক এক সঙ্গে জুড়িয়া গিয়াছে। কেবল-মাত্র পেটটি আলাদা। ইহাদের আটখানি পা, মুখের কাছে একজোড়া উপপদ ও চারজোড়া সরল গঠনের চোখ আছে। চোখের সংখ্যা আটটির বেশি হয় না, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ছয়টি বা আরও কম হইতে পারে। ইহাদের শ্বাসযন্ত্র পেটের নীচের দিকে বইয়ের পাতার মত ভাঁজ করা, ইহা ছাড়া প্রত্যেকেরই শরীরের প্রান্ত-ভাগে সূতা বুনিবার জন্য তিনজোড়া করিয়া উপাঙ্গ আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই উপাঙ্গের সংখ্যা আরও কম হইতে পারে, সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাদের দুইটি করিয়া পুং-জননযন্ত্র আছে, তাহাও আবার ঠিক মুখের কাছে। যন্ত্র দুইটি হাতের কাজ ও প্রজনন এই উভয়বিধ কার্য্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহারা খোলস বদলাইতে বদলাইতে ক্রমশ পরিণতি লাভ করে। কীটপতঙ্গ-শ্রেণীভুক্ত না হইলে ইহারা তবে কোন্ জাতীয় প্রাণী? ইহার উত্তরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, মাকড়সা মাকড়সা-জাতীয় প্রাণী ছাড়া আর কিছুই নহে



পুরুষ মেলানগস্থাথাস মাকড়সা

বাংলা দেশের মাকড়সাদের মধ্যে কতকগুলিকে দেখা যায়—যাহারা জাল বুনিয়া শিকার ধরে, কয়েক জাতীয় মাকড়সা আবার শিকারের অন্বেষণে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। ইহারা শিকার ধরিবার জন্য জাল বোনে না। এই শ্রেণীর মাকড়সাদের মধ্যে কতকগুলিকে দেখা যায়—জলচর। কাঁকড়ার মত কতকটা পাশাপাশি চলে—এই ধরণের বহু জাতীয় মাকড়সা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার রাত্রিচর। রাত্রিবেলায় শিকারের অন্বেষণে বহির্গত হয়। এই শ্রেণীর দিনচর মাকড়সাদের মধ্যে কয়েক জাতীয় মাকড়সা আবার ফল ফুল লতা পাতার সঙ্গে দেহের রং মিলাইয়া অথবা অনুকরণ করিয়া আত্ম-গোপনে অদ্ভুত দক্ষতা প্রদর্শন করে। কোন কোন জাতীয় মাকড়সা আছে, তাহারা মাটি দিয়া বাসা নির্ম্মাণ করে অথবা গর্ত্তের নীচে বাস করে। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি মাকড়সা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা সর্ব্বদাই পিপীলিকার অনুকরণ করিয়া চলে এবং দেহের আকারও তাহাদের হুবহু পিঁপড়ার মত। পিঁপড়ার মত সমাজবদ্ধ ভাবে বাস করে, অথচ তাহাদিগকে অনুকরণ করে না—এই জাতীয় কয়েক প্রকার মাকড়সাও এ দেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে জালবোনা-মাকড়সাদের মধ্যে 'আর্জিওপ', 'নেফিলা', 'এপিরা', 'টেট্রাগ্নাথা' প্রভৃতি বিভিন্ন গণভুক্ত কয়েক রকমের মাকড়সা প্রায়ই নজরে পড়িয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে 'আর্জিওপ' ও 'নেফিলা'ই আকারে খুব বড় হইয়া থাকে। 'আর্জিওপ' মাকড়সার পেটের আকৃতি ঈষৎ চেপ্টা এবং গোলাকার। তাহাদের গায়ে রং বেরঙের রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। বনে জঙ্গলে সাদা সূতার প্রকাণ্ড জাল পাতিয়া রাখে। দুই রকমের বৃহদাকার 'নেফিলা' দেখা যায়। কতকগুলির গায়ের রং মিশ কালো, আবার কতকগুলির গায়ে সোনালী রঙের

ডোরা কাটা। ইহাদের আকৃতি কতকটা বড় বড় লঙ্কার মত। উঁচু গাছের ডাল হইতে ইহারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হলদে সুতার জাল পাতিয়া তাহার মধ্যস্থলে বসিয়া থাকে। 'এপিরা' মাকড়সা দেখিতে গোলাকার ও মধ্যমাকৃতি। ইহাদের গায়ের রং ধূসর বা কালো। পূর্ব্বোক্ত মাকড়সাগুলি সকলেই খাড়াভাবে জাল পাতে। কিন্তু 'টেট্রাগ্নাথা' গণভুক্ত মাকড়সারা জলের উপরে জলের সঙ্গে সমান্তরাল করিয়া খুব মোটা মোটা ফাঁকের জাল বোনে। ইহারা দেখিতে কতকটা কাঠি-ফড়িঙের মত। গায়ের রং খয়েরী বা বাদামী। চারিটি পা সামনের দিকে এবং চারিটি পা পিছনের দিকে লম্বালম্বিভাবে এক-ত্রিত করিয়া ঠিক একটি শুষ্ক কাঠির মত জালের গায়ে লাগিয়া থাকে।

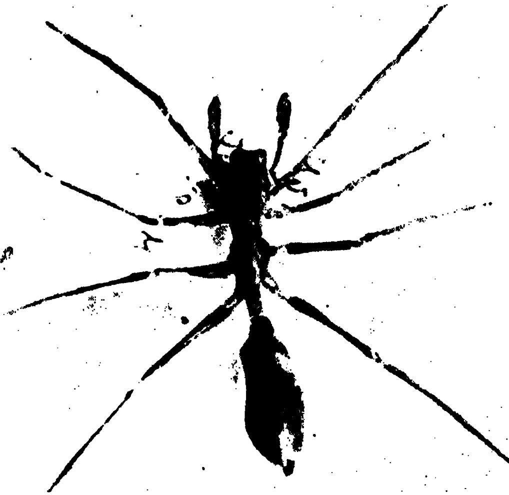
জাল পত্তন করিবার প্রারম্ভে এই মাকড়সারা একটি পাতার উপর বসিয়া শরীরের পশ্চাদ্ভাগ উঁচু করিয়া রাখে এবং ক্রমাগত বাতাসের মধ্যে সুতা ছাড়িতে থাকে। দশ পনর হাত লম্বা সুতা বাহির হইবার পর ইহার প্রান্তভাগ হাওয়ায় উড়িতে উড়িতে কোন কিছুতে ঠেকিয়া যায়। তখন মাকড়সা সুতাটিকে গুটাইতে গুটাইতে বেশ টান করিয়া পাতার সঙ্গে আটকাইয়া দেয়। তারপর সেই সুতা ধরিয়া মধ্যস্থলে যায় এবং সেখানে নূতন সুতার প্রান্তভাগ জুড়িয়া নীচে ঝুলিয়া পড়ে। ঝুলিয়া পড়িবার সময় পিছনের এক পা দিয়া সুতাটাকে ধরিয়া ধরিয়া আস্তে আস্তে নীচে নামিতে থাকে। মধ্যপথে আসিয়া থামিয়া যায় এবং সেই অবস্থাতেই আবার বাতাসের মধ্যে চতুর্দ্দিকে সুতা ছাড়িতে থাকে। প্রায় মিনিট পাঁচ সাতেকের মধ্যেই ছাতার শলার মত জালের একটা কাঠামো গড়িয়া উঠে। তখন এক সমতলস্থিত টানাগুলি রাখিয়া বাকি এলো-মেলো টানাগুলি কাটিয়া দেয়, এবং প্রত্যেক টানার উপর ঘুরিয়া পিছনের পায়ের সাহায্যে বৃত্তাকারে জাল রচনা করে। প্রায় আধঘণ্টা সময়ের মধ্যেই একখানি জাল বুনিয়া শেষ করে। জাল বোনা হইয়া গেলে 'নেফিলা' ও 'আর্জিওপ' মাকড়সারা শিকার ধরিবার আশায় জালের মধ্যস্থলে বসিয়া থাকে। কিন্তু 'এপিরা' ও 'টেট্রাগ্নাথা' মাকড়সারা জালের টানা বাহিয়া এক কোণে আশ্রয় গ্রহণ করে; শিকার জালে পড়িলেই সুতার কম্পনে বুঝিয়া ছুটিয়া আসে এবং শিকারকে সুতায় জড়াইয়া পুঁটুলির মত করিয়া ফেলে। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ও পরেই ইহাদের শিকার ধরিবার প্রশস্ত সময়। এই সময়েই যথেষ্ট কীট-পতঙ্গ উড়িতে দেখা যায়। ইহারা সকলেই সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে জাল বুনিতে আরম্ভ করে। কোন কোন মাকড়সার জাল দুই তিন দিন পর্য্যন্ত থাকে আবার অনেকেই প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে পূর্ব্বে নূতন জাল বুনিয়া থাকে। 'নেফিলা'র জাল এত শক্ত যে, ছোট ছোট পাখীও ইহাতে আটকা পড়িয়া যাইতে পারে। টুনটুনি পাখীরা তাহাদের বাসার মুখ সেলাই করিবার জন্য এই জালের সুতা সংগ্রহ করিয়া থাকে। 'আর্জিওপ' মাকড়সাকে জালের সাহায্যে টিকটিকি ধরিয়া খাইতে দেখিয়াছি। আমরা সচরাচর যেসব মাকড়সা দেখিতে পাই, তাহাদের অধিকাংশই স্ত্রীজাতীয়। স্ত্রীজাতীয় মাকড়সারাই আকারে বড় হয়। উপরোক্ত মাকড়সাদের মধ্যে 'টেট্রাগ্নাথা' ছাড়া আর সকলেরই পুরুষগুলি এত ক্ষুদ্র হইয়া থাকে যে, সহজে দৃষ্টিগোচরই হয় না। জালের মধ্যেই থলি বুনিয়া স্ত্রী-মাকড়সারা ডিম পাড়ে। বাচ্চা বাহির হইয়া কয়েকদিন সেই থলির মধ্যেই কাটায়। তারপর চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাদের



স্ত্রী 'এপিরা' মাকড়সা

চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িবার কায়দা অদ্ভুত। বাচ্চাগুলিকে কোন স্থানে রাখিয়া দিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে তাহারা সকলেই তাহাদের শরীরের পশ্চাদ্ভাগ উঁচু করিয়া রহিয়াছে। পশ্চাদ্ভাগ উঁচু করিয়া তাহারা বাতাসের মধ্যে সুতা ছাড়ে, যদি কিছুতে আটকাইয়া গেল তবে সুতা গুটাইতে গুটাইতে সেই স্থানে উপস্থিত হয়। নচেৎ আরও সুতা ছাড়িতে থাকে। সুতার দৈর্ঘ্য যথেষ্ট বড় হইলে হাওয়ার টানে মাকড়সা বাচ্চাটি সমেত বাতাসে উড়িয়া যায়। এইভাবে হাওয়ায় ভাসিতে ভাসিতে সুতাটিকে ক্রমশ গুটাইয়া লইয়া প্যারাসুটের মত যে কোন স্থানে ইচ্ছামত অবতরণ করিতে পারে। যে কেহ ইচ্ছা করিলেই তাহাদের এইরূপ উড়িবার কৌশল প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

এতক্ষণ যেরূপ জালের কথা বলিলাম, ইহা ছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় মাকড়সারা অন্যান্য বিভিন্ন রকমের জাল তৈয়ারি করিয়া থাকে। কতকগুলি মাকড়সার জাল হয় পাতলা, কাগজের মত। এগুলি চাঁদোয়ার মত টানা দিয়া ঝুলাইয়া রাখে আবার কোন কোন মাকড়সা জাল বুনে ঠিক তাঁবুর মত করিয়া, এই তাঁবুর বুনন হয় ঠিক আমাদের কাপড়ের টানা-পড়েনের মত, রেড ইণ্ডিয়ানরা যেরূপ 'উইগ ওয়াম' নামক এক জাতীয় তাঁবু ব্যবহার করে। এই মাকড়সার তাঁবুগুলিও দেখিতে সেইরূপ—অবশ্য আকারে ছোট।



লাল পিঁপড়া অনুকরণকারী স্ত্রী-'ম্যাটালিরডস্' মাকড়সা

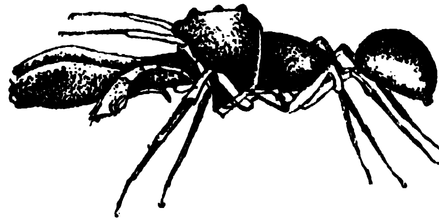
লম্বা-পাওয়ালা 'ফলসিডি' জাতীয় মাকড়সারা এলোমেলোভাবে জাল পাতে। ঘরের নির্জ্জন অন্ধকার স্থানে প্রায়ই এই জাতীয় মাকড়সার জাল দেখিতে পাওয়া যায়। 'ড্যাডি-লং-লেগ্‌' নামে এক প্রকার মশক জাতীয় প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা যেখানে সেখানে বসিয়া কেবল শরীরটাকে নাচাইতে থাকে। ইহাদের সঙ্গে এই 'ফলসিডি' জাতীয় মাকড়সার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। জালের মধ্যে কিছু একটু নাড়াচাড়া হইলেই ইহারা শরীরটাকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দ্রুত গতিতে কাঁপাইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে জালগুলিও ভীষণ ভাবে আন্দোলিত হয়। কোন কোন অঞ্চলে ইহাদিগকে বলে কাঁপুনে পোকা। ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি ধরিলে—এই পোকা ধরিয়া তাহারা কবচ করিয়া রাখে।

এপিরা জাতীয় কালো রঙের ক্ষুদ্রকায় এক প্রকার মাকড়সা দেখা যায়, ইহারা পুরাতন দেওয়ালের ফাটলে বা অনুরূপ কোন স্থানে দলে দলে বাস করিয়া থাকে। ইহারা দেওয়ালের ফাটলের মধ্যে লুকাইয়া থাকে; কিন্তু বাহিরে দেওয়ালের খানিকটা স্থান জুড়িয়া এলোমেলো ভাবে আঠালো সুতা বিছাইয়া রাখে। মাকড়সার শরীরের পশ্চাদ্ভাগ ও জালের মধ্যে একটি সুতার টানা থাকে। আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা যেমন 'ল্যাসো' নামক এক প্রকার লম্বা চামড়ার দড়ির মাথায় ফাঁস লাগাইয়া সুকৌশলে বন্য ঘোড়া গরু ধরিয়া থাকে, এই মাকড়সারাও তেমনই শিকার জালের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইবামাত্রই টানার সাহায্যে টের পাইয়া ছুটিয়া আসে এবং তাহার গায়ে কতকগুলি সুতা এলোমেলো ভাবে ছড়াইয়া দিয়া ক্রমশ লাইনের মত সুতা ছাড়িতে থাকে এবং মাঝে মাঝে গুটাইয়া লইয়া শিকারকে ধীরে ধীরে হয়রান করিয়া আয়ত্ত করিয়া ফেলে।

আমাদের দেশে ছোট ছোট ভাঁট, কামিনী ফুল এমন

কি বটগাছেও পিঁপড়ার বাসার মত অসংখ্য বাসা দেখিতে পাওয়া যায়। এই বাসাগুলির মধ্যে একসঙ্গে ৫০।৬০ এমন কি তাহারও বেশি কতকগুলি মাকড়সা বাস করে। ইহারা 'এপিরা' শ্রেণীর এক প্রকার সামাজিক মাকড়সা। বাসা এক হইলেও প্রত্যেকেরই ঘর আলাদা। প্রত্যেক ঘরেই গোলাকার ছিদ্রের মত দুইটি করিয়া দরজা আছে। বাসার উপর কোন কীটপতঙ্গ আসিয়া পড়িলেই আঠায় আটকাইয়া যায়, আর ইহারা সকলে একসঙ্গে মিলিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। প্রত্যেক বাসাতেই দুই একটা ঘর খালি থাকে। শিকারকে সেখানে টানিয়া লইয়া গিয়া একসঙ্গে সকলে রস চুষিয়া খাইতে থাকে। শিকার ছোট হইলে খাওয়ার সময় ইহাদের মারামারি কামড়াকামড়িও হইয়া যায়।

যে সকল মাকড়সা শিকারান্বেষণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদের মধ্যে 'মেলানগনেথাস' নামে এক জাতীয় মাকড়সা বোধ হয় অনেকেরই নজরে পড়িয়া থাকিবে। এই মাকড়সারা শিকার ধরিবার জন্য জাল বোনে না। ইহারা ঘরের দেওয়াল বা মেঝেতে প্রায়ই ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাছি শিকার করিয়া থাকে। শরীরের দৈর্ঘ্য আধ ইঞ্চির কিছু কম, গায়ের রং ধূসর, পেটের উভয় পার্শ্বে কালো মোটা লাইন আছে। ইহারা ভয়ানক চটপটে এবং প্রায়ই লাফাইয়া লাফাইয়া চলে। চলিবার সময় মাথা ঘুরাইয়া এদিক ওদিক দেখিয়া লয়। সম্মুখের চোখ-জোড়া যেন মোটরের হেড-লাইটের মত জ্বল জ্বল করিতে থাকে। মাছি বসিতে দেখিলেই ইহারা দূর হইতে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসে; কিন্তু কাছে আসিয়া এক পা দুই পা করিয়া অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে থাকে। প্রায় দুই তিন ইঞ্চি দূর হইতে বাঘের মত শিকারের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে। যদি উভয়ে মুখোমুখি হইয়া যায়, তবে মাকড়সা মাছির দিকে মুখ রাখিয়া পাশের দিকে সরিতে সরিতে অবশেষে তার পিছনে উপস্থিত হইয়া ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়ে। এবং শিকার মুখে করিয়া কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া আহার করে। এক জাতীয়



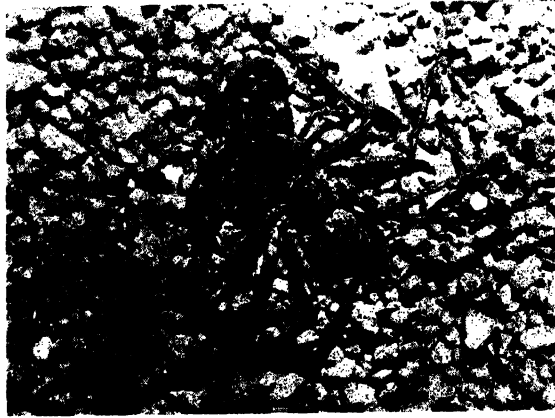
কালো পিঁপড়া অনুকরণকারী মাকড়সা (পুরুষ)

দুইটিতে একবার কাছাকাছি দেখা হইলেই হইল! সঙ্গে সঙ্গে লড়াই বাধিয়া যায়। এদের লড়াই ঠিক ষাঁড়ের লড়াইয়ের মত। উভয়েই সামনের দুই পা উঁচু করিয়া অগ্রসর হয়। উভয়ে পরস্পর মুখোমুখিভাবে কিছুক্ষণ পাঁয়তাড়া কষিয়া পায়ে পায়ে ঠেকাইয়া ঠেলাঠেলি করিতে থাকে। এই সময় কেহ একটু বেটাল হইলেই আর রক্ষা নাই। প্রতিদ্বন্দ্বী ছুটিয়া গিয়া তাহাকে কামড়াইয়া দেয়। প্রত্যেক লড়াইয়ের পর কেহই অক্ষত শরীরে ফিরিতে পারে না। দুই একখানা পা ফেলিয়া আসিতে হয়।

একটি ঘটনার কথা বলিতেছি, যাহা হইতে ইহাদের ঝগড়াটে স্বভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে। পরীক্ষাগারে নূতন আমদানি একটি ঝকঝকে যন্ত্র দেখিতেছিলাম। হঠাৎ ছাদ হইতে এই জাতীয় একটা মাকড়সা নীচে পড়িল। মেঝের উপর দিয়া লাফাইতে লাফাইতে সে যন্ত্রটার উপর উঠিয়া পড়িল। যন্ত্রটার সেই স্থানে তাহার প্রতিচ্ছবি পরিষ্কার-ভাবে দেখা যাইতেছিল। মাক-ড়সাটা তাহারই প্রতিচ্ছবিকে অন্য একটা মাকড়সা বলিয়া ভুল করিয়া তৎক্ষণাৎ পা উঠাইয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে গেল। কিন্তু ধাক্কা খাইয়া পিছু হঠিয়া গেল। আবার একটু দূর হইতে ছুটিয়া আসিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেগে ঢুঁ মারিল। এবারও প্রতিহত হইয়া আবার যন্ত্রটার এদিক ওদিক ঘুরিয়া দেখিল, পিছনে মাকড়সাটা লুকাইয়া আছে কি না! কিছুই দেখিতে না পাইয়া আবার পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া উপর্য্যুপরি চার পাঁচবার কাল্পনিক শত্রুর দিকে লাফাইয়া পড়িল। বার বার আঘাত পাইয়া ক্লান্ত হইয়াই সে যন্ত্রটার উপর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া একদিকে চলিয়া গেল।

এই মাকড়সার বাচ্চাগুলি খাদ্য সংগ্রহের জন্য যেরূপ চাতুরি অবলম্বন করিয়া থাকে তাহা সত্যসত্যই কৌতূহলোদ্দীপক। অনেক সময় দেখা যায়, হলদে রঙের ক্ষুদে পিঁপড়ারা লম্বা লাইন করিয়া একস্থান হইতে অন্য স্থানে ডিম ও খাদ্যকণিকা স্থানান্তরিত করিতেছে। এই

বাচ্চা মাকড়সারা প্রায়ই এই পিঁপড়ার লাইনের সন্ধানে ঘুরিয়া থাকে। পিঁপড়ার লাইন দেখিতে পাইলেই বাচ্চা-মাকড়সারা তাহাদের আশেপাশে অতি সতর্কতার সহিত ঘোরাফেরা করিতে থাকে। কারণ পিঁপড়ারা দেখিতে পাইলেই তাহাদিগকে তাড়া করিয়া যায়। মাকড়সারা যদি দেখিতে পায় পিঁপড়ারা কিছু মুখে করিয়া যাইতেছে অমনই বাজপাখীর মত ছোঁ মারিয়া তাহা ছিনাইয়া লইয়া আসে এবং অনেক দূরে গিয়া তাহা খাইয়া ফেলিয়া পুনরায় লাইনের আশে-পাশে ওৎ পাতিয়া থাকে। ডিম ছিনাইয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গেই পিঁপড়ারা লাইন ছাড়িয়া লুণ্ঠন-কারীর পিছনে ছুটিয়া যায়, কিন্তু মাকড়সার মত অত দ্রুত গতিতে ছুটিতে পারে না বলিয়া হতাশ-ভাবে ফিরিয়া আসে। এরূপ ঘটনা একবার নয়, দুইবার নয়, বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি।



কাঁকড়া বিছার সঙ্গে 'ভেনাটরিয়া' মাকড়সার লড়াই

এই মাকড়সাগুলি এতই ধূর্ত্ত ও চটপটে যে, ইহাদিগকে জীবন্ত অবস্থায় বন্দী করা বড়ই কষ্টকর। কিন্তু ইহাদের একটি অদ্ভুত স্বভাবের সুযোগ লইয়া জীবন্ত অবস্থায় ধরিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম। সুমাত্রাদ্বীপের আদিম অধিবাসীরা নাকি বানরের মাংস খায়। কিন্তু বানরেরা প্রায় সর্ব্বদাই উঁচু নারিকেলগাছে চড়িয়া থাকে। নীচে নামিলেও তাহাদিগকে ধরা শক্ত। শুনা যায়, সুমাত্রাবাসীরা বানর ধরিবার জন্য এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। নারিকেলের মুখ ছোট করিয়া কাটিয়া তাহার মধ্যে চিনি ভরিয়া সেগুলিকে একস্থানে বসাইয়া রাখে। চিনি খাইবার লোভে বানরেরা নারিকেলের খোলের মধ্যে হাত প্রবেশ করাইয়া দেয় এবং মুঠা করিয়া চিনি বাহির করিতে চেষ্টা করে। লোকগুলি আড়ালে লুকাইয়া থাকে; যখন দেখে অনেক বানরই তাহাদের দুইটি হাত নারিকেলের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে তখন সকলে সমবেতভাবে সোরগোল করিতে করিতে তাহাদিগকে তাড়া করে। বানরেরা ভয় পাইয়া ছুটিতে থাকে; কিন্তু নারিকেলের, ভিতরে হাতের মুঠা খোলে না—চিনি মুঠা করিয়াই থাকে। এ অবস্থায় দুই হাতে দুইটা নারিকেল লইয়া তাহারা না পারে ছুটিতে না পারে গাছে উঠিতে; কাজেই লোকের হাতে সহজেই বন্দী হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই মাকড়সারা মাছি শিকার করে এবং শিকারকে মুখে করিয়া বহিয়া লইয়া যায়। মাছি ধরিয়া জোরে আছাড় মারিলেই সেটা অনেকটা নিৰ্জ্জীব হইয়া পড়ে; তখন কোন মাক-ড়সার নজরে পড়িতে পারে এমন অবস্থায় সেটাকে মেঝে বা অন্য-স্থানে একটু আঠার উপর বসাইয়া দিলেই হইল। মাছিটা একটু সম্বিত পাইলেই অনবরত তাহার শরীর প্রসাধন করিতে সুরু করিয়া দেয়। এই নড়ন চড়ন দেখিয়া মাকড়সা তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে; কিন্তু মাছিটা আঠার সহিত লাগিয়া থাকাতে লইয়া যাইতে না পারিয়া টানাটানি করিতে থাকে, শিকারকে কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতে রাজী নহে। তখন তাহাকে ধরিতে বেগ পাইতে হয় না। এস্থলে বলা আবশ্যক, সকল প্রকার মাকড়সাই জীবন্ত পোকামাকড় ধরিয়া তাহাদের শরীরে বিষদাঁত ফুটাইয়া মারিয়া ফেলে এবং অবসর মত রস চুষিয়া খায়। তাহারা শিকার করে নাই এমন কোন মৃত কীটপতঙ্গ স্পর্শই করে না।

এই জাতীয় আর এক শ্রেণীর নেকড়ে মাকড়সাকে বড় বড় গাছের গুঁড়ির উপর প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা ছোট ছোট পিপীলিকা ধরিয়া খায়। অবশ্য পিপীলিকাই ইহাদের প্রধান খাদ্য নহে—অন্যান্য কীট-পতঙ্গও শিকার করিয়া থাকে। শিকার দেখিতে পাইলেই ইহারা দূর হইতে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে আক্রমণ করে।

এইরূপ নির্ব্বিচারে শিকার ধরিবার ফলে তাহাদিগকে মাঝে মাঝে বিপন্ন হইয়া পড়িতে হয়। অনেকদিন আগে কলিকাতার উপকণ্ঠে এক বাড়ির দাওয়ায় বসিয়া আছি। বেলা তখন নয়টা কি দশটা হইবে। বাড়িতে চুণকাম হইতেছিল। কিছু দূরে একটা কোঠার মধ্যে মাটির গামলায় ভিজানো কিছু চুণ ছিল। আমি যেখানে বসিয়াছিলাম, চুণের পাত্রটা সেখান হইতে পরিষ্কার দেখা যায়। হঠাৎ একটা কালো রঙের হনুমান আস্তে আস্তে সে ঘরটায় ঢুকিয়াই এক খাবলা চুণ মুখে পুরিয়া দিল। বোধ হয় দই বলিয়া ভুল করিয়াছিল। মুখে দিয়াই সে ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল, কিন্তু কিছুক্ষণ কোনই প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হইল না। গামলাটার পাশে সে যেন উদাস দৃষ্টিতে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। প্রায় পাঁচ সাত মিনিট পর প্রতিক্রিয়া সুরু হইল। ঘরটার ভিতরে সে এমন দাপাদাপি সুরু করিয়া দিল যে, বাড়ির এতগুলি লোক তামাসা দেখিতে জড়ো হওয়া সত্ত্বেও কেহ কাছে যাইতে ভরসা পাইল না। এ তাক হইতে লাফ মারিয়া ও তাকে যায়, আবার লাফাইয়া মাটিতে পড়ে। কখনও বা মুখ ঘষে, আবার কখনও মাটিতে গড়াগড়ি দেয়। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকে আবার তাণ্ডবনৃত্য সুরু করিয়া দেয়, তাক ও দেওয়ালের জিনিসপত্র চুরমার করিয়া তচনচ করিয়া ফেলিল। এ অবস্থায় অনেকক্ষণ কাটিবার পর সে ঘরের এককোণে চুপ করিয়া বসিল। আর নড়ে না। দূর হইতে লাঠিসোঁটা লইয়া ও ঢিল ছুঁড়িয়া ভয় দেখানো সত্ত্বেও এক পা নড়িল না। এইভাবে ঠায় বসিয়া থাকিয়া দিনটা তো কাটাইলই, রাত্রিও কাটাইল। তার পরের দিন রোদ উঠিবার কিছু পরে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া জঙ্গলের দিকে চলিয়া গেল।

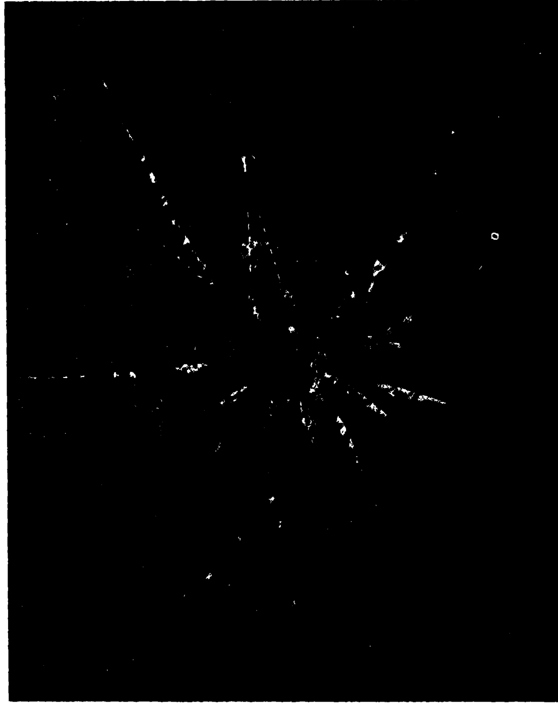


'লাইকোসা' জাতীয় মৎস্যভুক জলচর মাকড়সা

হুবহু এইরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম এই জাতীয় একটি মাকড়সার শিকার ধরিবার সময়। দেওয়ালের গায়ে মাকড়সাটা শিকারের পিছু পিছু ধাওয়া করিতেছিল অনেকক্ষণ ধরিয়া। সে দিনটা বোধ হয় তার পক্ষে বড়ই অপয়া ছিল। শিকার ধর-ধর হয় এমন সময়ে সেটা উড়িয়া পলায়। অনেকবারই এইরূপে শিকার ফসকাইয়া গেল, হঠাৎ দেখি একটা সুড়সুড়ে জাতীয় পিঁপড়া, মাকড়সাটার প্রায় সম্মুখ দিয়াই ত্রস্ত ভাবে ছুটিয়া যাইতেছে। মাকড়সাটা যেন কিছু চিন্তা না করিয়াই পিঁপড়াটার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিন্তু পিপীলিকাটাকে ধরিয়াও তৎক্ষণাৎ আবার ছাড়িয়া দিয়া সম্মুখের উপপদ দুইখানির সাহায্যে কেবল মুখ ঘষিতে লাগিল। পিঁপড়াটার বোধ হয় একটা পা ভাঙিয়া গিয়াছিল, দেখিলাম সে কাৎরাইতে কাৎরাইতে প্রাণপণে ছুটিয়া যাইতেছে। এদিকে কিন্তু মাকড়সাটার ধাঁধা লাগিয়া গিয়াছে। বোধ হয় যেন টাল সামলাইতে পারিতেছিল না; এক একবার পা পিছলাইয়া পড়িবার উপক্রম হয়, কোন ক্রমে ধরিয়া থাকে। কিছুক্ষণ পর একটা স্থানে পিছনের পা আটকাইয়া কেবল ঘুরিতে লাগিল। প্রায় মিনিট দশেক পর চুপ করিয়া বসিয়া

রহিল। ঘণ্টা দেড়েক বাদে আসিয়া দেখি সে চলিয়া গিয়াছে। ছোট্ট বাসাটি তার কাছেই ছিল। যে স্থানে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেখানে চিহ্ন দিয়া রাখিয়াছিলাম। আঠা দিয়া সে স্থলে জীবন্ত পোকা আটকাইয়া দুই দিন পর্য্যন্ত তাহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিলাম। সে পোকাটার একটু দূর দিয়া আনাগোনা করে বটে কিন্তু তাহার দিকে ফিরিয়াও তাকায় না। চতুর্থ দিনে দেখিলাম তাহার পূর্ব্বস্মৃতি বিলুপ্ত হইয়াছে। পোকাটার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ধরিয়া লইয়া চলিয়া গেল। ঐ ঘটনার পরে দেখিয়াছিলাম—সেই জাতীয় পিপীলিকার শরীরের পশ্চাদ্দেশ হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধ বিষাক্ত রস নিস্থত হয়। বোধ হয় উহা মাকড়সাদের পক্ষে ভয়ানক মারাত্মক।

যাহারা ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদের মধ্যে ধূসর-বর্ণের ছোট ছোট কতকগুলি বিভিন্ন জাতীয় মাকড়সা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা জলচর। ইহাদের পুরুষ-মাকড়সাগুলির গায়ের রং কালো ভেলভেটের মত। আকারে স্ত্রী-মাকড়সা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট। ইহারা সারাদিন জলে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। স্ত্রী-মাকড়সা মটরের মত গোলাকার ডিমের থলিটি দেহের পশ্চাদ্দেশে আটকাইয়া ইতস্তত বিচরণ করিয়া থাকে। ডিম ফুটিয়া বাচ্চাগুলি বাহিরে আসিলেই কাঙ্গারু, মার্স্থপিয়েল জাতীয় জানোয়ারদের মত মায়ের পিঠের উপর আশ্রয় গ্রহণ করে। মা তাহাদিগকে পিঠে করিয়াই ঘোরাফেরা করিয়া থাকে। পাঁচ সাত দিন মায়ের পিঠের উপর থাকিবার পর ইহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং স্বতন্ত্রভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে।



লাইকোসা মাকড়সার যৌন-সঙ্গম

একদিন দমদম বিমান-ঘাঁটির নিকট বিলের মধ্যে একটা লম্বা কাটি-মাকড়সা নজরে পড়িল। মাকড়সাটা শিকারটাকে আয়ত্ত করিতে গিয়া কেমন করিয়া যেন জলের উপর নামিবামাত্রই ধূসররঙের আরেকটা মাকড়সা ঝোপের মধ্য হইতে জলের উপর দিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহার ঘাড় কামড়াইয়া ধরিল। তারপর একটা জলঘাসের উপর বসিয়া শিকারের রস চুষিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। তাহাকে ধরিবার জন্য কাছে অগ্রসর হইবামাত্র চক্ষের নিমেষে লাফ দিয়া জলের উপর পড়িয়া কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আরেক দিন দমদমের একটা এঁদো পুকুরের ধারে বসিয়া আছি, দেখিলাম পুকুরের জলের উপর ওই জাতীয় অনেক মাকড়সা ঘোরাফেরা করিতেছে। সাজসরঞ্জাম সঙ্গেই ছিল—দুই একটাকে ধরিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহারা একটুখানি ছুটিয়া গিয়া হঠাৎ কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া যায়—কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অবশেষে একটার উপর নজর রাখিয়া তাহাকে অনুসরণ করিলাম। সেটা জলের উপর দিয়া লাফাইতে লাফাইতে অনেকটা তফাতে চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে জলে নামিয়া পড়িলাম। কিন্তু কোনই ফল হইল না। এবারেও কোথায় যেন গাঢাকা দিল। জলজ লতাপাতাগুলি ভাল করিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলাম; কিছুতেই খোঁজ মিলিল না। জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিলাম—ব্যাপারটা কি? হঠাৎ আমার সম্মুখে একটা ছোট্ট শালুক-পাতার নীচ হইতে একটা মাকড়সা ভাসিয়া উঠিল, তখন

বুঝিতে আর বাকি রহিল না যে উহারা জলের নীচে ডুব দিয়া জলজ ঘাসপাতা আঁকড়াইয়া লুকাইয়া থাকে। বিপদের সম্ভাবনা কাটিয়া গেলেই আবার উপরে উঠিয়া আসে।

তারপর কয়েকদিন ধরিয়াই ঐ স্থানে তাহাদের আচার-ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি। একদিন দেখি, একটা শালুক-পাতার কিনারায় জলচর মাকড়সা একটা চুপ করিয়া বসিয়া আছে। উদ্দেশ্য কিছু বুঝিতে পারা গেল না। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেই দেখিলাম—শালুক-পাতার একপাশে পাতাটা হইতে ইঞ্চিখানেক দূরে কতকগুলি তেচোকো-মাছ সাঁতার কাটিতেছে। কেহ কেহ একবার পাতার নীচে যাইতেছে আবার বাহির হইয়া আসিতেছে। তখন বুঝি নাই—মাকড়সাটা মাছগুলার গতিবিধির উপর নজর রাখিয়াছে। প্রায় দশ পনর মিনিট পরেই দেখিলাম, একটা মাছ যেইমাত্র পাতার ধারে মাকড়সাটার খুব কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে, অমনই মাকড়সা মুখ বাড়াইয়া ছোঁ মারিয়া মাছটাকে জল হইতে পাতার উপর টানিয়া তুলিল। মাছটা কিছুক্ষণ লেজ দিয়া ঝাপটাঝাপটি করিল, কিন্তু মাকড়সার কামড় ছাড়াইতে পারিল না। অল্প সময়ের মধ্যেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। তখন সে বসিয়া বসিয়া তাহার রস চুষিয়া খাইতে লাগিল। এই মাকড়সা 'লাইকোসা' জাতীয়।

যৌন-মিলনের পূর্ব্বে এই জাতীয় পুরুষ-মাকড়সারা স্ত্রী-মাকড়সাদের সম্মুখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যেরূপ অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে নৃত্য করে তাহা দেখিলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া থাকিতে হয়। স্ত্রী-মাকড়সা এক স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে আর পুরুষ-মাকড়সাটি তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি সহকারে নৃত্য করিয়া তাহার মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা করে। যৌন-সম্মিলনের পর অধিকাংশক্ষেত্রেই স্ত্রী-মাকড়সা পুরুষটাকে খাইয়া ফেলে।

আমাদের দেশে ঘরের ভিতরে দেওয়ালের গায়ে ধূসর-বর্ণের কয়েক জাতীয় বড় বড় মাকড়সা দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও পায়ে কালো কালো ডোরা কাটা থাকে। ইহাদের এক জাতীয় মাকড়সা পয়সার মত গোলাকার সাদা রঙের একটা ডিমের থলি বুকে লইয়া ঘোরে। কেহ আবার দেওয়ালের গায়ে ডিম পাড়িয়া একটা পাতলা পর্দ্দা দিয়া ঢাকিয়া রাখে এবং সর্ব্বক্ষণ সেখানে বসিয়া পাহারা দেয়। ইহারা কাঁকড়ার মত কতকটা পাশাপাশি চলে। যাহারা ডিম বুকে করিয়া ঘোরে তাহারা 'হেটারোপোডা ভেনাটরিয়া' নামে পরিচিত। ইহারা রাত্রিচর মাকড়সা, দিনের বেলায় একস্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। রাত্রিবেলায় শিকার করে। শিকার ধরিবার জন্য ইহারা অনবরত ঘোরাঘুরি করে না। একস্থানে চুপ করিয়া ওৎ পাতিয়া থাকে। উইচিংড়ি, আরসোলা প্রভৃতি কাছ দিয়া যাইবার সময় লাফাইয়া তাহাদের ঘাড়ের উপর পড়ে। ভেনাটরিয়া মাকড়সা ভয়ানক কলহপ্রিয়। পরস্পর কাছাকাছি আসিলেই ঝগড়া বাধিয়া যায়। বিশেষত ডিম বুকে থাকিলে লড়াই চরমে উঠে। কামড়াকামড়ি করিতে করিতে উপর হইতে জড়াজড়ি করিয়া নীচে পড়িয়া যায়। বিজেতার বুকে ডিম থাকিলেও পরাজিতের ডিম লইয়া চলিয়া যায়। এই অতিরিক্ত ডিমটিকে বিজেতা পিছনের পা দিয়া ধরিয়া কাঁখে করিয়া বহন করে। একবার একটা কাঁকড়াবিছার সঙ্গে এই মাকড়সার লড়াই দেখিয়াছিলাম। কাঁনা-উচু একটা পাত্রের মধ্যে কাঁকড়াবিছা পুষিয়াছিলাম। দৈবাৎ একদিন একটা 'ভেনাটরিয়া' মাকড়সা উপর হইতে সেই পাত্রের মধ্যে পড়ে। মাকড়সাটা পলাইবার জন্য ছুটাছুটি করিবার সময় কাঁকড়াবিছার সঙ্গে মারামারি লাগিয়া যায়। কাঁকড়াবিছা অনবরত হুল ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছিল; মাকড়সাও তাহার ঘাড় কামড়াইবার জন্য সুযোগ খুঁজিতেছিল। কিন্তু কেহই সুবিধা পাইতেছিল না। হঠাৎ কেমন করিয়া একফাঁকে মাকড়সা কাঁকড়া-বিছাটার পিঠে চড়িয়া বসিল। এইভাবে কিছুক্ষণ থাকিবার পর, কাঁকড়াবিছা লেজ উল্টাইয়া একবার মাকড়াসাকে হুল ফুটাইয়া দিল। মাকড়সাটা যন্ত্রণায় যেন ছিটকাইয়া দূরে গিয়া পড়িল এবং অল্পক্ষণ পরেই হাত পা গুটাইয়া ক্রমশ অসাড় হইয়া পড়িল।

আরও যে কত রকমের অদ্ভুত মাকড়সা আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপ আলোচনাও এস্থলে সম্ভব নহে। এখন আমাদের দেশীয় অতি-অদ্ভুত কয়েক জাতীয় অনুকরণকারী মাকড়সার বিবরণ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

এই অনুকরণকারী মাকড়সাদের পিঁপড়া-মাকড়সা বলা

যাইতে পারে। এই জাতীয় যত প্রকারের মাকড়সা আছে—তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া দেখিলেও এবিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহাদিগকে পিঁপড়া বলিয়াই ভুল করিবে। আমার মনে হয়, যত প্রকার বিভিন্ন শ্রেণীর পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায় পিঁপড়ে-মাকড়সা তত রকমেরই আছে, হয়তো বা বেশিও আছে। এ পর্য্যন্ত বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে ৬৭ রকমের বিভিন্ন জাতীয় পিঁপড়ে-মাকড়সা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। ইহারা বোধ হয় শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত আবার কেহ কেহ পিঁপড়া খাইবার জন্য তাহাদিগকে অনুকরণ করিয়া থাকে। পিঁপড়া ও পিঁপড়ে-মাকড়সাতে প্রধান পার্থক্য এই যে, পিঁপড়াদের মাথার কাছে এক জোড়া শুঁড় থাকে, মাকড়সাদের তাহা নাই। কিন্তু পিঁপড়া মাকড়সারা আশ্চর্য্য উপায়ে এই অভাব পূরণ করিয়া লইয়াছে। মাথার সম্মুখের দুইখানা পা, মাথার কাছ ঘেঁষিয়া সর্ব্বদাই শুঁড়ের মত উপর দিকে উঠাইয়া রাখে এবং শুড়ের মতই নাড়াচাড়া করিয়া থাকে। সহজে বুঝিবার জো নাই যে ইহা শুঁড় নয়—পা।

আমাদের দেশীয় নালসো বা লাল পিঁপড়াকে তিনটি বিভিন্ন জাতীয় মাকড়সা অনুকরণ করিয়াছে। 'প্ল্যাটালিয়ডস' নামক মাকড়সাকে কি গায়ের রঙে, কি চেহারায় দেখিতে হুবহু নালসোর মত। ইহারা নালসোদের দলের সঙ্গেই একটু তফাতে চলাফেরা করে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া শিকার অন্বেষণ করে। জাল বোনে না। ডিম পাড়িবার সময় গাছের পাতার নীচের দিকে সুতা দিয়া চ্যাপ্টা ডিম্বাকৃতি বাসা নির্ম্মাণ করে। ইহারা এত চটপটে ও সতর্ক যে মনে হয় এই আছে, এই নাই। আবছায়া মত কিছু দেখিবামাত্রই চক্ষের নিমিষে লতা-পাতার আড়ালে আত্মগোপন করে। ইহাদের পুরুষ-মাকড়সারা স্ত্রী-মাকড়সা অপেক্ষা অনেক বড়। পুরুষ-মাকড়সাগুলিকে যৌবনোদ্গমের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অবিকল স্ত্রী-মাকড়সাদের মতই দেখায়, হঠাৎ একদিন শেষবারের জন্য খোলস বদলাইবার সময় এক অদ্ভুত বিকটাকৃতি পরিগ্রহ করিয়া বাহির হয়। মুখের সামনে লম্বালম্বিভাবে থাকে দুইটি মুগুরের মত ঠোঁট, তার উপরে নীচে কুমীরের মত দাঁত; আর মুগুরের মাথার দিক হইতে বাহির হইয়া আসে—বাঁকানো লম্বা সূচের মত দুইটি তীক্ষ্ণাগ্র শলাকা। যাহারা ইহাদিগকে জানে না তাহারা বলে—ডবল-পিঁপড়ে, বাস্তবিকই কতকটা জোড়া-পিঁপড়ের মতই মনে হয়। এই অদ্ভুত আকৃতি লইয়া বাহিরে আসিবার দুই তিন দিন পরেই তাহারা সঙ্গিনীর খোঁজে বাহির হয়। এস্কিমো যুবকেরা যেমন সঙ্গিনীর খোঁজে পাড়া-প্রতিবেশীর 'ইগলু'র ভিতর ঢুকিয়া ঢুকিয়া আলাপ পরিচয় করে, এই মাকড়-সাদের দেখিয়াও কতকটা সেইরূপই মনে হয়। অনেক সময় একই 'ইগলু'র নিকট দুইজন পাণিপ্রার্থীর দেখা হইয়া যায়, তখন বাধিয়া যায় ভীষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

জীবন্ত অবস্থায় ইহাদিগকে বন্দী করা বড়ই কষ্টকর; কিন্তু একটু কায়দা করিয়া সহজেই ইহাদিগকে ধরা যাইতে পারে। ছোটনাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরা নাকি এক অদ্ভুত উপায়ে বাঘ ধরিত। যে পথে বাঘ চলে, তাহার অনুসন্ধান লইয়া তাহারা পাতার গায়ে একোনাইটের আঠা মাখাইয়া সেই পাতাগুলিকে পথের উপর বিছাইয়া রাখিত। পায়ের নীচে আঠাসমেত পাতা লাগিয়া গেলেই বাঘ সেই বিরক্তিকর পদার্থটাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে অকৃত-কার্য্য হইয়া পা-টাকে মুখে ঘষে। তাহার ফলে মুখেও আঠা লাগিয়া যায়। ইতিমধ্যে আরও দুই একটা পাতা লাগিয়া গেলে বাঘ অনন্যোপায় হইয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিতে থাকে, তখন সর্ব্বাঙ্গে এমন কি চোখে মুখে পর্য্যন্ত পাতা লাগিয়া যায়; এ অবস্থায় ক্ষিপ্ত হইয়া অন্ধের মত লাফালাফি করিতে থাকে, তখন লোকজন আসিয়া অতি সহজেই তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলে। এই মাকড়সা-দিগকেও অনুরূপ এক প্রকার কৌশলে ধরা যাইতে পারে। ইহারা মানুষ বা অন্য কোন প্রাণীকে দেখিলেই মুহূর্ত্তের মধ্যে পলাইয়া যায়; কিন্তু যদি একটি লম্বা লাঠির অগ্রভাগে জিলাটিন জাতীয় আঠায় ডুবাইয়া কয়েকটি সবুজ পাতা বাঁধিয়া সেটিকে মাকড়সাটির নিকটে ধরা হয় তবে নির্ব্বিচারে সে পাতার উপর লাফাইয়া পড়ে এবং পায়ে জিলাটিন লাগিয়া গেলে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে পারে না। বিশেষত জিলাটিন-মাখানো পা দিয়া অনবরত চোখ মুছিতে মুছিতে অবশেষে চোখেও ভাল দেখিতে পায় না, তখন সহজেই ধরিয়া ফেলা যাইতে পারে।

বন্দে মাতরম্

শ্রীমনোজ বসু

গ্রামের সীমানায় বিল। এখন অগ্রহায়ণ মাস, জল-কাদা নেই, যত দূর তাকাও ধানবনে যেন সোনা ঢেলে দিয়েছে। গহর আলির দাওয়া থেকে বিল দেখা যায়, কিন্তু সে আর কদিন বা! বড় পুকুরের ধার দিয়ে সারবন্দী আমের চারা পুঁতেছে, এই এবারের বর্ষাতেও আট দশটা পুঁতেছে—চারাগুলোর নধর সবুজশ্রী, পাল্লা দিয়ে ডাল পালা মেলছে, বছর কয়েকের মধ্যে সমস্ত জায়গা জুড়ে ওদিকটা অন্ধকার হয়ে যাবে।

ধান কাটা লেগেছে, দুবেলাই কাজ হয়। যতক্ষণ নজরে কুলোয়, গহর ক্ষেতে থাকে। উঠানে এসে দাঁড়াতেই পরী তামাক সেজে আনে। কাস্তে ফেলে গহর তখন হুঁকা নিয়ে বসে, আরও খানিক পরে হাত-পা ধুয়ে ভাত খায়। পরী ততক্ষণ মাদুর বিছিয়ে রেখেছে। কিন্তু খেয়ে দেয়ে যে বিশ্রাম নেবে, তার উপায় আছে! মল বাজিয়ে বউ অমনই সঙ্গে সঙ্গে হাজির। বলে, একটা গীত গাও না, শুনি।

খঞ্জনী বাজে, গান আরম্ভ হয়। সখীসোনার বারমাসী—ঝিকর গাছার পুল ভাঙার গান—মুগ্ধ শ্রোতাটি ব'সে ব'সে শোনে। ঝিরঝিরে বাতাসে আমচারাগুলো নড়ছে, বড় পুকুরের জল জ্যোৎস্নায় ঝিকমিক করছে, শীতের আমেজ লাগছে। গহর আলি হঠাৎ যেন সম্বিৎ পেয়ে জেগে ওঠে, বলে, বউ, অনেক রাত হ'ল, তোর এখনও খাওয়া হয় নি—আজ এই অবধি?

পরীর নেশা লেগে গেছে, উঠতে চায় না। মৃদু হেসে বলে, ক ঘড়ি বাজল? বারোটা—চোদ্দটা?

—তা বাজল বই কি। এখন তুই খেতে যা।

তাচ্ছিল্যের সুরে পরী বলে, বাজুকগে। যা বাজবার বেজে যাক্, তারপর ধীরে সুস্থে খেতে বসব। তুমি আর একখানা ধর।

গহর গম্ভীর হয়ে এক মুহূর্ত্ত কি ভাবে। তারপর বলে, এই শেষ কিন্তু। এর পর আর গাইতে নেই।—ব'লেই গেয়ে উঠল—

সুজলাং সুফলাং মাতরম্

মাত্র তিনটি কথা, তার বেশি জানা নেই। বিশ্রী সুর, উচ্চারণ আরও বিশ্রী। পুণ্যনাম দেশসেবক যাঁরা, গহরের গান শুনলে তাঁরা ক্ষেপে যেতেন, বলতেন, জাতীয় সঙ্গীতের অপমান হচ্ছে। পরীও হেসে খুন; বলে, সং বং—কি রকম গীত হচ্ছে গো? ভাল দেখে কিছু গাও—

গহর গম্ভীর কণ্ঠে বলল, হাসিস নে বউ, এ আমাদের মাটির গান। বাপজান বড় পুকুর কেটে গিয়েছে, চাষীরা লাঙল ছেড়ে ঘাটে এসে বসে, আঁজলা ভ'রে জল খায়—ঐ হ'ল গিয়ে সুজলা। নতুন ধানে আমাদের বিল ঐ ভ'রে গেছে, এত যে আমগাছ লাগিয়েছি ওতেও কি রকম ফল

ফলবে দেখিস ; চাষীরা এখন শুধু জল খায়, তখন আম খাবে ; এই সব কথা দিয়ে গান বেঁধেছে—সুফলা। তারপর গহর প্রশ্ন করলে, আমার বীরু ভাইকে দেখিস নি বউ, নাম শুনেছিস তো ?

পরী নামটাও শোনে নি।

গহর বললে, শহরের ফাটকের মধ্যে এখন হয়তো সে ঘানি ঘুরিয়ে মরছে।—বলতে বলতে একটু উন্মনা হয়ে পড়ে। জেলের ভিতরকার ব্যাপার সম্বন্ধে ধারণা তার স্পষ্ট নয়। হয়তো বীরুকে তারা পেট ভ'রে খেতে দেয় না, এত যে লেখাপড়া শিখেছে তার কোন মর্য্যাদা দেয় না, হয়তো হাতে পায়ে শিকল বেঁধে রেখেছে। নিশ্বাস ফেলে গহর বলতে লাগল, বীরু ভাই 'বন্দে মাতরম্' গাইত, আমি হাসতাম। একদিন সে মানে বুঝিয়ে দিলে, আমার তাজ্জব লাগল। মাটিকে ওরা মা ব'লে জানে—গাছপালা, ধানবন, পুকুরের জল, বাড়ি ঘর দোর সমস্ত মিলে ওদের মা। সেই মাকে ওরা 'বন্দে মাতরম্' বলে ডাকে।

পরী জিজ্ঞাসা করলে, অমন লোকের ফাটক হ'ল ?

গহর বললে, ঐ তো মজা। আমরা চাষীর ছেলে মাটি মেখে দিন কাটে। আমার বীরু ভাই ভদ্দর হ'লেও মাটির 'পরে দরদ আমাদের চেয়ে বেশি। এমন মানুষকে মাটি থেকে সরিয়ে ইটের পাঁচিলে আটকে রেখেছে।

গহর আলি চুপ করল। পরী রান্নাঘরে গিয়েছে। দূরের জ্যোৎস্নামগ্ন বিলের দিকে চেয়ে চেয়ে গহর তার বীরু ভাইয়ের কথা ভাবতে লাগল, চোখে জল এসে গেল। কেন মানুষের এ রকম দুর্ব্বুদ্ধি হয় ? চাকরি-বাকরি করবি, ঘর-আলো করা বউ আসবে, মায়ের মুখে হাসি ফুটবে, পায়ের উপর পা দিয়ে দিব্যি দিন কেটে যাবে ! তা নয়, বাড়ি বাড়ি গিয়ে লোকের দুঃখের কথা শুনে বেড়ানো, হেরিকেন জ্বেলে পাড়ার এখানে সেখানে সভা করা—

রান্নাঘরে শিকল টেনে দিয়ে পরী শুতে যাচ্ছিল। গহর বললে, কাল মা-ঠাকরুণকে দেখতে যাব। যাবি রে বউ ? আমার বীরু ভাইয়ের মা, দেখলে পুণ্যি হবে—

পরদিন মনে তাড়া রয়েছে, মা-ঠাকুরুণের ওখানে যেতে হবে, দুপুর না হ'তেই গহর আলি ক্ষেত থেকে ফিরে এল। খাওয়া দাওয়া সেরে পরীর হাত ধ'রে বললে, চল্।

চল্ বললেই অমনি যাওয়া যায় বুঝি ! পরীর এখনো কত কি বাকি ! কাঁসার মল সে তেঁতুল দিয়ে মাজতে বসল ; কপালে কাঁচপোকার টিপ পরল ; বিয়ের ঢাকাই শাড়িখানা ফেরতা দিয়ে প'রে ঝুমঝুম ক'রে সে আল বেয়ে গহরের পিছনে পিছনে চলল।

—মাগো !

—গহর ? ব'স বাবা, আসছি এক্ষুনি।

বয়স হয়েছে, কিন্তু মা দুপুরে ঘুমান না। কাঁথার ডালা নিয়ে বসেছিলেন, সূচসুতো সাবধান ক'রে রেখে তিনি বাইরে এলেন। পরীকে দেখেই তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

ওকি, ওকি !—গহর বাধা দিয়ে উঠল, ওকি করছ মা ?

বিস্মিত হয়ে মা প্রশ্ন করলেন, কি বলছিস, গহর ? এ আমার মালক্ষ্মী নয় ?

—হ্যাঁ মা, এদ্দিন ছোট ছিল, আজ দিন কুড়িক একে বাড়ি নিয়ে এসেছি।

মা চ'টে উঠলেন, তবে যে তুই হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলি ? আমার মাকে একটু আদর করছিলাম, তাতে তোর হিংসে হচ্ছিল বুঝি ! দেখ দিকি, ছেলে মানুষ—কি রকম জড়সড় হয়ে গেছে !

গহর আলি অপ্রতিভ হয়ে বলতে লাগল, মাগো, সে কথা নয়। আমরা হলাম মোছলমান, তোমরা বামুন ; এই অবেলায় ছোঁয়াছুয়ি হ'লে—

মা বললেন, ওঃ ! গহরের আমার বুদ্ধি-বিবেচনা হয়েছে, এ খবর তো জানতাম না ! হ্যারে, বামুন মোছলমান তোরা কবে থেকে হ'লি ? তুই আর বীরু পাঠশালা থেকে কালিঝুলি মেখে আসতিস, মুড়ির মোয়া কাড়াকাড়ি ক'রে খেতিস, তখন তো এসব ছিল না। মনে পড়ে, পেয়ারাগাছ থেকে প'ড়ে পা ভেঙে কাঁদতে কাঁদতে এলি, তার উপর আমি আবার আচ্ছা ক'রে কান টেনে দিলাম ! এখন হ'লে বোধ হয় বলতিস—দেখ, মোছলমানের উপর হিন্দুদের অত্যাচারটা দেখ একবার !

এ কথার জবাবে গহর আলি একটুখানি মুখ টিপে হাসে। মনে মনে বলে, খুব মনে পড়ে মা, কান টেনে দিয়ে তারপর সমস্ত দুপুর কোলের মধ্যে রেখে হাঁটুতে মলম মালিশ করলে। সে সব দিন কি আর আসবে ?

মা বলতে লাগলেন, আমার ছেলে যে এত দুঃখ সইছে, সে বুঝি মোছলমান বাদ দিয়ে কেবল বামুন জাতের জন্যে ?

এ কথায় গহরের চোখে জল এসে গেল। বললে, মাগো, দোষ হয়েছে—তোমার বীরুর মত তো বিদ্যে শিখি নি ; কথাবার্ত্তা বলতে জানি না। রাজপুত্র হয়ে কেন যে ওরা বনবাসে যায়, আমি বুঝতে পারি না, কিন্তু মা, এটা জানি—যে মাটির জন্যে ওরা মরছে সে হিন্দুর মাটি মোছল-মানেরও মাটি। ওরা মাটি দেখে, জাত দেখে না। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, বীরু ভাই আসবে কবে মা ?

মা বললেন, আসবে তো ভাদ্র মাসে। এসে আবার কদিন থাকে, তাই দেখ !

মা কিছুতে ছাড়লেন না, বললেন, গহর বাবা, ঐ দাওয়ার উপর পাতা পেতে তোরা দুই ভাই খেতিস, মনে আছে ? কতদিন কেউ মা বলে ডাকে না, ছেলের পাতে ভাত বেড়ে কতদিন দিই নি ! আজকে তোদের ছাড়ছি না, খেয়ে যেতে হবে। তোর ভাই নেই, তেমনই আমার মা-লক্ষ্মী রয়েছে ; দুটো পাতাই পাততে হবে।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল, চাঁদ উঠল। মা নিজের হাতে কি কি রান্না করলেন, দুজনের জায়গা পাশাপাশি ক'রে দিলেন। পরীর তো পুরুষমানুষের সামনে খাওয়া অভ্যাস নেই, আড়ষ্ট হয়ে হাত কোলে ক'রে ব'সে থাকে। মা বলেন, ও মেয়ে, খাচ্ছিস না কেন ? রান্না খারাপ হয়েছে বুঝি ! বুড়ো মানুষ, তোদের মত কি পারি ?

গহর তাড়া দিয়ে ওঠে, কেন খাচ্ছিস না ? এ জিনিস বেশি জুটবে না—খেয়ে নে ! যতদিন বাঁচবি, মুখে স্বাদ লেগে থাকবে।



নৈশোমার্গঃ সবিতুরুদয়েসূচ্যতে কামিনীনাম্।

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীপুলিনবিহারী সেনের সৌজন্যে

Engraved & Printed by
BHARAT PHOTOTYPE STUDIO

আরও জ্যোৎস্না ফুটেছে, দিনের মত স্বচ্ছ জ্যোৎস্না। মা রাঙচিতের বেড়া অবধি এগিয়ে দিয়ে গেলেন। এবার আলপথে নয়, বাঁধের রাস্তা দিয়ে চলেছে। ওদিক থেকে একখানা গরুর গাড়ি আসছে, তারই ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ হচ্ছিল। খানিক পথ গিয়ে গহর কথা ব'লে উঠল, মা দেখলি, বউ ?

পরী জবাব দিল না। গহর বলতে লাগল, শোন্ আমার বীরু ভাইয়ের গল্প। সভা ভেঙে সবাই হুড়মুড় ক'রে পালাল। লাঠির পরে লাঠি পড়ছে। তেঁতুলগাছের উপর থেকে আমি চেঁচাচ্ছি—পালা ভাই, পালা। সে নড়ে না, চেঁচিয়ে বলে—বন্দে মাতরম্। তার পর খানার মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

আর্ত্তকণ্ঠে পরী ব'লে উঠল, আহা !

গহর উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বলে, আমরাই ব্যথা পাই, তার ওসব বালাই নেই। বুকের মধ্যে অত জোর কোত্থেকে আসে জানিস বউ ?—ঐ মা রয়েছে ব'লে। আমার মা যদি ছোট বয়সে না ম'রে যেত, আমি কি সেদিন ঐ রকম পালাতাম ? বীরু ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে আমিও বলতাম —বন্দে মাতরম্।

তার পর গহর তার জানা সেই একটা মাত্র কলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারম্বার গাইতে লাগল, সুজলাং সুফলাং বন্দে মাতরম্—

পরীরও বুক ভ'রে উঠল। গানের মধ্যে কেবলই তার মায়ের কথা মনে হচ্ছে; কাল রাতে গহর যে মানে করেছিল সে তার মনে ধরে না। স্নিগ্ধ সুগৌর একখানি মুখ, পরনে সাদা থান—নিরলঙ্কার, দু-চারটে চুল পেকেছে—মার তাতে অপরূপ শ্রী খুলেছে, বন্দে মাতরম্—

গরুর গাড়ি নিকটে এসে পড়ল। গাড়ি থেকে হাঁক এল, হোই গো, যার ডাইনে সেই—

গলা শুনে গহর চিনতে পারল। বলে, মুন্সী সাহেব নাকি ? নবাবপুরের মক্তবে যাওয়া হচ্ছে ?

মুন্সী সাহেবও চিনলেন।—গীত গাচ্ছ গহর মিঞা ? তা একটা ভাল গীত গাইলে হয়—

গহর আলি লজ্জিত হয়ে বললে, গলাটা সুবিধের নয়। তা এই রকম মাঠে ঘাটে গাই, মানুষ-জন দেখলে চুপ করি।

মুন্সী সাহেব বললেন, গলার কথা হচ্ছে না তো ; গীতটাই ভাল নয়। ও হিঁদুর গান—মোছলমানের ছেলে গাইলে যে ধর্ম্মে পতিত হবে।

গহর আলি অবাক হয়ে বলে, সে কি কথা মুন্সী সাহেব ? মা কি কেবল হিঁদুর—মোছলমানের মা নেই ?

মুন্সী স্নেহের হাসি হাসতে হাসতে বললেন, কোন্ মা সেটা ঠাহর ক'রে দেখেছ, মিঞা ? ও যে হিঁদুর ঠাকুরের গান, দশহাতওয়ালা—

গাড়ি এগিয়ে গেল। গহর স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াল। বলে কি ! বিশ্বাসী সরল মানুষ, যত

গোলমালে থাকুক পাঁচ বার নমাজ করতে কোন দিন ভুল হয় না তার ; ধর্ম্মের হানি হবে, তার চেয়ে জীবন যাওয়াই যে ভাল।

পরী তার হাত ধ'রে টানে। বলে, দুত্তোর, বাজে কথা।

—সর্ব্বনেশে কথা রে বউ ! তার পর গহর চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল, মুন্সী সাহেব, আমি নবাবপুরে যাব একদিন ; সব কথা আমায় ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে।

এরই প্রায় দিন-কুড়ি পরে, একদিন গঙ্গাচরণ সর্দ্দার বেড়াতে এল। গঙ্গার বাড়ি খালের ওপার, শেখহাটির আবাদে। ওরা এক গানের দল করছে, গহর তাতে ঢোলক বাজাতে পারবে কিনা, জানতে এসেছে। গহর মহা উৎসাহে বলে, পারব, খুব পারব। কিন্তু ভাই, এই কটা মাস। বৃষ্টির ফোঁটা পড়লে আর হবে না, লাঙল নিয়ে ভূঁয়ে নামতে হবে।

শেখহাটির আবাদ জুড়ে এখন নোনা জলের তরঙ্গ খেলে। আগে ধান হ'ত, এখন জলকর হয়েছে—দিন-ভোর মাছ ধরা হয়, শেষ রাতে ডিঙা বোঝাই হয়ে শহরে চালান যায়।

গঙ্গাচরণ এক নূতন খবর দিলে। বলে, শোনলি না বুঝি ? সেওড়ে বালি—লাঙল বেচে এবার খেপলা জাল কেনো গে যাও। তোমাদের বিলও ভাসিয়ে দেবে, শুনলাম। নীলমণি সাঁপুই সতর হাজার ডাক দিয়েছে। দেবে না ? জলকরে লাভ কত ?

এত বড় ভয়ানক কথাটা সহজে বিশ্বাস হয় না। গহর অর্থহীন ভাবে খানিক তাকিয়ে থাকে।—বল কি !

গঙ্গাচরণ হি-হি ক'রে হাসতে হাসতে বললে, তাতে ঘাবড়াবার কি আছে মিঞা ? সে তো ভাল কথা। রোদে পুড়ে সমস্তটা দিন লাঙল ঠেলে বেড়াতে হবে না ; রাত্তিরবেলায় ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় কাজ। কপালে লেগে গেল তো এক দণ্ডের মধ্যে পাঁচ সিকে দেড় টাকা রোজগার। তার পর দিন-মানটা ঘুমিয়ে তাড়ি খেয়ে যে রকম খুশি কাটিয়ে দাও।

গহর ব্যাকুলকণ্ঠে বলে, ছিলাম চাষা, শেষকালে কি চোর হ'তে হবে ?

গঙ্গা বলে, কোন্ সুমুন্দি নয়, শুনি ? বলি, পেটে খেতে হবে তো ! আর চোরই বল যা-ই বল, আগের চেয়ে ভাল আছি ভাই। এখন পানে তাম্বুলবিহার, সকালবেলা মিছরির জল—নানা রকম বেয়াড়া অভ্যেস হয়ে গেছে।

চেহারা দেখেই সুখের অবস্থা অনুমান করা যায় বটে। এদের বাপ-দাদা শেখহাটির আবাদে একদিন সোনা ফলিয়ে গেছে ; এদের কাজ গভীর রাত্রে। চারিদিক একেবারে নিশুতি হয়ে যায়, দূরের খালায় টিমটিম ক'রে লণ্ঠন জ্বলে, সেই সময়ে আবছা আঁধারে বাগদীপাড়া থেকে একের পর এক প্রেতের মত সব বেরিয়ে আসে। বাদার খোলে ঝুপঝাপ শব্দে জাল পড়ে, হয়তো খালা থেকে কোন পাহারাদার শুয়ে শুয়ে হাঁক দেয়—হোই গো—ও—ও—। ছুটাছুটি ক'রে এরা আঁধার পাড়ার গহ্বরে ঢুকে পড়ে ; আর কোন সাড়াশব্দ নেই।

গঙ্গাচরণের খবর মিথ্যা নয়, একদিন সকলের কাছারিতে ডাক পড়ল। নায়েব বললেন, ভুঁয়ে কেউ লাঙল দিও না, বাছারা। নীলমণি সাঁপুইয়ের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়ে গেছে।

বিশ কুড়ি জন যেন হাহাকার ক'রে উঠল, আমরা খাব কি হুজুর ?

নায়েব বললেন, সে কথা বললে জমিদার শুনবে কেন, বাবা ? জমি তাঁর ; তোমরা বছর বছর কেবল ঠিকা চাষ ক'রে যাও বইতো নয় ! এবারে সুবিধা হয়ে গেল, সাড়ে সাত হাজার টাকা বেশি মুনাফা—তার উপর টাকাটা একসঙ্গে এসে যাবে, কোন হাঙ্গাম-হুজ্জৎ নেই।

—জমিদার কেবল নিজেরটাই দেখলেন—

নায়েব শেষ করতে দিলেন না। বলতে লাগলেন, কেন, শুধু নিজেরটা হবে কেন ? তোমার ঐ নীলমণিও লাল হয়ে যাবে, এই ব'লে দিলাম। শহর যে রকম জেঁকে উঠছে, মাছের দরকার খুব—মাছের সেখানে সোনার দাম।

—শহরের লোকে কি কেবল মাছই খায় ? ভাত খায় না ? ধানের তাদের দরকার নেই ?

নায়েব বললেন, ধান তো কাঁহা কাঁহা মুল্লুক থেকে আসতে পারে। মাছ যে পথে যায়—

গহর আলি বললে, তাদের টাকা আছে, সোনার দামেও কিনে খেতে পারে। আমরা যে ক্ষেতের তলানি খেয়ে বাঁচি ! নায়েব মশায়, তোমরা নিজের আর নীলমণি সাঁপুইয়ের দিকটাই দেখলে, যাট ঘর চাষার দিকে চেয়ে দেখলে না !

লক-গেট উঠে গেল, খালের মুখের বাঁধ কেটে দিলে, টুকরা টুকরা যত খাল ছিল, নোনা জলের ঢেউয়ে তাদের আর চিহ্ন রইল না। জ্যৈষ্ঠ মাসে গহরের দক্ষিণ ঘরের কানাচে দিন রাত জলের ধাক্কা লাগে। বড় পুকুরের কালো জল এরই মধ্যে বিবর্ণ হয়ে গেছে। আগে পাঁচ-সাত ক্রোশ দূর থেকেও নৌকা ক'রে কলসী কলসী ভ'রে নিয়ে যেত, এখন পরীকেই বামুনপাড়া থেকে জল নিয়ে আসতে হয়। সতেজ লাবণ্যভরা ধানগাছে যে সব জায়গা খাঁটা থাকত, মাছের নৌকা সেখানে খটাখট বৈঠা চালিয়ে বেড়ায়। গহর আলি বিলের ধারে ব'সে ব'সে দেখে, যখন-তখন এসে চুপটি ক'রে ব'সে থাকে।

পরী হাত দুখানি ধ'রে বলে, তুমি অত কি ভাব বল তো ?

—যা ভাবি, সে মুখে বলবার কথা নয়, বউ। বলতে বলতে গহর আলি গর্জ্জন ক'রে ওঠে, জানিস, তুই তখন আসিস নি,—এখানে পোড়ো জমি ছিল। নিজের হাতে কারকিত করেছি, জঙ্গল কেটেছি, ভুঁয়ে মাটি তুলেছি। আজ এক হুকুমে সেখানে নোনা জলের বন্যা বইয়ে দিলে। এ সব কি চোখ মেলে দেখা যায় ?

পরী বললে, দেখো না, চল এখান থেকে, যদি কখনও এসে পড়, চোখ বুজে থেক।

—ইচ্ছে করে কি বউ, ওদের একটুখানি দেখিয়ে দিতে পারতাম !

বউ তাড়াতাড়ি গহরের মুখে হাত চাপা দিল। একটুখানি হেসে গহর বললে, জানিস রে, আর ভাত জুটবে না, নোনা জল খেয়ে থাকতে হবে। আর এমনই কপাল, বীরু ভাইও এ সময়টা বাইরে নেই। এত লোকের দুঃখ কখনও সে চুপ ক'রে সইত না, উপায় একটা কিছু করতই।

যাই হোক, আপাতত কোন চিন্তা নেই খালা বাঁধা হচ্ছে। এই উঁচু টিলাটা ছিল গহর আলির মামার বাড়ি, এখানে ধান তুলত। এখন সমান চৌরস ক'রে চোঙের মত বড় বড় খড়ের ঘর উঠেছে। মাটি কেটে চারি পাশে উঁচু বাঁধ দেওয়া হচ্ছে, সকাল-সন্ধ্যা চাষীরা সব কোদাল নিয়ে বেরোয়। এখন মাস দুই এক রকম নিশ্চিন্ত।

সন্ধ্যার সময় মাটির মাপ হয়। কারকুন গোলাম হোসেন মাপকাঠি নিয়ে মাপ করে; পূর্ণ গায়েন থলি-ভর্ত্তি পয়সা-সিকি-দুয়ানি নিয়ে বসে।

গোলাম হোসেন হাঁক দেয়, তিন—তিরিশ।

পূর্ণ বলে, তেরো পয়সা, নাও মিঞা, গুনে গেঁথে নাও।

গোলাম হাঁকে, চার—পুরো।

পূর্ণের সঙ্গে সঙ্গে হিসাব, সাড়ে চোদ্দ পয়সা, ধর।

একুনে কার কত হ'ল, রাস্তায় এসে সকলে হিসাব করতে করতে চলে। গহর আলি এত খাটে, তার চার কি পাঁচ আনার বেশি কোন দিন হয় না। অথচ আর সকলের কারও হয়েছে দশ আনা, কারও বারো আনা—এই রকম।

একদিন সে গোলামকে কথাটা বললে। গোলাম হি-হি ক'রে হাসে। বলে, তুই বড্ড ন্যাকা গহর মিঞা। পয়সা কামাই করতে হ'লে ইয়ের বন্দোবস্ত করতে হয়। জুড়ন মাঝি কত পার্ব্বণী দেয় জানিস? সিকিতে আনা হিসেবে।

গহর বলে, বন্দোবস্ত হয় নি ব'লে আজ তিন হপ্তা ধ'রে এই রকম ফাঁকি দিয়ে আসছিস? মাপ্ আবার, দেখব।

গোলাম হাসতে হাসতে বলে, খুব—খুব। একবার কেন—হাজার বার; মনে সন্দো রাখিস না।

সে মাপ করতে লাগল, এই এক কাঠিতে হ'ল ছ-ফুট, আর এক কাঠি হ'ল বারো, আর এক কাঠি পনর, আর এক কাঠি সতর, আর এক কাঠি—

মাপকাঠি গোলামের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে গহর মারল তার চোয়ালে এক বাড়ি। আর্ত্তনাদ ক'রে গোলাম মাটিতে ব'সে পড়ল। বিশ-কুড়ি জন খালার দিক থেকে ছুটে এল, গহরকে এসে চেপে ধরল; কেউ ধরল হাত, কেউ কান, কেউ চুলের মুঠি।

প্রহরখানেক রাত্রে গহর ক্লান্ত দেহে বাড়ি এল। পরী কাঁদো-কাঁদো গলায় জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে?

—কিছু না, তুই তামাক সাজ।

পরী বললে, হুঁ, সাজতে যাচ্ছি—ব'য়ে গেছে আমার! কাঁদতে কাঁদতে সে তেলের বাটি নিয়ে এল। পিঠের উপর মুখের উপর দড়ির মত ফুলে ফুলে উঠেছে, পরী তেল মালিশ করতে লাগল। এক পশলা বৃষ্টির মত ঝরঝর ক'রে গহরের চোখ দিয়ে হঠাৎ জল নেমে এল;

কি মনে হ'ল—চোখের জলের মধ্যে অতি অস্পষ্ট কণ্ঠে বারম্বার সে বলতে লাগল, মা, মা, বন্দে মাতরম্।

গভীর রাতে গহর টিপিটিপি বেরুচ্ছে। পরীর সজাগ ঘুম, সভয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় যাও গো ?

গহর ফিসফিস ক'রে বলে, শেখহাটির আবাদে, একটা খেপলা জালের খোঁজে গো। আজ ওরা পিঠেই দিয়েছে, পেটের তো কিছু দেয় নি। কাল যে নিরম্বু উপোস, তা ঠাহর করেছিস ?

বাগদীপাড়ায় গিয়ে গহর প্রথমেই গঙ্গাচরণের দাওয়ায় উঠল। গঙ্গাচরণ শুনে লাফিয়ে উঠল—বল কি, মিঞা ? আট ঝুড়ি মাছ প'ড়ে রয়েছে আর বেটারা প'ড়ে প'ড়ে ঘুমুচ্ছে ? পেটে জুত থাকলে ঘুম আসে ঐ রকম! চল চল, খাসা হবে—আমাদের যাত্রাদলের সাজের টাকাটা হয়ে যাবে এইবার।

খাল পেরিয়ে ছায়ামূর্ত্তিরা চলেছে টিপিটিপি। অন্ধকার রাত্রি, কোন দিকে কেউ নেই; খালার উপর তীব্র একটা আলো জ্বলছে, অনেক দূর থেকে দেখা যায়। বাগদীরা বিলের খোলে নেমে দাঁড়াল। মাছের ঝুড়ি রয়েছে বটে; কিন্তু ওরা সকলেই যে ঘুমিয়ে আছে তা নয়, ঝুড়িগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে জন দুই লোক সড়কি হাতে পাহারা দিচ্ছে।

গহর ফিসফিস ক'রে বললে, দেশলাই আছে রে ?

গঙ্গা বললে, উঁহু, এখন কি বিড়ি ধরাবার সময় ?

গহর বললে, বিড়ি নয় ভাই, খালায় আগুন ধরালে কেমন হয় ? ঐ জায়গাটায় আমি ধান তুলতাম, এখন খালা তুলেছে।

যুক্তিটা সকলেই ঘাড় নেড়ে অনুমোদন করল। সবাই আগুন নেবাতে ব্যস্ত থাকবে, মাছ নিয়ে সেই ফাঁকে স'রে পড়বার সুবিধা হবে।

দাউ দাউ ক'রে খালা জ্বলে উঠল। ঐ অত রাত্রে বিলের মধ্যে তখনও মাছ ধরা হচ্ছিল। আগুন দেখে আর চীৎকার শুনে যে যেখানে পারল, নৌকা রেখে বাঁধ ধ'রে ছুটল। নূতন জলকর হয়েছে, চাষীরা সব ক্ষেপে আছে, কখন কি ক'রে বসে বলা যায় না, জেলেদের সকলের সঙ্গে সড়কি রাখবার হুকুম আছে। সকালবেলা শোনা গেল, আলায় মাছ লুঠ করতে এসেছিল, সুবিধা করতে পারে নি, তিন চার জন ধরা পড়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আহত হয়েছে গহর আলি মিঞা।

সেই রাত্রেই গহরকে শহরের হাসপাতালে পাঠান হ'ল। সেখান থেকে আদালতে। একদিন হাজতের মধ্যে চুপিচুপি সে পরীকে বললে, তোর জন্যে ভাবি না বউ, ইচ্ছে হয় বাপের বাড়ি যাস, না হয় মা-ঠাকুরুণের ওখানে গিয়ে থাকিস। বীরু ভাই ভাদ্র মাসে বেরিয়ে আসছে, তবে আর কি। কিন্তু আমার দুঃখ, সমস্ত কথা শুনে ভাই আমার বলবে কি। চোর-ডাকাতকে ওরা ঘেন্না করে। ওরা যায় ফুলের মালা প'রে আর আমি চললাম ডাকাতি ক'রে। ফাটকের মধ্যে দেখা না হ'লে বাঁচি, কি ক'রে তার মুখের দিকে তাকাব।

গহর আলির দু-বছর জেল হয়ে গেল।

বছর-দুই পরে এক সকালে বীরনারায়ণ জেলের ফাটকের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। গহর বেরিয়ে এল। বীরু বলে, চিনতে পার গহর ভাই?

—পারি বইকি ভাই? এত বড় হয়েও আমাদের সকলের জন্য তোমার কত দুঃখ! চিনব না? বন্দে মাতরম্।

বীরু প্রতিধ্বনি করলে, বন্দে মাতরম্। আরও জন-কয়েক লোক সেখানে ছিল, নানা দরকারে তারা জেলের ফটকে এসে দাঁড়িয়েছে। তারাও হেঁকে উঠল, বন্দে মাতরম্।

রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে যায়। একজনে বলে, কোন স্বদেশী বাবু বেরুল বুঝি! থাম, একটুখানি দেখে যাই।

তাদেরই পাশ দিয়ে গহরের হাত ধ'রে বীরনারায়ণ গরুর গাড়ির দিকে যাচ্ছিল। বললে, হ্যাঁ ভাই, বড় স্বদেশী আমাদের গহর আলি। দু-বছর পরে এই বেরুচ্ছে। বল ভাই—বন্দে মাতরম্।

গরুর গাড়ি ক্যাঁচকোঁচ ক'রে অসমান মেঠোপথে চলেছে। গহর ছলছল চোখে বললে, মিছে কথা কেন বললে, বীরু ভাই?

বীরু বললে, কোন্‌টা মিছে?

—এই যেমন আমি স্বদেশী ফাটক গিয়েছি। আমি তো ডাকাত ভাই, খালা লুট করতে গিয়েছিলাম।

বীরনারায়ণ বললে, ও তো একটা ছুতো। আসলে তোমার প্রাণ কাঁদছিল। সুজলা সুফলা আমাদের গাঁয়ের ঐ দশা তুমি দেখতে পারছিলে না। বড় পুকুরে নোনা জল উঠেছে, ধানবন হা হা করছে, একি তোমার সহ্য হয়? খালা লুঠ ক'রে, যা হোক ক'রে তোমার প্রাণ কোথাও আড়ালে গিয়ে একটু জিরতে চাচ্ছিল, আমি কি বুঝি না গহর ভাই?

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে গহর বললে, কিন্তু এ আমাদের নিজেদের ব্যাপার। এতে কি স্বদেশী হ'ল?

বীরু বললে, স্বদেশ কি দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে?

দু-জনে পাশাপাশি চুপ ক'রে রইল। গাড়ি খালের ধারে ধারে চলেছে। গহর হঠাৎ বীরুর হাত দুখানা জড়িয়ে ধরল। বললে, গাঁয়ে তো ফিরছি, একটা কথা বল ভাই—এদ্দিনে আপদ চুকে গেছে তো? নীলমণি সাঁপুই বিদায় হয়েছে? আবার ধান হচ্ছে? ছেলেমেয়েরা বড় পুকুরে চান করতে আসে তেমনই ক'রে? আমার আম-চারায় এবার আম হয়েছিল? তুমি যখন ফিরে এসেছ সমস্ত আবার ঠিক হয়ে গেছে—নয়?

বীরনারায়ণ ম্লানদৃষ্টিতে গহরের চোখের দিকে এক মুহূর্ত্ত চেয়ে রইল। বললে, হয়ে গেছে বইকি, ভাই? তুমি ভেব না ভাই, সব ঠিক আছে।

গরুর গাড়ি বাড়ির সামনে আসতেই অনেকে এসে দাঁড়াল। সবাইকে সরিয়ে বীরু হাত ধ'রে তাকে দাওয়ায় নিয়ে বসাল। গহর ফিসফিস ক'রে জিজ্ঞাসা করে, বীরু ভাই, মা এসেছে তো?

তার পর জোর গলায় হাঁক দেয়, ও মা, মাগো, দুটো মুড়ি দেবে না? কত দিন খাই নি তোমার হাতে। আমার বীরু ভাই আছে দু-জনে কাড়াকাড়ি ক'রে খাব।

মৃদু পায়ে পরী এসে দাঁড়ল। যত পালিয়ে আসুক, গহর তা টের পায়। হাসতে হাসতে বললে, কেমন আছিস বউ?

পরীর ঠোঁট কাঁপতে লাগল; কথা বলতে পারে না, ভয় হয় বুঝি বা কেঁদে ফেলবে। তার পর বললে, তুমি কেমন ছিলে গো?

—ভাল। তবে কষ্ট হ'ত খুব; চারিদিকে ইট আর ইট! আহা-হা, আজ চোখ জুড়চ্ছে। আমরা হলাম চাষার ছেলে, ধানবন না দেখলে বাঁচি?

পরী চমকে উঠল। ও কি পাগল হয়ে গেছে! বললে, কি দেখছ?

ধানবন। কি রকম কালো হয়েছে, দেখ্! কত গাছপালা! আমার আমচারাগুলো কত বড় হয়েছে রে? এবারে আম হয়েছিল?

পরী ভাল ক'রে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল। অর্থহীন লক্ষ্যহীন দৃষ্টি। তার ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছা হ'ল। হায় রে, নোনা জলের তুফান লেগে গহরের নিজের হাতে পোঁতা আমচারাগুলো যে কোন্ কালে ম'রে গেছে! গহর বললে, কি ভাবিস রে বউ? আমার কথার জবাব দিলি না?

ধরা গলায় পরী বললে, অনেক আম হয়েছিল, আমসত্ত্ব ক'রে রেখেছি—তুমি খেয়ো—

—আর, বড় পুকুরের জল মিঠে হয়েছে তো রে? খেতে নোনা লাগে না? আমার জন্য এক গ্লাস নিয়ে আয় দিকি!

—আচ্ছা—ব'লে বউ ছুটে পালাল। গহর তখন বলছে, ও বউ, বলি সেই গীতটা মনে আছে—সুজলাং সুফলাং বন্দে মাতরম্? এখন ভাল লাগে? তার মানে বুঝিস?

পরী তখন ঘরের মেজেয় প'ড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। মার কাছে গিয়ে বলে, মা গো, ও অন্ধ হয়ে গেছে।

মা বললেন, সে তো শুনেছি, মা। তাই শুনে বীরু ওকে জেলে দেখতে গিয়েছিল। তুই দুঃখ পাবি ব'লে তোকে জানায় নি। সেই যে সড়কির খোঁচা লেগেছিল, তার পর ক্রমেই খারাপ হয়ে গেল। কাঁদিস না বেটি, ও এই বাড়ি ঘর দোর বিল বড় ভালবাসত কিনা, তাই তাদের এ দশা ভগবান ওকে আর দেখতে দিলেন না।

বীরু বললে, মা, অন্ধ হয়ে গেছে গহর ভাই, কিন্তু ও দেখতে পাচ্ছে। ও দেখছে—বড় পুকুরে কাকের চোখের মত জল, বিল-ভরা সবুজ ধান, গাছে গাছে ফুল, মানুষের মুখে চোখে হাসি —সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা আমাদের মা। আমাদের চেয়ে ও ভালই দেখছে। আসতে আসতে গহর গাড়িতে সেই সব কত গল্প করলে! মাগো, ভাগ্যবান আমার গহর ভাই—আমরা সব ম'রে আছি যে, যদি বেঁচে থাকতাম সবাই ঐ রকম অন্ধ হ'তে চাইতাম।

বেলা প'ড়ে এল। কাজকর্ম্মের পর বাড়ি ফিরবার মুখে অনেকে গহরের উঠানে এসে বসেছে। নবাবপুরের মুন্সীসাহেব গহরকে খুব ভালবাসতেন, খবর পেয়ে তিনিও এসেছেন।

এসেই তর্ক সুরু হয়েছে। তিনি বলছেন, বেশ তো, বন্দে মাতরম্ বললে আমরা যখন চ'টে যাচ্ছি—জেদাজেদির কি দরকার? আর একটা নতুন কিছু বললেই তো হয়! অবশ্য দেবতা-টেবতা ওসব মানুষ-ক্ষেপানোর জন্যে বলে, দশভুজাকে কখন সুজলা ব'লে পুজো করে না, সেকথা সবাই বোঝে। কিন্তু আর কিছু না হোক—এই গান যিনি লিখেছেন, আমাদের জাতকে তিনি গালি দিয়েছেন, এটা তো মানতে হবে!

বীরনারায়ণ উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ ক'রে উঠল, আমি চালেঞ্জ করছি, বঙ্কিম সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। স্বার্থবাদীরা মিথ্যে দোষারোপ করে। আমি প্রমাণ ক'রে দিচ্ছি—

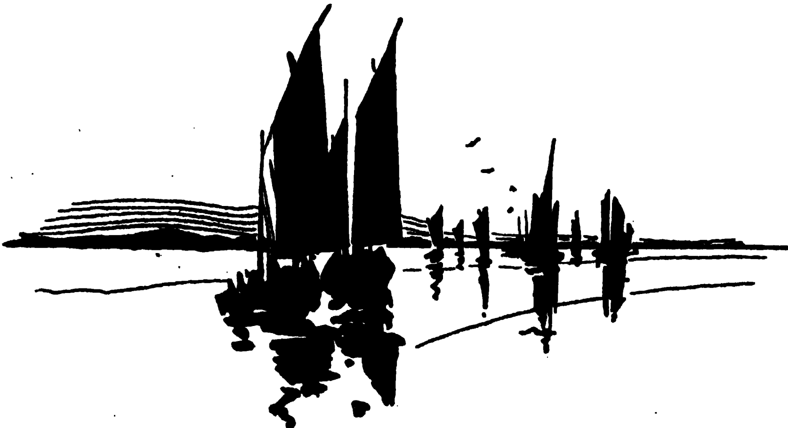
শান্তকণ্ঠে মা বললেন, তার দরকার কি বাবা? আমরা তো কেউ বঙ্কিমের বন্দে মাতরম্ গাই না।

—বঙ্কিমের গান নয়?

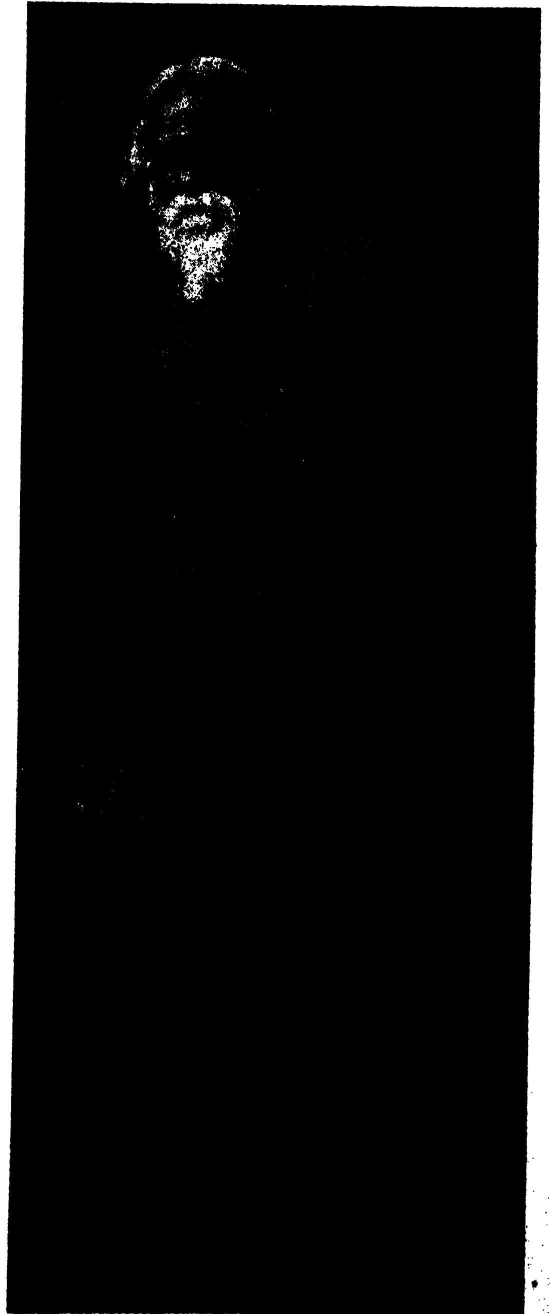
মা বলতে লাগলেন, না, মুন্সীসাহেব। 'আনন্দমঠে'র সন্তানেরা বইয়ের পাতায় আছে, আমার এই সন্তানেরা রক্তে মাংসে চোখের সামনে বেড়াচ্ছে। এদের গান ভোলবার জো নেই। এই বন্দে মাতরম্ আমার বীরুর রক্তে রাঙা হয়ে রয়েছে, এই গান আবার অন্ধ গহরের চোখের জলে ভিজে গেছে। সত্যি যদি গানের জন্মগত দোষ কিছু থাকে, গঙ্গাজলে ধুয়ে ধুয়ে তাতে আর এক কণিকাও ময়লা নেই। আর একটা নতুন কিছু বলবার যে প্রস্তাব করছিলেন, তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবে কে? রাজি আছেন আপনারা?

গহর রুক্ষকণ্ঠে ব'লে উঠল, তুমি বলবে বইকি, মুন্সীসাহেব! তুমি যাও নবাবপুরে—সেখানে ধানবনে নোনা জলে তুফান বয় না, চোখ মেলে উঠানের উপর মরা আমচারাও দেখতে হয় না। তোমরা সুখের মানুষ—মাকে চিনবে কি! তুমি বাড়ি যাও, মুন্সীসাহেব, আমরা এখন বন্দে মাতরম্ গাইব।

সুরহীন কণ্ঠে বন্দে মাতরমের একটি কলি গাইতে গাইতে গহর আলির চোখ জলে ভ'রে গেল।



মুক্তির উপায়



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা

ফকির, স্বামী অচ্যুতানন্দের চেলা। গোঁফ দাড়িতে মুখের বারো আনা অনাবিষ্কৃত। ফকিরের স্ত্রী হৈমবতী। বাপের আদরের মেয়ে, তিনি টাকা রেখে গেছেন ওর জন্যে। ফকিরের বাপ বিশ্বেশ্বর পুত্রবধূকে স্নেহ করেন, পুত্রের অপরিমিত গুরুভক্তিতে তিনি উৎকণ্ঠিত।

পুষ্পমালা এম. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম-হওয়া মেয়ে। দূরসম্পর্কে হৈমর দিদি। কলেজি খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে পাড়াগাঁয়ে বোনের বাড়িতে সংসারটাকে প্রত্যক্ষ দেখতে এসেছে। কৌতূহলের সীমা নেই। কৌতুকের জিনিসকে নানা রকমে পরখ ক'রে দেখছে কখনো নেপথ্যে কখনো রঙ্গভূমিতে। ভারি মজা লাগছে। সকল পাড়ায় তার গতিবিধি, সকলেই তাকে ভালোবাসে।

পুষ্পমালার একজন গুরু আছেন, তিনি খাঁটি বনস্পতি জাতের। অগুরু জঙ্গলে দেশ গেছে ছেয়ে। পুষ্পর ইচ্ছে সেইগুলোতে হাসির আগুন লাগিয়ে খাণ্ডবদাহন করে। কাজ সুরু করেছিল এই নবগ্রামে। শুনেছি বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর পুণ্যকর্মে ব্যাঘাত ঘটেছে। তার পর থেকে পঞ্চশরের সঙ্গে হাসির শর যোগ ক'রে ঘরের মধ্যেই সুমধুর অশান্তি আলোড়িত করেছে। সেই প্রহসনটা এই প্রহসনের বাইরে।

পাশের পাড়ার মোড়ল ষষ্ঠীচরণ। তার ছেলে মাখন দুই স্ত্রীর তাড়ায় সাত বছর দেশছাড়া। ষষ্ঠীচরণের বিশ্বাস পুষ্পর অসামান্য বশীকরণ-শক্তি। সেই পারবে মাখনকে ফিরিয়ে আনতে। পুষ্প শুনে হাসে আর ভাবে যদি সম্ভব হয় তবে প্রহসনটাকে সে সম্পূর্ণ ক'রে দেবে। এই নিয়ে রবি ঠাকুর নামে একজন গ্রন্থকারের সঙ্গে মাঝে মাঝে সে পত্রব্যবহার করেছে।

প্রথম দৃশ্য

ফকির। পুষ্পমালা। হৈমবতী।

ফকির

সোহং সোহং সোহং।

পুষ্প

ব'সে ব'সে আওড়াচ্ছ কী ?

ফকির

গুরুমন্ত্র।

পুষ্প

কতদূর এগোলো ?

ফকির

এই ইড়া নাড়িটার কাছ পর্যন্ত এসে গেল থেমে।

পুষ্প

হঠাৎ থামে কেন ?

ফকির

ঐ আমার ছিঁচকাঁদুনি খুকিটার কীর্তি। মন্তরটা গুরগুর গুরগুর করতে করতে দিব্যি উঠছিল উপরের দিকে ঠেলে। বোধ হয় আর সিকি ইঞ্চি হ'লেই পিঙ্গলার মধ্যে ঢুকে পড়ত, এমন সময় মেয়েটা নাকিসুরে চীৎকার ক'রে উঠল,—বাবা নচক্নুস্। দিলুম ঠাস ক'রে গালে এক চড়, ভ্যাঁ ক'রে উঠল কেঁদে, অমনি এক-চমকে মন্তরটা নেমে পড়ল পিঙ্গলার মুখ থেকে একেবারে নাভীগহ্বর পর্যন্ত। সোহং ব্রহ্ম, সোহং ব্রহ্ম।

পুষ্প

তোমার গুরুর মন্তরটা কি অজীর্ণ রোগের মতো ? নাড়ির মধ্যে গিয়ে—

ফকির

হাঁ দিদি, নাড়ির মধ্যে ঘুটঘাট ঘুটঘাট করছেই—ওটা বায়ু কিনা।

পুষ্প

বায়ু নাকি ?

ফকির

তা না তো কী ? শব্দ ব্রহ্ম—ওতে বায়ু ছাড়া আর কিছুই নেই। ঋষিরা যখন কেবলি বায়ু খেতেন তখন কেবলি বানাতেন মন্তর।

পুষ্প

বলো কি ?

ফকির

নইলে অতটা বায়ু জমতে দিলে পেট যেত ফেটে। নাড়ি যেত পটপট ক'রে ছিঁড়ে বিশখানা হয়ে।

পুষ্প

উঃ, তাই তো বটে—একেবারে চার বেদভরা মন্ত্র—কম হাওয়া তো লাগে নি।

ফকির

শুনলেই তো বুঝতে পার, ঐ যে ও—ম্, ওটা তো নিছক বায়ু উদ্গার। পুণ্য বায়ু, জগৎ পবিত্র করে।

পুষ্প

এত সব জ্ঞানের কথা পেলে কোথা থেকে? আমরা হ'লে তো পাগল হয়ে যেতুম।

ফকির

সবই গুরুর মুখ থেকে। তিনি বলেন কলিতে গুরুর মুখই গোমুখী—মন্ত্রগঙ্গা বেরচ্ছে কল্‌কল্ ক'রে।

পুষ্প

বি. এ.তে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে খেটে মরেছি মিথ্যে। অজীর্ণ রোগেও ভুগেছি, সেটা কিন্তু পাকযন্ত্রের, ইড়াপিঙ্গলার নয়।

ফকির

এতেই বুঝে নাও—গুরুর কৃপা। তাই তো আমার নাড়ির মধ্যে মন্তরটা প্রায়ই ডাক ছাড়ে গুরু গুরু গুরু শব্দে।

পুষ্প

আচ্ছা, ডাকটা কি আহারের পরে বাড়ে?

ফকির

তা বাড়ে বটে।

পুষ্প

গুরু কী বলেন?

ফকির

তিনি বলেন, পেটের মধ্যে স্থূলে সূক্ষ্মে লড়াই, যেন দেবে দৈত্যে। খাদ্যের সঙ্গে মন্ত্রের বেধে যায় যেন গোলাগুলি বর্ষণ, নাড়িগুলো উচ্চস্বরে গুরুকে স্মরণ করতে থাকে।

হৈম

দুঃখের কথা আর কী বলব দিদি! পেটের মধ্যে গুরুর স্মরণ চলছে, বাইরেও বিরাম নেই। চরণদাস বাবাজি আছেন ওঁর গুরুভাই, সে লোকটার দয়ামায়া নেই, ওঁকে গান শেখাচ্ছেন। পাড়ার লোকেরা—

পুষ্প

চুপ চুপ চুপ, পতিব্রতা তুমি। স্বামীর কণ্ঠ যখন চলে, সাধ্বীরা প্রাণপণে থাকেন নীরবে। ফকিরদা, গলায় গান শানাচ্ছ কেন, গান্ধিজির অহিংসানীতির কথা শোন নি?

হৈম

তোমরা দুজনে তত্ত্বকথা নিয়ে থাক। আমাকে যেতে হবে মাছ কুটতে। আমি চললুম।

(প্রস্থান)

ফকির

আমার কথাটা বুঝিয়ে বলি। গুরুর মন্ত্র, যাকে বলে, গুরুপাক। খুব বেশি যখন জমে ওঠে অন্তরে, তখন সমস্ত শরীরটা ওঠে পাক দিয়ে; নাচের ঘূর্ণি উঠতে থাকে পায়ের তলা থেকে উপরের দিকে; আর ঘানি ঘুরলে যে রকম আওয়াজ দিতে চায়, ভক্তির ঘোরে সেই রকম গানের আওয়াজ ওঠে গলার ভিতর দিয়ে। এই দেখ না এখনি সাধনার নাড়া লেগেছে একেবারে মূলাধার থেকে, উঃ!

পুষ্প

কী সর্বনাশ! ডাক্তার ডাকব নাকি?

ফকির

কিছু করতে হবে না। একবার পেটভরে নেচে নিতে হবে। গুরু বলেছেন, গুরুর মন্ত্রটা হ'ল ধারক, আর নৃত্যটা হ'ল সারক, দুটোরই খুব দরকার। (উঠে দাঁড়িয়ে নৃত্য)

গুরুচরণ করো শরণ-অ
ভবতরঙ্গ হবে তরণ-অ
সুধাক্ষরণ প্রাণ ভরণ-অ
মরণভয় হবে হরণ-অ।

পুষ্প

শুধু মরণভয় হরণ নয়, দাদা। গুরুদক্ষিণার চোটে স্ত্রীর গয়না, বাপের তহবিল হরণও চলছে পুরো দমে।

ফকির

ঐ দেখ, বাবা আসছেন বৌকে নিয়ে, বড় ব্যাঘাত, বড় ব্যাঘাত। গুরো।

পুষ্প

ব্যাঘাতটা কিসের?

ফকির

স্থুলরূপে ওঁরা আমাকে ফকির ব'লেই জানেন।

পুষ্প

আরো একটা রূপ আছে না কি?

ফকির

ক্ষয় হয়ে গেছে আমার ফকির দেহটা ভিতরে ভিতরে। কেবলি মিলে যাচ্ছে গুরুদেহের সূক্ষ্মরূপে। বাইরে পড়ে আছে খোলসটা মাত্র। ওঁরা আসলটাকে কিছুতেই দেখবেন না।

পুষ্প

খোলসটা যে অত্যন্ত বেশি দেখা যাচ্ছে। একেবারেই স্বচ্ছ নয়।

ফকির

দৃষ্টিশুদ্ধি হ'তে দেরি হয়। কিন্তু সব আগে চাই বিশ্বাসটা। ভগবৎকৃপায় এঁদের মনে যদি কখনো বিশ্বাস জাগে, তা হ'লে গুরুদেহে আর ফকিরের দেহে একেবারে অভেদ রূপ দেখতে পাবেন—তখন বাবা—

পুষ্প

তখন বাবা গয়ায় পিণ্ডি দিতে বেরবেন।

(ফকিরের প্রস্থান)

(বিশ্বেশ্বর ও হৈমবতীর প্রবেশ)

বিশ্বেশ্বর

(হৈমর প্রতি) বেয়াই ব্যাঙ্কে তোমার নামে কিছু টাকা রেখে গেছেন। ফকির সেটা জানে, তাই তো ওর কিছু হ'ল না।

পুষ্প

আর কী হ'লে আর কী হ'ত, সে ভাবতে গেলে মাথা ধ'রে যায়।

বিশ্বেশ্বর

ম্যাকিননের হেড্‌বাবু আমার বন্ধুর শ্যালীপতি, সে বলেছিল ফকির যা হয় একটা কিছু পাস করলেই তাকে এসিস্টেণ্ট স্টোরকীপার ক'রে দেবে। বাঁদরটা কেবল জেদ ক'রেই বারে বারে ফেল করতে লাগল।

পুষ্প

ফেল করবার বিশ্রী জেদ আরো অনেক ছেলের দেখেছি। মিত্তিরদের বাড়ির মোতিলাল আমার সঙ্গে একসঙ্গেই পড়া আরম্ভ করেছিল, ম্যাট্রিকের এ পারের খোঁটা এমনি বিষম জেদ ক'রে আঁকড়িয়ে রইল, ওর পিসেমশায় ওর কানে ধ'রে ঝিঁকে মারতে মারতে কান প্রায় ছিঁড়ে দিলেন কিন্তু পার করতে পারলেন না। চল্ ভাই হৈমি, পড়া করবি আয়—স্বামীর হয়ে পাস করার কাজটা তুই সেরে রাখবি চল্।

বিশ্বেশ্বর

যাও পড়তে, কিন্তু শোন মা, ফকির টাকা চাইলেই তুমি ওকে দাও কেন ?

হৈম

কী করব বাবা, টাকা টাকা ক'রে উনি বড় অশান্তি বাধান।

বিশ্বেশ্বর

ঐ দেখ না, একটা রোঁওয়া-ওঠা বাঘের চামড়ার উপর ব'সে বিড়বিড় ক'রে বকছে।—এই ফকির, শুনে যা বাঁদর। শুনে যা বলছি।

পুষ্প

মেসোমশায়, তোমার বুঝি সাহস হয় না ওকে ওর গণ্ডিটা থেকে টেনে আনতে!

বিশ্বেশ্বর

সত্যি কথা বলি, মা, ভয় ভয় করে। ওর সব মন্তর-তন্তর ঠিক যে মানি তাও নয়, আবার না মানবার মতো বুকের পাটাও নেই। দেখ না ওখানটায় কী রকম খুদে পাগলা-গারদ সাজিয়েছে। গুরু কবে পাঁঠা খেয়েছিল তার মুড়োর খুলিটা রেখেছে পশমের আসনে।

পুষ্প

ঐ জায়গাটাকে ও নাম দিয়েছে মোক্ষধাম। গুরুর সিগারেট-খাওয়া দেশলাই-কাঠিগুলো কাটা কাঁচকলার টুকরোর উপর পুঁতে পুঁতে গণ্ডি বানিয়েছে। ও বলে, কাঠিগুলোর আলো কিছুতেই নেবে না, যার দিব্যদৃষ্টি আছে সে চোখ বুজলেই দেখতে পায়। গুরুর একটা চা-সেটের ভাঙা পিরিচ এনেছে, সেটার প্রতিষ্ঠা হয়েছে গুরুর বর্মা চুরুটের প্যাকবাক্সে। গুরু ভালোবাসেন সাড়ে আঠারো ভাজা, কিনে এনে নৈবেদ্য দেয় ঐ পিরিচ ভ'রে। বলে, ঐ পিরিচে যে পেয়ালা ছিল এক কালে, তার অদৃশ্যরূপ গুরুর অদৃশ্য প্রসাদ ঢালতে থাকে। মোক্ষধাম ভ'রে যায় দার্জিলিং চায়ের গন্ধে।

বিশ্বেশ্বর

আচ্ছা মা, ঐ বড় বড় বোতলগুলো কী করতে সাজিয়ে রেখেছে! ওর মধ্যে গুরুর ফীভার মিক্‌শ্চারের অদৃশ্যরূপ ভ'রে রেখেছে না কি!

পুষ্প

বল্ না হৈমি, ওগুলো কিসের জন্যে?

হৈম

দক্ষিণা পেলেই গুরু তালপাতার উপর গীতার শ্লোক লিখে সেগুলো জল দিয়ে ধুয়ে দেন। গীতা-ধোওয়া জলে ঐ বোতলগুলো ভরা। তিন সন্ধ্যে স্নান ক'রে তিন চুমুক ক'রে খান। ওঁর বিশ্বাস ওঁর রক্তে গীতার বন্যা বয়ে যাচ্ছে। আমার সংসার খরচের দশ টাকার পাঁচখানা নোট ঐ বন্যায় গেছে ভেসে। যাই আমার কাজ আছে।

(প্রস্থান)

বিশ্বেশ্বর

ওরে ও ফকরে!

পুষ্প

আচ্ছা, আমি ওকে নিয়ে আসছি। (কাছের দিকে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে) ও ফকিরদা, করেছ কী!

ফকির

কেন, কী হয়েছে?

পুষ্প

গুরু হাঁসের ডিমের বড়া খেয়েছিলেন তার খোলাটা প'ড়ে গেছে তোমার চাদর থেকে বারান্দার কোণে।

ফকির

(লাফ দিয়ে উঠে) এঃ, ছি ছি করেছি কী !

পুষ্প

হতভাগা হাঁসটাকে পর্যন্ত বঞ্চিত করলে তুমি ! সে তোমার পিছনে পিছনে প্যাঁক প্যাঁক করতে করতে যেত বৈকুণ্ঠধামে—সেখানে পাড়ত স্বর্গীয় ডিম।

ফকির

(বেরিয়ে এসে খোলাটা নিয়ে বারবার মাথায় ঠেকালে)

ক্ষমা ক'রো গুরু, ক্ষমা ক'রো—এ অণ্ড জগদ্ ব্রহ্মাণ্ডের বিগ্রহ—এর মধ্যে আছে চন্দ্র সূর্য, আছে লোকপাল দিকপালরা সবাই। গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে আনিগে।

পুষ্প

(চাদর চেপে ধ'রে) এনো, এখন তোমার বাবার কথাটা শুনে নাও।

(চাদরের খুঁটে ডিম বেঁধে ফকির বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করলে)

বিশ্বেশ্বর

বাপু, ভক্তিটা খাটো ক'রে আমার উক্তিটা মানো।

ফকির

কী আদেশ করেন ?

বিশ্বেশ্বর

আর একবার পাস করবার চেষ্টা ক'রে দেখ।

ফকির

পারব না বাবা।

বিশ্বেশ্বর

কী পারবি নে ? পাস করতে, না পাস করবার চেষ্টা করতে ?

ফকির

চেষ্টা আমার দ্বারা হবে না।

বিশ্বেশ্বর

কেন হবে না ?

ফকির

গুরুজি বলেন, পাশ শব্দের অর্থ বন্ধন। প্রথমে পাস তার পরেই চাকরি।

বিশ্বেশ্বর

লক্ষ্মীছাড়া ! কী ক'রে চলবে তোমার ! আমার পেন্সেনের উপর ? আমি কি তোমাকে খাওয়াবার জন্যে অমর হয়ে থাকব ? একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—বৌমার কাছে টাকা চাইতে তোর লজ্জা করে না ? পুরুষমানুষ হয়ে স্ত্রীর কাছে কাঙালপনা !

ফকির

আমি নিজের জন্যে এক পয়সা নিই নে।

বিশ্বেশ্বর

তবে নিস্ কার জন্যে?

ফকির

ওঁরি সদ্গতির জন্যে।

বিশ্বেশ্বর

বটে? তার মানে?

ফকির

আমি তো সবই নিবেদন করি গুরুজির ভোগে। তার ফলের অংশ উনিও পাবেন।

বিশ্বেশ্বর

অংশ পাবেন বটে! উনিই ফল পাবেন আঁঠিসুদ্ধ। ছেলেপুলেরা মরবে শুকিয়ে।

ফকির

আমি কিছুই জানি নে। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) যা করেন গুরু।

বিশ্বেশ্বর

বেরো, বেরো আমার সামনে থেকে লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর। তোর মুখ দেখতে চাই নে।

(প্রস্থান)

(হৈমবতীর প্রবেশ)

ফকির

কা তব কান্তা—।

হৈমবতী

কী বকছ?

ফকির

কা তব কান্তা? কোন্ কান্‌তা হ্যায়?

হৈমবতী

হিন্দুস্থানী ধরেছ? বাংলায় বল।

ফকির

বলি, কাঁদছে কে?

হৈমবতী

তোমারি মেয়ে মিস্তু।

ফকির

হায় রে, একেই বলে সংসার। কাঁদিয়ে ভাসিয়ে দিলে।

হৈমবতী

কাকে বলে সংসার ?

ফকির

তোমাকে।

হৈমবতী

আর তুমি কী ! মুক্তির জাহাজ আমার ! তোমরা বাঁধ না, আমরাই বাঁধি !

ফকির

গুরু বলেছেন, বাঁধন তোমাদেরই হাতে।

হৈমবতী

আমি তোমাকে যদি বেঁধে থাকি সাত পাকে, তোমার গুরু বেঁধেছেন সাতান্ন পাকে।

ফকির

মেয়েমানুষ—কী বুঝবে তুমি তত্ত্বকথা ! কামিনী কাঞ্চন—

হৈম

দেখ ভণ্ডামি ক'রো না। কাঞ্চনের দাম তোমার গুরুজি কতখানি বোঝেন সে আমাকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আর কামিনীর কথা বলছ ! ঐ মূর্খ কামিনীগুলোই পায়ের ধূলো নিয়ে পায়ে কাঞ্চন যদি না ঢালত তা হ'লে তোমার গুরুজির পেট অত মোটা হ'ত না। একটা খবর তোমাকে দিয়ে রাখি। এ বাড়ি থেকে একটা মায়া তোমার কাটবে। কাঞ্চনের বাঁধন খসল তোমার। শ্বশুরমশায় আমাকে দিব্যি গালিয়ে নিয়েছেন, আমার মাসহারা থেকে তোমাকে এক পয়সাও আর দিতে পারব না।

(পুষ্পর প্রবেশ)

পুষ্প

ফকিরদা ! মানে কী ? তোমার শোবার ঘর থেকে পাওয়া গেল মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ! অনিদ্রার পাঁচন না কি ?

ফকির

(ঈষৎ হেসে) তোমরা কী বুঝবে—মেয়েমানুষ !

পুষ্প

কৃপা ক'রে বুঝিয়ে দিতে দোষ কী !

(ফকির হাস্যমুখে নীরব)

হৈম

কী জানি ভাই, ওখানা উনি বালিশের নীচে রেখে রাত্তিরে ঘুমোন।

পুষ্প

বেদমন্ত্রগুলোকে তলিয়ে দেন ঘুমের তলায় ! এ বই পড়তে গেলে যে তোমাকে ফিরে যেতে হবে সাতজন্ম পূর্বে।

ফকির

গুরুকৃপায় আমাকে পড়তে হয় না।

পুষ্প

ঘুমিয়ে পড়তে হয়।

ফকির

এই পুঁথি হাতে তুলে নিয়ে তিনি এর পাতায় পাতায় ফুঁ দিয়ে দিয়েছেন, জ্বলে উঠেছে এর আলো, মলাট ফুঁড়ে জ্যোতি বেরতে থাকে অক্ষরের ফাঁকে ফাঁকে, ঢুকতে থাকে সুষুম্না নাড়ির পাকে পাকে।

পুষ্প

সে জন্যে ঘুমের দরকার ?

ফকির

খুবই। আমি স্বয়ং দেখেছি গুরুজিকে, দুপুরবেলা আহারের পর ভগবদ্গীতা পেটের উপর নিয়ে চিৎ হয়ে প'ড়ে আছেন বিছানায়—গভীর নিদ্রা। বারণ ক'রে দিয়েছেন সাধনায় ব্যাঘাত করতে। তিনি বলেন, ইড়াপিঙ্গলার মধ্য দিয়ে শ্লোকগুলো অন্তরাত্মায় প্রবেশ করতে থাকে, তার আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যায়। অবিশ্বাসীরা বলে, নাক ডাকে; তিনি হাসেন, বলেন, মূঢ়দের নাক ডাকে; ইড়াপিঙ্গলা ডাকে জ্ঞানীদের—নাসারন্ধ্র আর ব্রহ্মরন্ধ্র ঠিক এক রাস্তায়, যেন চিৎপুর আর চৌরঙ্গী।

পুষ্প

ভাই হৈমি, ফকিরদার ইড়াপিঙ্গলা আজকাল কী রকম আওয়াজ দিচ্ছে ?

হৈম

খুব জোরে। মনে হয় পেটের মধ্যে তিনটে চারটে ব্যাং মরীয়া হয়ে উঠেছে।

ফকির

ঐ দেখ, শুনলে পুষ্পদিদি ? আশ্চর্য ব্যাপার ! সত্যি কথা না জেনেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। গুরুজি ব'লে দিয়েছেন, মাণ্ডুক্য উপনিষদের ডাকটাই হচ্ছে ব্যাঙের ডাক। অন্তরাত্মা চরম অবস্থায় নাভীগহ্বরে প্রবেশ ক'রে হয়ে পড়েন কূপমণ্ডুক, চারদিকের কিছুতেই আর নজর পড়ে না। তখনি পেটের মধ্যে কেবলি শিবোহং শিবোহং শিবোহং ক'রে নাড়িগুলো ডাক ছাড়তে থাকে। সেই ঘুমেতে কী গভীর আনন্দ সে আমিই জানি—যোগনিদ্রা একেই বলে।

হৈম

একদিন মিন্তু কেঁদে উঠে ওঁর সেই ব্যাং-ডাকা ঘুম ভাঙিয়ে দিতেই তাকে মেরে খুন করেন আর কি।

পুষ্প

ফকিরদা, সংস্কৃতে অনার্স নিয়েছিলুম, আমাকে পড়তে হয়েছিল মাণ্ডুক্যের কিছু কিছু। নাকের মধ্যে গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে হেঁচে হেঁচে ঘুম ভাঙিয়ে রাখতে হ'ত। হাঁচির চোটে নিরেট ব্রহ্মজ্ঞানের বারো আনা তরল হয়ে নাক দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল। ইড়াপিঙ্গলা রইল বেকার হয়ে। অভাগিনী আমি গুরুর ফুঁয়ের জোরে অজ্ঞান সমুদ্র পার হ'তে পারলেম না।

ফকির

(ঈষৎ হেসে) অধিকার ভেদ আছে

পুষ্প

আছে বই কি। দেখ না, ঐ শাস্ত্রেই ঋষি কোন্ এক শিষ্যকে দেখিয়ে বলেছেন, সোয়মাত্মা চতুষ্পাৎ— এর আত্মাটা চারপাওয়ালা। অধিকার ভেদকেই তো বলে দুপা চারপায়ের ভেদ। হৈম, রাত্রে তো ব্যাঙের ডাক শুনে জেগে থাকিস্, আর কোনো জাতের ডাক শুনিস কি দিনের বেলায় ?

হৈম

কী জানি ভাই, মিস্ত দৈবাৎ ওঁর মন্ত্রপড়া জলের ঘটি উল্‌টিয়ে দিতেই উনি যে হাঁক দিয়ে উঠেছিলেন, সেটা—

পুষ্প

হাঁ, সেটা চারপেয়ে ডাক। মিলছে এই শাস্ত্রের সঙ্গে।

ফকির

সোহং ব্রহ্ম সোহং ব্রহ্ম সোহং ব্রহ্ম।

পুষ্প

ফকিরদা, তপস্যা যখন ভেঙেছিল, শিব এসেছিলেন তাঁর বরদাত্রীর কাছে—তোমার তপস্যা এবার গুটিয়ে নাও, এই দেখ বরদাত্রী অপেক্ষা ক'রে আছেন লালপেড়ে শাড়িখানি প'রে।

হৈমবতী

পুষ্পদিদি, বরদাত্রীর জন্যে ভাবনা নেই, পাড় দেখা দিচ্ছে রঙ বেরঙের।

পুষ্প

বুঝেছি, গেরুয়া রঙের ছটা বুঝি ঘরের দেয়াল পেরিয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে ?

হৈমবতী

এরই মধ্যে আসতে আরম্ভ করেছেন দুটি একটি ক'রে বরদাত্রী। গেরুয়া রঙের নেশা মেয়েরা সামলাতে পারে না। পোড়াকপালীদের মরণদশা আর কি! সেদিন এসেছিল একজন বেহায়া মেয়ে ওঁর কাছে মুক্তিমন্ত্র নেবে ব'লে, হবি তো হ, আমারি ঘরে এসে পড়েছিল—দুটো একটা খাঁটি কথা শুনিয়েছিলুম, মুক্তিমন্ত্রেরই কাজ করেছিল, গেল মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বেরিয়ে।

ফকির

দেখ, আমার মাণ্ডুক্যটা দাও।

পুষ্প

কী করবে ?

ফকির

নারীর হাত লেগেছে গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে আনিগে।

পুষ্প

সেই ভালো, বুদ্ধি দিয়ে ধোওয়াটা তো হ'ল না এ জন্মে।

ফকির

শুনে যাও হৈম। আজকে গুরুগৃহে নবরত্ন দান ব্রত। আমি তাঁকে দেব সোনা, একটা গিনি চাই।

হৈমবতী

দিতে পারব না, শ্বশুর মশায় পা ছুঁইয়ে বারণ করেছেন।

পুষ্প

তোমার গুরুজির বুঝি কাঞ্চনে অরুচি নেই!

ফকির

তাঁর মহিমা কী বুঝবে তোমরা! কাঞ্চন পড়তে থাকে তাঁর ঝুলির মধ্যে আর তিনি চোখ বুজে বলেন—হুং ফট্। বাস্, একেবারে ছাই হয়ে যায়—যারা তাঁর ভক্ত তাদের এ স্বচক্ষে দেখা।

পুষ্প

ঝুলিতে যদি ছাই ভরবারই দরকার থাকে, কাঠের ছাই আছে, কয়লার ছাই আছে, সোনার ছাই দিয়ে বোকামি কর কেন?

ফকির

হায় রে, এইটেই বুঝলে না! গুরুজি বলেছেন, মহাদেবের তৃতীয় নেত্রে দগ্ধ হয়েছিলেন কন্দর্প, সোনার আসক্তি ছাই করতেই গুরুজির আবির্ভাব ধরাধামে। স্থূল সোনার কামনা ভস্ম ক'রে কানে দেবেন সূক্ষ্ম শোনা, গুরুমন্ত্র।

পুষ্প

আর সহ্য হচ্ছে না, চল্ ভাই হৈমি, তোর পড়া বাকী আছে।

ফকির

সোহং ব্রহ্ম সোহং ব্রহ্ম সোহং ব্রহ্ম।

পুষ্প

(খানিক দূরে গিয়ে ফিরে এসে) র'সো ভাই, একটা কথা আছে, ব'লে যাই। ফকিরদা, শুনেছি তোমার গুরু আমার সঙ্গে একবার দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

ফকির

হাঁ, তিনি শুনেছেন তুমি বেদান্ত পাস করেছ। তিনি আমাকে ব'লে রেখেছেন নিশ্চয় তোমাকে তাঁর পায়ে এসে পড়তে হবে, বেদান্ত যাবে কোথায় ভেসে! সময় প্রায় হয়ে এল।

পুষ্প

বুঝতে পারছি। ক'দিন ধ'রে কেবলি বাঁ চোখ নাচছে।

ফকির

নাচছে, বটে! ঐ দেখ অব্যর্থ তাঁর বাক্য। টান ধরেছে।

পুষ্প

কিন্তু আগে থাকতে ব'লে রাখছি, ছাই ক'রে দেবার মতো মালমসলা আমার মধ্যে বেশি পাবেন না। যা ছিল সব পাস করতে করতে য়ুনিভার্সিটির আঁস্তাকুড়ে ভর্তি ক'রে দিয়েছি।

হৈমবতী

কী বলছ ভাই পুষ্পদিদি! কোন্ ভূতে আবার তোমাকে পেল?

পুষ্প

কী জানি ভাই, দেশের হাওয়ায় এটা ঘটায়। বুদ্ধিতে কাঁপন দিয়ে হঠাৎ আসে যেন ম্যালেরিয়ার গুরুগুরুনি। মনে হচ্ছে রবি ঠাকুরের একটা গান শুনেছিলুম—

গেরুয়া ফাঁদ পাতা ভুবনে

কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে!

ফকির

পুষ্পদি, তুমি যে এতদূর এগিয়েছ তা আমি জানতুম না। পূর্বজন্মের কর্মফল আর কি!

পুষ্প

নিশ্চয়ই, অনেক জন্মের অবুদ্ধিকে দম দিতে দিতে এমন অদ্ভুত বুদ্ধি হঠাৎ পাক খেয়ে ওঠে—তার পরে আর রক্ষে নেই।

ফকির

উঃ, আশ্চর্য! ধন্য তুমি! সংসারে কেউ কেউ থাকে যারা একেবারেই—কী বলব!

পুষ্প

একেবারে শেষের দিক থেকেই স্বুরু করে। রবি ঠাকুর বলেছেন—

যখনি জাগিলে বিশ্বে পূর্ণ প্রস্ফুটিতা।

ফকির

বা বা, বেশ বলেছেন রবি ঠাকুর—আমি তো কখনো পড়ি নি!

পুষ্প

ভালো করেছ, পড়লে বিপদেই পড়তে। ভাই হৈমি, তোর সেই মটরদানার চুনলী হারটা আমাকে দে দেখি। মহাপুরুষদের দর্শনে খালি হাতে যেতে নেই।

হৈম

কী বল দিদি! ও যে আমার শাশুড়ীর দেওয়া!

পুষ্প

এ মানুষটিও তো তোর শাশুড়ীর দেওয়া, এও যেখানে তলিয়েছে ওটাও সেখানে যাবে না হয়।

ফকির

অবোধ নারী, আসক্তি ত্যাগ কর, গুরুচরণে নিবেদন কর যা কিছু আছে তোমার।

পুষ্প

হৈমি, বিশ্বাস ক'রে দাও আমার হাতে, লোকসান হবে না।

ফকির

আহা, বিশ্বাস—বিশ্বাসই সব! আমার ছোট ছেলেটার নাম দেব—অমূল্যধন বিশ্বাস।

পুষ্প

হৈমি, ভয় নেই, আমার সাধনা হারাধন ফেরানো। গুরুকৃপায় সিদ্ধিলাভ হবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গুরুধাম

(শিষ্যশিষ্যাপরিবৃত গুরু। জটাজাল বিলম্বিত পিঠের উপরে। গেরুয়া চাদরখানা স্থূল উদরের উপর দিয়ে বেঁকে পড়েছে, ঘোলা জলের ঝরণার মতো। ধূপ ধুনা। গদির এক পাশে খড়ম, যারা আসছে খড়মকে প্রণাম করছে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলছে, গুরো। গুরুর চক্ষু মুদ্রিত, বুকের কাছে দুই হাত জোড়া। মেয়েরা থেকে থেকে আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে। দুজন দুপাশে দাঁড়িয়ে পাখা করছে। অনেকক্ষণ সব নিস্তব্ধ। হঠাৎ চোখ খুলে)

গুরু

এই যে তোমরা সবাই এসেছ, জানতেই পারি নি। সিদ্ধিরস্তু সিদ্ধিরস্তু। এখন মন দিয়ে শোন আমার কথা।

সেবক

মন তো প'ড়েই আছে গুরুর চরণে।

(শিষ্যাদের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না)

গুরু

আজ তোমাদের বড় কঠিন পরীক্ষা। মুক্তির সাতটা দরজার মধ্যে এইটে হ'ল তিনের দরজা। শিবোহং শিবোহং শিবোহং। এইটে কোনমতে পেরলে হয়। যাদের ধনের থলি ফেঁপে উঠেছে উদুরি রুগির পেটের মতো, তারা এই সরু দরজায় যায় আটকে, জাঁতাকলের মতো।

সকলে

হায় হায় হায়, হায় হায় হায়!

গুরু

এইখেনে এসে মুক্তির ইচ্ছেতেই ঘটে বাধা। কেউ ব'সে পড়ে, কেউ ফিরে যায়। তারপরে এক-দুই-তিন, ঘণ্টা পড়ল, বাস্—হয়ে গেল, ডুবল নৌকো, আর টিকি দেখবার জো থাকে না। ক্রিং ক্রিং ক্রম্।

সকলে

হায় হায় হায়, হায় হায় হায়!

গুরু

এতকাল আমার সংসর্গে থেকে তোমাদের ধনের লোভ কিছু হালকা হয়েছে যদি দেখি, তা হ'লে আর মার নেই। এইবার তবে শুরু হোক। ওহে চরণদাস, গানটা ধর।

গুরুপদে মন কর অর্পণ
ঢাল ধন তাঁর ঝুলিতে—
লঘু হবে ভার রবে নাকো আর
ভবের দোলায় হুলিতে।
হিসাবের খাতা নাড়ো ব'সে ব'সে,
মহাজনে নেয় সুদ ক'ষে ক'ষে,
খাঁটি যেই জন সেই মহাজনে
কেন থাক হায় ভুলিতে,
দিন চ'লে যায় ট্যাঁকে টাকা হায়,
কেবলি খুলিতে তুলিতে।

গুরু

কী নিতাই, চুপ ক'রে ব'সে ব'সে মাথা চুলকচ্ছ যে? মন খারাপ হয়ে গেছে বুঝি! আচ্ছা, এই নে, পায়ের ধুলো নে।

নিতাই

তা গুরুর কাছে মিথ্যে কথা বলব না। খুবই ভাবনা আছে মনে। কাল সারারাত ধস্তাধস্তি ক'রে স্ত্রীর বাক্স ভেঙে বাজুবন্দজোড়া এনেছি।

গুরু

এনেছ, তবে আর ভাবনা কী?

নিতাই

প্রভো, ভাবনা তো এখন থেকেই। বউ বলেছে, ঘরে যদি ফিরি তবে ঝাঁটাপেটা ক'রে দূর ক'রে দেবে।

গুরু

সেজন্যে এত ভয় কেন?

নিতাই

এ মারটা প্রভুর জানা নেই, তাই বলছেন।

গুরু

নারদসংহিতায় বলে, দাম্পত্যকলহে চৈব—ঝগড়া দুদিনে যাবে মিটে।

নিতাই

ঐ নারীটিকে চেনেন না। সীতা সাবিত্রীর সঙ্গে মেলে না। নাম দিয়েছি হিড়িম্বা। তা বরঞ্চ যদি অনুমতি পাই তা হ'লে দ্বিতীয় সংসার ক'রে শান্তিপুরে বাসা বাঁধব।

গুরু

দোষ কী! বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিরা বলেছেন, অধিকন্তু ন দোষায়, সেই রকম দৃষ্টান্তও দেখিয়েছেন— পুরুষের পক্ষে স্ত্রী গৌরবে বহুবচন।

মাধব

তার মানে একাই এক সহস্র।

গুরু

উল্টো। আধ্যাত্মিক অর্থে পুরুষের পক্ষে এক সহস্রই একা। বড় বড় সজ্জন কুলীন বহুকষ্টে তার প্রমাণ দিয়েছেন। সেই জন্যেই এ দেশকে বলে, পুণ্যভূমি—পুণ্য বিবাহকর্মে আমাদের পুরুষদের ক্লান্তি নেই।

মাধব

আহা, এ দেশের আধ্যাত্মিক বিবাহের এমন সুন্দর ব্যাখ্যা আর কখনো শুনি নি।

গুরু

কি গো বিপিন, প্রস্তুত তো? যেমন বলেছিলুম, কাল তো সারারাত জপ করেছিলে—সোনা মিথ্যে, সোনা মিথ্যে, সব ছাই, সব ছাই?

মাধব

জপেছি। মোহরটা আরো যেন তারার মতো জ্বল জ্বল করতে লাগল মনের মধ্যে। (গুরুর পা জড়িয়ে ধ'রে) প্রভু, আমি পাপিষ্ঠ, এবারকার মতো মাপ কর, আরো কিছুদিন সময় দাও।

গুরু

এই রে! মোলো, মোলো দেখছি। সর্বনাশ হ'ল। দিতে এসে ফিরিয়ে নেওয়া, এ যে গুরুর ধন চুরি করা! (ঝুলি এগিয়ে দিয়ে) ফেল্ ফেল্ বলছি, এখ্‌খনি ফেল্।

(মাধব বহুকষ্টে কম্পিতহস্তে রুমাল থেকে মোহর খুলে নিয়ে ঝুলিতে ফেলল)

গুরু

এইবার সবাই মিলে বলো দেখি—

সোনা ছাই সোনা ছাই সোনা ছাই।
নাহি চাই, নাহি চাই, নাহি চাই।
নয়ন মুদিলে পরে কিছু নাই কিছু নাই কিছু নাই।

(সকলের চীৎকার স্বরে আবৃত্তি)

গুরু

এই যে মা তারিণী! এস এস, এই নাও আশীর্বাদ। তোমার ভাবনা নেই, তুমি অনেক দূরে এগিয়েছ। তোমরা মেয়েমানুষ, তোমাদের সরল ভক্তি, দেখে পুরুষদের শিক্ষা হোক্।

(তারিণী পায়ের কাছে এক জোড়া বালা রেখে অনেকক্ষণ মাথা ঠেকিয়ে রাখল)

গুরু

(হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে) গুরুভার বটে—বন্ধনটা বেশ একটু চাপ দিয়েছিল মনটাকে। যাকগে এতদিনে হাতের বেড়ি তোমার খসল। লোহার বেড়ির চেয়ে অনেক কঠিন—ঠিক কিনা মা ?

তারিণী

খুব ঠিক বাবা। মনে হচ্ছে খানিকটা মাংস কেটে নিলে।

গুরু

মাংস নয় মাংস নয়, মোহপাশ। গ্রন্থি এই সবে আলগা হ'তে শুরু করল, তারপরে ক্রমে ক্রমে—

তারিণী

না বাবা, আর পারব না। মেয়ের বিয়ের জন্যে শাশুড়ীর আমলের গয়নাগুলি যত্ন ক'রে রেখে দিয়েছি।

গুরু

(থলির মধ্যে বালা জোড়া ফেলে দিয়ে)

আচ্ছা আচ্ছা, এখনকার মতো এই পর্যন্তই থাক। তোমরা বলো সবাই—সোনা ছাই ইত্যাদি।

(সকলের আবৃত্তি)

গুরু

আরে বলদেও, ক্যা খবর ?

বলদেও

(পায়ের কাছে হাজার টাকার নোট রেখে)

খবর আঁখসে দেখ্ লীজিয়ে হজরৎ।

গুরু

ভালা ভালা, দিল তো খুশ হ্যায় ?

বলদেও

পহেলা তো বহুৎ ঘবড়া গিয়া থা। রাত ভর মেরে জীবাত্মানেসে হাজারো দফে বাতায়া লিয়া কি, কুছ্ নেই, কুছ্ নেই, ইয়ে তো শ্রেফ্ কাগজ হ্যায়, হাওয়াসে চলা জাতা, আগসে জ্বল জাতা, পানীমেসে গল জাতা, ইস্‌কো কিম্মৎ কৌড়িসে ভি কমতি হ্যায়। লিকেন আত্মারাম সারা বখৎ ঘড়বড় করতে থে। মেরে ঐসি বুদ্ধি লগি যে ইয়ে কাগজ তো গুরুজিকে পাঁও পর ডারনেকে লায়েক একদম নেই হ্যায়—ইস্‌সে দো এক রূপেয়া ভি অচ্ছি হৈ। পিছে ফজিরমে দো লোটা ভর ভাং যব পী লিয়া, তব সব দুরস্ত হো গয়া। মেরে দিল হালকা হো গয়া ইয়ে কাগজকা মাফিক্।

গুরু

জীতা রহো বাবা, পরমাত্মা তুঝকো ভালা করে। বলো সবাই—

নোটগুলো সব ঝুটো সব ঝুটো সব ঝুটো—
ওরা সব খড়কুটো খড়কুটো খড়কুটো—
ছাই হয়ে উড়ে যাবে মুঠো মুঠো মুঠো মুঠো মুঠো মুঠো।

(সকলের আবৃত্তি)

গুরু

আজ ফকিরকে দেখছি নে বড়ো

বলদেও

এক ঔরৎ ফকিরচাঁদজিকো আপনি সাথ লেকে আয়ি হৈ। নয়া আদমি, হমারা মালুম দিয়া কি ভিতর আকে চিল্লায়েগি—ইসবাস্তে দোনোকো বাহার খাড়া রখ্‌খা হয়। হুকুম মিলনেসে লে আয়গা।

গুরু

কি সর্বনাশ! ঔরৎ! আরে নিয়ে আয়, নিয়ে আয়, এখ্‌খনি নিয়ে আয়। এইখানে একটা ভালো আসন পেতে দে, মেয়েটা হাতছাড়া না হয়!

(ফকিরের সঙ্গে পুষ্পর প্রবেশ)

গুরু

এস এস মা এস। মুখ দেখেই বুঝছি দৈববাণীর বাহন হয়ে এসেছ।

পুষ্প

ভুল বুঝছেন। আমি ছাই ফেলবার ভাঙা কুলো হয়েই এসেছি। এই আমার সঙ্গে যাকে দেখছেন, এত বড় বিশুদ্ধ ছাইয়ের গাদা কোম্পানির মুল্লুকে আর পাবেন না। কোনোদিন ওঁর মধ্যে পৈত্রিক সোনার আভাস হয়তো কিছু ছিল—গুরুর আশীর্বাদে চিহ্নমাত্রই নেই।

এ সব কথার অর্থ কী ?

পুষ্প

অর্থ এই যে, এঁর বাপ এঁকে ত্যাগ করেছেন, ইনি ত্যাগ করতে যাচ্ছেন এঁর স্ত্রীকে। এক পয়সার সম্বল এঁর নেই। শুনেছি আপনার এখানে সকল রকম আবর্জনারই স্থান আছে, তাই রইলেন ইনি আপনার শ্রীপাদপদ্মে।

ফকির

অ্যাঁ, এ সব কথা কী বলছ পুষ্পদি ? ঐ তো সোনার হারগাছা নিয়ে আসা গেল—গুরুচরণে রাখবে না ?

পুষ্প

রাখব বৈ কি। (গুরুর হাতে দিয়ে) তৃপ্ত হলেন তো ?

গুরু

(হারখানা হাতে নিয়ে ওজন আন্দাজ ক'রে) আমার অতি যৎসামান্যেই তৃপ্তি। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং।

ফকির

ভুল করবেন না প্রভু, ওটা আমারই দান।

পুষ্প

ভুল ভাঙানো জরুরি দরকার, নইলে আসন্ন বিপদ। ওঁর বাবা বিশ্বেশ্বরবাবু পুলিসে খবর দিয়েছেন, তাঁর হার চুরি গেছে। খানাতল্লাসি করতে এখনি আসছে মথ্‌লুগঞ্জের বড় দারোগা দবিরুদ্দিন সাহেব।

গুরু

(দাঁড়িয়ে উঠে) কী সর্বনাশ !

পুষ্প

কোনো ভয় নেই, এখ্‌খনি সোনাগুলোকে ভস্ম ক'রে ফেলুন, পুলিসের উপর সেটা প্রকাণ্ড একটা কানমলা হবে।

গুরু

(কাতরস্বরে) বলদেও !

বলদেও

(লাঠি বাগিয়ে) কুছ পরোয়া নেই ভগবান। আপ তো পরমাত্মা হো, আপকো হুকুমসে হম লড়াই করেঙ্গে।

মথুর

গুরুজি, ওর ভরসায় থাকবেন না। ওর ভাঙের নেশা এখনো ভাঙে নি। লালপাগড়ি দেখলেই যাবে ছুটে। আপাতত আপনি দৌড় দিন। কী জানি এই নোটখানা পরমাৎমার ভরসায় ওর কোন্ মনিবের বাক্স ভেঙে নিয়ে এসেছে !

গুরু

অ্যাঁ, বল কি মথুর ? পালাব কোথায় ? ওরা যে আমার বাসার ঠিকানা জানে। এখন এই ঝুলিটা তোমরা কে রাখবে ?

সকলে

কেউ না, কেউ না।

তারিণী

আমার বালা জোড়া ফিরিয়ে দাও।

গুরু

এখ্‌খনি, এখ্‌খনি। আর বলদেও, তোমার নোটখানা তুমি নাও বাবা।

বলদেও

অব্‌ভিতো নেই সকেঙ্গে। পুলিস চলা জানেসে পিছে লেউঙ্গা।

পুষ্প

আচ্ছা, আমারি হাতে ঝুলিটা দিন। পুলিসের কর্তার সঙ্গে পরিচয় আছে। যার যার জিনিস সবাইকে ফিরিয়ে দেব।

মথুর

ওরে বাস্ রে, স্পাই রে স্পাই। কারো রক্ষা নেই আজ।

গুরু

স্পাই! সর্বনাশ! (ঊর্ধ্বশ্বাসে) চললুম আমি। মোটরটা আছে?

একজন

আছে।

ফকির

(পায়ে ধ'রে) প্রভো, আমি কিন্তু ছাড়ছি নে তোমার সঙ্গ।

গুরু

দূর, দূর, দূর। ছাড়্, ছাড়্ বলছি। লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা!

ফকির

তা আমার কী দশা হবে? আমার কোথায় গতি?

গুরু

তোমার গতি গো-ভাগাড়ে।

(দ্রুত প্রস্থান)

বিপিন

মাগো, ঐ ঝুলির মধ্যে আমার আছে মোহরটা।

নিতাই

আর আমার আছে বাজুবন্দ।

পুষ্প

এই নাও তোমরা।

সকলে

তুমিই রক্ষা করলে মা, ধড়ে প্রাণ এল।

বলদেও

মাইজি, উয়ো নোট হমকো দে দীজিয়ে। আফিস্‌কে বখৎমে থোড়ি দের হয়।

পুষ্প

এই নাও, ঠিক জায়গায় পৌঁছিয়ে দেবে তো?

বলদেও

জরুর। পরমাত্মাজি তো ফেরার হো গয়া, দুস্‌রা লেনেওয়ালা কোই ছায় নেই সওয়ায় মনিব ঔর ডাকু। মালুম থা কি নোট ভস্‌ম হো জায়গা, উস্‌কা পত্তা নহি মিলেগা, মেরা পুণ্য ঔর পুলিসকী ভাণ্ডা ফরক্ রহেগা। অভি দেখ্‌তা হুঁ কি হিসাবকি থোড়ি গলতি থী। হর হর বোম্ বোম্।

(প্রস্থান)

পুষ্প

ফকিরদা, মাথায় হাত দিয়ে ভাবছ কী? গুরুর পদধূলি তো আঠারো আনা মিলেছে। এখন ঘরে চল।

ফকির

যাব না।

পুষ্প

কোথায় যাবে?

ফকির

রাস্তায়।

পুষ্প

আচ্ছা বেশ, ছান্দোগ্যটা তো নিয়ে আসতে হবে!

ফকির

সে আমার সঙ্গে আছে।

পুষ্প

কিন্তু তোমার গুরু?

ফকির

রইলেন আমার অন্তরে।

পুষ্প

আর ডিমের খোলাটা?

ফকির

সে ঝুলছে গামছায় বাঁধা বুকের কাছে।

(প্রস্থান)

পুষ্প

(পিছন থেকে) সোয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।

(হৈমর প্রবেশ)

বিশ্বাস করতে পারিস নে বুঝি? এই নে তোর হার।

হৈম

আর অন্যটি?

পুষ্প

এখনকার মতো চার পা তুলে সে বেড়া ডিঙিয়েছে।

হৈম

তারপর?

পুষ্প

লম্বা দড়ি আছে।

হৈম

আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে।

পুষ্প

তুই হাঁউমাউ করিস নে তো। চতুষ্পদ একটু চ'রে বেড়াক না!

হৈম

উনি ছান্দোগ্য নিয়ে যখন বেরলেন তখনি বুঝলুম, ফিরবেন না। মণ্ডূক মানে ব্যাঙ বুঝি ভাই?

পুষ্প

হাঁ।

হৈম

উনি আজকাল বলতে আরম্ভ করেছেন, মানুষের আত্মা হচ্ছে ব্যাঙ। সেই পরম ব্যাঙ—যখন অন্তরে কুড়ুর কুড়ুর ক'রে ডাকে, তখনি বোঝা যায়, সে পরমানন্দে আছে।

পুষ্প

তাই হোক না, ওর আত্মা দেশে বিদেশে ডেকে বেড়াক, তোর আত্মা-ব্যাঙ এখন কিছুদিনের মতো ঘুমিয়ে নিক।

হৈম

মনটা যে হু হু করবে, তার চেয়ে ব্যাঙের ডাক যে ভালো।

পুষ্প

ভয় নেই, আনব তোর মাণ্ডূক্যকে ফিরিয়ে।

তৃতীয় দৃশ্য

ষষ্ঠীচরণ। পুষ্প।

ষষ্ঠী

মা, শরণ নিলুম তোমার।

পুষ্প

খবর নিয়েছি পাড়ায়, তোমার নাতি মাখন পলাতক সাত বছর থেকে—সংসারের দুনলা বন্দুক লেগেছে তার বুকে, দুঃখ এখনো ভুলতে পারে নি। একটা বিয়ে করলে পুরুষের পা পড়ে না মাটিতে, তোলা থাকে স্ত্রীর মাথার উপরে, আর দুটো বিয়ে করলেই দুজোড়া মল বাজতে থাকে ওদের পিঠে—শিরদাঁড়া যায় বেঁকে।

ষষ্ঠী

কী না জান তুমি মা। নবগ্রাম থেকে আরম্ভ ক'রে মথ্‌লুগঞ্জ পর্যন্ত সব কটা গাঁ যে তুমি জিতে নিয়েছ। বিধাতাপুরুষ নিষ্ঠুর, তাই তোমায় মোলাম করতে হয় তাঁর শাসন।

পুষ্প

না জ্যাঠামশায়, বাড়িয়ে বলো না। আমি মজা দেখতে বেরিয়েছি—ছুটি পেয়েছি বই পড়ার গারদ থেকে। দেখতে এলুম কেমন ক'রে নিজের পায়ে বেড়ি আর নিজের গলায় ফাঁস পরাতে নিস্‌পিস করতে থাকে মানুষের হাত দুটো। এ না হ'লে ভবের খেলা জমত না। ভগবান বোধ হয় রসিক লোক, হাসতে ভালবাসেন।

ষষ্ঠী

না মা, সবই অদৃষ্ট। হাতে হাতে দেখ না! বড় বৌয়ের ছেলেপুলের দেখা নেই। ভাবলেম পিতৃপুরুষ পিণ্ডি না পেয়ে শুকিয়ে মরবেন বৈতরণীতীরে। ধ'রে বেঁধে দিলেম মাখনের দ্বিতীয় বিয়ে, আর সবুর সইল না, দেখতে দেখতে পরে পরে দুই পক্ষেরই কল্যাণে চারটি মেয়ে তিনটি ছেলে দেখা দিল আমার ঘরে।

পুষ্প

এবারে পিতৃপুরুষের অজীর্ণরোগের আশঙ্কা দেখছি।

ষষ্ঠী

মা তোমার সব ভালো, কেবল একটা বড় খটকা লাগে, মনে হয় তুমি দেবতাব্রাহ্মণ মানই না।

পুষ্প

কথাটা সত্যি।

ষষ্ঠী

কেন মা, ঐ খুঁৎটুকু কেন থেকে যায়!

পুষ্প

সংসারে দেবতাব্রাহ্মণের অবিচারের বিরুদ্ধেই যে লড়াই করতে হয়, ওদের মানলে জোর পেতুম না। সে কথা পরে হবে, আমি মাখনের খোঁজেই আছি।

ষষ্ঠী

জান তো মা, ও কী রকম হো হো ক'রে বেড়াত, কেবল খেলাধুলো, কেবল ঠাট্টাতামাসা। ভয় হ'ত কোথায় কি ক'রে বসে! তাই তো ওর গলায় একটা নোঙরের পর আর একটা নোঙর ঝুলিয়ে দিলুম।

পুষ্প

নোঙর বেড়েই চলল, ভারে নৌকো তলিয়ে যাবার জো। আমি তোমাদের পাড়ায় এসেছি হৈমির খবর নেবার জন্যে। শুনলুম, সে তোমার এখানেই আছে।

হাঁ মা, এতদিন আমি ছিলুম নামেই মামা। তার বিয়ের পর থেকে এই তাকে দেখলুম। বুক জুড়িয়ে গেল তার মধুর স্বভাবে। তারও স্বামী পালিয়েছে। হ'ল কী বলো তো! কন্‌গ্রেস-ওয়ালারা এর কিছু ক'রে উঠতে পারলে না?

পুষ্প

মহাত্মাজিকে বললে এখনি তিনি মেয়েদের লাগিয়ে দেবেন অসহযোগ আন্দোলনে। দেশে হাতা-বেড়ির আওয়াজ একেবারে হবে বন্ধ। গলির মোড়ে খুহু ময়রার দোকানে তেলে ভাজা ফুলুরি খেয়ে বাবুদের আপিসে ছুটতে হবে—তুদিন বাদেই সিক্ লীভের দরখাস্ত।

ষষ্ঠী

ও সর্বনাশ!

পুষ্প

ভয় নেই, মেয়েদের হয়ে আমি মহাত্মাজিকে দরবার জানাব না। বরঞ্চ রবি ঠাকুরকে ধরব যদি তিনি একটা প্রহসন লিখে দেন।

ষষ্ঠী

কিন্তু রবি ঠাকুর কি আজকাল লিখতে পারে? আমার শ্যালার কাছে—

পুষ্প

আর বলতে হবে না। কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেছে দেখছি। কিন্তু ভাবনা নেই, লেখন্দাজ ঢের জুটে গেছে। দ্বাদশ আদিত্য বললেই হয়।

ষষ্ঠী

বরঞ্চ লিখতেই যদি হয়, আমি তো মনে করি আজকাল মেয়েরা যে রকম—

পুষ্প

অসহ্য, অসহ্য। জামা শেমিজ পরার পর থেকে ওদের লজ্জা সরম সব গেছে।

ষষ্ঠী

সেদিন কলকাতায় গিয়েছিলুম, দেখি, মেয়েরা ট্র্যামে বাসে এমনি ভিড় করেছে—

পুষ্প

যে পুরুষ বেচারারা খালি গাড়ি পেলেও নড়তে চায় না।—ওকথা যাক্‌গে—মাখনের জন্যে ভেব না।

ষষ্ঠী

সেই ভালো, তোমার উপরেই ভার রইল।

(ষষ্ঠীর প্রস্থান। হৈমর প্রবেশ)

হৈম

শুনলুম তুমি এসেছ, তাই তাড়াতাড়ি এলুম।

পুষ্প

ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন, তাই গান্ধারী চোখে কাপড় বেঁধে অন্ধ সাজলেন। তোমারো সেই দশা। স্বামী এল বেরিয়ে রাস্তায়, স্ত্রী এল বেরিয়ে মামার বাড়িতে।

হৈম

মন টেঁকে না ভাই, কী করি! তুমি বলেছিলে হারাধন ফিরিয়ে আনবে।

পুষ্প

একটু সবুর কর—ছিপ ফেলতে হয় সাবধানে—একটা ধরতে যাই, ছুটো এসে পড়ে টোপ গিলতে।

হৈম

আমার তো ছুটোতে দরকার নেই।

পুষ্প

যে রকম দিনকাল পড়েছে ছুটো একটা বাড়তি হাতে রাখা ভালো। কে জানে কোন্‌টা কখন ফস্‌কে যায়।

হৈম

আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, দেখলুম কাগজে তোমার নাম দিয়ে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে—

পুষ্প

হাঁ, সেটা আমারি কীর্তি।

হৈম

তাতে লিখেছ প্রাইভেট সিনেমায় সেতুবন্ধ নাটকের জন্যে লোক চাই, হনুমানের পার্ট অভিনয় করবে। তোমার আবার সিনেমা কোথায়?

পুষ্প

এই তো চারদিকেই, চলচ্ছবির নাট্যশালা, তোমাদের সবাইকে নিয়েই।

হৈম

তা যেন বুঝলুম, এর মধ্যে হনুমানের অভাব ঘটল কবে থেকে?

পুষ্প

দল পুরু আছে ঘরে ঘরে। একটা পাগলা পালিয়েছে ল্যাজ তুলে, ডাক দিচ্ছি তাকে।

হৈম

সাড়া মিলেছে?

পুষ্প

মিলেছে।

হৈম

তারপরে?

পুষ্প

রহস্য এখন ভেদ করব না।

হৈম

যা খুশি ক'রো, আমার প্রাণীটিকে বেশি দিন ছাড়া রেখো না। ঐ কে আসছে ভাই, দাড়িগোঁফঝোলা চেহারা—ওকে তাড়িয়ে দিতে ব'লে দিই।

পুষ্প

না না, তুমি বরঞ্চ যাও, আমি ওর সঙ্গে কাজ সেরে নিই।

(হৈমর প্রস্থান। সেই লোকের প্রবেশ)

পুষ্প

তুমি কে ?

সেই লোক

সেটা প্রকাশের যোগ্য নয় গোড়া থেকেই, জন্মকাল থেকেই। আমি বিধাতার কুকীর্তি, হাতের কাজের যে নমুনা দেখিয়েছেন তাতে তাঁর সুনাম হয় নি।

পুষ্প

মন্দ তো লাগছে না !

সেই লোক

অর্থাৎ মজা লাগছে। ঐ গুণেই বেঁচে গেছি। প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিলেই লোকের মজা লাগে। লোক হাসিয়েছি বিস্তর।

পুষ্প

কিন্তু সব জায়গায় মজা লাগে নি।

সেই লোক

খবর পেয়েছ দেখছি। তা হ'লে আর লুকিয়ে কী হবে ? নাম আমার শ্রীমাখনচন্দ্র। বুঝতেই পারছ যাত্রার দলের সরকারী গোঁফ দাড়ি প'রে এসেছি কেন ? এ পাড়ায় মুখ দেখাবার সাহস নেই, পিঠ দেখানই অভ্যেস হয়ে গেছে।

পুষ্প

এলে যে বড় ?

মাখন

চলেছিলুম নাজিরপুরে ইলিষমাছ ধরার দলে। ইস্টেশনে দেখি বিজ্ঞাপন হনুমানের দরকার। রইল প'ড়ে জেলেগিরি। জেলেরা ছাড়তে চায় না, আমাকে ভালোবাসে। আমি বললুম, ভাই, এদের বিজ্ঞাপনের পয়সা বেবাক লোকসান হবে আমি যদি না যাই—আর দ্বিতীয় মানুষ নেই যার এত বড় যোগ্যতা। এ তো আর ত্রেতাযুগ নয় !

পুষ্প

খাওয়াপরার কিছু টানাটানি পড়েছে বুঝি ?

মাখন

নিতান্ত অসহ্য হয় নি। কেবল যখন ধনেশাক দিয়ে ডিমওয়ালা কই মাছের ঝোলের গন্ধস্মৃতি অন্তরাত্মার মধ্যে পাক খেয়ে ওঠে, তখন আমার শ্রীমতী বাঁয়া আর শ্রীমতী তবলার তেরেকেটে মেরেকেটে ভিরকুটি মিরকুটির তালে তালে দূর থেকে মন কেমন ধড়ফড় করতে থাকে।

পুষ্প

তাই বুঝি ধরা দিতে এসেছ।

মাখন

না, না, মনটা এখনো ততদূর পর্যন্ত শক্ত হয় নি। শেষে বিজ্ঞাপনদাতার খবর নিতে এসে যখন দেখলুম, ঠিকানাটা এই আঙিনারই সীমানার মধ্যে—তখন প্রথমটা ভাবলুম, বিজ্ঞাপনের নাম রক্ষা করব, দেবো এক লম্ফ। কিন্তু রইলুম কেবল মজার লোভে। পণ করলুম শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। দিদি আমার, কেমন সন্দেহ হচ্ছে কোনো সূত্রে বুঝি আমাকে চিনতে, নইলে অমন বিজ্ঞাপন তোমার মাথায় আসত না।

পুষ্প

তোমার আচিলওয়ালা নাকের খ্যাতি পাড়ার লোকের মুখে মুখে। তোমার বিজ্ঞাপন তোমার নাকের উপর। বিশ্বকর্মার হাতে এ নাক দুবার তৈরি হ'তে পারে না—ছাঁচ তিনি মনের ক্ষোভে ভেঙে ফেলেছেন।

মাখন

এই নাকের জোরে একবার বেঁচে গিয়েছি দিদি। মট্রুগঞ্জে চুরি হ'ল, সন্দেহ ক'রে আমাকে ধরলে চৌকিদার। দারোগা বুদ্ধিমান, সে বললে, এ লোকটা চুরি করবে কোন্ সাহসে—নাক লুকোবে কোথায় ? বুঝেছ দিদি, আমার এ নাকটাতে ভাঁড়ামির ব্যবসা চলে, চোরের ব্যবসা একেবারে চলে না।

পুষ্প

কিন্তু তোমার হাতে যে কলার ছড়াটা দেখছি ওটা তো আমার চেনা, কোনো ফিকিরে তোমার জুড়ি অন্নপূর্ণার ঘর থেকে সরিয়ে নিয়েছ।

মাখন

অনেকদিনের পেটের জ্বালায় ওদের ভাঁড়ারে চুরি পূর্বে থেকেই অভ্যেস আছে।

পুষ্প

এত বড় কাঁদি নিয়ে করবে কি ? হনুমানের পালার তালিম দেবে ?

মাখন

সে তো ছেলেবেলা থেকেই দিচ্ছি। পথের মধ্যে দেখলুম এক ব্রহ্মচারী ব'সে আছেন পাকুড়তলায়। আমার বদ অভ্যাস, হাসাতে চেষ্টা করলুম—ঠোঁটের এক কোণও নড়াতে পারলুম না, মন্তর আউড়েই

চলল। ভয় হ'ল বুঝি ব্রহ্মদত্যি হবে। কিন্তু মুখ দেখে বুঝলুম উপোষ করতে হতভাগা তিথি বিচার করছে না। ওর পাঁজিতে তিনটে চারটে একাদশী একসঙ্গে জমাট বেঁধে গেছে। জিজ্ঞাসা করলুম, বাবাজি, খাবে কিছু? কপালে চোখ তুলে বললে, গুরুর কৃপা যদি হয়। মাঝে মাঝে দেখি মাথার নীচে পুঁথি রেখে নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছেন, ডাকের শব্দে ও গাছের পাখী একটাও বাকি নেই। নাকের সামনে রেখে আসব কলার ছড়াটা।

পুষ্প

লোকটার পরিচয় নিতে হবে তো।

মাখন

নিশ্চয় নিশ্চয়। হাসতে হাসতে পেট ফেটে যাবে, আমার চেয়ে মজা।

পুষ্প

ভালো হ'ল। হনুমানের সঙ্গে অঙ্গদ চাই। ওকে তোমারই হাতে তৈরি ক'রে নিতে হবে। শেওড়াফুলির হাট উজাড় ক'রে কলার কাঁদি আনিয়ে নেব।

মাখন

শুধু কলার কাঁদির কর্ম নয়।

পুষ্প

তা নয় বটে। যে কারখানায় তুমি নিজে তৈরি সেখানকার দুইচাকাওয়ালা যন্ত্রের তলায় ওকে ফেলা চাই।

মাখন

দয়াময়ী, জীবের প্রতি এত হিংসা ভালো নয়।

পুষ্প

ভয় নেই, আমি আছি, হঠাৎ অপঘাত ঘটতে দেবো না। আপাতত কলার ছড়াটা ওকে দিয়ে এস।

মাখন

আমাদের দেশে মেয়েরা থাকতে সন্ন্যাসী না খেয়ে মরে না। কিন্তু ও লোকটা ভুল করেছে—বৈরাগীর ব্যবসা ওর নয়—ওর চেহারায় জলুষ নেই। নিতান্ত নিজের স্ত্রী ছাড়া ওর খবরদারি করবার মানুষ মিলবে না।

পুষ্প

তোমার অমন চেহারা নিয়ে তুমি ছ বছর চালালে কি ক'রে?

মাখন

ময়রার দোকানে মাছি তাড়িয়েছি, পেয়েছি বাসী লুচি তেলে ভাজা, যার খদ্দের জোটে না। যাত্রার দলে ভিস্তি সেজেছি, জল খেতে দিয়েছেন অধিকারী মুড়কি আর পচা কলা। সুবিধে পেলেই মা মাসি পাতিয়ে মেয়েদের পাঁচালি শুনিয়ে দিয়েছি যখন পুরুষরা কাজে চ'লে গেছে।—

ওরে ভাই জানকীরে দিয়ে এস বন—
ওরে রে লক্ষ্মণ এ কী কুলক্ষণ, বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ।

মা জননীদের দুই চক্ষু দিয়ে অশ্রুধারা ঝরেছে—দুচার দিনের সঞ্চয় নিয়ে এসেছি। আমাকে ভালোবাসে সবাই। জ্যাঠাইমা আমার যদি দুটো বিয়ে না দিত তা হ'লে চাই কি আমার নিজের স্ত্রীও হয়তো আমাকে ভালোবাসতে পারত। বাইরে থেকে বুঝতে পারবে না, কিন্তু আমারও কেমন অল্পেতেই মন গলে যায়। এই দেখ না, এখন তোমাকে মা অঞ্জনা বলতে ইচ্ছে করছে।

পুষ্প

সেই ভালো, আমার নাতির সংখ্যা বেড়ে চলেছে, দিদির পদটা বড্ড বেশি ভারি হয়ে উঠল। আচ্ছা, জিগেস করি তোমার মনটা কী বলছে ?

মাখন

তবে মা, কথাটা খুলে বলি। অনেকদিন পরে এ পাড়ার কাছাকাছি আসতেই প্রথম দিনেই আমার বিপদ বাধল ফোড়নের গন্ধে। সে দিন আমাদের রান্নাঘরে পাঁঠা চড়েছিল—সত্যি বলি, বড় বোয়ের মুখ খারাপ, কিন্তু রান্নায় ওর হাত ভালো। সেদিন বাতাস শুঁকে শুঁকে বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছি সারাদিন। তার পর থেকে অর্ধভোজনের টানে এ পাড়া ছাড়া আমার অসাধ্য হ'ল। বারবার মনে পড়ছে কত দিনের কত গালমন্দ আর কত কাঁটাচচ্চড়ি। একদিন দিব্যি গেলেছিলুম, এ বাড়িতে কোনদিন আর ঢুকব না। প্রতিজ্ঞা ভেঙেছি কাল।

পুষ্প

কিসে ভাঙাল ?

মাখন

তালের বড়ার গন্ধে। দিনটা ছটফট ক'রে কাটালুম। রাত্তিরে যখন সব নিস্তুতি, বাইরে থেকে ছিট্‌কিনি খুলে ঢুকলুম ঘরে। খুট ক'রে শব্দ হতেই আমার ছোটটি এক হাতে পিদিম এক হাতে লাঠি নিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরে। মুখে মেখে এসেছিলুম কালি, আমি হাঁ ক'রে দাঁত খিঁচিয়ে হাঁউমাউ-খাঁউ ক'রে উঠতেই পতন ও মূর্চ্ছা। বড় বৌ একবার উঁকি মেরেই দিল দৌড়। আমি র'য়ে ব'সে পেট ভ'রে আহার ক'রে ধামাসুদ্ধ বড়া নিয়ে এলুম বেরিয়ে।

পুষ্প

কিছু প্রসাদ রেখে এলে না পতিব্রতাদের জন্যে ?

মাখন

অনেকখানি পায়ের ধুলো রেখে এসেছি, আর বড়াগুলো নিয়ে এসেছি দলবলকে খাইয়ে দিতে।

পুষ্প

আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি বলবে ?

মাখন

দেখ মা, বিপদে না পড়লে আমি কখনো মিথ্যে কথা কই নে।

পুষ্প

লোকে বলে, তুমি কাশীতে গিয়ে আরো একটা বিয়ে করেছ।

মাখন

তা করেছি।

পুষ্প

পিঠ সুড়সুড় করছিল ?

মাখন

না মা, দুটো বিয়ে কাকে বলে হাড়ে হাড়ে জেনেছি। ভারি ইচ্ছা হ'ল একটা বিয়ে কী রকম মরবার আগে জেনে নেব।

পুষ্প

জেনে নিয়েছ সেটা ?

মাখন

বেশি দিন নয়। ভাগ্যবতী কিনা, পুণ্য ফলে মারা গেল সকাল সকাল, স্বামী বর্তমানেই। ঘোমটা সবে খুলেছে মাত্র। কিন্তু ভালো ক'রে মুখ ফোটবার তখনো সময় হয় নি। বেঁচে থাকলে কপালে কী ছিল বলা যায় না।

পুষ্প

কার কপালে ?

মাখন

শক্ত কথা।

তৃতীয় দৃশ্য

(নিদ্রামগ্ন ফকির। মুখের কাছে একছড়া কলা। জেগে উঠে কলার ছড়া তুলে নেড়ে চেড়ে দেখল।)

ফকির

আহা, গুরুদেবের কৃপা। (ছড়াটা মাথায় ঠেকিয়ে চোখ বুজে) শিবোহং শিবোহং শিবোহং (একটা একটা ক'রে গোটা দশেক খেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে) আঃ!

(মাখনের প্রবেশ)

মাখন

কী দাদা, ভালো তো! আমার নাম শ্রীমাখনানন্দ।

ফকির

গুরুর চরণ ভরসা।

মাখন

গুরুই খুঁজে মরছি। সদগুরু মেলে না তো। দয়া হবে কি ? নেবে কি অভাজনকে ?

ফকির

ভয় নেই, সময় হোক আগে।

মাখন

(কান্নার সুরে) সময় আমার হবে না প্রভু, হবে না। দিন যে গেল! বড় পাপী আমি। আমার কী গতি হবে ?

ফকির

গুরুপদে মন স্থির কর—শিবোহং।

মাখন

এই পদেই ঠেকল আমার তরী; যম তা হ'লে ভয়ে কাছে ঘেঁষবে না।

ফকির

তোমার নিষ্ঠা দেখে বড় সন্তুষ্ট হলুম।

মাখন

শুধু নিষ্ঠা নয় গুরু, এনেছি কিছু তালের বড়া। তালগাছটা সুদ্ধ উদ্ধার পাক।

ফকির

(ব্যগ্রভাবে আহার) আহা সুস্বাদ বটে। ভক্তির দান কিনা!

মাখন

সার্থক হ'ল আমার নিবেদন। বাড়ির এঁয়ারা খবর পেলে কী খুশিই হবেন! যাই ওঁদের সংবাদ পাঠিয়ে দিইগে, ওঁরা আরো কিছু হাতে নিয়ে আসবেন। প্রভু, গৃহাশ্রমে আর কি ফিরবেন না ?

ফকির

আর কেন ? গুরু বলেন, বৈরাগ্যং এবং ভয়ং।

মাখন

গৃহী আমি, ডাইনে বাঁয়ে মায়া-মাকড়সানী জড়িয়েছে আপাদমস্তক। ধনদৌলতের সোনার কেল্লাটা কত বড় ফাঁকি সেটা খুব ক'রেই বুঝে নিয়েছি। বুঝেছি সেটা নিছক স্বপ্ন। ভগবান আমাকে অকিঞ্চন ক'রে পথে পথে ঘোরাবেন এই তো আমার দিনরাত্রির সাধনা, কিন্তু আর তো পারি নে, একটা উপায় বাৎলিয়ে দাও।

ফকির

আছে উপায়।

মাখন

(পা জড়িয়ে) ব'লে দাও, ব'লে দাও, বঞ্চিত ক'রো না।

ফকির

দিন ভোর উপোষ ক'রে থেকে—

মাখন

উপোষ! সর্বনাশ! সেটা অভ্যেস নেই একেবারেই। আমার দুষ্টগ্রহ দিনে চারবার ক'রে আহার জুটিয়ে দিয়ে অন্তরটা একেবারে নিরেট ক'রে দিয়েছেন। আর কোনো রাস্তা যদি—

ফকির

আচ্ছা দুখানা রুটি—

মাখন

আরো একটু দয়া করেন যদি, দুবাটি ক্ষীর!

ফকির

ভালো তাই হবে।

মাখন

আহা, কী করুণা প্রভুর! তেমন ক'রে পা যদি চেপে থাকতে পারি তা হ'লে পাঁঠাটাও—

ফকির

না না, ওটা থাক্।

মাখন

আচ্ছা তবে থাক্, একটা দিন বইতো নয়। তা কী করতে হবে বলুন। দেখুন আমি মুখ্‌খু মানুষ, অনুস্বার বিসর্গওয়ালা মন্তর মুখ দিয়ে বেরবে না—কী বলতে কী বলব, শেষকালে অপরাধ হবে।

ফকির

ভয় নেই, তোমার জন্যে সহজ ক'রেই দিচ্ছি, গুরুর মূর্তি স্মরণ ক'রে সারারাত জপ করবে, সোনা তোমাকেই দিলুম, তোমাকেই দিলুম, যতক্ষণ না ধ্যানের মধ্যে দেখবে, সোনা আর নেই—কোথাও নেই।

মাখন

হবে হবে প্রভু, এই অধমেরও হবে। বলব, সোনা নেই সোনা নেই, এ হাতে নেই ও হাতে নেই, ট্যাঁকে নেই থলিতে নেই, ব্যাঙ্কে নেই বাক্সোয় নেই। ঠিক সুরে বাজবে মন্ত্র। আচ্ছা গুরুজি, ওর সঙ্গে একটা অনুস্বার জুড়ে দিলে হয় না? নইলে নিতান্ত বাংলার মতো শোনাচ্ছে। অনুস্বার দিলে জোর পাওয়া যায়—সোনাং নেই, সোনাং নেই, কিছুং নেই, কিছুং নেই।

ফকির

মন্দ শোনাচ্ছে না

মাখন

আচ্ছা, তবে অনুমতি হোক, পোলাওটা ঠাণ্ডা হয়ে এল

(প্রস্থান)

ফকিরের গান

শোন্‌রে শোন, অবোধ মন,—
শোন্‌ সাধুর উক্তি কিসে মুক্তি
সেই সুযুক্তি কর গ্রহণ।
ভবের শুক্তি ভেঙে মুক্তি মুক্তা কর অন্বেষণ।—
ওরে ও ভোলা মন।

(ষষ্ঠীচরণ ছুটে এসে)

ষষ্ঠী

দেখি দেখি, এই তো দাদু আমার—আমার মাখন। (মুখে হাত বুলিয়ে) অমন চাঁদ মুখখানা দাড়ি গোঁফ দিয়ে একেবারে চাপা দিয়েছে! একে ভগবান আমার চোখে পরিয়েছে বুড়ো বয়সের ঠুলি, ভাল দেখতেই পাই নে, তার উপর এ কী কাণ্ড করেছিস মাখন?

ফকির

সোহং ব্রহ্ম সোহং ব্রহ্ম সোহং ব্রহ্ম।

ষষ্ঠী

করেছিস কী দাদু, মন্তর প'ড়ে প'ড়ে অমন মিষ্টি গলায় কড়া পাড়িয়ে দিয়েছিস। সুর মোটা হয়ে গেছে!

ফকির

শিবোহং শিবোহং শিবোহং।

(বামনদাসবাবুর প্রবেশ)

বামনদাস

আরে আরে, আমাদের মাখন না কি? খাঁটি তো? ও ষষ্ঠীদা, মানতেই হবে যোগবল—নাকের উপর থেকে আঁচিলটা একেবারে সাফ দিয়েছে উড়িয়ে। ভট্‌চায, দেখে যাও হে, নাকের উপর কী মন্তর দেগেছিল গো! একটু চিহ্ন রেখে যায় নি! ষষ্ঠীদা, ঐ নাক নিয়ে কত ঝাড়ফুঁক করেছিলে, একটু টলাতে পার নি। তপিস্যের মাহাত্মি বটে।

ষষ্ঠী

না ভাই, মাহাত্মি ভাল লাগছে না। তোরা যাকে বলতিস গণ্ডারী নাক, সে ছিল ভালো।

নিশি ঠাকুর

ওর মুখমণ্ডল যে নিজেকে বেকবুল করছে, তার উপরে আবার মুখে কথা নেই, অমন সব বোল চাল, মুনি হয়ে সব ভুলেছে বুঝি!

ভজহরি

দেখি দেখি মাখ্‌না, মুখটা দেখি (চিম্‌টি কেটে চামড়া টেনে) না হে, এ মুখোষ নয়, ধাঁদা লাগিয়ে দিলে।

নিতাই

কিন্তু, দেখ তো টেনে ওর দাড়ি গোঁফ সত্যি কি না !

ফকির

উঃ উঃ!

চণ্ডী

(পিঠে কিল মেরে) কেমন লাগল ?

ফকির

উঃ !

চণ্ডী

ঐ তো সন্ন্যাসীর সুখদুঃখবোধ আছে তো ? মাথায় হুঁকোর জল ঢালি তবে—মাথা ঠাণ্ডা হোক।

ষষ্ঠী

আহা, কেন ওকে বিরক্ত করছ ভাই ? সাত বছর পরে ফিরে এল, সবাই মিলে আবার ওকে তাড়াবে দেখছি। মাখন, ও ভাই মাখন, আর দুঃখু দিস নে—একটা কথা ক'—না হয় দুটো গাল দিলিই বা !

ফকির

আপনারা আমাকে মাখন ব'লে ডাকছেন কেন ? পূর্ব আশ্রমে আমার যে নাম থাক্, আমার গুরুদত্ত নাম চিদানন্দ স্বামী।

(সকলের উচ্চহাস্য)

চিনু

ওরে বাবা, ত্রাণকর্তা এলেন আমাদের। দ্যাখ্ মাখ্না, ন্যাকামি করিস নে। ভাবছিস এমনি ক'রে আবার ফাঁকি দিয়ে পালাবি ! সেটি হচ্ছে না ; তোর দুই বৌয়ের হাতে দুই কান জিম্মে ক'রে দেব, থাকবি কড়া পাহারায়।

ফকির

গুরো, হায় গুরো !

(দুই স্ত্রীর প্রবেশ)

১

ঐ যে গো, মুখ চোখ বদলিয়ে এসেছেন আমাদের কলির নারদ।

ফকির

মা, আমি তোমাদের অধম সন্তান, দয়া কর আমাকে।

সকলে

এই, এই করলে কী ! প্রাণের ভয়ে মা ব'লে ফেললে ?

১

ও পোড়াকপালে মিন্‌সে, তুই মা বলিস্ কাকে ?

২

চোখের মাথা খেয়ে বসেছিস, তোর মরণ হয় না!

ফকির

একটু ভালো ক'রে আমাকে দেখে নিন।

১

তোমাকে দেখে দেখে চোখ ক্ষয়ে গেছে। তুমি কচি খোকা নও, নতুন জন্মাও নি। তোমার দুধের দাঁত অনেকদিন পড়েছে, তোমার বয়সের কি গাছ পাথর আছে? তোমায় যম ভুলেছে ব'লে কি আমরাও ভুলব?

২

(নাক মুচড়িয়ে দিয়ে) সাক্ষীকে বিদায় করেছ নাকের ডগা থেকে। তাই ব'লে আমাদের ভোলাতে পারবে না—তোমার বিট্‌লেমি ঢের জানা আছে। ওমা, ওমা, ঐ দেখ লো ছুটকি—সেই তালের বড়ার ধামাটা।

১

তাই রাত্তিরে গিয়েছিলেন ভূত সেজে বড়া খেতে!

২

চক্কোত্তিমশায়, এই দেখে নাও—মিন্‌সে রান্নাঘরে ঢুকে এনেছে বড়াসুদ্ধ আমাদের ধামা চুরি ক'রে।

(সকলের হাস্য)

কানু মণ্ডল

সে কি হয়, যোগবল, ভাঁড়ার থেকে উড়িয়ে এনেছে।

ষষ্ঠী

ওগো বৌদিদিরা, কেন ওকে খোঁটা দিচ্ছ? ঘরের বড়া ঘরের মানুষই যদি নিয়ে এসে থাকে তাকে কি চুরি বলে?

১

ভালোমান্‌সের মতো যদি নিত তবে দোষ ছিল না—মাগো সে কী দাঁতখিঁচুনি। আমার তো দাঁতকপাটি লেগে গেল।

ষষ্ঠী

ভাই মাখন, এটা তো ভালো কর নি—গোপনে আমাকে জানালে না কেন? তালের বড়ার অভাব কী?

ফকির

গুরো।

২

(কলার ছড়ার বাকি অংশ তুলে ধ'রে) এই দেখ তোমরা। ভাঁড়ারে রেখেছিলুম ব্রাহ্মণ ভোজন করাব ব'লে। সকালে উঠে আর দেখতে পাই নে। দরজাও খোলা নেই, ভয়ে মরি। আমাদের এই মহাপুরুষের কীর্তি। কলা চুরি ক'রে ধর্মকর্ম করেন!

ষষ্ঠীচরণ

(মহাক্রোধে) দেখ, এ আমি কিছুতেই সইব না। এই ডাইনি দুটোকে ঘর থেকে বিদায় করতে হবে, নইলে আমার মাখনকে ঠেকাতে পারব না। দেখছ তো মাখন, কেবল ভালোমান্‌সি ক'রে দুই বৌকে কী রকম ক'রে বিগড়িয়ে দিয়েছ!

ফকির

সর্বনাশ। আপনারা সাংঘাতিক ভুল করেছেন। আপনাদের সকলের পায়ে ধরি—আমাকে বাঁচান! হে গুরো, কী করলে তুমি!

ষষ্ঠী

না ভাই, বেকবুল যেয়ো না। ধামাটা তুমি ওদের ঘর থেকে এনেছিলে, কলার ছড়াটাও প্রায় নিকেশ করেছ। সেটাতে তোমার অপরাধ হয় নি—তবে লজ্জা পাচ্ছ কেন?

ফকির

দোহাই ধর্মের, দোহাই আপনাদের—আমি ধামাও আনি নি, কলার কাঁদিও আনি নি।

ষষ্ঠী

পষ্টই দেখা যাচ্ছে খেয়েছ তুমি, কেন এত জিদ করছ?

ফকির

খেয়েছি, কিন্তু—

বামনদাস

আবার কিন্তু কিসের!

ফকির

আমি আনি নি।

(সকলের হাস্য)

পাঁচু

তুমি খাও তালের বড়া, দেয় এনে আর এক মহাত্মা, এও তো মজা কম নয়। তাকে চেনো না?

ফকির

আজ্ঞে না।

সিধু

সে চেনে না তোমাকে?

ফকির

আজ্ঞে না।

নকুল

এ যে আরব্য উপন্যাস।

(সকলের হাস্য)

ষষ্ঠী

যা হবার তা তো হয়ে গেছে, এখন ঘরে চল।

ফকির

কার ঘরে যাব ?

১

মরি মরি, ঘর চেনো না পোড়ারমুখো ! বলি, আমাদের দুটিকে চেনো তো ?

ফকির

সত্যি কথা বলি, রাগ করবেন না, চিনি নে।

সকলে

ঐ লোকটার ভণ্ডামি তো সইবে না। জোর ক'রে নিয়ে যাও ওকে ধ'রে, তালা বন্ধ ক'রে রাখ।

ফকির

গুরো।

(সকলে মিলে ঠেলাঠেলি)

ওঠো, ওঠো বলছি।

সুধীর

বৌ দুটোকে এড়াতে চাও তার মানে বুঝি ; কিন্তু তোমার ছেলেমেয়েগুলিকে ? তোমার চারটি মেয়ে তিনটি ছেলে, তাও ভুলেছ না কি ?

ফকির

ও সর্বনাশ ! আমাকে মেরে ফেললেও এখান থেকে নড়ব না। (গাছের গুঁড়ি আঁকড়িয়ে ধ'রে) কিছুতেই না।

হরিশ উকীল

জান আমি কে ? পূর্ব আশ্রমে জানতে। অনেক সাধুকে জেলে পাঠিয়েছি। আমি হরিশ উকীল। জান তোমার দুই স্ত্রী !

ফকির

এখানে এসে প্রথম জানলুম।

হরিশ

আর তোমার চার মেয়ে তিন ছেলে ?

ফকির

আপনারা জানেন, আমি কিছুই জানি নে।

হরিশ

এদের ভরণপোষণের ভার তুমি যদি না নাও, তা হ'লে মকদ্দমা চলবে ব'লে রাখলুম।

ফকির

বাপরে! মকদ্দমা! পায়ে ধরি একটু রাস্তা ছাড়ুন।

দুই স্ত্রী

যাবে কোথায়, কোন্ চুলোয়, যমের কোন্ দুয়োরে?

ফকির

গুরো। (হতবুদ্ধি হয়ে ব'সে পড়ল)

(হৈমবতীর প্রবেশ ও ফকিরকে প্রণাম)

ফকির

(লাফিয়ে উঠে) এ কী, এ যে হৈমবতী! বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।

১

ওলো, ওর সেই কাশীর বৌ, এখনো মরে নি বুঝি!

(মাখনকে নিয়ে পুষ্পর প্রবেশ)

মাখন

ধরা দিলেম—বেওজর। লাগাও হাতকড়ি। প্রমাণের দরকার নেই। একেবারে সিধে নাকের দিকে তাকান। আমি মাখনচন্দ্র। এই আমার দড়ি আর এই আমার কলসি। মা অঞ্জনা, কিষ্কিন্ধ্যায় তো ঢোকালে। মাঝে মাঝে খবর নিয়ো। নইলে বিপদে পড়লে আবার লাফ মারব।

পুষ্প

ফকিরদা, তোমার মুক্তি কোথায় সে তো এখন বুঝেছ?

ফকির

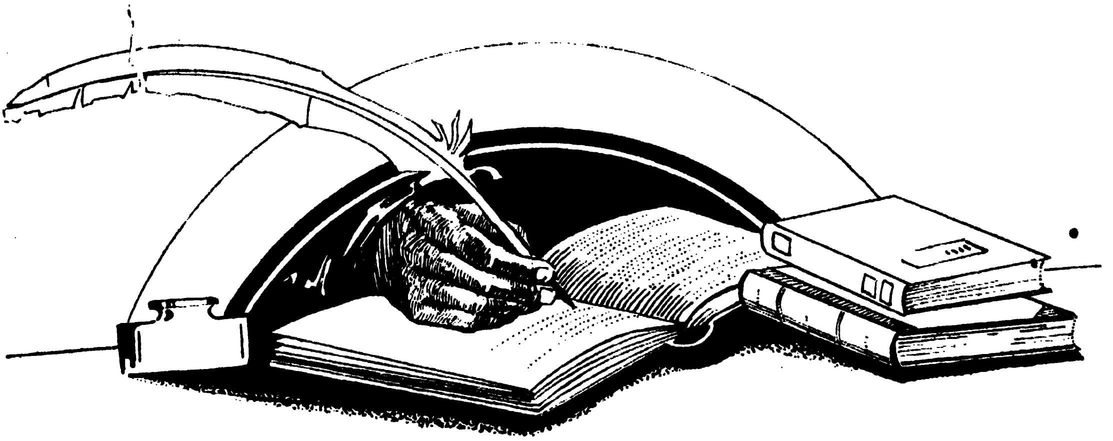
খুব বুঝেছি—এ রাস্তা আর ছাড়ছি নে।

পুষ্প

বাছা মাখন, তোমার মস্ত সুবিধে আছে—তোমার ফূর্তি কেউ মারতে পারবে না। এ দুটিও নয়।

দুই স্ত্রী

ছি ছি, আর একটু হ'লে তো সর্বনাশ হয়েছিল! (গড় হয়ে প্রণাম ক'রে) বাঁচালে এসে।



সম্পাদকীয়

নূতন কোনও সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের সময় অনির্দ্দিষ্ট পাঠক-সমাজের কাছে একটা কৈফিয়ৎ দেওয়ার রীতি আছে। আমাদের কৈফিয়ৎ পত্রিকার নামের মধ্যেই লুক্কায়িত। ধনাধ্যক্ষ কুবেরের আদর্শে অলকাপুরী নির্ম্মাণের কামনা, প্রকাশ করিয়া বলিতে নাই। কিন্তু সাহিত্য-সেবা ও সাহিত্য-ব্যবসায়ের মধ্য দিয়া তাহা যদি সম্ভব হয়, আমরা আনন্দিতই হইব। নেহাৎ ত্যাগের কারবার করিতে বসি নাই, এরূপ স্বীকারোক্তিতে লজ্জার কারণ থাকিলেও ইহাই আমাদের প্রথম কৈফিয়ৎ।

আমাদের পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সহিত পূজা-সংখ্যা এক হইয়া যাওয়াতে ইহার বরাবরের চেহারাটা দাখিল করা গেল না; রবীন্দ্রনাথের নাটকটিই প্রায় চল্লিশ পৃষ্ঠা জায়গা জুড়িয়া, সাধারণ এবং মাসিক কতকগুলি বিভাগকে স্থানচ্যুত করিয়াছে। কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে যতদূর সম্ভব একটা নির্দ্দিষ্ট আদর্শ অনুসৃত হইবে।

সাহিত্যিক কর্তৃক পরিচালিত জাতিবর্ণ-'কোটেরি'-নির্ব্বিশেষে সকল সাহিত্যিকের প্রতি সমান শ্রদ্ধাসম্পন্ন একটি সাময়িক পত্রিকার অভাব বাংলা দেশে আজকাল অনেকেই অনুভব করিতেছেন। 'অলকা' প্রকাশের দ্বিতীয় কৈফিয়ৎ—'অলকা' এই অভাব পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিবে। সম্পাদককে কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট দলভুক্ত কল্পনা করিয়া, ব্যক্তিগত ক্ষোভপরবশ হইয়া যদি কেহ 'অলকা'কে বর্জ্জন করেন, তাঁহাদের নিকট পূর্ব্বাহ্ণেই আমাদের এই নিবেদন যে, 'অলকা' সকল সাহিত্যিক দলাদলির ঊর্দ্ধে কি না তাহা স্বয়ং পরীক্ষা না করিয়া অকারণে তাহার প্রতি অবিচার করিবেন না। 'অলকা'র রচনা-বিচার নিঃসংশয়ে ব্যক্তি ও দল নিরপেক্ষ হইবে।

রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সহিত আমাদের সমাজ ও সাহিত্যের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক স্বীকার করিয়াও আমরা সকল রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিব; ইহার প্রধান কারণ—রাষ্ট্রব্যাপারে আমাদের অনভিজ্ঞতা। আমাদের সমাজে ও সাহিত্যে সমস্যার অভাব নাই; আমাদের আলোচনার গণ্ডি এই সকল সমস্যার মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিবে।

আমাদের জাতীয় উন্নতির জন্য আধুনিক বিজ্ঞানের সর্ব্বাঙ্গীণ প্রচারের প্রয়োজনীয়তা আমরা স্বীকার করি। সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞানের আলোচনা 'অলকা'র একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে।

* * *

'অলকা'র ২য় সংখ্যা আগামী কার্ত্তিক মাসের ১৫ই তারিখে বাহির হইবে।

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত

শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ৩৬।১ এল্‌গিন রোড হইতে প্রকাশিত